পরিচয়

সমালোচনা সংখ্যা
বর্ষ ৩৫ । সংখ্যা ১
শ্রাবণ ১৩৭২

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

সুশোভন সরকার

ভারতে ভাষা-সংকট

'পরিচয়'-এর পাঠকবর্গের কাছে শ্রীমোহন কুমারমঙ্গলমের নাম নিশ্চয় অপরিচিত নয়। বিদেশে উচ্চশিক্ষার পর তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হয়েছিলেন, সেদিনের সাম্যবাদী আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে তিনি গণ্য হতেন উচ্চতন নেতৃত্বের অন্যতম হিসাবে। পরে আইন-ব্যবসায়ে যোগ দিয়ে মাদ্রাজের আইন-জগতে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন স্বকীয় প্রতিভায়। আজও তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত, তামিলনাদে বিশিষ্ট নেতা, পার্টির জাতীয় পরিষদের সভ্য। এই বৎসরের গোড়ার দিকে দক্ষিণে যে প্রচণ্ড হিন্দি-বিরোধী আলোড়ন ভারতের ঐক্য সম্পর্কে বিপুল সমস্যা এনে ফেলেছে, আলোচ্য মূল্যবান চিন্তাশীল নিবন্ধটি তারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত।

মাদ্রাজে বিক্ষোভের মূলমন্ত্র রূপে ধ্বনি উঠেছিল—'ইংরেজি বরাবরের জন্য, হিন্দি কোনোদিন নয়।' অন্যদিকে হিন্দিভাষী কর্তৃপক্ষের দাবি হিন্দিকে এখনই স্বীকৃতি দিতে হবে। দক্ষিণী আন্দোলন এখন স্তিমিত হলেও অদূর ভবিষ্যতে তার পুনঃপ্রকাশ এবং অন্য অঞ্চলে তার বিস্তৃতির পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে আছে সমূহ বিপদ, বস্তুতই আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে ভাষা-সংকট। সংকটের মূলে দেখা যাবে মূলনীতির অভাব, সরকারের অদূরদর্শী সুবিধাবাদী আচরণ, সংকীর্ণ জেদের প্রকোপ, জাতীয় মুক্তি-যুদ্ধের ঐতিহ্য বিসর্জন।

গ্রন্থকারের মূল বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। 'পরিচয়'-এ সাত বৎসর পূর্বে প্রকাশিত (পৌষ, ১৩৬৪) প্রবন্ধে এর সমর্থন পাওয়া যাবে। শ্রীকুমারমঙ্গলম্ দুইটি মূল নীতির উপর সবিশেষ সঠিক জোর দিয়েছেন। প্রথম, প্রতিটি ভাষা-ভিত্তিক অঙ্গরাষ্ট্রে সেখানকার প্রাদেশিক ভাষাকে পূর্ণ

India's Language Crisis—by S. Mohan Kumaramangalam, New Century Book House (P) Ltd. Madras. Rs 5/-

মর্যাদায় সর্বস্তরে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দ্বিতীয়, ভারতের সংযুক্ত রাষ্ট্রে বাঞ্ছিত ঐক্য বজায় রাখার খাতিরে একটি সংযোগের ভাষা-প্রচলন কর্তব্য, আর এই উদ্দেশ্যে ইংরাজির বদলে হিন্দিকে মেনে নেওয়াটাই যুক্তিসংগত। এই দুই-এর মধ্যে আবার প্রথমটিই হল প্রাথমিক, এটা সুসম্পন্ন হলে দ্বিতীয় নীতি গ্রহণের পথে বাধা ও আপত্তি মিলিয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আজকের দিনে ভারতের ভাষা-সংকটের মূল কারণ হল প্রাথমিক কর্তব্যে অবহেলা, মুখে স্বীকার করলেও কার্যক্ষেত্রে তার প্রতি অবজ্ঞা। প্রাথমিক সোপান বাদ দিয়ে দ্বিতীয় ধাপে ওঠার চেষ্টা বিসদৃশ ও বিপদসংকুল। অথচ হিন্দীবাদী ও হিন্দিবিরোধী দুই প্রতিপক্ষ দলই ঠিক এই ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে গণ্ডগোল বাড়িয়ে চলেছেন। মূলনীতি বিস্মৃত হলে তার দাম দিতে হয় বৈকি!

সৌভাগ্যবশত ভারতে ভাষাভিত্তিক অঙ্গরাষ্ট্রগুলি আজ স্বীকৃত। গোটা বারো প্রধান ভাষা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত, সংবিধানেও তাদের বিশেষ স্থান রয়েছে। সর্বশেষ গণনার হিসাবে, এদের মধ্যে পাঁচটি (হিন্দি, তেলুগু, বাংলা, মারাঠি, তামিল) ভাষা বলে থাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিন কোটির উপর লোক। আরও চারটি ভাষা-ভাষীর সংখ্যা এক কোটির উপর (গুজরাটি, কানাড়ি, মালয়ালি, ওড়িয়া); পাঞ্জাবিও প্রায় এক কোটি লোকের মাতৃভাষা। আয়তনে ছোট হলেও অসমীয়া প্রায় সত্তর লক্ষের ভাষা, কাশ্মিরি প্রায় কুড়ি লক্ষের। প্রত্যেকটি ভাষার সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাষ্ট্র আজ ভারতে বিদ্যমান (হিন্দির ক্ষেত্রে একাধিক), যে-রাষ্ট্রে সেই প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার তুলনা চলে না। একমাত্র উর্দুর আনুষঙ্গিক রাষ্ট্র নেই, অথচ দুই কোটির উপর লোক উর্দুভাষী।

আমাদের প্রথম নীতি, এই সব প্রাদেশিক ভাষাকে নিজ নিজ অঙ্গরাষ্ট্রে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করা। মনে পড়ে লেনিনের অমর উক্তি—জনগণের সঙ্গে কথা বলতে হয় তাদের নিজস্ব ভাষায়। বিদেশী ব্রিটিশ শাসকেরা স্বভাবতই এদের অগ্রাহ্য করে ইংরাজি চালাবার চেষ্টা করেছিলেন, স্বাধীনতার পর সে-পন্থা আমাদের কাছে অগ্রাহ্য। গণতন্ত্রের অর্থ এ নয় যে বিপুল জনগণকে তাদের অবোধ্য সরকারী ভাষার দরজায় মাথা খুঁড়তে হবে, গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্বই এই যে জনসাধারণের ভাষায় কাজকর্ম চালাতে হবে। পৃথিবীর সর্বদেশে আজ এই নিয়ম প্রচলিত, ভারতই কি এমন সৃষ্টিছাড়া দেশ যে এখানে এ-নীতি অচল?

প্রাদেশিক ভাষাকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হল সকল ক্ষেত্রে সর্বস্তরে শিক্ষায়, প্রশাসনে, আইন-আদালতে সেই ভাষার পূর্ণ ব্যবহার। প্রতি প্রদেশ-রাষ্ট্রে বাহন বা মাধ্যম হবে সর্বত্র সেখানকার প্রধান ভাষা। আপত্তি আসে পণ্ডিতদের কাছ থেকে—এঁদের উদ্দেশে গান্ধীজীর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ গ্রন্থকার উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁদের বিশেষ বিষয়ের উন্নতিসাধনে লিপ্ত থাকুন, গণতান্ত্রিক সাধারণ নীতির বেলায় তাঁদের মতটাই প্রামাণ্য হবে কেন? মুষ্টিমেয় ইংরাজিনবিশের হাতে আজও সকল ক্ষমতা ন্যস্ত, পরিবর্তনকে বাধা দেওয়া তাঁদের কায়েমী স্বার্থের পরিপূরক নয় কি? তঁাদের মধ্যে অনেকে স্থানবিশেষে 'আ মরি আমার ভাষা' বলে আবেগ প্রকাশ করতে ছাড়েন না, অথচ গতানুগতিক পথ ছাড়তে হলে আসে অভ্যাসের দাসত্ব, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ।

বিশেষজ্ঞ কি শুধু এদেশী পণ্ডিতেরা? মাতৃভাষায় শিক্ষাদানই যে পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক প্রথা এ কথা কি অন্য দেশে স্বীকৃত সত্য নয়? স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মাতৃভাষা মাধ্যম হলে ছাত্রদের সময় ও শক্তির অপচয় বন্ধ হয়, স্বাধীন চিন্তা ও সুষ্ঠু আত্মপ্রকাশ সহজ হয়ে ওঠে, দুরূহ ভাষায় অবান্তর কথা বলে শিক্ষকেরা পার পান না, মুখস্থ করার প্রয়াস ক্ষীণ হয়ে আসে, সম্ভব হয় অধীত বিদ্যাকে আত্মস্থ করে তোলা। পাঠ্যপুস্তকের অভাব কোনোও যুক্তিই নয়, শিক্ষার মাধ্যম যে-ভাষা হবে সেই ভাষাতেই পাঠ্যপুস্তক রচনা কিছুটা সময়সাপেক্ষ মাত্র। উচ্চস্তরে গিয়ে শিক্ষার মাধ্যম পালটানো অযথা শক্তিক্ষয়, সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। আসলে জলে না নামলে সাঁতার কাটা শেখা যায় না; আমাদের অভাব সেই জলে নামার সাহসটুকু। ১৯৫৭ সালে মাদ্রাজে তামিলকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির আইন পাশ হয়, অথচ শ্রীকুমারমঙ্গলম্ দেখিয়েছেন যে আজ পর্যন্ত তামিল সরকারের সাহস হল না তাকে কার্যকর করার। তাই ইংরাজিকেই আঁকড়ে থাকতে হয়, বিজাতীয় হিন্দিকে আটকাতে হলে রব ওঠে—'ইংরাজি বরাবরের জন্য।'

প্রাদেশিক ভাষাকে স্বস্থানে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার পর দ্বিতীয় সোপানে আরোহণ সহজসাধ্য হয়। ভারতের সংযুক্ত রাষ্ট্রে সংযোগের ভাষা প্রয়োজন—আর্থিক উন্নতি, সাংস্কৃতিক ঐক্য-সন্ধান, রাষ্ট্রিক শক্তি বৃদ্ধি—সার্থক আত্মরক্ষার খাতিরেই আবশ্যক। কথা উঠেছে যে সংবিধানের অষ্টম সেডুলে স্বীকৃত চোদ্দটি ভাষাই সংযোগের ভাষা হবে না কেন। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে—

যেমন পার্লামেণ্টে বক্তৃতায় অনুবাদের সাহায্যে চোদ্দটি ভাষা চালানো অসম্ভব নয়, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কাজকর্ম ও অঙ্গরাষ্ট্রের সঙ্গে সকল ব্যাপারে যোগাযোগে চোদ্দ ভাষার সমান ব্যবহার অবাস্তব কল্পনা। ডি-এম্‌-কের এই দাবি বস্তুত ইংরাজি বজায় রাখার কূটকৌশল মাত্র। এক্ষেত্রে অন্য সব কথা ছেড়ে দিলেও বিপুল ব্যয়ের প্রশ্ন থেকে যায়। প্রতিটি সরকারি দলিল প্রতি ক্ষেত্রে চোদ্দ ভাষায় প্রকাশ করতে হলে বিপুল পরিমাণে কাগজ শক্তি সময়ের অপব্যবহার করতে হয়, মাথাভারি সরকারের মস্তকস্ফীতি ব্যাধিতে দাঁড়িয়ে যায়। ব্যবহারিক দিক থেকে সংযোগের ভাষা এক হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।

গ্রন্থকারের মতে এবং আরও অনেকের মতে সংযোগের সেই ভাষা হিন্দি হওয়াই উচিত। হিন্দি আমাদের সবচেয়ে প্রচলিত ভাষা—১৯৬১ সালের সেনসাসে হিন্দিভাষীর সংখ্যা পাই বারো কোটির উপর। এর মধ্যে অবশ্য হিন্দির উপভাষাগুলিও পড়ে, কিন্তু অন্য ভাষার রাজ্যেও উপভাষা কিছুটা থাকতে বাধ্য, আর কালক্রমে হিন্দির উপভাষাবিশেষ (মৈথিল ইত্যাদি ?) স্বতন্ত্র ভাষার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারলেও মূল ভাষার সঙ্গে যোগসূত্রটুকু লোপ না পাওয়াই স্বাভাবিক। ভারতে অন্য ভাষাভাষী সাধারণ লোকের কাছে কিছুটা হিন্দি শেখা খুব শক্ত নয়, কথা ও ভাবের অনেক মিল আছে, অবশ্য হিন্দির দাপটের ভয়টুকু মন থেকে লোপ পাবার পর। ভারতে সরকারি সংযোগের ভাষা ভারতীয় হওয়াটাই শোভন, অন্যথা দেশের আত্মমর্যাদার হানি হয়, বিদেশের কাছে ভারতকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করাটা শুধু জাতীয় ভাবাবেগের কথা বলে চিহ্নিত করা অনুচিত। জাতীয় পতাকার মতন জাতীয় সংযোগের ভাষারও বিশেষ দাম আছে।

অনেকে ইংরাজিকেই সংযোগের ভাষা হিসাবে রাখতে চান। মুষ্টিমেয় ভারতীয়ের মাতৃভাষা ইংরাজি, কিন্তু সংখ্যায় তারা হো বা গারো-ভাষীদের চাইতেও কম। ইংরাজি ভাষা নয় অথচ ইংরাজি জানে দাবি করে এমন লোকের সংখ্যা এদেশে এক কোটির সামান্য বেশি ; হিন্দি মাতৃভাষা নয় অথচ হিন্দি জানে এমন সংখ্যা তার চাইতে বেশি কম নয়—প্রায় ১ কোটি। ইংরাজির যত গুণই থাক, তাকে ভারতীয় ভাষা বলা চলে না, সাধারণ লোকের চোখে ইংরাজি বিদেশী ছাড়া কিছু নয়। শিক্ষিত সমাজ আজও ইংরাজিকে আঁকড়ে ধরে থাকলে সেটা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক হবে। হিন্দির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজিকেও সহযোগী সংযোগের ভাষা রাখা অসম্ভব নয়, দেশের বর্তমান ভিত্তি

অবস্থায় এ ব্যবস্থার কিছুটা সুবিধা আছে। কিন্তু সহযোগী ভাষা সহযোগী মাত্র, মূল ভাষার তুলনায় তার স্থান নিশ্চয় কিছুটা নিচে, বিশেষত তাকে যখন দেশীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও পরিণামে সংযোগের ভাষা হিসাবে হিন্দির প্রাধান্যই মানতে হবে।

গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে হিন্দি-বিরোধের মূল উৎস হল হিন্দি-প্রভুত্বের ভয়, আর তার ভিত্তিতে রয়েছে প্রাদেশিক ভাষাকে স্বাধিকারে বঞ্চিত করে রাখা। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে প্রাদেশিক ভাষার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হওয়া মাত্র হিন্দি-প্রাধান্যের ভয় লোপ পেতে আরম্ভ করবে। হিন্দি জাতীয় ভাষা নয়, বহু ভাষাভাষী ভারতবর্ষে কোনো একটি ভাষা জাতীয় বলে দাবি করতে পারে না। হিন্দি একক রাষ্ট্র ভাষা নয়, অঙ্গরাষ্ট্রে প্রাদেশিক ভাষাই ত সরকারি বা রাষ্ট্র-ভাষা হবে। হিন্দি সংযোগের ভাষা মাত্র, সম্ভব হলে একক ভাবে, নয়ত কিছুদিন ইংরাজির সাহচর্যে। মূলনীতি স্বীকৃত ও ব্যবহৃত হলে হিন্দি সম্বন্ধে অযথা ভয়ের কারণ থাকে না। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রে সমস্ত কিছু যে হিন্দিতে চলবে এমনটাও ঠিক নয়। কেন্দ্ররাষ্ট্রের যেসব বিভাগের শাখা অন্য ভাষার অঞ্চলে কাজ করবে—রেল, ডাকঘর, আয়কর বিভাগ, শুল্ক সংগ্রহ ইত্যাদি—সেখানে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার না করতে পারলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে অগণতান্ত্রিক ব্যবধান সরকারকেই দুর্বল করে রাখতে বাধ্য। সরকারি হিন্দি ভাষাকে এভাবে সীমিত করতে পারলে ভাষা-সংকটের সমাধান সহজ।

আলোচ্য গ্রন্থের একটি চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য হল ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ। প্রচুর উদ্ধৃতি সহযোগে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে মুক্তি-সংগ্রামের বরেণ্য নেতারা—বিশেষত গান্ধীজী ও জওহরলাল—ভাষা-সংকটের যে-সমাধান ইঙ্গিত করেছিলেন তার সঙ্গে উপরে বর্ণিত মূলনীতি দুটির সম্পূর্ণ মিল আছে। ১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেসে সভাপতির আসন থেকে গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে প্রাদেশিক রাষ্ট্রে সকল কাজকর্মে প্রাদেশিক ভাষাকে চালু করতে হবে আর কেন্দ্রীয় শাসনের ভাষা হবে হিন্দুস্থানি। মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে পর্যন্ত তিনি বলেছিলেন যে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র স্থাপন অবশ্যকর্তব্য, রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানি বিভিন্ন প্রদেশে মাধ্যম হিসাবে সেখানকার ভাষাকে স্থানচ্যুত করতে পারে না। ১৯৩৭-এর এক প্রবন্ধে নেহরু বলেছিলেন যে প্রতি প্রদেশে শিক্ষার বাহন হবে সেখানকার ভাষা, অন্যথা জনগণের উন্নতি অসম্ভব। তিনি লিখেছিলেন যে সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষা ইংরাজির বদলে হিন্দুস্থানিকেই করা উচিত,

কিন্তু কেন্দ্রীয় সেই ভাষার পক্ষে প্রাদেশিক ভাষার নিজস্ব ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ অন্যায়। এমনকি যে-রাজাজি আজ ইংরাজির ধ্বজা আকাশে তুলেছেন তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন-উৎসবে (ওস্‌মানিয়া, ১৯৪৪; কলিকাতা, ১৯৪৭) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার দাবি করেন, প্রতিটি প্রধান ভাষার সংশ্লিষ্ট নিজস্ব অঙ্গরাষ্ট্র স্থাপন সমর্থন করেন।

দুর্ভাগ্যবশত গৌরবময় এই ঐতিহ্য থেকে পশ্চাদগমন শুরু হল স্বাধীনতা-লাভের পর থেকেই। সর্দার পাটেলের নেতৃত্বে দেশীয় রাজ্যসমূহ দখলের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন স্থগিত রইল। রাষ্ট্রগঠন-পরিষদে বিতর্ক উঠল—হিন্দি না ইংরাজি। গোপালস্বামী আয়েঙ্গার বিলাপ করলেন যে শেষ পর্যন্ত ইংরাজি বর্জন করতে হলেও সেটা আমাদের দুঃখজনক দুর্ভাগ্য; শেঠ গোবিন্দদাস দাবি তুললেন যে হিন্দি প্রতিষ্ঠা করতেই হবে, অযথা দেরি করে লাভ কি। প্রাদেশিক ভাষার স্বীকৃতি যে প্রাথমিক কর্তব্য, সে সম্বন্ধে উভয় পক্ষ নীরব রইলেন। শুরু হল ইংরাজি, না হিন্দি—এই লড়াই।

এর প্রতিফলন দেখতে পাই সংবিধানের সপ্তদশ ভাগে। ৩৪৩ ধারা ঘোষণা করল হিন্দি (হিন্দুস্থানি নয়) কেন্দ্রের সরকারি ভাষা, কিন্তু পনের বছর পর্যন্ত ইংরাজি চলবে। এটা হল আবশ্যিক নীতি, কিন্তু ৩৪৫ ধারা অনুসারে প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষার স্বীকৃতি থেকে গেল ঐচ্ছিক ব্যাপার (shall আর may-এর তফাৎ)। অর্থাৎ প্রাথমিক কর্তব্যটাকে ঠেলে দেওয়া হল অনিশ্চিতের গহ্বরে, সে-ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণও উচিত মনে হল না। ৩৪৪ ধারা অনুসারে হিন্দি প্রচলনে গতি বিচারের জন্য পাঁচ বৎসর পর পর পর্যালোচনার আদেশ হল, অনুরূপ ব্যবস্থা প্রাদেশিক ভাষার বেলা রইল অনুক্ত। ৩৫১ ধারায় নির্দেশ দেওয়া হল কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দি প্রচার অভিযানে নিযুক্ত হতে, প্রাদেশিক ভাষার ভাগ্যে থাকল নীরবতা। ঐতিহ্য ও মূলনীতি থেকে অপসরণ ছাড়া একে আর কি বলা যায়।

সংবিধানের পাঁচ বৎসর পর ভাষা কমিশনের আলাপ-আলোচনায় বিচ্যুতি আরও স্পষ্টভাবে দেখা দিল। কথা উঠল, তিন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে কেবল অহিন্দি প্রদেশের জন্য, অর্থাৎ হিন্দীভাষীরা বাধ্য হবে না অন্য ভারতীয় ভাষা শিখতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে, হাইকোর্টে, আইন প্রণয়নের বেলা হিন্দি ভাষাই প্রতিষ্ঠা করতে হবে ক্রমে ক্রমে। সর্বভারতীয় পরীক্ষায় প্রাদেশিক ভাষার জন্য অপেক্ষা না রেখে হিন্দি মাধ্যম যথাসময়ে গ্রহণ করা চলবে। অর্থাৎ আবার

সেই পদে পদে প্রাথমিক কর্তব্য অবহেলা করার বন্দোবস্ত। পার্লামেন্টের আলোচনায় বা ভাষা-আইনে এই সব উগ্র ধারণা সামগ্রিক ভাবে গ্রাহ্য না হলেও সঠিক নীতিও স্পষ্টভাবে ঘোষিত হল না। ফলে অহিন্দি প্রদেশগুলিতে ভয় দানা বাঁধতে থাকল যে নিজস্ব ভাষার আশ্রয়ে থাকলে চাকরির অসুবিধা হবে, সর্বক্ষেত্রে হিন্দিওয়ালাদের তাঁবে গিয়ে পড়তে হবে, হিন্দিভাষীরা সর্বত্র পাবে বেশি সুযোগ, বেশি মর্যাদা। আত্মরক্ষার তাগিদে তাই ইংরাজি আঁকড়ে থাকার প্রবণতা বেড়ে চলল, বিশ্বাস দৃঢ় হল যে হিন্দি আটকাবার প্রকৃষ্ট অস্ত্র হল ইংরাজি-সংরক্ষণ। অবশ্য কিছু বুদ্ধিবাদী আছেন যাঁদের মতে ইংরাজি বিধাতার এমনই সৃষ্টি যে এ ছাড়া সভ্য জীবনযাত্রা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কেননা একদা ইতিহাসের গতিপথে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ইংরাজি শিখতে হয়েছিল। কিন্তু বোঝা কঠিন নয় যে বুদ্ধিবাদী পণ্ডিতের কূটতর্ক আজ জোর পাচ্ছে হিন্দি প্রাধান্যের ভয় থেকেই। মূলনীতি থেকে বিচ্যুতি না আসলে এ ভয় কখনও মাথা তুলতে পারত না। ভাষার প্রশ্নকে সংকটে পরিণত করে ফেলছে আমাদেরই নীতিহীন মূঢ়তা—সংকট ঠেকিয়ে রাখার জন্য একমাত্র রব উঠছে স্থিতাবস্থা বজায় থাকুক, সে-অবস্থা যতই অবৈজ্ঞানিক, উন্নতির যত পরিপন্থী হোক না কেন!

ভাষা-সমস্যার প্রাঞ্জল যোগ্য আলোচনার জন্য মোহন কুমারমঙ্গলম্ আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করলেন। বইখানির বিপুল প্রচার ও ভাষান্তর তাই কামনা করি। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ছাড়া আরও চারটি প্রসঙ্গ আলোচ্য পুস্তকটির মর্যাদা বাড়িয়েছে—সেনসাসের সর্বাধুনিক (১৯৬১) তথ্য পরিবেশন, কমিউনিস্ট জাতীয় পরিষদের ভাষা-নীতি নির্দেশক প্রস্তাবের (এপ্রিল, ১৯৬৫) উদ্ধৃতি, সোভিয়েত দেশে বিভিন্ন ভাষার বিকাশসাধনের বিবরণ, তামিলনাদে বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ।

দুটি ব্যাপারে আলোচনা আরও বিস্তৃত হলে লাভজনক হত—সংযোগের ভাষা হিসাবে গান্ধীজীর সরল হিন্দুস্থানির বদলে সংস্কৃত-ঘেঁষা কঠিনতর হিন্দির প্রবর্তন, ও সর্বভারতীয় পরীক্ষায় কোটা নির্দেশের ব্যবস্থা। সহজবোধ্য হিন্দুস্থানি ছিল একটা মহান আদর্শ, সরকারি নীতি তাকে অগ্রাহ্য করে জোর দিচ্ছে 'বিশুদ্ধ' হিন্দির উপর, যার ফলে হিন্দিভীতি বাড়ে বই কমে না। পরিভাষার নূতন শব্দ উদ্ভাবন এরই একটা অঙ্গ, অথচ, বিশেষত বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রচলিত আন্তর্জাতিক শব্দগুলি মেনে নিলে বুঝবার সুবিধা হয়, ভারতে বিভিন্ন

ভাষার মধ্যে এই সম্পর্কে সমতা রক্ষাও হয়ে ওঠে সহজতর। প্রাদেশিক ভাষা উচ্চশিক্ষার বাহন হলে সর্বভারতীয় পরীক্ষায় একই প্রশ্নপত্র প্রধান ভাষাগুলিতে রচিত হওয়া অনিবার্য। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ ও বিভিন্ন ভাষায় পরীক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচনের সময় কোটা নির্দেশ ছাড়া গতি থাকে না, কারণ এই অসম অবস্থায় সার্থক moderation সম্ভব নয়। অথচ এই ব্যবস্থায় সব কিছু রসাতলে যাবার আশঙ্কা ওঠে কেন? পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থীরাই বাছাই হয়ে থাকে ভাবাটাই অসংগত; একই পরীক্ষায় বিভিন্ন পরীক্ষক থাকার দরুণ এখনও সমতা রক্ষা সম্ভব হয় না, যোগ্যতম ছাত্রেরাই যে শুধু পরীক্ষায় উপস্থিত হয় এ কথাও ঠিক না। ঐক্যরক্ষার জন্য কিছুটা ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন হয়; সকল দেশের বিধিব্যবস্থায় তার নিদর্শন পাওয়া যাবে। যান্ত্রিক ভাবে সমান সুযোগ কি সকল অবস্থায় সম্ভব?

স্বল্পায়তন গ্রন্থে অবশ্য সকল আলোচনার স্থান হয় না। তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি সমস্যা-আলোচনার অভাব তাই সমালোচকের চোখে পড়েছে—পরবর্তী সংস্করণে এগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

প্রথম, উর্দুর বিশেষ সমস্যা। দুই কোটি লোকের ভাষা উর্দু, অথচ তার সংশ্লিষ্ট কোনো ভাষাভিত্তিক প্রদেশ নেই। এর সমাধান সম্ভবত এই ব্যবস্থায় যে, যে-অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ উর্দুভাষী আছে সেখানে উর্দুকে সহযোগী প্রাদেশিক ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। এই পথই সংগত ও গণতান্ত্রিক।

দ্বিতীয়, প্রতি অঞ্চলে সংখ্যাল্পের মাতৃভাষার সমস্যা, প্রতি প্রদেশে অল্প-বিস্তর সংখ্যাল্প লোক থাকতে বাধ্য। প্রদেশের যে-অঞ্চলে অন্য ভাষা-ভাষী লোক বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান, সেখানে শিক্ষা ও শাসনে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার আমার কাছে অনিবার্য মনে হয়—যেমন বাংলাদেশের নেপালি এলাকায় বা আসামে গারো-ভাষী ভূখণ্ডে। সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুন্নত ভাষার শ্রীবৃদ্ধি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। কলিকাতায় দক্ষিণ ভারতীয় বা পশ্চিম বাংলায় হিন্দি-ভাষীদের জন্য কিছুটা পৃথক ব্যবস্থাও একেবারে অসম্ভব নয়। যেখানে সংখ্যাল্প লোক মুষ্টিমেয় সেখানে অবশ্য প্রাদেশিক ভাষাকেই অবলম্বন করতে হবে, পৃথিবীর সর্বত্রই এই নিয়ম।

তৃতীয় কথা, তিন ভাষা-শিক্ষার ফর্মুলা। মাতৃভাষা অবশ্য শিক্ষণীয়, আর ইংরাজি আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি হওয়াতে উচ্চশিক্ষায় অন্তত তাকে বাদ দেওয়া চলে না। আবশ্যিক ভাবে অহিন্দি অঞ্চলে হিন্দি আর হিন্দি এলাকায়

অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা-শিক্ষাও বাঞ্ছনীয় হতে পারে, কিন্তু এতে আপত্তি ওঠারও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ভাষা-শিক্ষার এই ভারবৃদ্ধি কি একেবারে অনিবার্য? তৃতীয় ভাষাকে যদি প্রথমটা শুধু ঐচ্ছিক বিষয় রাখা হয়, তাহলে পাস মার্কের অতিরিক্ত নম্বর মোট নম্বরে যোগ করার ব্যবস্থা থাকলে এবং এই বর্ধিত নম্বর বিভাগ ও বৃত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে বিচার্য হলে ছাত্রদের তৃতীয় ভাষা-শিক্ষা সম্পর্কে একটা স্বার্থ সৃষ্টি সম্ভব, আর এতে করে আপত্তি হ্রাসের উপায় পাওয়া যায়।

চতুর্থ প্রশ্ন লিপি সম্পর্কে। প্রতিটি ভাষায় যদি রোমক লিপি অবলম্বন করা যায়, তাহলে বিস্তর সুবিধার সম্ভাবনা। অন্য প্রদেশের ভাষা-শিক্ষার পথে এতে অনেক বাধা অপসারিত হবে, ভাষায় ভাষায় যোগাযোগ হয়ে উঠবে সহজতর, ভারতীয় ঐক্যও হবে পরিপুষ্ট। প্রাদেশিক লিপি একেবারে বর্জন করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিছুটা রোমক লিপির সাহায্য নিলে অশিক্ষিত বিপুল জনগণকে শিক্ষাদান সহজতর হতে পারে, যুক্তাক্ষর আয়ত্ত করার প্রচণ্ড প্রয়াস এড়ানো সম্ভব হয়, প্রশাসনে টাইপরাইটারের সমস্যা মিলিয়ে যায়, ভাষা-শিক্ষার কষ্ট লাঘব হতে থাকে। ভাষা ও লিপি একার্থক নয়। রোমক লিপি আন্তর্জাতিক হওয়াতে বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগও সহজসাধ্য হয়। আন্তর্জাতিক সংখ্যার ব্যবহার ত শুরু হয়েছে, আন্তর্জাতিক লিপিও কেন অগ্রাহ্য থাকবে?

পরিশেষে গ্রন্থকারের সঙ্গে কয়েকটি ব্যাপারে মতান্তরের উল্লেখ করে দীর্ঘ আলোচনা শেষ করব। ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলি সুপ্রাচীন সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্রিটিশ আমলের আগে কি তারা, লেখক যতটা দাবি করেছেন, ঠিক ততটা সমৃদ্ধ ছিল? ভাষারও একটা ইতিহাস থাকে, সময়ে বাইরের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে তার পুষ্টিলাভ হয়। বাংলা ভাষায় অন্তত সার্থক গদ্যসৃষ্টি উনিশ শতকের আগে হয় নি। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিধি এত বিস্তৃত যে তার কাজ সুসম্পন্ন করা প্রাচীন ভাষার পক্ষে শক্তিসঞ্চয় ও যথাযোগ্য প্রসার লাভের আগে হয়ত বা সম্ভব হত না। যুগোপযোগী নূতন শিক্ষার প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রশ্নটা এর সঙ্গে জড়িত। পশ্চিমী শিক্ষা যখন প্রথম বাংলাদেশে এল তখনকার চিন্তানায়কদের স্বভাবতই চোখ ছিল শিক্ষাবস্তুর উপর, মাধ্যমটা তখনকার মতন গৌণ মনে হওয়ার কারণ বোঝা শক্ত নয়। তাঁরা সেদিন চেয়েছিলেন সংকীর্ণ সনাতনী বিদ্যাচর্চার গণ্ডি পার হয়ে বিদেশাগত বিজ্ঞান,

ইতিহাস, রাষ্ট্রচিন্তা, ও এ-যুগের সাহিত্য অধ্যয়ন করে ভাবনার নূতন সিংহদ্বার খুলে দিতে। হিন্দু কলেজের তরুণ যুবকেরা তখন নূতন শিক্ষার সুবিধাজনক যন্ত্র হিসাবে ইংরাজি মাধ্যমের আশ্রয় নেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এক থাকে না। ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তনের অর্ধশতাব্দী পর অবস্থা নিশ্চয়ই বিপুলভাবে বদলে গিয়েছিল। ততদিনে নূতন শিক্ষার বিষয়বস্তু পরিচিত হয়ে উঠেছে, মাতৃভাষাও হয়ে উঠেছে শক্তিশালী। মাধ্যম পরিবর্তন তখন মূল প্রশ্ন হয়ে ওঠা উচিত ছিল। সেই সন্ধিক্ষণ মোটামুটি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক। আমাদের দুর্ভাগ্য, চিন্তানেতারাসেদিন কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, ইংরাজি তখন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, শিক্ষিত সংকীর্ণ গণ্ডির হাতে ক্ষমতা হয়েছে দৃঢ়মূল।

শ্রীকুমারমঙ্গলম্ রামমোহন প্রভৃতি সম্বন্ধে অবিচার করেছেন। রামমোহন সম্পর্কে উদ্ধৃত গান্ধীজীর উক্তি—তাঁকে ইংরাজিতে ভাবতে হয়েছিল, লিখতে হয়েছিল প্রধানত ইংরাজিতে—অনৈতিহাসিক, হাস্যোদ্দীপক। প্রথম যে-বইখানিতে রামমোহন তাঁর সেদিনের পক্ষে বিপ্লবাত্মক ধর্মচিন্তার খসড়া উপস্থিত করেন, সেটা রচিত হয় ফারসিতে, তখন তিনি ইংরাজি জানতেন না বললেই চলে। সমাজ-সংস্কারে তিনি যখন তুমুল আলোড়ন আনলেন তখন প্রতি পর্যায়ে তিনি প্রকাশ করেন বাংলা পুস্তিকা, বস্তুত প্রথম সার্থক বাংলা গদ্যরচনা এই লেখাগুলি। রাজনীতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাতৃভাষাকে বাহন করার দাবি গান্ধীজী নিশ্চয় সজোরে উপস্থিত করেছিলেন ; গুজরাটিদের প্রতি তাঁর উদ্ধৃত আবেদনের তারিখ হল ১৯০৯। কিন্তু গ্রন্থকার বিস্মৃত হয়েছেন যে তার বহু পূর্বে মাতৃভাষা মাধ্যমের দাবি বাঙালি মনীষীরা ধ্বনিত করেছিলেন—উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ (১৮৯২), বাংলা প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের নাটোর (১৮৯৭) ও পাবনা (১৯০৮) অধিবেশনের উল্লেখই যথেষ্ট।

চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

গ্রামীণ ভারতবর্ষ

"যে সকল দেশ ভাগ্যবান তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়, বালককালের ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয়-সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উল্টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।...কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল...। কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়, এ সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনাখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।...ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জন সত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না। সেদিনও সেই ধূলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান।"

—রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভাদ্র ১৩০৯

'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য', এই সত্যের সন্ধানে লিপ্ত হয়ে এ-যুগের মনীষীবৃন্দ ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ধারার বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে; সকলেই এই কথা উপলব্ধি করেছেন যে "প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে-জীবনস্রোত" বইছে, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে, তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হলে সর্বাগ্রে দরকার, দেশকে, দেশবাসীকে জানা, তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া।

ভারতের গ্রাম-জীবন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। **ভারতবর্ষের গ্রাম-জীবনের বৈশিষ্ট্যাবলী পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ভারত-সরকারের নৃতত্ত্ব-সমীক্ষা কর্তৃক সংগৃহীত বিবরণ। চার টাকা।**

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও অর্থনৈতিক আলোড়নের ফলে যদিও একদিকে আমাদের 'স্বদেশ' বোধ দানা বেঁধেছিল, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংজ্ঞা সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হয়েছিল, অপরদিকে তেমনি সৃষ্টি হয়েছিল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শহরবাসী ও অগণিত গ্রামবাসীর মধ্যে এক দুরতিক্রম্য ব্যবধান। রাজনৈতিক চেতনার ফলে 'রাষ্ট্র' গঠনের চেষ্টা যখন শুরু হয়, তখন প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে দেশের এক ঐক্যর রূপ আমরা কল্পনা করতাম, তার অন্তরালে ছিল শিক্ষিত দেশবাসীর কাছে সম্পূর্ণ অজানা এক দেশ, আমাদের প্রতিবেশী অগণিত গ্রাম।

বারো লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে ভারতের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রাম ও কয়েক সহস্র শহরে যে ৪৪ কোটি লোক বাস করছে[১] তাদের ভাষা, ধর্ম, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহারের মধ্যে বৈচিত্র্য যে থাকবে এ কথা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। ইউরোপীয় শিল্পনগরীগুলির ভারতীয় সংস্করণ আমাদের মহানগরী বা শিল্পকেন্দ্রগুলির চেহারা প্রায় সর্বত্র সমান; স্থানীয় লোকেদের স্বভাবপার্থক্যজনিত যে-প্রভেদ, তা বাদে বাহ্যিক সাদৃশ্যের চিহ্নগুলি সব শহরেই বিরাজমান। কিন্তু যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন পাঁচ লক্ষাধিক গ্রামগুলির মধ্যে কি কোনো মিলনসূত্র আছে? শহরবাসীদের চোখে আপাতভাবে যে-সাদৃশ্য দেখা যায় তা হচ্ছে গ্রামবাসীর দারিদ্র্য ও অশিক্ষা; স্থানভেদে ভাষা, পেশা বা পোশাকের যে-পার্থক্য নজরে পড়ে, তা এতকাল কিছু কৌতূহলের উদ্রেক করেছে মাত্র, তার বেশি আগ্রহ জন্মাবার সুযোগ ঘটে নি। উভয়ের মধ্যে মানসিক দূরত্ব অন্তহীন।

স্বাধীনতার পূর্বে কিছু পরিমাণে এবং স্বাধীনতার পর অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে ভারতবর্ষের গ্রামজীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা হয়েছে।

---

১. ১৯৬১র আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতের শহরের সংখ্যা ২৬৯০ (জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮৮ লক্ষ) আর গ্রামের সংখ্যা ৫,৬৪,৭০০ (জনসংখ্যা ৩৫ কোটি ৯৪ লক্ষ)। এই গ্রামের মধ্যে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রামের জনসংখ্যা গ্রামপিছু ৫০০ জনের থেকে কম (মোট জনসংখ্যা ৭ কোটি ৫২ লক্ষ); আর ২ লক্ষ ১১ হাজার গ্রামের গড় জনসংখ্যা ৫০০ থেকে ৫০০০-এর মধ্যে; এগুলির মোট জনসংখ্যা ২৪ কোটি ৯৮ লক্ষ। এই সংখ্যা থেকেই আমাদের দেশের গ্রামজীবনের বৈচিত্র্যের কারণ অনুমান করা অসম্ভব নয়।

এই সূত্রে এক বিদেশীয় গবেষকের লেখার থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"As for what life in the Indian village is really like, who knows save the Indian villager? A few officials like M. L. Darling whose Punjab rural sides compare with Cobbett's, a few devoted social workers, Indian and European, Christian and otherwise. But *even then there is the difference* between living in the village from cradle to grave (or burning-ghat), and living in the village with a territorial—and social and psychological—base outside."···"The alien may perhaps glean some thing from the rich harvest of salty rural proverbs which are as vital a part of India's cultural heritage as the lyrical and metaphysical visions of her sages.[২] Not that this latter strain of culture is absent from the village : the great epics Ramayana and Mahabharata pass from lip to lip in folk-versions, to some extent at least every man is his own poet and not a few of the noblest figures in India's predominantly devotional literature sprang from thh village rather than the schools : Kavir, the Weaver, Tukaram. The *things that strike the outsider, then, ar not perhaps ultimately the most* important : the flies an the sores, the shrill clamour of gaunit pi-dogs, th primitive implements, the utter lack of sanitation.···" "A its worst, the Indian village is infinitely depressing ···Yet, cheerfulness keeps breaking in, in the mos unfavourable circumstances ; fatalist as he ls and mus

২. "কিন্তু বিদেশ যখন ছিল দেশ তখনো ছিল, নইলে এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর নান চৈতন্য তুকারাম ইহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লী আগ্রা ছিল তাহা কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল···।" ('ভারতবর্ষের ইতিহাস'—ইতিহাস, পৃ. ২)

be, the peasant often *displays an astonishing resilience and refuses to the broken by his often bitterly hard geographical and social environment.*"

(O. H. K. Spate : India and Pakistan).

ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব-সমীক্ষা দেশের গ্রামজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে পরীক্ষা করে দেখবার উদ্দেশ্যে কয় বছর পূর্বে যে-পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, সম্প্রতি সেটির প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। গান্ধীজীর ভাবশিষ্য নির্মলকুমার বসু মহাশয়ের ভূমিকা, মুখবন্ধ ও আলোচনা -সংবলিত এই মূল্যবান গবেষণার বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ অর্জন করেছেন। গ্রাম-পরিকল্পনা, গৃহগঠনপদ্ধতি, খাদ্য-উৎপাদন ও তার সরঞ্জাম ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন, নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে-সাদৃশ্য লক্ষিত হয় তার বিশদ বিবরণ মানচিত্র ও ছবির সাহায্যে পরিস্ফুট হয়েছে এই সমীক্ষার মধ্যে। ভূমিকাতে শ্রীনির্মলকুমার বসু মহাশয় এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও ফলাফল ব্যাখ্যা করেছেন—"বাস্তবজীবনের ঘটনাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়-স্থাপনই যে কোনও সমাজ-বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রথম পাঠ।" "ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ঐক্যের বোধ ও বহিরঙ্গে তাহার বিচিত্রতার সম্বন্ধে পাঠকগণের ধারণা যদি কিছু স্পষ্ট হয় তাহা হইলে নৃতত্ত্ব-সমীক্ষার···কর্মীগণ···যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের শ্রম সার্থকতা লাভ করিবে।" সমীক্ষার প্রথম পর্বে যে-ফলাফল দেখা যায়, তার পরিধি প্রধানত "জীবনযাপনের বাহ্য পদ্ধতি"র ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ; সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও গ্রামীণ শিল্পের বৈচিত্র্য অনুসন্ধানের কাজ পরবর্তী গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্তমান গবেষণার ফলে লক্ষ করা যায় যে :

> "আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সহিত ভাষাগত বা বিশিষ্ট দেহলক্ষণযুক্ত নৃগোষ্ঠীর পরস্পর পার্থক্যের কোনও সম্পর্ক নাই। বাস্তব জীবনধারার ক্ষেত্রে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যে আঞ্চলিক প্রভেদ বিদ্যমান তাহা বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের সীমানা ছাড়াইয়া গিয়াছে" এবং "জীবনযাপনের বাহ্য পদ্ধতির ক্ষেত্রে যদিও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য, দেশের সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিন্তু পার্থক্য পরিমাণে এত অধিক নহে।"

এই দুইটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নানান দৃষ্টান্তের দ্বারা পাঠকের কাছে উপস্থিত করে ভূমিকা-লেখক মন্তব্য করেছেন :

"বাহ্যজীবনের প্রভেদ যেমন স্পষ্টত দৃষ্টিগোচর…জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই প্রভেদ ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর প্রতীয়মান হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধিনিয়মাবলী, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত আচরণবিধি বা অধিকারবিধি, ধর্মবিশ্বাস, শিল্পরীতি প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যবহারিক বস্তুজীবনের নানা দিকে রীতিনীতির যতখানি পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, জীবনের উক্ত উন্নততর বিভাগ সকলে সেরূপ নহে। এই সকল ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী যেন সকল পার্থক্য অতিক্রম করিয়া ক্রমশ একটি ঐক্যের ভূমিতে উপনীত হইয়াছে। ইহার ফল ভারতীয় সভ্যতা সমগ্রভাবে একটি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে।"

বর্তমান সমীক্ষার ফলাফল নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রামবিন্যাসের অধ্যায়ে আমরা লক্ষ করি "ভারতবর্ষে গ্রামবিন্যাসের রীতির সংখ্যা তিন অথবা চারের বেশি নয়।…বাঁচিবার তাগিদে, বাসের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষের মানুষ যে বহুযুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে মাত্র তিন-চারি ভাবে গ্রামের বিন্যাস করিতে শিখিয়াছে, ইহা শিক্ষা করা আমাদের পক্ষে পরম লাভের বিষয়। ভাষায় যদি বা অনৈক্য বা প্রভেদ থাকে, অন্যান্য ব্যাপারে অন্তর্নিহিত দীর্ঘকালস্থায়ী ঐক্যের লক্ষণ বর্তমান, ইহা জানাও আমাদের পক্ষে কম লাভের বিষয় নহে।"

ঘরবাড়ি তৈরির রীতিও এই বিরাট দেশে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, এই তথ্যও ভারতের অন্তর্নিহিত ঐক্যের পরিচয় দেয়। ভৌগোলিক কারণে কোথাও সমতল ছাদ, কোথাও ঢালু ছাদ, কোথাও কাঠ বা পাথরের প্রচলন, কোথাও-বা মাটিই প্রধান উপকরণ। সামাজিক রীতিবৈচিত্র্যের দরুণ কোথাও বাড়ির ভিতরে আঙিনা, কোথাও-বা তা নেই ; কিন্তু এসব আঞ্চলিক পার্থক্য সত্ত্বেও মহাদেশতুল্য এই বিশাল রাজ্যে গৃহনির্মাণ প্রথার সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমীক্ষার এই অধ্যায়ে, প্রসঙ্গত দেখা যায় যে হেলানো কাঠের জাফরি দেওয়া বাড়ি যেমন কেরল প্রদেশে আছে, তেমনি আছে সুমাত্রা দ্বীপে (পৃ. ১০)। অনেকে আবার অনুমান করেন : "কেরল স্থাপত্যের উপরে চীনদেশের কিছু প্রভাব পড়িয়াছিল।" বৃত্তাকার আসনবিশিষ্ট

ঘরের বিবরণ পড়তে গিয়ে আমরা আরেক বিস্ময়কর তথ্যের সন্ধান পাই : "প্রাচীন স্তূপ, বিহার বা মন্দিরের স্থাপত্যের সহিত যাযাবর বা তথাকথিত 'নিম্ন' শ্রেণীর কয়েকটি জাতির গৃহনির্মাণ-পদ্ধতির হয়তো কোনও সম্পর্ক নাই। তবু উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আকস্মিক হইলেও কৌতূহলোদ্দীপক।"

'খাদ্য' সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের কথা উদ্ধারযোগ্য : "...ভারতবর্ষকে মোট দুইটি ভাগে ভাগ করা চলে ; এক ভাতের দেশ, অপর রুটির দেশ। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কাম্বোজ, মালয়, ইন্দোচীন সর্বত্র লোকে প্রধানত ভাতের উপর নির্ভর করে। এবং সেদিক দিয়ে ভারতের অর্ধাংশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সহিত সম্পর্কান্বিত। আবার গম বা রুটির বিষয়ে বিবেচনা করিলে ভারতের সহিত পশ্চিম পাকিস্তান, ইরাণ, আরব প্রভৃতি দেশের সম্পর্ক বেশি। মোগল বাদশাহদের পদচ্ছায়া অনুসরণ করিয়া যেমন কয়েকপ্রকার সুকুমার শিল্প ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, হয়তো রন্ধনেরও কয়েকটি পদ্ধতি তৎসহ ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়, এরূপ অনুমান করা বোধহয় অসঙ্গত হইবে না।"

"লাঙ্গল ঢেঁকি ও উদুখল" অধ্যায়ে যে-তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সেটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। "আচার্য সিলভাঁ লেভি প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত 'লাঙ্গল' শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া যে-মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় এই শব্দের সহিত সম্পর্কিত শব্দ কাম্বোডিয়ার খ্মের, আসামের খাসিয়া জাতি, সুমাত্রার বাটাক জাতি এবং মালয় উপদ্বীপ, আনাম প্রভৃতি দেশেও প্রচলিত আছে। 'তাম্বুল' শব্দের মতো ইহার দ্বারাও ভারতবর্ষের সহিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনা সম্ভব হয়।" মোটামুটি যে চার রকমের লাঙ্গল ব্যবহার হয় তার মধ্যে লুসাই উপজাতির মধ্যে ব্যবহৃত একপ্রকার লাঙ্গল "চীন, কোরিয়া, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও যবদ্বীপেও বর্তমান। পশ্চিমে ইহা ইরাণ, ককেশাস পর্বত, এমনকি ইউরোপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে পূর্বসীমান্তে এরূপ লাঙ্গলের ব্যবহার যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক।"

"তেল ও তেলের ঘানি", "পাদুকা", "স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ", "পুরুষের পরিচ্ছদ", "গরুর গাড়ি" ইত্যাদি অধ্যায়গুলিতেও একাধারে বৈচিত্র্য ও সাদৃশ্যের প্রভূত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

নবভারত গঠনের কঠিন কাজে আজ যখন দেশবাসী লিপ্ত, সকলের সামনে

এই প্রশ্নটি উপস্থিত : দ্রুত যানবাহন, সিনেমা ও রেডিওর বহুল প্রচলন এবং সেই সঙ্গে গ্রামোন্নয়নের সর্বব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের পাঁচ লক্ষাধিক গ্রামের পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যেকার আপাত বৈষম্য বা বৈচিত্র্য কী পরিমাণে দূরীভূত হবে এবং শেষ পর্যন্ত কী ধরনের ঐক্যবোধ স্থাপিত হবে ! 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'র যে-চিত্র আমরা লক্ষ করি, তা কিছু পরিমাণে অতীতের যোগাযোগহীনতার থেকে উদ্ভূত। আজ শহর থেকে প্রচারিত রেডিও গ্রামবাসীর চিন্তাধারা ও রুচিকে এক বিশেষ ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করছে। সিনেমার জনপ্রিয়তা লক্ষ করে আমাদের সরকার গ্রামাঞ্চলে সিনেমাঘর স্থাপনের সর্ববিধ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করছেন ; শহরের ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর নির্দেশ ও রুচির দ্বারা প্রভাবান্বিত সিনেমা অদূর ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকভাবে প্রবেশ করবে গ্রামাঞ্চলে। যানবাহনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের ও শহরের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হবে। অতীতের 'ঐতিহ্য' রক্ষার নামে গ্রামবাসীকে আধুনিক কালের আনন্দ-উপকরণ থেকে বঞ্চিত করা যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, তেমনি সম্ভবও নয়। নতুন যুগের প্রভাবে রুচি ও চিন্তাধারার standardisation অনিবার্য ; এই নতুন ভাবধারার সংমিশ্রণে হয়তো আমাদের গ্রামজীবনে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের জীবনযাত্রার বাহ্যিক লক্ষণসমূহ দেখা যাবে। প্রশ্ন যেটি থেকে যায় তা হচ্ছে, সম্ভাব্য standardisation-এর গতি বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করবার দায়িত্ব কারা, কি ভাবে গ্রহণ করছেন ? এই প্রশ্নের আলোচনা, বলা বাহুল্য, বর্তমান প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়।

ভবিষ্যৎকালের গ্রাম-জীবনের চিত্র যেরকমই দাঁড়াক না কেন, এ কথা আজ উত্তরোত্তর সকলেই উপলব্ধি করছেন যে পরিবর্তন ঘটাবার কঠিন কাজ গ্রহণ করবার পূর্বে সকলকেই দেশকে, দেশবাসীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার কঠিনতর কাজে নামতে হবে। দেশ 'স্বাধীন' করার উত্তেজনাময় পর্বে দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ যাঁদের কথা ভাববার ও যাঁদের জানবার সুযোগ ও সময় পান নি, সেই বিস্মৃত, অবহেলিত গ্রামবাসীকে জানবার উপকরণ জোগাড় করতে শুরু করেছেন ভারতের নৃতত্ত্ব-সমীক্ষা। আলোচ্য পুস্তকটি সেই প্রয়াসের প্রথম অধ্যায়মাত্র ; অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের আরব্ধ কাজের ফলাফল প্রকাশিত হবে আশা করা যায়। দেশবাসীকে ঘনিষ্ঠভাবে না চিনতে পারলে তাদের মঙ্গলসাধন সম্ভব নয় ; নৃতত্ত্ববিভাগের সমীক্ষা সেই পরিচয়লাভের পথ সুগম করছেন।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বসাহিত্য-পরিক্রমা

উনবিংশ শতাব্দীর অপরাহ্ণেই এ-বিষয়ে আমাদের চোখ খুলে যায় যে অধিক পাঠ ব্যতীত তুলনার অধিকার জন্মায় না। এবং তুলনার অধিকার না জন্মালে বিচার সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের বড়ো উদাহরণের কথা আপাতত মুলতুবি রেখেও, বাংলা সাহিত্যে সেকালে তুলনাভিত্তিক বিচারপদ্ধতির প্রয়োগে সমালোচনাকে সাবালকের সমালোচনা করে তুলেছেন, এমন একাধিক নাম স্মরণ করা চলে। এখন আমরা অধিকতর নিবিষ্ট মনোযোগে তুলনায় বিচারের পক্ষপাতী। সে পক্ষপাত বিশ্বসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠককে অনুসন্ধিৎসু করেছে স্বাভাবিক-ভাবেই। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান গ্রন্থখানি এক রসিক এবং বিষয়গ্রাহী লেখকের বিশ্বসাহিত্য-পরিক্রমা।

লেখকের 'সোনার আল্পনা' নামক গ্রন্থে আমরা তাঁর রসবিমুগ্ধ চিত্তের পরিচয় পেয়েছিলাম। বর্তমান গ্রন্থে তাঁর প্রাবন্ধিক বৈশিষ্ট্যের এক পৃথক পরিচয় পাওয়া গেল। ঝকঝকে সরল গদ্যে সাহিত্যের নানা বিষয় তিনি আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে "আফ্রিকান সাহিত্যে"র মতো প্রয়োজনীয় বিষয়ও যেমন আছে, "সাহিত্যিক ধাপ্পা"র মতো সরস প্রবন্ধও তেমনি স্থান পেয়েছে। "সাহিত্য ও রাজরোষ" রচনায় যেমন কিছু মনে করে রাখার মতো তথ্য রয়েছে, তেমনি "আমেরিকান সাহিত্যে ভারত", "ইংরেজি সাহিত্যে ভারত" ও বিশেষ করে "জার্মান সাহিত্যে ভারতে"র মতো কৌতূহলনিবারক ও তথ্য-সমৃদ্ধ প্রবন্ধও গ্রন্থটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। এগুলি প্রয়োজনীয় কাজ, এবং চিত্তরঞ্জনবাবুরই এ কাজগুলি বিশেষ করে করার কথা। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন বলে আমরা তাঁকে সাহিত্যপাঠকের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বইটির প্রথম প্রবন্ধের নাম "বিশ্বসাহিত্য"। এই প্রবন্ধটিকে সমগ্র গ্রন্থের

সাহিত্যের কথা। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপা অ্যাণ্ড কোং। ছয় টাকা

মুখপাত বলা যায়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বসাহিত্য' নামক রচনার উল্লেখ না থাকায় পাঠক হয়তো একটু দুঃখিত হবেন। কিন্তু সে-দুঃখ নিরর্থক, কেননা "বিশ্বসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ" নামে একটি পৃথক প্রবন্ধই বইটিতে স্থান পেয়েছে। এবং সে-লেখাটি এই গ্রন্থের সর্বোত্তম রচনাগুলির একটি। "বিশ্বসাহিত্য" প্রবন্ধে সাহিত্যের বিবর্তনের ধারা সব দেশেই যখন এক-পথগামিনী তখন "ক্রমবিকাশের আলোচনাটা একসঙ্গে হওয়া উচিত"—লেখকের এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে সচেতনতা যে প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে সুস্থতর ও গভীরতর সচেতনতার নামান্তর, এ-বিষয়ে চিত্তরঞ্জনবাবু আলোকসম্পাতী মন্তব্য করেছেন। আমি সাধারণ পাঠক হিসাবে আর-একটু আলোকিত হতাম যদি "ক্রমবিকাশের আলোচনাটি একসঙ্গে" কী পদ্ধতিতে হবে সে বিষয়ে চিত্তরঞ্জনবাবু কিছু বলতেন। এখনো রবীন্দ্রনাথই, আরো নানা ব্যাপারের মতো এ ব্যাপারেও যেটুকু বলেছেন সেটুকুই আমাদের প্রধান নির্দেশক থেকে গেল। চিত্তরঞ্জনবাবুর বইটির প্রধান গুণ বিষয়গুলির মধ্যে একটি অনুচ্চারিত গূঢ় সংযোগসূত্রের বিদ্যমানতা। "বিশ্বসাহিত্য" এবং "সাহিত্যপাঠনা" প্রকৃতপক্ষে একালের সাহিত্যের রসিক ছাত্র কোন্ পথে পদচারণা শুরু করবে তারই ইঙ্গিতবহ। যদিও "বিশ্বসাহিত্য" প্রবন্ধের বিষয়-সীমা ছিল অন্য।

"বিশ্বসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির ১৮৪৮-৪৯ সালের বার্ষিক বিবরণীটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখক আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে ঐ বছরই ম্যাথ্যু আর্নল্ড বিশ্বসাহিত্য কথাটি ব্যবহার করেন। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির আবেদনপত্রে 'বিশ্বসাহিত্য' কথাটি ছিল না বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যচরণ ঘোষাল, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখের স্বাক্ষরিত উক্ত পত্রে বিশ্বসাহিত্য-পরিচিতির জন্য তাগিদ ছিল অকৃত্রিম। আলোচ্য প্রবন্ধটি বর্তমান গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধর আলোকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর বিশ্বদৃষ্টির একটি ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিশ্বদৃষ্টি কেমন করে বিশ্বমনা রবীন্দ্রনাথে এসে গভীর-পরিণামী হয়ে উঠেছে, সে কথা বলতে গিয়ে চিত্তরঞ্জনবাবু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তাকেও সর্বার্থে কাজে লাগিয়েছেন। এবং এই প্রসঙ্গেই কথাটি বলবার কথা যে এই জাতীয় প্রবন্ধই লেখকের স্বক্ষেত্র। এখানেই তাঁর বুদ্ধি-চিন্তা-শ্রমের সার্থকতা। এগুলি তাঁর কাছ থেকেই আমরা আশা করব।

কিন্তু এই স্বক্ষেত্র পরিহার করে লেখক যেখানে সাহিত্যের তত্ত্বসংক্রান্ত কোনো আলোচনায় অবতীর্ণ হতে চেয়েছেন সেখানেই তাঁর দ্রুত পরিক্রমা নানা প্রকারের বিভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। "ক্লাসিকস্-এর ক্রান্তিকাল" প্রবন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তের দিকটি গৌণ, কিন্তু যে-পদ্ধতিতে তিনি এপিকের মৃত্যু ঘোষণা ও ক্লাসিকের মৃত্যু-ঘোষণা একার্থক করে ফেলেন তা বিচার-সহ নয়। এলিয়টের মূল্যবান উদ্ধৃতিটি যথাযথ প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু civilisation is mature বলতে এলিয়ট কী বুঝিয়েছেন লেখক সে প্রশ্নকে পাশ কাটিয়েছেন। আমাদের সমকালীন সভ্যতার চারিত্র নির্ণয়ের উপরেই লেখকের বক্তব্য এখানে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত সরল বাক্যে তিনি সব ব্যাপারটা সরল করে ফেলতে চেয়েছেন—"বর্তমান শতকে ক্লাসিকস রচনার উপযুক্ত মানসিক ও সামাজিক প্রেরণা অনুপস্থিত।" তিনি বলেছেন, "প্রাচীন ক্লাসিকসগুলি সবই মহাকাব্য।" তিনি কি তাহলে গ্রীক নাটকগুলিকে ক্লাসিকস বলে ধরেন না? নাকি বলতে চাইছেন প্রাচীন ক্লাসিকসের লেখকেরা কবি ছিলেন? আসলে ক্লাসিকস বলতে কী বোঝাতে চাইছেন সেটাই পরিষ্কার হয় নি। তিনি বলেন, "ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে আমরা ক্রমশ আত্মসচেতন হয়ে উঠছি।" বলছেন যে লিরিক কবিতা এ-যুগেরই বৈশিষ্ট্য। কথা দুটি তিনি যদি আলগোছে বলে ফেলেন তা হলে ঐকমত্যের হানি হয় না। কিন্তু তিনি প্রবন্ধ লিখছেন "ক্লাসিকসের ক্রান্তিকাল", তাতে গ্রীক মহাকাব্যকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন—তিনি জানেন নিশ্চয় যে হোমরীয় মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডি-স্রষ্টাদের মধ্যে ব্যবধানবর্তী সময়ে বিখ্যাত গ্রীক লিরিক কাব্যের সার্থক লগ্ন দেখা দিয়েছিল। লিরিক কবিতা সে যুগেরও বৈশিষ্ট্য হতে পেরেছিল। ফরাসী বিপ্লবের দরকার হয় নি। তা ছাড়া, 'প্রাচীন ক্লাসিকসগুলি সবই মহাকাব্য' এই কথা বলে ফেললে এলিয়ট-কথিত উক্তিকে তিনি কাজে লাগাবেন কি করে? গ্রীক সভ্যতার প্রৌঢ় পরিণত যুগে অন্যতম কবি অ্যারিস্টফিনিস কমিক নাট্যকার। ইলিয়াড-ওডিসির কাল গ্রীকসভ্যতার উঠতি যৌবনের কাল।

আসলে লেখক যেখানে তাঁর প্রবন্ধকে তথ্য-জ্ঞাপনী সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন সেখানে তিনি যে-পরিমাণে সার্থক, তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি সে পরিমাণেই অসার্থক। "সমকালীন সাহিত্যে ভাবতাত্ত্বিক গোষ্ঠী" একটি সুলিখিত প্রবন্ধ। উদ্দিষ্ট পাঠকের কাছে এর মূল্যও অনস্বীকার্য।

এখানে অস্তিত্ববাদ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যের অসম্পূর্ণতা প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য ও বিষয়ের ব্যাপকতার খাতিরে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু ফরাসী ন্যাচারালিস্টদের পরে সিম্বলিস্টদের উদয় কোন্ প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত তা একটুও না বললে কিছুই বলা হল না। প্রবন্ধটির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদ সে-কারণেই বিবরণী হিসাবে পূর্ণাঙ্গ নয়। "পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে বাস্তবতা" লেখকের দ্রুত পরিক্রমার আর-এক নিদর্শন। এ পরিক্রমা পাদ-পরিক্রমা না হয়ে জেট-পরিক্রমা হয়ে গিয়েছে। এখানেও বাস্তবতা বলতে তাঁর যে-ধারণা তা তিনি পরিষ্কার করে বলে নেন নি। ফলে এখানেও তাঁর বহু উক্তি অসতর্কতার জন্য অভিযুক্ত হবে। টমাস মান এবং সমারসেট মম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হোক, এবং দুজনেই কুশলী উপন্যাস-লেখক বলে চিহ্নিত হোন—তাও হয়তো উপেক্ষা করা যাবে (যদিও কে উপেক্ষা করবেন জানি না), কিন্তু তিনি যখন ড্রেইজারের সিস্টার কেরি, দি জিনিয়াস এবং অ্যান্ আমেরিকান ট্র্যাজেডির নাম ন্যায়ত উচ্চারণ করেন, অথচ তার পাশেই সিনক্লেয়ার লুইসের মেন স্ট্রীট, ব্যাবিটের নাম ভুলেও বলেন না, তখন কিন্তু আর উপেক্ষা করা যায় না। এইভাবে বলতে গিয়ে অনেক সংক্ষিপ্ত উক্তি উঁকি দিয়েছে যা বিস্তারিত হওয়া উচিত ছিল, নয় বর্জিত হলে ভালো হত। লরেন্সকে যৌনবিকৃতি ও স্নায়বিক বিকৃতি বিশ্লেষণের লেখক বললে অর্ধসত্য বলা হয়। কন্‌রাড সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি তাঁর আর-কোনো উপন্যাসের নাম করলেন না। নাম করলেন লর্ড জিম্-এর এবং বলে দিলেন এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, লর্ড জিম্ কন্‌রাডের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে লেখকের কাছে অনায়াসেই প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু সেটা তাঁর এই জাতীয় প্রবন্ধে এত সহজে বলে দিলেই হবে কি? বিশেষত যখন এফ. আর. লেভিস-এর মতো সমালোচক স্পষ্টতই বলেছেন যে লর্ড জিম্ কন্‌রাডের তাৎপর্যপূর্ণ ও সার্থক শিল্পকর্ম নয়।

সে তুলনায় "মধ্যযুগের য়ুরোপীয় সাহিত্য" একটি সতর্ক এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধ। যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে মধ্যযুগের ঐতিহাসিক ভূমিকার বিষয়টি বিবৃত করে লেখক য়ুরোপের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের দুই মুখ্য ধারার পরিচয় দিয়েছেন। এই বিষয়ের এমন প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় আর পড়েছি বলে সহজে মনে পড়ছে না। ফ্রান্সের মধ্যযুগ আর-একটু গুরুত্ব ন্যায্যভাবেই দাবি করতে পারে, কিন্তু সে অভিযোগ তীব্র হতে পারে না Francois Villon সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রয়োজনীয় আলোচনার জন্য। এই প্রসঙ্গেই "সুইডিস সাহিত্য :

আধুনিক যুগ" প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজনীয় তথ্যে এবং তথ্যভাষ্যে প্রবন্ধটি ভারবান এবং সারবান।

আমাদের শতাব্দীর দুই প্রধান লেখক তিনটি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছেন। টমাস মান ও কামু। কামু-বিষয়ক প্রবন্ধে লেখকের ঝোঁক যতটা কামুর শিল্পার্থের আলোচনার দিকে, তার চেয়ে বেশি কামুর শিল্পকর্মের প্রাথমিক পরিচয় প্রদানের দিকে। এরকম প্রবন্ধে আর সার্ত্রের প্রসঙ্গ না টানলেই ভালো হত। যদি বা টানলেন সে প্রসঙ্গ, তাহলে সার্ত্রের সঙ্গে কামুর পার্থক্যের মূল ভিত্তি কোথায় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া দরকার ছিল। এ বিষয়ে অন্য কোনো সাহায্য যদি না-ও নেন, টাইমস সাহিত্য-সাময়িকীর উনিশ শো ষাট সালের আটই জানুয়ারির "আলবেয়ার কামু" প্রবন্ধটিও যথেষ্ট সাহায্য করতে পারত। সার্ত্রের স্বাধীনতা-চেতনা ও মার্কসবাদ-সংক্রান্ত চিন্তার কথা অবশ্যই উল্লেখিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। সে তুলনায় "টমাস মানের শিল্পাদর্শ" এবং "টমাস মান ও মৃত্যু" আমাদের বেশি প্রীত করে। বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে টমাস মান যথেষ্ট আলোচিত হন নি। শ্রীসরোজ আচার্য মহাশয়ের লেখাই এখনো পর্যন্ত প্রধান প্রয়াস। চিত্তরঞ্জন-বাবুর আলোচনাকে আমরা সে কারণে স্বাগত জানাই। একটা কথা—"টমাস মান ও মৃত্যু"র মতো চমৎকার প্রবন্ধটিতে তিনি Joachim-এর মৃত্যুর প্রসঙ্গটি একবারও স্মরণ করলেন না কেন?

"সমালোচনার মান" শীর্ষক একটি রচনায় লেখক বাংলা রিভিয়্যুর মান-উন্নয়নের জন্য রিভিয়্যু-লেখকদের টাকায় পারিশ্রমিক দেবার প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। আমি এ-প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি, আশা করছি পরিচয়-এর বর্তমান সংখ্যার সব লেখকই এতে সম্মতি জানাবেন।

সুনীল সেন

নিজের চোখে মানবেন্দ্রনাথ

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতিকথা এক অসাধারণ বই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের তিনি অন্যতম নেতা। তাঁর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ। তাঁর লেখা জীবন্ত। স্মৃতিকথা লিখতে বসে তিনি নিজেকে বীরের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন নি, নিজেকে তিনি দেখেছেন সেই ঝড়ো যুগের প্রবহমান আন্দোলনের অংশ হিসাবে। শেষ জীবনে তিনি এই বই লিখেছেন। তখন তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে বিতাড়িত, বামপন্থী মহলে বহু নিন্দিত। তবু তাঁর লেখায় কোনো উত্তাপ নেই। দলত্যাগীদের লেখায় যে স্থূল কটূক্তি ও ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রায় অনিবার্য, তাঁর লেখায় তা অনুপস্থিত। তাঁর অনেক মন্তব্য ও বিবরণ আধুনিক গবেষণার আলোকে মূলত সঠিক বলে প্রমাণিত। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতিকথার ঐতিহাসিক মূল্য প্রশ্নাতীত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে রায়ের স্মৃতিকথা শুরু হয়েছে। চব্বিশ পরগণার আরবেলে গ্রামের এক অখ্যাত পুরোহিত বংশের এক দুর্মদ যুবক ভবিষ্যতের নেতাজীর পথ অনুসরণ করে জার্মানীর সাহায্যে দেশকে স্বাধীন করবার স্বপ্ন নিয়ে সাগর পাড়ি দিলেন। তাঁর নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তাঁর রাজনৈতিক গুরু বাঘা যতীন। তারপর অস্ত্রের সন্ধানে ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কোরিয়া ও চীন ভ্রমণ। রাসবিহারী বোস এবং তখন ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে 'অবতার' বলে গণ্য সান ইয়াত-সেন তাঁকে হতাশ করেন। ১৯১৬ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি চলে আসেন আমেরিকায়। অনেক ভারতীয় বিপ্লবী আমেরিকায় এসেছিলেন সাহায্যের আশায়। আমেরিকা মিত্রপক্ষে যোগ দেবার ফলে সে আশায় ছাই পড়লো। লালা লাজপত রায়ের বাসায় এবং নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে তিনি মার্কসবাদী সাহিত্য পড়বার সুযোগ পান। তাঁর হলো নবজন্ম। সন্ত্রাসবাদী হলেন সাম্যবাদী। নরেন্দ্র হলেন

M. N. Roy's Memoirs. Allied Publishers. Rs. 30/-

মানবেন্দ্র। আমেরিকা তাঁর পক্ষে আর নিরাপদ রইলো না। তিনি চলে এলেন মেক্সিকোতে।

মেক্সিকো সাম্যবাদী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রথম কর্মস্থল। তিনটি অধ্যায়ে তিনি সেকালের মেক্সিকোর রাজনৈতিক জীবনের বিবরণ দিয়েছেন। মেক্সিকোর প্রধান শত্রু "ইয়াংকি সাম্রাজ্যবাদ", প্রধান দাবি পেট্রোলিয়াম তেলের খনির জাতীয়করণ। ১৯১৮ সালে সমাজতান্ত্রিক দলের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল, দলের সাধারণ সম্পাদক পদে তিনি নির্বাচিত হলেন। তাঁকে স্প্যানিশ ভাষা শিখে নিতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি আরো কয়েকটি ভাষা শিখেছিলেন (পৃ. ১৪১—৪৬)। এই মেক্সিকোতেই বোরোদিনের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। রায় লিখেছেন, ১৯২৯ সালে রাশিয়া ছাড়া পর্যন্ত বোরোদিন তাঁর অন্যতম প্রিয় বন্ধু ছিলেন। এ-সম্পর্ক মানবিক, কোনো পক্ষেই কোনো মোহ ছিল না। উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে শিখেছেন (পৃ. ১৯৫)।

রাশিয়ায় পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ী হয়েছে। লেনিন তৃতীয় আন্তর্জাতিক স্থাপন করেছেন। আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য তিনি মেক্সিকো থেকে বিদায় নিলেন। মস্কোর পথে তাঁর যাত্রা হল শুরু। নতুন জীবন ও নতুন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁর আকর্ষণ তীব্র। রাশিয়ায় এসে তিনি এক বৃহত্তর কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন। সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কাছে থেকে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট নেতাদের দেখবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। লেনিন, স্টালিন, ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ, রাডেক, চিচেরিন, বালাবানোভা, থালহাইমার, পিক, লেভি, গ্রামসচি এবং আরো অনেক নেতা সম্পর্কে তাঁর মতামত স্মৃতিকথায় ছড়ানো। এঁরাই রায়ের স্মৃতিকথার নায়ক, এই সমাজকে পরিবর্তনের জন্য যাঁদের জীবনব্যাপী সাধনার কথা পণ্ডিতদের লেখা ইতিহাসের বইতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

লেনিনের ব্যক্তিত্ব ও নিষ্ঠা রায়কে মুগ্ধ করেছিল। তিনি লিখেছেন, লেনিন একজন অপরাজেয় আশাবাদী। ইতিহাস রচনায় মানুষের অসীম ক্ষমতায় তিনি বিশ্বাসী। বিপ্লবী আন্দোলনে কখন রাশ টানতে হয় তা তাঁর জানা ছিল। জার্মানীর বামপন্থী কমিউনিস্টদের শিশুসুলভ হঠকারিতার তিনি কঠোর নিন্দা করেছিলেন। "নেপ" (নতুন অর্থনৈতিক নীতি) প্রবর্তন করে তিনি রুশ বিপ্লবকে রক্ষা করেছিলেন (পৃ. ৩৪১—৪৭)। স্টালিন সম্পর্কে

তিনি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেন। স্টালিনের বিচারবুদ্ধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে লেনিনের "প্রায় অসীম বিশ্বাস" ছিল (রায় লেনিনের প্রসিদ্ধ টেস্টামেণ্টের কোনো উল্লেখ করেন নি, যেখানে লেনিন পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে স্টালিনের অপসারণের সুপারিশ করেছিলেন)। রায়ের মতে রাশিয়ার ও অন্যান্য দেশের কমিউনিস্টদের "বীর পূজা" ও স্তাবকতার ফলেই স্টালিনের মাথা বিগড়ে যায় এবং এক ন্যক্কারজনক ব্যক্তিতন্ত্র শিকড় গাড়ে (পৃ. ৪৯৯, ৫৩৯)। ট্রটস্কিরও অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তাঁর "বামপন্থী বিরোধিতার" ফলেই স্টালিন লেনিনের "Dantonist spirit" ধ্বংস করতে বাধ্য হন (পৃ. ৪৪৭)। প্রতিভাবান কূটনীতিবিদ চিচেরিন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলেন। এই অত্যন্ত রুচিবান শান্ত মানুষটি দলাদলির অনেক উপরে ছিলেন। স্টালিন-পর্বে তিনি বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যান (পৃ. ৩২৩, ৩২৫)। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম সাধারণ সম্পাদিকা বালাবানোভা লেনিনের মৃত্যুর পর বলশেভিকবাদ সম্পর্কে "মোহমুক্ত" হয়ে আমেরিকায় আশ্রয় নিয়ে আত্মজীবনী লেখেন—*My Life As A Rebel* (পৃ. ৩:৮—৩৪)।

রায় দীর্ঘদিন বার্লিনে ছিলেন। জার্মানীর সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল। তাঁর স্মৃতিকথার অনেকটা অংশ জুড়ে আছে জার্মানীর সাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাস। জার্মানীতেই প্রথম সংগঠিত সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের জন্ম। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা ছিল জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি। মার্কসবাদী তত্ত্বের বিকাশে বার্নস্টাইন, কাউটস্কি, হিলফার্ডিং-এর অবদান অবজ্ঞেয় নয়। রায় অবশ্য সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের যুদ্ধ-সমর্থনের নীতির নিন্দা করেছেন (পৃ. ২৫৩)। জার্মানীর কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে তাঁকে সর্বাধিক আকৃষ্ট করেছিলেন থালহাইমার ও লেভি। অন্যমনস্ক বুদ্ধিজীবী, গণিতজ্ঞ থালহাইমার পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন, লেভি ১৯২৯ সালে আত্মহত্যা করেন। পার্টির নেতা হন পিক, যাঁর সম্পর্কে রায়ের ধারণা উঁচু নয়। জার্মানীর সাম্যবাদী আন্দোলনে রাডেকের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি নতুন তথ্য দিয়েছেন। রাডেক পরে আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, ১৯২৯ সালে তিনি বহিষ্কৃত হন (পৃ. ২৫৪—৭৮)। বার্লিনে অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির এক ইটালীয় অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তিনিই প্রসিদ্ধ গ্রামস্চি। রায় লিখেছেন, তাঁর দর্শনসংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি হয়তো মার্কসবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মৌলিক

অবদান বলে একদিন স্বীকৃত হবে (গ্রামসূচির পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়েছে এবং "পরিচয়" পত্রিকায় তাঁর সমালোচনা গত বৎসর আমরা পড়েছি)।

সেকালে ভারতীয় বিপ্লবীদের বিদেশী সাহায্যের উপর অনেক ভরসা ছিল। অনেক রঙীন আশা নিয়ে তাঁরা গেছেন জাপানে, আমেরিকায়, জার্মানীতে এবং সোভিয়েত রাশিয়ায়। অনেকে শেষ রক্ষা করতে পারেন নি, বিদেশেই তাঁরা সংসার পেতে ঘরকরণা করেন। পুরনো বিপ্লবীদের অনেকের কথা রায় লিখেছেন—রাসবিহারী বোস, মাদাম কামা, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর ভাই), অবনী মুখার্জি, নলিনী গুপ্ত, চম্পকরাম পিল্লাই, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ। অবনী এবং বীরেন্দ্র শেষ পর্যন্ত রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে লেনিনগ্রাদে বসবাস করেন। একমাত্র নলিনী গুপ্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পণ্ডিত নেহরুও তাঁর "আত্মজীবনী"তে ভারতীয় বিপ্লবীদের কথা লিখেছেন। রায় এবং বীরেন্দ্র ছাড়া অন্যদের সম্পর্কে তিনি আদৌ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না।

তাসখন্দ-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই রায়ের কাছে হাস্যকর এবং অবাস্তব মনে হয়েছিল। প্যান ইসলাম মন্ত্রে দীক্ষিত হাজার হাজার মুজাহির তুর্কী যাবার পথে অকসাস নদীর সীমানায় বন্দী হন। লাল ফৌজ তাঁদের মুক্ত করে। এদের মধ্য থেকে মাত্র পঞ্চাশ-জনকে তাসখন্দ-এ আনা সম্ভব হয়। "খিলাফত জিন্দাবাদ" থেকে "ইনকিলাব জিন্দাবাদ"-এ এদের দীক্ষিত করা দুঃসাধ্য ছিল। শেষ পর্যন্ত কয়েকজনকে নিয়ে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হয়। যাঁদের নিয়ে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে শুধু শৌকত উসমানি ভারতে ফিরে যান। তিনি মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম বন্দী ছিলেন (পৃ. ৪৫৮—৬৭)। রাশিয়ায় 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' স্থাপনের প্রচেষ্টা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি, এবং সেটাই স্বাভাবিক।

স্মৃতিকথায় রায় তাঁর নিজের রাজনৈতিক মতামত সংক্ষেপে বলেছেন। মেক্সিকোর ক্ষেত্রে তিনি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমর্থক। মেক্সিকোর প্রধান শত্রু "ইয়াংকি সাম্রাজ্যবাদ", প্রধান দাবি তৈলশিল্পের জাতীকরণ। ভারতের ক্ষেত্রে তিনি উগ্র বামপন্থী নীতির প্রবক্তা। তাঁর মতে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে সামন্ত শ্রেণী থেকে

পৃথক করে দেখা যায় না। গান্ধীজীকে তিনি মনে করেন প্রাচীন ভারতের প্রতিনিধি, "religious revivalist"। লেনিনের সঙ্গে আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় এই বিষয় নিয়ে তাঁর বিতর্ক হয়। লেনিন মনে করতেন, অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকা প্রগতিশীল। রায় মনে করতেন, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করে ফেলবে। *India In Transition*—এই মত প্রমাণ করবার জন্য লিখিত, যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশকে তিনি অতিরঞ্জিত করেছেন ; এই ভুলের জন্য দায়ী অবনী মুখার্জি, যাঁর সংগৃহীত তথ্য তিনি ভাল করে না দেখে ব্যবহার করেছেন (পৃ. ৩৭১, ৪১২—১৩)।

শুধু রায় কেন, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকও ভারতীয় বিপ্লবের নীতি-নির্ধারণে একাধিক বার অবাস্তব এবং ভুল বক্তব্য উপস্থিত করেছে। ১৯২৫ সালে স্টালিন লিখেছিলেন যে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর "আপসমুখী অংশ" মূলত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে "ব্লক" গঠন করেছে। গান্ধীজী সম্পর্কে স্টালিনের উক্তি অনেকের মনে পড়বে। জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারা থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে দীর্ঘ দিন বিচ্ছিন্ন থেকেছে এবং রাজনৈতিক ভাবে এক দুর্বল অকেজো সংগঠন হয়ে থেকেছে তা অস্বাভাবিক নয়। আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেস "দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী বিচ্যুতির জন্য" রায়ের বহিষ্কার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। রায়ের পুরো বক্তব্য কী ছিল তা রায় স্মৃতিকথায় বলেন নি। তবে বর্তমান লেখকের মতে ষষ্ঠ কংগ্রেসের উপনিবেশ-সংক্রান্ত দলিলে পুরনো সংকীর্ণতাবাদী সুর পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ষষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার মাত্র দু বছর পরে ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী আপসমুখী হলেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকায় তখন অবতীর্ণ।

রায় ভারতের বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের অন্যতম। তাঁর জীবনের বেশির ভাগ কেটেছে বিপ্লবের সাধনায়। ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের বিকাশে তাঁর অবদান আছে। মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্পর্কে দুমদাম করে মত প্রকাশ করার দুঃসাহস আমার নেই। তবু মনে হয় তিনি চিরদিন অশান্ত, অস্থির। শেষ জীবনে তিনি মার্কসবাদ সম্পর্কে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। শেষ পোতাশ্রয় থেকে তিনি ছিটকে পড়েন ; জীবনে তিনি পরাজিত। রায় লিখেছেন, "Success is the measure of greatness,

and men greater than the successful great men are known to have preferred unpopularity to paying the price of success (পৃ. ১৬২)। সম্ভবত রায়ের জীবনদর্শন এই কথাগুলির মধ্যে প্রতিভাত। রাজনৈতিক আন্দোলনের সুবিধাভোগীর দলে তিনি ঠাঁই পাতেন নি।

রায়ের মৃত্যুর প্রায় দশ বছর পরে এই বই প্রকাশিত হল। প্রকাশককে অসংখ্য ধন্যবাদ, তাঁরা এক প্রথম শ্রেণীর বই প্রকাশ করেছেন। রায় সম্পর্কে বিদেশী বুদ্ধিজীবীরা গবেষণা করেছেন, আমরা যেন অন্তত তাঁর স্মৃতিকথা পড়ি।

গৌতম সান্যাল

সার্ত্র ও মার্কস্‌বাদ

ব্যবহারিক জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সার্ত্র'র অনুকূল যোগাযোগের কারণ হিসাবে ফরাসী উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা উল্লেখ করা যায়। ভিয়েৎনাম এবং আলজিরিয়ায় ফরাসী উপনিবেশের অবসানের জন্য বিভিন্ন আন্দোলনে সার্ত্র অংশ গ্রহণ করেন। সুয়েজ এবং হাঙ্গেরীর ঘটনার জন্য পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুই শিবিরকে সমানভাবে ধিক্কার জানালেও অনেকের মতেই পূর্ব অপেক্ষা পশ্চিমের সমালোচনাতেই সার্ত্র অধিকতর মুখর। অবশ্যই বুর্জোয়া সভ্যতার অন্তঃসারশূন্য অবস্থা এবং শোষণ—সার্ত্রকে শোষিত শ্রেণীর প্রতি মরমী করে তুলেছে। এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে তাঁকে অধিকতর আশাবাদী ও আস্থাশীল করে তুলেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে একাধিক ক্ষেত্রে ফরাসী দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সমালোচনাও তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে করেছেন এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল—বিভিন্ন প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং কমিউনিস্ট পার্টির খুব কাছাকাছি এলেও তিনি কখনও পার্টির সভ্য হন নি। ব্যবহারিক জীবনের এই বৈশিষ্ট্যের কারণ সহজেই অনুধাবন করা যায়। সার্ত্র অস্তি-বাদের অন্যতম প্রবক্তা। অস্তিবাদের প্রথম প্রবক্তা হিসাবে যাঁকে গণ্য করা হয়, তিনি হলেন কিয়ের্কেগর্দ। হেগেলীয় ভাববাদ বর্জনের জন্য কিয়ের্কেগর্দ প্রধানত দুটি উপায় অবলম্বন করেছিলেন; প্রথম হেগেলীয় ভাববাদের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির পরিহার এবং হেগেলীয় ভাববাদী ঐতিহাসিকতার পরিহার।[1] অন্যত্র, বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিকতা এবং বস্তুজগতের দ্বান্দ্বিক গতি—এই দুটি হল মার্কস্‌বাদের অন্যতম সূচক। কাজেই, মার্কস্‌বাদ এবং অস্তিবাদের মধ্যে একটি মূল পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অবশ্য, সার্ত্র'র অস্তিবাদ নিঃসন্দেহে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। কিন্তু সার্ত্র'র অস্তিবাদ এবং মার্কস্‌বাদের মধ্যেও এই পার্থক্য

[1] *The Problem of Method.* By Jean-Paul Sartre. Tr. by H. F. Barnes.

অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সার্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ের মতবাদকে স্বীকার করলে মার্কস্‌বাদের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য সম্ভব নয়। কাজেই সার্ত্র মার্কস্‌বাদকে (বা, সাম্যবাদকে) রাজনৈতিক ভাবাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।

১৯৪৬ সালে সার্ত্র "Materialism & Revolution" নামে একটি রচনা প্রকাশ করেন। সার্ত্রের রাজনৈতিক মতবাদকে বোঝার পক্ষে এই রচনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শোষণের অবসান এবং শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সার্ত্রের কাম্য; বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের বস্তুবাদকে সার্ত্র এখানে স্বীকার করেন নি। শোষিত শ্রেণী সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত, কাজেই তারা সমস্ত রকম বন্ধনমুক্ত এবং স্বাধীন। এই মুক্ত, স্বাধীন হওয়ার বোধই তাদের বিপ্লবের উপযুক্ত করে তোলে। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে নিয়ন্ত্রণবাদ নিহিত এবং এইজন্যই তা বিপ্লবের জন্য অপরিহার্য মুক্তস্বভাবের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। একমাত্র সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে সমাজকে দেখলেই সমাজের কার্যবিধি অনুধাবন করা যায়। মানুষ যখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সমাজে পরিবর্তন আনতে চায়—কেবল তখনই সে তার বিপ্লবের অভিক্ষেপের মাধ্যমে সমাজকে বুঝতে পারে। বস্তুবাদকে বর্জন না করলে সমাজের পরিবর্তন ঘটানোর এই স্বাধীন ইচ্ছা এবং সমাজের কার্যবিধি বোঝা—কোনোটাই সম্ভব নয়। ১৯৫২-৫৪ সালের মধ্যে "The Communists and Peace" এই নামে তিনটি রচনা প্রকাশিত হয়। এই রচনাগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে সার্ত্রের ক্রমবর্ধমান আস্থা এবং বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। সার্ত্র এখানে স্বীকার করেন যে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে এবং শান্তির সপক্ষে দায়িত্বশীল। কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমে আস্থা বাড়লেও সার্ত্র কিন্তু তখনও পর্যন্ত মার্কস্‌বাদের তত্ত্বকে সম্পূর্ণ স্বীকার করেন নি। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সার্ত্রের ক্রমবর্ধমান অনুকূল ঘনিষ্ঠতা ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরীর ঘটনায় যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার তৎকালীন ভূমিকা এবং ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির সেই ভূমিকাকে সমর্থন—সার্ত্র তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হলেও এই প্রসঙ্গে ১৯৫৭ সালে "Stalin's Ghost" নামে যে-লেখাটি প্রকাশিত হয়—তাতে কেবল সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি নয়—মার্কস্‌বাদের প্রতিও তাঁর অকৃত্রিম আস্থা সূচিত হয়। হাঙ্গেরীতে রাশিয়ার ভূমিকার সমালোচনা করতে গিয়ে সার্ত্র তথাকথিত

ন্যায়-বিচার, মানবতাবাদ বা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দোহাই পাড়েন নি। তাঁর বক্তব্য হল—হাঙ্গেরীতে রাশিয়া সৈন্য না পাঠালেও সেখানকার শ্রমিকশ্রেণী প্রতি-বিপ্লবকে ঠেকাতে পারত এবং সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারত। সার্ত্রর এই রচনা কতখানি যুক্তিসংগত—সে বিচার এ প্রসঙ্গে অবান্তর। কিন্তু সার্ত্রর মতে কমিউনিস্ট পার্টি যখন তীব্র নিন্দার কাজ করেছে তখনও তিনি তাকে সমালোচনা করেছেন সমাজতন্ত্রের এবং মার্কস্‌বাদের স্বার্থেই—এই ঘটনা সার্ত্রর রাজনৈতিক মতবাদ পর্যালোচনার প্রসঙ্গে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তাঁর দার্শনিক মতবাদের বিকাশ, বিবর্তন এবং পরিণামের সামগ্রিক আলোচনার প্রসঙ্গেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া Stalin's Ghost-এ সার্ত্র বাস্তব রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কস্‌বাদ সম্পর্কে যে-মতামত ব্যক্ত করেছেন সেই মতামতের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ "The Problem of Method" গ্রন্থে করেছেন এমন কথাও বলা চলে।

দুই

১৯৫৭ সালে পোল্যাণ্ডের একটি পত্রিকা সার্ত্রকে "The Situation o Existentialism in 1957" এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করেন এই প্রসঙ্গে সার্ত্র যে-প্রবন্ধটি লিখেছিলেন সেটি কিছু পরিবর্তন করে— কিছু পরে *Les Temps modernes* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ সালে সার্ত্র "Critique de la raison dialectique" (Pre´ce´de´ de Question de Me´thode) বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করেন এবং এই বইটির প্রথমে ঐ প্রবন্ধটি সংযোজিত হয়। The Problem of Method এই পৃথক সংযোজনীর অনুবাদ।

Critique de la raison dialectique সার্ত্রর দর্শনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করে। অস্তিবাদী দর্শনের বিভিন্ন প্রবক্তারা যে একই তত্ত্বে বিশ্বাসী এমন কথা বলা যায় না। এমনকি 'অস্তিবাদ' এই নামপত্রটি সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় কিনা সে বিষয়েও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। Critique de la raison dialetique-এ যে কেবল সার্ত্র তাঁর নিজস্ব অস্তিবাদ থেকে দূরে সরে গেছেন তা নয়—সাধারণভাবে অস্তিবাদী দর্শন বলতে যে সমস্ত মতবাদ আমরা পাই—এই গ্রন্থটি— সেই সমস্ত মতবাদগুলিরও পুনর্বিচারের প্রয়োজনীয়তা সূচিত করছে। The

Problem of Method সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। কিন্তু এই গ্রন্থে সার্ত্র পুরনো মতবাদ—যা থেকে তিনি সরে আসছেন, তা অপেক্ষা মার্কস্‌বাদ—যার সঙ্গে তিনি তাঁর অস্তিবাদের সামঞ্জস্য বিধান করতে চাইছেন—সে সম্পর্কে যা বলেছেন, সেইটিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। মার্কস্‌বাদকে আজকের যুগের একমাত্র তত্ত্ব বলে স্বীকার করে নিলেও এর সংকীর্ণতা মোচন করবার জন্য অস্তিবাদের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তাঁর ধারণা।

সার্ত্র Philosophy এবং Ideology এই দুটি শব্দকে পৃথক অর্থে ব্যবহার করেছেন। Philosophy বা তত্ত্ব বলতে সার্ত্র বোঝেন একটি যুগের একটি বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থার সমগ্র চিন্তাধারার মূলসূত্র। সমগ্র চিন্তাধারার এই মূল সূত্রটি হল ঐ বিশেষ সময়ে বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থায় যে-শ্রেণী প্রগতিশীল এবং উন্নতির লক্ষ্যে চলমান সে শ্রেণীর আত্ম-চেতনার সূচক। কাজেই ঐ যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি সমস্ত কিছুতেই ঐ মূল সূত্রটি প্রতিফলিত। সার্ত্রর মতে এক-একটি যুগে এক-একটি সমাজ-ব্যবস্থায় একটি তত্ত্বই সম্ভব। মার্কস্‌বাদ হল আজকের যুগের তত্ত্ব এবং একমাত্র তত্ত্ব। মার্কস্‌বাদের অতিরিক্ত যা কিছু তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয় তা সমস্তই বর্তমানে অচল পুরাতন কোনো তত্ত্বের চর্বিতচর্বণমাত্র। Idealogy বা ভাবাদর্শ হল সেই সমস্ত ভাবক্রিয়া যেগুলির সাহায্যে তত্ত্বের মূল সূত্রটিকে নতুন-নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয় অথবা নতুন-নতুন ঘটনা ঐ তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করার জন্য নতুন-নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়। ভাবাদর্শ একাধিক সম্ভব। এমনকি কোনো-কোনো ভাবাদর্শ মূল তত্ত্বের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধনও করতে পারে। সার্ত্রর অস্তিবাদ আজকের যুগের এমন একটি ভাবাদর্শ। সার্ত্রর মতে মার্কস্‌বাদের মূল তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই এর উদ্ভব—মার্কস্‌বাদের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করাই এর প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান মার্কস্‌বাদের কিছু কিছু পরিবর্তন আনা এর সার্থকতা।

অস্তিবাদকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে—তাকে মার্কস্‌বাদের বৃহত্তর পরিধির অন্তর্গত ভাবাদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার আগে সার্ত্র হেগেলীয় ভাববাদ, কিয়ের্কেগর্দের অস্তিবাদ এবং মার্কস্‌বাদের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন এবং মার্কস্‌বাদ কেন আজকের যুগের একমাত্র তত্ত্ব, সংক্ষেপে তা বিবৃত করেছেন। তাঁর মতে: "Thus Marx, rather than Kierkegaard or Hegel, is right, since he asserts with

Kierkegaard the specificity of human existence and, along with Hegel, takes the concrete man in his objective reality. Under these circumstances, it would seem natural if existentialism, this idealist protest against idealism, had lost all usefulness and had not survived the decline of Hegelianism." (পৃ. ১৪)। সার্ত্র'র মতে হেগেলীয় ভাববাদের বিরুদ্ধে কিয়ের্কেগার্দ যে-ধরনের আপত্তি তুলেছিলেন ঠিক সেই ধরনের আপত্তি মার্কস্‌বাদের বিরুদ্ধে তোলেন ইয়েস্পার্স। মার্কস্‌বাদের পরিপূরক ভাবাদর্শ হিসাবে সার্ত্র যে অস্তিবাদের কথা বলেছেন তা নিঃসন্দেহে ইয়েস্পার্সের অস্তিবাদ থেকে পৃথক। তবুও, সার্ত্র'র মতে এ-জাতীয় ভাবাদর্শগুলির উদ্ভব মার্কস্‌বাদের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ত্রুটি সূচিত করে। মার্কস্‌বাদের এ-জাতীয় কতগুলি অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্য যে-অস্তিবাদকে তিনি পরিপূরক ভাবাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য বলছেন— সেই ভাবাদর্শের সঙ্গে মার্কস্‌বাদের মূল বক্তব্যের কোনো বিরোধ নেই বলে সার্ত্র'র ধারণা। সার্ত্র ঐতিহাসিক বস্তুবাদ স্বীকার করেন; স্পষ্টতই তিনি বলছেন: "We support unreservedly the formulation in Capital by which Marx means to define his 'materialism': 'The mode of production of material life generally dominates the development of social, political and intellectual life.'" (পৃ. ৩৩-৩৪)। তিনি স্বীকার করেন: "in the present phase of our history, productive forces have entered into conflict with relations of production. Creative work is alienated; man does not recognize himself in his own product, and his exhausting labor appears to him as a hostile force. Since alienation comes about as the result of this conflict, it is a historical reality and completely irreducible to an idea. If men are to free themselves from it, and if their work is to become the pure objectification of themselves, it is not enough that 'consciousness think itself'; there must be *material* work and revolutionary *praxis*." (পৃ. ১৩-১৪)। সার্ত্র'র মতে অস্তিবাদ ও মার্কস্‌বাদ—উভয়েরই লক্ষ্য এক। উভয়েরই উদ্দেশ্য মানুষের বাস্তব

জীবন তার অভিজ্ঞতাকে বিচার করে—ঐতিহাসিক মূর্ত সত্যে উপনীত হওয়া। এই মূর্ত সত্য দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে পূর্ণতর হয়ে ওঠে—এ কথাও উভয়ে স্বীকার করে। সার্ত্র এ কথাও স্বীকার করেন যে এই বক্তব্য মূলত মার্কস্‌বাদের এবং এইজন্যই তিনি মার্কস্‌বাদকে মূল তত্ত্ব এবং অস্তিবাদকে তদন্তর্গত ভাবাদর্শ বলে মনে করেন। কিন্তু সার্ত্রের মতে মার্কস্‌বাদের এই মূল তত্ত্ব যথাযথভাবে বিকাশ এবং পরিণতি লাভ করতে পারে নি। উত্তরযুগের বিভিন্ন মার্কস্‌বাদী তাত্ত্বিকদের অতিসরলীকরণের প্রচেষ্টা, বাস্তব, বিশিষ্ট ঘটনার প্রতি উদাসীন হয়ে তত্ত্বের অমূর্ত প্রত্যয়গুলিকে চিরায়ত সত্য জ্ঞান করে সেগুলি দ্বারা বাস্তব ঘটনাকে আচ্ছন্ন করার চেষ্টা ইত্যাদি মার্কস্‌বাদের মূল তত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে। ঐতিহাসিক আপেক্ষিকতা এবং দ্বান্দ্বিক গতি ক্ষুণ্ণ হওয়ায় মার্কস্‌বাদ এক অচলায়তনে পর্যবসিত হয়েছে। সেইজন্যই এই মূল তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত অস্তিবাদ ভাবাদর্শের প্রয়োজন। কাজেই নিজের মতবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সার্ত্র বলেছেন: "but Marxism has reabsorbed man into the idea, and existentialism seeks him everywhere where he is, at his work, in his home, in the street." (পৃ. ২৮)।

তিন

সার্ত্রের মতে এঙ্গেলস্‌ এবং পরবর্তী কালের অন্যান্য মার্কস্‌বাদী অযথা ব্যক্তির মূর্ত বিশিষ্টতাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। এঙ্গেলস্‌-এর মতে ইতিহাসে বিশেষ দেশে এবং বিশেষ কালে যে-কোনো বিশেষ ব্যক্তির আবির্ভাব হয় তা আকস্মিক। কিন্তু ঐ বিশেষ ব্যক্তি না থাকলেও অন্য কোনো ব্যক্তি থাকতেন এবং ইতিহাসের ধারা তার আপন ক্রমে চলে নির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করত। সার্ত্র এঙ্গেলস্‌-এর এ সম্পর্কীয় একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে এঙ্গেলস্‌ ব্যক্তিবিশেষের অমূর্ত শ্রেণীগত লক্ষণকে ঐ বিশেষ ব্যক্তির মূর্ত চরিত্রের লক্ষণ বলে ধরছেন। এর ফলে দ্বান্দ্বিক গতিকে অযথা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে এবং তার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণতর করা হয়েছে। সার্ত্র ব্যক্তিবিশেষের বাস্তব জীবনকে আকস্মিক উপাধিভূষিত করে তাকে ব্যাখ্যা না-করাকে এবং কোনো-একটি সাধারণ এবং শ্রেণীগত লক্ষণের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষকে সীমাবদ্ধ করে রাখাকে স্বীকার করেন না। তিনি এমন একটি মধ্যস্থ

খুঁজে পেতে চান যার সাহায্যে মার্কস্‌বাদকে স্বীকার করে নিয়েও উৎপাদন-শক্তি আর উৎপাদন-সম্পর্কের বিরোধিতার পটভূমিকা থেকে ব্যক্তির মূর্ত, বিশিষ্ট লক্ষণগুলিকে নিরূপণ করতে পারবেন (পৃ. ৫৭)। শ্রেণীগত পটভূমিকায় ব্যক্তির বিশিষ্টতাকে এবং মূর্ত লক্ষণগুলিকে যথাযথভাবে নিরূপণ করার উপায় হিসাবে সার্ত্র যে-পদ্ধতি গ্রহণ করতে চান তা হল মনোবিকলন পদ্ধতি। অবশ্য এ মনোবিকলন পদ্ধতি ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন পদ্ধতি থেকে ভিন্ন এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরোধী নয়। এই পদ্ধতির উপযোগিতা বর্ণনা করতে গিয়ে সার্ত্র বলেছেন: "Psychoanalysis alone allows us to discover the whole man in the adult; that is, not only his present determinations but also the weight of his history. And one would be entirely wrong in supposing that this discipline is opposed to dialectical materialism." (পৃ. ৬০) সার্ত্রর মতে আজকের মার্কস্‌বাদীরা কেবল ব্যক্তির পরিণত বয়সের অবস্থা ব্যাখ্যা করতে উৎসুক—অর্থাৎ, তার শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণেই নিজেদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখতে চান। অথচ ব্যক্তির পরিণত বয়সের শ্রেণীচরিত্রকে যথাযথ বুঝতে হলে তার শৈশবকালের অবস্থাকেও ভালো করে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং ব্যক্তির সঙ্গে তার শ্রেণীর যোগসূত্র যে মাধ্যমের সাহায্যে হয় তাকেও পৃথকভাবে বুঝতে হবে। এই তৃতীয় মাধ্যমটি হল পরিবার। এইভাবে ব্যক্তিকে বোঝার চেষ্টা করলে তবে তার পূর্ণতর চরিত্র বোঝা যাবে। সার্ত্রর অস্তিবাদ মার্কস্‌বাদের এই অসম্পূর্ণতাকে দূর করে তার মনোবিকলন পদ্ধতির সাহায্যে। কারণ, "Existentialism,...believes that it can integrate the psychoanalytic method which discovers the point of insertion for man and his class—that is, the particular family as a mediation between the universal class and the individual. The family in fact is constituted by and in the general movement of History, but is experienced, on the other hand, as an absolute in the depth and opaqueness of childhood." (পৃ. ৬২)

কেবলমাত্র মানুষকে তার শৈশবের পারিবারিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করলেই যে ব্যক্তি এবং শ্রেণীর মধ্যকার সেতুটি সম্পূর্ণ হল তা নয়।

বিশেষ উৎপাদন-ব্যবস্থায় এবং অন্যান্য সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তি অসংখ্য মানবিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। সার্ত্রের প্রশ্ন হল মার্কস্‌বাদ এই বিভিন্ন মানবিক সম্পর্কগুলি কিভাবে ব্যাখ্যা করে? বিশেষ উৎপাদন-ব্যবস্থাপ্রসূত সম্পর্ক অর্থাৎ শ্রেণী-সম্পর্ক তারই সাহায্যে সে অন্যান্য যাবতীয় সম্পর্ক ব্যাখ্যা করবে, না, শ্রেণী-সম্পর্ক ছাড়া অন্যান্য মানবিক সম্পর্কের স্বাতন্ত্র্য সে স্বীকার করে নেবে। সার্ত্র শ্রেণী-সম্পর্ক অতিরিক্ত অন্যান্য মানবিক সম্পর্ক এবং বিশেষ-বিশেষ কয়েকটি সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বা সমিতি গড়ে ওঠে সেগুলির আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিতে চান। এ-প্রসঙ্গে, বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য সমাজতাত্ত্বিকেরা যেভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীসম্পর্কগুলি ব্যাখ্যা করেছেন সার্ত্র তার আলোচনা করেছেন। এই সমস্ত সমাজতাত্ত্বিকেরা যখন বলেন যে উৎপাদন-ব্যবস্থাপ্রসূত শ্রেণী-সম্পর্কের বিশেষ গুরুত্ব কিছু নেই; এগুলি হল অন্যান্য বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্পর্কেরই মতো এবং অন্যান্য গোষ্ঠী-সম্পর্ক আদৌ শ্রেণী-সম্পর্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না—সার্ত্র তাঁদের বক্তব্য সোজাসুজি বর্জন করেন। কিন্তু সার্ত্রের মতে এই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী-সম্পর্ককে যথাযথ বুঝতে হলে তাদের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করতে হবে যদিও তিনি মনে করেন যে বিশেষ উৎপাদন-ব্যবস্থাপ্রসূত শ্রেণী-সম্পর্কই বিভিন্ন সমাজ-সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু. তাঁর মতে,…"we must never yield to simplifications based wholly on techniques or consider social conditions to be conditioned by techniques and tools in a context peculiar to themselves alone. Aside from the fact that traditions and history (……) intervene at the same level as work and needs, there exist other material conditions (…………) which reciprocally condition techniques and the real level of life." (পৃ. ৭৫)। সার্ত্রের বক্তব্য যে মার্কসীয় বক্তব্য থেকে পৃথক সার্ত্র এমন কথা মনে করেন না। তবে বর্তমানের মার্কস্‌বাদের বক্তব্য থেকে সার্ত্রের বক্তব্য নিশ্চয়ই কিছুটা ভিন্ন এবং এ-প্রসঙ্গে তিনি মার্কস্‌বাদের দুটি ত্রুটির উল্লেখ করেছেন। বর্তমান মার্কস্‌বাদে একমাত্র শ্রেণী-সম্পর্ককেই স্বীকার করা হয়। অথচ ব্যক্তির সঙ্গে শ্রেণীর অথবা শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্ককে যথাযথভাবে বোঝবার জন্য ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যও বুঝতে হবে। এই বৈশিষ্ট্য না বুঝলে

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সমস্ত সমষ্টিগত সম্পর্ক এবং প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলিও যথার্থ বোঝা যাবে না। মার্কস্‌বাদ যে কেবল শ্রেণী-সম্পর্ক অতিরিক্ত সম্পর্কগুলি যথাযথ ব্যাখ্যা করছে না—তার অন্যতম কারণ, যে-কোনো সমষ্টি-সম্পর্ককে বুঝতে হলে সেই সমষ্টি-সম্পর্ককে যারা গড়ে তুলছে সেই বিশেষগুলিকে তাদের স্বরূপত বোঝার চেষ্টা করতে হবে। ইতিহাসকে বুঝতে হলে এবং সমাজ ও ব্যক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানকে সম্পূর্ণ করে তুলতে হলে কেবল বস্তুবাদের দ্বান্দ্বিক এবং ঐতিহাসিক গতি পর্যবেক্ষণ করলেই হবে না—তার সঙ্গে যোগ দিতে হবে সমান্তরালমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। এবং পর্যবেক্ষণের এই দ্বিতীয় মাত্রা প্রথম মাত্রা অর্থাৎ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দ্বান্দ্বিক মাত্রার বিরোধী নয়, পরিপূরক মাত্র। মার্কস্‌বাদ যদি এ কথা স্বীকার না করে তাহলে এই খণ্ডসত্যটুকুকে আশ্রয় করে প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতত্ত্ব মার্কস্‌বাদকে পুরোপুরি অস্বীকার করবে।

চার

সার্ত্রের মতে ব্যক্তির বিশেষ মূর্ত লক্ষণগুলির প্রতি উদাসীনতার ফলে সমসাময়িক মার্কস্‌বাদ মানুষকে অস্বীকার করেছে। শ্রেণী-সম্পর্কের অমূর্ত ধারণাকে ওতপ্রোতভাবে আশ্রয় করায় এবং তাকেই সর্বস্ব জ্ঞান করার ফলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে সমসাময়িক মার্কস্‌বাদ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং জীর্ণ একটি পর্যায় এনে ফেলেছে। এই অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার সুনির্দিষ্ট উপায় নির্দেশ করে অস্তিবাদ-এর ভাবাদর্শ। "Men themselves make their history but in a given environment which conditions them"— এঙ্গেলস্‌-এর এই উক্তি সার্ত্র গ্রহণ করেন। সার্ত্রের মতে বাস্তব পরিবেশ এবং পূর্বস্থ অবস্থাকে ভিত্তি করে মানুষ ইতিহাস রচনা করে। এ প্রসঙ্গে সার্ত্র যে-বিষয়টির উপর সব থেকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছেন তা হল ইতিহাস মানুষের দ্বারাই প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়—ইতিহাসের এই নিয়ন্ত্রণে মানুষ বাস্তব পরিবেশ এবং অবস্থার উপর নির্ভর করে এই মাত্র। ইতিহাসের নিয়ন্তা এই মানুষ যে অভিক্ষেপের সাহায্যে তার কার্য সম্পন্ন করে সেই অভিক্ষেপকে কেবল শ্রেণী-সচেতনতা এবং শ্রেণী সংঘর্ষের আলোয় বিচার করলে ইতিহাসকে অসংগতভাবে অতিসরলীকৃত করা হবে। কারণ, সার্ত্রের মতে এই অভিক্ষেপের পশ্চাতে ব্যক্তির মূর্ত বিশিষ্টতা এবং আপেক্ষিক-

ভাবে স্বতন্ত্র অন্যান্য সমষ্টি-সম্পর্কও কাজ করে। এই স্বতন্ত্র অভিক্ষেপগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে ; ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাপ্তির মধ্যে এই সমস্ত অভিক্ষেপগুলি সংগতভাবে ব্যাখ্যাত হচ্ছে কিনা এবং তাদের স্বাতন্ত্র্য অসংগতভাবে অস্বীকৃত হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব সমসাময়িক মার্কস্‌বাদ পালন করছে না। এবং এই দায়িত্ব পালন করে মার্কস্‌বাদের পরিপূরক ভূমিকা নেওয়াই সার্ত্রের অস্তিবাদের উদ্দেশ্য।

মানুষের অভিক্ষেপ দু-প্রকারে নিয়ন্ত্রিত ! বর্তমানের বাস্তব পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। মানুষের বস্তুজগতের অবস্থা তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রকে পরিসীমিত করে। এই সম্ভাবনার ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করে মানুষ কাজ করে। সম্ভাবনার ক্ষেত্রকে যেমন একদিকে নিছক অনিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র বলা যায় না, তেমনি সম্ভাবনার ক্ষেত্রের যে-কোনো একটি সম্ভাব্য বিষয়কে চরিতার্থ করে মানুষ ইতিহাস রচনা করে। একাধিক সম্ভাব্য বিষয়ের মধ্যে একটিকে বাস্তবে চরিতার্থ করার মধ্যেই ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণী-অতিরিক্ত কোনো গোষ্ঠী-সম্পর্কের স্বাতন্ত্র্য প্রতিভাত হয়। সম্ভাবনার ক্ষেত্র দিয়ে সার্ত্র প্রত্যেক মানুষকে বর্ণনা করতে চান। এমনকি যে সম্ভাব্য বিষয়গুলি বাস্তবে চরিতার্থ হল না সেগুলিও নেতিবাচকভাবে মানুষকে বর্ণনা করে। শুধু তাই নয়, সার্ত্রের মতে একটি সমাজে যা সামগ্রিক সম্ভাবনার ক্ষেত্র তা সদর্থকভাবে বা নঞর্থকভাবে ঐ সমাজের ব্যক্তিবিশেষেরও সম্ভাবনার ক্ষেত্র। এমনকি যাকে একান্তভাবে ব্যক্তির সম্ভাবনার ক্ষেত্র বলে মনে হয় সেটাও কোনো সামগ্রিক সম্ভাবনার আত্মস্থ এবং সমৃদ্ধ রূপ।

যে অভিক্ষেপের সাহায্যে মানুষ ইতিহাস তৈরি করছে, সেই অভিক্ষেপ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা যায় সত্য কিন্তু তাকে নিছক শ্রেণী-অভিক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করা ভুল হবে। এবং এই দ্বান্দ্বিক সঞ্চালন কোনো অতিজাগতিক নিয়ম নয়। অথবা এই দ্বান্দ্বিক সঞ্চালনকে নিছক জড় পদার্থের যান্ত্রিকতার সঙ্গে এক করে দেখলেও চলবে না। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এবং ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ককে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে এই দ্বান্দ্বিক সঞ্চালনের স্বরূপ বুঝতে হবে। এই অভিক্ষেপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সার্ত্র বলেছেন : "The given, which we surpass at every instant by the simple fact of living it, is not restricted to the material conditions of our existence ; we must include

in it, as I have said, our own childhood." (পৃ. ১০০), "The project must of necessity cut across the field of instrumental possibilities. The particular zuality of the instruments transforms it more or less profoundly; they condition the objectification." (পৃ. ১১২) এবং "The project must not be confused with the will, which is an abstract entity, although the project can assume a voluntary form under certain circumstances." (পৃ. ১৫০)। অভিক্ষেপের বিষয় মন্তব্য করতে গিয়ে সার্ত্র বার বার সতর্ক হয়েছেন যেন এই অভিক্ষেপ নিরবলম্ব নির্ণয়ের অতীত ব্যক্তিমানসের বিচ্ছিন্ন স্ফুরণ বলে মনে না হয় অথবা এই অভিক্ষেপকে মানব-প্রকৃতিতে বাস্তব পরিস্থিতি আর পরিবেশের যান্ত্রিক প্রতিফলন বলে মনে না হয়। ইতিহাসের ধারায় মানুষের প্রকৃত ভূমিকা নির্ণয় করা জটিল ব্যাপার। তাকে অতিসরলীকরণের চেষ্টা করলে তা অমানবিক হবে। ইতিহাস রচনায় মানুষের প্রকৃত ভূমিকা যথাযথ নির্ণয় করতে গেলে তাই অত্যন্ত সতর্ক হয়ে অভিক্ষেপকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

পাঁচ

যে-কোনো উপায়ে যে কোনো একটা লক্ষণকে মানুষের নিহিত সত্তা বলে অভিহিত করা যায় না। মনুষ্যেতর অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রে ভৌতিক অস্তিত্বের পূর্বেই সেই জিনিসের একটি রূপ কল্পনা করা যায় এবং সেই কল্পিত রূপকে সেই জিনিসটির নিহিত সত্তা মনে করে তদনুসারে সেই জিনিসটির ভৌতিক অস্তিত্ব সংঘটিত করা যেতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রে এরকম সম্ভব নয়। কারণ, মানুষের ক্ষেত্রে কোনো পূর্বচিন্তিত নিহিত সত্তা আরোপ করে তার অস্তিত্ব ঘটানো যায় না। মানুষের ভৌতিক অস্তিত্বই প্রাথমিক এবং এই ভৌতিক অস্তিত্বই মানুষের সত্তাকে নির্ণয় করে। সার্ত্রর অস্তিবাদের এই হল গোড়ার কথা। এই মতবাদ সার্ত্র যখন প্রথম প্রচার করেন তখন তিনি তাঁর মতবাদকে মার্কস্‌বাদরূপ তত্ত্বের অন্তর্গত ভাবাদর্শ বলে ঘোষণা করেন নি। প্রথম জীবনে সার্ত্র যে অস্তিবাদী দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন নিঃসন্দেহে তাঁর আজকের মতবাদের সঙ্গে তার গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্তৃত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু আজও তিনি কোনো প্রাক্‌-গৃহীত অমূর্ত প্রত্যয়ের সাহায্যে

মানুষের নিহিত সত্তাকে নির্ণয় করার বিরোধী। মানুষের সত্তা যে আদৌ নিরূপণ করা যায় না সার্ত্র এরকম মনে করেন না। কিন্তু সেই সত্তা নিরূপণ করতে হলে ব্যক্তির বিশিষ্ট, মূর্ত অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে হবে, কারণ সত্তা তার দ্বারাই নিরূপিত হয়। প্রায় কুড়ি বছর আগে *Existentialism and Humanism* গ্রন্থে সার্ত্র লিখেছেন : "What do we mean by saying that existence precedes essence? We mean that man first of all exists, encounters himself, surges up in the world—and defines himself afterwards." (ফিলিপ ম্যারিয়েট কর্তৃক অনূদিত। পৃ. ২৮)। এবং ১৯৬০ সালে যখন তাঁর মতবাদ যথেষ্ট পরিবর্তিত তখন লিখেছেন : "Man defines himself by his project. This material being perpetually goes beyond the condition which is made for him ; he reveals and determines his situation by transcending it in order to objectify himself by work, action, or gesture." (*The Problem of Method*—পৃ. ১৫০)

সার্ত্রের মতে এই মূল বক্তব্যের সঙ্গে মার্কসের বক্তব্যের কোনো বিরোধিতা নেই। তবুও সমসাময়িক মার্কস্‌বাদ-এর কিছু কিছু ত্রুটি এবং সংকীর্ণতার জন্য অস্তিবাদী ভাবাদর্শের প্রয়োজনীয়তা। সার্ত্র যখন মার্কস্‌বাদের সমালোচনা করেছেন তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিষ্কারভাবেই বলেছেন যে তাঁর এই সমালোচনা মার্কসের নিজস্ব মূল বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ, এর নিহিতার্থ এই যে—যে সমস্ত মার্কস্‌বাদীর বিরুদ্ধে সার্ত্র তাঁর সমালোচনা উপস্থাপিত করেছেন তাঁদের মূল বক্তব্য মার্কস্-এর নিজস্ব বক্তব্য থেকে বিচ্যুত। কিন্তু এ কথা তিনি ধরে নিলেও আলোচ্য গ্রন্থের কোথাও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে তাঁর এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। তা ছাড়া সার্ত্রের সমালোচনা যে কেবল পরবর্তী যুগের মার্কস্‌বাদীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য এমন কথা বলা চলে না। সার্ত্র অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই এঙ্গেলস্-এর বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন এবং খুব স্পষ্টভাবে না হলেও তাঁর কয়েকটি বক্তব্য স্বয়ং মার্কসের বক্তব্যের সমালোচনা হিসাবেও উপস্থাপিত।

অন্তত দুটি বিষয়ে সার্ত্রের বক্তব্য মূল মার্কসীয় বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই

পৃথক; এবং এই দুটি বিষয় হল মার্কস্‌বাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে সার্ত্র নিরঙ্কুশভাবে মেনে নিলেও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্বন্ধে তাঁর মত কী—আলোচ্য গ্রন্থে খুব স্পষ্ট নয়। বরং একাধিক জায়গায় সার্ত্র যা বলেছেন তা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা সন্দেহজনক। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে সার্ত্র নিজে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তাঁর বক্তব্য দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পরিপন্থী নয়—পরিপূরক। কিন্তু তাঁর সেই উক্তির যাথার্থ্যও বিস্তৃততর বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। বিশেষত—*Critique of Dialectical Reason*-এ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে এই অসুবিধাটি আরও প্রকট হয়: "Ought we them to deny the existence of dialectical connections at the centre of inanimate Nature? Not at all. To tell the truth, I do not see that we are, at the present stage of our knowledge, in a position either to affirm or to deny. Each one is free to *believe* that physico-chemical laws express a dialectical reason or not to believe it." (পৃ. ১২৯)

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রমা-তত্ত্ব। মার্কসীয় প্রমা-তত্ত্ব সম্পর্কে সার্ত্রের অভিমত: "Yet the theory of knowledge continues to be the weak point in Marxism. When Marx writes: 'The materialist conception of the world signifies simply the conception of nature as it is without any foreign adition;' he makes himself into an *objective observation* and claims to contemplate nature as it is absolutely. ......By contrast, when Lenin speaks of our consciousness, he writes. 'Consciousness is only the reflection of being, at best an approximately accurate reflection'.···In both cases it is a matter of suppressing subjectivity; with Marx, we are placed beyond it; with Lenin, on this side of it." (পৃ. ৩২। টীকা ৯)। সার্ত্রের মতে মার্কসীয় প্রমা-তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ তাঁর ধারণা তাঁর মনোবিকলন পদ্ধতি মার্কস্‌বাদের পরিপন্থী নয়। মার্কসীয় প্রমা-তত্ত্ব গ্রহণ না করলে হয়তো সার্ত্রের পদ্ধতিকে পরিপূরক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তার

আগে আমাদের বিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং যথাযথ আলোচনা করে দেখতে হবে মার্কসীয় প্রমা-তত্ত্বের বর্জনে সার্ত্র্ কতখানি যুক্তিসংগত। ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে এবং ব্যক্তির চরিত্র নির্ণয়ে তাকে শ্রেণী-সম্পর্কের গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ রাখা সম্পর্কে সার্ত্র্ যে-বক্তব্যগুলি উপস্থাপিত করেছেন সেগুলিও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং মার্কসীয় প্রমা-তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে মার্কস্‌বাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে সার্ত্র্ যে-সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন সে-সম্পর্কে অনেক বিরোধের অবকাশ আছে। কিন্তু সেই বিরোধ নিরসনের জন্য সার্ত্র্ যথেষ্ট বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। এ ছাড়া প্রসঙ্গের জটিলতার জন্য এক-এক জায়গায় বক্তব্য এমন দ্ব্যর্থক এবং অস্বচ্ছ যে তার নিহিতার্থ অনুধাবন করা যথেষ্ট শক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য যে মূল গ্রন্থে (*Critique de la Raison Dialectique*) এই নিবন্ধটি সংযোজিত হয়েছে—সেখানে অনেক বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এবং অনেক প্রশ্নের নিরসন হবে এমন প্রতিশ্রুতি সার্ত্র্ দিয়েছেন।

সার্ত্র্‌র মতবাদকে কি অভিধায় ভূষিত করা যায়? অস্তিবাদ অথবা মার্কস্‌বাদ? ঠিকভাবে বলতে গেলে এই ভাবাদর্শকে ঠিক অস্তিবাদ বলা যায় না এবং সার্ত্র্‌র দাবী, যে, এই ভাবাদর্শ মার্কস্‌বাদের ক্ষেত্র থেকেই উদ্ভূত এবং মার্কস্‌বাদের পরিপূরক—গ্রহণযোগ্য কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে অতিসরলীকরণ এবং অযথা সংকীর্ণকরণের যে-অভিযোগ সার্ত্র্ তুলেছেন তা থেকে গ্রাহ্য একটি জিনিস আছে। সার্ত্র্‌র অভিযোগ বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হতে পারে তবে এই সম্ভাব্য ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার জন্য সার্ত্র্‌র সাবধানবাণীর প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সার্ত্র্‌র মতবাদ মার্কস্‌বাদ থেকে যথেষ্ট পৃথক হলেও ব্যবহারিক জীবনে মার্কস্‌বাদী লক্ষ্যের প্রতি সার্ত্র্‌র অকৃত্রিম আগ্রহ এবং তদনুযায়ী ব্যবহারিক নিষ্ঠা—তাঁর সাবধানবাণী এবং সমালোচনার মূল্য বাড়িয়েছে।

সুমিত সরকার

ভারতের রাজনীতি : বিভিন্ন ধারা

আলোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য হল কংগ্রেসের জন্ম থেকে ১৯২১ পর্যন্ত ভারতের রাজনীতির বিভিন্ন ধারার বিশ্লেষণ। ব্রিটিশ শাসন থেকে উদ্ভূত পটভূমিকা, কংগ্রেসের প্রথম যুগের 'মডারেট্' কর্মপন্থা, একস্ট্রিমিজ্ম্, মুসলমান রাজনীতি, গান্ধী-নেতৃত্বের গোড়ার দিক—এই পাঁচটি ভাগে লেখাটি বিভক্ত। জাতীয় আন্দোলনের আদর্শগত দিক সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার খুবই অভাব। প্রগতিবাদী বলে পরিচিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রী কে পি করুণাকরণের এই বই তাই নিশ্চয়ই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

বইটি পড়ে সব মিলিয়ে কিন্তু নিরাশ হতে হল। জাতীয় আন্দোলনের রাষ্ট্রমত সম্বন্ধে দু-ধরনের কাজের অবকাশ রয়েছে। প্রথমত নতুন তথ্যের অন্বেষণ—বড় বড় নেতাদের মতামত মোটামুটিভাবে সুপরিচিত হলেও, জানা দরকার এমন বহু খবর এখনো সে-যুগের সংবাদপত্র, পুস্তিকা ও সরকারী মহাফেজখানায় ছড়িয়ে আছে। ১৮৮৫-র আগের যুগের ক্ষেত্রে এই তথ্য অনুসন্ধানের কাজ কিছুটা এক সময় শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার করেছিলেন—বিশ্লেষণের নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁর বই আজও অবশ্যপাঠ্য। দ্বিতীয়ত, প্রসিদ্ধ নেতাদের পরিচিত মতামতের নতুন ব্যাখ্যারও মূল্য থাকতে পারে, বিশেষ করে যদি এই আলোচনা কিছুটা সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে হয়, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর উত্থান-পতনের কারণ অনুসন্ধান করে, সুনির্দিষ্ট উত্তর না দিতে পারলেও অন্ততপক্ষে পাঠকের মনে অর্থপূর্ণ প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। উভয় দিক থেকেই কিন্তু শ্রীকরুণাকরণ ব্যর্থ হয়েছেন। বইটি উদ্ধৃতিতে ভরা, কিন্তু বলতে গেলে সবই নেওয়া হয়েছে সুপরিচিত বক্তৃতা, প্রবন্ধ, আত্মজীবনী বা বড়জোর দু-একটি ইংরাজি মাসিকপত্রিকা থেকে। কয়েক বছর আগে শ্রীকরুণাকরণ

K. P. Karunakaran. *Continuity and Change in Indian Politics.* (PpH, New Delhi, October (1964), Rs. 12·50.

Modern Indian Political Tradition নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, বর্তমান গ্রন্থ যেন তারই একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা। বইয়ের শেষে চার পাতা ধরে প্রাথমিক সূত্রের তালিকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে সীতারামায়ার কংগ্রেসের ইতিহাস কোন হিসাবে স্থান পেল বোঝা গেল না। অন্যদিকে শ্রীকরুণাকরণের বিশ্লেষণও আগাগোড়া মা'লী ধাঁচের, মৌলিকতার পরিচয় বিশেষ মিলল না।

কয়েকটি তথ্যের ভুল চোখে পড়ল, নিশ্চয়ই অসাবধানতাবশত এগুলি এসে পড়েছে। 'National Association' (পৃ. ৩১) নয়, 'Indian Association' —প্রতিষ্ঠার তারিখেও ভুল আছে। রামকৃষ্ণ মিশন বা থিওজফিকাল সোসাইটি ধর্মীয় কুসংস্কার, মূর্তিপূজা ও পুরোহিত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল বলে শোনা যায় না (পৃ. ২২)—আর তাদের কাজের ফলে "spirit of enquiry" (পৃ. ২৫) বর্ধিত হয়েছিল কিনা এ-বিষয় সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় "the politically conscious section of the people gave unconditional support to the war efforts of the government" (পৃ. ১৬৩)—লেখক নিশ্চয়ই এই যুগের বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্বন্ধে অজ্ঞ নন।

তথ্যের কয়েকটি ত্রুটির চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল বিশ্লেষণের দুর্বলতা। প্রথম পরিচ্ছেদে শাসনতান্ত্রিক ঐক্য, উন্নততর আইন-ব্যবস্থা, পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার সুফল ইত্যাদির দীর্ঘ আলোচনার পর ব্রিটিশ শাসনে উদারনৈতিক দিক ছাড়াও কিছু "authoritarian elements" (পৃ. ৯) ছিল—শুধু এইটুকু বললে কি যথেষ্ট হয়? শ্রীকরুণাকরণ কখনোই বিশ্বাস করেন না যে, ইংরাজরা আমাদের হাত ধরে রাজনীতির অ-আ-ক-খ শিখিয়েছিল বলেই জাতীয় আন্দোলনের জন্ম হয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের কথা নিশ্চয়ই তাঁর জানা আছে—কিন্তু হয়তো তাড়াতাড়ি বই লিখতে গিয়ে এখানে তাঁর রচনা একদেশদর্শী হয়ে পড়েছে।

একস্ট্রিমিজম্ সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য আমার অতি-সরল মনে হয়েছে। 'নরমপন্থা'র বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে আবার নানা ধারা ছিল, এর ইঙ্গিত আমরা The Indian World থেকে উদ্ধৃত রচনাটিতে পাই (পৃ. ৫৯), কিন্তু এই সূত্রটি লেখক অনুসরণ করার চেষ্টা করেন নি। অরবিন্দের Doctrine of Passive Resistance নামক বিখ্যাত প্রবন্ধমালার (পৃ. ৭৯-৮০তে কিছু উদ্ধৃতি

রয়েছে) সঙ্গে এই লেখাটি মিলিয়ে পড়লে মনে হয় অন্তত বাংলাদেশে (এবং হয়তো অন্য প্রদেশেও) তাত্ত্বিক দিক থেকে একস্ট্রিমিজম্-এর মধ্যে তিনটি ধারা ছিল। প্রথমটির মূল কথা ছিল আত্মশক্তির আবাহন, নিষ্ফল আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে শিল্প-শিক্ষা-গ্রাম্য সংগঠন ইত্যাদির ক্ষেত্রে গঠনমূলক স্বদেশীর কার্যক্রম—রবীন্দ্রনাথের লেখায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় মিলবে। দ্বিতীয় ধারাটি তিলক-লাজপৎ-বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ আলোচিত Passive Resistance-এর নতুন গণ-আন্দোলনের রাজনীতি। চরম-পন্থার তৃতীয় রূপ শিক্ষিত যুবকদের গুপ্ত-সমিতি ও সন্ত্রাসবাদ। স্বদেশী যুগে প্রথম দুই ধারা শেষ পর্যন্ত বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারল না কেন এটাই হল বড় প্রশ্ন—মোটামুটি একই ধরনের গঠনমূলক কাজ ও আইন-অমান্যের কার্যক্রম নিয়েই তো পনেরো বছর পর গান্ধীজী সারা ভারতে ঝড় তুললেন। এই রকম প্রশ্নের উত্তর অবশ্য সহজ নয়, তবু আলোচনার বোধহয় প্রয়োজন আছে। এ ছাড়া একস্ট্রিমিজম্ অনেকটা নব-হিন্দুবাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেও পাশ্চাত্ত্য-দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমানের দ্বন্দ্ব তার ভিতরেও চলেছিল—বাংলাদেশে স্বদেশীযুগের বহু পত্রিকায় এই আদর্শগত বিতর্কের পরিচয় মিলবে, তিলকের বাল্যবন্ধু সমাজ-সংস্কারক আগরকর রাজনীতিতে মোটেই নরমপন্থী ছিলেন না। জাতীয় শিক্ষা আলোচনা প্রসঙ্গে (পৃ. ৭১-৭৯) দু-একবার এই অন্তর্দ্বন্দ্বের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তা ইঙ্গিত মাত্রই। তবে এক ধরনের একস্ট্রিমিজম্-এর সঙ্গে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার মিলনের কুফল সম্পর্কে লেখকের দ্ব্যর্থহীন অভিমত (চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৯৫-১০৫) নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

বস্তুত 'ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্বন্ধ'—শীর্ষক এই চতুর্থ পরিচ্ছেদটি বোধহয় বইয়ের শ্রেষ্ঠ অংশ। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস লেখার নামে আজকাল যেরকম সাম্প্রদায়িক প্রচার আরম্ভ হয়েছে যে এই সময় খুব নতুন কিছু কথা না থাকলেও উগ্র-হিন্দুবাদের সমালোচনা ও মুসলমান রাজনীতির বিভিন্ন ধারার তথ্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যার যথেষ্ট দাম রয়েছে। তবে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কারণ আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীকরুণাকরণ প্রধানত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার মানের পার্থক্য এবং সেই থেকে চাকুরি প্রভৃতির ক্ষেত্রে রেষারেষির ভাব এই দিকেই নজর দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য হল সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ মানুষের

মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে, এর কারণ বুঝতে হলে সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

গান্ধীবাদের আলোচনায় লেখক এক সময় বহুল-প্রচলিত অতি-বামপন্থী সংকীর্ণতা সযত্নে বর্জন করেছেন, তবে এর চাইতে বেশি মৌলিকতা তিনি দাবি করতে পারেন কিনা সন্দেহ। বিস্তর অসংগতি ও আপাতদৃষ্টিতে অনেক প্রতিক্রিয়াশীল মতামত সত্ত্বেও (বা না কি কিছুটা এসবের জন্যই ?) গান্ধী আধুনিক ভারতের বৃহত্তম গণ-জাগরণের উদ্যোক্তা। তাঁর আন্দোলনে সম্মিলিত হয় পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন ধারা—মডারেট্‌দের ব্যক্তিস্বাধীনতা-প্রীতি (রাউলাট অ্যাক্টের প্রতিবাদ), একস্‌ট্রিমিস্টদের অসহযোগের কৌশল ও দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, মুসলমানদের খিলাফৎ রক্ষার দাবি (পৃ. ১৭৭)। ১৯২১-এই বইটি শেষ, তাই গান্ধীবাদের পূর্ণ কোনো আলোচনা অবশ্য আমরা পাই না।

পরিশেষ নামক অধ্যায়টি না থাকলেই ভাল হত কারণ লেখক বলবার মতো নতুন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। একস্‌ট্রিমিজম্‌ ও গান্ধীবাদ উভয়েরই ভাল এবং মন্দ, এ দুটি দিক ছিল (পৃ. ১৭৩, ১৭৯)—এই ধরনের কথা বইয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করে না।

শেষে একটি প্রশ্ন থাকে—বইয়ের নাম থেকে যে-ধরনের উচ্চমানের ঐতিহাসিক বা এমনকি দার্শনিক আলোচনার প্রত্যাশা করা যায়, শ্রীকরুণাকরণ কি তা দিতে পেরেছেন ?

প্রদ্যোৎ গুহ

বিদেশীর চোখে ভারতের সংকট

সাংবাদিক রোনাল্ড সেগল ভারতযাত্রার প্রাক্কালে লণ্ডনে সতীর্থ এক সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করে জানতে চেয়েছিলেন, তিনি তো ভারতবর্ষে অনেকদিন ছিলেন, ভারতবাসীকে তিনি পছন্দ করেন কিনা। "তাদের পছন্দ করি?" সেগলের প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিকপ্রবর ক্ষিপ্ত জবাব দিলেন—"ঘৃণা করি তাদের! নোংরা এবং বশংবদ একদল লোক, তাদের মধ্যে কোনো আগুন বা লড়াইয়ের স্পৃহা পর্যন্ত নেই—কুসংস্কারে নিমজ্জিত, সব ব্যাপারে উদাসীন, এদিকে অর্থহীন ঔদ্ধত্য আছে প্রচুর। ধনীরা লোভী এবং দুর্নীতিপরায়ণ আর দরিদ্রদের মধ্য থেকে বেঁচে থাকার আগ্রহ পর্যন্ত নিংড়ে নেওয়া হয়েছে। সরকার নির্বোধ এবং অপদার্থ, দেশে চরম অব্যবস্থা, কোনো-না-কোনো প্রকারের বিপর্যয় সেখানে অবশ্যম্ভাবী।" সেগল অবশ্য এতটা কড়াভাবে ভারতবাসীর সমালোচনা করেন নি, বরং তিনি এক জায়গায় বলেছেন, জনসাধারণের উপর তাঁর আস্থা দুর্মর, তবু মোটামুটি তাঁর বইও একই সুরে বাঁধা।

রোনাল্ড্ সেগলের বয়স ৩৩, জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়, শিক্ষা কেপ টাউন ও কেম্ব্রিজে। দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ হলেও তিনি বর্ণবিদ্বেষী নন, বরং বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়। দেশ ছেড়ে তিনি আসেন বেচুয়ানাল্যাণ্ড এবং সেখান থেকে ভারতসরকারের সহায়তায় নিয়াসাল্যাণ্ড টাঙ্গানিকা ঘুরে ব্রিটেনে। বর্তমানে তিনি ব্রিটেনেরই বাসিন্দে। সেগলের এই পরিচয়টুকু জানা না থাকলে মনে হতে পারত, শ্বেতাঙ্গ বা 'কৃষ্ণকায় শ্বেতাঙ্গ'-সুলভ জাত্যাভিমানই বুঝি তাঁর সমালোচনার তীব্রতায় ইন্ধন জুগিয়েছে।

সেগল ভারতবর্ষে এসেছিলেন বই লিখতেই। 'অন্য দরিদ্র সমাজের সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা আছে অথচ ভারতবর্ষ সম্পর্কে যার কিছুমাত্র জ্ঞান নেই'—

Ronald Segal. The Crisis of India. Penguin Books. London. 5 sh.

এমন একজনের চোখে ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী কেমনভাবে প্রতিবিম্বিত হয় তা লিপিবদ্ধ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন তিনমাস। এই তিনমাসে এই উপমহাদেশে তিনি সাত হাজার মাইল ভ্রমণ করেছেন, আলাপ-আলোচনা করেছেন বহুলোকের সঙ্গে। সেগল অবশ্য তাঁর এই যৎসামান্য অভিজ্ঞতার উপরই শুধু নির্ভর করেন নি—ভারতবর্ষ, তার ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ে বেশ কিছু বইও তিনি পড়েছেন। কিন্তু পুস্তকের পরিশিষ্টে তিনি যে-গ্রন্থপঞ্জী দিয়েছেন, তাতে মনে হবে পড়াশুনো ব্যাপারটা তাঁর বেশ এলেমেলো। অর্থনীতি বিভাগে তিনি এমনকি ভারতীয় অর্থনীতির একটি কলেজপাঠ্য পুস্তকেরও উল্লেখ করেন অথচ তালিকায় কে. এন. রাজ কিংবা ভি. কে. আর. ভি. রাও-এর মতো বিশেষজ্ঞদের কোনো বই নেই। ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাতে তার প্রধান নির্ভর 'অক্সফোর্ড হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া।' কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁর স্বল্পকালীন অবস্থিতি এবং পড়াশুনার এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, তাঁর বই, 'দ্য ক্রাইসিস অব ইণ্ডিয়া'—একেবারে মূল্যরিক্ত নয়।

সেগলের সবচেয়ে বড় গুণ, তাঁর সবল রচনাশৈলী। পেশাদার সাংবাদিক হলেও তিনি সরাসরি তাঁর বক্তব্য বলতে দ্বিধা করেন না—সে বক্তব্য যদি অপ্রিয় হয় তাহলেও। আর ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি যা বলেন তার অধিকাংশই অপ্রিয়—অনেক পরিমাণে তা সত্য হলেও।

দুই

সেগলের বইকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে—যা বইটির প্রায় অর্ধাংশ—লেখক ভারতবর্ষের মানুষ, তাদের ধর্ম, রীতি-নীতি ও সমাজের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেন, বোধ হয়, ভারতীয় সংকটের একটি পটভূমিকা দেবার জন্যই। আর দ্বিতীয় ভাগে তিনি বিশ্লেষণ করেন বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের স্বরূপ। 'দ্য ক্রাইসিস অব ইণ্ডিয়া'র যা কিছু মূল্য সে এই শেষাংশের জন্যই।

মুখবন্ধে সেগল ভারতবাসীর স্বাস্থ্যবিধি-সম্বন্ধীয় অভ্যাস সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেন তাতে নতুনত্ব কিছু নেই—কিছুকাল আগে প্রকাশিত নাইপলের 'অ্যান এরিয়া অব ডার্কনেস'-এও ওসব কথা ঠিক অমনি লঘুচালেই লেখা

হয়েছে। ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কিত সুদীর্ঘ অধ্যায়টি উদ্দেশ্যহীন, এলোমেলো রচনার নিদর্শন। ভারতে জাতিভেদ আছে, বা ভারতবাসীরা নির্জীব, উদাসীন, তা দেখাবার জন্য মহেন-জো-দাড়ো, হারাপ্পার যুগ থেকে ভারতীয় ইতিহাস বর্ণনার কি প্রয়োজন ছিল বোঝা গেল না। আর ৮০।৯০ পাতার মধ্যে ভারতের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস এবং হিন্দুধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য কি তার ব্যাখ্যা ঠেসে ঢোকাতে গিয়ে সেগল সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। অনেক অপ্রয়োজনীয় তথ্য আছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ গিয়েছে। ভারতে জাতিভেদ প্রথা তুলে দেবার জন্য বিভিন্ন সময়ে যে-আন্দোলন হয়েছে, এমনকি মোগল আমলেই যে সতীদাহ প্রথা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হয়েছে, সেগলের বইয়ে সেসব কথা একেবারে নেই।

সংস্কারই ভারতবাসীর জীবনের নিয়ামক—কথাটাকে সেগল একেবারে বেদবাক্য বলে ধরে নিয়েছেন। তাই, তাঁর কাছে সিপাহিবিদ্রোহ শুধুই ধর্মান্ধদের একটা ব্যাপার, তার পেছনে যে জমির প্রশ্ন ছিল তা তাঁর চোখে পড়ে না।

উনিশ শতকের নবজাগরণ আন্দোলন সম্পর্কেও সেগল নীরব থাকেন। মাত্র একটি অনুচ্ছেদে তিনি এক নিঃশ্বাসে যেভাবে রামমোহন, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের (পৃ. ৯২-৯৩) নাম করে যান তাতে গায়ে কাঁটা দেয়। ভারতবাসীদের তিনি যেরূপ নিরীহ এবং ভালোমন্দ, ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে উদাসীন বলে চিত্রিত করেছেন, তার বিপরীত দৃষ্টান্তও ভারতের ইতিহাসে যথেষ্ট আছে। সেগলের বই পড়ে তা জানা যাবে না। বেশি অতীতে যাবার দরকার নেই, মন্ত্রিমিশনের প্রাক্কালে আই-এন-এ বন্দীদের মুক্তি এবং নৌবিদ্রোহের অগ্নিগর্ভ দিনগুলির বিশেষ কোনো ছায়া তাঁর বইতে পড়ে নি, যদিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদির জন্য তিনি অনেকগুলি পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন। এই সব পরিবর্জন ইচ্ছাকৃত না হতে পারে কিন্তু এর ফলে তিনি যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা সব সময় সঠিক হয় না।

যেমন ধরা যাক, জাতিভেদ প্রথা গ্রামাঞ্চলে যদিও এখনও যথেষ্ট প্রবল আছে, শহরাঞ্চলে তার প্রভাব অনস্বীকার্যভাবেই বিলীয়মান। আর রাজনীতির উপর তার প্রভাবও সর্বত্র সমান নয়। এই বাংলাদেশেই Caste factor নির্বাচনকে তত বেশি প্রভাবিত করে না, যতটা করে হয়তো বিহারে কি উত্তরপ্রদেশে। আর এর সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের খুব যে একটা সম্পর্ক আছে

তাও নয়। 'সবচেয়ে শিক্ষিত রাজ্য' কেরালা সম্পর্কে সেগলের ধারণা ভুল। ধর্ম ও Caste ঐ রাজ্যে নির্বাচনকে যত প্রভাবিত করে অন্য কোনো রাজ্যে ততটা করে কিনা সন্দেহ। এই সাম্প্রতিক নির্বাচনেও বাম কমিউনিস্টদের জয় এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পরাজয়ের মূলে অন্যান্য কারণের মধ্যে একটা বড় কারণ বাম কমিউনিস্টদের সুবিধাবাদী কায়দায় ধর্ম এবং Caste factors-এর ব্যবহার।

তাছাড়া, ভারতে জাতিভেদপ্রথার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার 'অ্যাপারথীড' নীতির তুলনা, খুব নরম করে বললেও বলতে হয়, একদেশদর্শী। নারীদের দাসত্ব সম্পর্কেও সেগলের বক্তব্যের সঙ্গে আজকের বাস্তবতার মিল যৎসামান্য, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে।

আসলে, ভারতবর্ষ একটা বিশাল দেশ। ঐতিহাসিক কারণে সে দেশের নানা অংশের বিকাশে তারতম্য ঘটেছে। কোনো অংশ, যা ইওরোপের ছোটোখাটো অনেক দেশের চেয়ে আয়তনে ও জনসংখ্যায় অনেক বড়ো, হয়তো সত্যিই পিছিয়ে আছে, এই বিশাল দেশের কোনো প্রত্যন্ত প্রদেশে হয়তো এখনও নরমুণ্ড শিকারীর সাক্ষাৎ মেলে, কোনো সুদূর গ্রামাঞ্চলে হয়তো পাঁচবছরে-দশবছরে একটা সতীদাহের ঘটনা না ঘটে তা নয়, কিন্তু এই সব বিচ্ছিন্ন ঘটনার উপর নির্ভর করে এই দেশ সম্পর্কে কোনো সামান্যীকৃত সিদ্ধান্ত করতে গেলে তা কুৎসা রটনার সামিল হয়ে দাঁড়াবে। অস্বীকার করা যায় না, সেগলের বইয়ে এ ধরনের ঝোঁক আছে।

ভারতীয় সমাজ, ইতিহাস, জনসাধারণ ও তাঁদের রীতিনীতি সম্পর্কে সেগলের এই একপেশে, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্বজ্ঞানহীন, মূল্যায়ন—ভারত সরকার সম্পর্কে তাঁর ন্যায্য সমালোচনার ধার অনেকখানি ভোঁতা করে দেয়। কারণ যে-দেশের মানুষ যেমন সে দেশে তেমনি সরকারই তো গঠিত হয়। যারা নির্জীব, নিষ্ক্রিয়, ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে উদাসীন—সে দেশের মানুষ কি এর চেয়ে ভালো গভর্নমেণ্ট আশা করতে পারে?

তিন

'দ্য ক্রাইসিস অব ইণ্ডিয়া'র শেষ তিনটি অধ্যায়ে সেগল আধুনিক ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে যে-আলোচনা করেন তা অনেক বাস্তবানুগ—যদিও নতুন কথা হয়তো তিনি বিশেষ কিছুই বলেন নি।

'দ্য ইকনমিক্‌ প্রেসিপিস্‌' অধ্যায়ে সেগল ভারতের দারিদ্র্যের এক মর্মন্তুদ চিত্র এঁকেছেন। সেগল লিখেছেন, ভারতের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য দারিদ্র্য। সে দারিদ্র্য এত গভীর, এত সর্বব্যাপী যে তাকে প্রকৃতির অংশ বলেই মনে হয়। এই দারিদ্র্য আত্মসমর্পণ দাবি করে এবং তা লাঘব করার প্রয়াসকে উপহাস করে। এই দারিদ্র্য সেরকম দারিদ্র্য নয় যা স্বেচ্ছাকৃত অসাম্যের ফল। ভারতবর্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা নয়, যেখানে একমাত্র প্রয়োজন হল পরিতৃপ্তির প্রয়োজন এবং দেশের ধনসম্পদের যথাযথ বিলিবণ্টন হলেই সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। ভারতের দারিদ্র্য নিরঙ্কুশ—যদিও এখানেও এমন লোক আছে যারা ধনী এবং দিনে দিনে আরও ধনী হয়ে ওঠে কিন্তু তারও তুলনামূলকভাবে দারিদ্র্যের প্রান্তে অবস্থিত সার্ফ মাত্র। (পৃ. ১৭২)

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর কুড়ি বছর হতে চলল, সমাজতন্ত্রের কথাবার্তা কম হল না, তিনটি পঞ্চবার্ষিক যোজনাও সমাপ্তির পথে, তবু অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। ক্ষীর-ননী-ছানা যা কিছু ধনীদের ভাগ্যেই জুটছে, দরিদ্রের জন্য দুমুঠো অন্নও ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠছে, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ থেকে যাচ্ছে মরীচিকাই। অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর, এদিকে জমির উৎপাদিকা শক্তি কম এবং চাষের পদ্ধতি সেকেলে ধরনের। ভারতবর্ষে যা খাদ্য উৎপাদন হয় তাতে কোনোক্রমে তার জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভরণ-পোষণ চলতে পারে। জনসংখ্যার হার বেড়েই চলেছে, সম্পদ সামান্য যা বাড়ে, ওতেই তা খেয়ে যায়। (পৃ. ১৮১)

এই রকম একটা পরিস্থিতিতে পরিত্রাণের দুটি মাত্র পথ আছে: দরিদ্র সমাজ মূলধন পেতে পারে ধনী সমাজের কাছ থেকে ঋণ বা দান হিসেবে অথবা নিজেরা কৃচ্ছ্রসাধন করে। এর মধ্যে প্রথমোক্ত পথ সহজতর সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবে তা কদাচিৎ ঘটে। মোটা রকমের মুনাফার প্রতিশ্রুতি না থাকলে ধনী সমাজ কখনও ঋণ দেয় না। তদুপরি তারা আদায় করতে চায় রাজনৈতিক বশ্যতা এবং অর্থনৈতিক সুবিধা। কিন্তু ভারতের মতো দরিদ্র দেশে দ্বিতীয় বা কঠোরতর পন্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে সম্ভবত সেগলও নিশ্চিত হতে পারেন নি। তাই তিনি শেষপর্যন্ত যে ব্যবস্থাপত্র দেন তা হল এই যে, ভারতকে অবিরাম অর্থনৈতিক সাহায্য সংগ্রহের প্রয়াস করে যেতে হবে এবং যে-সূত্রই তার নীতির উপর কোনো দাবি না জানিয়ে সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকবে, সাহায্য তার কাছ থেকেই নিতে হবে।

যত ভালোভাবে এই সাহায্যকে তারা কাজে লাগাতে পারবে, তত বেশি পরিমাণে সাহায্যও তারা পাবে। (পৃ. ২৭৪)

সেগলের এই ব্যবস্থাপত্রে অভিনবত্ব অবশ্য কিছু নেই এবং তা বিতর্কমূলকও নয়—কমিউনিস্ট পার্টিসহ ভারতের প্রগতিশীল জনমত এ-কথা অনেকদিন ধরেই বলে আসছে, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমস্ত সমাজবাদী দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর তারা জোর দিয়ে আসছে শাসক দলের নেতাদের হুঁশ হবার অনেক আগে থেকেই।

ভারতে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে সেগলের অভিযোগ এই নয় যে, বিদেশী মূলধন বেশি আসছে, তাঁর অভিযোগ এই যে সমাজতন্ত্রের কথা বলায় অথচ বাস্তবে তা রূপায়িত না করায়—ভারত সমাজতন্ত্রের সুবিধা এবং বিদেশী মূলধন উভয় থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিমী বিনিয়োগের পরিমাণ যেখানে ১৮,০০০,০০০,০০ পাউণ্ড সেখানে ভারতীয় অর্থনীতিতে বিদেশী লগ্নীর পরিমাণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর! (পৃ. ২০১)

মূলধন সঞ্চয়ের অপর ক্ষেত্র কৃষি সম্পর্কেও সেগল তাঁর মতামত তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কৃষি-ক্ষেত্রে সরকারী ব্যর্থতা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ছাড়া কৃষির সংকটমুক্তি অসম্ভব। কিন্তু এ-ব্যাপারে সরকারী নীতি হোঁচট খেতে খেতে এগিয়েছে না বলে পিছিয়েছে বলাই শ্রেয়। কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাব সঠিক পথের ইঙ্গিত দিয়েছিল কিন্তু কায়েমী স্বার্থের তীব্র বিরোধিতার ফলে—সে-প্রস্তাব লিপিবদ্ধ সদিচ্ছাই থেকে গেছে। নেহরুর উদ্যোগে নাগপুর প্রস্তাব পাশ হলে যারা গেল গেল রব তুলেছিল সেগল তাদের কিছু আকাড়া সত্য পরিবেশন করেছেন। সেগল বলেছেন: বোম্বাই-এর ব্যবসায়ীকুল যতই গেল গেল রব তুলুক—ভারতের কৃষির জন্য যা প্রয়োজন তা কম মাত্রায় নয়, আরও বেশি মাত্রায় 'কমিউনিজম'। যদি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ফারাক দূর করতে হয়, যদি সমষ্টিচেতনার উদ্বোধন করতে হয়, জাতীয় উদ্যোগের বিকাশ ঘটাতে হয়, যদি অসংখ্য বুভুক্ষুর মুখে অন্ন দেবার মতো পর্যাপ্ত খাদ্য-উৎপাদন বাড়াতে হয়, যদি শেষপর্যন্ত "স্তালিনপন্থী হিংসার" (Stalinist violence) বিকল্প এড়াতে হয় তাহলে এ ছাড়া অন্য পথ নেই। (পৃ. ২১৬)

ভারতের যোজনা-নীতি সম্পর্কে সেগলের সমালোচনা তীব্র হলেও তাতে নূতন কোনো কথা নেই। সরকারের সমাজতান্ত্রিক বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও

ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান সুবিধাভোগী যে পুঁজিপতি শ্রেণী তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেগল যখন লেখেন, 'সমাজের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ' কার্যত ভারতীয় পুঁজিপতিদের—তারা নিজেদের জোরে যা পারত, তার চেয়ে বেশি 'ক্ষমতা এবং সুবিধা' দিয়ে থাকে—তখন স্বতই প্রশ্ন জাগে অর্থনীতিক পরিকল্পনা, পাবলিক সেকটর, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ ইত্যাদি সম্পর্কে তাহলে ভারতীয় পুঁজিপতিরা এত স্পর্শকাতর কেন?

চার

রাজনীতিকভাবে, সেগলের মতে, ভারতীয় সংকটের প্রধান উপসর্গ হল শাসকদলের নেতৃত্বের সঙ্গে জনসাধারণের দুস্তর ব্যবধান। নয়াদিল্লী বা রাজ্যের রাজধানীর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আপিস ঘরে নিরাপদে সমাসীন কংগ্রেস নেতৃত্ব গ্রামের ভোটদাতা জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন পেশাদার রাজনীতিক 'এলিটে' পরিণত হয়েছে। (পৃ. ২৪৭)। তারা জনসাধারণের ভাষা বুঝতে অক্ষম। যখন গণ-আন্দোলন উত্তাল হয়ে ওঠে এবং তা আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় মাত্র তখনই সরকার তাদের দাবির ন্যায্যতা বুঝতে পারে। যখন ৫ লক্ষ কৃষক নীরবে কোনো দরখাস্ত করেন তখন কংগ্রেস নেতারা তাতে কান দেন না, কিন্তু যখন ৫ শো হাঙ্গামাকারী দোকান লুঠ করে, ট্রামে আগুন দেয় তখন তাদের টনক নড়ে। অর্থাৎ, সেগলের ভাষায়, যখন তাঁদের সাড়া দেওয়া উচিত তখন তাঁরা উপেক্ষা করেন, যখন পরিমাপ উচিত তখন করেন প্রতিরোধ আর যখন প্রতিরোধ করা উচিত তখন করেন আত্মসমর্পণ। আর সেগল এত লক্ষ করেছেন যে, এই সহিংস হাঙ্গামার চরিত্র প্রধানত মধ্যশ্রেণীর, শ্রমিকশ্রেণীর নয়। (পৃ. ২৪৩)

কংগ্রেস একদা ছিল জাতীয় সংগঠন, এখন রাজনৈতিক দল—কিন্তু কোনো নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক দল নয়। সেগলের ভাষায়, কংগ্রেস একাধারে সরকার এবং বিরোধী দলের সমাহার।…দুটি সমাজবাদী দলের যে কোনোটিতে যত সমাজবাদী আছে তার চেয়ে অনেক বেশি স্বয়ংঘোষিত সমাজবাদী আছে কংগ্রেসে, তেমনি স্বতন্ত্র পার্টিতে যত "স্বাধীন উদ্যোগের" পুরোহিত আছে তার ঢের বেশি আছে কংগ্রেসে। কংগ্রেসের মধ্যে সেক্যুলার শক্তি যেমন আছে, তেমনি আছে সাম্প্রদায়িকতার শক্তিও। স্বতন্ত্র, জনসংঘ বা সোশ্যালিস্ট প্রভৃতি দলগুলি তাদের নিজস্ব

শক্তির দ্বারা সরকারের নীতিকে যতটা না প্রভাবিত বা পরিবর্তিত করতে পারে, তার থেকে ঢের বেশি পারে কংগ্রেসের মধ্যেকার তাদের বন্ধুদের সাহায্যে চাপ সৃষ্টি করে।

ভারতে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র বড বড় পার্টির নির্বাচনী সমর্থন এবং বিধানসভা অধিকারের সংগ্রামের ব্যবস্থা ততটা নয়, যতটা একপ্রকারের একদলীয় ব্যবস্থা আর এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ দল তাদের নীতি পরিবর্তন করে মুখর জনমতের বা অপেক্ষাকৃত ছোট সংগঠিত বিরোধী গ্রুপগুলির চাপে—যারা এর সঙ্গে এবং একে অপরের সঙ্গে নিয়ত সংঘর্ষে লিপ্ত। (পৃ. ১৪৬)

সেগলের মতে ভারতে গণতন্ত্রের পক্ষে আর-একটি সমস্যা হল কংগ্রেসের একচেটিয়া ক্ষমতা এবং বিরোধী দলগুলির অকিঞ্চিৎকর শক্তি। ক্ষমতা একাদিক্রমে বছরের পর বছর কংগ্রেসের হাতে থাকায় আমলাতন্ত্রের উপর তাঁদের প্রভাব প্রায় নিরঙ্কুশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে শাসনযন্ত্রকে তাঁরা দলীয় বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারছেন ও করছেন। ক্ষমতাই কোনো-কোনো কংগ্রেস নেতার পক্ষে চরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, কংগ্রেসের মধ্যে নীতি অপেক্ষা উপদলীয় কলহ প্রবল হয়ে উঠে গণতন্ত্রের পক্ষে তা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যতদিন নেহরু জীবিত ছিলেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং জনসাধারণের উপর প্রভাবের দ্বারা তিনি এই বিবদমান উপদলগুলিকে একত্র করে রাখতে পেরেছিলেন। সেগল মনে করেন, নেহরুর মৃত্যুর পর এই সংকটজনক ঐক্য আর বেশিদিন বজায় রাখা যাবে না—দক্ষিণপন্থীরা এসে মিশবে স্বতন্ত্র পার্টিতে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা জনসংঘে, আর বামপন্থীদের একাংশ যোগ দেবে কমিউনিস্ট পার্টিতে, অন্য অংশ সোশ্যালিস্ট দলগুলিতে। সেগলের মতে এর ফলে গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যোন্নতিই ঘটবে। কেননা, তখন উপদলের প্রতিযোগিতার বদলে শুরু হবে নীতির প্রতিযোগিতা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যখন কংগ্রেসের ভিতরের ও বাইরের প্রগতিশীল জনতার সঙ্গে ঐক্যের কথা বলেন—তখন হয়তো এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই তাঁরা তা বলেন।

সেগল খোলাখুলিভাবেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তিনি যেসব কথা বলেছেন, এই দু-এক বছরের মধ্যেই তা অনেকাংশে মিথ্যা হয়ে গেছে। সেগল অবশ্য এর জন্য

দায়ী নন, এর জন্য দায়ী সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে, চীনাদের ভ্রান্ত নীতি। ভারতের উপর চীনা-আক্রমণ এবং সেই প্রশ্ন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙনের ফলে সংসদে কমিউনিস্ট পার্টি এখন আর প্রধান বিরোধী দল নয়, সে-স্থান অধিকার করেছে স্বতন্ত্র পার্টি। আর আগামী নির্বাচনে কমিউনিস্টদের (বাম সহ) কী অবস্থা দাঁড়াবে, সে সম্পর্কে এখনই কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী না করাই শ্রেয়, কেননা, ইতিমধ্যে গঙ্গা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে যাবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে বিরোধ সম্পর্কে সেগলের ভাষ্য কিন্তু বেশ মজাদার! সমস্ত বিরোধটা নাকি, বিশেষ করে বাংলাদেশে, 'ট্রাডিশনাল' নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 'উঠতি কৃষক নেতৃত্বের' বিদ্রোহ—যাঁরা এসেছেন কৃষকদের মধ্য থেকেই। এই 'উঠতি কৃষক নেতৃত্ব' কারা? জ্যোতি বসু না নাম্বুদিরিপাদ না হরেকৃষ্ণ কোঙার? আমাদের যতটুকু সংবাদ জানা আছে তাতে তারা কেউই তো কৃষক-সন্তান বলে জানি না। আর নাম্বুদিরিপাদ কি সুন্দরাইয়া, সেগল যাকে 'ট্রাডিশনাল নেতৃত্ব' বলেছেন, তার অংশ ছিলেন বলেই তো আমাদের সংবাদ। অবশ্য সেগল নিশ্চয়ই এ-সব তথ্য উদ্ভাবন করেন নি, আসলে তাঁকে যারা তথ্য সরবরাহ করেছেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে যা করেছেন, তা হল practical joke!

পাঁচ

ভারতীয় পুঁজিপতিদের সম্পর্কে সেগল কিছু খাঁটি কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন: ভারতীয় পুঁজিপতি নির্মাতা ততটা নয়, যতটা ফাটকাবাজ। তার ভিত্তি শিল্প ততটা নয়, যতটা ব্যবসায় এবং মহাজনি। জাতীয় দায়িত্ববোধ তার কিছুমাত্র নেই। তার দৃষ্টিভঙ্গি সংগঠনমূলক নয়, তার দৃষ্টিভঙ্গি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর দৃষ্টিভঙ্গি। হিসাবের কারচুবিতেই সে সিদ্ধহস্ত। (পৃ. ৩০৪)

সেগলের মতে, এই পুঁজিপতিদের সঙ্গে কংগ্রেসের বড়কর্তারা গাঁটছড়াতে বাঁধা পড়ার ফলেই যত দুর্নীতির উদ্ভব হয়েছে এবং শাসনযন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা ছড়িয়ে পড়েছে। (পৃ. ৩০১)

কংগ্রেস রাজত্বে দুর্নীতি প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। তা নিয়ে মহাভারত

লেখা চলে। সেগল মাত্র কয়েক পৃষ্ঠায় বিষয়টির আলোচনা করেছেন। ফলত, তা অনেক পরিমাণেই অসম্পূর্ণ।

এই দুর্নীতির জন্য সেগল শেষপর্যন্ত নেহরুকে দায়ী করেছেন। কংগ্রেসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই দায়িত্ব নিশ্চয়ই নেহরুর উপর কিছু পরিমাণে বর্তাবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও না বলে পারা যায় না, শেষ অধ্যায়ে সেগল নেহরুর যে-মূল্যায়ন করেন, বিশেষ করে চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে নেহরুর প্রতিতুলনা, বাস্তবানুগ নয়। চিয়াং চীনের স্বাতন্ত্র্যের জন্য সংগ্রাম করেন নি—নেহরু ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নেতা। চিয়াং সমাজতন্ত্রের ভাবধারাকে দেশের জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেন নি, নেহরু করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের সান ইয়াৎ-সেনের নীতিকে চিয়াং লঙ্ঘন করেছেন, নেহরু সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের নীতি গড়ে তুলেছেন। সেদিক থেকে বরং সান ইয়াৎ-সেনের সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে।

সন্দেহ নেই নেহরুর অনেক দুর্বলতা ছিল, কায়েমীস্বার্থের আক্রমণের মুখে তিনি অনেক সময়ই পিছু হটেছেন, (সেগল ঠিকই লিখেছেন) যেসব মন্ত্রীদের বরখাস্ত করা উচিত ছিল তাদের তিনি বরখাস্ত করেন নি, বরখাস্ত করেছেন তাঁদেরই যাঁদের তাঁর নীতির প্রতি আনুগত্য সুবিদিত। কিন্তু এ-সবের জন্য নেহরুকে পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। সেগল তো নিজেই লিখেছেন : 'তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল তাঁর নিজের পার্টি, যা তাঁর নীতিকে বানচাল করার প্রয়াস পেয়েছে', 'তাঁর চিন্তার ফলকে করেছে কলুষিত।' (পৃ. ৩০৮)। আর আমরা এও জানি চীনা-আক্রমণের সেই সংকটময় দিনগুলিতে নিজের পার্টিতে এক সর্বাত্মক বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়ে কেমন করে নেহরুকে বিদায় দিতে হয়েছিল কৃষ্ণমেনন ও মালব্যজীকে। নেহরুকে সেগল যতটা সর্বশক্তিমান করে আঁকতে চেয়েছেন, আসলে নেহরু তা ছিলেন না। নেহরুকে চিরকালই কংগ্রেসের মধ্যে অন্যের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হয়েছে—যদিও জনসাধারণের তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। নেহরুর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এই যে, তিনি তাঁর নিজের আদর্শে কোনোদিন কংগ্রেসের ভিতরে বা বাইরে কোনো দল গড়েন নি। এটা বোধহয় তাঁর সংগঠনশক্তিরই অভাবের ফল—কিংবা হয়তো স্বপ্নদ্রষ্টা নেহরু কোনোদিনই মাটির পৃথিবীতে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে চান নি। বারে বারেই, তাই তাঁকে কায়েমীস্বার্থের আক্রমণের

সামনে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এ কথা কে অস্বীকার করবে, চীনা-আক্রমণের সেই দুর্যোগময় দিনগুলিতে, ইংগ-মার্কিন শক্তির প্রবলতম চাপের সামনেও তিনি ভারতের মূলনীতিগুলি থেকে পিছু হটেন নি? আর ভারতের এই মূলনীতিগুলি—জোটনিরপেক্ষতা, শান্তি, পরিকল্পিত অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্র—যে মূলত প্রগতিশীল, নিতান্ত অন্ধ না হলে কে তা অস্বীকার করবে?

নেহরুর পার্টি, কংগ্রেস—সেগলের ভাষায় যা তার 'worst enemy'—তার পক্ষে এই নীতি কার্যে পরিণত করা হয়তো সম্ভব নয় আর তার হাতে এই নীতি যে নিরাপদও নয় তার দুর্লক্ষণও ইতিমধ্যে কিছু কিছু প্রকট হয়ে উঠছে। সুতরাং এমন দিন হয়তো দূরে নয়, যখন নেহরুর এই নীতিকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসতে হবে ভারতের প্রগতিশীল শক্তিগুলিকেই—একদা যেমন সান ইয়াৎ-সেনের নীতিকে চিয়াং-এর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসতে হয়েছিল চীনের জনসাধারণকে।

রবীন্দ্র মজুমদার

বিশ্বজয়ী সেই খুদে ভবঘুরে

When I was young, someone asked me what a work of art was. I replied, 'It is a love-letter to the world, well written'.

—*Charles Chaplin*

পৃথিবীর উদ্দেশে সুন্দর করে লেখা ভালবাসায় ভরা সেই চিঠিখানি চ্যাপলিন আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন—তাঁর সৃষ্ট সেই অবিস্মরণীয় চরিত্র 'ট্র্যাম্প্'-এর হাতে। থলের মতো ঢিলে প্যান্ট, অসম্ভব ছোট সাইজের আঁটো কোট, পায়ে বিরাট জুতো, মাথায় ছোট্ট ডাবি হ্যাট, হাতে শৌখিন বেতের ছড়ি, প্রজাপতি-গোঁফওলা সেই খুদে মানুষটি আমাদের সমকালীন 'ফোকলোর' বা লোকযানে সিনেমার সবচেয়ে বড়ো দান। নানা নিষেধের বেড়াতোলা সমাজের বৈরী পরিবেশের বাধা ডিঙিয়ে, 'সিস্টেম' আর 'এস্টাব্লিশ্মেন্ট্'-এর উঁচু উঁচু দেয়াল অবলীলাক্রমে টপকে, যেমন-করে-হোক পথ-কেটে চলা অদম্য এই 'লিট্ল্ ম্যান্' আমাদের কালের সাধারণ মানুষের এক মস্তবড়ো প্রতীক। রূপকথার সেই দৈত্যের বিরুদ্ধে বাচ্চা জ্যাক-এর মতো, কিংবা রাজামশাইয়ের কয়েক হাজার সেপাই-শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে ছোট্ট টুনটুনির মতো, চ্যাপলিনের এই হাঘরে মানুষটি এমন একটি সার্বিক সত্যকে প্রকাশ করেছে যা দেশোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ।

চ্যাপলিন লিখছেন: 'বহুধাচরিত্র এই মানুষটি একাধারে ভবঘুরে, সজ্জন, কবি, স্বপ্নদ্রষ্টা, নিঃসঙ্গ—কিন্তু সব সময়ে আশাবাদী, মহৎহৃদয়।...সেই সঙ্গে সে বিজ্ঞানী, গীতকার, অভিজাত ডিউক, ওস্তাদ পোলো-খেলোয়াড়। কিন্তু সে-ই আবার সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে নিতে কিংবা শিশুর হাত থেকে লজেঞ্চুস কেড়ে নিতে পিছপাও নয়। এবং, বলা বাহুল্য, অবস্থাবিশেষে

Charles Chaplin. *My Autobiography*. Bodley Head. 42 sh.

প্রয়োজন হলে কোনো মহিলার পেছনে লাথি কষাতেও সে পারে—কিন্তু সেটা নিদারুণ ক্রুদ্ধ না হলে নয়।'

এই ট্র্যাম্প্ চরিত্রটির আইডিয়া কি ভাবে চ্যাপলিনের মাথায় এসেছিল, কি ভাবে তিনি তাকে বিকশিত ও পরিণত করে তুলেছিলেন—সে কথা চ্যাপলিনের অন্যান্য জীবনীকাররা বেশ বিশদভাবে বলেছেন। কিন্তু তবু, চ্যাপলিনের নিজের মুখে সে কথা শোনার জন্যে আমরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলাম। আমরা এ ও জানি, এই সর্বজনপ্রিয় চরিত্রটিকে রূপ দেবার পেছনে খুব একটা পূর্বপরিকল্পিত চিন্তা-ভাবনা ছিল না।

কিস্টোন কমেডি ফিল্ম্ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে চ্যাপলিন ম্যাক সেনেটের পরিচালনায় অভিনয় করতে এসেছেন। প্রথম ছবি 'মেকিং এ লিভিং'য়ে (১৯১৪) তিনি পাকা একজন ইংরেজ ড্যাণ্ডির ফ্রক কোট, টপ হ্যাট পরে, চোখে মোনোকল্ লাগিয়ে এক রিপোর্টারের ভূমিকায় কমিক অভিনয় করেন। দ্বিতীয় ছবির জন্যে ম্যাক সেনেট যখন তাঁকে নিজের ইচ্ছেমতো 'যা-হোক একটা মজাদার মেক-আপ' নিতে বললেন, তখন চ্যাপলিনের মাথার মধ্যে কোনো আইডিয়া ছিল না। গল্প সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানতেন না। পোশাকের ঘরে গিয়ে এমনিই মনে হয়েছিল—পরস্পর-বিরোধী গোছের একটা পোশাক পরলে কেমন হয়। তাই, থলে-প্যাণ্টের সঙ্গে আঁটো কোট, বিরাট জুতোর সঙ্গে ছোট্ট ডার্বি টুপি, বয়েসটাকে অনিশ্চিত করে তোলার জন্যে প্রজাপতি-গোঁফ (চ্যাপলিনের বয়েস বাজার-কাটতি কমেডিয়ানদের চেয়ে বেশ একটু কম বলে ম্যাক সেনেট প্রথমে আপত্তি তুলেছিলেন): 'চরিত্রটি সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আমার মাথায় ছিল না। কিন্তু যে-মুহূর্তে এই পোশাক পরলাম আর মেক-আপ নিলাম, সেই মুহূর্ত থেকেই মানুষটির ব্যক্তিত্ব অনুভব করতে শুরু করলাম। শুরু হল তার সঙ্গে জানা-চেনা এবং সেটে পৌছানোর সময়টুকুর মধ্যেই দেখলাম সে পুরোপুরি জন্মলাভ করেছে।'

চ্যাপলিনের দ্বিতীয় ছবি 'দি কিড অটো রেসেস অ্যাট ভিনিস'' ছবির মারফত কমেডির জগতে এই ট্র্যাম্প্ যে তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বজনের হৃদয় জয় করেছিল, তার কারণগুলো এখানে একটু স্মরণ করা যেতে পারে। গোড়ার যুগের সেই সিনেমা-কমেডির প্রধান উপাদান ছিল সিচুয়েশন আর দুর্দান্ত গতিতে chase। মঞ্চের থেকে সিনেমার মৌল ভিন্ন প্রকৃতিটা তখন

সুপ্রতিষ্ঠিত। চলচ্চিত্রের সেই কারুকৌশলগত বিশিষ্টতাগুলিকে পুরোপুরি এক্স্‌প্লয়েট করার মনোভাব থেকে, সিনেম্যাটিক অ্যাক্‌শনের একান্ত তাগিদে, সাস্‌পেন্স্‌ আর chase-এর মধ্যে দিয়ে সেই হাস্যরসের বিকাশ। সিনেমার কমেডিয়ানদের তখন ব্যক্তিত্ব রূপায়িত করার সুযোগ বড়ো একটা ছিল না। তাই সে যুগের কমেডি-ফিল্‌ম্‌গুলিতে প্রায় ক্ষেত্রেই সূক্ষ্ম রসের অভাব ঘটত। এমনকি, ম্যাক সেনেটের পরিচালনায় চ্যাপলিন যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছেন, সেই ফোর্ড স্টার্লিং, রস্‌কো আরবাকল্‌ প্রভৃতির মতো ক্ষমতাবান ও সুপ্রতিষ্ঠিত হাস্যরসস্রষ্টারাও মৌলিক কমিক ব্যক্তিচরিত্র সৃষ্টির বদলে, শেষ পর্যন্ত আশু দর্শকতোষণের দিকে নজর রেখে, সেই অতি-পরিচিত 'কিস্টোন কপ'দের chase-এর লক্ষ্য হতেন। সিচুয়েশন-নির্ভর সেই হাস্যরস সম্পর্কে চ্যাপলিন বলেছেন: 'It dissipates one's personality; little as I knew about movies, I knew that nothing transcended personality.'

চ্যাপলিন সিনেমায় এসেছিলেন মঞ্চাভিনেতার আশৈশব অভিজ্ঞতা নিয়ে— যে-মঞ্চে সিনেমার অতিদ্রুত পটপরিবর্তনের সুযোগ নেই, অ্যাকশনের অসম্ভব ঊর্ধ্বশ্বাস গতি নেই। তাই স্টেজ কমেডিয়ান হিসেবে তাঁকে প্রধানত চরিত্র-নির্ভর হতে হয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁর ছিল প্যান্টোমাইম বা মূকাভিনয়ের অসাধারণ সহজ দক্ষতা। সিনেমাদর্শককে সেই মূকাভিনয়ের রস উপভোগের সুযোগ দেবার জন্যে তাঁকে অনেক বিরোধিতাকে জয় করে ক্লোজ-আপ আর স্থির ক্যামেরার সাহায্য নিতে হয়েছে, অ্যাক্‌শনের উদ্দাম গতিকে মাঝে মাঝে স্তব্ধ করতে হয়েছে। চ্যাপলিনই তাই সিনেমায় প্রথম সার্থক একটি কমিক ব্যক্তিচরিত্র সৃষ্টি করেন।

এবং, তাঁর আশ্চর্য শিল্পপ্রতিভার স্পর্শে সেই হাস্যকর চরিত্রটি হয়ে দাঁড়াল তার কালের সমস্ত 'কোণঠাসা' মানুষের প্রতীক—যে-মানুষ প্রচণ্ড সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিজের উপরে অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য এক আস্থা নিয়ে লড়াই করে চলেছে। এ চরিত্র যে দর্শককে হাসবার জন্যে সিচুয়েশন-এর সুযোগ নেয় নি, তা নয়। কিন্তু সবার আগে সে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি দর্শকের মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করেছে, নিজের সঙ্গে দর্শকের একাত্মতার বোধকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার মধ্যে দর্শক নিজের একটা অংশকে personified দেখেছে। চ্যাপলিনের একজন বিখ্যাত জীবনীকার থিওডোর হাফ-এর একটি

চমৎকার উক্তি মনে পড়ছে : 'Each of us is a little of the Tramp created by Charlie.'

কিস্টোন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী, প্রতি সপ্তাহে তিনটি করে এক-রীলের ছবি (কিংবা প্রতি দুই সপ্তাহে তিনটি করে দুই রীলের ছবি) তুলতে হত। অনেক মতবিরোধ আর সংঘাতের মধ্যে দিয়ে এক বছর এইভাবে কাজ করার পর, এস্সানে কোম্পানির সঙ্গে নতুন চুক্তিবদ্ধ হয়ে চ্যাপলিন তোলেন তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি 'দি ট্র্যাম্প'—যাতে করুণ কোমল হাস্য-ব্যঙ্গ-আয়রনির সমন্বয়ে এই চরিত্রটি পূর্ণ বিকশিত। তারপর থেকে একের পর এক ইজি স্ট্রীট (১৯১৭), শোল্ডার আর্মস্ (১৯১৮), দি কিড (১৯২১), দি সার্কাস, দি গোল্ডরাশ (১৯২৫), সিটি লাইট্স্ (১৯৩১), মডার্ন টাইম্স্ (১৯৩৬), দি গ্রেট ডিক্টেটর (১৯৪০) ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে—চ্যাপলিনের নিজের কথায় : 'sad-funny-pathetic-heroic' এই ট্র্যাম্প্ চরিত্রকে তিনি প্রত্যেকবার গভীরতর করে তুলেছেন, তার এক-একটি নতুন দিকের উপরে আলোকপাত করেছেন।

ভাবতে ভালো লাগে যে, এমনকি আমরাও কোনো-না-কোনো সময়ে এই কলকাতা শহরেই অন্তত শোল্ডার আর্মস্ (নির্বাচিত অংশ) থেকে মসিঁয় ভের্দু (১৯৪৭) ও লাইমলাইট (১৯৫২) পর্যন্ত চ্যাপলিনের প্রধান ছবিগুলির প্রায় সবই দেখার সুযোগ পেয়েছি। পুরনো কমেডি-চিত্রের বিভিন্ন সংকলনে (দি চ্যাপলিন মেরি-গো-রাউণ্ড, এ চ্যাপলিন ফেস্টিভ্যাল, হোয়েন কমেডি ওয়জ্ কিং, দি গোল্ডেন ডেজ্ অফ কমেডি, ইত্যাদি) চ্যাপলিনের নির্বাচিত অনেক এক-রীলার দুই-রীলারও আমরা দেখেছি। চ্যাপলিনের সব শেষের ছবি দি কিং ইন নিউ ইয়র্ক (১৯৫৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতির গার্জেনদের কাছে রাজনৈতিক কারণে নিন্দিত এবং প্রযোজকদের ষড়যন্ত্রে তার প্রদর্শনী নিষিদ্ধ।

ছেলেবেলা থেকে জীবনের যে বিচিত্র সংগ্রামী রূপের সঙ্গে চ্যাপলিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, সেটা তাঁকে স্বভাবতই রাজনীতি-সচেতন করে তুলেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী সংকট ; ফ্যাশিবাদ-নাৎসীবাদের অভ্যুদয়—যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে—এই সবই চ্যাপলিনের উপলব্ধিতে যুদ্ধের শ্রেণীচরিত্রকে স্পষ্ট করে তোলে। ক্রমেই

তিনি সক্রিয়ভাবে দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশ নিতে থাকেন। ইহুদীবিদ্বেষ; নিগ্রোবিদ্বেষ; কমিউনিস্ট-বিরোধিতার নামে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার দলন; হিটলারের প্রতি মার্কিন পুঁজিপুতি শ্রেণীর প্রকাশ্য সমর্থন; সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাৎসীদের গোড়ার দিকের সাময়িক বিজয়-অভিযানে তাদের উল্লাস; দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের নিতান্ত অনিচ্ছা;—এই সব কিছুর বিরুদ্ধেই চ্যাপলিন শিল্পী হিসেবে প্রতিবাদ না করে পারেন নি। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার জন্যে জনমত সংগঠনে তিনি খুব প্রত্যক্ষ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়েছেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর সোচ্চার বন্ধু-মনোভাব আর তাঁর নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে বহু বিশিষ্ট কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী।—এই সবই চ্যাপলিনকে মার্কিন শাসকমহলের কাছে 'বিরক্তিকর' করে তুলেছিল। এই আত্মজীবনীতে চ্যাপলিন এমন বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন যা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উপরে খুব উজ্জ্বল আলোকপাত করেছে।

দি গ্রেট ডিক্টেটর-এর কাজে হাত দেবার সময় থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এস্টাব্লিশ্‌মেণ্ট চ্যাপলিনের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে চ্যাপলিন যখন মসিঁয় ভের্দু তুললেন, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে রাজনৈতিক ডাইনী তাড়ানোর উন্মাদনা, মানুষের অধিকার ঘোষণায় সোচ্চার বহু সৎ শিল্পীর সঙ্গে চ্যাপলিনকেও কমিউনিস্ট, আন্-আমেরিকান বলে অভিহিত হতে হয়েছে। মসিঁয় ভের্দু-র প্রদর্শনীগৃহের সামনে পিকেটিং সংগঠিত করেছে যুদ্ধ-ফেরৎ ভেটারান-দের সংস্থা, চার্চের বিভিন্ন দল। শেষ পর্যন্ত চ্যাপলিনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে হয়েছে। আজ, সুইজারল্যাণ্ডের কর্সিয়ের গ্রামের স্নিগ্ধ পরিবেশে, পঁচাত্তর বছর বয়সের প্রশান্ত মন নিয়ে লেখা তাঁর এই আত্মকথায় দেখছি সেই স্মৃতির তিক্ততাকে চ্যাপলিন কাটিয়ে উঠেছেন।

চ্যাপলিন-অনুরাগী—এবং সাধারণভাবে সিনেমা-অনুরাগী—সাধারণের কাছে এই মহৎ শিল্পীর জীবনকথা মোটামুটি জানা। শৈশবের মধ্যবিত্তসুলভ স্বচ্ছলতা, বাল্যের দুঃসহ দারিদ্র্য, স্বামী-পরিত্যক্তা অভাগিনী মায়ের মস্তিষ্ক-বিকার, বড়ো ভাই সিডনির সঙ্গে লণ্ডনের অনাথ-আশ্রমে দম-আটকানো জীবন, মাত্র আট বছর বয়সে পেশাদার হিসেবে মঞ্চাবতরণ, কমেডিয়ান হিসেবে উনিশ বছর বয়সেই প্রতিষ্ঠা অর্জন, ভ্রাম্যমাণ ভ্যারাইটি দল কার্নো কমেডি

কোম্পানির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসা এবং ম্যাক সেনেটের নজরে পড়ে তারপর থেকে ধাপে ধাপে অতিক্রুত সাফল্যের চূড়োয় পৌছানো—এ সব কথা তাঁর বহু জীবনীকার (হাফ, পেন্, ফিস্কে, মিনি প্রভৃতি) আমাদের শুনিয়েছেন।[১] কিন্তু চ্যাপলিনের নিজের মুখে সে সব কথা শুনতে বসে এক অপূর্ব সাহিত্যরসের আস্বাদ পাওয়া গেল। এবং, বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের মধ্যে যেসব ছোট ছোট—কিন্তু অপরিসীম তাৎপর্যপূর্ণ—ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, তা কোনো জীবনীকারের জানার কথা নয়।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে চার্লস্ স্পেন্সার চ্যাপলিনের জন্ম। বাবা মা দুজনেই ছিলেন মিউজিক হলের শিল্পী। বাবা অন্য নারীর প্রতি আসক্ত এবং মদের নেশা ছাড়তে অক্ষম। মা তাই ভিন্ন হয়ে গেলেন। কণ্ঠস্বর হারাবার ফলে মাকে মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হল। মঞ্চে গাইতে গাইতে মার যেদিন গলা একেবারে ভেঙে গেল, পাঁচ বছরের বাচ্চা চার্লিকে হঠাৎ ম্যানেজার ঠেলে দিল স্টেজের মধ্যে।—অবস্থাটার এক মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন চ্যাপলিন: 'ফুটলাইটের চোখ-ধাঁধানো আলো আর ধোঁয়া-ছাড়তে-থাকা অনেক মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আমি গান গাইতে শুরু করলাম। আমার স্বরগ্রামটাকে ধরতে গিয়ে বেহালাবাদক কিছুক্ষণ সময় নিলেন—গাইছি তখনকার দিনের একটি জনপ্রিয় গান 'জ্যাক্ জোন্স্'। অর্ধেক গাওয়া হতে-না-হতে মঞ্চের উপর পয়সা পড়তে লাগল ধারাবর্ষণের মতো। প্রচণ্ড হাততালি আর হাসি। তৎক্ষণাৎ আমি ঘোষণা করলাম—আগে পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তারপর বাকি গানটুকু গাইব। হাসির কলরোল প্রচণ্ডতর হয়ে উঠল।...উৎসাহের ঝোঁকে আমি মার ভাঙা গলায় গান গাওয়ার নকল করতে লাগলাম। উত্তাল করতালিধ্বনি আর হাসির ঝড় উঠল শ্রোতাদের মধ্যে। হঠাৎ মা এক ঝটকায় আমাকে মঞ্চ থেকে টেনে সরিয়ে নিলেন নেপথ্যে।...সেই রাত্রে আমার প্রথম এবং মার শেষ মঞ্চাবতরণ।...ভাড়াটে ঘোড়াগাড়ি চেপে রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে দেখি—জানলার গায়ে মাথা রেখে মা নিঃশব্দে কাঁদছেন। প্রথম রজনীর সেই সাফল্যের পরেও, কেন জানি না, আমারও কান্না পেল। মার বাহুর উপরে মুখখানা চেপে ধরলাম।'—এই কান্নার মধ্যে দিয়ে যে তাঁর

[১] মিনি-র বইটির বাংলা অনুবাদ এবং চ্যাপলিন সম্পর্কে মৃণাল সেনের লেখা ছোট একটি বাংলা বই বেশ কয়েক বছর হল প্রকাশিত হয়েছে। ইদানিং সাপ্তাহিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে এই আত্মজীবনীর অনুসরণের লেখা আরও একটি চ্যাপলিন-জীবনী।

হাস্যরসশিল্পের ভ্রূণ জন্ম নিয়েছিল, সেটা চ্যাপলিনের কমেডিকে বোঝার পক্ষে যেন খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

দুই ছেলেকে মানুষ করার জন্যে মা গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে বসে ব্লাউজ সেলাই করেন (প্রত্যেকটির জন্যে দেড় পেনি মজুরী)। দাম্পত্যজীবনে আর শিল্পীজীবনে ব্যর্থতার দুঃখে তাঁর মনোবিকার দেখা দিল। সিডনি আর চার্লি গেল অনাথ আশ্রমে। মা মানসিক রোগের হাসপাতাল থেকে ফেরার পর সিডনি পোস্ট অফিসে টেলিগ্রাফ বয়ের কাজ নিল। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে বাবা মারা গেলেন। কিন্তু তার আগেই, তাঁর পরিচিত মিঃ জ্যাকসনের 'এইট ল্যাঙ্কাশায়ার ল্যাড্‌স্' দলে ঢুকে আট বছর বয়সী চার্লি মফঃস্বল অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে নাচ-গান ক'রে রোজগার করে সপ্তাহে আড়াই শিলিং। পেশাদার মঞ্চশিল্পী হিসেবে এখানেই তার হাতেখড়ি। কিন্তু হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়ে তাকে ঘরে ফিরে আসতে হল।

তারপর ক্রমান্বয়ে চার্লি হল ফুলবিক্রেতা, পিয়ন বয়, গ্লাস ব্লোয়ার, খেলনা-নির্মাতা, ছাপাখানার শিক্ষানবীশ, কাঠ-ফেড়ে-দেওয়া শ্রমিক ইত্যাদি। এমনকি ডাক্তারি পরীক্ষা চালাবার জন্যে নিজের দেহকে ব্যবহৃত হতে দিয়েছে সে—রোজগারের অন্য কোনো পথ নেই দেখে। কিন্তু মূল লক্ষ্যটা সব সময়েই স্থির ছিল—অভিনয়শিল্পী হতে হবে। শিশু বয়েস থেকেই এই একাগ্র কামনা চার্লিকে চালিত করেছে। জীবনের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা চ্যাপলিনের পরবর্তী শিল্পজীবনকে যে সমৃদ্ধ করে তুলেছে, তা বলাই বাহুল্য। জীবনের সেই বিচিত্রতাকে এমনভাবে জেনেছিলেন বলেই, পরবর্তী কালে তিনি সেখান থেকে দু-হাত ভরে তাঁর শিল্পসৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন।

চ্যাপলিন তাঁর এই আত্মজীবনীতে নিজের শৈশব-কৈশোর জীবনের যে-বর্ণনা দিয়েছেন, সেই অংশটুকু পাঠকের মনে সবচেয়ে গভীর রেখাপাত করে।

কয়েকটি ভ্যারাইটি দল ঘুরে, উনিশ বছর বয়সী চার্লি যখন ফ্রেড কার্নোর দলে কমেডিয়ান হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তখন পনেরো বছরের কিশোরী নৃত্যশিল্পী হেটি কেলিকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবনে প্রথম প্রেমের আবির্ভাব। তারপর তাঁর জীবনে বহু নারীর আসা-যাওয়া ঘটেছে। কিন্তু, এই আত্মজীবনী পড়ে বোঝা যায়, আসলে চতুর্থ পত্নী ও তাঁর আটটি সন্তানের জননী উনা ও'নিলের সঙ্গেই (নাট্যকার ইউজিন ও'নিলের মেয়ে) চার্লির মনের গাঁটছড়া

একান্তভাবে বাঁধা। প্রথম পত্নী মিল্‌ড্রেড হ্যারিস (১৯১৮-২০), তৃতীয়া পলেট গডার্ড (১৯৩৬-৪২)। কিন্তু দ্বিতীয় পত্নী লিটা গ্রে-র নামটুকুর উল্লেখ পর্যন্ত এই আত্মজীবনীতে নেই কেন ?

কার্নো-দলের সঙ্গে চ্যাপলিন আমেরিকায় এসেছিলেন সেদেশে স্থায়ীভাবে থেকে যাবেন স্থির করে। চব্বিশ বছর বয়সে যখন সিনেমায় আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন থেকেই চ্যাপলিনের জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের কাহিনী: বিশ্বজোড়া খ্যাতি আর বিপুল অর্থ। ১৯১৬ সালের মধ্যেই 'চার্লি' নামটি লোকের মুখে মুখে। শুরু হয়ে গেছে দেশ জুড়ে চ্যাপলিনকে নকল করার প্রতিযোগিতা ('চ্যাপলিন কন্টেস্ট')। নতুন এক নাচ চালু হয়েছে যার নাম 'চ্যাপলিন ওয়াক'। তাঁর ছবি যে-প্রদর্শনীগৃহে দেখানো হয়, তার বাইরের দেওয়াল জুড়ে ট্র্যাম্প-বেশী চ্যাপলিনের সেই সুপরিচিত ছবি, আর নিচে শুধু লেখা থাকে : 'আই অ্যাম হিয়ার টু-ডে!' ছবিটির নাম পর্যন্ত লোকে জানতে চায় না—চার্লি হলেই হল!

কার্নো-দলে পারিশ্রমিক ছিল সপ্তাহে ৫০ ডলার। কিস্টোন কোম্পানিতে এলেন (১৯১৪) সপ্তাহে ১৫০ ডলারের চুক্তিতে। এক বছর বাদেই চ্যাপলিন সপ্তাহে ১,২৫০ ডলারের চুক্তিতে এস্যানে কোম্পানিতে যোগদান করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসার দু-বছর বাদে, ১৯১৬ সালে, মিউচুয়াল কোম্পানি সপ্তাহে ১০,০০০ ডলার আর সেই সঙ্গে কনট্র্যাক্ট-বোনাস হিসেবে ১৫,০০০ ডলার দিয়ে তাঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হল। ১৯১৭ সালে, চ্যাপলিনের বয়েস যখন সাতাশ বছর মাত্র, তখন ফার্স্ট ন্যাশন্যাল কোম্পানি আঠেরো মাসে আটটি ফিল্‌ম্ তোলার জন্যে দশ লক্ষ ডলার (তদুপরি কনট্র্যাক্ট-বোনাস) দেবে বলে চুক্তি করল।

এর ফলে, সিনেমায় তারকা-প্রথা প্রবর্তনের সেই গোড়ার যুগে চ্যাপলিনের ভূমিকা বেশ একটু মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন অবশ্য, এখনকার মতো, প্রযোজকরা নিজেদের স্বার্থে চিত্রতারকা সৃষ্টি করতেন না—দর্শকসাধারণের কাছে শিল্পীর চাহিদা ও জনপ্রিয়তা অনুসারে তাঁর দাম চড়ত। চ্যাপলিন অবশ্যই সেই সুযোগটুকু নিতে ছাড়েন নি। চ্যাপলিনের ব্যক্তি-জীবনের এই হিসেবী দিকটাও লক্ষণীয়। তাঁর এই আত্মজীবনীটি এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চ্যাপলিন জানতেন, প্রকাশক মহলে এর বিরাট চাহিদা আছে দীর্ঘকাল ধরে। নিলামে ডাকার মতো করে রয়্যাল্‌টির পরিমাণ

বাড়িয়েই চলেছিলেন দিনে দিনে। শেষ পর্যন্ত লণ্ডনের বডলে হেড প্রকাশন সংস্থার ম্যাক্স রাইন্‌হার্ড জিতলেন সবচেয়ে বেশি রয়াল্‌টি কবুল করে (শোনা যায়, মিনিমাম গ্যারান্টি ৫ লক্ষ ডলারেরও বেশি!) এবং একসঙ্গে আটটি ভাষায় প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে। ১৯৫৭ সালে চ্যাপলিন এই আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত, ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হল বিশ্বসাহিত্যের সেরা আত্মজীবনীগুলির অন্যতম এই বইটি।

এই বইয়ের যে-অংশে গান্ধী ও নেহরুর সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয়ের অনতিবিশদ বিবরণ চ্যাপলিন দিয়েছেন, সেই অংশ সম্বন্ধে স্বভাবতই ভারতীয় পাঠকরা আগ্রহী হবেন।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

মাধবসঙ্গীত-পরিচয়

পরশুরাম রায়ের মাধবসঙ্গীতের দুটি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। পুঁথি দুটি বিশ্বভারতী পুঁথিশালায় রক্ষিত (৯১৪ নং, ১৫০০ নং)। মাধবসঙ্গীত ইতিপূর্বে অমুদ্রিত। উক্ত পুঁথি দুটির ভিত্তিতে বইটি এখন প্রকাশ করেছেন বিশ্বভারতী—তাঁদের 'গবেষণা গ্রন্থমালা'য়। বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীর দ্বারা গ্রন্থটি সম্পাদিত।

শ্রীসুকুমার সেনের মতে মাধবসঙ্গীতের রচনাকাল অষ্টাদশ শতক; শ্রীচৌধুরী এই সময়কে আর-একটু পেছিয়ে সপ্তদশ শতক করতে চান।

'মাধবসঙ্গীত' কৃষ্ণমণ্ডল শাখার কাব্য। ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায় অংশ কবির প্রধান অবলম্বন। শুরুতেই কবি বলেছেন—

অবধানে শুন ভাই ভাগবত কথা।

'মাধবসঙ্গীত' কৃষ্ণমঙ্গলকাব্য হলেও কৃষ্ণমঙ্গলকারদের অনেক প্রিয় আখ্যান এতে বর্জন করা হয়েছে। এতে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড নেই, ভাগবতের বিশেষ বিশেষ অংশের আক্ষরিক অনুবাদ নেই, একমাত্র বৃন্দাবনবিলাস ছাড়া ভাগবতের বাকী সবই বর্জিত। কবিদের অতি-প্রিয় বাৎসল্যলীলার ঘটনাগুলিও বাদ দেওয়া হয়েছে। পূতনা বধ, যমলার্জুন উদ্ধার, গোবর্ধনধারণ ইত্যাদি কাহিনীগুলি নেই। এদিক থেকে 'মাধবসঙ্গীত' একটু স্বতন্ত্র ধরনের কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য।

এই স্বাতন্ত্র্য অন্যত্রও পরিলক্ষিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে মাধবসঙ্গীতের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো এখানেও তিনটি প্রধান চরিত্র—রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই। বড়াই উভয় গ্রন্থেই দূতী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো নাটকোচিত উক্তি-প্রত্যুক্তিরও একটা স্থান আছে এ বইতে।

এ ছাড়াও মাধবসঙ্গীতে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে। এ-ও কৃষ্ণমঙ্গল-

---

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী সম্পাদিত **পরশুরাম রায়ের মাধবসঙ্গীত**। বিশ্বভারতী-গবেষণা-গ্রন্থমালা। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। পনেরো টাকা।

কাব্যের বিষয় নয়। নিবন্ধসাহিত্য থেকে বিষয়টি গৃহীত। কৃষ্ণলীলার সঙ্গে চৈতন্যলীলার ঐক্য দেখিয়ে (রাধিকার প্রাণবন্ধু যে নন্দনন্দন। কলিকালে সেই পুন পতিতপাবন।) কবি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রসতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

এ গ্রন্থ কৃষ্ণমঙ্গলকাব্য হিসেবে বর্ণনামূলক হলেও পদাবলীর সংখ্যা এতে প্রচুর।

ফলে এই কৃষ্ণমঙ্গলকাব্যটি বহু ধারার এক সম্মিলনক্ষেত্র। পদ অংশে জ্ঞানদাসের প্রভাব যথেষ্ট। পরশুরামের গুরু মনোহরদাস ছিলেন জ্ঞানদাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বোধ হয় সেই পথে পরশুরামের উপর জ্ঞানদাসের প্রভাব এতটা বর্তেছে। কতগুলি পংক্তিকে জ্ঞানদাসের প্রতিধ্বনি বলে মনে হবে। যেমন—

১. রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥ (জ্ঞানদাস)
মনহারা হৈল রূপ যৌবনের বনে। (পরশুরাম)

২. রবাব খমক বীণা সুমেল করিঞা।
বৃন্দাবনে প্রবেশিল জয় জয় দিঞা॥ (জ্ঞানদাস)
উপঙ্গ গঞ্জরী বীণা সুমেল করিঞা।
প্রবেশিলা বৃন্দাবনে জয় জয় দিঞা॥ (পরশুরাম)

৩. প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥ (জ্ঞানদাস)
প্রতি অঙ্গ সঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গ কান্দে॥ (পরশুরাম)

রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই চরিত্রে বিশেষ নূতনত্ব নেই। অধিকাংশ কৃষ্ণমঙ্গলকাব্যে চন্দ্রাবলী রাধার প্রতিদ্বন্দ্বী; মাধবসঙ্গীতেও অনেকটা তাই। এখানে চন্দ্রাবলী রাধার চেয়ে বয়স্কা, স্থিরা, গম্ভীরা, সে নিজের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ও অহংকারী। প্রথমে রাধার সঙ্গে তার ব্যবহার বন্ধুর মতোই। সে সখী পদ্মাবতীর কাছে রাধার অভিসারের খবর শুনে ছুটে এসে রাধাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে। যেহেতু কৃষ্ণ 'নবীন লম্পট বড় ধৈর্যগন্ধ নাঞি।' আর তাতে হবে লোকনিন্দা—রাধার, এবং চন্দ্রাবলীরও। কারণ 'রাধা চন্দ্রাবলীসমা বলে সর্বলোকে।' কিন্তু আশ্চর্য, কুঞ্জে সবার আগে চন্দ্রাবলীকেই দেখা যায়। কৃষ্ণের সঙ্গে কথায় তার অহংকারী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কুঞ্জে চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণ ভুলে রাধা বলে ডেকে ফেলেন এবং চন্দ্রাবলী ক্রুদ্ধ হয়ে বলে যে সে সোমাভা, রাধা তো সামান্য একটি নক্ষত্রের নাম। 'কৃষ্ণভজনের বৈরী নিজ অহংকার।' পরে চন্দ্রাবলী অবশ্য নম্র হয়।

অহংকার যে অন্তরায়—এটি প্রমাণ করার জন্যে এখানে চন্দ্রাবলীকে ব্যবহার করা হয়েছে।

এ বইয়ের খুব উল্লেখযোগ্য চরিত্র—ধরণী। পৃথিবীকে বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও এমনভাবে উপস্থিত করা হয় নি।

রাধা অভিসারে যাচ্ছেন। ভূমিতে রাধার পদচিহ্ন পড়ছে না:

কমলচরণ যেন ভূবি না পরশে।
ধরণী কাতর পদপরশের আশে॥

তখন ধরণী স্বয়ং দেখা দিলেন। নব দূর্বাদলের মতো শ্যামল শরীর ধরণীর। তবে ধরণী বড় বেশি কথা বলেন। পৃথিবীর জন্মকথা, মহাপ্রলয়ের ইতিহাস, ব্রহ্মার জন্ম, বরাহরূপী বিষ্ণুর উপাখ্যান গড়গড় করে বলতে থাকেন। বেচারী অভিসারিকারা মাঝপথে আটকে আছে। শেষে ধরণীর আসল কথাটা বোঝা গেল: অসুরের অত্যাচার আর তিনি সইতে পারেন না। পৃথিবীর বিলাপ শুনে বিষ্ণু বললেন যে তাঁর দুঃখের কারণ নেই, ধর্ম স্থাপনের জন্য তিনি বারবার আসবেন। দ্বাপরে কালিন্দীপুলিনে তিনি বিহার করবেন। আবার তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় দেখা দেবেন। এই আশ্বাস দিয়ে বিষ্ণু ধরণীকে জলের উপর স্থাপন করেছেন। তখন থেকেই ধরণী শ্রীরাধিকার চরণস্পর্শ লাভের আশায় পথ চেয়ে আছেন।

অভিসারিকারা অত শত বোঝে না। তারা জানে শুধু—'শ্রীনন্দনন্দন বন্ধু সেই প্রাণেশ্বর।'

রাধাসহ সখীরা চলে গেল। ধরণী বিমর্ষ। করুণ চোখে তাদের গমনপথের দিকে চেয়ে রইলেন। এমন সময় দৈববাণী হোলো—'পৃথিবী, কাতর হোয়ো না। গোপীদের এখন বিস্মৃতি স্বাভাবিক।' তখন ধরণীর একটু ভরসা এল।

কাহিনী শেষ হয়েছে রাধাকৃষ্ণের বিবাহে। রূপগোস্বামী তাঁর 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধবে' রাধাকৃষ্ণের বিয়ে দিয়েছেন। জীব গোস্বামীও তাঁর 'গোপালচম্পূ' কাব্যে উভয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ তো রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনার আগে ব্রহ্মার পৌরোহিত্যে মন্ত্রপাঠ, সপ্তপ্রদক্ষিণ ইত্যাদি করিয়ে বেশ জমিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ পরকীয়া আকর্ষণের তীব্রতা কবি ও গোস্বামী উপলব্ধি করেন, কিন্তু ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কারে তাকে কিছুতেই স্থান দিতে পারছেন না। তাই গোস্বামীদের মুখে শেষে

শোনা যায় যে রাধা ও অভিমন্যু গোপের বিয়েটা কিছু না, প্রাতিভাসিক সত্য মাত্র, যোগমায়ার প্রভাবে সত্য বলে মনে হচ্ছে মাত্র। আসল সম্পর্ক কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার। অভিমন্যু রাধার 'মায়াপতি'। বড় বড় গোঁসাইদের এই গোঁজামিলের পথ ধরে পরশুরামও রাধাকৃষ্ণের আগে বিয়ে দিয়ে নিয়েছেন, তবে তো 'ব্রহ্মরাত্রি গোঙাইলা আনন্দ করিঞা'।

চৈতন্যদেবের 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকটির ভাবানুবাদ করেছেন পরশুরাম। পাঠকদের নিজেদের বিচারের জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাবানুবাদের পাশাপাশি পরশুরামের ভাবানুবাদ তুলে দিচ্ছি :

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি॥ (মূল শ্লোক)

উত্তম হঞা আপনাকে মান তৃণাধম।
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে পোষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয়॥ (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

পরিণাম কৃষ্ণপ্রীতি যদি মনে জান।
তৃণ হইতে লঘু করি আপনাকে মান॥
সহমানে নিজ তনু সাম্য কর ধরা।
পর উপগারে হবে তরলের পারা॥
অমানিনী হবে সখী সখ্যসুখ লঞা।
মানদাতা হবে পুন কৃষ্ণ সজাতিঞা॥
এতেক সহিতে যদি করহ স্বীকার।
তবে সে কৃষ্ণের প্রেমপাত্রে অধিকার॥ (পরশুরাম)

ভবতোষ দত্ত

জেন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' যথেষ্ট পরিচিত কাব্য নয়। বঙ্গদর্শনের যুগে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রথম প্রকাশ হয়েছিল। তখন যে এই কাব্য যথেষ্ট প্রচারিত ছিল, মনে হয় না। দ্বিজেন্দ্রনাথ দর্শন-আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করায় সম্ভবত তাঁর কবিখ্যাতি আচ্ছন্ন হয়েছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এর দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী', 'চিত্রা' বেরিয়ে পাঠকদের মনোযোগ অধিকার করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যধারার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ নতুন আদর্শের কাব্য বলে রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠকদের সচেতন করে তুলেছে। স্বপ্নপ্রয়াণ রীতির দিক দিয়ে ঊনবিংশ শতকের আদর্শকে অনুসরণ করেছিল। কাহিনী এবং রূপক—দুইই সেকালের কাব্যরীতি হিসাবে খুবই প্রচলিত ছিল। সম্ভবত সে-আদর্শ কিছু পুরনো হয়ে এসেছিল—তখন বাংলা কাব্যজগতে নবীনের প্রতিষ্ঠা—

মোদের সভা হল ভঙ্গ

এখন আসিয়াছে নূতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ।

সুতরাং স্বপ্নপ্রয়াণ কিঞ্চিৎ লোকচক্ষুর আড়ালেই চলে গেল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এর তৃতীয় সংস্করণ হয়। তখন প্রিয়নাথ সেন এর কাব্যপরিচয় দেবার জন্য একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতে বসেছিলেন কিন্তু সে-রচনা অসম্পূর্ণ ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ অবলম্বনে কবি সতীশচন্দ্র রায় একটি চমৎকার রসালোচনা লিখেছিলেন নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে। এই সব বিক্ষিপ্ত সমালোচনার দ্বারা স্বপ্নপ্রয়াণের কাব্যরস রসিকজনের কাছে সংশয়াতীত হয়ে উঠেছে। তথাপি বাংলা কাব্যের ধারা নির্দেশ-প্রসঙ্গে স্বপ্নপ্রয়াণের গুরুত্ব-বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়েছে কিনা সন্দেহ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর: স্বপ্নপ্রয়াণ। শ্রীপুলিনবিহারী সেন প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ। প্রাপ্তিস্থান 'জিজ্ঞাসা'। ৬·০০ এবং ৭·৫০ টাকা।

মেঘনাদবধ কাব্য যেমন ঊনবিংশ শতকের বিশেষ পরিবেশ এবং কাব্যরুচির সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে যুক্ত, স্বপ্নপ্রয়াণও তেমনি তার যুগবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত। এ কথা বোধ হয় বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দী ছাড়া স্বপ্নপ্রয়াণের রচনা সম্ভবই হত না। তবু যুগবৈশিষ্ট্যে চিহ্নাঙ্কিত হলেও মেঘনাদবধ কাব্য যেমন রসের বিচারে যুগকে অতিক্রম করে গিয়েছে, স্বপ্নপ্রয়াণের সেই শক্তি আছে। এ-যুগের পাঠক স্বপ্নপ্রয়াণ পড়লে এর কাব্যরসে নিঃসন্দেহে অভিভূত হবেন। স্বপ্নপ্রয়াণ কবিমানসের বিশেষ বিশ্বাস এবং অভিযাত্রার কাহিনী। নানা বিরূপতার মধ্য দিয়ে কবিমানসের যে-পরীক্ষা হয়ে গেল সেই পরীক্ষার বিচিত্রতা পাঠককে মুগ্ধ করে। এই কাহিনীর ভিতর দিয়ে কবিকল্পনার নৈতিক শুচিতার যে-ইঙ্গিত কবি দিয়েছেন, আজকের পাঠককে হয়তো সেটা তত আকর্ষণ করবে না কিন্তু সমগ্র কাহিনীর মধ্যে যে একটি আত্মগত ভাব ফুটে উঠেছে, সেটা আধুনিক বাংলা কাব্যের সাধারণ প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত এবং এজন্যই একালের পাঠকের অনুকূলতা লাভ করবে।

সেকালের কাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন দেশাত্মবোধক এবং যুদ্ধবর্ণনামূলক বিষয়ই কবিদের ছিল উপজীব্য। তখন কবিরা নিভৃতচিত্তে নিজের কথা কিছু বলতেন না। মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতি মহাকবি এবং তাঁদের অগণিত অনুগামীদের কথা মনে রাখলে রবীন্দ্রনাথের কথার সার্থকতা বোঝা যায়। এইরকম আবহাওয়ায় আত্মগত চিত্তে কাব্য রচনা করা কম সাহসের কাজ নয়। আত্মগত কাব্য যে রচিত হয় নি তা নয়, তার প্রতি পাঠকরুচি তত প্রখর ছিল না; দ্বিতীয়ত আত্মগত কাব্য লেখা হলেও সে-কাব্য নাটকীয়তায় ও শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাসে কিছু কৃত্রিম হয়ে পড়ত, তাতে সন্দেহ নেই। নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী'র কবিতাগুলি ছিল এই দ্বিতীয় ধরনের। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার সম্বন্ধে সেকালে কিছু প্রশস্তিপূর্ণ মন্তব্য করেন নি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে বস্তুবর্ণনামূলক রীতির সঙ্গে আত্মগত ভাবপূর্ণ রীতির সমন্বয় করেছিলেন। তাঁর সমগ্র স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যখানাই কবিকাহিনী ছাড়া কিছু নয়। কবি কী ভাবে মনোরাজ্যে গিয়ে কল্পনার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন, বিষাদপুরে এবং রসাতলে নানা শত্রুর মধ্যে দিয়ে কল্পনাকে লাভ করবার জন্য ক্লেশ স্বীকার করলেন; সেখানে বীর এবং ভয়ানক রসের যুদ্ধ দেখে কবির মনে বৈরাগ্যের উদয়

হল এবং পরিশেষে কল্পনাকে লাভ করলেন—এই কাহিনী কবির কাব্যধর্মের ঘোষণা ছাড়া কিছু নয়। এদিক দিয়ে বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্যের প্রকৃতির সঙ্গে তার মিল আছে। নিজের কাব্যের আদর্শের এমন অকুণ্ঠ ঘোষণা বাংলা কাব্যে কমই আছে। এই আত্মময়তা সেকালের সাধারণ কাব্যলক্ষণের মধ্যে কিছু অসাধারণ সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নপ্রয়াণ সম্বন্ধে বলেছেন: 'বড়দাদার স্বপ্নপ্রয়াণের আমি ছিলুম ভক্ত, কিন্তু তাঁর বিশেষ কবিপ্রকৃতির সঙ্গে আমার বোধ হয় মিল ছিল না।' ভক্ত হওয়ার অন্যান্য নানা কারণের মধ্যে এই লিরিক গুণটিও অন্যতম ছিল নিশ্চয়ই।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল ছিল না কোন দিক দিয়ে, সেটাও বিচার্য। বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ যে একটা সুস্পষ্ট কাহিনী, ঘটনার ধারাবাহিকতা, বিচিত্র রসের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন—সেটা রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতি ছিল না। এদিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিদের মতোই সর্বজনবোধ্য বক্তব্য দিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের সংশয়াতীত সাফল্যের কারণ, ঘটনাকে তিনি নিছক ছন্দোবদ্ধ বিবরণমাত্রে পর্যবসিত করেন নি। বর্ণনার প্রতি পর্যায়েই কবিব্যক্তিত্ব এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে তাতে বাংলা কাব্য-স্টাইলের একটা পূর্ণ রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সেকালের কাব্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষাতেও বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি নিজেও বলতেন খাঁটি বাংলা ভাষা লিখতেই তিনি সব সময় চাইতেন। তখনকার ভাষা গড়ে উঠেছিল সংস্কৃত এবং ইংরেজি রীতিকে আশ্রয় করে। পরে বাংলা ভাষার যে-ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে গিয়েছে, 'খাঁটি বাংলা' প্রায় 'ট্যাবু' হয়েছে কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের সময়ে তিনি ভাষাকে কৃত্রিমতাবর্জিত স্বাভাবিক জীবন্ত রূপ দিতে চেয়েছেন। ফলে তাঁর কাব্যভাষায় বস্তুত কাব্যিয়ানা ছিল না—সাধু-চলতি সব শব্দই অবলীলাক্রমে যেন রসের পংক্তিভোজনে বসে গিয়েছে। কবি নির্বিকারভাবে চোখে-দেখা ছবি এঁকে গিয়েছেন, তথাকথিত 'কাব্যে'র ভাষা হল কিনা ভাবেন নি:

ঈরিষা-বড়াই নামে দুই বুড়ি,
নড়ি-হাতে প্রমদার নিকটে আসিয়া গুড়ি-গুড়ি
সমুখা-সমুখি
দাঁড়াইল ঝুঁকি
নেত্রানলে ঘোমটার অন্ধকার ফুঁড়ি!　　রসাতলপ্রয়াণ। ৮০॥

নানা রকমের চিত্র-রচনা করায় কবির দক্ষতার তুলনা নাই। ভাষা তাঁর দাসত্ব করেছে বলা যায়। লৌকিক ভাষা দিয়ে তিনি এই সব ছবি এঁকেছিলেন বলে তাঁর কাব্যের আগাগোড়াই বাস্তবতাব সুর নিঃসন্দিগ্ধ। এই দৈনন্দিন ব্যবহারিক ভাষা দিয়ে তিনি স্বপ্নজগৎ তৈরি করেছেন বলেই পাঠকের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। স্বপ্ন আর বাস্তব, আলো আর ছায়া, দিন আর রাত এ-কাব্যে একসঙ্গে মিশে আছে। তৎকালপ্রচলিত কাব্যভাষাকে দ্বিজেন্দ্রনাথ যেভাবে রূপান্তরিত করেছিলেন, তাতে শুধু সেকালের নয়, সব কালের পাঠকের রসের ভাণ্ডারই পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই রস বিশেষ যুগ বা কালের উপলক্ষকে মাত্র অবলম্বন করে নেই। এই রস সব কালের উপভোগ্য, এর চিত্র সব কালেই প্রত্যক্ষগোচর। সতীশচন্দ্র রায় বলেছিলেন: 'স্বপ্নপ্রয়াণের লেখায় পদে পদে বিস্ময়ের আবির্ভাব, কথায় কথায় অপ্রত্যাশিত অভাবিতপূর্ণ অথচ চিরপরিচিত চিত্ররাজি। ভাষা চোখেই পড়ে না, চিত্রই জাগিয়া উঠে। যেখানে বা চিত্র নাই, সেখানেও ভাষার একটি অবলীলাকৃত সজীব ভঙ্গিতে পাঠকের মন উদ্যত হইয়া থাকে।'

সতীশচন্দ্রের এই মন্তব্যের মধ্যে স্বপ্নপ্রয়াণের সর্বপ্রধান সাফল্যের কারণটি নিহিত। এই চিত্রগুণ এবং ভাষার সজীবতার জন্যই স্বপ্নপ্রয়াণের রসসৌন্দর্য আজও অম্লান।

সম্প্রতি স্বপ্নপ্রয়াণ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। পুনর্মুদ্রণ খুবই দরকার ছিল। এ-কাব্যটিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত বইয়ের অন্যতমরূপে গণ্য না করে রসাস্বাদনের কাব্য হিসাবে নতুন করে এ যুগের পাঠকের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আধুনিক রসিক সমালোচকের দৃষ্টি এই বইটির উপরে পড়েছে এবং শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করেছে। সতীশচন্দ্র রায়ের সমালোচনাটি যথার্থ রসের আলোচনা, প্রিয়নাথ সেনের অসম্পূর্ণ প্রবন্ধটিতে স্বপ্নপ্রয়াণের তথ্যগত আলোচনা আছে। প্রিয়নাথ সেন 'ফেয়ারি কুইন' 'পিলগ্রিমস প্রগেস' প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করে এর কাব্যোৎকর্ষ আলোচনা করেছিলেন। দুটি আলোচনাই বর্তমানে কিঞ্চিৎ দুষ্প্রাপ্য। সেইজন্য আলোচনা-দুটি বর্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টে দেওয়ায় রসগ্রহণে সহায়তাই হয়েছে। 'প্রকৃত আইডিয়ালিস্টের প্রতিকৃতি' নামে সতীশচন্দ্রের আর-একটি অনতিদীর্ঘ রচনা দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখক-প্রতিকৃতিকে উজ্জ্বল করেছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণের বিশ্লেষণ করেছেন সুকুমার সেন তাঁর

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। এ ছাড়া আরও দুজন রসিক লেখক ইদানীং স্বপ্নপ্রয়াণের উৎকৃষ্ট আলোচনা করেছেন। প্রমথনাথ বিশী স্বপ্নপ্রয়াণের তুলনা-প্রসঙ্গে ডিভাইন কমেডির অবতারণা করে এই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নতুন করে আকর্ষণ করেছেন। কানাই সামন্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের কথা। কানাইবাবুর আলোচনাটি সতীশচন্দ্র রায়ের মতোই বিশুদ্ধ রসের আলোচনা। এই প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করবার সার্থকতা এই যে এদের দ্বারা স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের কালোত্তীর্ণতা প্রমাণিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু কাব্যকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত থেকে অনিচ্ছুক পাঠক সংগ্রহ করতে হয়, স্বপ্নপ্রয়াণকে শুধু তেমনি করেই পাঠক সংগ্রহ করতে হবে না বলে বিশ্বাস করি। এর ইচ্ছুক পাঠকের অভাব হবে না। চারটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা বর্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পাঠককে সে-বিষয়ে সংশয়মুক্ত করেছে। পুস্তকটির প্রচ্ছদলেখা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বহস্তাঙ্কিত।

গোপাল হালদার

বাংলার নবযুগের ভাব-বিচার

"বাঙ্গালী বাংলার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেকানন্দ পর্যন্ত বাংলার শ্রেষ্ঠতম মনীষিগণ বাংলার যে চিন্তা ও ভাবকে তিলে তিলে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আজিকার বাঙ্গালী যুবকেরা কেবল নহেন অনেক বৃদ্ধরা পর্যন্ত সে বাংলাকে চেনেন না।"... কথাগুলি এই বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা সংবাদপত্রের বলে মনে হতে পারে। ভাব সেরূপই, কিন্তু চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের সঙ্গে আরও সাংবাদিক 'কাব্যি' ভাষা ও উচ্ছ্বাস তাহলে থাকা উচিত। তার পরিবর্তে দেখছি সাধু ভাষার পদ, সংহত ভাবাবেগ, আর ভাব-ও-ভাষার পরিচ্ছন্ন প্রাঞ্জল রূপ আজ যা প্রায় বিস্মৃত, হাল আমলের বাংলা ভাষারীতির নতুন বিলাসে যা বিপর্যস্ত। চল্লিশ বৎসর পূর্বে ১৩২৮-১৩৩১ সালে 'বঙ্গবাণী' মাসিকপত্রে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল 'নবযুগের বাংলা'র কথা ধারাবাহিক আলোচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন এইভাবে ও এই ভাষায়। উপরের বাক্য দুটি তাঁরই। বাংলা আলোচনার ভাষা এক অর্থে বঙ্কিম সৃষ্টি করেছিলেন; তার চেয়ে স্বচ্ছতর ভাষা আর কেউ সৃষ্টি করতে পারেন নি। সে ধারাই পূর্বেকার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারেরা মেনে নিয়েছিলেন,—বিপিনচন্দ্রও তার বাহক। এ-কালেও দু-একজন লেখকের আলোচনায় যে সেরূপ প্রাঞ্জলতা না আছে, তা নয়। যুক্তি ও ভাবের সেরূপ সুস্থ মিলনও দেখা যায় দু-একজনার লেখায়। তাঁরা হয়তো অনেকেই লেখায় চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। কারণ, ভাষার প্রাঞ্জলতা ক্রিয়াপদের সাধু বা চলিত রূপের উপর নির্ভর করে না। তা কতকটা মনের ধর্ম। চিন্তার সেই সুনিশ্চয়তা ও ভাষার এই স্বচ্ছতা এক ধরনের পরিমার্জিত (ডিসিপ্লিন) শিষ্ট মনের বিশিষ্ট গুণ। সে মন হয়তো

১। **নবযুগের বাংলা** (২য় সংস্করণ, আগস্ট, ১৯৬৪ ইং, পৃ. ২৯৯ + ১৺)। সাত টাকা।
২। **সত্তর বৎসর** (আত্মজীবনী' পৃ. ২৬৯ + ।/০)। সাত টাকা।
৩। *Saint Bijoy Krishna Goswami* (পৃ. ১০৬)। চার টাকা।
লেখক—বিপিনচন্দ্র পাল। প্রকাশক—বিপিনচন্দ্র পাল পরিষদ্।

বাংলাদেশে এখনো আছে। বাঙালির মানসিক চর্চা এখন হয়তো আরও বহুদিকে এগিয়ে যাচ্ছে—ইকনমিক্‌স্‌-পলিটিক্‌স্‌ থেকে স্পোর্টস্‌-ও-ফিল্মী আলোচনায় তা উৎসাহী। কিন্তু সে আলোচনায় দুর্লভ আজ চিন্তার সুস্থিরতা আর ভাষার স্বচ্ছতা। অর্থাৎ সে মন থাকলেও সে মন এখন স্বধর্মচ্যুত। চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষায় একটা চাকচিক্য এসেছে ; একটা চিক্কণতাও এখন তাতে দেখা যায়। কিন্তু বাংলা আলোচনার ভাষা তার সহজ ধর্মকে খুইয়েছে, বিপিনচন্দ্রের বাংলা লেখা পড়তে-পড়তে বারে-বারে তা মনে হয়। আর, বারে-বারে এই প্রশ্নও মনে জেগেছে—এ-যুগের চর্যা বহুমুখী হতে বাধ্য, কিন্তু এমন অকালেই কেন আমরা বাংলার নবযুগের সেই প্রধান গুণটিও হারিয়ে ফেললাম ?

যুক্তি ও ভাবের এবং ভাষার অমন মিলন যাতে সম্ভব হয়েছিল সে তো শুধু বাইরের একটা প্রসাধন নয়, মনেরই একটা বিশেষ বিকাশ, বাঙালি আত্মার আত্মপরিচয়। তাই যেই পড়ি 'বাঙ্গালী বাংলার কথা ভুলিয়া গিয়াছে', তখনি এই কথায় যেন আমাদের আজকের সর্বব্যাপী খেদের পূর্বধ্বনি শুনতে পাই। আর তারপরেই ভাবতে হয় ১৯২১-২৪-এ চল্লিশ বৎসর পূর্বেও কি এ কথা এমন সত্য ছিল! উত্তরে মনে হয়—সত্য ছিল, কিন্তু এরূপভাবে সত্য ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর (১৯১৮) থেকেই বাঙালির জীবনসংকট দেখা দিয়েছিল। বিপিনচন্দ্রও তা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু তার বিশ্লেষণ করেন নি। অন্তত এসব গ্রন্থে করেন নি, 'ইংলিশম্যান' প্রভৃতি ইংরেজি সাময়িক পত্রের প্রবন্ধে সেরূপ চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে পড়ছে। কিন্তু 'বঙ্গবাণী'র প্রবন্ধ বা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁর 'সত্তর বৎসরে'র আলোচ্য কাল যে-নবযুগ তা 'রামমোহন থেকে আরম্ভ করে বিবেকানন্দ পর্যন্ত' বিস্তৃত। আরও সহজ ভাষায় বলতে পারি তাঁর আলোচ্য উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। অবশ্য আরও পরীক্ষা করলে দেখতে পাব সে-শতাব্দীর সর্বদিক নয়, প্রধান কয়েকটি দিকই ছিল বিপিনচন্দ্রের আলোচ্য।

বিপিনচন্দ্র স্বয়ং যখন এ নবযুগের উত্তরসাধক আর সে-বাংলার প্রধান এক নির্মাতা, তখনকার কথা (১৮৯৫-১৯২০) এসব গ্রন্থে তিনি উদ্‌ঘাটিত করে যান নি—সে ভার রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন পরবর্তীদের জন্য। এখনো সে পর্ব প্রায় অবহেলিত। বিংশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলার ইতিহাস হয়তো লেখা এখনো সহজ নয়—স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার দানও সরকারী

দৃষ্টিতে এখন অনুচ্চার্য। আর 'স্বদেশী যুগ' তো রাজনৈতিক যুগ নয়, একটা সাংস্কৃতিক-সামাজিক উজ্জীবনের যুগও। তার তথ্য অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় বিন্যস্ত। সে-সব সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কে করে? বিপিনচন্দ্র সে যুগের প্রধান এক পুরুষ—'লাল-বাল-পালের' মধ্যেও একাধারে বাগ্মী, সুলেখক, মনীষী, জননায়ক বোধ হয় অন্য কেউ তখন ছিলেন না। বিপিনচন্দ্রকে সম্পূর্ণ করে দেখতে হলে নবযুগের এই পরার্ধের অন্যতম নির্মাতারূপেই দেখতে হবে। আর এই পরার্ধও পূর্বার্ধের পরিণতি, যে পূর্বার্ধের কথা বিপিনচন্দ্রের এসব গ্রন্থে আলোচ্য। এ-পর্বটি এখন আর তত অবজ্ঞাত নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা আজ অনেকের বিশেষ জিজ্ঞাসার বিষয়। বিপিনচন্দ্রের শতবার্ষিক জন্মদিবসের স্মরণে প্রকাশিত ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থমালা তার প্রমাণ। *Studies in Bengali Renaissance* বিশেষ প্রশংসনীয়। 'যুগযাত্রী প্রকাশক' ও বিপিনচন্দ্র পাল ইন্‌স্টিটিউটের প্রকাশিত এইসব গ্রন্থেরও এক মৌলিক মর্যাদা আছে। যেমন, মর্যাদা আছে রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বা তাঁদের আত্মকথা, সুরেন্দ্রনাথের *Nation in Making*, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখদের 'জীবনস্মৃতি' প্রভৃতি রচনার। কিংবা সাধারণভাবে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের।

'নবযুগের বাংলা' যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলার ভাব-জগতের এক প্রামাণিক আলোচনা, 'সত্তর বৎসর' এক হিসাবে তেমনি তার পরিপূরক সেই দ্বিতীয়ার্ধের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের, গ্রাম্য জীবনের, লোক-জীবনের ও ভদ্র জীবনযাত্রার এক কৌতূহলোদ্দীপক মূল্যবান চিত্র। অন্তত সে সময়কার পূর্ববাংলার ও কলকাতার ছাত্রজীবনের এমন সুপাঠ্য বই আর আছে বলে আমরা জানি না।

ইংরেজিতে লেখা এই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবন-কথাও এক হিসাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যে-নবযুগ যুক্তিপ্রবণতাকে প্রধান পাথেয় করে আরম্ভ হয়েছিল হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উদ্দীপনায় (১৮১৮), সে যে শতাব্দীর শেষ পাদে ক্রমেই অধ্যাত্মবাদিতার স্রোতে ভেসে গিয়ে মধ্যযুগীয় অলৌকিকতায় ও গতানুগতিক রহস্যবাদিতায় কেমন করে পাক খাচ্ছিল, বিপিনচন্দ্রের লিখিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী-খণ্ডে তার আভাস আমরা পাই। বিপিনচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য, তিনি নিজেও কম অধ্যাত্মরসজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণকে আশ্রয় করে মধ্যযুগীয় মনোভাবের এই পুনরুদ্ভবে তিনি

শঙ্কিত বোধ করছিলেন। কারণ, শত সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্র স্বাধীনতা ও যুক্তিবাদ এবং মানবতা ছাড়তে কিছুতেই স্বীকৃত নন।

বিপিনচন্দ্রের বিচারে—নবযুগের বাংলার শুধু নয়—বাঙালি জাতিরই ঐতিহাসিক প্রকৃতি হল স্বাধীনতা ও মানবতা। ইংরেজের সম্পর্কে এসে যুক্তিবাদিতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মন্ত্রলাভ করে নবযুগের বাংলা সে ধর্মেই স্বপ্রকাশিত হয়। এই বাঙালি প্রকৃতির প্রকাশের নানা স্তর ও দিকের নির্দেশ বিপিনচন্দ্র দিতে চেয়েছেন তাঁর 'বঙ্গবাণীর' লেখায়—প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে (১৯২১-২৪-এ) যখন গান্ধীজীর সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের তাগিদে বাঙালি তার বিশিষ্ট ধর্মকে চেপে যেতেও কুণ্ঠিত হচ্ছিল না। বিপিনচন্দ্র বুঝেছিলেন—ভারতীয় জাতীয়তা ও বাঙালির জাতীয় বৈশিষ্ট্যে কোনো বিরোধের কারণ নেই। কারণ, 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই' হচ্ছে ভারতীয় জাতীয়তার মূল প্রাণসূত্র। আর বাঙালির মূল প্রকৃতি হল স্বাধীনতাপন্থী ও মানবতাপন্থী। অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয়তা কেন, বাঙালি প্রকৃতি বিশ্বমানবতারও সাধক। আরও চল্লিশ বৎসর পরে (১৯৬৪-৬৫) আমরা বুঝছি—সেই 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' ভারতীয় জাতীয়তাকে অখণ্ড রাখতে পারল না। ভারতবর্ষ দু-রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে গিয়েছে। তারপরে, বর্তমান ভারতরাষ্ট্রের মধ্যেও ভারতীয় অখণ্ডতা ও বাঙালি বৈশিষ্ট্য (বা তামিল বৈশিষ্ট্য) প্রভৃতির বিরোধ মিটে যায় নি। বরং বিপিনচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের ধ্যানদৃষ্ট 'ভারত-আত্মা' ও 'বাঙালি প্রকৃতি' যে কতটা আপেক্ষিক সত্য, সীমাবদ্ধ সত্য এবং কী পরিমাণে তাই কাল্পনিক, এখনকার দিনের বাঙালি ও ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের তা একটা প্রধান বিচার্য বিষয়। কারণ, ১৯৪৭-এর পরে আর সেই 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের' সাধনার অবশ্যম্ভাবী সাফল্যে অত নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে পারা যায় না। বিশ্বাস করব কি করে? নবযুগের বাংলার সাধনা যদি সম্পূর্ণ সত্য হত তাহলে কেন এমন সহজে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের বিরোধীরা ১৯৪৭-এ বাংলার দ্বিখণ্ডীকরণের পক্ষপাতী হয়ে উঠলেন? বিপিনচন্দ্র বাঙালি প্রকৃতি বলে যা উপলব্ধি করেছিলেন তা কি মুসলমান বাঙালিদের সম্বন্ধেও সত্য? হিন্দু বাঙালির পক্ষেই বা তা কতখানি সত্য?

আসল কথা, নবযুগের যে-ধারণা মোটামুটি একদিন আমাদের সকলের নিকট গ্রাহ্য ছিল, আজ তাই আমাদের অনেকের নিকট অগ্রাহ্য না হয়ে পারে না। অবশ্য ঊনবিংশ শতক জুড়ে বাঙালি সমাজে একটা জাগরণের

চাঞ্চল্য দেখা যায় তাতে সন্দেহ নেই। এমনকি, আমরা মনে করি এত অল্পকালের মধ্যে, একটি বিশেষ অঞ্চলে, ভারতবর্ষের সাড়ে তিন হাজার বৎসরের ইতিহাসেও এত বেশি সংখ্যক অসাধারণ মানুষের আবির্ভাব আর কোনোদিন ঘটে নি। কিন্তু কী এই জাগরণের স্বরূপ? ইংরেজিতে দেশী-বিদেশী অনেকই তাঁকে বলেছেন 'বেঙ্গল রিনাইসেন্স'; অথবা সমগ্রভাবে ভারতবর্ষকে ধরে, 'ইণ্ডিয়ান রিনাইসেন্স'। আমরা অবশ্য ইংরেজিতে একে রিনাইসেন্স বলতে আপত্তি দেখি না। কিন্তু কোনো-কোনো সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতের তাতে আপত্তি—রিনাইসেন্স বলতে (ইয়োরোপে) যা বোঝায়, আমাদের এই জাগরণের মধ্যে সেই বাস্তবচেতনা ও বিজ্ঞানবুদ্ধির বিশেষ অভাব দেখা যায়। নিশ্চয়ই এ অভাব সত্য ও গুরুতর। কিন্তু য়ুরোপেও রিনাইসেন্স সব দেশে এক রূপ গ্রহণ করে নি। একই পরিণতিও লাভ করে নি। পৃথিবীর সব দেশে সব কালে সকল মানবসমাজের জাগরণ সর্বাংশে একই রূপ পরিগ্রহ করবে, এমন কথা হাস্যকর। তা বলে কি বিভিন্ন দেশের অনেক জাগরণকে রিনাইসেন্স বলা হয় না! ইংরেজিতেও বহু দেশের এরূপ জাগরণের সম্বন্ধে তুলনামূলক বই আছে যার নাম "রিনাইসেন্স অ্যাণ্ড দি রিনাইসেন্সেস্'। কাজেই শব্দের বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। শব্দটার সাধারণ স্বীকৃত অর্থেই আমরা বলতে পারি—'বেঙ্গল রিনাইসেন্স' বা 'ইণ্ডিয়ান রিনাইসেন্স' আপত্তি হলে ইংরেজিতে 'অ্যাওয়েকেনিং' বা ওরূপ কিছু বলতেও আমাদের আপত্তি নেই। কারণ অর্থটাই আসল কথা। আর, কিছু তো বলব—বাংলার সেই সাধারণের সামগ্রিক প্রয়াসকে। জিনিসটা তো মিথ্যা নয়। সেজন্যই বাংলায়ও আমরা 'নবযুগ' 'জাগরণের যুগ' 'উজ্জীবনের যুগ' প্রভৃতি যে-শব্দই প্রয়োগ করি অর্থ তার পরিষ্কার বোঝাবে সেই বিশেষ বিষয় বা আলোড়ন। যে-নামই তার দিই—একটা বিশেষ জীবন-চাঞ্চল্য যে জেগেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু সে জাগরণের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধেও এখন আমরা আর সচেতন না হয়ে পারি না। কারণ, তার প্রধান ত্রুটিগুলো তো আজ প্রত্যক্ষ—প্রথমত, গোড়াতেই গলদ—পরাধীন দেশে, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক আওতায়, কোনো সত্যকার জাগরণই স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে নি। এ কথা ঠিক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অচেতনভাবেই এই ঐতিহাসিক বিকাশের সহায় হয়েছে। কিন্তু সচেতনভাবে তা আবার সেই ঐতিহাসিক বিকাশের

পথরোধও করেছে। ফলে স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয় নি—বিকাশ হয়েছে খর্বিত, বক্রগতি, অবরুদ্ধগতিতে বিক্ষুব্ধ, আবেগতাড়িত, কোনো-কোনো দিকে ছিন্নমূল, ইত্যাদি। কি বিস্তারের দিক থেকে কি গভীরতার দিক থেকে, অর্থাৎ কোয়ান্টিটেটিভ্‌লি ও কোয়ালিটেটিভ্‌লি, দু-ভাবেই এরূপ জাগরণ সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য।

অন্তত সংক্ষেপেও সে অভাবসমূহ গোণা যায়। যেমন, বিস্তৃতির দিক থেকে এ জাগরণ ছিল মুষ্টিমেয় ইংরেজি-শিক্ষিতের জাগরণ, - শুধুই যারা হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর, মুখ্যত যে-শ্রেণী অর্ধসামন্ত জমিদারী ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত, ব্যবসায়ে-বাণিজ্যে যাদের স্বার্থ নেই, বরং বিরাগ আছে, জীবনের বাস্তব সত্যের অনেক দিকেই যাদের আগ্রহ তাই সামান্য এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিও যাদের তাই সাধারণত খর্বিত থাকত। তা যে এ জাগরণ একেবারে খর্বিত হয় নি, অক্ষয়কুমার দত্ত, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতির মতো লোকও জন্মেছেন তা'ই বরং আশ্চর্য বিষয়। তা'ই প্রমাণ যে, জাগরণটা বহুপরিমাণে অন্তর্মুখী ও আবেগবহুল হতে বাধ্য হয়েও একেবারে অন্তঃসারশূন্য হয় নি। বাঙালি ভদ্রশ্রেণীর দ্বিধাত্মক ভূমিকার কথা এতই সুবিদিত যে, তার বিশদ আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। বিশেষ করে স্মরণীয়—এই নবযুগ বাংলার জনসাধারণের জীবন থেকে উত্থিত হয় নি। সেই নবজাগরণে উদ্‌বুদ্ধ ভদ্রলোকেরা জনগণকে সবল করতেও চেষ্টা করে নি। অবশ্য পরোক্ষে যে এই শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণী অনেক বিষয়ে জনসাধারণের মুখপাত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল (বিপিনচন্দ্রও তা মনে করতেন) তা মিথ্যা নয়—প্রধানত সেদিকটা হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামের দিক। যতই খণ্ডিত হোক, মোটামুটি ভদ্রশ্রেণীর এই প্রগতিমূলক ভূমিকাটুকুও স্বীকার্য। অবশ্য এই ঔপনিবেশিক সীমাবদ্ধতা থেকেই এই নবযুগের অগভীরতার বা গুণগত সংকীর্ণতার কথাও স্পষ্ট—অর্থাৎ জীবননিষ্ঠার অপেক্ষা পারমার্থিকতার ঝোঁক, বৈজ্ঞানিক ও সুস্থ পার্থিব উন্নতির অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতার উন্মাদনা ও আবেগবহুল রহস্যবাদিতার প্রবণতা ইত্যাদি।

ঔপনিবেশিকতারই ফল এই সংকীর্ণতা ও বক্রগতি। কিন্তু ঔপনিবেশিকতা যে আরেকটি গোড়ার গলদকে আশ্রয় করে ও বাড়িয়ে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল, তার স্বতন্ত্র উল্লেখ তথাপি প্রয়োজন। তা হচ্ছে এই—বাঙালি সংখ্যায় বেশির ভাগই মুসলমান। অথচ এই মুসলমান ও হিন্দুতে যতই 'সহাবস্থান' থাক, একাত্মতা

পূর্বেও সম্পূর্ণ হয় নি। মুসলমান বাঙালি মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতিতেও প্রায় বাইরের মানুষ থেকে গিয়েছে। 'নবযুগে' (ওহাবি আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাবে) বরং বাঙালি মুসলমান আরও দূরে সরে যাচ্ছিল। আর অন্য দিকে নবযুগও গোড়া থেকেই হিন্দু ভদ্রলোকের নেতৃত্বে হয়ে উঠছিল হিন্দুত্বের নবযুগ। অর্থাৎ এই নবযুগের বাংলা না-জেনে ১৯৪৭-এর দ্বিখণ্ডিত বাংলারও অঙ্কুরকে জলসেচনে পুষ্ট করে চলে। তাহলে বাঙালি সংস্কৃতি কতজনের সংস্কৃতি? আর নবযুগের বাংলাই বা কয়জনের বাংলা?

আজ থেকে চল্লিশ বৎসর পূর্বে বাঙালি জাগরণের এই সীমাবদ্ধতার কথা অনুভব করা যাচ্ছিল। কিন্তু তা যে প্রধান সত্য হয়ে উঠবে, এমন কথা না ভেবেও তখন থাকা যেত। অনুভব বিপিনচন্দ্রও করেছিলেন। 'সেই গোড়ার কথা, বেঁচে থাকলে আলোচনা করবেন, সে আশাও 'নবযুগের বাংলা'য় তিনি জানিয়েছেন, কিন্তু তা আর করতে পারেন নি। তাঁর কালে সে আলোচনা সুসাধ্যও হত না, বিপিনচন্দ্রের মূল দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও তা মনে হয়। তিনি এত বড় মনীষী, তবু নবযুগের সমস্ত আলোচনা পরিচালনা করেছেন বাঙালি-জীবনের আর্থিক-সামাজিক সমস্ত বিন্যাসকে একেবারেই গণনার বাইরে রেখে। শ্রেণী-সম্পর্কের তো কথাই নেই, সাধারণ বাস্তব তথ্যকেও তাঁরা তখন মূল্য দিতেন না। মনে করেছিলেন ভাব-জগতের তথ্য, বাঙালির মধ্যযুগের ভাবনার ধারা ও তার ঐতিহ্য দিয়েই বাঙালি প্রকৃতি গঠিত। সমাজের কোন্ স্তরে সেই ভাবনা-উদ্ভূত, হিন্দু-মুসলমান কতজন বাঙালি সেই ভাবনার অংশীদার, তাও বিশেষ অনুসন্ধান করেন নি। ধরেই নিয়েছেন ইংরেজি সভ্যতার স্পর্শে সেই বাঙালি প্রকৃতি জাগ্রত হয়েছে। আর ভাব-জগতের সেই আলোড়নেই এ-যুগের বাঙালির বাস্তব জীবন, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

সমস্ত আলোচনা-পদ্ধতিটাই চল্লিশ বৎসর পূর্বে ছিল ভাববাদী—নবযুগের সেই বস্তুবিমুখতার জের টেনে চলতে অভ্যস্ত। অবশ্য বিপিনচন্দ্র ডায়ালেকটিকস-এ বিশ্বাসী। পূর্বাপরই ভাবনার সঙ্গে ভাবনার দ্বন্দ্ব, থিসিস অ্যান্টিথিসিস-এর বিরোধের মধ্য দিয়ে সমন্বয়ের (সিন্থেসিস-এর) উদ্ভব দেখাতেও তিনি অভ্যস্ত। এই ডায়ালেকটিকাল ভাববাদ এক হিসাবে তিনি বাংলায় সুপ্রচলিত করেন, আর সমন্বয় শব্দটিকেও বিশেষ ভাবে চালু করেন। অবশ্য সমন্বয় বলতে তিনি (সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দও) বৈপ্লবিক পরিবর্তন বোঝাতেন না,

বোঝাতেন একটা আপোষ-রফা, মীমাংসা, কোনোরকমের মিল খাওয়ানো। এমনকি তালগোল পাকানো। আমরা 'পূর্ব ও পশ্চিমের যে সমন্বয়' করেছি বলে সর্বদা বলা হয়, সত্যসত্যই তা তালগোল পাকানো ছাড়া আর কি ?

চল্লিশ বৎসর পূর্বে এরূপ দ্বান্দ্বিক ভাববাদের দৃষ্টিতে ইতিহাস আলোচনাও এ দেশের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বিপিনচন্দ্রের মতো চিন্তাশীল বহুমুখী মনীষী সেদিন বোধ হয় দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। নবযুগের বাংলার সম্বন্ধে তাঁর মতো এমন সার্থক আলোচনাও তখন আর বেশি কেউ করেন নি। আপন পাণ্ডিত্যে ও অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি বাংলার ভাব-জগতের মূল প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করে দেখাতে চেষ্টা করেন—প্রথমত বাঙালি হিন্দুর দায়ভাগের ব্যবস্থায় আছে ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বীকৃতি,—তন্ত্রের মতো ধর্ম সাধনে, বাঙালির ধর্ম সিদ্ধান্তে, মতবাদে, সামাজিক আচার-ব্যবহারেও আছে একটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়ত, বাঙালির সনাতন সাধনার বিশেষত্ব তার মানবতার সাধনা, বিশেষ করে বাঙালি বৈষ্ণব তত্ত্বই তার প্রমাণ—

'কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার সহায়।'

স্বাধীনতা ও মানবতা, বাঙালি প্রকৃতিতে এই দুই প্রবণতা অজ্ঞাত নয়, তা স্বীকার্য ; আর এই আবিষ্কারে বিপিনচন্দ্রের স্বকীয়তাও স্বীকার্য। কিন্তু একটি আংশিক (হিন্দু সমাজের বিশেষ অংশে সীমাবদ্ধ) ও আপেক্ষিক সত্যকেই বাঙালির মূল প্রকৃতি বলে ধরা সমীচীন নয়। যাই হোক—বিপিনচন্দ্রের বক্তব্য,—এর পরেই নবযুগের সূত্রপাত। যথা, এক, যুগপ্রবর্তক রামমোহনের মধ্যে এই স্বাধীনতার ও মানবতার চেতনার বিকাশ ও সেই বাঙালি সাধনার সঙ্গে বিভিন্ন ধারার (য়ুরোপীয় মানব-সাম্যের) সম্মেলন ও সমন্বয় (নবযুগের বাংলা দ্বিঃ কথা ৬।৭)। দুই, ইংরেজি শিক্ষার প্রথম ফল—যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রসার। কিন্তু য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের অপূর্ণতাকে শোধন করে নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ ও দেবেন্দ্রনাথ জীবনে ও চরিত্রে যখন স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করলেন তখন থেকেই নবযুগের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলল। বিপিনচন্দ্রের মতে সেই প্রবাহেই স্বাধীনতার নূতন নূতন আহ্বান নিয়ে (দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ?) আসেন মুখ্যত ব্রাহ্মসমাজ—দেবেন্দ্রনাথের

পিছনে কেশবচন্দ্র, কেশবচন্দ্রের পিছনে শিবনাথ শাস্ত্রী-আনন্দমোহন বসু চালিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। তাতে ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও স্বাধীনতার প্রেরণা প্রবল হয়ে ওঠে। মনে হয়, বিপিনচন্দ্রের বিচারে স্বাধীনতার প্রেরণাতেই তার শ্রেষ্ঠ দান নবযুগের চেতনার স্বাভাবিক পরিণতি—রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রচেষ্টা। রিনাইসেন্স পরাধীন দেশে শুধু সাংস্কৃতিক জাগরণ নয়; শুধু ধর্ম ও সমাজের 'রিফর্মেশনে'ও নয়; রাজনৈতিক আয়োজনেই তার স্বাভাবিক পরিণতি। মুক্তির বুদ্ধিতেই পরাধীনের বুদ্ধিব মুক্তির যথার্থ স্ফুরণ। সে হিসাবে এই নবযুগ হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা থেকে (১৮১৭ খ্রীঃ) আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথকে পেরিয়ে একেবারে (১৯৪৭-এর) স্বাধীনতার ট্রাজি-কমিডি পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত বলে আমরা মনে করি। বিবেকানন্দেই বিপিনচন্দ্র তার শেষ ধরেছেন—যদিও বিবেকানন্দের দান এ গ্রন্থে তিনি আলোচনা করেন নি।

যাই হোক, তাঁর আলোচ্যকাল রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ পর্যন্ত (মোটামুটি তা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ ? কারণ, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাও তাঁর আলোচনা-বহির্ভূত)। এ কালের মধ্যে তিনি মুখ্যত দেখেছেন ব্রাহ্মসমাজের দান—কীর্তি ও ত্রুটী; আর সেই সঙ্গে হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবন, রাজনারায়ণ বসু থেকে হিন্দু জাতীয়তার উন্মেষ, হিন্দুমেলা ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্য দিয়ে সেই জাতীয়তার প্রকাশ; আর নাট্যালয়ে স্বাদেশিকতার প্রচার, তারপর সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের রাষ্ট্রকর্ম—ইংরেজের সঙ্গে মর্মান্তিক বিরোধের সূচনায় বিপিনচন্দ্রের আলোচনা সমাপ্ত। ব্রাহ্ম-সমাজের পূর্ব নেতৃত্ব তখন প্রায় নিঃশেষ, হিন্দু পুনরুজ্জীবনই প্রবল (বিপিনচন্দ্রও তাতে শক্তি সঞ্চার করেছেন)। তাই, সম্ভবত তিনি এ আলোচনায় ব্রাহ্মসমাজের অতীত কথা সংগত রূপেই একটু বেশি করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সে তথ্যগত ব্যাপার। তার চেয়েও বেশি উল্লেখযোগ্য তাঁর আলোচিত বঙ্কিমচন্দ্র-বিষয়ক চারটি অধ্যায় (১০ম—১৩শ কথা) এবং সুরেন্দ্রনাথ-বিষয়ক শেষ অধ্যায় দুটি (১৫শ।১৬শ কথা)। সমাজ ও সাহিত্যের ছাত্রের পক্ষেও বিপিনচন্দ্রের বঙ্কিম আলোচনা অমূল্য জিনিস আর বহুলাংশে সত্য। অন্তত সকলেরই তা পাঠ্য ও বিচার্য। সুরেন্দ্রনাথের কথাও আজ ভুললে সত্যই আমাদেরও দুঃখ না করে উপায় থাকে না—বাঙালি আজ বাঙলার কথা ভুলে গিয়েছে। বিপিনচন্দ্র কখনো সুরেন্দ্রনাথের দলের

লোক ছিলেন না। কিন্তু কী অকৃত্রিম তাঁর শ্রদ্ধা সুরেন্দ্রনাথের প্রতি! কী সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ তাঁর সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রকর্মের বিচার!

এ সব যে-কোনো বিষয়ের জন্যই বিপিনচন্দ্র পালের এই 'নবযুগের বাংলা' চিরদিন প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে গণ্য হবে। তার গোড়ার সীমাবদ্ধতা আমরা দেখেছি; আরও সীমাবদ্ধতাও উল্লেখ করা যেতে পারে—হয়তো করা উচিতও। যথা, ধর্মক্ষেত্রে ও সমাজক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রেরণার বিকাশের প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতে গিয়েই বোধ বিস্মৃত হয়েছেন—স্বাধীনতার যুক্তিবাদী ঐতিহ্যধারাকে। রাজনীতিতে ছাড়া যুক্তিবাদী চিন্তাকে গুরুত্ব দান তিনি করেন নি। সত্যই যদি এই যুক্তিবাদিতা রিনাইসেন্স-সুলভ প্রবলতা লাভ করত তাহলে আমরা পরে 'হিন্দু পুনরুজ্জীবন' পেতাম না; শশধর তর্কচূড়ামণিকে পেতাম না; হিন্দুজাতীয়তাবাদ পেতাম না; আর বিজয়কৃষ্ণ-রামকৃষ্ণাশ্রয়ী মধ্যযুগীয় অলৌকিকতাবাদও পেতাম না,—তারপর আজকের শ্রীশ্রীমাতাজী-বাবাজী ও জ্যোতিষীদের এমন দাপটও দেখতাম না। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে এখন আমরা বিশেষ করে বুঝতে পারি কেন বিপিনচন্দ্রও তাঁর আলোচনায় প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন নবযুগের প্রথম যুক্তিবাদী সাধকদের—হিন্দু কলেজের ইয়ংবেঙ্গলকে। কেন তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সেই যুক্তিবাদী ধারার লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের প্রায় উল্লেখ প্রয়োজন মনে করেন নি। কেন মাইকেল নবযুগের চেতনার এক বিশেষ বিগ্রহ রূপে তাঁর আলোচনার বিষয়ীভূত হয়ে উঠলেন না। (বিপিনচন্দ্র মাইকেলের কাব্যশক্তিকে তুচ্ছ করেন নি; কিন্তু রিনাইসেন্সের প্রকাশ হিসাবে সে কাব্যের ও কবির তাৎপর্য বিপিনচন্দ্র গ্রহণ করতে চান নি)। আরও একটি কথা—ধর্ম ও সমাজগত স্বাধীনতা ও মানবতাই যদি বাঙালি প্রকৃতি হয় তা হলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে তো কারো থেকেই ন্যূন মনে করা যায় না, হিন্দুপুনরুজ্জীবনের ও হিন্দুজাতীয়তার তাঁরাও বিরাট স্তম্ভ। শেষ কথা,—রিনাইসেন্স, বা নবজীবনের একটা শিকড় অতীত সংস্কৃতির উজ্জীবন। তাহলে নিশ্চয়ই স্মরণীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের পুনরাবিষ্কার বাংলার নবযুগের এক প্রধান প্রেরণা হয়ে উঠেছিল—উপনিষদের অনুবাদ, মহাভারতের অনুবাদ প্রভৃতির মতোই প্রিন্সেপ-রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির আবিষ্কারও জাতীয় আত্মবিশ্বাস সঞ্চারে কম সহায়ক হয় নি।

আসলে হয়তো মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল আলোচনা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। তখন কাল তাঁর প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল ; বয়স স্বাস্থ্য ও পারিপার্শ্বিকও সম্ভবত সে সুযোগ তাঁকে দেয় নি। না হলে তাঁর থেকে যোগ্যতর কোনো বাঙালি সেদিন ছিলেন না, যিনি বঙ্কিমের মতোই বাঙলার মৃণ্ময়ী না হোক্, চিন্ময়ী মূর্তিকে স্পষ্ট করে উপলব্ধি করেছিলেন, এবং বয়ঃকনিষ্ঠ বাঙালিকে বাঙলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারতেন। যতটুকু তাঁর থেকে আমরা লাভ করেছি তাতেও এ বিশ্বাসই জন্মে। আর যা লাভ করেছি তার জন্য প্রকাশকদের নিকট সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা বোধ করি। বাঙলার মনন-সাহিত্যে বিপিনচন্দ্র পালের দানের তুলনা নেই—একাধারে তা সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস, দার্শনিক বিচার, আর তৃপ্তিদায়ক সাহিত্য।

অনিল চক্রবর্তী

ইতিহাসের বেসাতি

আজকের এই মুহূর্তে যদি বাংলাসাহিত্যের কোনো পাঠককে জিজ্ঞেস করা যায়, গত পাঁচ বৎসরে কী ধরনের উপন্যাস তিনি বেশি পড়েছেন, তা হলে নিঃসন্দেহে উত্তর পাওয়া যাবে, ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইচ্ছে করে নয়, বাধ্য হয়েই তাঁকে এ বই পড়তে হয়েছে, কেননা পড়তে তাঁকে হবেই এবং সম্প্রতি ঐতিহাসিক উপন্যাস ভিন্ন অন্য কোনো কাহিনীকাব্য প্রায় প্রকাশিত হচ্ছেই না। ঠিক যে-সময়ে শুধু বাংলাদেশ নয়, সমস্ত ভারতবর্ষই সমস্যাজর্জর, তখনই প্রত্যক্ষ সত্যকে পরিহার করে কেন-যে বর্তমানের সাহিত্যিককুল পেছন ফিরে ছায়াচ্ছন্ন ইতিহাসের শরণ নিচ্ছেন তার কারণ খুঁজতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই যে-কথাগুলো মনে হতে পারে তা হচ্ছে এই, প্রথমত সাধারণ পাঠকমাত্রেই জমাট গল্পের পিপাসু, দ্বিতীয়ত, প্রকাশক-লেখক উভয়েই সুযোগসন্ধানী। এ হচ্ছে মোটামুটি বাইরের দিক। লেখক-মনের ভিতরটা খুঁজে দেখলেও হয়তো কিছু গভীরতর তত্ত্বের সন্ধান মিলবে। বর্তমান সময়টা বড় বেশি দ্রুত পরিবর্তনশীল, তার সমস্ত চারিত্রবৈশিষ্ট্যকে কাহিনীর আবরণে ধরে রাখাও হয়তো সম্ভব, কিন্তু সাহিত্যের শেষ কথা তো শুধু একটা দীর্ঘায়িত গল্প নয়, সমাজজীবনের অগোচর তলদেশে যে নিত্যসত্য প্রবহমান তাকে তার স্বরূপে উন্মোচিত করাই সাহিত্যের আসল কর্তব্য। তা কল্যাণকর হতে পারে, না-ও হতে পারে। কিন্তু কোনো কারণেই ঘটনার নিখুঁত রেখাচিত্র যথার্থ সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না। বর্তমান সমাজটাই তাই একটা বিপুল সমস্যা। অসাধারণ চিন্তাশীল কিংবা দূরদ্রষ্টা লেখকের হাতে সে যা তুলে দিতে পারত, নিঃস্তেজ কাহিনীকারের পক্ষে তাকে স্পর্শ করার অধিকারও নেই। বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছে যে-কয়েকটি

১। **লালকেল্লা** —প্রমথনাথ বিশী। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা-১২। চৌদ্দ টাকা।
২। **পৌষ-ফাগুনের পালা**—গজেন্দ্রকুমার মিত্র। বাক্‌-সাহিত্য, কলিকাতা-৯। পনের টাকা।

উপন্যাস, তারা তৎসাময়িক সমস্যাগুলোকে বহন করেও ভারাক্রান্ত নয়, পাঠকরা জানেন, সময় এবং চরিত্র এবং বিন্যস্ত ঘটনাপঞ্জীর সীমাকে অতিক্রম করে তারা কোনো-না কোনো সুদূরবিসারী সত্য কল্পনাকে প্রকাশ করে এসেছে। গল্পের কাঠামোয় সে কল্পনা নেই, চরিত্রের মিছিলে তাকে পাওয়া যায় না। সম্ভবত ব্যাপক এই কল্পনার প্রশ্রয় না পেয়েই আজকের বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসকারেরা সামাজিক উপন্যাস রচনা থেকে বিরত থাকতে চাইছেন।

এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতি আত্যন্তিক মনোযোগটাও আসলে এই কারণেই। সমস্ত সমস্যা বুকে পাথর চাপা দিয়ে অনাদি অতীত সেখানে স্তম্ভিত, যাদের চরণভরে ধরণী একদিন টলমল করে উঠলেও যাদের সমস্ত স্মৃতিই আজ ধূলির মতো দিগন্তে বিলীন, সেখানে কুয়াশায় আবৃত সেই অপরিচিত নায়করা একে একে শরীরী হয়ে উঠছে, ব্যাপারটা যত সুন্দর রহস্যে ঘেরা হোক, তার পরিণতি যে আদৌ বাংলাসাহিত্যের পক্ষে আশাপ্রদ নয় তার প্রমাণ দিচ্ছেন আজকের প্রায় সব ঐতিহাসিক উপন্যাসের খ্যাত-অখ্যাত লেখকরা। একমাত্র রাজসিংহ ভিন্ন আর-একটিও ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন নি, এ কথা তিনি নিজে স্বীকার করেছেন, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তা আর-একবার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। তাহলে ইতিহাসের পটভূমিতে অন্যান্য যেসব উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, সেগুলি কি? সমালোচকরা জানিয়েছেন, ইতিহাসের আশ্রয়ে এবং নিজের সৃষ্টিশীল কল্পনার প্রশ্রয়ে যে-উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেছিলেন, তার নাম রোমান্স। মধ্য বিংশশতকীয় বাংলা উপন্যাসসাহিত্যের সর্বনাশের বীজ বোধ হয় তখনই বঙ্কিমচন্দ্র রোপণ করে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য রাজর্ষি, বৌঠাকুরাণীর হাট রচনাকালে এই রোমান্সধর্মিতাকে পরিহার করে প্রমাণসিদ্ধ ঐতিহাসিকতার ধারা অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন; বৌঠাকুরাণীর হাটের ভূমিকায় তিনি তাঁর অনুসন্ধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণও পেশ করেছেন। কিন্তু তাতে কিছুমাত্র সুফল ফলেছে বলে মনে হয় না। কেননা দীর্ঘকালের ব্যবধানে আবার যখন নূতন করে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার স্রোত প্রবলবেগে বইতে শুরু করল, তখন দেখা গেল, বস্তুত বাংলাদেশের লেখকরা পাণ্ডুবর্ণ ইতিহাসের পটভূমিতে তাদের কাহিনীকে স্থাপন করলেও তা আসলে মনগড়া কতগুলো রোমান্সধর্মী বা রোমাঞ্চকর প্রেমগাথা মাত্র। অথচ অভিমানেরও অবধি নেই।

অতীতকালের দোহাই দিয়ে অস্বাভাবিক, এমনকি অসম্ভব ঘটনার অবতারণা তাঁরা অবলীলায় করেছেন এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন এ যুক্তি দিয়ে যে, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তেমন-তেমন ঘটনা সংঘটিত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

তার প্রমাণ আছে লালকেল্লার দীর্ঘ ভূমিকায়। ঐতিহাসিক এই প্রকাণ্ড উপন্যাসটির লেখক কবি-সমালোচক-কথাশিল্পীরূপে বহুযুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী। একদিকে একজন বিশ্বাসযোগ্য প্রবীণ লেখক, অন্যদিকে সিপাহীবিদ্রোহ এমন কিছু একটা প্রাচীন ঘটনা নয়। সুতরাং অনুমান করা সংগত, অক্ষত ইতিহাস স্বমহিমায় এখানে একটি সার্থক উপন্যাস হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। উপন্যাস হিসেবে লালকেল্লা কতখানি সার্থক· সে বিচার পরে কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইতিহাসের গন্ধটুকুই এখানে আছে, স্বয়ং ইতিহাস নেই। কেরীসাহেবের মুন্সির নায়ক রামরাম বসু তবু ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করেছে, জীবনলাল সে অধিকার থেকেও বঞ্চিত। শুধু জীবনলাল কেন, লালকেল্লার মূল কাহিনীকে যারা পরিচালিত করেছে তাদের একজনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি নয়, সত্যি সত্যি যাদের নাম আছে ইতিহাসের পাতায়, এখানে তাঁরা সবাই কাহিনীর জোগানদার মাত্র, সুতরাং প্রায় মূল্যহীন। ঐতিহাসিক কাঠামো একটা আছে বৈকি। সত্যিই উত্তর ভারতব্যাপী সিপাহীবিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল, নানা দিক দেশ থেকে বিদ্রোহীরা জড়ো হয়েছিল দিল্লীতে, সেখানে তখনও শেষ মোগলসম্রাট বাহাদুর শা জীবিত; তাঁর দরবার ছিল, উজীর হাকিম ইত্যাদি ছিল, স্বার্থান্বেষী পরিজনদের মধ্যে ঘনিয়ে উঠছিল আত্মঘাতী সন্দেহের ধোঁয়া, আর শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের জয় এবং সিপাহীদের পতন হয়েছিল সে বিদ্রোহে। ছাত্রপাঠ্য এ ইতিহাসটুকু থেকে যে লালকেল্লা বিচ্যুত হয়নি তা জানাবার জন্য কোনো বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিকের সার্টিফিকেট পেশ করার প্রয়োজন হয় না, উঁচু শ্রেণীর যে-কোনো ছাত্রই তা মেনে নেবে। কিন্তু লালকেল্লা থেকে যদি সিপাহীবিদ্রোহের মূল উপসংহারটিকে কোনো পাঠক জানতে চেষ্টা করেন, তাহলে আশ্চর্য হয়ে তিনি আবিষ্কার করবেন, বস্তুত সিপাহীবিদ্রোহের মতো এত বড় একটা ব্যাপার দিল্লী শহরে একদিন ঘটেছিল কেবল জীবনলাল আর পান্না-তুলসী-রুমালীর মধ্যে কখনও ভদ্র কখনও অশ্লীল কতগুলো অতিনাটকীয় কাণ্ড ঘটানোর জন্য। আমার মনে হয়, বৃথাই প্রমথনাথ এত

পরিশ্রম করেছেন। মূলত, পাঠকদের কাছে যে কেচ্ছাকাহিনী পরিবেশন করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল, ইতিহাসের ভণিতা না করে প্রাপ্তবয়স্কদের পাঠ্য একটি যে-কোনো অশ্লীল উপন্যাস রচনা করলেই তাঁর সে উদ্দেশ্য চরিতার্থ হতে পারত। তার জন্য এত আড়ম্বরেরও প্রয়োজন হত না।

সুতরাং অনাবশ্যক ইতিহাসের পিছু ধাওয়া না করে নিতান্ত একটি উপন্যাস বলে মেনে নিয়েই লালকেল্লার কাহিনীকে বিচার করা সংগত। সম্ভব অসম্ভব সব প্লটের পর প্লট সাজিয়ে যে-কাহিনীর অবতারণা করেছেন লেখক, সেখানেও কোনো-একটি বিশেষ গল্পসূত্রকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। কাহিনীর জটীলতাই যে তার জন্য দায়ী এ কথা বলা চলবে না, কেননা গল্পকে নিষ্প্রয়োজন দৈর্ঘ্যে টেনে নেওয়ার অদম্য উৎসাহে বারবার লেখক ইচ্ছে করেই মূল কাহিনীর সূত্রটিকে ছিন্ন করে ফেলেছেন। সমর্থনযোগ্য হলে অবশ্যই এ রীতিকে অভিনন্দন জানানো চলত, কিন্তু যে-কাহিনী বস্তুত সামান্য একটি প্রেমোপাখ্যান ভিন্ন আর কিছু নয়, অবান্তর ঘটনার মারপ্যাচে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে তুললে উপাখ্যান হিসেবে তার ব্যর্থ হওয়া ছাড়া অন্য গতিও নেই। লালকেল্লা তাই একটি ব্যর্থ উপন্যাস। কবে একদিন চলতে-চলতে পান্নাকে পিছে ফেলে এসেছিল জীবনলাল, নিতান্তই গল্পের পরিণতির প্রয়োজনে তাকে এগিয়ে আসতে হলো যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত ; জীবনলাল আর তুলসীর প্রেমে ফাটল না ধরাতে পারলে গল্প ঠিক দানা বেঁধে উঠবে না, তাই রুমালী আত্মহত্যা করতে গিয়েও বেঁচে গেল, কেননা তার জীবনদাতা সরাব মিঞার মারফৎ জীবনলালের গলার তক্তিটা না পেলে জীবনলালের সর্বনাশের পথটা প্রশস্ত করা সম্ভব হবে না। এমনি অনেক ঘটনা কিংবা বলা যায় সবগুলো ঘটনাই লেখকের প্রয়োজনে সংঘটিত, কাহিনীর প্রয়োজনে নয়। ফলে দীর্ঘ আয়তনে দীর্ঘতর সব ঘটনার মিছিল চলেছে লালকেল্লায়, যেখানে কারো সঙ্গে কারোর স্পষ্টত বা দৃশ্যত কোনো যোগসূত্র নেই। এ উপন্যাস তাই এক সুতোয় গাঁথা কোনো কাহিনীকাব্য নয়।

লালকেল্লা প্লটসর্বস্ব উপন্যাস। প্রমথনাথ বিশী এপিক রচনা করতে চেয়েছিলেন, তাই ছক মিলিয়ে প্লট সাজিয়েছেন—বাস্তবতার ধার দিয়ে যেতেও চেষ্টা করেন নি। মহাকাব্য রচনার সত্যযুগে অলৌকিক উপাখ্যানের প্রশ্রয় নেওয়া হত বলে আজও যদি লেখক এপিক উপন্যাস লিখতে বসে একের পর এক অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটাতে থাকেন তবে লালকেল্লা থেকে তৃতীয় শ্রেণীর একটি

গোয়েন্দা কাহিনীর ব্যবধান থাকে কতটুকু ! এ উপন্যাসটি বহুপঠিত, সুতরাং পাঠকদের কাছে অনেক-অনেক যুক্তিপ্রমাণ উপস্থিত করার প্রয়োজন নেই। নায়ক জীবনলালের জীবন আলোচনা করলেই এখানে যথেষ্ট হবে—নানারকম অলৌকিক উপায়ে বারবার জীবনলাল বেঁচে যাচ্ছে কেমন করে ! প্রথম দিকে দুজন পাঁড়ের সঙ্গে কামানের মুখে তাকেও বাঁধা হয়েছিল, অন্য দুজন কামানের গোলায় উড়েও গেল, কিন্তু জীবনলালের বেলায় লেফট্যানেণ্ট সাহেব কেন-যে হঠাৎ stop বলে বাধা দেবে বোঝা গেল না। সম্ভবত জীবনলালকে সে লালকেল্লার নায়ক বলে চিনতে পেরেছিল। কিন্তু বধ্যভূমিতে জীবনলালের মৃত্যু যখন অবধারিত, মুহূর্তের অপেক্ষা মাত্র, ঠিক তখনই বাইরে থেকে ইংরেজের গোলায় জীবনলাল নয়, জল্লাদের মুণ্ডটা উড়ে যাবে কেন? জীবনলাল উপন্যাসের নায়ক বলে? মিস্ এলবিয়নকে তো কেউ বাঁচাতে পারল না। পারল না তার কারণ তাকে দিয়ে লেখকের কোনো প্রয়োজন নেই। উপন্যাসটিকে খানিকটা দীর্ঘ হতে সাহায্য করেছে সে, কয়েকটা দিন বেঁচে থাকার এইটুকুই তার সার্থকতা। কিন্তু দেখা গেল জীবনলালও মরে, সম্ভবত ট্রাজেডীর নায়করা মরে বলেই। না, কেবল তাই-ই নয়, তাকে মরতে হয়েছে মায়ের ভবিষ্যদ্বাণীটিকে সত্য প্রমাণ করার জন্য—যেহেতু তিনি একদিন বলেছিলেন, 'একদিন কোম্পানির গুলিতেই তুই মরবি।' শিক্ষিত লেখক সুন্দর স্পষ্ট ভাষায় আমাদের dramatic irony-র অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন, সন্দেহ কি ! সে সঙ্গে বাংলাদেশের অগণিত পাঠকদের মনে আফিংও ছাড়িয়েছেন। উত্তেজনার পর উত্তেজনায় লালকেল্লার সমস্ত আকাশ চিত্র-বিচিত্র। বাদশার দরবার থেকে খুরশীদ জানের আসর, ভৈরবকাকার গড়গড়ির নল থেকে অনুপ সিং-এর গুপ্ত ছুরি, নয়নচাঁদের বিদ্বেষ থেকে স্বরূপরামের আত্মত্যাগ, কি নেই লালকেল্লায়? সব আছে, অভাব শুধু যুক্তিবুদ্ধির। মোট কথা, প্লট সাজানোর অসাধারণ পরিশ্রমেই লেখক তাঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছেন, সাহিত্যের প্রতি সততা রক্ষা করার মতো কিছু আর তাঁর হাতে অবশিষ্ট নেই !

বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় চরিত্রচিত্রণ কখনই বাস্তব হতে পারে না। মনে হয় লেখক নিজেও সে চেষ্টা করেন নি। তৈরি করা গল্পের কাঠামোয় নিজেদের খুশিমত চলাফেরা করার অধিকার যখন একটি চরিত্রেরও নেই, তখন তারা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছামত না চলে পারে না। বাস্তবিক, লালকেল্লার

প্রতিটি চরিত্র কাঠের পুতুল মাত্র। লেখক যেভাবে তাদের চালিয়েছেন, তারা ঠিক সে ভাবেই চলতে বাধ্য হয়েছেন। জীবনলাল যখনই স্বপ্নের ঘোরে অমর সিঙের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে তখনই সুখানন্দ পণ্ডিতকে আমরা চিনতে পারি হত্যাকারী বলে। পান্নার বোনকে ছেলের বদলে বিলিয়ে দেওয়ার মানেই যে তুলসীকে সেই বোন বলে পরে প্রতিপন্ন করা, তাতে পাঠকের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না; সেই ছেলেকে নেকড়ে বাঘ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, স্পষ্টত উল্লেখ না থাকলেও ক্যালিবানটিই যে সেই ছেলে, তা বুঝতে পাঠকের দেরি হওয়ার কথা নয়, নয়তো ক্যালিবান কাহিনীর অবতারণা করার কোনো অর্থই থাকত না। এমনি ভাবে সমস্তটা ঘটনাই যখন পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে, তখন লেখকের পক্ষেই কি সম্ভব তাঁর চরিত্রগুলোকে তাঁদের স্বভাবমত গড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া। পটভূমি যেমন অস্বাভাবিক, চরিত্রগুলোও তেমনি কৃত্রিম। এ কৃত্রিমতার চরম নিদর্শন মিলবে বাদশার মজলিসে, খুরশীদ জানের আসরে, সুখানন্দর বাড়ির নিমন্ত্রণে, সর্বোপরি সরাব মিঞা আর পন্টনের চরিত্রকল্পনায়। শুধু তাই বা কেন, ইংরেজকুঠীতে একটি ব্যক্তিকেও কি স্বাভাবিক বলে মনে হয়? কর্তব্যকঠোর ইংরেজ সেনাপতির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কোনো মূল্য নেই যুদ্ধক্ষেত্রে, এ যুক্তি দিয়েও তাদের চেনা সম্ভব নয় এ কারণে যে খাঁটি ইংরেজিপনা দেখানোর সুযোগও লেখক তাঁদের দেন নি। ম্যাজিস্ট্রেট ক্লিফোর্ড ব্যতিক্রম। কিন্তু বলতে বাধা নেই, এ চরিত্রটিকে এনেছেন লেখক বিশেষ একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্ররোচনাতে, ঘটনাপ্রবাহের প্রয়োজনে নয়। বাংলা সাহিত্যের পক্ষে যে চরম লজ্জাকর একটি অশ্লীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এই ক্লিফোর্ড, বস্তুত, ঐটুকু দৃশ্যের প্রয়োজনেই তার আবির্ভাব, নয়তো ব্রীজম্যানের মতো জরুরী ব্যক্তি সে নয়; অথচ স্বয়ং ব্রীজম্যান একটি ব্যক্তিত্বহীন জড়পুত্তলীমাত্র! এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ দীর্ঘ ভূমিকায় বলেছেন, তৎসাময়িক পটভূমিতে চরিত্রগুলোকে তিনি সহজসাধ্য সম্ভাব্য করে তুলতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু, বিনীতভাবে তাঁকে জানাতে চাই, শুধু সিপাহীবিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, পুতুলনাচের পুতুল কোনো অবস্থাতেই জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে না। সে সম্ভাবনাও অসম্ভব। লেখক কি এ কথাই আমাদের বোঝাতে চান যে, এই সব চরিত্রহীন মানুষগুলোর পক্ষে সম্ভব ছিল আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী একটি মহাবিপ্লবকে পরিচালনা করা কিংবা সেই অপ্রতিরোধ্য গতিকে সংহত করা।

এই বাহ্য সবচেয়ে হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন লেখক উপন্যাসের পরিণতিতে। তিনি জানেন, মহৎ ট্র্যাজেডির শেষ মৃত্যুতে। কিন্তু তিনি বোধ হয় ভুলে গেছেন এ-মৃত্যু মৃত্যু নয়, তার আর-এক নাম মহানায়কের মহাপতন, সে পতনে লাঞ্ছনা নেই, বরং আছে পরম গৌরব। কিন্তু জীবনলাল কি নায়কের মৃত্যুবরণ করেছে! কিছুতেই সে মরে না, এত সহজে তার মৃত্যু না হলে কি ক্ষতি হত! লেখকের ধারণা সে বেঁচে থাকলে লালকেল্লা ট্র্যাজেডি হত না, এবং তার ফলে সে এপিকের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হত। ট্র্যাজেডির অনিবার্য পরিণতি পাঠকমনে যে দীর্ঘস্থায়ী অনুভূতি সঞ্চারিত করে যায়, প্রশ্ন হচ্ছে, জীবনলালের মৃত্যু সে অনুভূতিকে সামান্যমাত্রও জাগাতে পেরেছে কিনা। আমি হলপ করে বলতে পারি, একটি পাঠকও জীবনলালের জন্য সমবেদনার দীর্ঘশ্বাস ফেলবে না। তার কারণ, এ তার অনিবার্য মৃত্যু নয়, ট্র্যাজেডিসুলভ মহাপতন ঘটে নি জীবনলালের। সে শুধু লেখকের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ করেছে—বেঁচে থেকেও এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে, মৃত্যুতে তো নয়ই। নায়কের মৃত্যুই তো ট্র্যাজেডির পক্ষে যথেষ্ট। এমন ধারণা প্রমথনাথ বিশীর কেন হল যে, প্রয়োজনীয় সব কটি চরিত্রের মৃত্যু না ঘটলে মহৎ উপন্যাস সম্পূর্ণ হয় না, আমি তা বুঝতে পারি নি। নানারকম হাস্যকর উপায়ে মড়কের রোগীর মতো প্রায় সকলকেই তিনি চটপট মেরে ফেলে হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে বসলেন। তাঁর কি এমন ভয় ছিল, কেউ বেঁচে থাকলে উৎসাহী পাঠকরা লালকেল্লার দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ খণ্ডের জন্য আবদার জুড়বে। তা-ও যদি হত তা হলেও কেরি সাহেবের মুন্সী আর লালকেল্লার লেখকের সে কাজও যথেষ্ট কঠিন হত না বলেই আমার ধারণা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অধুনাকালীন বাংলাসাহিত্যে যে-কয়টি গ্রন্থকে অশ্লীল বলে আমার মনে হয়েছে লালকেল্লা তার মধ্যে অন্যতম। কারো কারো অভিমত সাহিত্যে অশ্লীলতা বলে কিছু নেই, উদ্দেশ্য কিংবা প্রয়োগরীতির ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে সাহিত্যের অশ্লীলতা। আমার মতে, দুটি দোষেই লালকেল্লা দোষী। উদ্ধৃতি দেব না, ইচ্ছে হয় পাঠক লালকেল্লার (চতুর্থ মুদ্রণ) ২৬৪ পৃ. থেকে ২৬৬ পৃ. এবং ৬৮৩ পৃ. থেকে ৬৮৪ পৃ. পড়ে দেখতে পারেন। সে সঙ্গে তাঁকে মনে করিয়ে দিতে চাই, গভীর রাত্রে জীবনলালের বিছানায় নগ্নদেহে রুমাসীর আত্মসমর্পণের ঘটনাটি এবং যে

উক্তির জন্য পল্টনকে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হল সেই অশ্লীল কথাগুলো। এ-সমস্ত ঘটনার পেছনে অবধারিত কোনো কারণ ছিল বলে আমার মনে হয় নি, এবং রচনাভঙ্গি এত স্পষ্ট যে এর মধ্যে সাহিত্যকে খুঁজে বেড়ানোই পাগলামী। জানি না প্রমথনাথ বিশীর মতো একজন অতি বিখ্যাত এবং প্রবীণ লেখক ভিন্ন অন্য কোনো অখ্যাত নবীন লেখকের হাত দিয়ে এ গ্রন্থ রচিত হলে এতদিনে তার কপালে কী দুর্ভোগটা জুটত!

বাদশা-বেগম বা রাজা-উজীর যদি উপন্যাসের চরিত্র না হয়, যদি পুরনো দিনের সমাজজীবন হয় কাহিনীর বিষয়বস্তু, তবে তাকেই বা কেন বলা যাবে না ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাস তো কেবল সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষদের সাক্ষ্যই বহন করে না, তার স্রোতধারায় যে বয়ে চলে ক্রমপরিবর্তনশীল সাধারণ মানুষের সমাজজীবনও। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজকে আশ্রয় করে উপন্যাস রচনা করার অধিকার কেবল তৎকালীন লেখকেরই থাকবে, পরবর্তী কালের কোনো লেখকের থাকতে পারে না, এমন বাধ্যবাধকতা সাহিত্য কখনও মানে না। মানলে সে-আইন অবশ্যই প্রযোজ্য হত তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার বেলাতেও। সময় কখনও এক জায়গায় স্তম্ভিত হয়ে থাকে না, সমাজজীবনও সে-সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে চলে নানা বাধাবিপত্তি ভাঙাগড়ার বেড়া ডিঙিয়ে। ছাত্রপাঠ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে-কাহিনী হয়তো জায়গা পায় না, কিন্তু, তাই বলে তার নিজের ইতিহাসটা তো মিথ্যে নয়। সে ইতিহাসকে আমরা চিরকাল খুঁজে এসেছি দেশের কাব্যসাহিত্যে। প্রাচীন সাহিত্যের যথার্থ মূল্য যদি তার সাহিত্যমূল্যে স্বীকৃতি না পায়, তাহলেও তার দানকে আমরা স্বীকার করেছি সমকালীন সমাজজীবনের সত্যস্বরূপ হিসেবে। সে কাব্যকথা আজ উপন্যাসের রূপ নিয়েছে, রাজা-উজীর, বাদশা-বেগমের সঙ্গে সে চলমান সমাজের সাধারণ জীবনযাত্রার কাহিনীও বলে চলেছে পরম নিষ্ঠায়। সুতরাং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে জীবনের কথাই সে প্রকাশ করুক না তা ইতিহাস ভিন্ন আর কিছু নয়।

সে-অর্থে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের পৌষ-ফাগুনের পালা অবশ্যই ঐতিহাসিক উপন্যাস। সময়: বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব। স্থান: কলকাতার কাছাকাছি একটি অখ্যাত গ্রাম। পাত্রপাত্রী মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের সুখেদুঃখে ভেসে চলা কয়েকটি সাধারণ নরনারী। কেন্দ্রচরিত্র: শ্যামা। পৌষ-

ফাগুনের পালার যবনিকা যখন উঠল, তখন বৃদ্ধা। ছেলেমেয়ে, নাতী-নাতনীর রক্তস্রোত বেয়ে তার অস্তিত্ব ছড়িয়ে গেছে বৃহৎ সংসারে। তা সত্ত্বেও ঐ উপন্যাস মুখ্যত শ্যামার দীর্ঘশ্বাসের কাহিনী। শ্যামার জীবন উপজীব্য করে ইতিপূর্বে গজেন্দ্রকুমার আরও দুটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এবং প্রতিটিই শ্যামার দুর্ভাগ্যের বার্তাবহ। সে উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন পৌষ-ফাগুনের পালায় তাঁরা নতুন কিছু আশা করলে ঠকবেন, এ কথা আগেই তাঁদের জানিয়ে দিতে চাই। কতরকম দুর্ঘটনার ভিতর দিয়ে বেদনাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, মনে হয়, এক-একটি উপন্যাসে তা-ই পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন লেখক। একই মানুষকে চিরটা কাল কেবল দুঃখবেদনার মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়েছে এমন ঘটনা অবশ্যই চোখে পড়ে এবং তারই প্রতিবিম্ব হিসেবে পৌষ-ফাগুনের পালা এবং তৎসংলগ্ন অন্য খণ্ড দুটিকে দেখলেই তাদের প্রতি সুবিচার করা হবে, এমন যুক্তি যদি কেউ দেন, তাহলে তার সঙ্গে হয়তো তর্ক চলবে না, কিন্তু সাহিত্যে বাস্তবতা কতখানি চলতে পারে সেই চিরন্তন প্রশ্নের মুখোমুখী না দাঁড়িয়ে উপায় থাকে না। সে তর্কেও আমি এখানে নামতে চাই না, কেননা, সাহিত্য সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত অবিসংবাদিত যে সাহিত্য বাস্তবের যথাযথ প্রতিরূপ নয়। মঞ্চের উপর পা ছড়িয়ে বসে অভিনেত্রী মনিমালিনী যদি সত্যি-সত্যি সদ্যমৃত পুত্রের শোকে মড়াকান্না জুড়ে দেয়, তাহলে নিখুঁত বাস্তবতা সত্ত্বেও তাকে আমরা শিল্পকর্ম বলব না। সে শিল্পী পুত্রশোকাতুরা মায়ের অভিনয়ে সার্থক হবেন, তাকে সত্যি-সত্যি মা হওয়ারও প্রয়োজন নেই, কিন্তু মায়ের মতো হওয়া চাই। অভিনয়ের ক্ষেত্রে যা সত্য, শিল্পকর্মের সকল ক্ষেত্রেই তা সত্য। আসল কথা, সাহিত্যেও একটা সংযমসীমা আছে যাকে অতিক্রম করে গেলে সাহিত্য তার ধর্মকে হারায়। গজেন্দ্রকুমার মিত্র সে সীমাকে অতিক্রম করেছেন। মৃত্যুর পর মৃত্যু দিয়ে, আঘাতের পর আঘাত দিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত শ্যামাকে একেবারে চেতনারহিত করে ফেলেছেন ভাবেন নি, এ আঘাত তাঁর পাঠকের মনকেও একসময় নিঃসাড় করে ফেলতে পারে। তাই শ্যামার শেষ পরিণতি পাঠককে আর বিচলিত করে না, হয়তো তার মনে বিন্দুমাত্র আন্দোলনও জাগে না। বরং শ্যামার চেয়েও করুণতর অবস্থা বেচারা পাঠকের। বলতে গেলে কাউকেই নিষ্কৃতি দেন নি লেখক। যত চরিত্র এসে জড়ো হয়েছে এ-উপন্যাসে প্রত্যেকেই যেন দুঃখের এক-একটি

জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তাদের অনেকের সঙ্গে শ্যামার প্রত্যক্ষ, কারো-কারো সঙ্গে বা অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগও নেই। কেন্দ্র-চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও অনেক সংবাদ তার অগোচর, কিন্তু পাঠক সাক্ষী আছেন সমস্ত ঘটনার, সমস্ত দুর্ঘটনার।

যত চরিত্রের ভীড় জমেছে এ-উপন্যাসে, তাদের প্রত্যেকের জীবনকেই নেড়েচেড়ে দেখতে চেয়েছেন লেখক। ক্ষমতার বাইরে হাত দিয়েছেন। ফলে বারবার কেন্দ্রচ্যুত হয়েছে কাহিনী, এতদূর সরে গেছে যে অনেক সময় শ্যামার অস্তিত্ব পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অভয়পদর সংসারের সঙ্গে শ্যামার যোগসূত্র বড় মেয়ে মহাশ্বেতা। কিন্তু সে ক্ষীণ সূত্রটিকে অবলম্বন করে লেখক যখন অভয়পদ এবং তার সংসারযাত্রার খুঁটিনাটিতে গিয়ে পৌছন, তখন দেখা যায়, সে সংসার ভিন্ন জগতের, তার সঙ্গে শ্যামার কোনো যোগাযোগ নেই। তেমনি ঐন্দ্রিলা তার আর-একটি মেয়ে মাত্র। সে মধ্যে-মধ্যে মায়ের কাছে আসে, ঝগড়া করে, আবার চলে যায়। কিন্তু ঐন্দ্রিলাকে কেন্দ্র করে তার মেয়ে সীতার মৃত্যু পর্যন্ত যে দীর্ঘ কাহিনী গড়ে ওঠে, সে আর-একটি ভিন্ন উপন্যাস। কান্তিকে নিয়ে রতনের যে অশালীন ব্যবহার তার বর্ণনা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলেও মায়ের কাছে কান্তি ফিরে আসার ফলে সে-ব্যবহার তবু কিছু যৌক্তিকতা পেয়েছে। কিন্তু এখানে অরুণ আর স্বর্ণের স্থান কোথায়! তবু তারা অন্য কোনো উপন্যাসের সম্ভাব্য নায়ক-নায়িকা হওয়ার প্রলোভন ত্যাগ করে অনাবশ্যক জায়গা জুড়ে দুঃখের গান গেয়ে গেল বিষন্ন মনে। আসলে অনেকগুলো কাহিনীকে একসঙ্গে গেঁথে তুলতে গিয়ে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছেন লেখক। বারবার তিনি খেই হারিয়েছেন আর ফাঁকিটাকে ঢাকতে হয়েছে অস্বাভাবিকতা দিয়ে। সীতার মৃত্যু, জাদুকরের মতো অরুণের বড়লোক হওয়া, ডাক্তারবাবুর মুহূর্তের মতিভ্রম—সেই অনেক অস্বাভাবিকতার কয়েকটি মাত্র।

প্রমথনাথ বিশী এবং গজেন্দ্রকুমার মিত্র উভয়েই প্রলোভনের কাছে পরাজিত। তবু একটু সংযমের দীক্ষা যদি পেতেন গজেন্দ্রকুমার তবে সত্যিই হয়তো তিনি পৌষ-ফাগুনের পালাকে মহৎ সাহিত্য করে গড়ে তুলতে পারতেন। কেননা, মানবচরিত্রের চিত্র আঁকার দক্ষতা আছে তাঁর, সে-সঙ্গে আছে একটি বিশেষ দৃশ্যের যথাযথ বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতাও। তার মানে পৌষ-ফাগুনের পালার মানুষগুলো লালকেল্লার পুতুল নয়। তারা হাসে

কাঁদে জীবন্ত মানুষেরই মতো। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তার বেশি কিছু নয়। গজেন্দ্রকুমার সার্থক সাহিত্যশিল্পী নন, তিনি সামান্য রেখাচিত্র-বিশারদমাত্র। তাও সে চিত্র বড় বেশি বর্ণাঢ্য। ভারসাম্যের প্রতি দৃষ্টি না রেখে তিনি কেবলই চরিত্রচিত্রণে মগ্ন থাকতে চান, আর তার ফলে একটি বিশেষ চরিত্র যত প্রত্যক্ষ হয়েই পাঠকের চোখের সামনে ধরা দিক না, একক রূপে দাবি করার মতো তার কিছুই থাকে না। তা ছাড়া বিভিন্ন অবস্থায় মানুষগুলোর একই চেহারা, বাস্তবতার সার্টিফিকেট সত্ত্বেও, পাঠকমনে পীড়া জাগায়। কাহিনীর গতির সঙ্গে আমরা চাই চরিত্রেরও রূপান্তরকাহিনী। কিন্তু গজেন্দ্রকুমারের চরিত্ররা চলতে জানে না, একটিমাত্র পরিচ্ছদের আবরণে একই জায়গায় শুধু ঘুরপাক খেতে পারে তারা। মহাশ্বেতাকে প্রথম দৃশ্যে যা দেখেছিলাম, অভয়পদর মৃত্যুদৃশ্যেও সে ঠিক তাই আছে। চরিত্রের স্থানবদল হয় নি একতিলও। শেষ পর্যন্ত ঐন্দ্রিলার স্বভাবে হয়তো একটু ফাটল ধরেছিল, কিন্তু সে বড় দেরিতে, ততক্ষণে তার চরম সর্বনাশ সাধিত হয়ে গেছে। স্বর্ণর মানসিক বিবর্তনটা মূল্যহীন, কেননা সমস্ত গ্রন্থে স্বর্ণ নিজেই একেবারে অবান্তর, রতনেরই মতো। রতন আর উমা যদি নেপথ্য চরিত্র হয়েই থাকত, তবে কী ক্ষতি হত পৌষ-ফাগুনের পালার। আমার মনে হয়, তাতে কাহিনীর দিক থেকে উপন্যাসটি অনেকটা ভারসাম্য রক্ষা করতে পারত। এমনি অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, যা দিয়ে প্রমাণ করা যায়, পৌষ-ফাগুনের পালার লেখক বিশ্লিষ্টভাবে নিখুঁত রেখাচিত্র তৈরি করতে সক্ষম হলেও, সব মিলিয়ে একটি সুষম সমন্বয়ে এসে পৌছতে পারেন নি। যার ফলে, সমগ্র উপন্যাসটি অনেকগুলো রেখাচিত্রের যোগফল হয়ে রয়েছে মাত্র, উপন্যাস হয়ে ওঠে নি।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলাসাহিত্যে বৃহদায়তন উপন্যাস রচনার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। পণ্যদ্রব্য হিসেবে তার হয়তো কিছু মূল্য আছে, কিন্তু প্রমথনাথ বিশী এবং গজেন্দ্রকুমার মিত্র নিশ্চয় জানেন মহৎ উপন্যাস কখনও তার আয়তনের জন্য মহৎ নয়, অন্তরের মূল্যে তার মহত্ত্ব। এমন অনেক উপন্যাস আছে পৃথিবীতে যারা আয়তনে ক্ষুদ্র হয়েও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। লালকেল্লা এবং পৌষ-ফাগুনের পালা দুটিই সুবৃহৎ উপন্যাস। কিন্তু কোনোটিতেই লেখকেরা মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি, যুগের হুজুগে গা ভাসিয়েছেন মাত্র। হয়তো ক্ষণকালের জন্য নগদ মূল্যে তাঁদের পকেট ভারি হবে, কিন্তু ভুললে চলবে না যে অদূর ভবিষ্যৎই তাঁদের ক্ষমা করবে না। তার কাছে লালকেল্লা আর পৌষ-ফাগুনের পালা দুই-ই পরিচিত হবে সাময়িক-সাহিত্য বলে, সদর্থে সাহিত্য হিসেবে নয়।

দেবেশ রায়

ছোটগল্প : দুই মেজাজ

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুসমাচার' গল্পগ্রন্থটি বেরিয়েছে ১৩৭১ সালের মাঘ মাসে। অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'দীপিতার ঘরে রাত্রি' ১৩৭২ সালের বৈশাখে। কাঠের আঁশের ফ্রেমে শ্লেট রঙের উপর শাদা চকের রঙে কয়েকটি মুখের রেখায় আর লাল হরফের সুসমাচার—(প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত) সন্দেহ জাগায় লেখক মলাট থেকেই ঠোকা শুরু করেছেন। নাবিক-নীল কাগজে কালো রেখায় আঁকা প্রাসাদে একটি মাত্র আকাশ-নীল জানলা আর 'দীপিতার ঘরে রাত্রি'—(প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী)—আমন্ত্রণ জানায় লেখক প্রথম থেকেই স্নিগ্ধতার আশ্বাস দিচ্ছেন।

শান্তিরঞ্জন স্বভাবতই রাগী, ভীষণ বদমেজাজি, প্রথমে মনে হয় তামাম দুনিয়ার উপরই তাঁর রাগ, পরে বোঝা যায় কিছু মূল্যবোধের পিছুটানে নিজে ভণ্ডামি আর নষ্টামির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারেন না বলেই যত রাগ তাঁর নিজের উপরে। বা নিজের খুব কাছাকাছির লোকজনের উপরে। "লক্ষ্মীর বাস বাণিজ্যে"-র গগনের মতো। সে মেজাজ দেখিয়ে জেলে গিয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়েও সবাইকে মেজাজ দেখিয়ে বেড়িয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত দোকানের দরজা বন্ধ করে উনসত্তর কিলো তেলে কয়েক ফোঁটা তেলরঙের জল মেশাতে না পেরে রাগী গগন ঘরের ভিতর ভেউ-ভেউ করে কাঁদে। ঠিক এই হিসেবটা শান্তিরঞ্জনের সব গল্পেই আছে। উনসত্তর কিলো কেন, এই সাত সমুদ্দুর ভরা অমানবতায় খাবি খেতে-খেতেও যারা অমানুষ হতে পারে না তারা খেটে খেয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শেষ পর্যন্ত মাথার চুল ছেঁড়ে। সেজন্য তাঁর গল্পে একধরনের তির্যক তাৎপর্য আসে যাতে,

১। **সুসমাচার**। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। তিন টাকা।
২। **দীপিতার ঘরে রাত্রি**। অমিয়ভূষণ মজুমদার। সিগনেট প্রেস, কলিকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

ভয়ংকরতার সন্নিহিত হয়েও গল্পগুলি এক মানবিক মর্যাদা পায়। একটি শিশুর ভ্রূণ বাজারের থলেতে নিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করা এক দম্পতি তাদের বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপন করার জায়গা খুঁজছে—কলকাতা শহরে—ঘটনাটির ভয়ংকরতার মধ্যে যে লোক-দেখানো ভাব আছে তা থাপ খেয়ে যায় নিজের বাড়িঘর-ভাইবোনেদের প্রতি শশীর লুকোনো দরদে, শশী-শান্তির বিয়ে দিতে রেণুর মালিনীপনায়, আর জগার কলেরা দেখে টিফিন না-খেয়ে ট্রামে না-চড়ে জমানো পয়সা নির্বিবাদে রেণুকে দিয়ে আসার অকৃত্রিমতায়। মোরগ-মোসল্লম দেখে শূন্যগর্ভা শান্তির অস্থিরতা আর সেই দুই-আড়াই কিলোর মাংসের পিণ্ডটা রেস্তোরাঁর খাদ্য-সমারোহের মধ্যে ফেলে আসার অমানবিকতার আগুনে অমর মানবস্বভাবই দীপ্তি লাভ করে। শান্তিরঞ্জনের সমাজবোধ খুব প্রবল। তাই তাঁর গল্পে কোনো নিখিল শান্তি নেই। কিন্তু সন্দেহ হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের প্রক্রিয়ায়—নিত্যবর্তমানের ক্রিয়াপদে ছোট ছোট বাক্যে কড়া কড়া বুলি—যে-ঝাঁঝ তাঁর গল্পে তৈরি হয় তা কখনো-কখনো একটা নাস্তিক আধারেই তপ্ত কি না! কৌতূহলা কাশীপতি আর অধ্যাপক পরমেশ মুখুজ্জের ছেলে প্রেমতোষ ওরফে খোকা—উভয়েই খুনী। কিন্তু খোকার খুন সামাজিক, আর কাশীপতির খুন আধ্যাত্মিক! এই গ্রন্থে পরিষ্কার যে শান্তিরঞ্জন খুনোখুনির ব্যাপারটাকে সামাজিক মনে করেন। কিন্তু তাঁর ভঙ্গিমা এমন অস্থির যে ভয় হয় তিনি আধ্যাত্মিক নাস্তিকতার দিকে ঢলে না পড়েন।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'দীপিতার ঘরে রাত্রি'-তে ছোট গল্পের সংখ্যা চোদ্দ। মেজাজের দিক থেকে অমিয়ভূষণ যেন খানিকটা শৌখিন। তাই তাঁর এই গল্পগুলি পড়তে কখনো-কখনো কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গেই আবিষ্কার করতে হয়, যে, তাঁর ভাষায় রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের গল্পের ভাষারীতির একেবারে প্রত্যক্ষ প্রভাব। যেমন, "হয়তো সেটা ছিল চৈত্রের কোনো রাত। অস্পষ্ট আলো ছিল আকাশে। সারা পৃথিবীতে বাতাস ছিল না। নিঃশব্দ পুকুরের জলের মতো নিঃস্ব রাত্রি থই-থই করছিল, পাতা পড়লে শব্দ হবে এমন। অদ্ভুত উত্তাপ ছিল চরাচরে।" আবার খুব কৌতুকের সঙ্গে আবিষ্কার করতে হয় যে অমিয়ভূষণের গল্পের চরিত্রগুলির কেউ-কেউ আই. সি. এস. গোছের সরকারি চাকরে, বা অ্যামবাসাডার বা রাজা-রানী গোছের কেউকেটা বা খুব ডাকসাইটে জমিদারগিন্নি বা তিন-চারবার পাত্র বদলানো ধনী পাত্রী বা,

অন্তত একটি গল্পে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, বা অন্তত একটি গল্পে নেহাতই পুলিশের অফিসার বা অন্তত একটি গল্পে তাঁতী ও অন্তত একটি গল্পে সামান্য এক স্কুলের সামান্যতর তৃতীয় শিক্ষক। অমিয়ভূষণের গল্পে পাত্র-পাত্রীর সামাজিক ও শ্রেণীগত ভিত্তির চাইতে, দেশকালনিরপেক্ষ কতকগুলি আধ্যাত্মিক ভাবনা-চিন্তাই বড় বলে, চরিত্রের বাস্তবভিত্তি খুব একটা জরুরী প্রসঙ্গ নয়। অমিয়ভূষণের গল্পে পালক পিতা আর জন্মদাতা পিতার মধ্যে সত্যিকারের পিতা কে, এই দ্বন্দ্ব আছে, কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে বিখ্যাতা সুন্দরী দীপিতার সংঘাত আছে দুই প্রেমপ্রার্থী যুবকের মধ্যে, এমনকি "দরজার পাল্লায় হাত ছেঁচে রক্তারক্তি"-র মতো নাটকীয় ঘটনাও আছে, ছেলের লোভে জায়ের ছেলেচুরির কেলেঙ্কারি আছে, প্রণয়িনী কর্তৃক আর্টিস্ট হত্যা-ও। এই গল্পগুলির গতি ধীর, ভাষা মনোরম, সংলাপ শ্রবণগ্রাহী। পাঠক হিসেবে হয়তো এটা আমার ব্যক্তিগত অক্ষমতা যে গল্পগুলিতে নির্মিতির অতিরিক্ত কোনো ভাষ্য আবিষ্কার করতে পারি নি।

অথচ আপাত শৌখিন মেজাজে অমিয়ভূষণ যে সার্থক গল্প রচনা করতে পারেন তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ "শহীদ" ও "ভদ্রলোকের বাড়ি" গল্প দুটি। "ইতিহাস" গল্পটিরও নাম করা যায়। বিশেষত "ভদ্রলোকের বাড়ি" গল্পটি-র ছাড়া ছাড়া ভাব, তথাকথিত একটা সুঠামতার অভাব, অথচ এক অদৃশ্য যোগসূত্র প্রমাণ দেয় যে অমিয়ভূষণের কলমে সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘাত-প্রতিঘাতও আসে, সরলভাবেই আসে। আমার মনে হয় একটি নির্দিষ্ট কোনো ধারণার অভাবেই যথেষ্ট দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও অমিয়ভূষণ তাঁর শক্তির উপযুক্ত প্রমাণ গল্পগুলিতে দিতে পারেন নি। তাই তাঁর গল্প পড়তে পড়তে কী ভাষায়, কী বিষয়ে একটা সময়-বিপর্যয়ের—অ্যানাক্রনিজম অনুষঙ্গ মনে আসে। অমিয়ভূষণ যদি তাঁর শক্তি নিয়ে এই সময়-বিষয়ে নিজেকে প্রাসঙ্গিক করতে পারেন, তবে আমরা কিছু সার্থক গল্প পাব। আপাতত অমিয়ভূষণের সেই পরবর্তী রচনাতেই আমাদের আগ্রহ।

চিন্মোহন সেহানবীশ

?াবী সমাজ

প্রায় একশ কুড়ি বছর হতে চলল কমিউনিজমের তত্ত্ব, বিশেষ করে গত ৪০/৪৫ বছর যাবৎ নানান দেশের কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন অসংখ্য হারজিত, আগুপিছুর ভিতর দিয়ে সারা পৃথিবীর নির্বিত্ত শ্রেণীভুক্ত মানুষকে যে উত্তরোত্তর দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করেছে—এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। আর ঔপনিবেশিক শোষণ ও বর্ণবৈষম্যজাত নির্যাতনের যারা শিকার তাদের কাছেও ঐ আকর্ষণ আগের চাইতে অনেক বেশি প্রবল হয়েছে সাম্প্রতিক কালে।

এর কারণ অবশ্য সহজেই আঁচ করা চলে। কিন্তু তাত্ত্বিক ও ফলিত কমিউনিজমের আবেদন শুধু ঐখানেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লেখক, শিল্পী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী এবং সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও 'লিবারাল' পেশাভুক্ত বহু লোকও এদিকে ঝুঁকেছেন—কেউ-কেউ এমনকি কমিউনিস্ট পার্টিতেও যোগ দিয়েছেন শেষপর্যন্ত। তাঁদের মধ্যে কারো-কারো খ্যাতি নিঃসন্দেহেই জগৎজোড়া। কি এর কারণ?

কারণ যাই হোক, এ-বিষয়ে সংশয় নেই যে মাত্রার তারতম্য সত্ত্বেও প্রথমটির মতো এটিও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এর এক পরোক্ষ প্রমাণ এই যে সম্প্রতি এ-প্রসঙ্গ নিয়ে অনেকেই মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন আর তারই ফলে প্রকাশিত হয়েছে অনেকগুলি রচনা ও বই। এর মধ্যে বেশ কিছুই নিছক গালাগালি। লেখকদের কমিউনিজমবিদ্বেষ সেখানে যত প্রকট, ব্যাপারটি ঠিক ততই অস্পষ্ট—কেন এতগুলি সৎ ও বুদ্ধিমান মানুষ এমন মারাত্মক নেশায় মাতছেন হঠাৎ করে। সমাজতান্ত্রিক দেশ হলে না হয় ঐ-সব লেখকেরা বলতে পারেন যে নিরাপত্তার খাতিরে, বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা

David Caute: *Communism and the French Intellectuals, 1914-1960.* Andre Deutsch Ltd. 45 sh.

বা খ্যাতিপ্রতিপত্তির লোভে অথবা নিছক প্রবল পক্ষে থাকার সহজ প্রবৃত্তির তাগিদেই বুদ্ধিজীবীরা কমিউনিজম-স্বীকারের ভাণ করছেন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে, কমিউনিস্টরা যেখানে শাসকপক্ষ তো ননই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ হিসাবে নানাভাবে প্রপীড়িত, সেখানেও বুদ্ধিজীবীদের কাছে কমিউনিজমের আকর্ষণ কেন? সেখানে তো যোগদানের বৈষয়িক আবশ্যিকতা নেই, এইদিকে দায়বদ্ধ হওয়ায় ক্ষতি বই লাভের আশাও নেই তাঁদের তরফে।

সৌভাগ্যের কথা সব বই-ই ঐ-ধরনের নয়। ঘটনাটিকে যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবনের আন্তরিক প্রয়াসও যে একেবারেই দেখা যাচ্ছে না তা নয়। যেমন আলোচ্য বইটির ক্ষেত্রে। এর লেখক বয়সে নবীন -এখনো ত্রিশ পেরোন নি। তবু এরই মধ্যে অক্সফোর্ডের 'অল সোল্‌স্‌ কলেজের' এই তরুণ 'ফেলো'টি আলোচ্য বিষয়ে একখানি প্রভূত তথ্যসমৃদ্ধ বই লিখেছেন কয়েক বছরের গবেষণার ফলে। গোড়ায় সেণ্ট এণ্টনি কলেজের বৃত্তির জোরে ও পরে হেনরি ফাণ্ডের ফেলোশিপের টাকায় হার্ভাডে বছরখানেক থেকে তিনি গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ করেছেন। প্রসঙ্গত ঐ-সব বনেদী প্রতিষ্ঠানও যে আজকাল এমন একটা বেয়াড়া সমস্যা নিয়ে ভাবিত—এর থেকেও প্রসঙ্গটির গুরুত্ব অনুমান করা চলে কিছুটা।

গোড়াতেই অবশ্য লেখক সাধারণ সমস্যাটিকে কিছুটা পরিমিত করে নিয়েছেন দেশকালের দিক থেকে, তাঁর গবেষণাকে একদিকে ফরাসী দেশ ও অন্যদিকে ১৯১৪-১৯৬০ সনের মধবর্তী কালের ভিতরে সীমাবদ্ধ করে। এর মধ্যে প্রথম ক্ষেত্রে সীমানা টানার যে-কারণ তিনি দেখিয়েছেন তা যুক্তিসহ, যেমন, ফরাসী সমাজজীবনে বুদ্ধিজীবীদের উচ্চস্থান ও সমাদর, বুদ্ধিজীবীদের তরফেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে শুধু মাথা ঘামানো নয়, প্রয়োজনবোধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য (১৮৪৮ সনের বিপ্লব, ১৮৭১ সনে প্যারি কমিউন, ড্রেফ্যুস মামলা-সংশ্লিষ্ট আলোড়ন, ১৮৯৮ সনের 'বুদ্ধিজীবীদের ইস্তাহার', বিশ শতকের গোড়ার বছরগুলিতে সিণ্ডিক্যালিস্ট ধর্মঘট-এর প্রত্যেকটিতেই তাঁদের ভূমিকা লক্ষণীয়), প্রথম থেকেই ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সংযোগ এবং ঐ পার্টির ৪৫ বৎসরব্যাপী জীবনের প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা যার মধ্যে প্রতিফলিত সমসাময়িক ইউরোপীয় ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি

তাৎপর্যপূর্ণ পরিস্থিতিই (একমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পাঁচ বছর পার্টি বেআইনী ছিল, যদিও ঐ সময়ে আবার প্রতিরোধ সংগ্রামে তার গৌরবমণ্ডিত ভূমিকা তাকে তখন সত্যই 'দি পার্টি অফ ফ্রান্সে' পরিণত করে এবং প্রশস্ত করে তার যুদ্ধোত্তরকালীন বিপুল প্রভাব ও জনপ্রিয়তার পথ। তা সত্ত্বেও আজো ফরাসী পার্টি পশ্চিম ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম কমিউনিস্ট পার্টি। একদা ইউরোপের মধ্যে বৃহত্তম, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ও বর্তমানে পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তম, ইটালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু যথাক্রমে ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ এবং ১৯২৬ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায় থাকে ফ্যাসিস্ট ক্ষমতাদখলের ফলে। আর স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি বছর তিনেক মাত্র সুযোগ পেয়েছিল প্রভাববিস্তারের, তারপর থেকেই ফ্রাঙ্কোর কৃপায় তার কপালে জুটেছে একটানা বেআইনী জীবন)। অথচ এই সব দিক দিয়ে ফরাসী পার্টির যতই অভিনবত্ব থাকুক, আসলে তাকে গণ্য করতে হবে পশ্চিম ইউরোপীয় কমিউনিজমের প্রতিনিধি হিসেবেই, কারণ এদের সকলের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট সমস্যাটি হচ্ছে বুদ্ধিজীবী সমাজের সঙ্গে শাসনক্ষমতাহীন কমিউনিজমের (Communism out-of-power) সম্পর্কের সমস্যা। সমাজতান্ত্রিক দেশের থেকে সে-সমস্যা বহুলাংশেই স্বতন্ত্র চরিত্রের।

কিন্তু কালের দিক থেকে লেখক কেন যে ১৯৬০ সনে আলোচনার ছেদরেখা টেনেছেন তার কারণ ঠিক বোধগম্য হল না, বিশেষ করে বইটির প্রকাশকাল যখন ১৯৬৪ সন। লেখক অবশ্য কারণ দেখিয়েছেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেস ও হাঙ্গেরিয়ান অভ্যুত্থানের মতো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা থেকে উত্থিত নানান জটিলতা নাকি ১৯৬০ নাগাদ পরিষ্কার হয়ে যায় আর ফ্রান্সের দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের পতনও ঘটে ঐ সময়ে, যার পরে সূচনা নবপর্বের। যুক্তিটা কিন্তু ঠিক গ্রহণযোগ্য বোধ হল না কোনোদিক থেকেই। কারণ ২০তম কংগ্রেস থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে যেসব বৃহৎ প্রশ্ন উপস্থাপিত হয় তার নিষ্পত্তি তো দূরের কথা, তার জটিলতাও কি সত্যই পরিষ্কার হয়েছে বলা চলে আজো? তাই যদি হবে তাহলে কমিউনিস্ট শিবিরের বৃহত্তম দুই শক্তির মধ্যে এই প্রচণ্ড মতানৈক্য কেন? কেনই বা ইটালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির মতো বৃহৎ পার্টির কোনো-কোনো প্রসঙ্গে কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের চিন্তা? আশ্চর্য লাগে যখন দেখি যে আলোচ্য বইটির প্রকাশকাল ১৯৬৪ সন

হওয়া সত্ত্বেও ঐ অসীম গুরুত্বপূর্ণ বিভেদের বা চিন্তাধারার উল্লেখমাত্রও নেই এই বইয়ে! দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সের চতুর্থ ও বর্তমানে চালু পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের ব্যবধান যতটা মৌলিক বোধ হয়েছিল গোড়ার দিকে আসলে কি তাই প্রতিপন্ন হয়েছে কার্যক্ষেত্রে? এ-সবের দরুন ১৯৬৪ সনে আলোচনার ছেদ টানার সপক্ষে লেখকের যুক্তি যেন কিছুটা মনগড়াই বোধ হয় পাঠকের কাছে।

আর-একদিক থেকেও লেখক আলোচনার পরিধিকে কিছুটা সীমাবদ্ধ করেছেন। একই বাস্তব অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ বামে, কেউ দক্ষিণে হেলেন আর কেউ হয়তো মধ্যপন্থা ধরেন। প্রত্যেকেই পথ বেছে নেন মোটের উপর স্বাধীনভাবেই। এখন বামে যাঁরা গেলেন তাঁরা কেন দক্ষিণ বা মধ্যপথকে বর্জন করলেন লেখক তার বিশ্লেষণের মধ্যে যান নি। তাঁর বিচার তিনি সীমিত করেছেন বাম শিবিরের ভিতরেই—কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট বামপন্থীদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই। এর ফলে ঐ নির্দিষ্ট চৌহদ্দীর মধ্যে তাঁর আলোচনাটি বেশ বিশদ করে তোলার সুযোগ ঘটেছে।

লেখকের বিচারপদ্ধতি সম্পর্কেও এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার। একজায়গায় তিনি লিখেছেন :

> 'A certain relativism is essential for the historian of ideas and intellectual movements. Opinion should not colour analysis; the student's own beliefs should not distort his understanding of the motives and mental processes of those whom he studies; the rational process should not be regarded as indivisible, as a straight line leading inexorably from a given set of evidence to a given conclusion. Above all, a generalization, to have any value, must be founded on an examination of numerous specific cases. These are elementary rules, but in no field have they been less frequently observed than in the field of communist studies.' (পৃ. ২৭৫)।

এরই জন্য লেখক কোয়েস্লার প্রমুখ প্রাক্তন কমিউনিস্টদের সাক্ষ্য

সম্পর্কে যেমন সন্দিগ্ধ তেমনই তাঁর আপত্তি 'দি ওপিয়াম্ অফ দি ইন্টেলেক্চুয়াল'-এর লেখক রেমণ্ড এরন্-এর মতো ব্যক্তির মতামত সম্পর্কেও যাঁরা চেষ্টা করেন 'to explain (or ridicule) the behaviour of Marxist intellectuals while denying all their premises, while discarding as myths the basic ideas of the Left, of the Revolution and of the Proletariat.'। লেখকের মতে উভয়পক্ষেরই আশ্রয় এই ধরনের পূর্বসিদ্ধান্ত যে যেহেতু মার্কস্বাদ একটা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন মতবাদ, তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি তা গ্রহণ করেন তাহলে বুঝতে হবে যে তাঁর মতিভ্রম ঘটেছে আর তাই তিনি এমন একটা মারাত্মক নেশা ধরেছেন মানসিক বিকারবশে। ফলে এঁদের ঝোঁক নানারকম তথাকথিত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকে যেমন, মার্কস্বাদী 'মিথ্'-এ যাঁরা আকৃষ্ট হন তাঁরা নাকি আসলে ধর্মেরই একটি বিকল্পের আশ্রয় খোঁজেন বা তাঁরা 'আত্মবিসর্জন মারফৎ পাপস্খালনের অন্বেষায়' ('quest for holiness by means of martyrdom') ফেরেন অথবা মানসিক নিঃসঙ্গতার পীড়নে ও ব্যাপকতর সমাবেশের মধ্যে স্থানলাভের ব্যাকুলতায় মার্কস্বাদ গ্রহণের মতো একটা বেয়াড়া কাণ্ড করে বসেন। কাফ্কা-বর্ণিত একটা সন্ত্রস্ত আবহা'য়ার কথাও তাঁরা তুলে থাকেন এ-প্রসঙ্গে।

আলোচ্য বইয়ের লেখক গোড়াতেই এই তথাকথিত মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি বর্জন করে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের পথ ধরেছেন, সমগ্র বাম শিবিরের মূল ধারণাগুলিকে গোড়াতেই উড়িয়ে দিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হন নি। এই পদ্ধতি অনুসারে তিনি বইটির বিষয়বিন্যাস করেছেন চার খণ্ডে: প্রথম, 'পার্টি ও বুদ্ধিজীবী সমাজ', দ্বিতীয়, 'বুদ্ধিজীবী সমাজ ও পার্টি', তৃতীয়, 'তিনটি ব্যক্তিগত ইতিহাস' ও চতুর্থ, 'বুদ্ধিজীবী সমাজ ও মননশীলতা'। এই প্রত্যেকটি খণ্ডই বহু পরিশ্রমসাপেক্ষ, বিচিত্র, যথাযথ ও চিত্তাকর্ষক তথ্যসমাবেশে সমৃদ্ধ। এর জন্ত তিনি ধন্যবাদভাজন সমস্ত পাঠকসমাজেরই।

প্রথম দুই খণ্ডের নামকরণের পিছনে যুক্তি এই: প্রথমটির বিচার্য ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন পর্বে কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন ও তাঁদের প্রতি কেমন আচরণ করেছেন আর দ্বিতীয়টির প্রসঙ্গ হল বুদ্ধিজীবীরাই বা বিভিন্ন সময়ে পার্টি সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করেছেন, কতটা তার ঘনিষ্ঠ হয়েছেন অথবা দূরে সরে গেছেন। স্বভাবতই এ দুই

বিচার পরস্পর পরিপূরক কারণ কোনো পক্ষেরই মনোভাব বা আচরণ অপর পক্ষের মনোভাব বা আচরণনির্বিশেষ হতে পারে না—প্রশ্নটা অনেকটাই ঘাত-প্রতিঘাতের। তাই এই বিভাগ কৃত্রিম বোধ হল কিছুটা। তবে এই ভাগাভাগির ফলে হয়তো অনেক খুঁটিনাটি প্রশ্নের ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছেন লেখক। পরবর্তী খণ্ড দুটির সম্পর্কেও একই কথা।

কিছুটা নমুনা দিলে ব্যাপারটা আঁচ করা যাবে। প্রথম খণ্ডটিকে ('পার্টি ও বুদ্ধিজীবী সমাজ') ভাগ করা হয়েছে তিনটি অধ্যায়ে—'প্রসারিত হাতে' (La Main Tendue), 'উপযোগিতার নীতি' (Principles of Utility) ও 'বিচ্ছেদ ও শৃঙ্খল.' (Alienation and Discipline)। দ্বিতীয় খণ্ডটিও ('বুদ্ধিজীবী সমাজ ও পার্টি') তেমনি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে সাতটি কালানুক্রমিক ('১৯১৮-'২৭', '১৯২৭-'৩৪', '১৯৩৪-'৩৯', '১৯৩৯-'৪০', '১৯৩০-'৪৫', '১৯৪৫-'৫৬' ও '১৯৫৬-'৬০') ও একটি বিষয়সূচক ('চারটি প্রসঙ্গ' শিরোনামার এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'জাতীয়তাবাদ', 'ইহুদী-বিদ্বেষ', 'ঔপনিবেশিকতাবাদ' ও 'ফরাসী সংস্কৃতির সপক্ষে' এই চারটি প্রসঙ্গ)। তৃতীয় খণ্ডটির ('তিনটি ব্যক্তিগত ইতিহাস') তিনটি অধ্যায় আঁদ্রে জিদ্, আঁদ্রে মালরো ও জাঁ-পল সার্ত্রের প্রসঙ্গে এবং চতুর্থ খণ্ডটি ('বুদ্ধিজীবী সমাজ ও মননশীলতা') দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিত্রশিল্প এবং শিক্ষা ও আইন-বিষয়ক ছটি অধ্যায়ে বিভক্ত। সিনেমা সম্পর্কে একটি ছোট 'নোট'ও আছে বইয়ের শেষে। ভূমিকা আর উপসংহার নিয়ে মোট বাইশটি অধ্যায়ে এই হল বইটির বিরাট পরিকল্পনা।

এ-সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার মধ্যে না গিয়ে এখানে কয়েকটি বাছাই-করা প্রসঙ্গের অবতারণা করা গেল।

ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব আর ঐ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সেখানকার বুদ্ধিজীবী সমাজের মনোভাবের তুলনা করতে গিয়ে লেখক একটা কৌতূহলোদ্দীপক কথা বলেছেন: 'It is···easier to genaralize about the conditions in which intellectuals have felt attracted towards the Party than about the conditions in which the Party has opened its arms to the intellectuals'। কারণ লক্ষ্য ও পন্থার সাযুজ্য অথবা দ্বন্দ্বময় ঐক্য সম্পর্কে দার্শনিক মতামত পরিবর্তনের ফলে ততটা নয় যতটা আন্তর্জাতিক

ও দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পুনর্বিচার এবং তারই ভিত্তিতে যৌথ কাজকর্মের সুযোগ ও তাগিদ উপলব্ধির দরুনই সাধারণত দেখা গেছে যে বুদ্ধিজীবীরা পার্টির ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বলশেভিক বিপ্লব, ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী-সংগ্রাম, সোভিয়েত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ফ্রান্সে বেকারসংখ্যা বৃদ্ধি, হিটলারের অভ্যুত্থান ও নাৎসী নির্মমতা, ফ্রান্সে ১৯৩৪ সনের (৬ই ফেব্রুয়ারি) ফ্যাসিস্ট দাঙ্গা, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, মিউনিক তোষণনীতি, নাৎসীবিরোধী সংগ্রাম, তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের কলঙ্কমোচনের আগ্রহ, দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কিন অনুপ্রবেশের বিরোধিতা—এই সব ঘটনাই বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করে পার্টির দিকে। আর তেমনি আবার তাঁদের মধ্যে সমাজতন্ত্রে মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে বা হতে পারে—এমন সংশয় যখনই জেগেছে (যেমন, সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে সোভিয়েত সরকার ও পার্টি বুদ্ধিজীবীদের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন, বহু লেখক বা সংস্কৃতিকর্মী দেশত্যাগ করেছেন, এমনকি গর্কিও নাকি স্বেচ্ছা-নির্বাসিত—এই সব খবর, সোভিয়েত ইউনিয়নে গোড়ার দিকে সোশাল রেভলিউশানারি ও পরে ট্রটস্কিপন্থীদের বিতাড়ন, তারও পরে মস্কো বিচার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি সম্পাদন, সোভিয়েত-ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে যুগোশ্লাভিয়ার বহিষ্কার, সংস্কৃতি ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে জ্দানভ-পন্থার প্রচলন, সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমশিবিরের অস্তিত্ব, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে সোভিয়েত আইনের ব্যত্যয় ও অনাচার সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের অন্যান্য তথ্য উদ্‌ঘাটন, হাঙ্গেরিয়ান অভ্যুত্থান এবং এই সব ঘটনা সম্পর্কে ফরাসী পার্টির মনোভাব) তখনই তাঁরা বিমুখ অথবা সংশয়ান্বিত হয়েছেন পার্টির সম্পর্কে।

অন্যদিকে কিন্তু যদি ধরে নেওয়া হয় যে পার্টি যখন যুক্তফ্রণ্ট গঠনের দিকে ঝুঁকেছেন তখনই শুধু তার তরফে চেষ্টা হয়েছে বুদ্ধিজীবীদের কাছে টানার (এর অনুসিদ্ধান্তটি সমেত) তাহলে ঠিক হবে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে লেখক দেখিয়েছেন যে প্রতিষ্ঠাকালেই ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি বুদ্ধিজীবীদের কাছে সমর্থনের জন্য আহ্বান জানিয়েছে যদিও তখন সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্য বা যুক্ত কর্মকাণ্ডকে মোটেই সুনজরে দেখা হত না, এমনকি প্রায় নীতিবিরুদ্ধ গণ্য করা হত। আবার ১৯২৪ সনে পার্টি যখন যুক্ত-

ফ্রন্টের নীতি গ্রহণ করে তখনই কিন্তু 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের' ঐ নির্দেশের প্রতিবাদে কোনো-কোনো বুদ্ধিজীবী পার্টি ত্যাগ করেন এবং পার্টির দিক থেকেও বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে কিছুটা কড়া মনোভাব দেখানো হয়। কাজেই পার্টির তরফে যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি গ্রহণ ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত সব সময়েই একযোগে ঘটবে—এমন সিদ্ধান্ত অসমীচীন।

আসলে ফরাসী ইতিহাস ও সমাজের বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিয়েও বলা যায় যে ধনতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি, মধ্যশ্রেণীর একটি অংশ এবং বিভিন্ন মতাদর্শের বাহক—এই দুইদিক থেকেই বুদ্ধিজীবীদের দেখে এবং তাঁদের প্রতি মনোভাব স্থির করে, অর্থাৎ সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে মতাদর্শগত সংগ্রামের তাৎক্ষণিক চাহিদা দ্বারা প্রয়োজনমতো পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। স্বভাবতই অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থার যুক্তি সুবুদ্ধিরই পরিচায়ক। কিন্তু বিপত্তি বাধে যখন হয়তো এই নীতি অনুযায়ী সংকটকালে ন্যায্যভাবেই আপদ্ধর্ম হিসাবে গৃহীত ব্যবস্থা পরে ক্রমশ প্রায় সদ্ধর্ম হয়ে ওঠে অবস্থান্তর সত্ত্বেও। সেখানেও আসলে যা ঘটে তা হচ্ছে 'মূল দৃষ্টিভঙ্গির চৌহদ্দীর ভিতরে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থার' একান্ত সুবুদ্ধির নীতিরই লঙ্ঘন—নীতিটির যাথার্থ্য খর্ব হয় না তাতে।

আর-একটি কথা। উপরে যে-সব ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হল তার থেকে দেখা যাবে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপত্তি বেধেছে তখনই যখন 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' বা 'কমিনফর্ম' বা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে ফরাসী জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বোধ হয়েছে। কিন্তু 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' বা 'কমিনফর্মের' অস্তিত্ব আজ নেই আর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসের পর থেকে ঘটনাপ্রবাহ ক্রমেই বিভিন্ন দেশের পার্টিগুলিকে সাবালক গণ্য করার দিকেই এগিয়ে চলেছে। ইটালিয়ান পার্টির অদ্বিতীয় নেতা, তোগ্লিয়াত্তির 'বহুকেন্দ্রিকতার' নীতি ছাড়াও কার্যক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়া দেখা যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরেও বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে জ্দানভ-নীতি বহুলাংশেই কোণঠাসা যদিও অবশ্য এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রথমটির মতো অত সুনিশ্চিত নয়। সেখানে লড়াই এখনো অব্যাহত।

আলোচ্য বইটির প্রকাশকাল ১৯৬৪ সন হওয়া সত্ত্বেও কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিতরকার এই প্রক্রিয়াকে লেখক কেন জানি না উপেক্ষা

করেছেন। অবশ্য ২০তম কংগ্রেসের তিনি উল্লেখ করেছেন কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সেখানে তাঁর আলোচনা শুধু স্তালিন-সংক্রান্ত ব্যক্তিপূজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বইটির সব থেকে বড় অসম্পূর্ণতা এইখানেই।

লেখক তাঁর বইয়ে দুটি নতুন তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। একটি হল পার্টির চোখে বুদ্ধিজীবীদের উপযোগিতা-সংশ্লিষ্ট নীতি, তিনি যার নামকরণ করেছেন 'Principle of Utility'। আর দ্বিতীয়টি হল কমিউনিস্ট বা 'সহযাত্রী' বুদ্ধিজীবীদের মানস প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের নিয়ম (Law of Compensation)। লেখকের মতে কমিউনিস্ট পার্টির চোখে বুদ্ধিজীবীদের উপযোগিতা পাঁচ রকমের হতে পারে, যথা, কোনো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর খ্যাতি বা মর্যাদা পার্টিকেও গৌরবান্বিত করে, দ্বিতীয়ত, তাঁর বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো বুদ্ধিজীবীর অবদান, অন্য বুদ্ধিজীবী বা শিক্ষিত সাধারণকে আকৃষ্ট করে; তৃতীয়ত, লেখক বা শিল্পী বা ঐ-ধরনের বৃত্তিগত সংস্থার মধ্যে তিনি কাজ করতে পারেন; চতুর্থত, তিনি রাজনৈতিক সাংবাদিকতা করতে পারেন এবং সবশেষে একজন সৃষ্টিশীল মার্কসবাদী হিসাবে তিনি জনসাধারণের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার মানোন্নয়নে অগ্রণী হতে পারেন। লেখক অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে এই নীতিগুলি *post hoc* rationalization' এবং পার্টি তার বুদ্ধিজীবী-সংক্রান্ত নীতিকে কোনোদিন এইভাবে উপস্থিত করেছে বা সচেতনভাবে এই ছকের ভিত্তিতে কাজ করেছে—এমন কথা তিনি বলতে চান না।

লেখকের 'ক্ষতিপূরণের নিয়মটি' বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। কোনো বুদ্ধিজীবী যখন অনুভব করেন যে তাঁর কাছে খুবই জরুরী ও জোরালো একটি প্রশ্নে তাঁর উচিত কমিউনিস্টদের সমর্থন করা তখন অন্যান্য ক্ষেত্রেও, এমনকি যেসব ব্যাপারে হয়তো তাঁর কিছুটা সংশয় আছে সেখানেও তিনি ক্রমশ ঝুঁকতে থাকেন কমিউনিস্টদের দিকে। লেখকের মতে এটা নিছক সুবিধাবাদ নয়, মিথ্যাচরণও নয়। আসলে এর কারণ বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতি বা সমাজজীবন সম্পর্কে একটা বেশ সুসংবদ্ধ, সংগতিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী দর্শন ও কর্মকাণ্ড সন্ধানলাভের জন্য যে-আকুতি থাকে তারই তাগিদে তাঁরা বাস্তব অসম্পূর্ণতাকে পূরণ করতে চান হয়তো আপন মনের মাধুরী মিশিয়েই। বলা বাহুল্য, এই ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়াটি অচেতন—একে তাই হয়তো আত্মপ্রবঞ্চনা বলা যেতে পারে।

শেষ অধ্যায়ে লেখক বলেছেন যে বুদ্ধিজীবীদের মনের এই ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ার দুটি রূপ দেখা যায়। কমিউনিস্ট শিবিরের অনাচারের অথবা প্রতিকূল সংবাদমাত্রকে বিরোধী শিবির-উদ্ভূত বলে উড়িয়ে দেওয়া অথবা ত্রুটিগুলিকে স্বীকার করে নিয়েও বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ ত্রুটিকে, ভবিষ্যতের স্বার্থে বর্তমানের অসম্পূর্ণতাকে মেনে নেওয়া। লেখক দেখিয়েছেন যে দ্বিতীয় ব্যাপারটি শুধু কমিউনিস্ট নয়, অন্য বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেও ঘটে। যেমন তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের সমর্থক বহু বুদ্ধিজীবী হয়তো ভের্সাই সন্ধির অন্যায়, 'ব্লক ন্যাশানালের' অপদার্থ স্বরাষ্ট্রনীতি, মরোক্কো, সিরিয়া, ইন্দোচীন উপনিবেশিক অত্যাচার, ব্যাপক বেকারি, সমাজজীবন ও পার্লিয়ামেন্টারি রাজনীতির ক্ষেত্রে দুর্নীতি, প্রজাতন্ত্রী স্পেনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, মিউনিক তোষণনীতি, ম্যাকার্থী সন্ত্রাস, সুয়েজের সাম্রাজ্যবাদী অভিযান, আলজিরিয়ায় স্বাধীনতা-আন্দোলন দমন—এর প্রত্যেকটিরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। তবু ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত কোন শক্তিজোটে, কোন শিবিরে থাকবে—এই মূল প্রশ্নের মুখোমুখি পৌঁছে তিনি পশ্চিমী জোটের দিকেই মত করতে পারেন। যদি করেন তাহলেও তিনি তা করেন তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের ঐ-সব গুরুতর অনাচার সত্ত্বেও। এ-ক্ষেত্রেও তাই লেখক-বর্ণিত 'ক্ষতিপূরণের নিয়মটি' কার্যকর।

তবে ঐ নিয়মের প্রথম রূপটি অর্থাৎ আপন শিবির সম্পর্কে প্রতিকূল সংবাদমাত্রকেই শত্রুপক্ষের রটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া বা তার যাথার্থ্য অন্তরে অন্তরে অনুভব করলেও তার প্রকাশ্য স্বীকৃতি অপরপক্ষকে শক্তিশালী করবে এই ধারণা পোষণ করা লেখকের মতে শুধু কমিউনিস্টদের মধ্যেই দেখা যায়। অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বহু সমর্থক কিন্তু ঐ-ব্যবস্থার কোনো কোনো অসম্পূর্ণতা বা অনাচারকে খোলাখুলি নিন্দা করতে কুণ্ঠিত হন না। সে নিন্দার ফলে তাঁদের সমাজব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়বে বা কমিউনিস্ট শিবির আরো শক্তিশালী হবে—এই ধারণা তাঁদের নিরস্ত করে না সে-কাজে।

লেখকের এই অনুযোগের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছুটা সত্য আছে। তবু এখানেও মনে হয় লেখক সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেস থেকে উৎসারিত ঘটনাপ্রবাহের উপরে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তার কারণ কি এই যে ফরাসী পার্টি এখনো ইতিহাসের নতুন পর্বকে তলিয়ে বোঝার চেষ্টায় ততটা অগ্রসর হয় নি ইটালিয়ান পার্টির মতো ?

লেখক বলেছেন কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে 'ক্ষতিপূরণের নিয়মটি' যে বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে তার ফলে তাঁদের তরফে বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে একটা আপোষ-রফা অনিবার্য হয়ে পড়ে আর এই আপোষের গ্লানি প্রতিফলিত হয় তাঁদের চারিত্র্যের উপরেও। তিনি এই লিখেছেন যে '...the tragedy of French Communism was not the intellectuals it seduced or those it lost but rather those it maimed.' কথাটা অবশ্যই নির্বিশেষভাবে ঠিক নয় কারণ রলাঁ-আনাতোল ফ্রান্স-বারব্যুসের সাহিত্য, পিকাসো-মাতিস্-ব্রাক্-লেজারের ছবি, লাজভাঁ-জোলিও-কুরিদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা, এলুয়ার-আরাগঁর কবিতা নিশ্চয়ই মানসিক পঙ্গুতার সাক্ষ্য দেয় না। কিন্তু অখণ্ড কমিউনিস্ট চৈতন্য যে এখনো পর্যন্ত আরো ব্যাপকভাবে প্রস্ফুরিত হতে পারছে না অজস্র শিল্পকর্মে ও গবেষণায়—এ কথা ঠিক। আর এ-ক্ষেত্রে একটি মস্ত প্রতিবন্ধক যে পুরানো ধ্যানধারণা ও সাংগঠনিক রীতি তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে রাহুল সাংকৃত্যায়ন বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নইলে কি করতে পারতেন সে নিয়ে আজ শুধু মাথা ঘামানোই চলে।

ভবানী সেন

কামউনিজম্ বাদে মার্কস্‌বাদ ?

আলোচ্য গ্রন্থখানি মার্কসবাদের সমালোচনা হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই গ্রন্থের সমালোচনাটা বেশ কৌতুকপ্রদ। তাছাড়া "কংগ্রেস অব কালচারাল্‌ ফ্রিডম" নামে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের যে দৌবারিক প্রতিষ্ঠানটি বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি ধরে রাখতে সক্রিয় তারই রিসার্চ গ্র্যাণ্ট নিয়ে জর্জ লাইটহাইম এই গ্রন্থখানি লিখেছেন।

সবাই জানেন যে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন এই তিন জনের নাম একই নীতির সৃষ্টি, গবেষণা, প্রয়োগ ও সমৃদ্ধিসাধনের সঙ্গে সমানভাবে জড়িত। এ বিষয়ে নতুন কথা শোনালেন জর্জ লাইটহাইম্‌। লাইটহাইম সাহেবের মতে মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেলস-এর পার্থক্য গুণগত, আর লেনিন নাকি মার্কসবাদের সর্বপ্রধান সংশোধনকারী। লেখক বলেছেন যে মার্কস ছিলেন মূলত দার্শনিক এবং এঙ্গেলস মূলত বৈজ্ঞানিক। মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গীতে নাকি বাস্তবতার স্থান ছিল কম, ইতিহাস সৃষ্টিতে মানুষের আন্তরিক প্রেরণাকেই তিনি নাকি প্রধান স্থান দিতেন। তাই তিনি ছিলেন বিপ্লবী। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—এই পণ্ডিতপ্রবরের মতে এঙ্গেলস বিপ্লবী ছিলেন না, কারণ বৈজ্ঞানিক নাকি কখনও বিপ্লবী হতে পারেন না, বিপ্লবী হতে হলে দার্শনিক হতে হয়। গ্রন্থকার দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের চিরন্তন বিরোধে বিশ্বাসী।

লেখকের সর্বপ্রধান আবিষ্কার—এঙ্গেলস্‌। তাঁর ধারণা ডাইলেকটিক্যাল বস্তুবাদী দর্শন এঙ্গেলসেরই একার সৃষ্টি, মার্কসের নয়। ডায়লেকটিক্যাল বস্তুবাদ সম্পর্কে মার্কসের ধারণা ছিল অস্পষ্ট আর এঙ্গেলসের ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। এই ডাইলেকটিকাল বস্তুবাদের স্রষ্টা হিসেবে এঙ্গেলসকেই শুধু নয়, ডায়লেকটিক্যাল বস্তুবাদের অর্থও এই গ্রন্থলেখক নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে, ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ দর্শন নয়, বিজ্ঞান, "ডারুউইনের তত্ত্বের মত" একটি

'মার্কসিজম'—একটি ঐতিহাসিক ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। লেখক—জর্জ লাইট্‌হাইম্‌। প্রকাশক—ফ্রেডারিক, এ প্রেসার (নিউইয়র্ক, লণ্ডন)।

"ক্রমবিকাশতত্ত্ব"। লেখক আরও পরিষ্কার করেছেন। এঙ্গেল্স্ ডায়লেকটিস-তত্ত্ব লিখেছেন 'অ্যান্টিডুরহিং' নামক পুস্তকে এবং এই বইখানা প্রকাশ করার আগে মার্কসকে তিনি দেখিয়েছিলেন; মার্কস এই গ্রন্থের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি তবে এই তত্ত্ব প্রচারিত হলে বাকুনিনদের প্রতিপত্তি নষ্ট করার জন্য কাজের সুবিধে হবে মনে করে মার্কস গ্রন্থখানির প্রকাশনে নিমরাজি হয়েছিলেন। মার্কস এঙ্গেলসের ডাইলেকটিকাল বস্তুবাদ পুরোপুরি মানতেন না।

আর লেনিন? তিনি তো এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের ধার দিয়েও যেতেন না, তবে মার্কসের মতো বিপ্লবী প্রেরণা তাঁর ছিল। কিন্তু 'মার্কসবাদ' নামে যে-তত্ত্ব মার্কসবাদীদের জানা ছিল বা মার্কসবাদীরা যে-তত্ত্বকে মার্কসবাদ বলেন লেনিন নাকি তার ধার ধারতেন না। কারণ, মার্কসের মতো দর্শনও তার ছিল না, এঙ্গেলসের মতো বিজ্ঞানও না। মার্কস এবং লেনিন কেউ মার্কসবাদী ছিলেন না, মার্কসবাদী হলেন শুধু এঙ্গেলস। এই সব মন্তব্য থেকে মনে হয় লেখক মার্কসবাদের ব্যাপারে বিরিঞ্চি বাবার মতোই সর্বদর্শী। রুশ বিপ্লব সফল হল কি করে? তার উত্তরে লেখক বলছেন যে বহু আকস্মিক ঘটনার সমাবেশ রুশ বিপ্লবের সফলতার জন্য দায়ী। তাঁর মতে লেনিন্ ছিলেন খুব চতুর লোক, কোনোরকম পূর্বাপর সংগতির পরোয়া না করে যখন যা খুশী তাই ঘোষণা করে রুশীয় ইতিহাসের কতকগুলি আকস্মিক ঘটনাকে তিনি খুব তৎপরতার সঙ্গেই কাজে লাগান। এই চতুরতাই ছিল লেনিনের প্রতিভা।

রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্বন্ধেও গ্রন্থকার বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, সোভিয়েত রাষ্ট্রে "শ্রমিকের ডিক্টেটরশিপ" নাম দিয়ে যে-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো—তা আদৌ শ্রমিকের ডিক্টেটরশিপ নয়, তা হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির ডিক্টেটরশিপ; এ কথা অবশ্য বহু বুদ্ধিজীবীই বলে থাকেন। কিন্তু গ্রন্থকার তাদের উপর টেক্কা দিয়ে বলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের এই কমিউনিস্ট পার্টিটি কস্মিনকালেও শ্রমিকের পার্টি ছিল না, এখনও নয়। তবু যদি বলা হয় যে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর ভ্যানগার্ড আর সোভিয়েত রাষ্ট্র হলো তার ডিক্টেটরশিপ তাহলে লেখক বলতে চান যে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী দ্বিধা-বিভক্ত, তার একাংশ আর-এক অংশের হাতের ডিক্টেটরশিপের ক্ষমতা তুলে দিয়ে চুপচাপ আছে।

মার্কসবাদের বিবিধ তত্ত্ব নিয়ে অনেক গবেষণার পর লেখক ঘোষণা

করেছেন যে "সোভিয়েত মার্কসবাদ" নামে যে-মার্কসবাদ বাজারে চালু আছে তা আসলে মার্কসবাদই নয়।

এখন ট্রটস্কী যদি জীবিত থাকতেন এবং জর্জ লাইটহাইম ও ট্রটস্কী উভয়েই যদি হিন্দু হতেন তাহলে লাইটহাইম সাহেব সম্ভবত ট্রটস্কীর সামনে গঙ্গাজলের ঘট রেখে বলতেন—এই ঘট ছুঁয়ে বলতো আমি যা বলছি তা সত্য কিনা। ট্রটস্কীর কথা তুললাম এইজন্য যে গ্রন্থকারের মতে রুশবিপ্লবীদের মধ্যে একমাত্র ট্রটস্কীরই যা কিছু নীতিজ্ঞান ছিল, এমনকি লেনিনও যখনই বেকায়দায় পড়েছেন, ট্রটস্কীর কাছ থেকেই নীতি ধার করে নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ইতিপূর্বে মার্কসবাদের আর-কোনো প্রতিপক্ষ কি এমন রত্ন প্রসব করেছেন?

এই পর্যন্ত পড়ে পাঠকদের বোধ হয় মনে হবে যে এমন একটা ছ্যাবলা লেখকের ছ্যাবলামিকে অনর্থক একটা গ্রন্থপরিচয়ের মর্যাদা দিচ্ছি। কিন্তু বইখানা পড়লেই বুঝবেন যে জর্জ লাইটহাইম আদৌ ছ্যাবলা নন। ইতিহাস, দর্শন এবং অর্থনীতিতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য আছে এবং সেই পাণ্ডিত্যসহ তিনি মার্কসবাদের গুরুগম্ভীর সমালোচনাও করেছেন। উপরে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন সম্পর্কে গ্রন্থকারের যে-মতামত পরিবেশন করলাম তা একজায়গায় রাখলে যেমন শোনায়, ৪০৬ পাতার বইখানি আগাগোড়া খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে না পড়লে ঠিক তেমনটি ধরা যায় না। এটা হয়তো মার্কসবাদকে আক্রমণ করবার নতুন আমেরিকান কায়দা। ভাবরাজ্যের পি. এল. ৪৮০ আর কি!

লেখক আরম্ভ করেছেন ইতিহাসের একটা সঠিক বিবরণসহ মার্কসবাদী তত্ত্ব যে-সমস্ত পূর্বসূত্র থেকে আগত তার মধ্যে জার্মান দর্শন, উটোপিয়ান সমাজতন্ত্রবাদ, ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতি আর ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলন—এই চারটির নাম গ্রন্থকার সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন। জার্মান হেগেলীয় দর্শনকে উল্টো করে দাঁড় করিয়ে, ক্ল্যাসিকাল ইকনমিকস থেকে শ্রেণীগত শোষণের তত্ত্ব আহরণ করে এবং ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলন থেকে পুষ্ট হয়ে মার্কসবাদ ধনিকসভ্যতার বিরুদ্ধে একটা বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জরূপে আত্মপ্রকাশ করে। লেখক দ্বিধাহীন চিত্তেই সে কথা স্বীকার করেছেন। হেগেলের হাতে পড়ে জার্মান ভাববাদী দর্শন হয়ে পড়ল প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের হাতিয়ার, সুতরাং তরুণ হেগেলীয়রা করলেন বিদ্রোহ। তখন বিপ্লবী

মার্কস নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারে মনোনিবেশ করলেন। অসাধারণ প্রতিভাশালী মার্কস জার্মান দর্শন, উটোপিয়ান সমাজতন্ত্রবাদ এবং ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির অনেক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এমন একটা নতুন নীতি দাঁড় করালেন যা একটি আন্তর্জাতিক শক্তিতে পরিণত হলো। লেখক অসংকোচে এ সমস্তই স্বীকার করেছেন।

মার্কসবাদী তত্ত্বের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জর্জ লাইটহাইম মার্কসবাদের অপরাপর কুৎসারটনাকারীদের পায়ে-হাঁটা পথ ছেড়ে দিয়ে কতকটা ইতিহাসের পথ অবলম্বন করেছেন এবং সেজন্য মার্কসবাদের পূর্বসূত্র সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অসত্য হতে পাবে নি। অথচ মার্কসবাদের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ রোধ করাও দরকার। সেজন্য তিনি দুটি কাজ করেছেন: প্রথমত তিনি মার্কস, প্রুধঁ, বাকুনিন প্রভৃতি সবাইকেই বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী আখ্যা দিয়ে তত্ত্বের দিক থেকে মূলত একই তত্ত্বের পর্যায়ে ফেলেছেন—সে তত্ত্ব হলো "র‍্যাডিকাল হিউম্যানিজম" (বামপন্থী মানবতাবাদ)। দ্বিতীয়ত, লেখকের মধ্যে মার্কসের র‍্যাডিকাল হিউম্যানিজম-এর পূর্বসূরী হিসেবে দাঁড় করালেন হেগেলকে। কিন্তু ইতিহাসের পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও বেপরোয়া অভিযানসমূহ নিয়ে যে-মতবাদ রচিত তা মানবতাবাদের পরিপন্থী। তা যদি না হত তাহলে মার্কস ও মার্কসবাদীদের সঙ্গে বাকুনিনের বিরোধ অত উগ্ররূপ ধারণ করত না। দ্বিতীয়ত, এই মানবতাবাদের পূর্বসূরী হেগেল নন, সেণ্ট সাইমন, ওয়েন ও সিসমঁদি প্রভৃতি উটোপিয়ান সোশ্যালিস্টগণ। মার্কস ও মার্কসবাদীরা নির্যাতিত মানবসমাজের মুক্তির জন্য হিংসাত্মক পন্থা গ্রহণ করেছেন বাকুনিনের মতো হিংসাপ্রবণ আবেগ নিয়ে নয়, সামাজিক শক্তির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নিয়ে। তাই অযথা রক্তপাতের পক্ষপাতী তাঁরা কখনও ছিলেন না। সেণ্ট সাইমন প্রভৃতি মানবতাবাদী সমাজতন্ত্রীদের সত্যকার উত্তরাধিকারী বাকুনিন নয়, মার্কস এবং এঙ্গেলস।

এবার, মার্কসের মতামত সম্পর্কে গ্রন্থকারের পর্যালোচনা পরীক্ষা করা যাক। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ঘোষণা করেছিলেন যে ধনিকশ্রেণী এখন আর সমাজের শাসক হবার উপযুক্ত নয়। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বলছেন যে এটা একটা অত্যুক্তি। ক্যাপিটাল গ্রন্থে মার্কসও এ কথাটা একটু নরম করে দিয়েছেন এবং এঙ্গেলস তো এরকম ধরনের সিদ্ধান্ত বর্জনই করেছিলেন।

গ্রন্থকারের মতো একজন পণ্ডিত ব্যক্তির কলম থেকে এই রকম বিশ্লেষণে স্তম্ভিত হতে হয়। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর যুক্ত সৃষ্টি। অতএব তার একটা ঘোষণা মার্কসের কথা, সেটা এঙ্গেলসের কথা নয়, এরকম উক্তি যিনি করেন তাঁর মতের বিশেষ কোনো মূল্য নেই। ক্যাপিটাল গ্রন্থে মার্কস ঐ কথাটা নরম করে ফেলেছেন, এ সিদ্ধান্তও অচল! ম্যানিফেস্টো হলো সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আহ্বান, ধনিকশ্রেণীর হাত থেকে রাষ্ট্রশক্তি কেড়ে নেবার জন্য। সুতরাং তাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে এখন আর ধনিকশ্রেণী শাসক হবার যোগ্য নয়, সে যোগ্যতা এখন শ্রমিকশ্রেণীর হাতে চলে গিয়েছে। ক্যাপিটাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শেষ করা হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি ক্ষমতা দখলের এই আহ্বান জানিয়ে। কোথায় যে তা নরম করে ফেলা হয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য লাইট-হাইম সাহেব কোনো উদ্ধৃতি দেন নি। তেমন কোনো কথা নেই বলেই তা দিতে পারেন নি। আর আজ সমগ্র বিশ্বে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রার সময়ও কি এ কথা প্রমাণিত হয় নি যে ধনিকশ্রেণীর রাজদণ্ড শ্রমিকশ্রেণীর হাতেই চলে যাচ্ছে?

অর্থনীতির আলোচনাসূত্রে গ্রন্থকার সঠিকভাবেই মার্কসকে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির মূল্যতত্ত্বের উত্তরাধিকারী বলে বর্ণনা করেছেন। এ কথাও স্বীকার করেছেন মার্কস অর্থনীতিকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু তবু প্রমাণ করতে ছাড়েন নি যে মার্কস-এর অর্থনীতি অবৈজ্ঞানিক। এ বিষয়ে মূল্য ও দর সম্পর্কিত আলোচনা উল্লেখযোগ্য।

মার্কসের মতে পণ্যের দাম নিরূপিত হয় মূল্যদ্বারা, মূল্য নিরূপিত হয় শ্রম-সময় দ্বারা। শ্রমশক্তিই মূল্যরূপে পণ্যের মধ্যে রূপান্তরিত হয়। দামের মাপকাঠি অর্থ। যে পরিমাণ অর্থের মধ্যে যে পরিমাণ ধাতুদ্রব্য থাকে তার যা মূল্য তার সমমূল্য থাকে অন্য পণ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণের ভিতর। সুতরাং পণ্যের দাম নিরূপিত হয় মূল্যদ্বারা। কিন্তু বাজারে মূল্য আর দাম বলতে হুবহু এক হয় না। দামটা হয় কখনও মূল্যের বেশি, কখনও মূল্যের কম। এরকম হবার কারণ প্রধানত দুটি: প্রথমত, অর্থ আদিতে ছিল মূল্যসমন্বিত ধাতুদ্রব্য, কালক্রমে অর্থ হয় দাঁড়াল অর্থেরই একটি পরিচয়জ্ঞাপক নিশানা; যেমন কাগজের নোট। বাজারে মোট পণ্যের মোট মূল্য যদি একই থাকে তবে অর্থের সংখ্যা বেশি বা কম হলে দামের তারতম্য ঘটে। দ্বিতীয়ত বাজারে

পণ্যের বিনিময় ঘটে অনিয়ন্ত্রিতভাবে, আমদানির চেয়ে চাহিদা বেশি হলে দাম বাড়ে, অর্থাৎ অল্পমূল্যের বিনিময়ে বেশি অর্থ দিতে হয়। তেমনি আমদানির চেয়ে চাহিদা কম হলে দাম কমে, অর্থাৎ বেশি মূল্যের বিনিময়ে কম অর্থ দিতে হয়। আমদানি এবং চাহিদা ঠিক সমান-সমান হলে মূল্য এবং দামও হয় সমান-সমান। কিন্তু ধনতান্ত্রিক বিনিময় পদ্ধতির স্বরূপই এই যে অনিয়ন্ত্রিত বাজারে আমদানি এবং চাহিদা কখনও সমান হয় না, সুতরাং মূল্য এবং দামও কখনও হুবহু এক হয় না।

লাইটহাইম মার্কসীয় অর্থনীতির এই গতিশীলতা (ডিনামিকস) লক্ষ না করে বলছেন যে দাম যেহেতু কখনই মূল্যের সমান হয় না অতএব মার্কসের মূল্যতত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক। তা যদি হয় তো মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বও অবৈজ্ঞানিক, কেননা বস্তুর পতন কখনও এমন বিশুদ্ধ অবস্থায় ঘটে না যাতে নিছক মাধ্যাকর্ষণের বেগ ধরা যায়, বৈজ্ঞানিক তা ধরেন বায়ুশূন্য অবস্থা সৃষ্টি করে বস্তুর পতন লক্ষ দ্বারা। কিন্তু অর্থনীতির ব্যাপারে সামাজিক শক্তি নিয়ে লেবরেটারিতে ওরকম পরীক্ষা করা যায় না। তা ছাড়া ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই প্রকট হয়েছে বিনিময় পদ্ধতির ভিতর। তাই মূল্যদ্বারা দাম ঠিক হয়, অথচ মূল্য থেকে দাম চিরকালই পৃথক।

ধনতন্ত্রের সংকট সম্পর্কে লেখক একজায়গায় মার্কসের তত্ত্বকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে লিখেছেন যে ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই সংকটের কারণ এ বিষয়ে কেইনস-এর সঙ্গে মার্কস-এর পার্থক্যও সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে লেখক দেখিয়েছেন যে কেইনস-এর মতে ধনতন্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ করেই সংকট দেখা দেয় আর মার্কস-এর মতে সংকটের উদ্ভব ধনতন্ত্রের নিয়ম থেকেই।

ধনতন্ত্রের সংকট সম্পর্কে লেখক তাঁর নিজ মত প্রকাশ করেন নি, কিন্তু মার্কসের মূল্যতত্ত্বকে ভুল প্রতিপন্ন করে বুদ্ধিজীবীদের হাতেই ধনতন্ত্রকে স্থায়ী ব্যবস্থারূপে প্রমাণ করার ভার ছেড়ে দিয়েছেন। যে-বুদ্ধিজীবীরা এটুকু সহজেই ধরতে পারবেন যে মার্কসের মূল্যতত্ত্ব থেকেই তার উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব এবং উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব থেকে ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী বিনাশের তত্ত্ব পাওয়া গেছে তারা লাইটহাইমের মূল্যায়নে প্রতারিত হবেন না, কিন্তু অন্যেরা হবেন। মূল্যতত্ত্ব যদি নস্যাৎ করে দেওয়া যায়, তাহলেই ধনতন্ত্রের স্থায়িত্ব প্রমাণ করার পথ পরিষ্কার হয়। মার্কসের মূল্যতত্ত্বের মধ্যেই ধনতন্ত্রের গতি ও পরিণতির নিয়ম রয়েছে সুপ্ত।

চারশ' ছয় পৃষ্ঠার সমালোচনা একটি ক্ষুদ্র পরিসর প্রবন্ধে সম্ভব নয়। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করার নতুন কৌশলটি সম্পর্কে পাঠকদের পরিচয় করানোই এই গ্রন্থপরিচয়ের উদ্দেশ্য। এই নতুন কৌশলের গোড়ার কথা হলো এই যে মার্কসবাদ বর্তমানে বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে তা মনে রেখেই সূক্ষ্মভাবে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে তাদের মনটা ঘুরিয়ে দেওয়া।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পদ্ধতি এখন সাধারণভাবেই সর্বত্র সমাদৃত। অধ্যাপক লাইটহাইম তাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ভঙ্গিতেই মার্কসবাদ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন—যাতে তাঁর খণ্ডনটা উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার বলে ধরা না পড়ে, যাতে এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশ্লেষণরূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতি অনুকরণ করার ফলেই লেখকের পর্যালোচনা বিচার করাও সহজ হয়ে পড়েছে। একটি বৈজ্ঞানিক সত্যকে অবৈজ্ঞানিকরূপে চিত্রিত করার জন্য যদি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ছায়াবলম্বনে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহলে তার স্ববিরোধ প্রতি ছত্রেই প্রকট হয়ে ওঠে। মার্কস ও মার্কসবাদের যে সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য সঠিক বলেই গ্রন্থকার কর্তৃক স্বীকৃতিলাভ করেছে, সেইগুলির আলোকসম্পাতেই তাঁর বিরোধী মন্তব্যগুলির স্ববিরোধিতা ধরা পড়ে।

এ-বিষয়ে দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক :

গ্রন্থকারের মতে এঙ্গেল-সই অ্যান্টি-ডুরহিং পুস্তকে ডাইলেকটিকাল বস্তুবাদ প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু এই পুস্তকের কোথাও কি এমন আভাস পাওয়া যায় যে এঙ্গেলস ছিলেন শ্রমিক আন্দোলনে সংস্কারপন্থার অথবা ক্রমবিকাশ তত্ত্বের পক্ষপাতি? উক্ত গ্রন্থে এঙ্গেলস বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ডায়লেকটিক মতবাদ যে ক্রমবিকাশ তত্ত্ব নয়, সমাজের বা সর্ববস্তুর যে সময়-সময় আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে তা প্রকাশ করেছেন। অথচ লেখকের মতে মার্কস নাকি এঙ্গেলস-এর উক্ত পুস্তিকাখানি সম্পর্কে পুরোপুরি একমত হতে পারেন নি ঐ ক্রমবিকাশ তত্ত্বের জন্য। বলা বাহুল্য এটা লেখকের নিছক কল্পনাবিলাস।

গ্রন্থকারের মতে মার্কসের মৃত্যুর পর ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনে যে রিফরমিস্ট ধারা আসে তা এঙ্গেলস-এরই সৃষ্টি। এই মন্তব্য দ্বারা গ্রন্থকার এইটেই প্রমাণ করলেন যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বাস্তবতা তাঁর মাথায়

ঢোকে নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে ধনবাদ ক্রমশ সাম্রাজ্য-বাদের স্তরে উন্নীত করার পূর্বমুহূর্তে যে সাময়িক স্থিতিশীলতা লাভ করেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেই ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের কর্মকৌশলে ১৮৪৮-এর কর্মকৌশলের পরিবর্তন ঘটে।

কিন্তু গ্রন্থকারের ধারণা—১৮৪৮-এর ধারাটাই মার্কসের ধারা, ১৮৮০-৯০-এর ধারাটা এঙ্গেলসের ধারা। কিন্তু গ্রন্থকার ভুলে যাচ্ছেন যে প্যারি কমিউনের পরও মার্কস জীবিত ছিলেন, জীবিতকালে তিনি ১৮৭১ সালের পরও ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের গতিনির্দেশ করেছেন। ১৮৭৫ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার সময়ও তিনি জীবিত। আর সেই সময় থেকেই ইউরোপীয় শ্রমিকআন্দোলনে শান্তিপূর্ণ ট্রেডইউনিয়নিজম-এর সূত্রপাত হয়। কাজেই এ-বিষয়ে মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর মধ্যে পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

গ্রন্থকার লেনিনকে মার্কসবাদী শিবিরে একেবারে অপাংক্তেয় করে দিয়েছেন। গ্রন্থকারের এই দুঃসাহসের কারণ চিন্তা করতে করতে মনে হল যে লেনিনের "সাম্রাজ্যবাদ" নামক গ্রন্থখানি এবং এইরকম আরও অনেক লেখা গ্রন্থকারের পর্যালোচনায় দেখলাম না। ধনতন্ত্র সম্পর্কে মার্কস এবং এঙ্গেলসের বিশ্লেষণ অনুযায়ীই লেনিন দেখিয়েছেন যে বিংশ শতাব্দীতে ধনবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ধনবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বসমূহ প্রকট হয়েছে তীব্রভাবে। এই সূত্র ধরেই লেনিন ব্যাখ্যা করেছেন যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনে যে শান্তিপূর্ণ ধারার সূত্রপাত হয়, ১৯০৫ সাল নাগাদ তা শেষ হয়ে যায়, শুরু হয় বিপ্লবী অভিযানের জোয়ার। রুশ বিপ্লবটা আকস্মিক ঘটনা নয়, ঐ জোয়ারের ধাক্কায় প্রতিক্রিয়ার একটা পাড় ভেঙে গেল। আবার সেই পাড়েই তৈরি হল নতুন জগৎ।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব সম্পর্কে লেখকের বিকৃত ব্যাখ্যাই তাঁর সমস্ত মন্তব্যের মঞ্চসজ্জা রচনা করেছে; এমনভাবে তাতে আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা হয়েছে যাতে দর্শকের সম্মুখে অলীক দৃশ্যও সত্যরূপে প্রতিভাত হয়।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদে বলা হয় যে ইতিহাস বাস্তবের অনুগামী।

কিন্তু ইতিহাসের বাস্তব মানুষকে নিয়ে। সুতরাং মানুষের সমবেত ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা যে বাস্তবের অনুগামী, সেই বাস্তবেরই অন্যতম মানুষের ইচ্ছা ও চেষ্টা। সুতরাং মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে।

কিন্তু মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করার সময় যা-খুশি তাই করতে পারে না। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত যে বাস্তবতার স্রোত তার সম্মুখে প্রবাহিত, তার ভিতর থেকেই সে তার ইচ্ছা ও চেষ্টার সত্তা সংগ্রহ করে।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এই সারমর্মই ধরতে পারেন নি। তিনি মানুষ বোঝেন আর বাস্তব বোঝেন, কিন্তু যে-বাস্তব মানুষকে নিয়ে তা তিনি বোঝেন না।

মার্কস যখন মানুষের সৃষ্টিশক্তির উপর জোর দিয়েছেন তখনকার সেই বক্তব্যটাই লাইটহাইম মার্কসের একমাত্র চিন্তারূপে গ্রহণ করেছেন আর এঙ্গেলস যখন যখন বাস্তবের অনিবার্য পরিণতির উপর জোর দিয়েছেন তখনকার সেই বক্তব্যকেই এঙ্গেলসের একমাত্র বক্তব্য বলে ধরেছেন। অথচ "ক্রিটিক অব পলিটিকাল ইকনমি"র ভূমিকায় মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সমগ্র সারাংশের যে-বিবরণ দিয়েছেন তা লাইটহাইমের চোখে পড়ে নি আর এঙ্গেলস "পরিবার, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি"-তে মানুষের সচেতন ভূমিকার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাও তেমনি উপেক্ষা করেছেন। এইভাবে তিনি মার্কসকে বানিয়েছেন মানবমন উপাসক, আর এঙ্গেলসকে বানিয়েছেন ক্রমবিকাশবাদী। অথচ মানবমন উপাসনার জন্য ফয়ারবাখের যে-সমালোচনা মার্কস করেছেন এবং অ্যান্টি ডুরহিং-এ এঙ্গেলস ডুরহিং-এর সমালোচনাসূত্রে সমাজবিপ্লবে মানুষের সক্রিয় ভূমিকার অস্বীকৃতিকে যে-ধিক্কার দিয়েছেন এই গ্রন্থ দুখানির পর্যালোচনার সময়ও সে কথা লাইটহাইমের মনে উদয় হয় নি। এটা খুবই আশ্চর্য নয় কি?

অথবা, আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। বুদ্ধিজীবীর মন থেকে মার্কসবাদের মোহ দূর করতে হবে বুদ্ধিজীবীরই চিন্তাপ্রবণতার আশ্রয় নিয়ে। তাই, পাছে মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর তথাকথিত পার্থক্যও যদি বুদ্ধিজীবীকে বিভ্রান্ত না করে, সুতরাং লেনিন ও লেনিনোত্তর সোভিয়েত কমিউনিজমের খিস্তি করা হয়েছে। মার্কস অন্তত দার্শনিক এবং বিপ্লবী, এঙ্গেলস বিপ্লবী না হলেও বৈজ্ঞানিক; কিন্তু সোভিয়েত কমিউনিজম শুধুমাত্র মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ। অতএব মার্কসবাদী হও তা-ও সইবে কিন্তু কমিউনিস্ট হয়ো না।

এই হল বুদ্ধিজীবীর প্রতি আমেরিকার ধনিকের আবেদন—নতুন আমেরিকান পদ্ধতিতে কমিউনিজম-এর প্রতি আক্রমণ। এই আক্রমণকে প্রতিহত করেই খাস আমেরিকান বুদ্ধিজীবীর মধ্যেও মার্কসবাদী চিন্তার প্রসার রোধ করার ক্ষমতা লাইটহাইমদের নেই।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

নাট্যসমালোচনার মান

১৮৭২ সালে বাঙালি-পরিচালিত পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ১৯৬৫ সাল। এই দীর্ঘ নব্বই বছরেও বাংলা ভাষায় থিয়েটার সমালোচনার কোনো মান তৈরি হয় নি। সেকালে ও একালে বড় পার্থক্য নেই। আগের যুগে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর মতো লোকও কোনো শিল্পীকে প্রশংসা করতে গিয়ে বলতেন : 'অমুক জ্বালাইয়া দিয়াছে।' এ-যুগের সমালোচনাও সেই অসমালোচক অমূর্ত ভাবোচ্ছলতার রূপান্তর মাত্র। অথচ বাংলাদেশের থিয়েটার-সমালোচকের কর্মভার য়ুরোপীয় যে-কোনো দেশের থিয়েটার সমালোচকের তুলনায় নগণ্য। একটি প্রাসঙ্গিক তুলনাই যথেষ্ট। প্যারিসের কথাই ধরা যাক। এই শহরে বর্তমানে ষাটের বেশি রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনয় হয়ে থাকে। বাজার গরম-করা পেশাদারি কর্মীর নাটক ছাড়া যাঁদের নাটক নিয়মিত অভিনীত হয় তাঁরা হলেন Sartre, Anouilh, Camus, Cocteau, Ayme, Claudel, Salacron, Beckett, Ionesco, Genet, Adamov, Arrabal, Billetdoux. এ ছাড়া Racine থেকে Mauriac পর্যন্ত ফরাসী নাট্যকার এবং Shakespeare থেকে Brecht পর্যন্ত তাবৎ অ-ফরাসী নাট্যকারেরাও প্যারিসের রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনীত হয়ে থাকেন। এই বিরাট সমৃদ্ধ থিয়েটার-জগতের সঙ্গে তাল সামলে চলা নিঃসন্দেহে যে-কোনো সমালোচকের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। কলকাতা শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যাক। এই বিরাট শহরে নিয়মিত রঙ্গমঞ্চের সংখ্যা মাত্র পাঁচ। এখানে সাধারণত যেসব নাটক নিয়মিত অভিনীত হয়ে থাকে সেগুলি প্রায়শই stock-response-এর বাঁধা ছকে তৈরি; এগুলির শিল্পগুণ আলোচিতব্য নয়। ক্লাসিকস বলতে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর মুষ্টিমেয় কয়েকজনের দশ-বারোখানি নাটকেই তালিকা সম্পূর্ণ। স্বভাবতই এই অতি ক্ষুদ্র থিয়েটার-জগতের সমালোচকদের কর্মভার অল্প

Kenneth Tynan : *Tynan on Theatre.* Penguin Books, 1964-65.

দেশের তুলনায় খুবই কম। কিছু যোগ্য এবং সৎ সমালোচকের পক্ষে খুব উচ্চস্তরের না হলেও চলনসই মানের সমালোচনা সৃষ্টি করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু গোড়ায় গলদ। যোগ্যতা বা সততা—দুয়েরই অভাব বাংলাদেশের থিয়েটার-সমালোচনায় প্রকট। দু-চারটি উদাহরণ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একটি বহুল প্রচলিত বাংলা দৈনিকপত্রে বেশ কিছুদিন আগে উদয়াচল গোষ্ঠীর 'হ্যামলেট' অভিনয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচক লিখেছিলেন, 'Olivier, Redgrave, Gielgud এবং Scofield-এর অভিনয়ে যেমন হ্যামলেট নাটকের এক-একটি সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, অমর ঘোষ পরিচালিত 'হ্যামলেট' নাটকে তেমনি সমতুল্য মূল্যের একটি শৈল্পিক ব্যাখ্যা উপস্থিত।' একনজরেই এই সমালোচনার একাধিক ত্রুটি চোখে পড়ে। প্রথমত, সমালোচক উপরি-উক্ত ইংরেজ অভিনেতাদের অভিনীত হ্যামলেট দেখলেন কেমন করে? দ্বিতীয়ত, সমালোচক কোন দুঃসাহসে Olivier প্রমুখ শিল্পীর সঙ্গে অমর ঘোষের তুলনা করলেন? এই দৈনিক পত্রিকাতেই কিছুদিন আগে চতুরঙ্গ গোষ্ঠীর 'বাবু' নাটক সমালোচনা-প্রসঙ্গে সমালোচক এঁদের টিমওয়ার্কের সঙ্গে Old Vic-এর টিমওয়ার্কের তুলনা করেছিলেন। ওল্ড ভিক্ দল কলকাতায় কোনোদিন আসেই নি। যে-দলটি কিছুদিন আগে কলকাতায় অভিনয় করে গেল সেটি ওল্ড ভিকের বৃস্টল শাখা। অথচ সমালোচক চিন্তাহীনভাবে তুলনা করে ওল্ড ভিক্‌কে ছোট করলেন, নিজেকে অজ্ঞান প্রমাণ করলেন এবং সর্বোপরি যে দলটির প্রশংসার উদ্দেশ্যে এই হাস্যকর তুলনা সেই চতুরঙ্গ গোষ্ঠীকে বিব্রত করলেন। আর-একটি বাংলা দৈনিকে (বর্তমানে এটির প্রচার বন্ধ) একবার পড়েছিলাম লেবেডেফের জীবন নিয়ে রচিত রুশ নাটক 'India, my Dream'-এর সমালোচনা। প্রত্যক্ষদর্শীর ভঙ্গিতে লেখক শুরু করছেন—'পর্দা উঠে গেল, চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠল ১৭৯৫ সালের কলকাতা…।' নাটকটি সম্পর্কে আরো বেশি জানার আগ্রহ নিয়ে পরের দিনই গেলাম সেই সমালোচকের কাছে। বিন্দুমাত্র লজ্জা না পেয়ে তিনি জানালেন যে তিনি আদৌ মস্কো যান নি, স্বভাবতই নাটকটি দেখেন নি, এবং তাঁর লেখাটি একজন রুশ লেখকের সমালোচনার অনুবাদ মাত্র! কিছুদিন আগে বহুরূপীর নাট্যোৎসব হয়ে গেল। একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদকীয় কলাম-এর

পাশে উৎসবের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচক 'অয়েদিপাউস' নাটক আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখছেন: 'অনুবাদের স্থানে স্থানে মূলের কাব্যগুণ ক্ষুণ্ণ হয়েছে।' যতদূর জানি এই সমালোচক গ্রীক ভাষা জানেন না। গ্রীক ভাষা জানা অবশ্য শিক্ষনীয় নয়। কিন্তু এই অজ্ঞানতা চেপে গিয়ে জানার ভাণ করা নিঃসন্দেহে নিন্দার্হ। আর-একটি অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত দৈনিকপত্রের (এর সম্পাদক অবশ্য খুব নামী লোক) কথা বলি। বছরখানেক আগে এই পত্রিকায় কলকাতার অপেশাদারী থিয়েটার প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত বাগাড়ম্বরপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। রচনার প্রথম বাক্যটিতেই 'In Search of Theatre' বইয়ের লেখকরূপে Eric Priestley নামটি ব্যবহৃত হয়; এবং গোটা লেখাটিতেই Bentley নামের বদলে Priestley-নামটি বার বার ব্যবহৃত হতে থাকে! ইংরাজি দৈনিকগুলির অবস্থা বাংলা দৈনিকের চেয়ে বড় ভালো নয়। একটি প্রথমশ্রেণীর ইংরাজি দৈনিকে সমালোচকের নীতিই হল একই বিশেষণসমষ্টির মাধ্যমে সমস্ত নাটককে প্রশংসা করা। এই সমালোচকের কাছে রবীন্দ্রনাথ যত ভালো বিধায়ক ভট্টাচার্যও তত ভালো। ইনি স্টার থিয়েটারের পেশাদারী ব্যবসায়িক প্রযোজনা এবং বহুরূপীর প্রযোজনাকে একই প্রশংসাসূচক বিশেষণে ভূষিত করেন। কলকাতার সবচেয়ে অভিজাত ইংরাজি দৈনিকের চেহারা আবার অন্যরকম। এই পত্রিকায় সাধারণত বাংলা থিয়েটারের সমালোচনাই প্রকাশিত হয় না। অথচ 'Amateurs' বা 'Dramatic Club'-এর ইংরাজি নাটকের সমালোচনা করতে এঁরা যথেষ্ট উৎসাহী। আর খাস সাহেবদের অভিনীত ইংরাজি নাটকের সমালোচনার সুযোগ পেলে এই পত্রিকার সমালোচক 'অহো'ভাবে বিগলিত হয়ে পড়েন তা সেই সাহেবী দল যতই অর্ধশ্রুত বা অশ্রুতপূর্ব হোক না কেন। কিন্তু বিগলিত হওয়া মানেই নির্ভুল হওয়ার অধিকার পাওয়া নয়। ফলে সমালোচক ওল্ড ভিক্ (ব্রিস্টল)-এর 'A Man for All Seasons' সমালোচনা-প্রসঙ্গে প্রশংসায় মুখর হয়েও ভুল করে বসলেন। পরে পাঠকের পত্রাঘাতে জানা গেল সমালোচক বইটি না পড়ে সমালোচনা করার ফলে এই ভ্রান্তি। মাত্র মাসখানেক আগে কোন শুভক্ষণে জানি না এই পত্রিকায় 'Theatre Calcutta Style' শীর্ষক একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচকের মতামত সম্পর্কে আমার কোথাও দ্বিমত নেই। কিন্তু আপত্তির কারণ তিনি

পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের পেশাদারি নাটকগুলির সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হলেন; অপেশাদারি দলগুলি এবং তাদের নাটকের উল্লেখমাত্র করলেন না। তাঁর জানা উচিত ছিল বহুরূপী, রূপকার, নান্দীকার, চলাচল, শৌভনিক, প্রান্তিক প্রভৃতি দলগুলির নাট্যজগতে বড় কম অবদান নয় এবং এদের নাটকের তালিকায় রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়র, গর্কি, চেকভ, পিরানদেল্ও, বেকেট, সার্ত্র প্রমুখ মহান নাট্যকারদের নাটকও স্থান পেয়ে থাকে। অথচ রচনাটির নাম 'Theatre Calcutta Style'! একটি সাপ্তাহিকের কথা বলেই উদাহরণের ফিরিস্তিতে ছেদ টানা যেতে পারে। গত জুন মাসের আঠারো তারিখে এই পত্রিকায় 'বাস্তহারা নাটুকে দল' নামে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচক লিখছেন: 'বেশ লক্ষ্য করে দেখা গেছে এই নাটুকে দলগুলি গড়ে ওঠবার পিছনে কয়েকটি শক্তি একযোগে কাজ করে: (১) দলের যিনি চাঁই, তিনি সম্ভবত অন্য কোনো দল থেকে ছেড়ে এসেছেন সেখানে তাঁর যোগ্য সমাদর হচ্ছে না বলে। কিংবা কয়েক ক্ষেত্রে আগের দলের কোনো মহিলা শিল্পীর সঙ্গে জোড়ে দলত্যাগ করেছেন।··· (২) চাঁইদাদার চারপাশে যাঁরা অভিনয় করবার জন্য জড়ো হন, তাঁরা ভাবেন···কমবেশি যা-হোক নগদও পাওয়া যাবে এবং উপরি পাওনা হিসেবে কয়েকজন তরুণ ও তরুণী একসঙ্গে মিলে-মিশে সন্ধ্যাগুলি মধুরই হয়ে উঠবে; (৩) দলের প্রাথমিক খরচ চালাবার জন্যে দু-একজন ধনীসন্তানকে দলভুক্ত করা হয়, তাদের···বেশির ভাগই বাইরে নাট্যরসিক সেজে ভিতরে ভিতরে নতুন নতুন নারীসঙ্গলাভের আনন্দ উপভোগের প্রত্যাশায় থাকেন;···' এহেন কুৎসিত এবং ইতর লেখাও থিয়েটার সমালোচনার নামে বিকোচ্ছে এবং বেশ চড়া দামেই বিকোচ্ছে।

এই দীর্ঘ উদাহরণমালা থেকে আমি বোঝাতে চাইছি যে বাংলাদেশের থিয়েটার সমালোচনায় সাধারণত যা পরিলক্ষিত হয় তা হলো অশিক্ষা, অর্ধশিক্ষা, পক্ষপাতদুষ্টতা, দায়িত্ব সম্পর্কে অচৈতন্য এবং ইতরতা। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণময় রাহা, ধ্রুব গুপ্ত, গৌতম সান্যাল, গুরুদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ সমালোচকেরা তাঁদের সাধ্যমত সৎসমালোচনার চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু প্রচলিত সমালোচনার দুঃখজনক চেহারার মধ্যে এঁরা উজ্জ্বল ব্যতিক্রম মাত্র।

দুই

বাংলা থিয়েটার সমালোচনার এহেন দুর্দশার দিনে ইংরেজ সমালোচক কেনেথ টাইনান-এর 'Tynan on Theatre' বইখানির এসে পৌঁছোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর ধরে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন যে-সমস্ত নাটকের সমালোচনা টাইনান করেছিলেন সেগুলি ১৯৬১ সালে 'Curtains' নামক সমালোচনা-সংগ্রহরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান বইটি 'Curtains'-এরই পুনর্বিন্যস্ত সংস্করণ মাত্র। এটি ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

সমালোচকরূপে সম্পূর্ণ আদর্শ না হলেও মোটামুটি যে-গুণগুলি থাকলে দায়িত্ববান সমালোচক হওয়া যায় তার প্রায় সবগুলি গুণই টাইনানের আছে। প্রথাগত বিচারে তাঁর শিক্ষা যথেষ্ট, তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। অ্যাকাডেমিক শিক্ষাতেই তাঁর শিক্ষায় ছেদ পড়ে নি। তিনি বেশ কয়েকটি য়ুরোপীয় ভাষা আয়ত্ত করেছেন এবং Aeschylus থেকে Brecht পর্যন্ত তাবৎ নাট্যকারদের সঙ্গে তাঁর সুগভীর পরিচিতি ঘটেছে। কিন্তু পুঁথিগত শিক্ষা থাকলেই থিয়েটার-সমালোচক হওয়া যায় না। ছাত্রজীবন থেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন নাট্য-প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত থেকে টাইনান পর্যাপ্ত টেকনিক্যাল বিদ্যা উপার্জন করেছেন। এ ছাড়া থিয়েটার সমালোচনার ট্র্যাডিশনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে টাইনান Shaw, Beerbohm, Stark Young প্রভৃতি সমালোচকদের লেখা অধ্যয়ন করেছেন। সর্বোপরি টাইনান দাবি করতে পারেন তাঁর অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র, মন যথেষ্ট গ্রহণশীল এবং লেখনী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এতগুলি গুণের সমন্বয়ের ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখা সবিশেষ মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

'Tynan On Theatre' নানা কারণে মূল্যবান। তাঁর ছাড়পত্র নিয়ে আমরা প্রবেশ করি পঞ্চাশোত্তর একদশকের য়ুরোপীয় ও আমেরিকান নাট্যজগতে—সে-জগতের স্রষ্টা Shakespeare, Racine, Molliere, Labiche, Osborne, Wesker, Simpson, Oneil, Miller, Williams, Chekov, Sartre, Camus, Beckett, Ionesco, Genet, Eliot ও Brecht; সে-জগতের প্রযোজক Moscow Art Theatre, Piscator Theatre, Berliner Ensemble, Comedie Francaise, Theatre

National Populaire, Theatre Workshop, English Stage Company ও Old Vic ; এই জগতের পরিচালক Peter Hall, Orson Wells, M. Barrault, Joan Littlewood, Devine, Mrs. Brecht ; এ জগতের অভিনেতা-অভিনেত্রী Laurence Olivier, John Gielgud, Michael Redgrave, Paul Scofield, Peter O'Toole, Richard Burton, Vivian Leigh, Peggy Ashcroft, Claire Bloom এবং আরো অনেকে।

টাইনান শুধু এই জগতের ছাড়পত্রই দেন না। তিনি এই জগতকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন। আমরা শুধু বিবরণই পাই না, তাঁর দৃষ্টি দিয়ে দেখি এবং তাঁর অনুভূতি দিয়ে অনুভব করি, ঘটে যাওয়া ঘটনা আমাদের সামনে নতুন করে ঘটতে থাকে। এই প্রসঙ্গে Pritchett বলেছেন 'He is adept at catching the detail of action and at freezing the emotion of the moment for us to see.' পাঁচ বা দশ বছর আগের একটি প্রযোজনাকে কলমের সাহায্যে পুনঃস্পন্দিত করতে পারা বড় কম কথা নয়। দুটি উদাহরণেই আমার বক্তব্য প্রমাণিত হবে। Michael Redgrave-এর Lear-এর চরিত্রাভিনয় প্রসঙ্গে টাইনান লিখছেন : "He began finely, conveying grief as well as rage at Cordelia's refusal to flatter him. Physically already, the whole of Lear was there, a sky scraping oak fit to resist all the lightning in the world. The second act...was perhaps the least impressive stage of Mr. Redgrave's campaign...But once Lear was out on the heath, at odds with the elements, Mr. Redgrave found his bearings again, and never lost them to the end. Witness the Dover scene with the eyeless Gloucester : Lear's drifting whims, his sudden, shocking changes of subject, his veering from transcendent silliness to aching desolation were all explored, explained, and definitively exppressed.···Here was 'the thing itself.'" (পৃ. ১১৪) King Lear নাটক পড়া থাকলে এই বর্ণনার সাহায্যে কল্পনা করে নেওয়া শক্ত হয় না ১৯৫৫ সালের একটি সন্ধ্যা। Laurence Oliver-এর 'Macbeth' সম্পর্কে টাইনান বর্ণনা করছেন : "He begins in a perilously low key. This Macbeth is paralysed with guilt

before the curtain rises, having already killed Duncan time and again in his mind. Far from recoiling, he greets the air-drawn dagger with sad familiarity; it is a fixture in the crooked furniture of his brain. Uxoriousness leads him to the act, which purges him of remorse. Now the portrait swells; seeking security, he is seized with fits of desperate bewilderment as the prize is snatched out of reach. There was true agony in 'I had else been perfect'; Banquo's ghost was received with horoific torment, and the phrase about the dead rising to 'push us from our stools' was accompanied by a convulsive shoving gesture which few other actors would have risked." (পৃ. ১১৭)। এ জাতীয় উদাহরণ বইটির প্রায় প্রতি পাতায় ছড়ানো। টাইনান সমালোচক হতে চেয়েছিলেন কারণ তাঁর মনে হয়েছিল: "it seemed unfair that an art so potent should also be so transient, and I was deeply seduced by the challenge of perpetuating it in print. (পৃ. ১১)। তাঁর উদ্দেশ্যকে তিনি নিঃসন্দেহে সার্থক করতে পেরেছেন।

টাইনানের সবচেয়ে মহৎ গুণ হলো তিনি শুধু টীকাকার বা ভাষ্যকারই নন, তিনি দ্রষ্টাও বটে। ১৯৫৫ সালের একটি লেখায় তিনি ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চের তৎকালীন অবস্থার বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন: "Implusible as it may sound, good drama may be able to walk unaided within a year so.' (পৃ. ৩৩)। এই ঘোষণার এক বছরের মধ্যে Osborne-এর যুগান্তকারী নাটক 'Look Back in Anger' অভিনীত হল এবং Wesker, Pinter, Dennis, Simpson, Delaney, Arden, Hall প্রমুখ তরুণ নাট্যকারদের নেতৃত্বের শুরু হল ব্রিটিশ নাটকের এক গৌরবময় অধ্যায়।

তন

এবংবিধ গুণের সমন্বয় হওয়া সত্ত্বেও টাইনান আদর্শ সমালোচকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। তার প্রথম অসুবিধা ভাষাগত। অতিনাটকীয়তার ঝোঁক, চমক লাগানোর প্রলোভন এবং Shaw ও Beerbohm-এর সম্পর্কে

অত্যধিক দুর্বলতা থাকার ফলে টাইনানের ভাষা অনেক সময় উপমা-উৎপ্রেক্ষার ও কষ্টকল্পনার চোরাবালিতে পথ হারিয়ে ফেলে। ফলত ভাষা ভাবকে প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ না করে ধোঁয়াটে করে তোলে। Claire Bloom-এর Juliet অভিনয় প্রসঙ্গে টাইনান লিখছেন : ''When she is quiet, Miss. Bloom's candour is as still as a smoke-ring and as lovely'. (পৃ. ১০৯)। এ জাতীয় 'conceit' সপ্তদশ শতকের Metaphysical কাব্যে শোভন বা কার্যকর হলেও বিশশতকী থিয়েটার সমালোচনায় অসুবিধার সৃষ্টি করে। আর-একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। 'Tiger At The Gates' নাটকের ভাষার বর্ণনা দিতে গিয়ে টাইনান লিখছেন : ''Hector's scenes with Helen in the first act and with Ulysses in the second ring in the mind like doubloons flung down on the marble.' (পৃ. ১৯৫) সাহিত্যে এ জাতীয় expression মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু সমালোচনায় (যেখানে বক্তব্য বাচনভঙ্গীর চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান) এহেন ভাষা শেষ বিচারে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি ঘটায়।

টাইনানের আর-একটি অসুবিধা তাঁর খামখেয়ালিপনা। ভালো নাটকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি বহু মত প্রকাশ করেন যেগুলো প্রায়শই পরস্পরবিরোধী। কয়েকটি সংজ্ঞা পরপর হাজির করলেই আমার বক্তব্য প্রমাণিত হবে :

'...this sad age needs to be dazzled, shaped, and spurred, by the spectacle of heroism...' 'The greatest plays are those which convince us that men can occasionally speak like angels.' …'I shall reserve mycheers for the playin which man among men, not against men, is the well-spring of tragedy'.…'Good drama, of whatever kind, has but one mainspring—the human being reduced by ineluctable process to a state of desperation.' '…no price is too high for the postponement of despair.'… '.. A play…is basically a means of spending two hours in the dark without being bored.'

টাইনানের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ তাঁর বিচারের মাপকাঠির সংকীর্ণতা সম্পর্কে। এই সংকীর্ণতার কারণ তাঁর খামখেয়ালী Sociological commit-

ment. এর ফলে কখনো-কখনো তাঁর বিচার পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে এবং সহজেই তিনি objective criticism-এর ধারা থেকে বিচ্যুত হন। এই প্রসঙ্গে Encounter-এর Nigel Dennis-এর ১৯৬২ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত 'Down On The Side of Life' রচনা থেকে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করেই আমার বক্তব্য শেষ করব। নাট্যকার Dennis লিখছেন: "মানবজাতির অগ্রগতির আদর্শই তাঁর নাট্যবিচারের প্রধান মান হয়ে থেকেছে ; এই অগ্রগতি যে কী এবং কী নয় সে সম্পর্কেও তিনি সুনিশ্চিত ধারণা পোষণ করে এসেছেন।···সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের গুণাগুণের বিচারের চেষ্টা না করে শ্রীযুক্ত টাইনানের মানদণ্ডই মেনে নেওয়া যাক।···এই দৃষ্টিকোণ গ্রহণকালে আমাদের প্রথমেই স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে, এই বহুমান্য লক্ষ্য পূরণে ঠিক কোন গুণগুলি সবচেয়ে কার্যকর। আমাদের মনে হয়, সহৃদয়তা এবং বেঁচে থাকবার কামনা এই গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম ; এই গুণগুলি যেহেতু কুমারী পার্ল বাকের রচনায় বর্তমান, সেইহেতু আমরা তাঁর অধম রচনাবলীকে বিচারবুদ্ধির আলোকে বিচার করতে যাব না অথচ স্ট্রিন্ড্বার্গ যেহেতু জীবনযাপনের আনন্দ কিংবা মানবজাতির ভবিষ্যৎ প্রাণধারণের ভাবনায় তেমন ভাবিত নন, সেইহেতুই তাঁর রচনাবলীতে উপস্থিত অন্য গুণাবলীকে আমরা অবজ্ঞা করব ; কুমারী বাকের সঙ্গে করমর্দন চলতে পারে, কিন্তু স্ট্রিণ্ডবার্গের ভাগ্যে তা জুটবে না। মানবজাতির অগ্রগতির সহায়ক অন্য গুণগুলির মধ্যে ধরতে হবে বহুল ব্যবহৃত কথ্য ভাষার সাবলীল আকস্মিক প্রবল প্রকাশ, এবং আশাবাদী সুরের আনন্দময় অভিব্যক্তি। এই গুণাবলীর জোরে শ্রীযুক্ত ব্রেণ্ডাল বেহাল এবং রজার্স ও হ্যামারস্টাইন কুমারী বাকের পাশে স্থান পেয়ে যাবেন, অথচ পিরানদেলো বা শ্রীযুত টি, এস্, এলিয়টের স্থান হবে না। নৈরাশ্যকে মুলতুবী রাখা যেহেতু মানবজাতির অগ্রগমনে সহায়ক একটি গুণ, সেইহেতু একটি নাটকের জন্য শ্রীস্যামুয়েল বেকেট্কে অন্তর্গত করা যাবে, অন্য আরেকটি নাটকের অপরাধে তাঁকে বাদ দিতে হবে। ইয়োনেস্কো যেহেতু মানবসমাজের মধ্যে কমিউনিকেশনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সন্দিহান তথা মানবজাতির অগ্রগমনে ঘোর প্রতিবন্ধক, সেইহেতু আমাদের অন্তরে কোনো-দিনই কুমারী মেরী মার্টিনের অতি কমিউনিকেটিভ ফানেল তুলে ধরতে পারবেন না, কিংবা কুমারী শেলাঘ ডেলানীর প্রাণোচ্ছল আশাবাদে আমাদের ভরপুর করে দিতে পারবেন না। কিন্তু আমরা বোধ হয় সর্বোচ্চ মূল্য দেব সরল

মানুষের প্রতি এক তীব্র অনুরাগকে, কোনো নাট্যকার যখন আবেগের সঙ্গে এই শ্রেণীর মানুষের উপর পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদীদের চরম ক্ষতিকর প্রভাবের মুখোশ খুলে দেন, তখন আমরা নিশ্চয়ই তারিফ করব। সেই হেতুই ব্রেথট্ই হবেন আমাদের সবচেয়ে প্রিয় নাট্যকার; শুধু তা-ই নয়, আমরা কখনই তাঁকে সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করতে পাবো না। তাঁর ভালোত্বের মধ্যে যদি কিছু খারাপ থাকে, সেদিকে চোখ দেওয়া চলবে না, ঠিক যেমন কুমারী বাকের খারাপের মধ্যে যা ভালো, সেদিকে চোখ না রাখলে চলবে না।"

শিল্প-সমালোচনায় Sociological Commitment-এর স্থান আছে কি নেই সে বিতর্কে বিরত থেকেও বলা যায় যে টাইনানের ক্ষেত্রে এর ফল প্রায়শই মারাত্মক হয়েছে।

কিছু-কিছু দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও 'Tynan On Theatre' বাংলাদেশের প্রত্যেক নাট্যামোদীর একটি অবশ্যপাঠ্য বই। যে-নাটকগুলি এতে আলোচিত হয়েছে সেগুলি পড়া থাকলে এ বই পড়ে যে-কোনো পাঠক সুখ পাবেন। পাঠক টাইনানের সমালোচনা পড়ে আমাদের সমালোচকদের দৈন্য বুঝতে পারবেন এবং হয়তো অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এঁদের বাধ্য করবেন 'Tynan On Theatre' পড়ে নিজেদের মূল্য একবার নতুন করে যাচাই করে নিতে।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

ভারতে শিল্পনীতি ও শিল্পবিকাশ : ১৮৫৮-১৯১৪

১৮৫৮ সাল থেকে ১৯১৪ সাল, ভারতের ইতিহাসে এটা একটা বিশেষ যুগ। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবসান ঘটল, ব্রিটিশ মুকুটের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন হলো ভারত। তার ছাপ্পান্ন বছর পরে বাধল বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। শ্রীসুনীল সেনের বইটি এই যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস। এই যুগে ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের শিল্পনীতি এবং ভারতের শিল্পবিকাশ সম্বন্ধে তিনি যে থিসিস লিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল. ডিগ্রী পেয়েছিলেন তাকেই একটু বড় করে লেখার ফলে আমরা এই উপাদেয় বইটি পেলাম। অর্থনৈতিক ইতিহাসের এমন সুলিখিত বই পড়া সৌভাগ্যের বিষয়। তথ্যের ও সংখ্যার ছড়াছড়ি এবং প্রতি পৃষ্ঠার নীচে খুদে অক্ষরে ফুটনোটের প্রাচুর্য অবশ্যই আছে। থাকারই কথা। অর্থনীতির ব্যাপার তো। তবু আনন্দের সঙ্গে পড়া যায়। শুধু সাজানোগোজানোর ব্যাপারই নয়। তাঁর কিছু বলার আছে এবং তিনি জানেন তিনি কি বলতে চান। তথ্যগুলি আর কারো লেখা থেকে সংগ্রহ করেননি। চার বছর ধরে নয়া দিল্লীতে ভারতের জাতীয় পুঁথিশালায় কাজ করে অসংখ্য মূল দলিল ঘাটাঘাঁটি করে তথ্য ও সংখ্যা সংগ্রহ করেছেন। এই সকল তথ্য ও সংখ্যা সবই যে এতদিন অপ্রকাশিত ছিল তা অবশ্য নয়। অনেক কিছুই আমরা আগেই জানতাম। কিন্তু গবেষকের নির্ভর সর্বদাই হওয়া উচিত মূল দলিলের উপর, সুবিদিত তথ্যের জন্যও, অবিদিত তথ্যের জন্য তো বটেই। এই কর্তব্য সুনীল সেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। জানা খবরকে আরো ভাল করে জেনেছেন এবং অনেক নতুন খবরেরও সন্ধান পেয়েছেন। তাই তাঁর বক্তব্যে কোথাও জড়তা নেই, দ্বিধা নেই, যা কিছু বলেছেন সবই একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে।

Sunil Kumar Sen : *Studies In Industrial Policy and Development in India.* Progressive Publishers, Calcutta ; First Published in 1964 ; p. 187 ; Rs. 12·50

ব্রিটিশ শাসনের যুগে ভারতের শিল্পায়ন ঘটেনি এটা সাধারণ ও সর্বজন-স্বীকৃত সত্য। আধুনিক স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতেরা সকলেই এ বিষয়ে একমত। সমগ্র ব্রিটিশ শাসনকালই ছিল ভারতের অর্থনীতিক জীবনের বদ্ধাবস্থার যুগ। স্বাধীন ভারতেই এসেছে ভারতের অর্থনীতিক জীবনকে গতিশীল করার সম্ভাবনা ও অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। কিন্তু স্বাধীন ভারত কি একেবারে শিল্পরিক্ততার অবস্থা থেকে শিল্পায়নের পথে পা বাড়িয়েছে? না, তা নিশ্চয়ই সত্য নয়। বছর চল্লিশ আগেই বিপ্লবী সমাজবিজ্ঞানী মহলেও একথার চল ছিল যে, পৃথিবীর ঔপনিবেশিক দেশগুলির মধ্যে ভারতই সব চেয়ে শিল্পসমৃদ্ধ। ঔপনিবেশিক ভারতের এই আপেক্ষিক শিল্পসমৃদ্ধির ইতিহাসকে অনুসরণ করতে করতে প্রথম যে জায়গাটায় এসে একটু বড় রকমের সন্ধিস্থল চোখে পড়ে—সেটা হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তার আগেই সুনীল সেনের কাহিনীটা থেমে গেছে। সুতরাং মনে হতে পারে যে, ১৮৫৮-১৯১৪ যুগের ইতিহাসে এমন কি থাকতে পারে যা ভারতের পরবর্তী শিল্প-বিকাশের উপর দর্শনীয় আলোকসম্পাত করতে পারে? আছে, অনেক কিছুই আছে। কিন্তু তা দেখবার মতো চোখ থাকা চাই, বোঝবার মতো মন থাকা চাই। কোনো কিছুকেই ঠিকমতো বুঝতে হলে তার আদিপর্বে পৌছানো চাই, তার প্রথম উন্মেষের যথাযথ পাঠ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চাই। এর একটা নিজস্ব চিত্তচমৎকারিত্ব আছে।

১৮৫৮-১৯১৪ যুগটা ভারতের শিল্পবিকাশের আদিপর্ব। ঠিক এইজন্যই এ যুগ সম্বন্ধে সুনীল সেনের গবেষণা অত্যন্ত মূল্যবান। স্বীকার করা ভাল, প্রথমে খুব সন্দিগ্ধ ভাবে বইটি পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল, সুনীল সেন ব্রিটিশ যুগে ভারতের শিল্পবিকাশকে বাড়িয়ে দেখেছেন এবং বাঘা বাঘা ধনবিজ্ঞানীদের সুচিন্তিত অভিমতের উপর স্থূল হস্তাবলেপ করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার চিন্তা করার পর এ বিষয়ে নিঃসংশয় হয়েছি যে, সুনীল সেনের বইটির একটা বিশেষ সংবেদন ও গুরুত্ব আছে, বিশেষ করে তাঁদের কাছে যাঁরা মার্কসীয় ধারায় চিন্তা করতে অভ্যস্ত। রেলপথ স্থাপন করে ব্রিটিশ শক্তি ভারতে আধুনিক শিল্পের পত্তন করেছে এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ভারতে উদ্যোক্তা শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটবে, অবশেষে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের রূপ নিয়ে শ্রেণীসংগ্রাম ভারতকে স্বাধীন দেশে পরিণত করে ভারতের সামাজিক-অর্থনীতিক

বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করে দেবে, এসব কথা তো স্বয়ং কার্ল মার্কসই বলেছিলেন।

সুতরাং ভারতের শিল্পবিকাশের আদিপর্ব সম্বন্ধে বিশদ গবেষণা অন্তত মার্কসবাদীদের কাছে বিশেষ চিত্তাকর্ষক হওয়া উচিত। কিছুই হয়নি ও যুগে, একদিক থেকে ঠিক কথা। আবার কিছু কিছু হয়েও ছিল, এটাও ঠিক কথা। হ্যাঁ ও না, দুই-ই পরস্পরের সঙ্গে ওযুগে জড়াজড়ি করে ছিল, যেমন সব যুগেই করে থাকে। হ্যাঁ-র দিকটার ঐতিহাসিক তাগিদ ছিল দুর্বার। না-র দিকটা বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির রুদ্র মূর্তি ধরে তার পথ আগলে রাখছিল কিন্তু সম্পূর্ণ রোধ করতে পারেনি। রাষ্ট্রশক্তির মধ্যেই ছিল আভ্যন্তরীণ সংঘাত। বহুমুখী, বহুরূপী, বিচিত্র সংঘাত। এই সংঘাতের ইতিকথাকেই সুনীল সেন ফুটিয়ে তুলেছেন একটা নূতন ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে।

তিনি দেখাতে চেয়েছেন, ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় শিল্পনীতিটা একাধারে ছিল ভারতীয় শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহদানের নীতি আবার তার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক রূপে কাজ করার নীতি। কয়লা, কাগজ ও পশম শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, এদের প্রত্যেকটির বিকাশকেই শৈশবাবস্থায় ভারত সরকারের ভাণ্ডার ক্রয় নীতি সহায়তা করেছিল। যথেষ্ট তথ্যসম্ভারের দ্বারা সুনীল সেন এই বক্তব্যকে প্রমাণ করতে পেরেছেন বলেই মনে করি। তবু তাঁর মতে ওই নীতি ভারতীয় শিল্পকে যতটা সাহায্য করতে পারত ততটা করেনি। ভারতীয় শিল্প বলতে তিনি অবশ্য বুঝেছেন শুধু ভারতীয় উদ্যোগে ও ভারতীয় মূলধনে স্থাপিত শিল্পই নয়; ব্রিটিশ উদ্যোগে ও ব্রিটিশ মূলধনে স্থাপিত যেসব বিদেশী শিল্পসংস্থা ভারতে কাজ করছিল সেগুলিকেও তিনি ভারতীয় শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু কথাটা পরিষ্কার করে না বলায় তাঁকে ভুল বোঝার সম্ভাবনাটা রয়ে গেছে। যারা ভাণ্ডার ক্রয় নীতির শিথিলীকরণের জন্য চাপ দিত তারা অনেকেই ছিল ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ বণিক ও শিল্পপতি। ১৮৮০, ১৯০৯, ১৯১৩ সালে ভাণ্ডার ক্রয় নীতির কিছু কিছু শিথিলীকরণ হয়েছিল কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু কাজ হয়নি। ভারত সরকার কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত ভাণ্ডারদ্রব্যের ক্রয় ১৮৮৯-৯০ সালে ছিল ৭৮ লক্ষ টাকা, ১৯০৪-০৫ সালে ২ কোটি টাকা এবং ১৯১২-১৩ সালে পুনরায় ৭৮ লক্ষ টাকা। ১৯১২ সালে ভারতসচিবের ডেসপ্যাচে বলা হয় "গত পাঁচ বছরে ভারতে প্রস্তুত ভাণ্ডারদ্রব্যের ক্রয়ের প্রায় কোনোই প্রসার ঘটেনি।"

কেন ঘটেনি? উত্তরে ১৯১৪ সালে গভর্ণর-জেনারেলের ডেসপ্যাচে বলা হয়, কারণটা হলো, "ভারতে শিল্পোদ্যোগের মৃদুমন্দ বৃদ্ধি ও অপকৃষ্ট মান।" কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, আবার সমগ্র সত্য অবশ্যই নয়। লর্ড রিপনের সরকার 'সাঁচ্চা ভারতে নির্মিত দ্রব্যের' উৎপাদনকে ক্রয় নীতির দ্বারা উৎসাহদানের কথা বলেছিলেন। কিন্তু ব্রিটেনের খাস শিল্পপতিরা সর্বদাই ভারত সরকারের উপর এই মর্মে চাপ দিতেন, দেখো, এই কাজ করতে গিয়ে ভারতীয় শিল্পকে যেন 'অবৈধ সংরক্ষণ' দেওয়া না হয়। আসল কথা, ব্রিটেনের খাস শিল্পপতিদের চাপেই ভাণ্ডার ক্রয় নীতির কোনো সত্যকার শিথিলীকরণ ঘটেনি। এটা সুনীল সেন স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন। শুধু খাঁটি ভারতীয় শিল্পপতিদের সঙ্গেই নয়, ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ শিল্পপতিদের সঙ্গেও খাস ব্রিটেনের শিল্পপতিদের স্বার্থের সংঘাত ছিল। রৌপ্যের মূল্যহ্রাস এবং হোম চার্জের দায়বৃদ্ধি, এই সমস্যার হাত থেকে ভারত সরকার খানিকটা নিস্তার পেতেন, যদি ভারতে প্রস্তুত দ্রব্যের ক্রয় বৃদ্ধি পেত। সরকারী এই দিক থেকে ভারত সরকার এবং লণ্ডনের ভারতসচিব, এঁদের মধ্যেও সংঘাত ছিল। খিটিমিটি বাধত, রুষ্ট বাক্যবিনিময় হতো। কিন্তু গভর্ণর-জেনারাল বেশি বাড়াবাড়ি করলেই তাঁকে পেতে হতো লর্ড রিপনের অবস্থা। কাজেই শেষ পর্যন্ত খাস ব্রিটিশ শিল্পপতিদেরই জয় হতো ভারতসচিব মারফত। প্রকৃতপক্ষে ভারত-সচিবই ছিলেন 'দ্য গ্রেট মুঘল'। অবাধ উদ্যোগের অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতার শপথ গ্রহণ না করে তিনি জলগ্রহণ করতেন না।

ভাণ্ডার ক্রয় নীতির হেরফের ভারতের শিল্পবিকাশকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পারত? খুব বেশি নয় নিশ্চয়ই। ভারতীয় শিল্পকে সংরক্ষণদানের প্রভাব অবশ্যই তার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু শুধু তাই-ই কি যথেষ্ট? তাও নয়। সুতরাং এ প্রশ্ন উঠতে পারে, সুনীল সেন ভাণ্ডার ক্রয় নীতির উপর অত জোর দিয়েছেন কেন? এ প্রশ্নের উত্থাপন একান্তই অসমীচীন, কেন না শিল্পোন্নতির সহায়ক বিভিন্ন পদ্ধতির তুলনামূলক বিচার ঐতিহাসিকের কাজ নয়। যে যুগ সম্বন্ধে সুনীল সেন গবেষণা করেছেন সে যুগে ভাণ্ডার ক্রয় নীতির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এই গুরুত্বটা সুনীল সেন বা আর কারো ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ভারতের শিল্পবিকাশের উপর এই নীতির হিতকর প্রভাবকে তিনি বাড়িয়ে দেখেননি। স্পষ্টই বলেছেন, "ভারতের শিল্পায়নের উপর সরকারী ব্যয় নীতির প্রভাবকে বাড়িয়ে দেখা বোকামি হবে।"

সে যুগে এ প্রশ্নও উঠল, 'সাঁচ্চা ভারতে নির্মিত দ্রব্য' কাকে বলে। এ নিয়ে ব্রিটেনের খাস শিল্পপতিরা কূটকচালির বাহার দেখালেন। যদি বিদেশ থেকে কোনো কাঁচামাল বা আধা-প্রস্তুত দ্রব্য আমদানি করে কোনো ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয় সেটা কি ওই পর্যায়ে পড়ে? মেসার্স রিচার্ডসন অ্যাণ্ড ক্রাডাস (ভারতে অধিষ্ঠিত ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম) কথাটার এই অর্থ করলেন; "ভারতে পরিচালিত কোনো শিল্পের একটি পরিচিত ও স্বতন্ত্র দ্রব্য"। নিঃসন্দেহেই যুক্তিসঙ্গত অর্থ। ভারতের ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মগুলির চাপেই ১৯০৯ সালে ভাণ্ডার ক্রয় নীতির কিঞ্চিৎ শিথিলীকরণ ঘটেছিল কিন্তু তাঁরাও ব্রিটেনের খাস শিল্পপতিদের কুনজরে পড়লেন। ১৯ ২ সালে লণ্ডনের রেলওয়ে গেজেট মেসার্স বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি, জেসপ অ্যাণ্ড কোম্পানিকেও "Clamorous agitators"-এর পর্যায়ে ফেলেছিলেন। বেশ একটু গিলবার্টীয় পরিস্থিতি বলতেই হবে। ইণ্ডিয়ান এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড আয়রণ ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশন ১৯১২ সাল পর্যন্ত অভিযোগ করতে লাগলেন, সরকারি অর্ডার যথেষ্ট নয় এবং ১৯০৯ সালের ভাণ্ডার ক্রয় নিয়মাবলীর ফলে 'ব্যবসায়ের কোনো উন্নতি' দেখা দেয় নি। ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সভ্য ক্লার্ক সাহেব ১৯১৩ সালে অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় পরিষ্কার ভাষায় বললেন, "Subsidising local enterprise at the expense of the state" চলতেই পারে না। সুনীল সেনের মতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রধান নির্ভর ছিল সরকারি চাহিদা নয়, বেসরকারি চাহিদা।

ভারতের শিল্পায়নে 'crucial factor'-টা নিঃসন্দেহেই রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যম। ব্রিটিশ আমলে একটি দূরদর্শী ও সাহসী ভারতীয় উদ্যোক্তা শ্রেণী দেখা দেয় নি এবং বিদেশী মূলধন ও বিদেশী উদ্যোগ যে "brake on industrial advance" রূপে কাজ করেছিল একথা সুনীল সেন বলেছেন। সুতরাং প্রশ্ন উঠছে, রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যম সম্বন্ধে ব্রিটিশ শাসকদের নীতি কি ছিল? সুনীল সেন দেখিয়েছেন, সরকারী নীতি রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগের বিরোধী ছিল। তার কারণও ছিল ব্রিটেনের খাস শিল্পপতিদের এবং বেঙ্গল চেম্বারের প্রবল বাধা। লর্ড রিপনের সরকার যখন সাময়িকভাবে বেঙ্গল আয়রন ওয়ার্কস বা বরাকর ওয়ার্কস কিনে নিলেন, অমনি লণ্ডনের Economist পত্রিকা বলল, এটা তো "a policy of protection to native industries" এবং ভারতসচিব লর্ড হার্টিংটনও এই

কথার প্রতিধ্বনি করলেন। বেঙ্গল আয়রন ওয়ার্কস হস্তান্তরিত হলো বেঙ্গল আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্কসের কাছে। এই ফার্মটি ইস্পাত উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছিল সরকারি অর্ডারের প্রত্যাশায় কিন্তু ব্যবস্থাটি বানচাল হয়ে গেল, সরকারি অর্ডার এল না। ১৮৯৪ সালে ক্যাপ্টেন টাউনসেণ্ড প্রস্তাব করেছিলেন ভারত সরকারের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার নিরাকরণের জন্য লৌহ ও ইস্পাত বাবদ ব্রিটেনে যে টাকা পাঠানো হয় তা বন্ধ হওয়া আবশ্যক এবং তার জন্য সরকারী উদ্যোগে একটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পত্তন হওয়া দরকার। ভারত সরকার বললেন, তাঁরা "mining or manufacturing operations"-এ প্রবৃত্ত হতে চান না। ১৯০১ সালে মেজর মেহন প্রস্তাব করলেন, ভারত সরকারের উচিত নিজেরা ইস্পাত প্রস্তুত করে বেসরকারী শিল্পপতিদের দেখিয়ে দেওয়া, এ কাজ ভারতে খুবই সম্ভব। নাকচ হয়ে গেল মেহনের প্রস্তাব। এটা লক্ষণীয় যে, ভারতে অধিষ্ঠিত ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মগুলিও ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের ঘোরতর বিরোধী ছিল। ১৯০৭ সালে রেণ্ডেল প্রস্তাব করলেন, ভারতের বিরাট বিরাট রেলওয়ে ওয়ার্কশপগুলিতে লোকোমোটিভ, রোলিংস্টক ইত্যাদি নির্মাণ করা হোক, তার ফলে ভারতের রেলপথগুলির শোচনীয় আথিক অবস্থার প্রতিকার হবে। উত্তরে ভারত সরকার বললেন, অত মূলধন বিনিয়োগ করার মতো সম্বল আমাদের কোথায়, তাছাড়া ভারতের 'বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কথাও তো ভেবে দেখতে হবে, তাও যে 'বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ! অ্যালফ্রেড চ্যাটারটনের অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজের সরকারী পথপ্রদর্শক কারখানাগুলি সম্বন্ধে 'ভারতবন্ধু' লর্ড মরলির অগ্নিবর্ষী বাক্য তো একান্ত সুবিদিত এবং তাঁর ১৯১০ সালের ডেসপ্যাচ থেকে সুনীল সেন একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

তবু সুনীল সেন বলেছেন, অবাধ উদ্যোগ নীতির সঙ্গে রিয়ালিটির মিল ছিল না, রিয়ালিটির চাপে তা ভেঙে পড়তে শুরু করল। সমগ্র যুগটি সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন। ফলে একটু বিমূঢ় বোধ করছি। তাঁর বইটা যদি কিছু দেখিয়ে থকে তবে অবিকল এই জিনিসটাই দেখিয়েছে যে, তলোয়ারের সঙ্গে যেমন খাপের মিল, ঔপনিবেশিক ভারতের রিয়ালিটির সঙ্গে লেসে ফেয়ার বা অবাধ উদ্যোগ নীতির সেই রকম মিলই ছিল। অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে সুনীল সেন নিজেই দেখিয়েছেন, ভারতসচিব লেসে ফেয়ারের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে কি ভাবে ভারত সরকারের অতি ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত সাবধানী

শিল্পোন্নতির প্রস্তাবগুলিকে এবং মেহ্‌ন ও রেণ্ডেলের মতো টেকনোক্রাটদের দূরদর্শী শিল্পোদ্যোগ প্রকল্পগুলিকে বানচাল করে দিয়েছিলেন। ১৯১৪ সালেই লেসে ফেয়ার ভেঙে পড়ছিল এমন একটা কথা অন্তত তাঁর বইটি থেকে বেরিয়ে আসে না। বোধ হয় তাঁর মনে কি আছে তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। সরকারী উদ্যোগে রেলওয়ে ও তার ওয়ার্কশপগুলির প্রতিষ্ঠা, অর্ডন্যান্স কারখানা ও সামরিক পোশাক কারখানার স্থাপন, কোম্পানি আইন, এই সব কিছুর সঙ্গে লেসে ফেয়ারের কোনো মূলগত অসামঞ্জস্য ছিল না। আর যদি স্ববিরোধের কথাই ওঠে, তাহলে বলব, একটা স্ববিরোধহীন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা পাচ্ছি কোথায়? যাই হোক, একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও সুপাঠ্য গ্রন্থ লেখার জন্য তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

তরুণ সান্যাল

ভারতের পরিকল্পনা : নতুন দৃষ্টিতে

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতালাভের আন্দোলন ও বিজয় আর্থনীতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর এনেছে। আর্থনীতিক উন্নয়নের তত্ত্ব ও পরিকল্পনা সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি ভাবনা ক্রমাগত অধিক মর্যাদা পাচ্ছে। অর্ধোন্নত দেশগুলিতে যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই এমন দুর্বল মূলধনতান্ত্রিক ভিত্তিও নেই, সেজন্য অর্থনৈতিক দ্রুত উন্নয়নের চিন্তা পরিকল্পনা-প্রণয়নে ক্রমাগত আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এ-উন্নয়ন যেমন শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্বাধীনে সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নও নয় তেমনি মূলধনতন্ত্রকে ঠেকা দেবার জন্য আত্মরক্ষামূলকও নয়, একে মার্কসবাদী মহল 'অ-মূলধনতান্ত্রিক উন্নয়ন' আখ্যা দিয়েছেন। ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু অ-মূলধনতান্ত্রিক উন্নয়নের তত্ত্ব পুরোপুরি কার্যকর করা সম্ভবপর নয়। ভারতের শাসকশ্রেণী যেহেতু ব্যাপক অর্থে মূলধনতন্ত্রী শ্রেণী, এদের মধ্যে নানা সংঘর্ষ ও বৈপরীত্য ভারতের পরিকল্পনা ও অর্থনীতি-ভাবনায় প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের শাসকশ্রেণীর আভ্যন্তরিক বৈপরীত্য দেশে সামন্তপ্রথা উৎসাদনে তৎপর হয়েও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে একাধারে যেমন সন্ধি করতে উৎসুক, সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পিত অর্থনীতির সুযোগে কৃষিক্ষেত্রে বড়জোত ও মূলধনতন্ত্রের বিকাশও লক্ষ করা যায়। একই ভাবে বলা যায়, দেশীয় বৃহৎ পুঁজিপতিশ্রেণী যেমন ভারতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদেশী বেসরকারী মূলধনের সহায়তা চায়, তেমনি আবার ভারতীয় জাহাজ-ব্যবসায় প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধনের অস্তিত্ব অসহ্য বোধ করে থাকে। অর্থাৎ একদিকে যেমন ভারী ও ভিত্তিমূলক শিল্পে বিদেশী মূলধনের অনুপ্রবেশ অনেক ক্ষেত্রে বিপুল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়, তেমনি আবার অন্যবিধ শিল্পে বিদেশী বেসরকারী মূলধন কাম্য

Ajit Roy : *Planning in India*. National Publishers. Calcutta-6. Rs. 30'00

বলে আখ্যা পেয়ে থাকে। ভারত-সরকার ও ভারতের মূলধনতন্ত্রী শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের সংঘর্ষ ও সমঝওতা ক্রমাগত ভারতীয় অর্থনীতিকে অর্থনীতির ছাত্রদের নিকটে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

শ্রীঅজিত রায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ও গবেষণামূলক গ্রন্থটিতে ভারতের পরিকল্পনার নানা দিক তত্ত্ব ও বিপুল তথ্য সহযোগে বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতীয় মার্কসবাদী মহলে তাঁর বইখানি চিন্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়তা করবে। শ্রীরায় আর্থনীতিক চিন্তায় সাধারণ অর্থে পরিকল্পনার ইতিহাস ও ভারতের পরিকল্পনা চিন্তার আখ্যান আলোচনাসহ, ভারতের তিনটি পরিকল্পনা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তাঁর বইখানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশ্লেষণাত্মক পরিচ্ছেদগুলি। ঐ বিশ্লেষণাত্মক অংশেই ভারতের মূলধনতন্ত্রী-শ্রেণীর একচেটিয়া রূপ, বৈদেশিক সহায়তা, বৈদেশিক বেসরকারী মূলধন, আভ্যন্তরিক সম্পদের উৎস, জনগণের অবস্থা ও জাতীয় আয়, সরকারী উন্নয়ন বিভাগ প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অত্যন্ত যত্নসহযোগে লেখক যে-বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে ভারতীয় শাসকশ্রেণীর দ্বৈত চরিত্র যেমন পাওয়া যায় তেমনি সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় দিকগুলির উন্মোচনও ঘটে।

পরিকল্পনা ভাবনার ক্ষেত্রে মূলধনতন্ত্রে একদা টি. ভি. এ. দৈত্যকুলে প্রহ্লাদরূপী বলে মনে হত। আজ আর মূলধনতন্ত্রে পরিকল্পনাকে একেবারে অপাঙক্তেয় বিবেচনা করা হয় না। বিশেষত, কেইনস তাঁর 'কর্মসংস্থান, সুদ ও অর্থের সাধারণতত্ত্ব' প্রকাশ করে মূলধনতন্ত্রের অপূর্ণ কর্মসংস্থানই যে বিধিসিদ্ধ ও স্বাভাবিক তা দেখিয়ে দিয়েছেন। মোটা কথায় তাঁর মতে, যেহেতু দেশের মোট উৎপাদন হল ভোগ ও মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন, সেক্ষেত্রে স্বল্পসময়ে মূলধনীদ্রব্য উৎপাদন হ্রাসই অপূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য দায়ী। দক্ষিণপন্থী কেইনসবাদীগণ সুতরাং মূলধনীদ্রব্যের বাজার চাঙা করার জন্য নানা সম্ভব অসম্ভব পথ ভেবেছেন—তার অন্যতম দিক হল পেন্টাগনের কলাকৌশল। অর্থাৎ দেশের আভ্যন্তরিক ক্রয়ক্ষমতা যে মূলধনীদ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে না, সেই চাহিদা বাড়ানোর জন্য ট্যাক্স ও সরকারী ঋণ তথা মুদ্রিত অর্থের সহযোগে ঐ ভারী দ্রব্যগুলি ক্রয় এবং ধ্বংস (পরিকল্পিত ধ্বংসের জন্য বিদেশী ঘৃণ্য শাসকদের অস্ত্রসাহায্য দিয়ে জনপ্রিয় আন্দোলন দমন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বাজার লাভ ইত্যাদি অবধারিতভাবেই নির্ধারিত হয়) প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বামপন্থী কেইনসবাদীগণ

দীর্ঘকালে বণ্টনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে চান এবং জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপূর্ণ কর্মসংস্থান ও বেকারী ঠেকা দিতে চান। কিন্তু কেইনসীয় পন্থায় মূলধনতন্ত্রকে কিছুদিন টিঁকিয়ে রাখা যাবে বটে, কিন্তু বাঁচিয়ে রাখার জন্য ক্রমপ্রসারিত বাজার, জনসংখ্যা—অর্থাৎ চাহিদা স্বদেশে বা স্বদেশের বাইরে আর সম্ভবপব নয়। তবুও পূর্বের অপরিকল্পিত উৎপাদনের জগৎ অনেক বেশি সংকুচিত হয়েছে : পুরো অর্থনীতিক্ষেত্রে যেমন সংকটকে ঠেকা দেবার জন্য নানা স্টেবিলাইজার ও পন্থা চিন্তা করা হচ্ছে, তেমনি ফার্মগুলিব বিপুলায়তন ও একচেটিয়া ক্ষমতা প্রোগ্রামিঙেব সুযোগ নিতে পারছে। কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতার জঙ্গমত্ব এবং উৎপাদন সম্পর্কের স্থাণুত্ব মার্কসবাদীমহল যেমন বলে থাকেন মূলধনতন্ত্রের মূল বৈপরীত্য—এ দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল ঠেকা দেওয়া সম্ভবপর নয়, এ-বৈপরীত্য একমাত্র সমাজতন্ত্রেই ঘুচে যেতে পারে।

মার্কস-এঙ্গেলস মূলধনতন্ত্রের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের সর্বপ্রকার বৈপরীত্যগুলি বিশ্লেষণ করে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্রের পরিকল্পিত অর্থনীতির পত্তন চেয়েছিলেন। কমিউনিস্ট ইসতেহারে সেই ১৮৪৮ সালেই তাঁরা বলেছিলেন "সর্বহারাশ্রেণী তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা ক্রমে ক্রমে বুর্জোয়াদের নিকট থেকে সব মূলধন নিয়ে রাষ্ট্রের হাতে—অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী যেখানে শাসকশ্রেণীরূপে সংগঠিত হয়েছে—সব উৎপাদনের উপকরণগুলি সংগঠিত করবে।" গঠা কর্মসূচীতেও মার্কস পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির রূপরেখাটি অঙ্কন করেছিলেন। গঠা কর্মসূচী অনুযায়ী উৎপাদনের সূত্রটি হবে নিম্নরূপ :

১। উৎপাদনের উপকরণের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ।

২। উৎপাদন বিস্তারের জন্য সংযোজন।

৩। ভুলভ্রান্তি, দুর্ঘটনার জন্য কিছু সঞ্চয় ও বীমা তহবিল।

বণ্টনের ক্ষেত্রে নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে :

১। উৎপাদন ব্যতীত অন্যবিধ সরকারী কাজ চালাবার জন্য ব্যয়।

২। বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যবিভাগ প্রভৃতি সমাজের গোষ্ঠিগত প্রয়োজন মেটাবার জন্য ব্যয়।

২। কাজে অলস ব্যক্তিদের জন্য ব্যয়।

৪। বাকী উৎপাদিত বিষয় কর্মক্ষমতা অনুযায়ী বণ্টিত হবে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের ধারাটিতে মার্কসবাদী উল্লিখিত ধারণাগুলিকে কাজে লাগায়। সুতরাং একদিকে অতিমুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে প্রায় অনিয়ন্ত্রিত মূলধনতন্ত্র, অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির কল্যাণধর্মী সমাজতন্ত্র: উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর চরিত্রই পরিকল্পনার লক্ষ্য নিরূপণ করে। পশ্চিমের কল্যাণ রাষ্ট্রগুলি আসলে 'নিয়ন্ত্রিত মূলধনতন্ত্রের' দেশ, দেশে পূর্ণ-কর্মসংস্থানকে লক্ষ্য করে যে-কাজগুলি করা দরকার এই রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী তা করতে প্রস্তুত হয়, অবশ্য এতে যাতে মূলধনতন্ত্রের গায়ে না কোনো আঁচ লাগে। সুতরাং রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত মূলধনতন্ত্রী শ্রেণীচরিত্রই নাৎসী 'নয়া ব্যবস্থা', নিউ ডিল, ওয়েলফেয়ার স্টেট প্রভৃতি নিরূপণে যেমন তৎপর, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে বা নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব অন্যবিধ পরিকল্পনা রচনায় ব্রতী। সমাজতন্ত্রে তাই আর আর্থনীতিক সংকট নয়, কত বেশি উৎপাদনের মাধ্যমে কত দ্রুত জনগণকে সুখী করা যায়—সেই লক্ষ্যে অবিরাম পায়ের ডাণ্ডাবেড়ি ভাঙা উৎপাদন ও বণ্টনে বাধাহীন অগ্রগমনের পথ প্রশস্ত হয়ে থাকে। ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন মূলধনতন্ত্রীদের চরিত্র তাই পরিকল্পনা রচনা ও উপযুক্তভাবে নীতিগুলির প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে লক্ষ করা কর্তব্য। এবং, লক্ষ করা দরকার, কী ভাবে পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ভোগের ঊর্ধ্বের উদ্বৃত্ত সৃষ্টি, সঞ্চয়ন ও বিনিয়োগ ঘটছে। যদি বিচার করে দেখা যায় যে দরিদ্র জনগণকে ক্রমাগত দরিদ্রতর করে, বণ্টনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার মূল লাভ মূলধনতন্ত্রী ও ফাটকাবাজদের হাতে গিয়ে পড়ছে এবং যেহেতু দেশীয় মূলধনতন্ত্রীদের ভারী ও মূলশিল্প গঠনের ক্ষমতা নেই বলেই সরকার তাদের হয়ে ঐ কাজটি করল, মুদ্রাস্ফীতি ও অসম বৈদেশিক ঋণের জালে জনগণকে পীড়িত করছে—তবে পরিকল্পনার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত পরিবর্তন হওয়া উচিত। এমনকি, ভারতের বিভিন্নশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা এবং একচেটিয়া ব্যবসার বিরোধিতাকে ঐক্যবদ্ধ মোর্চায় রূপ দিয়ে যথার্থ দেশ উন্নয়নের পরিকল্পনার রূপরেখা নিরূপণ করতে হবে। ভারতের অর্থনীতিজিজ্ঞাসুগণ যখন পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রভৃতি নানাবিধ চিন্তায় পীড়িত,—কেননা মার্কস-পন্থীদের মধ্যেও যখন রাষ্ট্রের চরিত্র প্রভৃতি নানা প্রশ্ন দোলায়িত—শ্রীঅজিত রায়ের বইখানি বেশ সময়োপযোগী। শ্রীরায় জিজ্ঞাসু ব্যক্তি হিসাবে বহু ক্ষেত্রে শুধু জিজ্ঞাসার অবতারণা করেই পটক্ষেপ টানেন, কিন্তু তাঁর বিপুল

তথ্যনির্ভর আলোচনা পাঠককে সিদ্ধান্তের পথ বেছে নিতে সহায়তা করে। বইখানির ভূমিকায় বিখ্যাত ফরাসী অর্থতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বিটলহাইম বলেছেন যে লেখক 'প্রমাণযোগ্যভাবে দেখিয়েছেন যে কেমনভাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বছরগুলি ব্যেপে মূলধনতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়ম,—সামাজিক মেরুপ্রস্থান—প্রতিপালন করেছে। একদিকে যেমন, একচেটিয়া মূলধনের মুনাফা দ্রুত বেড়ে গিয়েছে অন্যদিকে আসল মজুরি মোটামুটি স্থিরই রয়ে গেছে এবং বেকারী ও অর্ধবেকারীর পরিমাণ পূর্বের যে-কোনো সীমা লঙ্ঘন করেছে…।' বিটলহাইমের মতে আমাদের শ্রেণীচরিত্র ও রাষ্ট্রশক্তি এবং মূলধনতন্ত্রের বাস্তব অর্থনৈতিক নিয়ম এজন্য দায়ী। এমনকি তিনি এতটাও বলতে পারেন, যা আমরা পূর্ণ সমর্থন করতে পারি না যে "The so-called democratic planning exposes itself as having nothing in common either with planning or with democracy. In their social effects, the previous plans have hither to revealed democratic content. Meanwhile, even the framework of political democracy is cracking up."

মুখবন্ধে অনুরূপ উক্তি দিয়ে বইখানির পরিচিতি হলেও, আমার কখনই মনে হয় নি শ্রীরায় তাঁর গ্রন্থখানিতে ভারতের পরিকল্পনাকে মসীম্লান করেছেন। তিনি ভারতের শাসকশ্রেণীর দোদুল্যমানতা, সিদ্ধান্ত বিষয়ে দোলাচল প্রভৃতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বরং বলেন: "Beginning with control over a few key levers of the economy, planning as it develops from year to year effects the necessary socio-economic changes conforming to the fundamental objectives embodied in the plan." এমনকি মূলধনতন্ত্রী অর্থনীতির মুনাফা ও মজুরির বৈপরীত্য প্রযোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যা একান্ত স্বাভাবিক, যা শ্রমিকদের নিরুৎসাহ করে তাও তিনি মনে করেন: "By gradually extending public ownership over the means of production a planned economy can increasingly dispel this indifference on the part of labour and infuse into the latter genuine labour enthusiasm which leads to a rapid improvement in p.oductivity." তাই অজিতবাবু পরিকল্পনার সংকট লক্ষ করেও

মূলধনতন্ত্রীশ্রেণীর আভ্যন্তরিক বিরোধবিষয়ক আলোচনায় ও সরকারী কার্যক্রমে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

কৃষির ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা নিয়ে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে বর্তমান পরিকল্পনা ও তৎসমসাময়িক কৃষি-আইনগুলির ফলে কৃষির ক্ষেত্রে উন্নয়নের দুটি পথ ক্রমাগত মুক্ত হচ্ছে—যাদের লেনিন প্রাশিয়ান ও আমেরিকান রাস্তা বলেছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আমেরিকান রাস্তা, অর্থাৎ চাষীর হাতে জমি দেওয়াই কৃষি-উন্নয়নের পন্থা বলে মনে করতেন। স্বাধীনতার পর দেখা গেল তাঁরা জমিদারদের সুযোগসুবিধা বহুক্ষেত্রে অব্যাহতই রাখলেন। সরকারের নীতি আসলে এই দুই নীতিরই একটা সুবিধাবাদী সমন্বয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে যেমন চাষীদের মূলধনতান্ত্রিক খামারপ্রথাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় অন্যদিকে তাকে কার্যকর করার কোনো ব্যবস্থা হয় না। প্রাশিয়ানপন্থায় জমিদারদের ক্ষমতা অব্যাহত থাকে, কিন্তু শ্রমজীবীরা অত্যন্ত জঘন্যভাবে শোষিত হয়। জমিদার আইন ফাঁকি দেওয়া সত্ত্বেও, বহু ক্ষেত্রে ছোট চাষীর ক্ষমতা যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি একদিকে জমিদার জোতদার হয়ে গিয়ে যেমন বিপুলায়তন চাষ করতে সক্ষম হচ্ছে না এবং ফলে কৃষি-উৎপাদন বাড়ছে না, অন্যদিকে ছোট চাষীদের ছোট জোত উৎপাদনক্ষেত্রে সুবিধা করতে পারে না। দেশের জমিদারকুল যদি আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করে, জমির সর্বোচ্চ সীমার পরিবর্তন ঘটাতে পারে, তবে জমিদার মূলধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষি-উৎপাদন বাড়াতে পারে বটে, কিন্তু জমি থেকে উৎখাত ভাগচাষী ও ছোট চাষীর যেহেতু অন্য কোনো সংস্থান খোলা থাকবে না ফলে অনেক বেশি শোষণের সম্মুখীন হয়ে ভূমিসত্ত্বে অধিকারহীন ভাগচাষী হিসাবে সর্বস্বান্ত হবে, অথচ উৎপাদন পরিমাণও বাড়বে না। কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রীরায় এ-বৈপরীত্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন।

শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রীঅজিত রায় বলেন : "There has been an unprecedented and all round development even though most of the targets have eluded the planners."

যোগাযোগ ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনামূলক কার্যকলাপকে চিত্তাকর্ষক বলা সত্ত্বেও, রেলরাস্তা ও মোটররাস্তার আরও বেশি বিস্তার এবং বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি আরও বেশি বেশি হারে হওয়ার

প্রয়োজন স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া কার্যকারিতা বৃদ্ধিও অভীপ্সিত। বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে মূলধনতান্ত্রিক পশ্চিমী দেশগুলির ভারতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে মৌখিক সহানুভূতি ও কার্যক্ষেত্রে অতি-মুনাফা ও অধিক সুদ আদায়ের কায়দাগুলি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতকে উন্নত উৎপাদক দেশ হিসাবে পশ্চিমী দেশগুলি যেমন দেখতে নারাজ, তেমনি আমাদের দেশের একচেটিয়া কায়েমী স্বার্থবিধৃত বৃহৎ ব্যবসায়ীকুল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যবিস্তারে সন্দিহান। আভ্যন্তরিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন যন্ত্রায়ণ বৃদ্ধি ও উৎপাদনের দাম ও মুনাফার হ্রাস প্রয়োজন, তেমনি আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠন ও আফ্রো-এশিয় দেশগুলির বাজার কর্ষণ তথা ঐ দেশগুলির উন্নয়নের পরিকল্পনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। তা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য-বিস্তার প্রয়োজন। বৈদেশিক ঋণ ও সহায়তার ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহারগত দিকও আছে। সেজন্য অ-উন্নয়মান ব্যয়হ্রাস, ধনীদের বিলাসগত ব্যয়সংকোচন দেশের কিছু কিছু সাংগঠনিক পরিবর্তন যথা ব্যাঙ্ক, আভ্যন্তরিক ব্যবসা ও বৈদেশিক ব্যবসার জাতীয়করণ প্রয়োজন এবং লক্ষ রাখা দরকার যাতে উন্নয়মান দেশের উৎপাদিত সম্পদ ফাটকাবাজী ও পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কহীন বেসরকারী উৎপাদনে ব্যবহার না হয়। প্রত্যক্ষ কর নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামের ধনীদের কর নির্ধারণ, রাজরাজরা ও এই সূত্রে ধনীদের বৈদেশিক মুদ্রামূল্য বিধৃত অর্থ আহরণ, কম ও বেশি দাম লিখে বৈদেশিক মূল্যতালিকা রচনা বন্ধ করা ইত্যাদি শ্রীরায় উল্লেখ করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন সোভিয়েত সহায়তা বৃদ্ধি ও ঋণের ক্ষেত্রে কম সুদের হার পশ্চিমী দেশগুলির দেওয়া সুদের হার কমিয়ে দিতে, সর্ত আরোপ বন্ধ করতে সহায়তা করেছে।

ভারতে একচেটিয়া ব্যবসার ঝোঁক যে অত্যন্ত ভয়ংকরভাবে বেড়েছে, তার বিপুল তথ্য শ্রীরায় দিয়েছেন। প্রায় পঞ্চাশটি দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী পরিবার আজ দেশের তিন-চতুর্থাংশ বেসরকারী সংগঠিত ব্যবসার মালিক। দেশের সংবাদপত্রগুলির মালিকানার একচেটিয়া ঝোঁকও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বড় ব্যবসায়ীগণ বিদেশী মূলধনের সঙ্গে যুক্তমালিকানায় দেশীয় বাজার শোষণ করতে চায়। কিন্তু আশ্চর্যভাবে আবার জাহাজী ব্যবসায়ে বিদেশী মূলধনের তীব্র বিরোধিতাও তাঁরা করে থাকেন। শ্রীরায় সরকারী উদ্যোগের কারণ

হিসাবে একদিকে যেমন কোনো-কোনো সরকারী সংগঠনকে "a certain fusion of the state apparatus and Indian big business elements and exploited by the big bourgeoisie to strengthen their position" বলেন, তেমনি অন্যদিকে মনে করেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে "there was also an edge directed against the domination of a particular section of Indian bourgeoisie·· and British finance capital." আবার ভারী সামরিক যানবাহন সরকারী উদ্যোগে উৎপাদনকে "a most pronounced bias against big business" বলে মনে করেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে, খনিজ তৈল উৎপাদন, শোধন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারী ভূমিকা একচেটিয়া বিদেশী ব্যবসাকে বেশ আঘাত দিয়েছে সুতরাং তিনি সরকারের মনোভাবের দোলাচল লক্ষ করে এই উভয় ধারারই একদিকে সংকোচ ও অন্যদিকে বিস্তার লক্ষ করেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে "the industrial policy Resolution of the Government is framed in so equivocal terms as to have ample scope for wide adjustments by the Government of India in the allocation of spheres of economic activity to two sectors."

শ্রীঅজিত রায় চতুর্থ পরিকল্পনার সূত্রপাতের পরিকল্পনা সন্ধিতে মনে করেন যে জনগণের ক্রমবর্ধমান মৌলিক রূপান্তরনের চাপ ও অন্যদিকে একচেটিয়া গোষ্ঠির পরিকল্পনাকে নিজেদের স্বার্থে কুক্ষীকরনের জন্য প্রতিচাপ ভারত সরকারকে নেহরু প্রবর্তিত মধ্যপন্থা থেকে সরিয়ে নিতে পারে। পরিকল্পনাকে যদি জনগণের স্বার্থে প্রচল করা যায় তবে জনগণ "will be in a position to use the public sector as a lever for really socialist transformation of the economy."

বইখানির বহুল প্রচার কাম্য কিন্তু এর অতিরিক্ত দামের জন্য ভারতীয় পাঠকমণ্ডলের এক বিপুল অংশের আয়ত্তের বাইরে রয়ে যাবে।

শ্রীঅজিত রায় ভারতীয় রাজনীতির এত বেশি দিকে আলোকপাত করেছেন যে ফলে বহু পরিচ্ছেদ যেমন তথ্যপূর্ণ হয়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, আবার অন্যপক্ষে বলা যায় ভারতীয় পরিকল্পনার এমন সুবিন্যস্ত ও মার্কসবাদী বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে আর চোখে পড়ে নি। সকলপন্থী মার্কসবাদীদের ভারতের অর্থনীতি চিন্তায় 'Planning in India' বিশেষ চিন্তার উপকরণ যোগাবে। সমালোচনা প্রসঙ্গে আমি পূর্বেই বলেছি, লেখক পাঠককে চিন্তা করার অবকাশ দিয়েছেন, সম্ভবত খাদ্য সমস্যা, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণ প্রভৃতি বিষয়ে সমাধানের দিকগুলি পাঠককে সিদ্ধান্ত করে নিতে হবে।

দিলীপ বসু

সর্বাধুনিক সমরনীতি

"সোভিয়েত মিলিটারি স্ট্রাটেজি"—পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার এই বৃহৎ বইটিতে সোভিয়েত আধুনিক সমরবিদ্যার ঔপপত্তিক বিচারের প্রথম প্রামাণিক দলিল এবার পাওয়া গেল। 1926 সালে স্ভেচিন (Svechin) লিখেছিলেন "স্ট্যাটার্জি", কিন্তু তার কোনো ইংরাজি অনুবাদ বোধহয় নি, অন্তত সমালোচকের হাতে আসে নি। একমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ম্যাক্স্ ভার্নারের "মিলিটারি স্ট্রেন্থ অফ্ দি পাওয়ার্স" পুস্তকে সোভিয়েতের সামরিক শক্তি ও সমরবিদ্যা সম্পর্কে কিছু কিছু বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছিল; ম্যাক্স্ ভার্নারের সবকটি বই-ই অধুনা দুষ্প্রাপ্য।

অনেকগুলি শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের সঠিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করে তবে রণনীতি (স্ট্র্যাটাজি) ও রণকৌশলের (ট্যাকটিক্স্) ঔপপত্তিক বিচার করা সম্ভব—একদিকে যেমন সমগ্র যুদ্ধের (War) মধ্যে যতগুলি লড়াই (battle) ঘটবে বা ঘটতে পারে, তার প্রত্যেকটিতে সৈন্যবাহিনী অস্ত্রসম্ভার ইত্যাদির যথাযথ প্রয়োগ ও বিন্যাস বিচার করতে হবে, তেমনি যুধ্যমান সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাসগত নৈতিক শক্তির (morale) সঙ্গে সমরোৎপাদনকারী শ্রমিক বা অন্যান্য অসামরিক (civilian) শ্রেণীর বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা স্থাপনের উপর গোটা যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের ভাগ্য নির্ভর করে।

এই ধরনের প্রত্যেকটি বিষয়কেই আলোচ্য পুস্তকে যথাযথভাবে উপস্থিত করা হয়েছে, সর্বাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও অবস্থার পটভূমিতে। তৃতীয় মহাযুদ্ধে

Soviet Military Strategy—Ed. by Marshall of the Soviete Union V. D. Sokolovskii—U. S. A. edition by Rand Corporation, Prentice Hall, Inc. 7·50 dollar সম্প্রতি Praeger Paperback-এ প্রকাশিত হয়েছে, 2·95 dollar (তবে মূল পুস্তকে আমেরিকান সম্পাদকদের যে মূল্যবান আশি পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকা রয়েছে, সেটি পেপার-ব্যাকের সস্তা সংস্করণে নেই। আমরা মূল বইটিকে আলোচনা করব—সমালোচক)।

আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বারা তাপ-পারমাণবিক বোমার বহুল ব্যবহারের ফলে রণনীতি, রণকৌশল এবং উপরিউক্ত প্রতিটি গুণনীয়ক অবস্থারই পক্ষে-বিপক্ষে সব যুক্তিই হাজির করা হয়েছে। যে-প্রশ্নটা পুস্তকে সর্ববিষয়ের আলোচনার মধ্যে একটি প্রধান চিন্তাসূত্রের মতো গ্রথিত রয়েছে, সেটি হল—তাপ-পারমাণবিক বোমা-সজ্জিত আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের আবিষ্কারের ফলে কি পুরনো যুগের (এমনকি প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের) যুদ্ধসংক্রান্ত সব ধ্যানধারণাকেই একেবারে সমূলে বর্জন ও পরিবর্তন করতে হবে? চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে সে ধরনের কোনো বক্তব্যই সোভিয়েত সমরনায়কেরা আলোচ্য পুস্তকে রাখেন নি। তবে বেশ বোঝা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে দুই রকমের মতেরই লোক যথেষ্ট প্রভাবশালী—একদল আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ও তাপ-পারমাণবিক বোমার পরে পুরনো সব কিছুরই, বিশেষ করে স্থল, জল বা আকাশ-বাহিনীকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান না; এমনকি সোভিয়েত রাষ্ট্রের তদানীন্তন একজন বড়ো নেতা একবার ঘোষণা করেছিলেন যে, বোমারু ও লড়াকু বিমানগুলিকে এবার জলে ডুবিয়ে দেবার দিন আগত। অন্য দলের মতে তাপ-পারমাণবিক ও আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের তৃতীয় মহাযুদ্ধে বহুল ব্যবহার হলেও যুদ্ধের চূড়ান্ত ফয়সালা শেষ অবধি শত্রুদেশকে বা শত্রুশক্তিগোষ্ঠির অন্যতম প্রাণকেন্দ্রকে স্থল-বাহিনীর সাহায্যে দখল না করে করা যাবে না।

আলোচ্য পুস্তকটিতে এই দুই মতের পক্ষে-বিপক্ষে নানারকম যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে এমনভাবে, যাতে মনে হয় যে, পুস্তকের লেখক সোভিয়েত সমরনায়ক সোকোলভ্স্কি এই দুই মতের মধ্যবর্তী।

পারমাণবিক কূটনীতি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তে 1945 সালের 6 ও 9 আগস্ট জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমাতে পারমাণবিক বোমার প্রথম ব্যবহারকে স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম ঘোষণা ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম মহড়া বলা যেতে পারে। এ-বিষয়ে বিশদ বক্তব্য প্রফেসার ফ্লেমিংয়ের "History of the Cold War" এবং প্রফেসার ব্র্যাকেটের "A Study of War" সমালোচনা-কালে আমরা ইতিপূর্বে পেশ করেছি। উপস্থিত বক্তব্যের মূল পটভূমি হিসাবে তার চুম্বকটুকু মাত্র আমাদের এখানে হাজির করলেই চলবে।

1945-1949 : আমেরিকার হাতে রয়েছে পারমাণবিক বোমা, সোভিয়েতের তখনও সেটা তৈরি করা সম্ভব হয় নি। বারুক প্ল্যানের সদম্ভ ঘোষণা "instant and condign punishment" তাই তখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে করা সম্ভব হয়েছিল।

1949-52 : দু-পক্ষেরই হাতে পারমাণবিক বোমা মজুদ রয়েছে, আবার তাপ-পারমাণবিক হাইড্রোজেন বোমার (যার ধ্বংসক্ষমতা ও তেজঃক্রিয়তা সত্য সত্যই মানবসভ্যতাকে লুপ্ত করতে পারে) প্রথম পরীক্ষা এই সময়েই দু-পক্ষের দ্বারা করা হল।

1952-57 : অস্ত্র-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দু-পক্ষেরই হাতে পারমাণবিক ও তাপ-পারমাণবিক বোমার যথেষ্ট মজুদ এবং পারস্পরিক ধ্বংসক্ষমতা তুল্যমূল্য হওয়াতে সমরবিদ্যার ঔপপত্তিক ও প্রয়োগকামী বিচারে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হল।

1957 সালের 4 অক্টোবর প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন, পরে 1958 সালের জানুয়ারিতে আমেরিকা, মহাকাশে উপগ্রহ প্রেরণ করার পরে বোঝা গেল যে, ভবিষ্যতের তৃতীয় মহাযুদ্ধে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রেরই প্রাধান্য হবে খুব বেশি। ক্ষেপণাস্ত্রের মাথায় সুসজ্জিত থাকবে দারুণ ধ্বংসশক্তিবিশিষ্ট পারমাণবিক ও তাপ-পারমাণবিক বোমা, হয়তো কোনো-কোনো ক্ষেত্রে থাকবে মারাত্মক বীজাণুভর্তি বোমা।

এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে পৌঁছতে ক্ষেপণাস্ত্রের সময় লাগবে মাত্র 20 মিনিট, যার মধ্যে বেশির ভাগ সময়টাই উপর-আকাশে, মহাকাশের প্রান্তভাগে, সে বিচরণ করবে। ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধের কোনো পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করা এখনও সম্ভব হয় নি। তাহলে তৃতীয় মহাযুদ্ধে যুধ্যমান দুই দেশকে পারস্পরিক হানাহানি করে, খতম করে দেবার চেষ্টা করাই একমাত্র রণকৌশল এমনকি রণনীতিও হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ, যুধ্যমান দুই দেশের শক্তিগোষ্ঠির কেবল ফ্রন্টের সৈন্যসামন্ত নয়, তার পৃষ্ঠের (rear) লোকবল, ধনবল, সামরিক ও বেসামরিক উৎপাদন ইত্যাদি যত তাড়াতাড়ি ও নির্মূলভাবে ধ্বংস করাই হবে সম্ভাব্য তৃতীয় মহাযুদ্ধরত শক্তিগোষ্ঠির একমাত্র উদ্দেশ্য। সেজন্যই পুগ্‌ওয়াশ্‌ কনফারেন্সে সম্মিলিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরা বছরের পর বছর অত্যন্ত জোর দিয়েই বলেছেন যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধে মানব-সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য, সে-কথা আমরা পরে আলোচনা করব।

রণনীতি ও কৌশলের পরিবর্তন

আলোচ্য পুস্তকের শুরুতে কয়েকটি পরিচ্ছেদে সামরিক নীতি ও কৌশলগত কতকগুলি মৌলিক বক্তব্যকে তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাসগত নৈতিক (morale) শক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক বিচার করা হয়েছে।

"War is the continuation of politics"—যুদ্ধ রাজনৈতিক সংগ্রামেরই রূপান্তর, বলেছিলেন ক্লসেউইচ্ (Clausewitz)। আলোচ্য পুস্তকে লেনিনের কিছু উদ্ধৃতি তুলে দেখানে হয়েছে যে, সোভিয়েত সমরনায়কেরা এই উক্তির সঙ্গে মূলত একমত। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে যথাযথ সামরিক, তথা রাজনৈতিক নেতৃত্ব যোগানো, যথা যুদ্ধফ্রণ্টে অস্ত্রশস্ত্র থেকে খাদ্য যোগানোর জন্য পৃষ্ঠের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাকে ঠিকমতো চালু রাখা ও যোগাযোগ স্থাপন করা, যুদ্ধক্ষেত্রে ও ফ্রণ্টে ঠিক সময় ও প্রয়োজমতো সৈন্য, ট্যাঙ্ক, বোমারু ও লড়াকু বিমান প্রভৃতির যোগান দেওয়া (logistics)—এই সমস্ত সমস্যাই তৃতীয় মহাযুদ্ধেও প্রথম ও দ্বিতীয়ের মতো বজায় থাকছে; কিন্তু তাহলেও আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের বহুল ব্যবহারের উপরিউক্ত প্রতিটি গুণনীয়ক অবস্থারই কি ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে, তা বিশদভাবে দেখানো হয়েছে। আমরা এখানে তার সারাংশ আলোচনা করব।

1 তৃতীয় মহাযুদ্ধের আসর হবে সারা পৃথিবী জুড়ে, বিশেষ করে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে। পৃথিবীর জমির শতকরা 26 ভাগে কায়েম হয়েছে সমাজতন্ত্র যেখানে মানবজাতির শতকরা 35 ভাগ বাস করে। পৃথিবীর মোট খাদ্যের অর্ধেক ও শিল্পজাত দ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদিত হয় সমাজতান্ত্রিক জগতে (পৃ. 278)। দুনিয়ার বাকি অংশের অর্ধেকের কাছাকাছি জুড়ে রয়েছে সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি, ভারত তার মধ্যে অন্যতম। এরা সকলেই শান্তিকামী। খানদানী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিরও জনসাধারণ তো বটেই, এমনকি শাসক-গোষ্ঠিরও অনেকেই তৃতীয় মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বিশেষ ভীত।

তাই ভৌগোলিক-রাজনৈতিক (geopolitical) ভারসাম্যের চেহারাটা মনে রাখলে একদিকে যেমন তৃতীয় মহাযুদ্ধ ঘটতে দেব না, এই বিশ্বাস থাকে

অটুট, তেমনি একমাত্র খাঁটি সামরিক দিক থেকেই সমস্যাটির বিচার করে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ ঘটলে ভৌগোলিক-রাজনৈতিক কারণে তার ক্ষেত্র হবে সত্য-সত্যই সারা পৃথিবী জুড়ে। (পৃ. 278)।

2. আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের লজিস্‌টিকস্‌ একেবারে আলাদা, কারণ সেগুলি ছোঁড়া হবে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে। ইলেক্‌ট্রনিক্‌ গণনাকারী (computer) যন্ত্রসমূহের বহুল ব্যবহার তাই ভবিষ্যতের মহাযুদ্ধে অনিবার্য। কাজেই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একটা বড়ো অংশে যুক্ত থাকবে এন্‌জিনিয়ার, টেক্‌নিসিয়ান্‌ ও আরো উন্নত ধরনের বিজ্ঞানবিদ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকেই সমগ্র সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এন্‌জিনিয়ারিং ও টেক্‌নিক্যাল্‌ কর্মীদের সঙ্গে রণনায়কদের (command personnel) আনুপাতিক পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 1 : 4·2 ; স্থলবাহিনীতে সেটা দাঁড়িয়েছিল 1 : 5·7। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হবে এন্‌জিনিয়ারিং ও টেক্‌নিক্যাল্‌ লোকদের তুলনায় রণনায়কদের অনুপাত দাঁড়িয়েছে 1 : 1·5 এবং স্থলবাহিনীতে 1 : 3 ; 1960 সালের গোড়াতে সমস্ত সামরিক অফিসারদের মধ্যে এন্‌জিনিয়ারিং ও টেক্‌নিক্যাল্‌ অফিসারদের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা 38 ভাগ, অর্থাৎ 1941 সালের প্রায় দ্বিগুণ। আর ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত প্রতিটি 100 অফিসারের মধ্যে 72 জন হচ্ছে এন্‌জিনিয়ার ও টেক্‌নিশিয়ান্‌। (পৃ. 310)।

কাজেই আমরা দেখছি যে, ভবিষ্যতের যুদ্ধের জন্য বেশ উচ্চশিক্ষিত সৈন্য ছাড়া ভাড়াটে এবং অর্ধ বা অশিক্ষিত লোকজন নিয়ে যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়। সৈন্যদের শিক্ষার মান ও নৈতিক মনোবলের সম্পর্ক তাই আরো নিবিড় হয়ে উঠছে ; সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত সৈনিকদের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রশ্নও জড়িয়ে রয়েছে—অর্থাৎ কেন তারা লড়াই করে প্রাণ দেবে, কি তার উদ্দেশ্য—এ সমস্ত প্রশ্নই উচ্চশিক্ষিত সৈনিকরা করতে বাধ্য। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা আমাদের বক্তব্যের বিষয়ের বহির্ভূত—তবু এটুকু মাত্র আমরা বলে রাখি যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ রুখে দিতে পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের পক্ষে এটা একটা মস্ত বড়ো হাতিয়ার।

লজিস্‌টিক্‌সের দ্বিতীয় প্রশ্ন—যুদ্ধসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ (operational

theatres) ঘটবে প্রধানত কোন ক্ষেত্রে ? প্রথম মহাযুদ্ধে ক্ষেত্র ছিল প্রধানত স্থলে, খানিকটা জলে বা সমুদ্রে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে খানিকটা আকাশে হলেও প্রধানত স্থলে ও জলে; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফয়সালাও একমাত্র স্থলেই হয়েছে। আকাশবাহিনীর ভূমিকা স্থল ও জলবাহিনীর তুলনায় ছিল গৌণ ও তাঁবেদার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের লড়াকু ও বোমারু বিমানবাহিনীর আসল কাজ ছিল, স্থলবাহিনীকে সাহায্য করা—যেন সর্বাপেক্ষা দূর-পাল্লার কামানের মতো কাজ করবে জঙ্গীবিমানগুলি।

হ্যানিবলের সময়ে প্রথম হস্তীবাহিনী দিয়ে জোরালো আঘাত করে, তারপর অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে ফ্রন্টকে ক্ষিপ্রগতিতে ছিন্নভিন্ন করে, তারপর পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে লড়াই ফতে করা হত।

নেপোলিয়ন থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ অবধি হাতির স্থান নেয় দূর-পাল্লার কামান, অবশ্যই এর পাল্লা ক্রমশ দীর্ঘতর হয়েছে। তারপর অশ্বারোহী, তারপর পদাতিক—অবশ্য শেষোক্ত দুটির হাতে অস্ত্র ক্রমশ মারাত্মক হয়ে উঠেছে (যেমন রাইফেল, মেসিনগান প্রভৃতি)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আবার হস্তীবাহিনী অথবা দূরপাল্লার কামানের বদলে প্রথম বোমারু বিমান দিয়ে জোরালো আঘাত করে, তারপর অশ্বারোহী বাহিনীর বদলে ট্যাঙ্ক বাহিনী এবং সর্বশেষে পদাতিকের বদলে যান্ত্রিক, অর্থাৎ সাঁজোয়া গাড়ি ও মোটর সাইকেল আরোহীর হাতে স্টেনগান, মেশিনগান ইত্যাদিতে সজ্জিত বাহিনী দিয়ে আক্রমণ করার পদ্ধতি চালু হল।

বিমানবাহিনীর সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবহারের চেষ্টা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে (স্ট্র্যাটাজিক বোমাবর্ষণ যাকে নাম দেওয়া হয়েছিল) বেশ কিছুটা করা হয়েছিল। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, 1944 সালে যখন জার্মানির উপরে মিত্রশক্তির বোমা-বর্ষণ সর্বাপেক্ষা তীব্র, ঠিক সেই সময়েই, অসামরিক লোকের প্রভূত ক্ষতি হলেও জার্মানির সামরিক উৎপাদনের হার ছিল উচ্চতম।

সেজন্যই স্থল-বাহিনীর সাহায্য বিনা যুদ্ধের চূড়ান্ত জয়-পরাজয় নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। এমনকি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একেবারে অন্তে জাপানের নাগাসাকি-হিরোশিমাতে পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের পরেও (প্রফেসর ব্ল্যাকেটের মত অনুসারে) এই সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকে।

কিন্তু তাপ-পারমাণবিক বোমাযুক্ত আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের আবিষ্কারের পরে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন—এখন থেকে স্থল ও জল বাহিনীর গুরুত্ব বহুলাংশে কমে গিয়ে যুদ্ধজয়ের জন্য প্রধানত নির্ভর করতে হবে ঐ ক্ষেপণাস্ত্রসমূহের পরিমাণ, পাল্লা ও ধ্বংসশক্তির উপর।

3. তাপ-পারমাণবিক ও আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের বহুল ব্যবহারে ধ্বংস এত বেশি হবে যে, যুদ্ধের আরম্ভ থেকে ফয়সালা হতে সপ্তাহ দুয়েকের বেশি লাগবে না। বৈজ্ঞানিকদের হিসাব অনুসারে শিল্পসমৃদ্ধ কোনো এলাকাতে একটি সাধারণ হাইড্রোজেন বোমা (অর্থাৎ কয়েক লক্ষ টন বা কয়েক মেগাটন টি. এন্. টি. যার ধ্বংসশক্তি) বিস্ফোরণ করলে দেড় কোটি লোক সরাসরি হত হবে এবং আর প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোক তেজস্ক্রিয় ভস্মপাতে প্রথমে আহত হয়ে পরে ভবযন্ত্রণা থেকে 'মুক্তি' লাভ করবে। বেশ বড়ো আকারের কোনো শহর (যেমন আমাদের কলকাতা) সাধারণ একটি হাইড্রোজেন বোমার আঘাতে ধরাপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়ে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশির শ্মশানে পরিণত হতে পারে। সোভিয়েত ও অন্যান্য দেশের বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুসারে তিন থেকে পাঁচ লক্ষ কিলোমিটার বর্গক্ষেত্রের উপরে দুই মেগাটনের একশটি পারমাণবিক বোমা সেখানকার যত কল-কারখানা, বসতি ইত্যাদির সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন করতে পারে। আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের, বিশেষ করে তার গভর্নমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের হিসাব অনুসারে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 18 কোটি 80 লক্ষ লোকের মধ্যে, পুরোদমের পারমাণবিক যুদ্ধ ঘটলে, প্রথম আঘাতেই মারা পড়বে 53 কোটি লোক, বড়ো বড়ো শহর একেবারে ধ্বংস হয়ে, জলসরবরাহের শতকরা ৭০ ভাগ অকেজো হবে এবং হাসপাতালগুলির বেশির ভাগ চিকিৎসাব্যবস্থা অচল হয়ে পড়বে। তা ছাড়া 53 কোটি মৃতদেহের অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সৎকার ব্যবস্থা করাও অসম্ভব। কাজেই মড়ক, মহামারী ইত্যাদিও ঘটবে একেবারে ব্যাপক আকারে (পৃ. 300-301)।

4. তৃতীয় মহাযুদ্ধের জয়-পরাজয় যদি মাসখানেকের মধ্যেই নির্ধারিত হয়, তাহলে লজিস্টিক্সের হিসাব, ফ্রণ্ট ও পৃষ্ঠের পারস্পরিক সম্পর্ক, যুদ্ধজনিত ও বেসামরিক উপাদান—সব কিছুই নতুন পরিপ্রেক্ষিতে ভেবে দেখার

দরকার। কারণ প্রথম মহাযুদ্ধ চলেছিল চার বছরের কিছু বেশি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছয় বছরের সামান্য কম, অথচ তৃতীয় মহাযুদ্ধ ঘটলে চলবে মাত্র একমাস।

গত দুই মহাযুদ্ধেই যুদ্ধজনিত সংগঠন (wartime mobilisation) সংক্রান্ত সব কিছু—সৈন্যসমাবেশ, অস্ত্রোৎপাদন, অসামরিক জনসাধারণের মনোবল, যুদ্ধজনিত প্রচার, অন্যান্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ও নতুন করে সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ চুক্তি—যুদ্ধ লাগবার পরেই গড়ে উঠেছিল-যুদ্ধের প্রয়োজন ও গতি অনুসারে।

তৃতীয় মহাযুদ্ধ মাসাধিক মাত্র চললে উপরি-উক্ত সমস্ত সমস্যারই চিত্র একেবারে মূলত বদলে যাচ্ছে।

5. আগেকার যুদ্ধে, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও কোনো বিশিষ্ট এলাকাতে (sector) কোনো আংশিক লড়াইয়ের জয়-পরাজয়ের উপর অনেক সময় গোটা যুদ্ধের ভাগ্য নির্ভর করেছে। অবশ্য কোনো এলাকাতে বা কোনো দেশে, যেমন অধুনা ভিয়েতনামে, জাতীয় মুক্তিস্বাধীনতা নিয়ে নিশ্চয়ই স্থানীয় যুদ্ধ (local war) চলতে পারে ; আমরা সে সম্পর্কে এখানে আলাদা করে কোনো আলোচনা উপস্থিত করছি না, কারণ বহুলাংশে (কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক ছাড়া) সেটা পুরনো কায়দায়ই চলবে। কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী সর্বগ্রাসীরূপে এরকমের কোনো আংশিক জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন নিশ্চয়ই একান্তই গৌণ। তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতিতে তাই সারা ভূমণ্ডল ব্যেপে সমরনীতি (global strategy) নির্ধারণ করার প্রশ্ন ওঠে।

6. গত দুই মহাযুদ্ধে যুদ্ধারম্ভে অনেক সময়েই একপক্ষ হঠাৎ-আক্রমণের (surprise attack) দ্বারা সামরিক সুবিধা লাভ করলেও দীর্ঘকাল ধরে বিরাট বিস্তৃত পশ্চাৎপ্রদেশে (hinterland) সেই সামরিক সুবিধা হারিয়েছে—যেমন 1941-45 সালের জার্মান-সোভিয়েত মহাযুদ্ধ। কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধে হঠাৎ-আক্রমণের দ্বারা এক পক্ষ আর-এক পক্ষকে চূড়ান্ত আঘাত হেনে সামগ্রিক যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে।

কাজেই খাঁটি সামরিক কারণে তৃতীয় মহাযুদ্ধের জমি তৈরি (combat

readiness) সব সময়েই থাকলে তবেই তৃতীয় মহাযুদ্ধ ঠেকানো সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ন্যায়তই উঠবে, এই চব্বিশ ঘণ্টা যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকতে গিয়ে ভুলক্রমেও হয়তো লড়াই লেগে যেতে পারে; আর মহাযুদ্ধের দাবানল অনিচ্ছাকৃতভাবে লাগলেও তাকে থামাতে-থামাতে পৃথিবীর বেশ বড়ো অংশ একেবারে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশিতে পরিণত হতে পারে। 'On the Beach' ফিল্মে এইরকমই একটি পরিস্থিতির কথা কল্পনা করা হয়েছে।

ঠিক এই কারণেই প্রতি মুহূর্তেই বিশ্বশান্তির জন্য সংগ্রামকে অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে। আমরা যেন বারুদের স্তূপের উপর বসে আছি—সেই বারুদে ক্রমাগতই শান্তিবারি সিঞ্চিত করতে হবে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ, সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ ইত্যাদি দাবির মাধ্যমে।

বিশ্বশান্তি আমরা বজায় রাখতে পারব—তাকে আরো বর্ধিত করতে পারব সমস্ত পরাধীন দেশের জাতীয় স্বাধীনতা লাভের দ্বারা—পৃথিবীর বৃহত্তম মানবসংখ্যা ও মানবসভ্যতার ইতিহাসের রায় জীবনের পক্ষে।

আকাশ-কুসুম

যাকে ট্র্যাজেডি বলা যায় না কমেডিও বলা যায় না ; বা ট্র্যাজি-কমেডিও বলা যায় কিনা সন্দেহ, এমনধারা লেবেলহীন অথচ চিরপুরাতন একটি কাহিনীর (আশিস বর্মন রচিত) বিন্যাসে মৃণাল সেন যে স্পর্শগভীরতার পরিচয় দিয়েছেন, সেটা দুষ্প্রাপ্য তাই হয়তো দুর্বোধ্যও (অন্তত সমালোচকদের কাছে)।

সাধুতা ও অসাধুতা—কাগজে-কলমে দুটি বিপরীতধর্মী গুণ। কিন্তু জীবনে সত্যি কি তাই? যদি তাই হত তবে জীবনটা বড় সহজ হত, লক্ষ্যপথ বেছে নিতে ভালো এবং মন্দ লোকের অসুবিধে হত না, 'জটিলতা' কথাটার অস্তিত্বই থাকত না অভিধানে। বিভিন্ন কাগজওয়ালাদের মতে নায়ক জোচ্চোর, সে একটি নির্দোষ মেয়েকে ঠকাতে উদ্যত, তার সম্পর্কে দর্শকমন স্বভাবতই বিমুখ—সহানুভূতিশূন্য। কিন্তু আমার তো মনে হল, নায়ক নিজেই ঠকছে, তার অসাধারণ সারল্য ও শিশুসুলভ দুরাকাঙ্ক্ষায় সে যে বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাইছে সেইটেই তার দুর্বলতা। ঠকাচ্ছে তাকে মিস্ত্রী—নায়ক কাউকে ঠকাচ্ছে না। অসম অবস্থার অর্থনীতির দেশে এ ঘটনা পৌঁছেচে অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে—সেখানে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু মৃণাল সেন দেখাতে চেয়েছেন পুরাতন মূল্যবোধের অন্তঃসারশূন্যতা. যে মূল্যবোধের জোরে নায়িকার বাবা তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন, যে মূল্যবোধের তাড়নায় সমালোচকরা এ-ছবিকে নীতিবিরোধী মনে করেন। শুধু জানলার ফ্রেমে-বাঁধা মেয়েটির মুখে একটা আশ্চর্য আনন্দবেদনার ছায়াপাত হয় মুহূর্তের জন্যে। সে বুঝতে পারে সে ঠকে নি, নায়ক তাকে ঠকায় নি, এ-খেলার শেষ হল সত্যি কথা, কিন্তু বঞ্চনায় নয়, হীনতায় নয়। যা সে পেয়েছে তাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এনে নির্দিষ্ট সংজ্ঞার প্যাঁচে ফেলতে পারলে হয়তো সে শুধু হাত নেড়েই ক্ষান্ত হত না, কিন্তু তার বেশি এগোবার তার ক্ষমতা নেই। ঠিক সেই জন্যেই মনে হল নায়কও একেবারে শেষ ঠকা ঠকে নি মিস্ত্রির কাছে।

তাই গল্পের 'মর‍্যাল'টা বড় জোর নেহাতই নেতিবাচক। নীতিহীনতা নয়। আর যদি বঞ্চনার চিত্র বলে ধরে নিতেই হয়, তবে সেটা নায়কের আত্মবঞ্চনা।

'আকাশ-কুসুম'-এ যা সবচেয়ে চমকপ্রদ তা হল সোজাসুজি বাহুল্যবর্জিত-ভাবে ছবির ভাষায় কথা বলা। অথচ প্রথম দৃশ্য কয়েকটিকে হয়তো লিখিত ভাষায় খুব সহজেই রূপান্তরিত করা যায়। একটা বিয়েবাড়ির দৃশ্য, বর-কনের ফোটোগ্রাফ, তারপরে নায়ক ও নায়িকার দেখা। বলতে পারি, 'কোনো-এক বিয়েবাড়িতে ওদের তুজনের দেখা হল।' গান শুনে মেয়েটি মুগ্ধ। মৃণাল সেন সে গান আমাদের শোনান নি। ইচ্ছে করেই শোনান নি। আমাদের গল্প গানের উৎকর্ষ নিয়ে নয়, মেয়েটির ভালো লাগা নিয়ে। গল্প তারপর সোজাসুজি এগোয়। (কী সৌভাগ্য ফ্ল্যাশব্যাক্ নেই!) মৃণাল সেন কিছু স্থিরচিত্র ও কিছু freeze-এর সাহায্যে গল্পটা বলতে চেয়েছেন। আমার নিজের মনে হয় একটা স্থিরচিত্রও অবান্তর নয়, একটা স্থিরচিত্রও হিন্দিছবির গানের মতো গল্পকে দাঁড় করিয়ে রাখে নি। স্টেট্স্ম্যান্-এর বর্ষার দিনের ছবিগুলি যেন বর্ষায় আমাদের অচল জীবনটাকে সচল করে তোলে। একটার পর একটা স্থিরচিত্রের গতি যেন এক ছন্দোময় সচলচিত্রের ভ্রম সৃষ্টি করে। Freeze-এ নায়িকার থেমে-যাওয়া হাসি আর গতি যেন মুহূর্তকে চিরদিনের করে ধরে রাখার প্রয়াস। আমরা এ টেক্নিকে অনভ্যস্ত, তবে ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসবের কথা ছেড়ে দিলেও মৃণাল সেন যে মুঙ্ক্-এর 'প্যাসেঞ্জার'-এর দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন, এটা নিঃসন্দেহ। সেই টেক্নিক্কে তিনি ব্যবহার করেছেন আশ্চর্য সার্থকভাবে।

তাই বলে কি ছবিটিকে বলব টেক্নিক্সর্বস্ব? না। কারণ, অতিস্বল্প আড়ম্বর-হীন ব্যঞ্জনায় ছবি নিজের কথা বলে গেছে। যেমন গাড়ির সামনে টানা শহরের রাজপথ আর আলো আর তুটি অদৃশ্য মানুষের গলার আওয়াজ; বা অদৃশ্য মেয়ের গলায় গানের সুরের পটভূমিতে বাবা অস্থির হয়ে পায়চারী করছেন। মেয়ের মনে স্বপ্ন, বাপের বুকে জ্বালা। এ কথা সত্যি, নায়িকাকে পরিচালক ক্যামেরার সামনে বার-বার দাঁড় করান নি, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, অথবা সামনে থেকে তার মুখের উপরে ক্যামেরা ধরে রাখেন নি। বরং ক্যামেরা থেকে কদাচিৎ স্থানচ্যুত হয়েছে নায়ক, যে ক্রমাগত তার তাসের ঘরের উপরে তাস ছড়িয়ে চলেছে। দর্শক আমরা জানি তার সে ঘর ভাঙবে, ভাঙবে, ভাঙবে। কারণ স্বপ্ন তার, নায়িকার নয়। নায়িকা কন্‌ভেন্‌শনাল, নায়ক তার সমাজের, সমঅবস্থার তরুণসমাজের প্রতীক। কিন্তু আন্‌কন্‌ভেন্‌শনাল প্রতীক। সে যে কতখানি সৎ তা প্রকাশ পায় তার একটি কথায়, যখন

ভাঙা স্বপ্নের, ভাঙা তাদের বাড়ির মুখোমুখি হয়ে নায়িকাকে বিনা দ্বিধায় জানাতে চায়, "খেল খতম।" [মৃণাল সেন 'প্রতিনিধি'তে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস পান নি, এইবার তিনি নিজে যে শুধু নতুন সাহস সঞ্চয় করলেন, তা নয়, আমাদের প্রাণেও নতুন সম্ভাবনার ভরসা জাগালেন।]

আকাশের রামধনুর মতো জীবনেও রামধনু ফোটে। সাত রং তার একসাথে মেশা। বলা যায় না শুধু লাল, শুধু নীল বা অন্য কিছু। রঙের খেলা আকাশেই মিলিয়ে যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে। তবু সে তো মিথ্যে নয়?

আবার একটা প্রশ্ন জাগে মনে। এ ঠিক, কী ভাবে গল্পটা বললেন মৃণাল সেন? যেন একটা হালকা সুরের পাশে এসে দাঁড়ায় গুরুগম্ভীর ধ্বনি, যেন হাসতে গিয়ে মনে হয় ওটা নিছক হাসির ব্যাপার নয়। নায়ক মাকে বলছে তার প্রেয়সীর কথা, ভবিষ্যতের কথা। মাকে সে আর রান্নাঘরে দিন কাটাতে দেবে না। ফুর্তিতে সে লাফ মেরে উল্টে পড়ছে খাটের উপর—খাট ভেঙে তার দেহটা ঢুকে যাচ্ছে ভাঙা খাটের গর্তে—সেইটেই তখন স্থিরচিত্র। আমাদের প্রাণখোলা হাসির শেষে যেন অন্য একটা সুরের শীতল স্পর্শ।

এইরকম করে বলার ভঙ্গি কি মৃণাল সেনের স্বকপোলকল্পিত? তাই কৃত্রিম? তাই বর্জনীয়? তা যদি হয়, তবে বলতে হয়, আমরা এ-ছবির নায়কের চেয়েও অসহায়, কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত। জীবন ছকবাঁধা পথে চলে না। অনুভূতি আলাদা-আলাদা সংজ্ঞায় মানুষের মনের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন কুঠরিতে বাস করে না। এ-সত্যকে যদি অস্বীকার করি, সমালোচক হিসেবে—তবে সে শুধু আত্মবঞ্চনা হবে না সেটা হবে অন্যকে ঠকানো।

পরিশেষে বলতে হবে, এ-ছবি 'পরিচালকের ছবি'। মৃণাল সেনের নির্দেশনায় অভিনেতারা ছবির দাবি সার্থকভাবেই মিটিয়েছেন, সংগীত-পরিচালকও তাঁর যথার্থ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের কৃতিত্বের পৃথক স্বীকৃতির তেমন সুযোগ নেই, কারণ পরিচালকের সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিই এ-ছবির সবচেয়ে বড় কথা।

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ-কুসুম। পরিচালনা—মৃণাল সেন। চিত্রনাট্য—মৃণাল সেন ও আশিস বর্মন। চিত্রগ্রহণ—শৈলজা চট্টোপাধ্যায়। সংগীত—সুধীন দাসগুপ্ত। অভিনয়ে—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দাসগুপ্ত, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন। কলকাতায় মুক্তিলাভ—১৬ই জুলাই, ১৯৬৫।

বি বি ধ-প্র স ঙ্গ

য়েট্‌স্ : শতবার্ষিকী উপলক্ষে

১৯২২-এর ২৬শে সেপ্টেম্বর ভার্জিনিয়া উল্‌ফের বাড়ির আড্ডায় তরুণবয়সী টি. এস্. এলিয়ট তাঁর সেই আমলের স্বভাবসিদ্ধ অবিনয়ী আত্মাভিমানে জেম্‌স্ জয়েস্‌কে "পুরোপুরি লিটেরারি" বা সাহিত্যনির্ভর বলে বর্ণনা করেন। সাহিত্যের সীমাবদ্ধতার এই বিশেষ অভিযোগটি তখনই চালু হয়ে গেছে। সাহিত্যের 'কমিউনিকেশন' বা রসগ্রাহিতার প্রসার ও গণতন্ত্রের তথা সামাজিক দায়িত্বের অবিচ্ছেদ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই সাহিত্যঘেঁষা বা সাহিত্যনির্ভর সাহিত্যের মূল্য সম্পর্কে সংশয় দেখা দিচ্ছে। ১৯৩২-এ কোনো-এক প্রবন্ধ-বার্ষিকীর ইদানীং প্রায়-অপঠিত ও তৎকালেও প্রায়-অনালোচিত এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে লুই ম্যাক্‌নীস্ একই অভিযোগে এলিয়ট্ ও পাউণ্ডকে দায়ী করেন, অন্যপক্ষে য়েট্‌স্‌কে কম সাহিত্যনির্ভর ও সেইহেতু আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে সমাদরণীয় প্রভাব বলে স্বীকার করেন। ম্যাক্‌নীস্ সেদিন যেমন য়েট্‌স্‌কে যথাযোগ্য স্বীকৃতিদানে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁর নিজ যুক্তিকে আরো কিছুদূর অনুসরণ করলে হয়তো তেমনই তখনই লরেন্‌স্‌কেও কবি হিসেবে আবিষ্কার করতে পারতেন। এলিয়ট্ সম্পর্কে লরেন্‌স্-এর কোনো মূল্যায়ন এখনও চোখে পড়ে নি; কিন্তু মনে হয়, ফ্রীডা লরেন্‌স্-এর সঙ্গে এ-বিষয়ে বোধ হয় তাঁর মতান্তর ঘটত না। ফ্রীডা ১৯৫১ সালে (২৪ জানুয়ারি) হ্যারি মুর-কে লিখেছিলেন: "আমার চোখে টি. এস্. এলিয়ট্ যেন এক সুচারুরূপে খোদিত কঙ্কাল—রক্তহীন, অন্ত্রহীন, মজ্জাহীন, মাংসহীন।" সেই একই অভিযোগ। লরেন্‌স্-এর সমালোচনা-সাহিত্যের সংগ্রহগ্রন্থে য়েট্‌স্ সম্পর্কে একটিমাত্র প্রাসঙ্গিক উক্তি যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। তবু বোধ হয়, সাহিত্যক্ষেত্রে এঁরা দুজনেই এলিয়ট্ (ম্যাক্‌নীস্ সেদিন তাঁকে বলেছিলে: "আর্চ-হাইব্রাও") ও পাউণ্ডের ঘরানার প্রতিপক্ষ ধারার সবচেয়ে ভাস্বর মূর্তি। সেই কারণেই য়েট্‌স্ লরেন্‌স্-এর 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারেন, ওলিভিয়া শেক্সপীয়রকে লিখতে পারেন: "...একের সেই অমার্জিত ভাষা যখন দুজনেই গ্রহণ করে, তখন সেই ভাষা এক নিঃসঙ্গ কবিতা হয়ে উঠে

তাদের দুজনের একাকীত্বকে একসূত্রে মিলিয়ে দেয়—এ যেন প্রাচীন, বিনীত, ভয়ংকর কি এক বস্তু।…লরেন্‌স্ নিশ্চিতভাবেই একালীন বিমূর্তনের ('অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌শন') বিরুদ্ধে প্রকাশিত এক শক্তি।" (২২ মে, ২৫ মে, ১৯৩৩)। য়েট্‌স্ যখন এলিয়ট্ কিংবা পাউণ্ড সম্পর্কে মন্তব্য করেন, তখনও ধারণার এই বিরোধের প্রমাণ মেলে। এলিয়ট্ একদা যাঁকে প্রায় ভজনা করেছেন, সেই "আরো কীর্তিমান শিল্পী" এজরা পাউণ্ড (যিনি আবার য়েট্‌স্-এরও তলোয়ার-খেলার গুরু) সম্পর্কে শেষ বয়সে য়েট্‌স্-এর মন্তব্য: "আবেগ নয়, এক স্থির কষ্টকৃত ভঙ্গিমাত্র, সকল তীব্রতা সত্ত্বেও লিঙ্গহীন মার্কিন অধ্যাপকমাত্র।" (ডরোথি ওয়েলেস্‌লিকে লেখা চিঠি, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)। প্রায় একই পর্বে তিনি এলিয়ট্ সম্পর্কে লেখেন: "এলিয়ট্ লোকটা আধুনিক নয়। লোকটা অতীতকে নিঙড়ে ছিবড়ে করে দিয়ে তার রস ঢেলে দেয় তাদের গলায়, যারা হয় এত ব্যস্ত নয়তো এমন সৃজনশীল যে ওর মতো অত পড়বার অবকাশ পায় না। আমার বিশ্বাস, এমন সময় একদিন আসবে যেদিন লোকে এলিয়ট্‌কে মনে রাখবে অসুস্থ বিষাদগ্রস্ত এক যুগের 'ইণ্টেরেষ্টিং সিম্‌টম্‌স্' হিসেবে।" (ডরোথি ওয়েলেস্‌লিকে লেখা চিঠি, ৪ জুলাই, ১৯৩৬)।

সন্দেহ হয়, নৈর্ব্যক্তিকতার তত্ত্বে আদি প্রত্যয়ের কারণেই হয়তো এলিয়ট্ নিজের কবিতা থেকে নিজেকে নির্বাসনের দুরূহ প্রয়াসে পুরনো সাহিত্যের মুখোসে ফর্মের বাঁধুনী পেয়েছিলেন। তাই পরে, ১৯৪০-এ জুন মাসে, ফ্রেন্‌ডস্ অফ দি আইরিশ অ্যাকাডেমির সভায় বক্তৃতাকালে তিনি নৈর্ব্যক্তিকতার দ্বিজাতিভেদ স্বীকার করে য়েট্‌স্-এর ভিন্ন জাতের অথচ গভীরতর নৈর্ব্যক্তিকতার আবিষ্কারে কৃতকার্য হলেন। 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তিপ্রতিভা' নামে যে অপরিণত রচনাটির জন্য এলিয়ট্ গত বছর অবধি লজ্জাবোধ করেছেন, তাতে ব্যক্ত মতের অস্পষ্টতা ছাড়িয়ে উনিশশো চল্লিশের প্রাজ্ঞতর এলিয়ট্ বললেন: "যে-কবি গভীর ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অন্তর থেকে কোনো সর্বতোমুখ সত্য প্রকাশ করতে পারেন, তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ রক্ষা করেও তাকে সর্বজনীন প্রতীকে পরিণত করতে পারেন, তাঁর নৈর্ব্যক্তিকতা ঐ দ্বিতীয় জাতের।" আত্মীয়বন্ধু থেকে শুরু করে মিউনিসিপাল চিত্রশালায় কীর্তিত আইরিশ জনজীবনের তাবৎ প্রতিভূকে জড়িয়ে এক একান্ত ব্যক্তিক পুরাণ রচনা করে, গ্রীক হেলেন ও আইরিশ কুহুলিন্, কনোহার, ক্যাথ্‌লিন-এর সঙ্গে জর্জ পলেক্‌স্‌ফেন্, মড্ গন্, গোগার্টি, অগস্টা গ্রেগরি,

জন সিঙ্-এর বহুসূত্রগ্রথিত সংযোগ তিনি আবিষ্কার করেছেন ; তা ছাড়াও ছিল ইতিহাসের সেই জটিল অতীন্দ্রিয় পরিকল্প। দেশকালসীমিত এক বিশেষ মানুষের আত্মপ্রকাশের তাগিদেই এই সমূহ সূত্র রূপকল্প-প্রতীকের অর্থগভীর ক্ষেত্র যুগিয়েছিল। অনুষঙ্গের বিস্তীর্ণ তাৎপর্যেই, একই রূপকল্পের বহু স্তরে বিধৃত অর্থেই য়েট্‌স্-এর কবিতার সবচেয়ে বড় মূল্য।

য়েট্‌স্ কাব্যচর্চায় ও কাব্যসাধনায় মালার্মের পথ ধরে "কয়েক ফার্লং" এগিয়েছিলেন, পরে ব্লেক ও শেলির রোম্যাণ্টিক প্রতীকধর্ম মেনেছিলেন, পুরোহিত স্বামীর সঙ্গে উপনিষদ্ অনুবাদকালে সংস্কৃত সাহিত্য ও নিজে 'ইডিপাস্' অনুবাদকালে গ্রীক সাহিত্যকে জেনেছিলেন। য়েট্‌স্-এর কাব্যশরীরে এই সবেরই চিহ্ন আছে। কিন্তু এহেন সমূহ প্রভাবের চেয়েও বেশি বিস্মিত করে তাঁর কাব্যপ্রসঙ্গ ও কাব্যকলার বিকাশ। গোলাপের উদ্দেশে নিবেদিত প্রার্থনায় 'পুরনো আয়ারের' স্মৃতির আকর্ষণ থেকে "এক একর ঘাসে"র "বৃদ্ধের তীব্র মত্ততা"র জন্য প্রার্থনা এত ভিন্ন, অথচ একই মানসবৃত্তের বিবর্তনের সত্যে আত্মীয় মনে হয়। গত শতাব্দী থেকে এই শতাব্দীতে তাঁর কবিতায় ভাষা তথা প্রকাশভঙ্গির চরিত্রগত বিবর্তনও ঐ একই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। কালানুক্রমিক সূচীর গাণিতিক হিসেব ছাড়িয়ে তাঁর কবিতাসমূহকে এক অখণ্ড সত্তা তথা এক আর্কিটাইপাল কবির "মনের ইতিহাস" বলেই বিবেচনা করা উচিত, এই ছিল তাঁর নিজের নিবেদন।

১৯৩৮-এ একদিন ডরোথি ওয়েলেস্‌লির সঙ্গে আলোচনাকালে গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের তর্ক ওঠে। কথায় কথায় অভিজাততন্ত্রের গুণমুগ্ধ য়েট্‌স্ বীরের দর্পিত মনকেই অভিজাততন্ত্রের স্বরূপ বলে মানেন। সস্তা, খেলো, অযত্ননির্মিত যা-কিছু, তার বিরুদ্ধেই তীব্র ঘৃণা,—য়েট্‌স্-এর এই ব্যক্তিক অভিজাততন্ত্রের লক্ষণ। দু'-দুবার জনতার যুক্তিহীন আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে য়েট্‌স্ সিঙ্ ও ও'কেসির নাটকের জন্য লড়াই করেছিলেন। গণতন্ত্রের খাতিরে তার প্রায় অবশ্যম্ভাবী সহচর অরসিকতন্ত্রকে তিনি মানতে রাজী হন নি। গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর বিরাগ রাজনৈতিক নয়, ইস্‌থেটিক্।

অ্যাবে থিয়েটারের পত্তনে য়েট্‌স্-এর ভূমিকা স্মরণীয়। কিন্তু থিয়েটারের ধারণার দৈন্যহেতু তাঁর অভীষ্ট ও পন্থার মধ্যে কখনও পুরোপুরি মিল হল না। ফলে শেষ পর্যন্ত য়েট্‌স্-কে অ্যাবে থিয়েটার ছাড়তে হল, অ্যাবে থিয়েটারও অন্য পথ ধরেছে। কিন্তু তাঁর নিজের নাটকে পুরনো মিথ্ ভেঙে নতুন মিথ্

রচনার ক্ষমতা অনস্বীকার্য। 'দ্য প্লেয়ার কুইন্'-এর মিথ্ ও জেনে-র 'ব্যাল্কনি'-র মিথের মধ্যে কোথাও একটা মিল আছে মনে হয়, এলিয়েনেটেড মানুষের আত্মবীক্ষণের য়েট্সীয় রূপায়ণ জেনে-র লেখার মতোই একেবারে আজকের বলে মনে হয়। সমাজ ও মানুষকে নিয়ে এই যে সংকট, এর সমাধান কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তরে য়েট্স্ বলেছিলেন: "জানি না।" সমাধান বাৎলে দেবার উদ্ধত আত্মপ্রত্যয় ছিল না বলেই বোধহয় য়েট্স্-এর কবিতা ও নাটক সংকটের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে সংকটকে মূর্ত করে তুলল, খৃষ্টের আবির্ভাব কিংবা স্বস্তিবচনের শান্তিবারি ছেটাবার নিষ্ফল চেষ্টার দিকে গেল না। বোধহয়, এই চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে মেলাবার চেষ্টায় বিরত থাকতে পেরেছেন বলেই য়েট্স্ এতটা আধুনিক। কোনো আশ্বাসবাণী না শুনিয়ে সংকটকে মুখোমুখি চিনে নেবার স্পর্ধাই আধুনিক মনের লক্ষণ। সেই ইন্কন্‌ক্লিউসিভ্‌নেস্-এর সাহসের জোরেই য়েট্স্ শতবর্ষান্তেও আমাদের সমকালীন।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

লাইব্রেরি শোধন

ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা বিগড়ে যাচ্ছে। কি করে তাদের শোধরানো যায়? ভাবতে ভাবতে কেরালার রাজ্যপালের পরামর্শদাতা শ্রীরাঘবনের মাথায় হঠাৎ একটা খুব মোক্ষম বুদ্ধি খেলে গেল। যত রাজ্যের ছাইপাঁশ বই ছাত্রছাত্রীরা ইস্কুলের লাইব্রেরি থেকে গাদা গাদা নিয়ে যাচ্ছে আর সেই সব পড়ে তারা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। তাই তিনি ডিক্রিজারি করলেন (অবশ্য রাজ্যপালের নামে), বই হঠাও। এক-আধখানা নয়, একেবারে ২৩৩ খানা। লেখকদের মধ্যে আছেন মোপাসাঁ, জোলা, কোয়েসলার, পাণিক্কর, ভাল্লাথল, নাম্বুদিরিপাদ, অচ্যুত মেনন, মুন্দাসেরি ইত্যাদি। হ্যাঁ, একজন আই. এ. এস. অফিসারও আছেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনিও একজন বামপন্থী! এইতেই ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ বোঝা গেল। খানিকটা প্রতিহিংসার ব্যাপার। কেরালার ভূতপূর্ব কমিউনিস্ট মন্ত্রীদের কোনো বই ইস্কুলের লাইব্রেরিতে রাখা চলবে না। কেরালার কংগ্রেস মন্ত্রীরা চক্ষুলজ্জার খাতিরে অথবা বিধান সভায় চেঁচামেচির ভয়ে কাজটা করতে পারেন নি। এখন পথ নিষ্কণ্টক। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য

হলো ছেলেমেয়েদের মনকে খাঁচায় পুরে রাখা যাতে তার গায়ে সংস্কৃতির মুক্ত আকাশ-বাতাসের ছোঁয়াচ না লাগে এবং যাতে তারা বড় হয়ে কংগ্রেসী গুরুর কাছ থেকে শেখা 'তট তট তোটয়' বুলি ছাড়া আর কিছু আওড়াতে না পারে।

প্রথমটা মনে হয়েছিল, সমস্ত ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিই। এমন নিরেট বোকামি দেখলে সত্যিই হাসি পায়। ছেলেমেয়েরা কি বই পড়ে খারাপ হয়? শিক্ষাতত্ত্ব নিয়ে এত হৈচৈ হচ্ছে, অথচ এই সেকেলে ধারণাটা এখনও আমাদের শাসকদের মন থেকে গেল না। টেডি-বয়েরা ও ঈভ-টীজাররা মোপাসাঁ ও জোলা পড়া দূরে থাক, কোনোদিন তাঁদের নাম শুনেছে কিনা সন্দেহের বিষয়। যদি 'নৈতিক' কারণে বইপড়া বন্ধ করে দিতে হয় তাহলে তো মহাভারতকেই সর্বাগ্রে নিষিদ্ধ করা উচিত। সংস্কৃত কাব্যগুলিতেও কি কেবল বিশুদ্ধ, অশরীরী আত্মারই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়? দুয়েকটা সংস্কৃত কাব্য তো মানুষের অ্যানাটমির পাঠ্যপুস্তকরূপেও নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য। তারপর কেরালার ছেলেমেয়েরা ইস্কুলের লাইব্রেরি ছাড়া অন্য লাইব্রেরি থেকেও ওই ২৩৩ খানা বই যোগাড় করে পড়তে পারে। কেরালা সরকার কি করে তার প্রতিবিধান করবেন? আমার তো মনে হয়, কেরালা সরকারের ওই মূর্খ আদেশ জারি হওয়ার পর সেখানকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে ওই নিষিদ্ধ বইগুলো পড়ার রেওয়াজ বহুগুণ বেড়ে যাবে। সুতরাং ছাত্রছাত্রীর শোধন হলো না, হলো লাইব্রেরির শোধন। শিক্ষাবিভাগের কর্তারা যাতে ইস্কুলের লাইব্রেরি পরিদর্শন করার সময়ে হঠাৎ কমিউনিস্ট বিভীষিকার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দাঁতকপাটি লেগে পড়ে না যান তার অতি উত্তম ব্যবস্থা করা হলো।

নাম্বুদিরিপাদ ও অচ্যুত মেননের বই পড়তে না পেলেই কেরালার ছেলে-মেয়েরা আর কমিউনিস্ট হয়ে উঠবে না, এই ব্যাপারটার কথা ভাবলেই বাস্তবিকই হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। এঁরা কমিউনিস্ট হয়েছিলেন কি নিজেদেরই লেখা পড়ে? মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এঁদের বই পড়া বন্ধ করার কি ব্যবস্থা হয়েছে? হয় নি, তবে হবে হয়তো। তাই ব্যাপারটা ঠিক হাসির নয়। আজ কেরালার আকাশে যে হস্তপরিমাণ মেঘ দেখা দিয়েছে, কাল হয়তো তা ঘনঘটা করে সমগ্র ভারতবর্ষের আকাশকে আচ্ছন্ন করবে। কেরালা রাজ্যকে তো চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং কংগ্রেস যাঁদের অঙ্গুলি-হেলনে চালিত হয়, তাঁরাই আছেন কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষদেশে। তাই ভয় হয়, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা দেশকে। লাইব্রেরি থেকে বই সরানো,

মানুষের মনে শেকল পরানোর চেষ্টা, এসব দুর্লক্ষণ ম্যাকার্থীইজম ও ফাশিজমকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আজই ভারতে একটা ফাশিস্ত রাষ্ট্র দেখতে পাচ্ছি, একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা কালকের সম্ভাব্য অমঙ্গলকে আজকের বাস্তব অমঙ্গল বলে প্রচার করে কার যে কি উপকার সাধন করতে চান তা বুঝি না। তবু এই সম্ভাব্য অমঙ্গল সম্বন্ধে উদাসীন থাকা খুবই ভুল হবে। ভারতে গণতন্ত্রকে বজায় রাখাই আজ সর্বপ্রধান কর্তব্য, আমার, আপনার, সব ব্যক্তির, সব দলের। কংগ্রেসের দায়িত্বই এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি। চিন্তার স্বাধীনতা, সংস্কৃতির স্বাধীনতা বিনা গণতন্ত্র একটা বিরাট পরিহাস। তাই ইউনিয়ন সরকারের উচিত, গণতন্ত্রের ন্যূনতম শোভনতার খাতিরে এখনই কেরালা সরকারকে নির্দেশ দেওয়া যে, ২৩৩ খানা বইয়ের উপর কাঁচি চালিয়ে সেগুলির পুনঃপ্রকাশ হোক, এই ধরনের পাগলের প্রলাপ না বকে তাঁরা ওই দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত নোংরা আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করুন। এ কাজ যদি কেন্দ্রীয় সরকার না করেন, তাহলে আজ অন্ধকার ভূগর্ভে যে সব শক্তি ভারতে ফাশিস্ত রাষ্ট্র বা সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে, তাদেরই সঙ্গে কংগ্রেস নেতারা জেনে হোক, না জেনে হোক হাত মেলাবেন।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

এই সংখ্যা যখন ছাপা শেষ হতে চলেছে তখন খবর এল, কেরালার রাজ্যপাল লাইব্রেরি শোধন আদেশটির সংশোধন করেছেন। মন্দের ভালো। ধন্যবাদ। আদেশটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করাই উচিত।

—সম্পাদক, **পরিচয়**

পাঠকগোষ্ঠী

আধুনিক বাঙলা কবিতা প্রসঙ্গে

গত আষাঢ় সংখ্যা 'পরিচয়ে' 'ভয়ে-ভয়ে কয়েকটি কথা' শিরোনামে শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র বাঙলা কবিতার বর্তমান দুরবস্থা প্রসঙ্গে যে-আলোচনা উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন তার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়েছে। বাঙলা ভাষার নিখুঁত-চতুর, ছন্দে ও বাকচাতুর্যে আকর্ষণীয় কবিতা পড়তে পড়তে আমরা, বাঙলাদেশের কবিতা পাঠকগণ, ক্লান্ত। কবিতা এখন ক্লিশে-কণ্টকিত নিরুত্তাপ গতানুগতিকতা। এর কারণ হিসেবে শ্রীযুক্ত মিত্রের মনে হয়েছে (১) পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে বাঙালি কবিদের ঔদাসীন্য (২) জীবনানন্দর রূপকল্পের ঘোর-লাগা প্রভাব। সমাজ ও পৃথিবীর এমতাবস্থায় (কবিতার ঋতু শেষ, কবিতার প্রতি প্রেম মরে গেছে) বাঙালি কবিরা যদি বিশ্বাস ও আস্তিকতায় ফেরেন তাহলে বাঙলা কবিতার দুর্দিন শেষ হবার সম্ভাবনা আছে আর এ-ব্যাপারে তরুণ কবিদের সামনে উদাহরণ রেখেছেন প্রথম দিককার সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সমর সেনের।

যদি খুব ভুল বুঝে না থাকি, তাহলে অশোকবাবুর আলোচনার সারমর্মটা এই রকমই। এ ব্যাপারে প্রথমত যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য হয়েছি একটা ব্যাপার দেখে যে তাঁর আলোচনায় জীবন ও লোকপ্রেমের প্রত্যয়, দু-টুকরো-হয়ে-যাওয়া শরণার্থীসমস্যাদীর্ণ বাঙলাদেশ, মৃত্তিকার মূল, পারিপার্শ্বের নিঃশ্বাস ইত্যাদি শব্দগুলো এসেছে অথচ কবি বিষ্ণু দে সম্বন্ধে তিনি আশ্চর্যভাবে নীরব। একবার মাত্র নামটা উল্লেখ করেছেন, আর সে উল্লেখে প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে অমিয় চক্রবর্তী পর্যন্ত সকলকেই একই পংক্তিতে উচ্চার্য মনে হয় তাঁর এই কারণে যে এঁরা অনেক ভালো কবিতা লিখলেও, এঁদের কবিতা নাকি কয়েক দশক বাদে আমাদের 'বুকে চমক দিয়ে ডাকবে' না বা 'বুদ্ধিতে নতুন কোনো দীপ্তির দৌত্য নিয়ে আসবে' না। শুধু রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-মোহিতলালের প্রবাহে হারিয়ে যাবেন না জীবনানন্দ এবং সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায় উদ্ধৃত বিদ্রূপের মতো পংক্তি-বিভক্ত হয়ে থাকবেন।

আমি জানি না, 'সহজবোধ্য' ও 'সহজগ্রাহ্য' না হলেই কোনো কবি আমাদের 'বুকে চমক দিয়ে' ডাকেন কি-না বা বুদ্ধিতে নতুন নতুন দীপ্তির দৌত্য নিয়ে আসেন কি-না। তবে এটুকু জানি যে যে-কবির কবিত্বময় 'সবার মানসে মিলে যায় দেশের যুগের কবিমানস তার অতীত বর্তমান সমেত আগামী ইঙ্গিতময়তায়।' যাঁকে 'ব্যক্তিস্বরূপের আত্মসন্ধানে বা ব্যাপ্ত কোনো সংলগ্নতার মর্মান্তিক জিজ্ঞাসায় চরম এক উৎক্রান্তি বা ক্রাইসিসের মুখোমুখি হতে হয়, যে আততিতে কবিমনের বিকাশ স্বাক্ষর পায়।' এমন কবিরাই বহুদিন আমাদের ডাক দিয়ে তৃপ্ত করে কৃতজ্ঞ করেন—তিরিশের যুগের এমত লক্ষণাক্রান্ত দুজন কবির কথাই আমার মনে পড়ে জীবনানন্দ দাশ (যাঁর উপমা-চিত্রকল্প আদৌ ছায়া-ছায়া নয়, ছায়া-ছায়া বিশেষণটা যে-কোনো আধুনিক কবির চিত্রকল্পের পক্ষে নিন্দাসূচক) এবং বিষ্ণু দে। এবং বলতে দ্বিধা নেই যে বিষ্ণু দে-কে অনেক ব্যাপারে আমার মহত্তর মনে হয় যেহেতু তিনি যৌবনের রোম্যান্টিক-মগ্নতাকে কখনও জগচ্চিত্র ভাবেন নি এবং বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার পুনর্গ্রহণে, নির্মাণে উৎসাহিত হয়েছেন। বৃত্ত থেকে বৃহত্তর বৃত্তান্তরে বেরিয়ে গেছেন। 'সন্দ্বীপের চর' থেকে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' পর্যন্ত যাঁর কবিতা নতুন অভিজ্ঞতা এবং কবিভাবনায় শেষ পর্যন্ত দুরূহ পেশল সরলতায় অনন্য। আমাদের বাঙলাদেশকে, গত কয়েক দশকের বাঙলাদেশের ছিন্ন-ভিন্ন ইতিহাসকে তার বহু বৈচিত্র্য জটিলতাসহ আর কেউ এমনভাবে ধরতে পেরেছেন বলে জানা নেই। এবং বর্তমান বাঙলা কবিতার দুর্দশার ব্যবস্থাপত্র অশোকবাবু না-না করেও যদি লিখলেনই এবং যদি দুজন কবির উদাহরণ সামনে রাখার প্রয়োজনটা জরুরী মনে হল তাঁর, তবে কেন বিষ্ণু দে-র নামটা তাঁর মনে হলো না তাও আমি বুঝে পাই না। কারণ আমার তো মনে হয় বিষ্ণু দে'র আজীবন কাব্যসাধনাটাই ম্রিয়মান নিস্তেজ চাতুরীর বিরুদ্ধে, উন্মূল উৎকেন্দ্রিক হাংরিপনার বিরুদ্ধে উজ্জ্বল প্রতিবাদ।

সমর সেনের 'নাগরিক' কবিতায় অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও, সুধীন্দ্র দত্তের 'উটপাখি'র তুলনায় সে-কবিতা যে 'স্মরণযোগ্য বাক্যের সমষ্টিমাত্র' জীবনানন্দ দাশ এ সত্য আমাদের লক্ষগোচর করেছিলেন। সমর সেনের কবিতার বৃহদংশই তো 'স্মরণীয়তর বাণী'র অভাবে ক্লিষ্ট।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় শক্তিমান, বিশেষত যে-সুভাষ মুখোপাধ্যায় পদাতিক লিখেছেন। যদি বিশ্বাস আস্তিক্য আশা এগুলো বর্তমান বাঙলা কবিতার

দুর্দশামোচনের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে তাহলে সুভাষবাবুর কবিতা, বিশেষত পদাতিকের কবিতাগুলি (যেখানে বিশ্বাস ও কবিতা দুই-ই মেলে) উদাহরণ হিসেবে ভালো।

ভালো কবিতা মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ নিয়ে চিন্তিত এবং সেই অর্থেই বাস্তব। আমার তো মনে হয় বর্তমান বাঙলা কবিতায় মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান ও অনুভূতির অভাব আমাদের পীড়িত করছে।

আশিস মজুমদার
কলকাতা-৬

মঞ্জরী আমের মঞ্জরী

গত বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীবিধু চক্রবর্তীর লেখাটি পড়লাম। শ্রীচক্রবর্তী নান্দীকার গোষ্ঠীর আগের প্রযোজনা 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্রে'র প্রশংসা করেছেন। প্রশংসার কারণ (সম্ভবত !) এই নাটকটিতে নাকি ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলা যাত্রার সঙ্গে আধুনিক থিয়েটারের সার্থক সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। শ্রীচক্রবর্তীর প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েও সততা রক্ষার জন্য বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমরা জ্ঞানত এই ধরনের কোনো চেষ্টা করি নি এবং শ্রীচক্রবর্তীর অভিনব ব্যাখ্যার আলোকে এখনও আমাদের নাটকে এ-জাতীয় কোনো চেষ্টা খুঁজে বার করতে পারছি না।

শ্রীচক্রবর্তী আমাদের 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' নাটকটি পছন্দ করে উঠতে পারেন নি। অবশ্যই পছন্দ-অপছন্দ শেষ বিচারে ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু এই নাটক সম্পর্কে তাঁর অভিযোগটি (যা তিনি 'পরিচয়' পত্রিকার মাধ্যমে জন-গোচর করেছেন, ব্যক্তিগত করে রাখেন নি) গ্রহণযোগ্য কিনা সন্দেহ করা যেতে পারে। তাঁর মতে 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' 'সম্রাট-শ্রেষ্ঠী'দের পটভূমিকায় রচিত নাটক। সুতরাং এর আবেদন আধুনিক মনের কাছে পৌছতে পারে না। 'সম্রাট', 'শ্রেষ্ঠী' জাতীয় শব্দগুলি আলংকারিক ব্যবহার মাত্র। তবুও তাঁর অভিযোগের মূল চেহারাটি বোঝা শক্ত নয়। তিনি বলতে চান ইতিহাসের বিগত অধ্যায়কে নাটকে আনা আজকের জীবন থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ার সমতুল্য। এই ব্যাখ্যা মানতে গেলে অনেক মহৎ নাটকই

বরবাদ করে দিতে হয়। 'জুলিয়াস সীজারে'র কথাই ধরা যাক। রোমের ইতিহাসের যে অধ্যায়ের পটভূমিকায় এই নাটকটি বিধৃত হয়েছে, সে সম্পর্কে তথ্য আহরণের যোগ্য উৎস গিবন সাহেবের পুঁথি বা প্লুটার্চের 'লাইভস'। এই উদ্দেশ্য নিয়ে শেক্সপীয়র পড়ি না। 'জুলিয়াস সীজারে'র মূল্য 'রিপাবলিকানিজম্' বনাম 'ডিক্টেটরশিপে'র লড়াইয়ের ধারাবিবরণীরূপে নয়। এর মূল্য দুটি ঐতিহাসিক গতির নাটকীয় সংঘর্ষের মধ্যে নিহিত। এর মূল্য চিরকালীন মৌলিকগুণসম্পন্ন যে-জীবন—যা ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের পটভূমিকায় রূপায়িত হয়েছে—সেই জীবনের রসাপ্লুত নাট্যকীর্তি বলেই। 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' (The Cherry Orchard) নাটকও এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের পটভূমিকায় রচিত নাটক, এই নাটকেও ইতিহাস local habitation-এর প্রয়োজন মেটানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। আজকের দর্শক বা পাঠকের কাছে এর আবেদন ইতিহাস-তথ্য নির্ভর নয়, জীবন-রস নির্ভর। কাজেই এই নাটককে সামন্ততন্ত্র বনাম ধনতন্ত্রের লড়াইয়ের ইতিহাসমাত্র বলে মূল্যায়ন করলে চেকভের উপর অবিচার করা হবে। হ্যামলেট বহু শতাব্দী আগের ডেনমার্কের যুবরাজ বলে, বিশশতকী যন্ত্রযুগের এক যুবক নন বলেই কী 'হ্যামলেট' নাটকটি 'আউটডেটেড' প্রতিপন্ন হবে?

বিভাস চক্রবর্তী

নান্দীকার-এর পক্ষ থেকে

আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

শারদীয় সংখ্যা
বর্ষ ৩৫ । সংখ্যা ২
ভাদ্র, ১৩৭২

সূচীপত্র

সূচীপত্র

কবিতা

গোপাল ঘোষ, সুবেন দে, করুণা সাহা, সজল রায়
সুনীল চক্রবর্তী

প্রচ্ছদপট : নবকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

[illegible] (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

K' DOCK
14/3/54 9 P.M.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রাবলী

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

কলকাতা

[পোস্টমার্ক : ২২ মার্চ ১৯২৮

কল্যাণীয়েষু

গেল শনিবার এবং কাল মঙ্গলবারে বিচিত্রায় বাদী প্রতিবাদী দুই দলই উপস্থিত ছিলেন। আমার যা বলবার ছিল আমি দুই পক্ষকেই স্পষ্ট করে বলেচি। নবীন সাহিত্যিকদের মঙ্গলবারের কোঠায় ফেলা যেতে পারে—তারা ঐ মঙ্গলগ্রহটারই মতো অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয়ে উঠেচে—ভারতীর আসন যে শ্বেতবর্ণের—যার মধ্যে সকল রং মিশে আছে, সেটার প্রতি ওদের বড়ো অবজ্ঞা—সব বাদ দিয়ে একেবারে টকটকে রঙের পরেই ওদের বিলাস। তার কারণ ওটা শস্তা, আর সহজেই চোখ ভোলায়। অপর পক্ষ নিজেকে শনিগ্রহের সঙ্গে যুক্ত করেচে—মঙ্গলের বিরুদ্ধে ওরা কেবল অমঙ্গলটাকেই বাছাই করে নিচ্চে। মাঝের থেকে আমাদের সাহিত্যে শনি-মঙ্গলের মাতামাতিটাই অত্যন্ত মুখরিত হয়ে উঠেচে। দুই পক্ষের কোনো গ্রহই শুভগ্রহ নয়, অথচ দুই পক্ষেই গুণী লোক আছে। শাস্ত্রমতে রবি হলো গ্রহদের রাজা, এই জন্যে দুই পক্ষকেই সংযত করবার ইচ্ছে করি—কিন্তু সময় খারাপ—রাজাকে বরখাস্ত করে দিয়েচে—কোনো আইনকেও মানতে চায় না—বলতে চায় না-মানা সেইটেই হচ্চে যুগধর্ম্ম। আমি বলি যুগ বলে কোনো রাজাই নেই, কিন্তু ধর্ম্ম আছেই—ধর্ম্মের চেয়ে যুগকে সত্য বলে মানা হচ্চে কিছুই না মানা। সাহিত্য পদার্থটা যা-হয় একটা-কিছু; শূন্য নয়,—যা-হয়

একটা-কিছুর যা-হোক একটা-কিছু ধর্ম্ম আছে, শুধু বাইরের ভঙ্গী নয়, তার সত্তার তত্ত্ব।—বলে কিছু ফল হবে বোধ হয় না, ওরা বলচে আমি আমার যুগ খুইয়েচি অতএব আমার বলবার কিছুই নেই। যুগটা কি তুমি তার কোনো খবর জানো? ইতি ৯ই চৈত্র ১৩৩৪

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'বিচিত্রা', শ্রাবণ ১৩৩৪, পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধটির প্রকাশ উপলক্ষে সাহিত্যিক মহলে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তার পরিণামে জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রাভবনে বাংলার প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে সম্মিলিত আলোচনার উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর উদ্যোগে দুটি সভা হয় (৪ ও ৭ চৈত্র, ১৩৩৪)। পত্রে তারই উল্লেখ রয়েছে।

সভার সূত্রধাররূপে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য 'সাহিত্যরূপ' ও 'সাহিত্য-সমালোচনা' নামে 'সাহিত্যের পথে' (৩য় সংস্করণ) ও 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (বিশ্বভারতী সং, ২৩) গ্রন্থে আহৃত হয়েছে।

[পোস্টমার্ক : শান্তিনিকেতন, ১৪ আগস্ট, ১৯৩২]

কল্যাণীয়েষু

লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের আশা ত্যাগ করেছিলুম। মরীয়া হয়ে গোয়ালিয়রের রাজমন্ত্রীর দরবারে আবেদন জানিয়ে পত্র পাঠিয়েছি। যিনি বাহক, তাঁর যথাস্থানে পৌছতে বিলম্ব আছে, তাই উত্তর শীঘ্র আশা করি নে। এখান থেকে আশা[১] তোমাদের কর্তৃপক্ষকে পত্র লিখেছিলেন। তিনি মজুমদার পদবীধারী কোন এক বাঙালীর ভরসা দেন। কিন্তু তার মধ্যে বেতনের যে আভাস ছিল তাতে আলোচনাটা আর অধিক অগ্রসর হলো না। তা ছাড়া আমি বাঙালী জাতকে ভয় করি—তাদের মেজাজ উচ্চ সপ্তকে বাঁধা। কিন্তু হেমেন্দ্রকে[২] পাওয়া যেতে পারে বলে তুমি যে আশ্বাস দিয়েছ সেটাতে আমি এত খুসি যে মাসিক ৭৫ টাকা ব্যয়ের সম্ভাবনা স্বীকার করতেও দুঃখ বোধ করচি নে। একটা কথা তাঁকে জানাতে পারো এখানে যে পদে তাঁর অভিষেক হবে সেখানে তাঁর সম্পূর্ণ স্বরাজ। বস্তুত ক্ষেত্রটাকে সৃষ্টি করবেন তিনি নিজের বিধানে, বাধা পাবেন না কোথাও। কর্তা কর্ম্ম ক্রিয়া সমস্তই তাঁতে হবে কেন্দ্রীভূত। এখানে ভারতীয় সঙ্গীতের একটি পীঠস্থান হবে বাংলা দেশে। দু রকমের ছাত্র হবে, ওষধি ও বনস্পতি জাতীয়। একদলের অবস্থান কিছুদিনের জন্যে, তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কবলে তাদের অন্তর্ধান। আর একদল আশা করি সঙ্গীতবিদ্যাকেই মুখ্য লক্ষ্য করে স্থির হয়ে বসবে। বাংলাদেশে সঙ্গীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্চে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বররূপ। কিন্তু এই রূপকে সর্ব্বদা প্রাণবান করে রাখতে হলে হিন্দুস্থানী উৎসধারার সঙ্গে তার যোগ রাখা চাই। আমাদের দেশে কীর্তন ও বাউল গানে বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, তবুও সে স্বাতন্ত্র্য দেহের দিকে, প্রাণের দিকে ভিতরে ভিতরে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। বর্তমানে এর অনুরূপ আদর্শ দেখা যায় আমাদের বাংলা সাহিত্যে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে এর আন্তরিক যোগ বিচ্ছিন্ন হলে এর স্রোত যাবে মরে, অথচ খাতটা এর নিজের, এর প্রধান কারবার নিজের দুই পারের ঘাটে ঘাটে। অতি বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানী সুরে আমার কান এবং প্রাণ ভর্তি হয়েছে, যেমন হয়েচে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ভাবে ও রসে।

কিন্তু অনুকরণ করলেই নৌকোডুবি, নিজের টিকি পর্যন্ত দেখা যাবে না। হিন্দুস্থানী সুর ভুলতে ভুলতে তবে গান রচনা করেছি। ওর আশ্রয় না ছাড়তে পারলে ঘরজামাইয়ের দশা হয়, স্ত্রীকে পেয়েও তার স্বত্বাধিকারে জোর পৌঁছয় না। তাই বলে স্ত্রীকে বজায় না রাখলে ঘর চলে না। কিন্তু স্বভাবে ব্যবহারে সে স্ত্রীর ঝোঁক হওয়া চাই পৈতৃকের চেয়ে শ্বাশুরিকের দিকে তবেই সংসার হয় সুখের। আমাদের গানেও হিন্দুস্থানী যতই বাঙালী হয়ে উঠবে ততই মঙ্গল, অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে। স্বভবনে হিন্দুস্থানী স্বতন্ত্র, সেখানে আমরা তার আতিথ্য ভোগ করতে পারি—কিন্তু বাঙালীর ঘরে সে তো আতিথ্য দিতে আসবে না—সে নিজেকে দেবে, নইলে মিলন হবে না। যেখানে পাওয়াটা সম্পূর্ণ নয় সেখানে সে পাওয়াটা ঋণ, আসল পাওয়ায় ঋণের দায় ঘুচে যায়। যেমন স্ত্রী, তাকে নিয়ে দেনায় পাওনায় কাটাকাটি হয়ে গেছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা ঐ। তাকে আমরা শিখব পাওয়ার জন্য। ওস্তাদী করবার জন্যে নয়। বাংলা গানে হিন্দুস্থানী বিধি বিশুদ্ধভাবে মিলচে না দেখে পণ্ডিতেরা যখন বলেন সঙ্গীতের অপকর্ষ ঘটচে তখন তাঁরা পণ্ডিতী-মূর্খতা করেন, সেই মূর্খতা সবচেয়ে দারুণ। বাংলায় হিন্দুস্থানীর বিশেষ পরিণতি ঘটতে ঘটতে একটা নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে এ সৃষ্টি প্রাণবান, গতিবান, এ সৃষ্টি সৌখীন বিলাসীর নয় কলাবিধাতার। পণ্ডিতীমূর্খতার জয় হলে বাংলা ভাষা আজ সীতার বনবাসের চিতায় সহমরণ লাভ করত। সংস্কৃতর সঙ্গে প্রণয় রেখেও বন্ধন বিচ্ছিন্ন করেছে বলেই বাংলা ভাষায় সৃষ্টির কার্য্য নব নব অধ্যবসায়ে যাত্রা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। বাংলা গানেও কি তারই সূচনা হয় নি, এই গান কি একদিন সৃষ্টির গৌরবে চলৎশক্তিহীন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে অনেকদূর ছাড়িয়ে যাবে না? ইতি ১৩ অঃ ১৯৩২

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

১। আশা অধিকারী (আর্যনায়কম), শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন শিক্ষিকা।

২। হেমেন্দ্রলাল রায়, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন শিক্ষক।

Glen Eden
Darjeeling
[পোস্টমার্ক ১২ মে ১৯৩৩]

কল্যাণীয়েষু

ডাকযোগে তোমার প্রেরিত দুখানা চিঠি হতে আমি বঞ্চিত হলুম এ কথা যদি খবরের কাগজে ছাপাই তাহলে তাদের প্রেস বাজেয়াপ্ত হবে—কারণ এ সংবাদটা সিডীশন। চিঠিলেখক এবং ডাকঘরের মধ্যপথেও কোনো ভ্রষ্টতা ঘটতে পারে। তাই যদি হয় তবে আমার উদ্দেশে যে দশ পয়সা ব্যয় করেছ তা আমার চেয়ে অধিকতর সৌভাগ্যবান কারো অভিমুখে প্রক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়—কঠোর সাধনায় তাকে ক্ষমা করতে চেষ্টা করব। অন্তর বাহিরের স্থূল সূক্ষ্ম নানা তাগিদে গোটা দুয়েক গল্প অথবা নাট্যাখ্যান লিখেছি বান্ধবমণ্ডলীকে শুনিয়েছি, ভাব দেখে বোধ হলো খুসি হয়েছেন। তোমাকে শোনাতে পারলে খুসি হতুম কারণ আপরিতোষাদ্ ইত্যাদি। দার্জ্জিলিঙে অধিরোহণ করেছি, ভেবেছিলুম আমার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মফলের ধাক্কা এ পর্য্যন্ত পৌছবে না কিন্তু ডাকঘরকে বাহন করে প্রত্যহই সেটা এসে উত্তেজিত করে তুলছে—মেসেজ চাই আশীর্ব্বাদ চাই নামকরণ চাই, ভিক্ষা চাই, সদুপদেশ চাই খবরের কাগজ ও মাসিকপত্রের প্রবন্ধ চাই এই সমস্ত কলরবের প্রতিপক্ষে আমার কেবল একটি মাত্র আবেদন বিশ্রাম চাই। শীত এবার ঋতুর যথানিয়মিত বরাদ্দ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সেটা সহ্য করা শক্ত নয় কিন্তু আমার ভাগ্য সাধারণ মানবের বরাদ্দের চেয়ে অধিক পরিমাণ উত্তেজনা যখন আমার স্কন্ধে চাপায় তখন খ্যাতিকে ধিক্কার দিই। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩৪০

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চার

ওঁ

[পোস্টমার্ক : শান্তিনিকেতন, ১৪ অগস্ট ১৯৩৫]

কল্যাণীয়েষু,

ব্যস্ত আছি বর্ষামঙ্গল উৎসব নিয়ে—কিন্তু শরীরটাতে স্ফূর্ত্তি নেই—বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তায় গোরুগাড়ি ঠেলে নিয়ে যাবার মতো অবস্থা। Derby sweep-এর টিকিট কেনার প্রস্তাব তোমার চিঠিতে আছে—বয়স হাতে থাকলে দৈবসম্ভাবনার অবকাশ ক্বচিৎ ঘটতে পারত—অন্ধকারে ঢেলা মেরে সিদ্ধিলাভ করতে হলে অনেকক্ষণ ধরে অনেক ঢেলা মারতে হয়—সময় নেই হাতে জোরও কম।

বিশ্বভারতীর দোকানে আমার পাঠকরা আমার বইয়ের খোঁজ করে—আমার নামাঙ্কিত বই বিক্রির সহজ পথ তদভিমুখে। ইতি বিচিন্ত্য উক্ত দোকানের কর্ত্তাদের সঙ্গে কথা চালাচালি কোরো। উক্ত দোকানের মালিক আমি নই—বারোয়ারি সমুদ্রে তার মুনফার ধারা গিয়ে মেশে।

গ্রামোফোন রেকর্ড সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার ভার রথী[৩] নিয়ে সেই মহলের অধ্যক্ষদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রবৃত্ত আছেন। গানগুলি আমার, এইটুকুমাত্র এই ব্যাপারের সঙ্গে আমার অতি তুচ্ছ সম্বন্ধ। বন্দোবস্তঘটিত বাকি সমস্ত বাক্য অন্যেই কবেন আমি রব নিরুত্তর। এর মধ্যে দুরূহতম সমস্যা হচ্চে গান গাওয়ার জন্যে সুকণ্ঠের সমাবেশ—অনেক আওয়াজ শুনি যা "কানের ভিতর দিয়া মরমে" গিয়ে পৌঁছয় মর্ম্মান্তিকরূপে। আমা কর্ত্তৃক গানের নির্ব্বাচন অর্ব্বাচীনদের মনঃপূত হবে না এমন ইঙ্গিত আছে তোমার পত্রে—কথাটা অবিচলিত চিত্তে মেনে নিলেম। ইতি ২৯ শ্রাবণ ১৩৪২

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীমতী ছায়া দেবী ও শ্রীকুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে মুদ্রিত

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পত্র

অন্নদাশঙ্কর রায়কে লিখিত

…P. E. N., All-India Centre, Bombay থেকে প্রকাশিত "BENGALI LITERATURE" বইখানির খসড়া দেখে রামানন্দবাবু আমাকে নানাভাবে পরামর্শ দেন। চিঠিখানি সেই সূত্রে লেখা। তাঁর পরামর্শ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলুম।

—অন্নদাশঙ্কর রায়

ঘাটশিলা

২৬-১০-১৯৪১

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার লেখাটি দীর্ঘকাল রেখে তারপর এখন তার সম্বন্ধে যা লিখতে যাচ্ছি তাতে বড় সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। যদি অপেক্ষাকৃত সুস্থ অবস্থায় এবং কলকাতায় আমার বক্তব্য লিখতে পারতাম, তাহলে বোধ হয় এর চেয়ে সুগ্রথিত এবং প্রামাণিক কিছু লিখতে পারতাম—যদিও তাও মূল্যবান হত না। কিন্তু দুঃখ করা বৃথা;—খাপছাড়া কতকগুলো মন্তব্যই পাঠাই। যদি কোনোটা বিবেচনার যোগ্য মনে করেন, তাহলে আমার বিলম্ব কিঞ্চিৎ মার্জনীয় মনে হতে পারে।

আপনার সন্দর্ভটি সুলিখিত ও সুখপাঠ্য। এতে আপনি লেখক-লেখিকাদের ধর্ম ও 'দল' নিরপেক্ষভাবে সকলের প্রতি সুবিচার করবার চেষ্টা করেছেন।

আপনার চেষ্টা সত্ত্বেও সুবিচারে কোথাও কোথাও বাধা হয়েছে আপনার লেখাটির সংক্ষিপ্ততা। যদি আপনার ও শ্রীমতী সোফিয়া বাডিয়ার পূর্বনির্দিষ্ট কোনো দৈর্ঘ্যে বাধা না জন্মায়, তা হলে সন্দর্ভটি দীর্ঘতর করা বাঞ্ছনীয় হবে। তা করলে, আপনি এমন কোনো কোনো লেখিকা ও লেখকের সম্বন্ধে কিছু

বলতে পারবেন যাঁদের কেবল নাম করেছেন কিংবা হয়ত ২।১টা বিশেষণ মাত্র প্রয়োগ করেছেন—স্থানাভাবে।

আপনার প্রবন্ধটি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা থাকলেও কোনো কোনো কারণে হয়ত আমি তা করতে পারছি না, এবং সুস্থ থাকলেও হয়ত পারতাম না। একটা কারণ এই যে, আমি বাংলা লিখতে শিখেছিলাম বাল্যকালে ও কৈশোরে যাঁদের লেখা থেকে, তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের নামটি পর্যন্ত আপনার সন্দর্ভে উল্লিখিত হয় নি; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম উল্লিখিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সাহিত্যিক বিশেষ কিছু বলা হয় নি। এঁদের বই আমরা স্কুলে পাঠ্যপুস্তক রূপে পড়তাম। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কোনো কোনো বইও পাঠ্যপুস্তকরূপে পড়েছিলাম। তাঁরও প্রায় শুধু উল্লেখমাত্র আপনার সন্দর্ভে হয়েছে।

আমি এসব কথা আপনার লেখাটির বিরুদ্ধে grievance হিসাবে বলছি না। বলছি এই জন্যে যে, আমার বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয় প্রধানত যাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে তাঁরা আজকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হন না। সুতরাং আমি বাংলা সাহিত্যের সম্বন্ধে কিছু যদি লিখতাম তা হলে আমার angle of vision বয়ঃকনিষ্ঠদের থেকে একটু ভিন্ন রকমের হত। আমরা এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়ে কলেজে আসার পর ছাত্রাবস্থায় বাংলা সাহিত্যের কোনো চর্চা করি নি (এখন ছাত্রেরা যা করতে বাধ্য হয়), যদিও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির লেখা যৌবনে পড়তাম বটে। কিন্তু আমার যদি কোনো style থাকে, তাহলে বঙ্কিম প্রভৃতির বই পড়বার আগেই তার কাঠামো ও ভিত্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো up-to-date সন্দর্ভের বিচার করবার আমার অসামর্থ্যের আর একটি কারণ, আমি আধুনিক অনেক লেখকের লেখা সামান্যই পড়েছি, বা হয়ত কিছুই পড়ি নি। যা হোক, এই দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকার পরে আমার সামান্য বক্তব্য কিছু বলি।

চণ্ডীদাস ও রামী রজকিনী "were one in death"—এর বৃত্তান্ত আপনি অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের সম্পাদিত "চণ্ডীদাস চরিত" কাব্যে দেখেছেন কি না জানি না। না দেখে থাকলে, দেখলে প্রীত হবেন। ঐ কাব্যটি জাল বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু এটি জাল নয়। এটির originality ও অন্য বিশিষ্টতা আছে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সমকালিক ছিলেন, এরকম কিম্বদন্তী ও জনশ্রুতি আছে। "চণ্ডীদাস চরিত" কাব্যে উভয়ের মিলনের আখ্যান আছে, এই রকম মনে পড়ছে।

আপনি লিখেছেন, "আগমনী" গানগুলি "though deeply moving, they have little literary value." মোটের উপর এ মন্তব্য সত্য হলেও আমার ধারণা (বোধ হয় বাল্য সংস্কার প্রযুক্ত) ঐ গানগুলির কিঞ্চিৎ সাহিত্যিক উৎকর্ষ আছে।

'বাউলে'র অনুবাদ আপনি করেছেন "fools of God"। রবীন্দ্রনাথ কি অনুবাদ করেছেন আমার এখন মনে পড়ছে না। আপনারটিও চলতে পারে।

"Modern Period"-এর লেখকদের পৌর্বাপর্ব এবং তাঁদের সম্বন্ধে তথ্য যে-সব আপনার সন্দর্ভে আছে, সে বিষয়ে এখান থেকে এখন আমি কিছু বলতে অসমর্থ।

আমার বিবেচনায় চণ্ডীদাসের জীবনের সঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের জীবনের আপনি যে সাদৃশ্যের বর্ণনা করেছেন, তা ঠিক হয় নি।

মাইকেলের সঙ্গে যে দুই মহিলার দাম্পত্য সম্বন্ধ হয়েছিল, তাঁদের উভয়ই সামাজিক দৃষ্টিতে বিবাহিতা পত্নী ছিলেন না, একজন ছিলেন, একজন ছিলেন না। চণ্ডীদাস ও রামী রজকিনীর মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ ছিল বলে আমি অবগত নই। রামী চণ্ডীদাসের পত্নী ছিলেন না। একটি পদে তাঁদের প্রীতি সম্বন্ধে আছে—"কামগন্ধ নাহি তায়।"

মাইকেলের কোনো পত্নীর সহিত তাঁর সে সম্পর্ক ছিল না যে-সম্পর্ক ছিল চণ্ডীদাস ও রামী রজকিনীর মধ্যে। চণ্ডীদাস ও রামীর সম্পর্ক তাঁদের সাধনার অঙ্গ ও উপায় ছিল। কোনো নারীর সহিত সে উদ্দেশ্যে মাইকেলের সেরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। চণ্ডীদাস ও রামী যে অর্থে "One in death" হয়েছিলেন, মাইকেল ও তাঁর পত্নী সে অর্থে "One in death" হন নি।

মাইকেলের কবিপ্রতিভা ও কবিকীর্তি সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু চণ্ডীদাস তাঁর মত ছিলেন বললে, মানুষ ও সাধক হিসাবে এবং প্রেমিক হিসাবে চণ্ডীদাসকে খাটো করা হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন, তা সত্য। কিন্তু তিনি যখন "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশ করলেন তখন "Bengali prose

was as yet scarcely out of its swoddling clothes" বললে তাঁর অব্যবহিত পূর্বের গদ্যলেখকদের প্রতি ও তাঁদের গদ্যের প্রতি সুবিচার করা হয় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর ভবনের দ্বারমোচন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা স্মর্তব্য। সে সব উক্তি অনেক দৈনিকে বেরিয়েছিল, "প্রবাসী"তেও বোধ হয় কিছু উদ্ধৃত করেছিলাম। স্মৃতি থেকে কিছু লিখতে পারব না। রবীন্দ্রনাথ ঐ মর্মের কথা আগেও লিখেছিলেন। তা বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলীর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধৃত আছে। বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রথম artist। তিনি শুধু অনুবাদক এবং বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকাবলীর লেখক নন। তাঁর লেখায় (শকুন্তলা, সীতার বনবাস ও ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতিতে) সেই রস আছে যা থাকলে বাক্যসমষ্টি সাহিত্যনামধেয় হয়। প্রথম প্রথম তিনি লম্বা লম্বা সমাস ব্যবহার করতেন বটে, কিন্তু বঙ্কিমও প্রথম প্রথম তা করতেন। উভয়েই পরে ভাষাকে সহজ করে এনেছিলেন।

শেক্সপীয়রের অনেক নাটকের, শুধু আখ্যান নয়, কথোপকথনের বিস্তর বাক্যও পূর্ববর্তী লেখকদের গ্রন্থ হতে নেওয়া ; কিন্তু সেজন্যে কেও তাঁকে তাঁর যশ থেকে বঞ্চিত করে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর যদিও অভিজ্ঞান শকুন্তল, উত্তর-রামচরিত, বা Comedy of Errors-এর অনুবাদ করেন নি, ঐ নাটকগুলি থেকে উপন্যাসের মত গ্রন্থ লিখেছেন, তবুও আমরা অনেক সময় তাঁকে শুধু অনুবাদকই মনে করি।

অক্ষয়কুমার দত্ত রসসম্ভারপূর্ণ কোনো গ্রন্থ লেখেন নি। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনাগুলি, তাঁর "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ" এবং তাঁর "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদ বৈজ্ঞানিক গদ্য এবং গম্ভীর ও ওজস্বিতাপূর্ণ গদ্যের উৎকৃষ্ট নমুনা বিস্তর আছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অন্য সব রচনা ছেড়ে দিলেও তাঁর "সফল স্বপ্ন" এবং শিবাজী ও রোশিনারা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গল্পগুলিতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বেশ পূর্বাভাস পাওয়া যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আত্মচরিত" প্রাগবঙ্কিম যুগের গদ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

এইরূপ লেখকদের গদ্য বিবেচনা করলে মনে হয়, বঙ্কিমই প্রথমে এবং একাই আধুনিক গদ্যকে প্রায় শৈশব থেকে যৌবনে পৌছিয়ে দিয়েছিলেন বললে

যেন অত্যুক্তি করা হয়। তাঁর সমকালিক লেখক কেশবচন্দ্র সেন সুলভ সমাচারে যে গদ্য ব্যবহার করতেন, তা সহজ সরল ও "কথ্য" বাংলার কাছ ঘেঁষা।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীদের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম উদ্দীপিত করেছিলেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু এ-বিষয়েও তাঁর পূর্বগ অনেকে ছিলেন—যেমন হিন্দু মেলার প্রবর্তক ও উৎসাহদাতারা।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং স্বদেশী প্রচেষ্টাতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাজাতিকতার প্রভাব অবশ্যই ছিল, কিন্তু তার চেয়ে অধিক ছিল এবং খুব সাক্ষাৎভাবে ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার এবং তৎপ্রসূত গান ও বক্তৃতাদির প্রভাব। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রস্মৃতি সংবধনা উপলক্ষ্যে সভাপতি সর যদুনাথ সরকার যা বলেছিলেন, তা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। প্রাসঙ্গিক বাক্যগুলি কার্ত্তিকের প্রবাসীর ৭৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত আছে। তার থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করছি। সবটি আপনি আবশ্যক বিবেচনা করলে দেখতে পারেন। "...এই জিনিষটির তখন বড় আবশ্যক ছিল। কারণ তখন বাংলার জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বলিয়া একটা জিনিষ ছিল না। হেম ও বঙ্কিমের আহ্বান, 'ভারতসঙ্গীত' ও 'বন্দেমাতরম্', স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষণিক প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল। অবসাদ ও অবহেলায় সেই প্লাবনে ভাঁটা আসে। এই সময় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জাতির হৃদয়ে শক্তি ও বল।"

আপনি খুবই ঠিক লিখেছেন, "Necessary as national self-respect was, national isolation was undesirable. None realised this so well as the Tagores of Calcutta." এর আগে, প্যারাগ্রাফের গোড়ায় আপনি লিখেছেন, "What Bankim perceived dimly in his later years became transparent to the following generation." Tagore-দের মধ্যে যাঁরা এটি অনুভব করেছিলেন তাঁরা কেও কেও "following generation"-এর লোক হলেও অন্য কেও কেও বঙ্কিমের পূর্বগ ছিলেন, সমসাময়িকও ছিলেন। আধুনিক ভারতীয়দের মধ্যে যিনি প্রথম অনুভব করেন যে, National self-respect was necessary, but national isolation was undesirable, তিনি রামমোহন রায়। তিনি সমগ্র পৃথিবীর সব জাতির ধর্মের লোকদের সঙ্গে যোগস্থাপনের চেষ্টা

করেছিলেন। আপনি ঠিকই লিখেছেন যে সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুবিচার করা অসম্ভব।

বিহারীলাল চক্রবর্তী "influenced him most" ("outside his family circle"), এই কথা কবির কৈশোর ও যৌবন সম্বন্ধে সত্য; কিন্তু পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে সত্য নয়। এই সময়ে, অর্থাৎ তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ে তিনি বিশেষ কোনো ব্যক্তির বা ব্যক্তিগণের প্রভাব বেশী অনুভব করেছিলেন, এরূপ বলা যায় না।

কবির জীবনকে আপনি "comparatively serene life of eighty years" বলেছেন। বাইরে থেকে দেখলে এইরকম মনে হতে পারে। কিন্তু খুব কম লোকই তাঁর মতো শোকের আঘাত, বন্ধুবিয়োগ ও বিচ্ছেদ এবং নানাবিধ মানসিক ঝঞ্ঝা ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও তীব্র নিন্দা সহ্য করেছেন এবং অসাধারণ ধৈর্য, সংযম ও দৃঢ়তার সহিত সহ্য করেছেন।

আপনি দেশভক্ত কবি হিসাবে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের উল্লেখ করেছেন। তার আগে "পদ্মিনীর উপাখ্যান" প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে—যাঁর,

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়···"

বাল্যে কৈশোরে আবৃত্তি করেছি, এখন বার্ধক্যেও উদ্ধৃত ক'রে থাকি।

স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশহিতৈষণার উদ্দীপন প্রসঙ্গে আরো কোনো কোনো কবির নাম উল্লেখ্য। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে (এবং তার আগেও) প্রবাসী বাঙালি কবি আগ্রা (?)-নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র রায়ের (?)

"কতকাল পরে বল, ভারত রে,
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।"

ইত্যাদি গানটি গীত হত। এই গানটিরই অন্তর্গত

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে,
পরদাসখতে সমুদয় দিলে—"

পংক্তি দুটি একসময় প্রবাসী-র মলাটে উদ্ধৃত হ'ত, এবং এরই শেষে আছে

"পর দীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে॥"

ইহা গান বলে গীত, ও কবিতা বলে পঠিত ও আবৃত্ত হতে পারে, এবং গান ও

কবিতা উভয় দিক দিয়েই উৎকৃষ্ট। গোবিন্দবাবুর অন্য একটি প্রসিদ্ধ কবিতা—

"নির্মল সলিলে বহিছ সদা,
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে, ও।"

দেশভক্ত কবিদের মধ্যে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ্য।

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের "আলো ও ছায়া"-র পরে রচিত একাধিক উৎকৃষ্ট কবিতাগ্রন্থ আছে। যেমন "অম্বা", সব নাম মনে পড়ছে না। তার মধ্যে তাঁর autobiographic সনেটগুলি উচ্চ অঙ্গের self-revelation.

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিন্দুর ছেলে"-র আমি Modern Review-তে অনুবাদ প্রকাশ করেছিলাম। অন্য কিছুও পড়েছি; কিন্তু "চরিত্রহীন" প্রভৃতি বই আমার এখনও পড়া হয় নি। সুতরাং তাঁর গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা হবে। তবে তাঁর "পরিণীতা" পড়ে, "বিজয়া"-র অভিনয় দেখে, এবং "গৃহদাহ"-র এক নায়িকার বিষয় শুনে আমার ধারণা হয়েছে যে, ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে এবং সাধারণত শিক্ষিতা নারীদের সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান খুব অ-যথেষ্ট এবং বিরুদ্ধসংস্কার (bias) অধিক। সেইজন্যে তিনি ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকাদের ও শিক্ষিতা মহিলাদের সম্বন্ধে artist-এর সমদর্শিতা রক্ষা করতে পারেন নি।

নিরুপমা দেবীর প্রতিভা অস্বীকার করি না। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি। "প্রবাসী"-তে প্রকাশিত তাঁর কোনো কোনো রচনা (উপন্যাস···) "প্রবাসী"-র তৎকালীন অন্যতম সহকারী সম্পাদক চারুবাবু ছাঁটাই, সংশোধন ও স্থানে স্থানে পুনর্লিখিত করেছিলেন,···[আরও কেহ] নিরুপমা দেবীর লেখার সম্বন্ধে এইরকম কাজ করেছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর সন্দর্ভগুলির style, erudition, wit এবং entertaining quality-র আপনি যে প্রশংসা করেছেন তা সত্য ও ন্যায্য। আপনি যে তাঁকে চিন্তানায়কদের মধ্যে স্থান দেন নি, তাতে আপনার সুবিচার ও সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রমথবাবু যে "কথ্য" বাংলার champion ইহা খুব সত্য। আপনি যে তাঁকে বাংলা পুস্তকে "কথ্য" বাংলার প্রবর্তক বলেন নি (যা অনেকে অজ্ঞতা বা অন্য কোনো কারণে বলে থাকেন), ঐতিহাসিক তথ্য তার সমর্থন করে। কারণ, পুস্তকে "কথ্য" বাংলার ব্যবহার তাঁর আগে একাধিক লেখক করেছিলেন।

আপনি "সবুজপত্র" সম্বন্ধে যে লিখেছেন, "Its practical contribution was to make the Bengali language...obscurity of their own province, (p. 12-A), তা সত্য। কিন্তু এই মন্তব্য "সবুজপত্র"-এর পূর্বকালিক, সমকালিক এবং এখনও বিদ্যমান কোনো কোনো মাসিকপত্র সম্বন্ধে করা যায়। এই সকল মাসিকের কোনো কোনো লেখক (তরুণ লেখকও) সবুজপত্রের আপনার উল্লিখিত লেখকদের চেয়ে কম বিদ্বান বা কম প্রতিভাশালী নহেন। "সবুজপত্র"-এর এই সকল লেখকদের মধ্যে কেও কেও অন্য কাগজেও আগে থেকেই লিখতেন, পরেও লিখেছেন।

"সবুজপত্র"-এ রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের আকারে যা লিখতেন, "প্রবাসী"-তে তা প্রায় সবই উদ্ধৃত হত, এবং প্রধানত তার দ্বারাই বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ জানতে পারত যে, রবীন্দ্রনাথ ঐ জিনিসগুলি লিখেছেন।

"সবুজপত্র"-কে খর্ব করবার জন্যে এ-সব কথা লিখলাম না। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে—বিশেষত সাময়িক সাহিত্যক্ষেত্রে, এর ঠিক achievement-টি কি, তা বুঝবার সুবিধা আমার কথাগুলি থেকে কিঞ্চিৎ হতে পারবে।

আপনি (p. 12-A) ফ্রেঞ্চ, জর্ম্যান, রাশিয়ান ও জাপানী থেকে অনুবাদের উল্লেখ করেছেন। মূল রাশিয়ান থেকে কেও অনুবাদ করেছেন বলে অবগত নই। মূল ফ্রেঞ্চ থেকেও অল্পসংখ্যক লেখক করেছেন বটে, জর্ম্যান থেকে তার চেয়ে কম। মূল জাপানী থেকে বোধ হয় সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যসুন্দর দেব কিছু তর্জমা করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে আমি পূর্বেই কিছু লিখেছি। তাঁর বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তকের কোনো কোনো অংশ করুণরসে পূর্ণ এবং কোনো কোনো অংশ গম্ভীর তীব্র ধিক্কার ও ভর্ৎসনার জ্বালাময়। বিধবা-বিবাহ বিষয়ক তর্ক-বিতর্কে তাঁর অনাবিল ব্যঙ্গবিদ্রূপশ্লেষের শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল যে প্রসিদ্ধ দার্শনিক লেখক ছিলেন তা নয়। তাঁর "স্বপ্নপ্রয়াণ" উৎকৃষ্ট কাব্য। তাঁর "গুম্ফহরণ" Pope-এর Rape of the Lock-এর চেয়ে নিম্ন স্তরের নয়। তাঁর অন্যান্য হাস্যোদ্দীপক কবিতাও আছে। তিনি বাংলা রেখাক্ষর লিপির (shorthand-এর) অন্যতম উদ্ভাবক। হিন্দুমেলায় তাঁর গান—

"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি,
রাত্রিদিন বহিছে লোচনবারি"—

গীত হ'ত।

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর "আত্মচরিত" ছাড়া অন্য উচ্চাঙ্গের গ্রন্থও লিখেছেন। তিনি সুকবি ছিলেন ;—"পুষ্পমালা", "পুষ্পাঞ্জলি", "নির্বাসিতের বিলাপ", "হিমাদ্রিকুসুম" এবং আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য "ছায়াময়ী পরিণয়" তাঁর কবিপ্রতিভার, মানবিকতার ও সবল মনুষ্যত্বের সাক্ষ্য দেয়। তাঁর "মেজ বউ" দীর্ঘকাল হিন্দুসমাজেও গার্হস্থ্য সামাজিক উপন্যাস বলে আদৃত হত—এখনও এর চলন আছে। তাঁর উপন্যাস "যুগান্তর" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনাসূত্রে "সাধনা"-য় লিখেছিলেন, "শাস্ত্রীমহাশয় বিরলবসতি বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন গ্রাম বসিয়েছেন" ইত্যাদি (ঠিক কথাগুলি স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করতে পারলাম না)। "রামতনু লাহিড়ী ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" গ্রন্থে তিনি বাংলা সাহিত্যে জীবনচরিত রচনার একটি উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ, প্রাজ্ঞ ও মননশীল সন্দর্ভলেখক (Essayist)। তাঁর কথাবার্তা যেমন, তেমনি তাঁর অনেক লেখা তাঁর রসিকতায় সমুজ্জ্বল। বালকবালিকাদের জন্যে লেখা তাঁর,

"হবু গবু অশ্ব দুটি করতেছিলেন জলপান,
এমন সময় এলেন তথায় বন্ধু একজন লম্বা কান,"

প্রভৃতি কবিতায় তাঁর অনবিধ পরিহাসরসিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

দীনেশচন্দ্র সেন "ময়মনসিংহ গীতিকা" সংগ্রহ ও প্রকাশ সম্বন্ধে যে চেষ্টা করেছিলেন, তা উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গের রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ও তার নাট্যকারদের লেখার সহিত আমার পরিচয় অতি সামান্য। প্রায় নাই। অমৃতলাল বসুর লেখা ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমার নিজের কোনো উচ্চ ধারণা না থাকলেও আমার বোধ হয় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখ অনেকে প্রত্যাশা করবে।

গ্রামবাসীদের অধিকাংশের সঙ্গে আমাদের আধুনিক সাহিত্যের যে কোনো যোগ নেই, তা লক্ষ্য করে আপনি যা লিখেছেন, তা ঠিক। দেশজোড়া নিরক্ষরতা তার একটা কারণ।

রবীন্দ্রনাথের গান ও গীতিকবিতার নিরক্ষরদের মধ্যে যত প্রচলন হওয়া উচিত মোটেই তা হয় নি। কিন্তু কোনো কোনো গান নিরক্ষর গ্রাম্য

করেন। তাঁর মৃত্যুর পর "কল্লোল" সম্পাদকের অনুরোধে কালিদাস মূল ফরাসী থেকে বহিটির অনুবাদ ঐ কাগজে দিতে থাকেন। তিনি কল্যাণীয়া শাস্তার কিঞ্চিৎ সহযোগিতায় ঐ কাজ করতেন। "কল্লোল" কাগজ উঠে যাওয়ায় অনুবাদের আর কোন তাগিদ না থাকায় তর্জমাও আর করা হয় নি। কিন্তু "Jean Christophe"-এর প্রথম খণ্ডের (বোধ হয় "Dawn"-এর) অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছিল ও "কল্লোলে" প্রকাশিত হয়েছিল; এবং কালিদাস বলেছেন, সেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ (complete in itself) গ্রন্থ বলে গৃহীত ও পঠিত হতে পারে।

প্রসিদ্ধ মাসিকগুলির মধ্যে আমি "প্রবাসী"র নাম আগে করেছি। তার কারণ এই যে, এর সম্পাদক প্রতিভাশালী সাহিত্যিক না হলেও, এতে (অন্য লেখকদের কথা না বললেও) রবীন্দ্রনাথের "গোরা," "শেষের কবিতা," "অচলায়তন," "মুক্তধারা," "রক্তকরবী" প্রভৃতি বেরিয়েছে, তাঁর বিস্তর শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং বক্তৃতা ও প্রবন্ধ বেরিয়েছে, তাঁর এমন সব চিঠি বেরচ্ছে যার কোন কোনটি ইতিহাসের সম্পদ। এতে জাতীয় জীবনের কোন বিভাগ, বিদ্যার কোন বিভাগ বাদ পড়েনি; Art চিত্রে ও লেখায় বিশেষ করে এতে স্থান পেয়েছে; সঙ্গীত ও স্বরলিপিও স্থান পেয়েছে; সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতির বিপৎসঙ্কুল আলোচনা এই মাসিকের সম্পাদক পরিহার করে নাই, এড়িয়ে যায় নাই; সাম্প্রদায়িক নানা সমস্যার ও প্রশ্নের বিপৎসঙ্কুল আলোচনাও বর্জিত হয় নাই; বঙ্গের নিগৃহীতা নারীদের কথাও এতে আলোচিত হয়েছে; এই সমস্তই ব্যাপক অর্থে সাহিত্যের অন্তর্গত। একদিকে রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে অতুল গুপ্ত বলেছেন, "প্রবাসী" আধুনিক সাময়িক পত্রসমূহের standard প্রতিষ্ঠিত করে পথপ্রদর্শক হয়েছে।

আপনি সাধারণতঃ রসাত্মক রচনাকেই সাহিত্য বলে গণনা করেছেন। এরকম করবার নজীর অবশ্য যথেষ্ট আছে। তবে, মানবচিত্তের সর্বাংশের, তার সব অবস্থার, গতির ও ঘটনার ভাবিক শোভন ও সুসমঞ্জস প্রকাশকে সাহিত্য বলে বিবেচনা করেও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ একটা চিত্র আঁকা যেতে পারে। সে চিত্রে শুধু রসাত্মক রচনার নয়,—যে-রচনায় মনন ও ধ্যানলব্ধ তত্ত্ব থাকবে, পর্য্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও বিচারলব্ধ জ্ঞান থাকবে, তারও স্থান সে চিত্রে থাকতে পারে।

যেরূপ বাংলা গদ্য দ্বারা তত্ত্ব, জ্ঞান, গভীর ও গম্ভীর বিচার

বিশদভাবে প্রকাশিত হতে পারে, সেইরূপ "অনাবিল" বাংলা গদ্যের প্রবর্তক ছিলেন রামমোহন রায়। কবি ঈশ্বর গুপ্ত, প্রথম বিখ্যাত ইংরেজি কবিতা লেখক বাঙালী কাশীপ্রসাদ ঘোষ, এবং রবীন্দ্রনাথ উক্ত মর্মের মত প্রকাশ করেছেন। অতএব বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তেও তাঁর নাম ন্যায্যভাবে উল্লিখিত হতে পারে।

এই দীর্ঘ পত্র পড়তে আপনার অনেক সময় লাগবে। সেটা একটা বিরক্তির কারণও হতে পারে। কোন কোন মন্তব্য এবং আমি তা যেরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছি, তাও বিরক্তির কারণ হতে পারে। সকল রকম বিরক্তির কারণের জন্যে মাফ চাচ্ছি। ইতি।

শুভানুধ্যায়ী
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

পুঃ আগেই লিখেছি, অনুবাদগুলি মূলের সঙ্গে মিলিয়ে কিছু লিখতে পারব না। যা পড়েছি, ভালই লেগেছে। ইতি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র

186-A Gopallal Tagore Road
Calcutta-35
9. 2. 55

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত সমীপে
১২৫, রাসবিহারী এভিঃ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাদের ভালবাসার পরিচয় পেয়ে আমি বিচলিত অভিভূত হয়ে পড়েছি। প্রীতি ও বন্ধুত্ব পেয়েছি অনেক কিন্তু আপনারা সকলে যে আমায় এত ভালবাসেন, আমার জীবনের দাম যে এত বেশি মনে করেন, এ ধারণা ছিল না।

আমি কেন হাসপাতালে যেতে অস্বীকার করছি সে সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার। জানি না আমার বক্তব্য আপনাদের গ্রহণযোগ্য হবে কিনা।

আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস যে নিজেকে রোগী মনে করলে এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলে আমার সর্বনাশ হবে—আমাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে।

আমার কোনো রোগ নেই, আমি সুস্থ সবল সক্রিয় মানুষ—এ বিশ্বাস আঁকড়ে থাকা ছাড়া আমার কোনো গতি নেই।

কারণগুলি এই—

(১) প্রথম দিকে পুতুলনাচের ইতিকথা প্রভৃতি কয়েকখানা বই লিখতে যেতে গিয়ে যখন আমি নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার একটা শরীর আছে এবং পরিবারের মানুষেরাও নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন হয়ে গিয়েছিল তখন

একদিন হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। এক মাস থেকে দু' তিন মাস অন্তর এটা ঘটতে থাকে।

তখন আমার বয়স ২৮।২৯—৪।৫ বছরের প্রাণান্তকর সাহিত্য সাধনা হয়ে গেছে।

(২) কয়েক বছর ধরে বহুভাবে আমার চিকিৎসা হয়েছে, কয়েকজন স্পেসালিষ্টও আমায় পরীক্ষা করেছেন। ৬।৭ বছরের জন্য আমি ডাক্তারের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিলাম, সব রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলাম।

ডাক্তাররা শুধু ব্রোমাইড ইত্যাদি ওষুধের ব্যবস্থা দিতেন।

কোনো স্পেসালিষ্ট বলতে পারেন নি আমার অসুখ কি এবং কেন আমি মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাই।

অ্যালকোহলের সঙ্গে তখন আমার সম্পর্ক ছিল না।

(৩) ঝিমিয়ে দেওয়া ওষুধ খেয়ে খেয়ে ক্রমে ক্রমে অকর্মণ্য হয়ে পড়লাম এবং মৃত্যুর প্রায় মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

ইতিপূর্বেই আমি নিজের অসুখ সম্পর্কে ডাক্তারি বই পড়তে শুরু করেছিলাম। খাতা ভর্তি করে সব টুকে রেখেছিলাম—প্রমাণ আছে।

ডাক্তারও স্বীকার করেছিলেন এবং ডাক্তারি বই পড়ে আমিও দেখেছিলাম সেখানে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে: মাঝে মাঝে আমি কেন অজ্ঞান হয়ে যাই তার কারণ আজও চিকিৎসা-বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারে নি।

(৪) দীর্ঘকাল চিকিৎসা চালিয়ে অকর্মণ্য মরণাপন্ন হয়ে আমি তখন সিদ্ধান্ত নিই যে নিজেকে আর রোগী ভাবব না।

কোনো ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়েই আমি একটা পেটেন্ট ওষুধ এবং সেই সঙ্গে এত বছর ঝিমিয়ে দেওয়া ওষুধ খাওয়ার প্রতিষেধক হিসাবে বিপরীত জিনিষ অ্যালকোহল শুরু করি।

(৫) একটা কথা ভুল বুঝবেন না—আমি কোনোদিন চিকিৎসা-বিজ্ঞান বা ডাক্তারকে উড়িয়ে দেবার কথা কল্পনাতেও আনি নি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আমি বিশ্বাসী।

আমি বরাবর ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছি, দরকার মত ওষুধপত্র খেয়েছি।

এমন কি, অ্যালকোহল বেড়ে যাবার পর এর বিপদটা টের পেয়ে

আমি যে গত কয়েক বছর ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করেছি, তার প্রমাণ আছে।

এ ডাক্তার গত ছ' সাত বছর আমার পরিবারের সমস্ত অসুখ বিসুখের চিকিৎসাও করে আসছেন।

(৬) তবে কথা হল এই, ডাক্তার-এর সব উপদেশ মেনে চলা বা সব ওষুধ নিয়ম মত খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কারণ অর্থাভাব এবং অতিরিক্ত খাটুনি। আজ এখন ওষুধ খেয়ে ঘুমোলে কাল হাঁড়ি চড়বে না—খানিকটা অ্যালকোহল গিললে কিছুক্ষণের জন্যে তাজা হয়ে হাতের কাজটা শেষ করতে পারব। এ অবস্থায় অ্যালকোহলের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় কি ?

(৭) সমস্ত চিকিৎসা বন্ধ করে, নিজেকে রোগী ভাবতে অস্বীকার করে এবং সাধারণ একটা পেটেণ্ট ওষুধ ও অ্যালকোহলের সাহায্যে আমি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলাম।

ডাঃ নারায়ণ রায় আমায় পরীক্ষা করতে এসে পেটেণ্ট ওষুধটা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে গেছেন—It was the correct medicine.

কিন্তু শুধু ওষুধটা অবলম্বন করলে আমি বাঁচতাম না। কয়েক বছর নিজেকে রোগী ভেবে এবং ডাক্তারদের চিকিৎসার অধীনে থেকে আমি যে কি অবস্থায় পৌঁচেছিলাম আমিই কেবল তা জানি।

অ্যালকোহলের আশ্রয় না নিলে National War Front-এর চাকরীটা একমাসও আমি টানতে পারতাম না।

কবিরাজী 'মৃতসঞ্জীবনী সুরা' দিয়ে আমার অ্যালকোহলিজম শুরু হয়েছিল —চাকরী করার সময় বিলাতী মদ রপ্ত করি।

(৮) বছর দশেকের কথা।

প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলাম। আর ক'মাস বাঁচব এই ভাবনা মাথায় এসেছিল।

নিজেকে রোগী না ভেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলাম বলেই রক্ষা পেয়েছিলাম।

গত দশ এগার বছরের মধ্যে ২।৩ বছর দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকরী করেছি, শত শত সভা সমিতিতে যোগ দিয়েছি, বক্তৃতা করেছি, ১৯।২০ খানা বই লিখেছি।

(৯) এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে যা একদিন আমায় বাঁচিয়েছিল, সেটা গিলবার অভ্যাসই হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার প্রধান রোগ।

অ্যালকোহলের কবল থেকে এবার মুক্তি লাভ করা দরকার সে বিষয়ে আমি যে অনেকদিন আগে থেকেই সচেতন হয়েছি তার প্রমাণ আছে।

অর্থাভাব ও অতিরিক্ত খাটুনির জন্য এটা একেবারে বর্জন করতে পারি নি কিন্তু সামলে চলার চেষ্টা যে করেছি সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন আমার পুরাণো ফেমিলি ফিজিসিয়ান।

(১০) আমি মাতাল নই—সাহিত্যিক।

ডাক্তারের সহযোগিতা যে দরকার আমি তা জানি। সপ্তাহে ২।৩ দিন আমি আমার পুরাণো ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করি।

দয়া করে আমায় রোগী বানাবেন না, জোর করে হাসপাতালে টানবেন না।

খাটুনি এবং চিন্তাভাবনার হাত থেকে রেহাই পেলে বাড়িতে থেকেই আমি অ্যালকোহলকে কিছুদিনের মধ্যে বশে আনতে পারব।

এটুকু মনের জোর যদি আমার না থাকে তবে কলম বন্ধ করে আমার মরাই ভাল।

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠিটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ষিত কাগজ-পত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে। তবে এটি পোস্ট করা হয়েছিল কিনা জানা নেই, এখন জানবার আর উপায়ও নেই। মানিকবাবুর জীবনীর কিছু উপকরণ আছে বলে এটি ছাপা হল। চিঠিটি পাওয়া গেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী শ্রীমতী কমলা দেবীর সৌজন্যে। সম্পাদক, পরিচয়

অন্নদাশঙ্কর রায়

জিব্রালটার সঙ

হঠাৎ শুনে চমকে উঠি
জিব্রালটার ফৌজ
কাশ্মীরেতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
বাধিয়েছে কী মৌজ।
এঁরাই কি সেই আরবসেনা
তারিক যাঁদের নেতা?
এঁরাও কি পণ করেছেন—
মরা, না হয় জেতা?
ফিরে যাবার পথ রুধতে
নৌকা পুড়িয়েছেন?
শতকটা কি অষ্টম, আর
রাজ্যটা কি স্পেন?

ওহে আরব, ওহে তারিক,
কবির কথা শোনো।
শস্ত্রগুলো নতুন বটে
শাস্ত্র যে পুরোনো।
ব্যর্থ তোমার শিক্ষা করা
গেরিলা পদ্ধতি।
মধ্যযুগের মতবাদে
জারিয়ে আছে মতি।
আধুনিকের সঙ্গে এই
মধ্যযুগের দ্বন্দ্ব
পরিণাম এর সবাই জানে
তুমিই শুধু অন্ধ।

অমিয় চক্রবর্তী

তিনটি কবিতা

হীরে

বুক ভাঙা কালো কয়লা তীব্র রাতে
হীরে হও।
ঝড়ের জঙ্গলে মৃত মাটির গহ্বরে লুপ্ত রও।
পরিত্যক্ত যুগশেষে হঠাৎ ভবিষ্য কোন্ ঘাতে
শাবল কোদাল হাতে
খুঁজে পাবে কারা এক তীক্ষ্ণ টুকরো শুকনো মণি
কবেকার অনাদৃত রঞ্জিত জীবনী ;
রিক্ত খনি ;
হাড়ে হাড়ে পুড়ে গিয়ে অগ্নিরক্ত শুভ্র বক্ষে রও—
হীরে হও॥

চিহ্ন

নীলমাথা পাখি হাওয়ার একক
গ্রহপারে ওড়ো শূন্য সাধক :
পালকে এখনো দেখি আছে কিনা
পৃথিবী-দিনের মাটির কণিকা লীনা,
ঠোঁটের কোণায় মহুয়ার কণা লুকোনো
বাংলা ঘরের সবুজ চিহ্ন কোনো,
নখের তলায় জীবনের ধুলো লাগা ?
ঘুম থেকে আলো-জাগা
উড়ে যাও যেই ঘুরে
ঝঞ্ঝায় ভাঙা নীড় থেকে শেষ দূরে॥

বসন্ত

সেই বহুদিন,
বৃন্তহীন।

স্পর্শ যার নেই
শ্রুতি-ভার নেই—
স্বর্গ অবিস্মৃতি
পাতা-ঝরা প্রীতি
অবসান পুষ্পিত প্রকৃতি ॥

বিষ্ণু দে

স্টেশনের দৃশ্য

(লামুর জন্য)
দৃশ্যটা দুর্লভ নয়, ধরো গেছি আমরাও, হাওড়া স্টেশনে।
বম্বে কিংবা দিল্লী মেলে, ওরই মধ্যে, কিছু ধুমধাম,
কুলপি-কামরা আর খানার ব্যবস্থা অন্তত কিছুটা ছিমছাম।
গণ্যমান্য লোক যান রাজধানী, গরিব চাকুরে যায় নিজ কর্মস্থানে,
—দৃশ্যটা দুর্লভ নয়, রাজন্য বা ধন-নেতা, অথবা কেরানি
ছুটির মেয়াদ-অন্তে চলেছে দপ্তরে কেউ লোকসভা কেউবা কংগ্রেসে,
সুস্থ বা অসুস্থ দেহে কিংবা-বা-এবং-মনে, সর্বভারতীয় নানাবেশে,
কেউ হিমে কেউ ঘামে নানান্ ধরনে, সকলেই জানি
একই ট্রেনে সকলেই দিল্লী চলে, বহুভাষী হিন্দির সাগরে
সবাই বিচ্ছিন্ন লক্ষ দ্বীপে দ্বীপে, ভিন্ন আর দূর।

দৃশ্যটা করুণ লাগে, হয়তো বা ছাপোষা বাঙালি ছেলে হাত ধরে,
বিচ্ছেদব্যথায় ভাবে প্রবাসীর স্বাস্থ্যের উদ্বেগে, ভাবে ঘরে
স্বস্তি ভালো, ঘনিষ্ঠের নিশ্চিতিতে ভাবে বেকসুর
কি হবে এ উন্নয়নে, তাই চোখমুখলাল, ভাবে একী গেরো!
বাপ্পের ব্যথায় থাকে পাদানিতে, প্লাটফর্মে, দরজাটা ঘিরে
অনেকেরই ছেলেমেয়ে, গণ্যমান্য বা সামান্য লোকেরও,
যারাই দিল্লীর যাত্রী নানান্ শ্রেণীতে নানা আদর্শে, ফিকিরে

—করুণ বিদায়, তবু দৃশ্যটা দুর্লভ নয়, প্রায় নিত্য দেশের বিদায়,
গরিবের চাকুরের নির্বিত্তের নেতাদের দেশ প্রায় রেল-পাতা প্রতীক যেখানে,
গৃহ আর গন্তব্যের লক্ষ্য আর উপলক্ষ্যে বিচ্ছিন্ন ব্যথায়।
তাই কি দেশের ছেলেমেয়ে থাকে উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে, যেন ফিনল্যাণ্ড স্টেশনে॥

চিত্ত ঘোষ

প্রতিমা

জল আর মাটি মিশে এক উপাদান
তা দিয়ে গড়ন। এক অবয়ব বানানোর দিকে যাওয়া
তারপর রঙ লাগানো
তারপর গর্জন মেখে মুখশ্রী, আভা
তারপর দৃষ্টি।

পতিত আঙিনার মৃত্তিকা চাই
গঙ্গাজল কাশফুল আর তিসি
ধূসর রূপার মতো বালু

যজ্ঞের অগ্নির উত্তাপ।

আমার রক্তে নৌকা ভাসে

ঢাকের বাজনা দূরে, আরো দূরে, আরো আরো দূরে
জলের স্রোতে ভাসানের লগ্ন ঝাঁপ দেয়।

মৃগাঙ্ক রায়

অশ্বসকল

আমার চোখের ওপর দিয়ে চলে গেল শ্বেতকেতন ঘোড়াগুলো ;
পায়ে, সুঠাম উরুমূলে, পিঠে, মেরুদণ্ডের ঢলে ঠিকরে উঠল দিনান্ত ;
ঘাড়ের শুভ্র কেশর যেন জলপ্রপাতের ফেণপুঞ্জ।
আমি তাকিয়ে রইলাম। তারা আমার কর্মের মধ্য দিয়ে গেল,
আমার স্বপ্নের মধ্য দিয়ে গেল, আমার কর্ষিত ভূমির
ওপর দিয়ে গেল। আমি তাকিয়ে রইলাম। তাদের
পায়ের গোছ, ঘাড়, পিঠ, কাঁধের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমারই দৃষ্টি থেকে তারা নির্গত হয়েছিল একদিন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

নগরপ্রশ্ন ও সাঁওতালি প্রত্যুত্তর

"ইচ্ছা মিটে যাওয়ার পরেও ঘৃণিত শয়তান
কেন অমন ইচ্ছা বানায়, উত্তাল মশারি
ছিঁড়ে কেন পালিয়ে যায় সকল নক্ত নারী ?"
দীপির্ দাং দীপির্ দাং দীপির্ দীপির্ দাং।

"একাদশী চাঁদের চোখে কৃপাদৃষ্টি ঝরে,
কোনো-কোনো গৃহীর মুখে ঈশ্বর ঝরান
কী-অপরূপ আভা, তবু কে রয় নিজের ঘরে ?"
দীপির্ দাং দীপির্ দাং দীপির্ দীপির্ দাং।

"রুক্ষ দুপুর সে-ও কি তোদের সুন্দর কালিমা ?
এক-একজনের স্বত্ব নাকি ধানকেয়ারির সীমা ?
মৃত্যু বুঝি তোদের কাছে নিশীথিনীর নাম ?
দীপির্ দাং দীপির্ দাং দীপির্ দীপির্ দাং॥

শঙ্খ ঘোষ

বয়স

বৃষ্টিপ্রতিহত ফুল হাতে নিতে নেই, হাতে নিলে
বালক বয়স ঝরে পড়ে !

সড়কে তুমুল বৃষ্টি—শতবর্ষ গাছগুলি দেশ দেশান্তর
মুড়ে রেখে দেয়
সাঙ্গ করো মেলা
জানি না কখন সব জানাজানি হয়ে যায়
ভুটান সীমায়
সাঙ্গ করো মেলা
হায়, ওই দেখা যায় পড়ে আছে ইতস্তত ভেজা বকুলের মতো
আমাদের দিন
পথিকবিহীন !

এই ভারি ঝড়জলে সীমান্তে প্রহরী নেই কোনো।
এসো, যাও—চকিতে পালাও।
বৃষ্টিপ্রতিহত ফুল ছুঁলে কেন আঙুলশিখরে
সকল বয়স ঝরে পড়ে !

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আমার ছায়াটা

আগুন মুখে ক'রে
একটা দড়ি
বেড়ার গায়ে ঝুলছিল

সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে
দেয়ালের গায়ে
চোখ পড়ল

ঠিক আমার পাশে দাঁড়িয়ে
আমাকে অবিকল নকল করছে
আমার ছায়া

মাথায় আমারই মত পাখির বাসা
চোখে চশমা
ঠোঁটে সিগারেট ধরা

ধোঁয়ার জায়গাগুলো নিখুঁতভাবে ফোটালেও
আমি লক্ষ করলাম
আগুনের জায়গাটা
ইচ্ছে করেই যেন চেপে গেল

দেয়ালের গা থেকে ছায়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে
ফুটপাথে আমি আছড়ে ফেললাম
তারপর টেনে
হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে গেলাম
একটা গাছের নীচে

ছায়াটাকে রেখে বেরিয়ে আসছি
আমাকে টপকে
পেছন থেকে সামনে লাফিয়ে পড়ল
আমার সেই ছায়া

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সরিয়ে নড়িয়ে
অনেক চেষ্টা করেও
আমি তাকে ছাড়াতে পারলাম না

তখন আমি এই ব'লে তাকে শাসালাম—

শয়তান
এবার আমি আগুনের মধ্যে যাব।

[সজল রায়

[সজল রায়

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট

ভিক্টোরীয় যুগের চরিত্র-সম্পন্ন লেখকদের মধ্যে জর্জ এলিয়টের উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের বক্র মন্তব্য দুবার নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্থূল মন্তব্যটির কথা আপাতত সরিয়ে রেখে আমরা রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ জর্জ এলিয়টের ঔপন্যাসিক গুরুত্বকে সংক্ষেপে স্বীকার করে বলেছিলেন, "জর্জ এলিয়টের নভেল যদিও আমার খুব ভাল লাগে তবু এটা আমার বরাবর মনে হয় জিনিসগুলো বড় বেশি বড়—এত, লোক, এত ঘটনা, এত কথার হিজিবিজি না থাকলে বইগুলো আরো ভালো হত। উনবিংশ শতাব্দীর সায়াহ্নে লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লেখা এই পত্রাংশের সঙ্গে, ঐ শতাব্দীরই অপরাহ্নে রোমোলা উপন্যাস সম্বন্ধে হেনরী জেম্‌সের মন্তব্যের মিল লক্ষ করার বিষয়: রোমোলা "Sins by exess of analysis; there is too much description and too little drama; too much reflection (all certainly of a highly imaginative sort) and too little creation." জর্জ এলিয়ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হয়তো রোমোলা-জাতীয় উপন্যাসের কথা রবীন্দ্রনাথের মনে পড়েছে। মিডল্‌ মার্চের মতো উপন্যাসেও হয়তো crowded with episodes বলে জেমস ও রবীন্দ্রনাথের কাছে একসঙ্গেই প্রতিভাত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যা দেখতে পান নি, যা তিনি হারিয়েছেন তা হল জর্জ এলিয়টের উপন্যাসের নৈতিক ভিত্তিভূমির বনিয়াদী বিশুদ্ধতা। এটা তাঁর চোখ এড়িয়ে না গেল তিনি বুঝতে পারতেন যে জর্জ এলিয়ট ও রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গির পার্থক্য। অবশ্য সেই মনোভঙ্গির পার্থক্যের কথা তুলেই রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক স্বাতন্ত্র্যের মূল কোথায় তা ব্যাখ্যা করা যাবে না। জর্জ এলিয়টের কাছে সমাজ ছিল ভিক্টোরীয় নিশ্চিন্ত স্থিরতার আর এক আদর্শ। সে প্রসঙ্গে বরঞ্চ তাঁর সঙ্গে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-ধারণায় মিল সহজে নজরে পড়ে। অথচ ঔপন্যাসিক

হিসাবে জর্জ এলিয়টের পট এবং পটধৃত কাহিনীর রসগত প্রকরণ ও পরিণাম কথনো বঙ্কিমের বিষয় ছিল না। সেই পটগত বিস্তৃতিবোধও বঙ্কিমের আয়ত্তে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র এবং জর্জ এলিয়ট থেকে এই অর্থে পৃথক যে শেষোক্ত দুজনের কাছে সমাজ ও মানুষের অদৃষ্ট যেখানে স্থাণুবং প্রতিভাত, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা ছিল চলিষ্ণু সত্য। রবীন্দ্রনাথের প্রধান উপন্যাসে এবং গল্পে বিশিষ্ট সমাজ-ধারণা শৈল্পিক অর্থেই সক্রিয় ছিল। তার ফলে জর্জ এলিয়ট যেখানে সামাজিক বিষয়ের বিশ্লেষণের ভিতরে একটা বক্তব্য নির্মাণ করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সে ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার বা চরিত্রসমূহের অতি বিশ্লেষণকে পরিহার করে সমাজের এবং ব্যক্তির জীবনের অতি-সত্যকে প্রতিফলিত করেছেন। ব্যক্তির জীবনের গতিশীলতাকে বঙ্কিমচন্দ্র মর্যাদা দিতেন না। রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যক্তির জীবন এবং তার সংলগ্ন সবকিছুই গতির ব্যঞ্জনাতেই তাৎপর্য পায়। তাই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'ই সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত উপন্যাস। জেবউন্নিসাকে রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহ প্রবন্ধে পৃথক মর্যাদায় আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টত বলেন নি, কিন্তু আমরা জানি জেবউন্নিসাই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র নায়িকা যে পিতার স্থিরীকৃত ছকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছে। চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে এভাবেই তার পরোক্ষ আত্মীয়তা। রাজসিংহে বঙ্কিমের নিজের হাত থেকে মুক্তিই প্রধান কথা। এই প্রথম তাঁর উপন্যাসে আমরা এমন চরিত্রের দেখা পেলাম যার কৃতকর্মের সঙ্গে তার করুণ পরিণামের কোনো যোগ নেই। জেবউন্নিসার বিষণ্ণ পরিণামের কারণে তার বলিষ্ঠ প্রত্যয়লব্ধ পদক্ষেপের গৌরব খণ্ডিত হয়ে যায় না। ইতিহাস যখন সবকিছুকে পরিবর্তিত করছিল তখন জেবউন্নিসা নিজের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য নিজেই সক্রিয় হয়েছে, ইতিহাসের কাঁধে দায় চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে নি।

কিন্তু এই ব্যাপারটা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সম্বন্ধে সাধারণ সত্য নয়। স্থিতাদর্শের আত্মসমর্পণ করাই তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের স্বাভাবিক নিয়তি। বঙ্কিমচন্দ্র এর বাইরে কখনো যেতে পারেন নি। কোনো দিক থেকে তাঁর উপন্যাসে আমরা কখনোই বাঙালি মধ্যবিত্তের চলিষ্ণু সত্তাকে দেখি নি। বাঙালি মধ্যবিত্তের গৌরবের দিনে বঙ্কিমচন্দ্র সাবালক হয়েছেন কিন্তু সেই গৌরবের কোনো ছায়া তাঁর সৃষ্ট মধ্যবিত্ত চরিত্রে পড়ে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়লে নবোদিত বাঙালি মধ্যবিত্ত কথাটার অভিধা বড় ক্ষুদ্র বলে

মনে হয়। তাঁর নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে দু-একজন ছাড়া বাকি সকলেই নৈতিকতার নামরূপটুকু নিয়েই চঞ্চল। লবঙ্গ-অমরনাথের অপরাধ-শাস্তির ঘটনার মতো লঘু স্খলনের গুরু ব্যঞ্জনায় সৃষ্টির প্রহসনই সেখানে শিল্প-সাফল্যের অন্তরায় হয়েছে। গভীরতর নৈতিক প্রশ্ন কপালকুণ্ডলায় আর ভ্রমরে ছাড়া আর কোথাও উচ্চারিত হয় নি। ঔপন্যাসিকের নৈতিক সচেতনতা বলতে বঙ্কিমচন্দ্র পাপপুণ্যের সামাজিক ধারণার অনুসরণ ছাড়া বেশি দূর এগুতে পারেন নি। তাঁর মধ্যবিত্ত নায়কদের এ-হেন অস্পষ্টতার কারণ এই যে তাদের উত্তরাধিকার ও ভূমিকা-সচেতনতা বড় ক্ষীণ। নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, অমরনাথ সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিন্তায় বাঙালি মধ্যবিত্তের গৌণ প্রতিনিধি। তারা তৎকালীনতার কোনো প্রশ্নে চঞ্চল নয়। বাঙালি মধ্যবিত্তের কর্মচঞ্চল প্রাণস্রোতে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ভূমিকাবিহীন। বাঙালি জমিদারদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা কোনো কর্মময় বাস্তবাধারে রূপায়িত হয় নি। তার ফলে তিনি যে মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি আঁকেন তাও খুবই সংকোচপরায়ণ কৃপণজীবন। উপন্যাসের প্রাত্যহিক খুঁটিনাটি বর্ণনায়, বৌদ্ধিক পরিকল্পনায়, সেই কার্পণ্যের ছায়া অনড়। 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্রনাথের কক্ষ বর্ণনায় সে কারণেই গল্পের ছবি ফোটে, কিন্তু নগেন্দ্রনাথের ছবি ফোটে না। সেই বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র জানাচ্ছেন :

> "ঘরটি প্রশস্ত এবং উচ্চ, হর্মতল শ্বেত কৃষ্ণ মর্মর-প্রস্তরে রচিত। কক্ষ-প্রাচীরে নীল পিঙ্গল লোহিত লতা-পল্লব-ফল-পুষ্পাদি চিত্রিত; তদুপরি বসিয়া নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহঙ্গম সকল ফল ভক্ষণ করিতেছে, লেখা আছে। একপাশে বহুমূল্য দারুনির্মিত হস্তিদন্ত খচিত কারুকার্যবিশিষ্ট পর্যঙ্ক, আর একপাশে বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত নানাবিধ কাষ্ঠাসন এবং বৃহদ্দর্পণ প্রভৃতি গৃহসজ্জার বস্তু বিস্তর ছিল। কয়খানি চিত্র কক্ষপ্রাচীর হইতে বিলম্বিত ছিল। চিত্রগুলি বিলাতী নহে। সূর্যমুখী নগেন্দ্র উভয়ে মিলিত হইয়া চিত্রের বিষয় মনোনীত করিয়া এক দেশী চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করাইয়াছিলেন। দেশী চিত্রকর একজন ইংরাজের শিষ্য। লিখিয়াছিল ভাল। নগেন্দ্র তাহা মহামূল্য ফ্রেম দিয়া শয্যাগৃহে রাখিয়াছিলেন।"

এই বর্ণনায় যে মধ্যবিত্ত-মানসের ছবি ধরা পড়ে তার সাংস্কৃতিক চেতনার স্বরূপ অস্পষ্ট। লেখকের 'বহুমূল্য' এবং 'মূল্যবান' শব্দের উপর লোভ অভিজাত রুচির

পরিচায়ক হয় নি। ধনীগৃহের বর্ণনা হিসাবে এ সার্থকতা লাভ করেছে—কিন্তু একটা নির্দিষ্ট মানসিক অগ্রগামিতা সেই ধনী ব্যক্তিটির আছে কিনা তা বোঝা যায় না। নগেন্দ্রনাথের কাছে সংস্কৃতি ব্যাপারটা শোনা কথা। দেশজ শিল্পধারার প্রাণবান স্রোত সম্বন্ধে সে অজ্ঞ। 'চিত্রগুলি বিলাতী নহে'—এ আত্মপ্রসাদ চিত্রের বিষয় সম্বন্ধে। ইংরাজ গুরুর উল্লেখ যে ছবির স্মৃতি মনে আনে তাতে ঘরখানিকে এবার মেরুদণ্ডহীন রুচিবিলাসীর ঘর বলে মনে হয়। নগেন্দ্রনাথের চরিত্র-পরিকল্পনার মূল দৌর্বল্যকে আমরা এর আগেই ভালো করে চিনেছি "আমার সূর্যমুখী কাহার এমন ছিল···" এই অংশে। স্ত্রী সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথের আবেগ অকৃত্রিম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সে আবেগ সামন্তযুগীয় অধিকার-চেতনা বা সম্পত্তি-চেতনার আধারে ধৃত। বৃহত্তর অর্থে নগেন্দ্র চরিত্র-পরিকল্পনায় যে-দৌর্বল্য এই কক্ষ-বর্ণনা তারই অংশ হিসাবে প্রতিভাত।

সে-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের হাতে, উপন্যাসের প্রাত্যহিক খুঁটিনাটির প্রয়োগে চরিত্রদের সামাজিক-আর্থনীতিক স্তরবৈশিষ্ট্য যেমন স্পষ্টতা লাভ করে, তেমনই চরিত্রদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বরূপও ঠিকমতো আঁকা হয়ে যায়। যোগাযোগের "বিপ্রদাসের বাপ মুকুন্দলালও ধাবমান নতুন যুগকে ধরতে পারেন নি" এই বিবৃতির পরে রবীন্দ্রনাথ মুকুন্দলালের উনিশ শতকীয় জমিদারের "দুই মহলা জীবনের" পরিচয় দিয়েছেন। একদিকের বর্ণনা এই :

> "বাড়ীর আর-এক মহলে বিলিতি বৈঠকখানা, সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতি আসবাব। সামনেই কালোদাগ-ধরা মস্ত এক আয়না, তার গিল্টি করা ফ্রেমের দুই গায়ে ডানাওয়ালা পরীমূর্তির হাতে-ধরা বাতিদান। তলায় টেবিলে সোনার জলে চিত্রিত কালো পাথরের ঘড়ি। আর কতকগুলো বিলিতি কাঁচের পুতুল। খাড়া পিঠওয়ালা চৌকি, সোফা, কড়িতে দোদুল্যমান ঝাড়লণ্ঠন সমস্তই হল্যাণ্ড কাপড়ে মোড়া। দেয়ালে পূর্বপুরুষদের অয়েল-পেন্টিং, আর তার সঙ্গে বংশের মুরুব্বি দু-একজন রাজপুরুষের ছবি। ঘর-জোড়া বিলিতি কার্পেট, তাতে মোটা মোটা ফুল টকটকে কড়া রঙে আঁকা।"

এ বর্ণনায় ন্যাচারালিস্টদের মতো বাস্তবের প্রাত্যহিক খুঁটিনাটি বর্ণনার আতিশয্য যেমন নেই, তেমনই বর্ণনায় প্রতীকী প্রকরণের দিকে ঝোঁকও নেই। যে বৌদ্ধিক পরিকল্পনার ফলে মুকুন্দলাল উপন্যাসে সংযুক্ত, এই

"বিলিতি-বৈঠকখানা" বর্ণনায় তারই প্রতিফলন। মুকুন্দলালের শ্রেণী এবং ব্যক্তিরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট জ্ঞান মুকুন্দলালের বৈঠকখানা-বর্ণনাকে শিল্পগত তাৎপর্য দিয়েছে। উনিশের শতকের ধনতন্ত্রের সংস্পর্শে-আসা বাঙালি ভূস্বামীর অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতি আসবাবেই 'যথেষ্ট আধুনিকতা' 'টকটকে কড়া রঙে' উগ্র হয়ে উঠেছে। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন প্রাচীন ভূতে-পাওয়া কামরা। কেননা নিত্য দিনযাত্রার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। এ শুধু বাইরের ঘর। ভূসম্পত্তি-বিশিষ্ট বাঙালি মধ্যবিত্তের জটপাকানো জীবনের ছবি ফুটেছে এর পটে।

দুই

রবীন্দ্রনাথের কাছে বাঙালি মধ্যবিত্ত ব্যাপারটা একটা চলিষ্ণু সত্তা। চলিষ্ণুতার মধ্য থেকে তার শুভ্র সারাৎসারকে রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছেন তার ঔপন্যাসিক জীবনে। 'চোখের বালি'র কথা মনে রেখেও বলা যায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন উপন্যাসের নায়ক পরম্পরার মধ্যে বাঙালি মধ্যবিত্তের ঔজ্জ্বল্য ও ম্লানতার, সংগ্রামের এবং আশাভঙ্গের ইতিহাস মূর্ত হয়েছে। এই শতাব্দীর প্রথম দশকের রাজনৈতিক সামাজিক আলোড়নের সংক্ষুব্ধ লগ্নেই বাঙালি মধ্যবিত্ত উপলব্ধি করেছে নিজের ভূমিকা। জনজীবনের সঙ্গে তার বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা, এই বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে লড়ে যাবার প্রতিজ্ঞা এই কালখণ্ডে বাইরের তাড়নায়, ভিতরের প্রেরণায়, তাকে চঞ্চল করে তুলেছে। সবরকম প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সে অগ্রসর হতে চেয়েছে। গোরা এই যুগের নায়ক। কিন্তু গোরার মতো নায়ক রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক জীবনে আর নেই। শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রধান নায়ক শচীশ। শচীশের যন্ত্রণা নিজেকে উন্নীত করার যন্ত্রণা। গোরার যন্ত্রণা ছিল স্বদেশের ও সমাজের বাস্তবতার সঙ্গে মিলিত হবার প্রয়াসে চঞ্চল। শচীশ নিজেকে অনুভবাতীতলোকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। গোরা অনুভবগ্রাহ্য মানবিক বাস্তবতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের দুই অধ্যায়ের প্রথমটির আবেগের জন্মকালে যে তাড়না সক্রিয় ছিল 'মেঘ ও রৌদ্র'তে এবং 'গোরা'য় তাই প্রতিফলিত ব্যাপকতর আকারে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আবেগের ছবি যেন শচীশের শেষ উপলব্ধিতে :

"যাকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার—আর কিছুতেই

আমার দরকার নাই। দামিনী তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।"

'আর কিছুতেই আমার দরকার নাই'—এমন কথা গোরার কালের কথা কখনো হতে পারত না। শচীশের জীবনের অধ্যায়গুলিকে অনুধাবন করলে শচীশের ভাঙাগড়ায় বাঙালি মধ্যবিত্তের চলিষ্ণু ইতিহাসের ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। বেন্থাম-মিলের প্রশিষ্য শচীশ শেষ পর্যন্ত সে-পথ ছেড়ে, আত্মিক মুক্তির একক-যাত্রায় সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হল। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতাও তাৎপর্যময়। শচীশ লীলানন্দ স্বামী নয়। রসের কীর্তনসভায় সে রসবিকার ঘটাল না। গুরুবাদী দেশে সে গুরুপদকে প্রশ্রয় দিল না। তার গৌরীশঙ্কর আধ্যাত্মিকতায় নৈঃসঙ্গ্য দীপ্তিমান হয়ে থাকল। বাঙালি মধ্যবিত্তের সকল প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সংগ্রামে শচীশের ইতিহাসও তাই স্মরণীয়। যদিও দামিনী আরও সুস্থতার এবং স্বাভাবিকতার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করল তার চিতাগ্নির শিখায়।

'ঘরে বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়'-এ মধ্যবিত্তজীবনের বিংশ শতাব্দীর শুভারম্ভের জয়ধ্বনি আর নেই। আন্দোলনের পতন এবং লক্ষ্যহীন উপলক্ষপরায়ণতার যে-ইতিহাস তাতে নিখিলেশ সন্দীপ এবং অতীনই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। নিখিলেশ সন্দীপ অতীন আন্দোলনের পরের অধ্যায়ের হতমান বীর্যবত্তার অবদ্ধ বিকারের চঞ্চল নায়ক। ব্যর্থ এবং পরাভূত। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই ব্যর্থতার আঘাত বহন করেছেন নানাভাবে। শতাব্দীর প্রথম পাদের জাতীয় সামাজিক উত্থানের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের শূন্যতায় তিনি পীড়িত হয়েছেন। সে শূন্যতা পূরণের জন্য একা-একা চেষ্টা করেছেন। গোরা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নায়ক-চরিত্র-পরিকল্পনার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে নায়কেরা উপসংহারে সকল ক্ষেত্রেই ম্লানায়মান সূর্যের মতো সংবৃত-রশ্মি। গোরার মতো পরিসমাপ্তি তিনি যে কেন আর দ্বিতীয়বার পরিকল্পনা করতে পারেন নি—বাঙালি মধ্যবিত্তের উজ্জ্বল ঐতিহাসিক ভূমিকার ক্রমাবনতির মধ্যেই তার প্রধান উত্তর-সংকেত নিহিত। তাঁর উপন্যাসে এরই ছায়া। তাঁর উপন্যাসের নায়কদের মধ্যে তারই প্রক্ষেপ। এখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সহজে অনুভব করা যায়। মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত উপন্যাসের থিম্-এর সংযোগ বাস্তব প্রত্যক্ষতায় ধৃত নয়। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ বাঙালি মধ্যবিত্তের দীর্ঘ যাত্রায়, উদ্যমে এবং বৈফল্যে প্রত্যক্ষ

অংশীদার ছিলেন। যে-জীবন নিয়ে তিনি উপন্যাস লিখেছেন সে জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কসূত্রগুলি শুধু যে শ্রেণীগত তাই নয়—ব্যক্তিগতও বটে। তাই তার প্রত্যক্ষতা আরো বেশি।

তাছাড়া আর-একটা কথাও স্মরণীয়। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের বাস্তববাদ বুদ্ধিমার্গীয় বাস্তববাদ। তিনি বাস্তব-অবলম্বী ঔপন্যাসিক মাত্র নন। এবং এই বুদ্ধিমার্গীয় বাস্তববাদের সমস্ত শক্তি প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সংগ্রামে নিযুক্ত ছিল। তাই বাস্তবের স্থূল অনুকৃতি অপেক্ষা বাস্তবের দ্বন্দ্বময় গতিশীলতাকেই তিনি নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের পুরুষ-চরিত্রগুলিকে যে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, তার মধ্যেও সেই দ্বন্দ্বময় গতিশীলতার যে ধারণা তারই অভিব্যক্তি। গোরা, শচীশ, মধুসূদন ইত্যাদির মধ্যে যেমন সময়ের গতিবেগ স্পষ্ট, এবং তার ফলে যেমন চরিত্রগুলির মধ্যে মহত্ত্ব বা বৃহত্ত্ব এসেছে, বিনয়, শ্রীবিলাস এবং নবীনের মধ্যে তেমনি বাস্তবের প্রাত্যহিক রূপ ফুটেছে। এরা সময়ের বিপুল গতির দ্বারা চিহ্নিত নয়। অথচ বাস্তবের সামগ্রিক আলেখ্য গঠনে এদের ভূমিকা তুল্যমূল্যের। এরা না থাকলে উপন্যাসের প্রত্যক্ষতা আহত হত। এই বুদ্ধিমার্গীয় বাস্তববাদকে ব্যবহার করেই রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের শতাব্দীর তৃতীয় দশকের উপক্রমণিকায় এসে পৌঁছলেন তখন বাঙালি মধ্যবিত্তের ইতিহাসও এক সন্ধিলগ্নে এসে দাঁড়িয়েছে। মধ্যবিত্ত নায়কের চলিষ্ণু সত্তা তখন দ্বিধাহত, খণ্ডিত এবং দিকহারা। গোরা এবং অমিতের মধ্যে যে-পার্থক্য তার রহস্য যত গভীর, অমিত এবং মধুসূদনের মধ্যে যে-বিরুদ্ধতা তার তাৎপর্য তার থেকে অনেক বেশি মর্মান্তিক। বাঙালি মধ্যবিত্তের সকল প্রতিশ্রুতির করুণ পরিণামকে ঔপন্যাসিক এই দুই উপন্যাসের দুই চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। একদিকে লক্ষ্যহীন বৈদগ্ধ্য, আর একদিকে লোভের এবং দৈন্যের কলোনির জারজ।

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল সমাজ-জীবনের অগ্রগামী অংশের স্বরূপের দিকে। প্রতিক্রিয়া এবং পিছুটানের সঙ্গে যুদ্ধে যেহেতু তিনি ছিলেন অনলস এবং অনবনত, তাই তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই একদিকে বাঙালি মধ্যবিত্তের শুদ্ধ-গতিবেগকে চিহ্নিত করার প্রয়াস, অপরদিকে মধ্যবিত্তের সকল প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের ছবি। মধ্যবিত্ত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সংগ্রামে সতত তৎপর এই ঔপন্যাসিকের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা যেমন স্মরণীয় তেমনি একথাও কিন্তু ভুলবার নয় যে এই সংগ্রামের নায়ক নিজেও এক মধ্যবিত্ত অভিমানের

দ্বারা প্রতারিত। এর ফলে তাঁর উপন্যাসের গঠনের শৈলীও প্রভাবিত হয়েছে। গোরা উপন্যাসে এবং অন্যত্রও দেখা যায় যে নায়কের সংগ্রাম শেষপর্যন্ত একক মুক্তির সংগ্রাম। গোরার সংগ্রামের অভীপ্সার পাশে পাশে জীবনের ব্যাপক বিশাল সংগ্রামী বাস্তবতাকে রবীন্দ্রনাথ আভাসে এঁকেছেন মাত্র। গোরাকে তার সঙ্গে অন্বিত করে দেখেন নি। গোরা শচীশ থেকে কুমু পর্যন্ত সকল প্রধান পাত্র-পাত্রীই ব্যক্তিত্বের যে তীব্র যন্ত্রণায় মথিত তা একাকিত্বের অগ্নিপরীক্ষা। এবং রবীন্দ্রনাথ যখন এদের কথা যখন বলেন, এদের চরিত্র যখন আঁকেন তখন তিনি সব থেকে অন্তর্যামী। সেই চরিত্রগুলির অসীম উৎকণ্ঠাকে তিনি ভাষা দিয়েছেন সহজ নিশ্চয়তায়। কিন্তু যখনই তিনি উপন্যাসে নায়কেতর পুরুষচরিত্রগুলি এঁকেছেন তখনই দেখা যায় স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে বটে কিন্তু একটা মূলে স্থূলে তফাৎ হয়ে গেছে। বুদ্ধিজীবী, অগ্রণীস্বভাবের নায়কদের বেলায় ঔপন্যাসিক যেমন ভিতর থেকে স্বসম্মুখভাবে কথা বলেছেন, নায়কেতর চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে তেমনি কিছুটা বাইরে থেকে কথা বলা হয়েছে। ফলে মনে হয় যে শেষোক্ত চরিত্রগুলি বাইরে থেকে আঁকা। শ্রীবিলাস এর এক নিদর্শন। নবীন এর আর এক নিদর্শন। বিনয় অবশ্যই কতকাংশে এই সীমার বাইরে পড়ে। কারণ বিনয় এবং গোরা যে কালখণ্ডের প্রেরণায় সৃষ্ট সে কালখণ্ডের বিশিষ্ট সংঘাতে বৃহৎ মানুষ আর এ্যাভারেজ মানুষের ব্যবধান ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শ্রীবিলাস এবং সম্পূর্ণ অন্যক্ষেত্রে নবীন বৃহৎ-ভূমিকাবিহীন অ্যাভারেজ মানুষ। এদের চলাফেরা, কথাবার্তা সবকিছুতেই এমন একটা সিচুয়েশন-সচেতনতা যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাটকের জনসাধারণ-চরিত্রের ভঙ্গিগত মিল বেশি। অথচ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই জাতীয় চরিত্র-পরিকল্পনা তাৎপর্যবিহীন নয়। জীবন সম্বন্ধে এক স্বাস্থ্যবান ঋজুসারল্য এই চরিত্র-পরিকল্পনার মাধ্যমে অভিব্যক্ত; এবং তার মূল্যও অনস্বীকার্য। বাঙালি মধ্যবিত্তের যে বিশুদ্ধ স্বরূপ তিনি সন্ধান করেছেন এই চরিত্র-কল্পনাও সেই সন্ধানেরই আরেক ফল। কিন্তু বাইরে থেকে আঁকার ফলেই এদের জীবনে বাস্তবের গূঢ় জটিলতার কোনো দায়ভাগ এরা বহন করছে কিনা তা দেখানো সম্ভব হয় নি। ফলে এরা উপন্যাসে প্রভাবসঞ্চারী হলেও ভূমিকার দিক থেকে গৌণ থেকে গেছে।

প্রসঙ্গত, বিনয়ের কথা মনে রেখেও, এ কথা স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নায়ক-চরিত্রগুলির পাশাপাশি স্থাপিত পুরুষচরিত্রগুলি গভীরতর

নৈতিক সমস্যার আলোড়ন থেকে দূরে সরে গেছে। বিনয়ের একটা সমস্যা-সংকুল ব্যক্তিজীবন অবশ্যই ছিল; তথাপি তার জটিলতাটুকু একান্তই বাইরের জটিলতা। গোরার ভিতর-বাহির সব মিলিয়ে যে-সমস্যা তার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। বিনয়কে আমরা বিনয়ের জগতে দেখতে পাই না। তার জগৎ গোরারই জগৎ। টলস্টয়-এর ওঅর অ্যাণ্ড পীস-এর পিয়ের এবং আন্দ্রে উভয়েই মানব-কল্যাণমূলক নৈতিক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ভূমিতে উপনীত হয়েছে। টলস্টয় তাদের যাত্রাপথকে পৃথক করে, চরিত্র দুটির বিশ্বাস ও উপলব্ধিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন। টমাস মান-এর ম্যাজিক মাউণ্টেনের বন্ধুযুগলও স্মরণীয়। হান্স কাস্টর্প ও জোয়াকিম সময়ের অভিঘাতকে স্বতন্ত্রভাবে বহন করেছে। সময়ের সমস্যার সম্মুখীন এভাবে হতে হতে তাদের দুজনের পৃথক জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ গোরা এবং বিনয়ের যাত্রাপথের পার্থক্য এঁকেছেন গভীর তাৎপর্যে অন্বিত করে। কিন্তু বিনয়ের উপলব্ধি কোন্ স্তরে পরম পরিণতি পেল সে কথা হারিয়ে গেছে। গোরার মন্ময়তা আমাদের কাছে প্রত্যয়সঞ্চারী—কেননা দেশ-কাল-পাত্রের প্রবল প্রতিক্রিয়াতেই সে মন্ময়তার বাস্তবমূল খুঁজে পাওয়া যায়। বিনয়ের তন্নিষ্ঠতা সে ক্ষেত্রে বিনয়কে আবদ্ধ করেই রাখল। বিনয়কে বিনয়ের নিজস্ব পটে একবারও উপস্থাপিত না করার ফলেই এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে একে রবীন্দ্রনাথ বাইরে থেকে এঁকেছেন। বিনয়, শ্রীবিলাস এবং রবীন্দ্রনাথের এ-জাতীয় চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখলে এই সিদ্ধান্ত আরো শক্ত হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে এই চরিত্রগুলিকে কর্মতৎপরতা এবং ঘটনাময় সক্রিয়তার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাগত সক্রিয়তার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। এগুলি তাদের ব্যক্তিত্বসঞ্জাত ব্যাপারও নয়। বৃহতের গৌরব তারা চায় নি। কিন্তু তার দায় তাদের বহন করতে হল। মেঘ ও রৌদ্র এবং গোরার যুগের সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্তের বিবেকবান আন্তরিকতার স্পর্শের ফলে বৃহৎ ইতিহাস ও সভ্যতার মৌল গতিবেগের সঙ্গে অ্যাভারেজ মানুষের সম্পর্ক হয়তো এইভাবেই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রতিভাত হয়েছে।

তিন

মহৎ ঔপন্যাসিকদের অনেকের একটা একটা বিশেষ কালখণ্ডের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাপূর্ণ

স্মৃতি দুর্মর থাকে। সেই কালখণ্ডের পটে মানুষের অপরাজেয় সত্তার কোনো-না-কোনো উদ্ভাসনকে তাঁরা হয়তো অনুভব করেন। টলস্টয়ের জন্মের কয়েক বছর পূর্বের ব্যর্থ ডিসেম্‌ব্রিস্ট-বিদ্রোহীদের সামাজিক অবিচাররোধের মধ্যবিত্তীয় প্রয়াসের ইতিহাস টলস্টয়ের কাছে ছিল অবিস্মরণীয়। টমাস মানের মনে জার্মান মধ্যবিত্তের সকল ঔজ্জ্বল্যের সুদিনের স্মৃতি মধ্যবিত্ত বিবেকের সারাৎসারের রূপক নির্মাণে সহায়তা করেছে। টলস্টয় প্রথম নিকোলাসের দমননীতির দিনগুলিতে জার সরকার সম্বন্ধে সকল বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। বাংলাদেশের ও ভারতবর্ষের দমননীতির দিনগুলিতে ইংরাজ সরকার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিরাশ্বাস হয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগের বাংলাদেশের গতিশীল কর্মকাণ্ডের স্মৃতি একটা আদর্শের ভাবতরঙ্গ রচনা করে রেখেছিল। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রধান উপন্যাসের নৈতিক আবহাওয়ায় তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার কাজ চলেছে। তাঁর সকল মধ্যবিত্ত নায়কদের বীর্যবত্তা ও পরাভবের ছবি নির্মাণে সেই স্মৃতি প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে নানা সহায়তা করেছে। গোরা ও নিখিলেশের কৃষকজনতা সম্বন্ধে চেতনায় তার নিদর্শন যেমন প্রকট, তেমনি তাঁর সমস্ত নায়ককুলের প্রয়াসে প্রচ্ছন্ন রয়েছে উক্ত স্মৃতির সম্পদ। সংগ্রামের এতদপেক্ষা কোনো বড় ছবি এ-দেশীয় পটে রবীন্দ্রনাথ আর মনে করতে পারেন নি। সে ছবি একক ব্যক্তিত্বের দীর্ঘ যন্ত্রণাময় সংগ্রামের ছবি।

অথচ এই ছবিতে বাংলাদেশের সামগ্রিকতা ফোটে না। ব্যক্তির তীব্র প্রয়াস সত্ত্বেও এ কথা কিছুতেই স্বীকার করার নয় যে ইংরাজের কলোনির গ্রন্থিল জট এখানে দুর্মোচনীয়। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রধান সৃষ্টি যোগাযোগ-এ সেই বাস্তবের বৃহৎ এবং পূর্ণাবয়ব দর্পণ রচিত হল। দুই শতাব্দীর বাংলাদেশের যা-কিছু সঞ্চয় তার ছায়া পড়েছে এই দর্পণে। কুমু রবীন্দ্রনাথের যথাযথ আত্মমর্যাদা-সচেতন নায়িকা। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রধান নায়িকাদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যদিও তাদের জীবনযাত্রা উচ্চমধ্যবিত্ত ছক বা প্যাটার্নেই কল্পিত হয়েছে কিন্তু প্রায় তাদের সকলকেই লেখক দারিদ্র্যের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন তাদের মানসিক বলিষ্ঠতা নির্মাণের জন্য। বিনোদিনী গরীবের মেয়ে বলে বর্ণিত। সুচরিতা ব্যতিক্রম যদিও, তবু হরিমোহিনীর সেই বাড়িতে উচ্চমধ্যবিত্তিক প্যাটার্ন ছিল না। দামিনী যখন স্বামীগৃহে ভক্তমণ্ডলীকে ভোজ দিত তখন তার পিত্রালয়ের অভুক্ত

স্বজনদের স্মৃতি তাকে চঞ্চল করে তুলত। লাবণ্য গভর্নেস। কুমু অভিজাত কিন্তু বিপ্রদাসের বাড়িতে দারিদ্র্য তাকে ভ্রূকুটি করেছে শীতল নেত্রে। কুমু অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের এখনও—আধুনিকতম নায়িকা দামিনী নয়—কিন্তু তার মধ্যেই বাংলাদেশের একালের মধ্যবিত্তজীবনের সমগ্র ট্র্যাজেডিকে চেনা গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সকল আত্মাভিমান, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার প্রচেষ্টা কোন্ ব্যর্থ উত্তরাধিকারে বিড়ম্বিত হল কুমু যেন তারই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ভ্রমরের-মতো-বিবাগী-কুমুর-র-মায়ের স্বামীগৃহ ছেড়ে চলে যাওয়া আর কুমুর চলে যাওয়ায় কত তফাৎ। কেননা নন্দরানীর সঙ্গে মুকুন্দলালের যত বৈপরীত্য, কুমুর সঙ্গে মধুসূদনের বৈপরীত্য যে তার চেয়ে অনেক বেশি। কুমু সত্যই নন্দরানীর মেয়ে, মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রথম প্রভাতরশ্মিতে স্নাত শুদ্ধতা কুমু। কিন্তু এখন আর বিদ্রোহেও গৌরব নেই। মুকুন্দলালের দুই মহলা বাড়ির এক মহলায় হয়তো মুকুন্দলালকে খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু মধুসূদন কে? মূল্যবান ডাইনিং টেবলে যে ডাটাচচ্চড়ি আর মোটা ভাত কলায়ের ডাল খায়? অধিকারপরায়ণ লোভের বণিক-বিগ্রহ সে। কুমু সম্বন্ধে তার মনোভাবকে চেনা শুরু করতে হবে এইখান থেকে। অথচ তারও সর্বাঙ্গে মারের দাগ—বিড়ম্বনা তারও বিস্তর। সে বোবা যন্ত্রণায় তার নিজের সাক্ষ্য সে নিজেই। অথচ নতুন পুরুষকে জন্মাতে হবে এরই ঔরসে। বাঙালি মধ্যবিত্তের শ্রেষ্ঠতার ও শুদ্ধতার গর্ভে—বিপ্রদাসের ন যযৌ ন তস্থৌ অস্থবী স্তব্ধতা বিমূঢ় থাকবে শুধু। কুমু কিছুতেই সেখানে বদ্ধ থাকল না। সে-সন্তান কেমন হত—সে কি বাডেনব্রুকস-এর শেষতম বংশধরের মতো হত, তার নিঃসঙ্গ মায়ের ছায়ায়—নাকি সে হত শুধু মধুসূদনেরই বংশধর—সেকথা আমরা এখনো জানি না; অথচ এটা জানার জন্য আমাদের শৈল্পিক আকুলতা কত তীব্র। কুমুকে জানা তবেই তো পূর্ণ হবে। বিপ্রদাস রইল অতীত শতাব্দীর মর্যাদা—ম্লান এবং পরাভূত। কুমু এগিয়ে এল নব-ইতিহাসে। অথচ কুমু বাঙালি মধ্যবিত্তের সকল বিশুদ্ধতার প্রতিনিধি বলেই মধুসূদন তাকে বুঝেও বুঝতে পারে না। গান শোনানোর মুগ্ধ মুহূর্ত ভেঙে চুরমার হয়ে যায় মধুসূদনের দানের দর্পে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে কুমুর সান্ত্বনা নেই কোথাও। তার যা যন্ত্রণা তা শুদ্ধতার যন্ত্রণা। এই শুদ্ধতার সরস্বতী উপনিবেশের বিকারের বেড়াজালে বন্দিনী—অথচ এই বন্দীশালা তার অস্তিত্বেরই অংশ। সান্ত্বনা হয়তো শুধু মোতির মায়ের সাধারণ

জীবনের শান্ত ছন্দে। কিন্তু কুমু জানে যে সে-সহজ জীবনও নিস্তরঙ্গ। নবীনের কোনো নবীনত্বর পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দেন নি। মধুসূদনের সঙ্গে শ্যামার সম্পর্কে মধুসূদনের মালিকী মেজাজ এবং ক্ষুধার্ততা যেমন ফোটে, শ্যামার ভিতর দিয়ে তেমনিই ফোটে এই সমাজের নারীর ভূমিকায় যে-দৈন্য তার আভাস। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠিকভাবেই তার বক্তব্যকে সঞ্চারিত করেছেন। ব্যর্থ হয়েছেন নবীনের বেলায়। নবীন আর মোতির মায়ের সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ককে তিনি যদি একটু অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখতেন তাহলে নবীনকে শুধু মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করেই নিঃশেষিত হতে হত না। মধুসূদন যে-সম্পদের ছায়ায় বড়মানুষ হয়েছে সে-সমাজের সমস্ত সম্পর্কই আর্থিক সম্পর্ক। মধুসূদন সেকথা জানে। নবীন তেমন করে না জানলে নবীনের তাৎপর্য ব্যাখ্যাও হয় না। নবীনের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অ্যাভারেজ মানুষের নতুন ভূমিকা-নির্ণয়ের একটা অবকাশ পেয়েছিলেন—কিন্তু ব্যবহার করেন নি। যার আর্থিক নির্ভরতা মধুসূদনে এবং আনন্দের আবেগের আশ্রয় কুমুর কাছে তার দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে এক যুগের বাঙালি যুবককে পাবার কথা। হাবুল শিশু বলেই হয়তো তার চেয়ে চেতনার দিক থেকে অধিকতর নিরাবরণ।

অবিনাশ ঘোষালের জীবনী পেলে বাংলাদেশের সংগ্রামের আলেখ্য আরো স্পষ্ট হত।

গোপাল হালদার

প্রথম অশ্রু

সুলতার সঙ্গে আজ দেখা করবেই প্রতিমা। তিন মাস ধরেই প্রতিমা একথা ভেবেছে—সেই যেদিন সুলতা বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে। বুঝিয়ে দিয়েছে—দোতলার ডানদিকে দুয়ারের সঙ্গে 'কলিং বেল', একটা ছোট নেমপ্লেট, আছে ওঁর নামে, আর বার বার বলেছে, 'তুমি আসবে, ভাই। বেশ তো, তোমার স্কুল যখন এ-পাড়ায়, যে-কোনো দিন সময় করে চলে এসো। এক সঙ্গে চা খাব দুজনায়। কথা হবে।' প্রতিমা কথাটা ভুলতে পারে নি। ঠিক করেছে যাবে একদিন—এক শনিবার। শনিবার এলে মনে পড়েছে, আর ভেবেছে,—আজ থাক, অন্য এক শনিবার। অনেক শনিবার গিয়েছে। প্রতিমা যায় নি। কিন্তু ভুলতেও পারে নি শনিবারে সেদিনটি শনিবার, লতাদির সঙ্গে দেখা করলে হয়।' তবু যায় নি। ভেবেছে—গেলে টিউশনিতে দেরী হয়ে যাবে। এমনিতেই মেনকার শাশুড়ি যেরকম মানুষ! প্রতিমা বাইরের ঘর থেকেই প্রতিদিন শুনতে পায় সংবর্ধনা—'নাও বউমা, তোমার টিচারদিদি এসেছেন—সময় হল তোমাদের।' বাড়ি গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে পাঁচটার মধ্যে সেই টালিগঞ্জ দিয়ে পৌঁছাতে হবে ছ'নম্বর বাসে ছ'টায়। না, থাক, বাড়ি যাওয়া যাক। ছেলেমেয়েরাও তো স্কুল থেকে এসে যাবে। মাকে না দেখলে তারাই বা কি কুরুক্ষেত্র বাধাবে কে জানে? সুলতার সঙ্গে দেখা করা হয় না।

কিন্তু প্রতিমা আজ দেখা করবে। যা হয় একবার বুঝবে। লতাদি যদি তেমনি তাকে মনে রেখে থাকে, তাহলে একবার কাথাটা পাড়বে।

ঘণ্টা টিপতেই দুয়ার খুলে গেল। সামনেই সুলতা নিজে।

—ওমা! তুমি! প্রতিমা!

—হাঁ, ব্যাঘাত হল বোধহয় তোমার লতাদি। আমিও ভাবছিলাম দুপুরবেলা বিশ্রাম করছ, একটু হয়তো ঘুমুচ্ছ—

—তা বলে তুমি আসবে না?—হাত ধরে তাকে ঘরে নিয়ে গেল—

সাজানো ড্রয়িং রুম। সুলতা বলতে বলতে এল : ঘুমুই একটু-আধটু। কিন্তু কাজ করতে হবে না নাকি তাই বলে ? আর দুপুর কি আর আছে ? তিনটে তো বাজছে।

—তোমার কাজ আছে নাকি এখন ?

—ওই একটু ছানা কেটে সন্দেশ করছিলাম, ওঁরা এলে দেব। তারপর বেরুব—আমার মেয়ের স্কুলে আজ ওদের লাকি বাজার। মাদের না গেলেই নয়।

—মেয়ে কোথায় ?

—আবার কোথায় ? স্কুলে। আজ কি আর বাড়ি থাকতে পারে।

—ছেলে ? কি নাম যেন—নির্মাল্য না ?

—হাঁ, নির্মাল্য। তোমার তো মনে আছে নাম! সে ভাই বলো না। সেণ্টজিভিয়ার্স-এ পড়বে, সব ঠিক। উনি পাঠিয়ে দিলেন দেরাদুন। বলেন সে নাকি আরও ভালো। ভালো তো হবেই—মাসে তিন শ করে টাকা দিলে অমন ভালো পড়া এখানকার স্কুলেও হত। তা ছাড়া, চোখে দেখতে পাব না—বোর্ডিং-এ থাকবে—বলো তো, এভাবে থাকা যায় ?

প্রতিমা হেসে বলল, যায়। যায় কেন, আমি হলে বাঁচতাম লতাদি। এই তো তিন-তিনটে দস্যি এসে বাড়িতে কি যে বাধিয়ে দিয়েছে এতক্ষণ, দেখলে তুমিও বলতে—সবগুলোকে পারি তো পাঠিয়ে দিই—দেরাদুনে না পারি, দণ্ডকারণ্যে।

সুলতাও হেসে ফেলল। বাবা, তুই এখনো তেমনি আছিস। রোগা হয়েছিস একটু, তিন ছেলের মা, তবু নিজেও হাসতে জানিস, হাসাতে পারিস। কিন্তু একটা মাত্র ছেলে হলে তুইও কি ছেড়ে থাকতে পারতিস তাকে ? বল্ তো ? তোর তিনটি ছেলে বলেই তো—

প্রতিমা বললে, মেয়ে দুটোকে বাদ দিলে কেন ? তাঁরাও আছেন, তিন পুত্র দুই কন্যা!

বলবার ভঙ্গিতে সুলতা আবার হাসল : তাতে কি হয়েছে ?

—কী হয়েছে ? হোক তোমার, বুঝবে—

দুজনায় চোখে-চোখে মিলতে আবার হাসল। সুলতা মৃদু হাস্যে বললে : হবে না। ওঁর মত নেই।

—তোমার মত আছে ?

—আরেকটি ছেলের। কিন্তু সে হয় না।

দুজনায় এমন আপনার হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই যে, সুলতা তা জানতেই পারল না প্রতিমাকে মনখুলে বলে যাচ্ছে 'ওঁর' কথা।

—এম-এস-সি পরীক্ষা দেন নি, সে তো তোর মনে আছে? মনে নেই? চাকরি তখনি নিলেন। কিছুদিন পরে বিয়ে। চলে গেলাম ওঁর সঙ্গে জব্বলপুরে। তারপরে আবার কানপুরে। ঘুরে ঘুরে এই তিন বৎসর এখন কলকাতা। কিন্তু চল প্রতিমা রান্নাঘরে বসে কথা বলি। চায়ের জল চাপিয়ে দিই—দুজনায় চা খেতে-খেতে কথা হবে।

বড় বড় তিনটি ঘরের ফ্লাট। সুলতা জানায় সাড়ে পাঁচশ টাকা মাসে ভাড়া।

—সাড়ে পাঁচ শ!

সুলতা জানায়, তিন বছর আছি বলে। দুবেলা শোনান গিন্নী পাশের বাড়িতে কোন্ মাদ্রাজী এসেছে সাড়ে সাত শ টাকা ভাড়ায়। ভাই, গ্যাস আমরা নিজেরা আনালাম, এস ঘরগুলো দেখবে।

সুলতা ঘর দেখাতে নিয়ে যায়। ড্রয়িং রুম, পাশেই শোবার ঘর দেবতোষের, তার পাশের ঘর সুলতা ও বেবির—বেবি তো একা থাকতে পারে না।

প্রতিমা বলে—তোমার 'উনিই' কি একা থাকতে পারেন? না, তুমিই তা দাও।

—যাঃ! ছাখ, ওঁর ঘরে ওঁর জিনিস সব। একটা জিনিসও আমার পাবি না। একটা চুলের কাঁটাও না।

এই দেবতোষের ঘর, এই দেবতোষের শয্যা, ওই তার নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্র, টুকিটাকি। ছোট আলনায় সিল্কের ড্রেসিং গাউন, রাত্রির পা-জামা, কোট, সব সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, গুছানো। এমনটি কি প্রতিমা রাখতে পারত গুছিয়ে?

দেবতোষ নিজেও অগোছাল মানুষ ছিল না। ছাত্রজীবনেও না। খুব পরিপাটি নয়, কিন্তু ধীর পরিচ্ছন্ন। বেশ হিসাবী। কোন্ খরচটা করতে হবে কোন্ খরচটা নয়, যেন জন্মাধিকারেই তার হিসাব জানে। অতটা হিসাব-করা জীবন কেমন যেন লাগত প্রতিমার। অন্তত তখন। প্রতিমা ছাত্র-আন্দোলনে মাতত, মেয়েদের মধ্যে সে বলতে পারত, কইতে পারত,

লিখতেও পারত কিছুটা। তাকে নিয়ে তখন বিভিন্ন দলের মধ্যে কম কাড়াকাড়ি ছিল না। যে গ্রুপে প্রতিমা যাবে সে গ্রুপের জয়ের চ্যান্স্ অনেক বেড়ে যায়। প্রতিমারও তাই নেশা লাগছিল সে-সবে। হাঁ, নেশাই। তবে তার ঝোঁকও ছিল—বাড়ির ঝোঁক, দাদার থেকে; কংগ্রেসম্যান কাকার থেকে পাওয়া স্বাধীনতার ঝোঁক। তা বেড়ে গেল কলেজে, হল বামপন্থী ঝোঁক, নেতাজীর আদর্শ, ফরওয়ার্ড ব্লক-পন্থী। দেবতোষ কিন্তু পা বাড়াতে চায় না। প্রতিমার এই মাতামাতিও দেবতোষের ভালো লাগত না। স্বাধীনতা চাই, পাচ্ছি—পাঁচ শ বার তা রক্ষা করব। কিন্তু দেবতোষ বুঝতে পারে না—কেন বামপন্থী হব, সোশ্যালিস্ট হব, কমিউনিস্ট হব? আর, এমন সভা-সমিতি মিছিলের বা এখন দরকার কি? অথচ দেবতোষ পথ দেখে না। সে সভা-সমিতি চায় না, কিন্তু প্রতিমার কথা শুনতে চায়, তার বক্তৃতা শুনতে চায়। প্রতিমা ভালো বললে সে মুগ্ধ হয়, আবার অস্বস্তিও বোধ করে। এত ভালো বলে বলেই তো এমন নেশায় প্রতিমাকে পেয়ে বসছে। প্রতিমা মাথা দুলিয়ে বলত, নেশা! বেশ, তা-ই। কিন্তু তোমার ভালো লাগে না?

—কি? তোমার বক্তৃতা? লাগে—কিন্তু তোমার বক্তৃতা বলে। হাঁ, তোমাকে ভালো লাগে বলে।

প্রতিমারও কেমন ভালো লাগত এ-কথা শুনতে। তার বক্তৃতা শুধু নয়, তাকেই ভালো লাগে একটি মানুষের, একটি পুরুষের, দেবতোষের। মুখটা কেমন লাল হয়, কানের গোড়ায় একটা আরক্ত আভা দেখা দেয়। একটা জয়েরও আনন্দ মনে জাগে।

দেবতোষকে এভাবেই প্রতিমা টেনে নিয়ে চলল সভা থেকে সভায় নিজের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু দেবতোষ আরাম পায় না। প্রতিমা তা বোঝে। সে-ও কেমন আরাম পায় না দেবতোষকে অমন টেনে-টেনে নিয়ে চলতে। বড় হিসাবী—কেবলি দ্বিধা!

এমনি সময়ে কবিতার আলোকছটা নিয়ে কংগ্রেসী ছাত্রদের মাঝখানে ফুটে উঠল প্রতাপ চৌধুরী। স্থলতার মাসতুত ভাই—মফস্বল থেকে কলকাতায় এসেছিল এম-এ পড়তে। স্থলতার পরিচয়েই তার সঙ্গে পরিচয় প্রতিমার, আর প্রতিমার সঙ্গে পরিচয় প্রতাপের। আবার, প্রতিমার পরিচয়ে

সুলতা-প্রতাপের পরিচয় দেবতোষের সঙ্গে। ঝকঝকে ছেলে সেই প্রতাপ—সুবক্তা নয়, কিন্তু সুকবি। আন্তরিকতায় মনকে স্পর্শ করে, স্পর্শকাতরতায় নিজে হয় বিচলিত। সুলতা বলত—সেন্টিমেন্টাল! অথচ অত ভাবপ্রবণ হওয়া ঠিক নয়। বিধবা মা 'আছেন, ভাইবোনদের মানুষ করতে হবে। মেসোমশায় মাস্টারি করতেন। রেখে যেতে পারেন নি কিছুই।

প্রতিমা বলত, প্রতাপই তো যথেষ্ট—এর চেয়ে বেশি রেখে যেতেন আবার কি? টাকা, জমিদারী? কোম্পানির কাগজ?

সুলতা তা মানত। তা বলছি না।—কিন্তু ওর বোঝা অনেক—মানুষ করতে হবে ছোট ভাইবোনদের।

—ও মানুষ হলে তবেই তাদের মানুষ করতে পারবে। নাহলে টাকা করলেও হবে ভুত!

সেই প্রতাপ—কবি প্রতাপ চৌধুরীকে নিজের সঙ্গে নিজেদের সভায়, সমিতিতে, আন্দোলনে নিয়ে যেতে বেশি দেরি হল না প্রতিমার। ছুটো ছাত্রদলে তা নিয়ে লাঠালাঠি হয় আর কি! প্রতিমাকে একবার বিপক্ষের একটা ছেলে কি টিটকিরি দিতে প্রতাপ চৌধুরী গেল এগিয়ে। মার খেয়ে চশমা ভাঙল।

তারপর কয়মাসের মধ্যেই এসে গেল একটা দিন যখন প্রতিমাকে স্পষ্ট করেই প্রত্যাহার করতে হল দেবতোষের নিকট তার দেওয়া অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতি। কারণ, সে বাগ্‌দত্তা। আসলে কথাটা তখনো সত্য ছিল না। কিন্তু মাস না শেষ হতেই সত্য হয়ে গেল—প্রতিমা আর প্রতাপের বিয়ে হল। বাংলাদেশের ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাসে সে একটা ল্যাণ্ডমার্ক। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যার মিলন—ভাবী যুগের সূচনা বর্তমান যুগের এই অভ্যন্তরে। জয় হিন্দ্‌।

দুজনায় যখন যুগলযাত্রার উৎসাহে-আনন্দে, নতুন শপথের উদ্দীপনায়-উন্মাদনায় দিগ্‌দেশহারা তখন কখন দেবতোষ এম-এস-সি পরীক্ষা না দিয়ে চলে গেল, চাকরি নিলে কোথায়, আর কবে বিবাহ হল তার সুলতার সঙ্গে, সে-সব কথা প্রতিমার ভাববারও সময় হয় নি। শুনল, হিসেবী মানুষ দেবতোষ মাঝারি বুদ্ধির লতাদিকে বিয়ে করে মাঝারি জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে সংসার করবে, এই নিশ্চয়তায় নিশ্চিন্ত বোধ করেছে, আর সে কল্পনা করে প্রতিমা স্বচ্ছন্দমনে হেসেছেও একটু। বেশ!

মুখে প্রতিমার হাসি লেগে রয়েছে তখনো—এই দেবতোষের ঘর—দেবতোষের শয্যা।

স্বলতা বলল, গ্যাসটা আসতে ভাই বড় স্থবিধা হয়েছে। রান্নাঘরে চল, দেখবে।

প্রতিমাকে নিয়ে চলল রান্নাঘরে। যেতে-যেতে প্রতিমা আবার পিছনে ফিরে দাঁড়াল---এই দেবতোষের ঘর, দেবতোষের শয্যা—প্রতিমারও যা হতে পারত—

দ্রুতপদে রান্নাঘরে এসে ঢুকল প্রতিমা। ঝুঁকে পড়ল গ্যাসের উন্থনের উপর।—চমৎকার! ঘুঁটে, কয়লা, কিছু নেই। প্রতিমা এমন উন্থনে রাঁধতে পারলে বেঁচে যেত!

—বেশি খরচ নয়। পৌনে দু'শ একবার, তারপর মাসে মাসে যেমন খরচ কর, পঁচিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ!

পৌনে দু'শ, মাসে মাসে পঁচিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ! প্রতিমা মাসে পঁচাত্তর টাকার জন্য স্কুলের শেষে সপ্তাহে তিনদিন মধ্য-কলকাতা থেকে ছোটে টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে গড়িয়ার বাসে---শুধু পঁচাত্তর টাকা মাসে। আর তাতেও মেনকার বেনামীতে শুনতে হয় গঞ্জনা—আজও যেমন শুনতে হবে। সত্যিই পঁচাত্তর টাকাও তার পক্ষে কম নয়, সে তা ছাড়তে চায় না। অবশ্য মেনকাও তাকে ছাড়তে দেবে না। বিধবা মেয়েটা শ্বশুরবাড়ির কয়েদখানায় তিন বৎসরের ছেলেটিকে নিয়ে অনেক চেষ্টায় নিজের পড়াশুনার ব্যবস্থা করিয়েছে—মেয়ে টিচার পড়াবে, শাশুড়ির তদারকে। 'আপনি কাজ ছেড়ে দিলে প্রতিমাদি, আমার আর পড়াশুনা হবে না! আমি দম বন্ধ হয়ে মরে যাব এই কবরখানায়।' ফিউডিলাজিমের কবরখানাই বাড়িটা, প্রতিমাও তা বুঝতে পারে। তা ছাড়া পঁচাত্তর টাকা—অন্য কিছু না পেলে তাও ছাড়া যায় না। সে তাহলে এবার কি বলবে স্বলতাকে? দেবতোষদের আপিসে কিছু মামলা-মোকদ্দমার কাজ-কর্ম কি প্রতাপ পেতে পারে? না, না। প্রতাপ নয়—প্রতাপ নয়—প্রতাপের জন্য দেবতোষের দাক্ষিণ্য—না, না। বরং প্রতিমা নিজের জন্য বলতে পারে স্বলতাকে। কোনো একটা ভালো স্কুলে বা আপিসে প্রতিমার একটা চাকরি হয় না? সেই কথাটাই বরং পাড়বে। পাড়বে কি? হাঁ। কিন্তু আজ নয়, আজ থাক। অন্তত এখনো নয়।

—আচ্ছা, লতাদি, এ-গ্যাস নিলে। দুর্গাপুরের গ্যাসও তো আসছে।

—সে যখন আসবে, তখন দেখা যাবে। বাড়িওয়ালা রাজি হলে তো পাব। তা ছাড়া, উনি তো সব জানেন—বলেন, 'সে গ্যাসের উপর ভরসা করে থাকলেই হয়েছে।'

চা তৈরি করে দুজনায় আবার বসল—রান্নাঘরে স্ট্যাণ্ডে পাখা ঘুরছে। দাঁড়িয়ে কাজ করতেও আরাম। বসে গল্প চা খেতে খেতে কাজ করতেও আরাম। আজ কথাটা পাড়া যাবে না। উঠে পড়ছে গ্যাসের সঙ্গে দুর্গাপুরের কথা, তারপর ভিলাইর কথা, বোকারোর কথা। সেই মাঝারি বুদ্ধির সুলতাও এখন বোঝে—কিছু হচ্ছে না। বুঝবে না কেন? অনেক শোনে সে এ-সব কথা দেবতোষের বন্ধুদের মুখে। শুনতে হয়। এখানে তারা আসে—বাঙালি, পাঞ্জাবি, গুজরাতি। সুলতারাও তাদের বাড়ি যায়। যেতে হয় সুলতাকেও। তবে পার্টিতে সুলতা যেতে চায় না। উনিও সুলতার যাওয়া পছন্দ করেন না। 'বিশ্রী কথা ওঠে, বিশ্রী ঘটনাও ঘটে—মেয়েগুলিও তাল রাখতে জানে না। তবু মাঝে-মধ্যে যেতে হয়। অফিসররা নিমন্ত্রণে সস্ত্রীক না গেলে কর্তারা অপমানিত মনে করেন। কিন্তু ওই একসঙ্গে যাই, চলে আসি। উনি স্পষ্টই তাঁদের বলেন, 'আমাদের বাঙালি মেয়েরা ড্রিংক করে না, স্মোক করে না, ক্লাবে যায় না, নাচে যায় না।' উনি নিজেও বেশি খান না ও-সব, যানও না ওসব জায়গায়—ক্লাবে, নাচে। ওই মানুষ,—দেখেছ তো ঘরদুয়ার কেমন গোছানো। আমারই কি বেশি করতে হয়, নিজেরই অভ্যাস ওরকম। সব জিনিসটি ঠিক শৃঙ্খলা মতো'—

সুলতা বলে যায়—ছেলেটা অত পারত না, আমি করে দিতাম। তাতেও ওঁর আপত্তি। ছোটবেলা থেকে শিখতে হবে। আচ্ছা ভাই, বল তো, নিজের শিখতে হবে বলে কি আমি মা, আমি ওকে নাইয়ে দিতে পারব না! ওর বিছানাপত্র, জামা-কাপড় কিছুই আমাকে গুছিয়ে রাখতে নেই?

সুলতার কথায় একটু অনুযোগ, কিন্তু অনেকখানি তার অপেক্ষা গর্ব—'ওঁর' নিয়ম-শৃঙ্খলা-বোধে। গর্ব করবার মতো স্বামী দেবতোষ—সেই দেবতোষ।

কিন্তু প্রতিমা আর শুনতে চায় না। না, তার দেরী হয়ে যাচ্ছে। দেরী হয়ে গিয়েছে। আজ মেনকার শাশুড়ি কথা শোনাবেই।

সুলতা বলল: কোথা যাবে? বসো। এখনো কোনো কথা হয় নি—

উনি আস্থন—তোমার তো অপরিচিত নন। কতকাল পরে দেখা হবে। হাঁ, ছাখো, কেমন আছে প্রতাপদা—কেমন হচ্ছে আলিপুরে ?

না, কিছুতেই প্রতিমা স্বীকার করবে না। বললে: ভালো—

—প্রতাপদার কিন্তু হাইকোর্টে বসা উচিত ছিল। আচ্ছা, আর লেখেন না কেন ? লেখেন ? কই দেখি না তো। এই তো এত কাগজ আসে—আমি বাংলা মাসিকপত্র ভাই সব রাখি—প্রতাপ চৌধুরীর নাম খুঁজি, পাই না।

বারো বৎসরের আগেকার প্রতাপ চৌধুরীর সেই কবিতার প্রাণ শুকিয়ে গিয়েছে। যাবারই কথা। বৎসর-দুই একটা কলেজে সে কাজ করছিল, আর প্রতিমা স্কুলে। এমন সময় আরম্ভ হল সে কলেজে বড় রকমের ছাত্র স্ট্রাইক। কলেজের ছাত্রদের প্রফেসর চৌধুরী হয়ে পড়লেন মুখপাত্র। দুমাসের মধ্যেই প্রতাপ পেল নোটিশ—মাথা নোয়াতে হবে গবর্নিংবডির কাছে। এ্যাপোলজি চাইবে প্রতাপ চৌধুরী ? দ্বিতীয় সন্তান তখন প্রতিমার পেটে। একবার বুক কেঁপেছিল। শাশুড়ি মৃত্যুশয্যায়। ননদ করেছে ফেল। দেওর দিচ্ছে আই-কম পরীক্ষা—তখনো ফি দেওয়া হয় নি। কিন্তু প্রতিমা-প্রতাপ কি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন কামনা করে বিবাহ করেছে ? সে প্রতিমা, আর ওই প্রতাপ ··যাদের নাম জীবনের খাতায় লেখা হবে ত্যাগে আর কর্মে।

প্রতাপ চাকরি ছাড়ল—প্রতিমাও ছাড়াত,—প্রতাপই ছাড়ল। তারপর ? নামকাটা প্রফেসর প্রতাপ, সেই-ই প্রতাপ চৌধুরী—কলেজের পথে আর পা বাড়াতে পারে নি। দূর দূর করে তাড়িয়েছে তাকে কাগজওয়ালারাও। টিউশনি করেছে—আইন পাশ করেছে—আলিপুরেও নয়, স্মল্‌কজ্‌কোর্টেই গিয়ে হাজিরা দেয়। কিন্তু কোথায় মক্কেল ? ভদ্র, সংকোচ-নম্র প্রতাপ চৌধুরীকে কে দেয় মোকদ্দমা ? আর কবিতা ? টাকা পেলে পুলিশকোর্টের উকিলও গল্প লেখে, খাজনার মামলার মুনসেফও কবিতা লিখতে পারে। কিন্তু টাকা না পেলে প্রতাপ চৌধুরীও শুকিয়ে যায়। বরং বাড়ে তার জেদ—বাড়ে তার দুর্জয় আত্মাভিমান, নীরবে আপনার মনে গুমড়ে-ওঠা গভীর খেদ হয়ে ওঠে দুঃখবুভুক্ষার দুর্বার সংকল্প।

সেই প্রতাপ আজ সবচেয়ে গোঁড়া বামপন্থী—প্রতিমা বোঝে প্রতাপের

বিপরীত পরিণতির জন্ত কে দায়ী। সে-ই স্বাভাবিক পথ থেকে টেনে এনে এই কবিপ্রাণকে তার স্বভাববিরোধী পথে ঠেলে দিয়েছে। আজ প্রতিমারই কি সাধ্য আছে বলতে পারে—'তুমি ভুল করেচ। এখন আত্মপ্রবঞ্চনা করছ।' প্রতাপই তা শুনলে প্রতিমার রক্ষা রাখবে? না, প্রতিমা শখের জীবন চায় না। তবু—তবু যদি একটা সুস্থির আয়ের জীবনযাত্রা আয়ত্ত করতে পারত তারা, পাঁচটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে, তাহলে হয়তো এখনো প্রতাপ আবার সেই আনন্দোজ্জ্বল মানুষটি হয়ে উঠতে পারে—কবি প্রতাপ চৌধুরী। আর প্রতিমা?—না, সে কিছু চায় না! ছেলেমেয়েগুলিকে যদি একটু মানুষ করবার মতো সুযোগ পায়—একটু অবকাশ, নিজে দেখে রেঁধেবেড়ে খাইয়ে-পরিয়ে একটু ওদের পড়া শেখাবার মতো সময়—আর আরও একটু সংগঠনে কাজ করতে পায়—

প্রতিমা বলে: কবিতা আর লিখতে চান না। বলেন, 'তাতে মানুষের কি হবে?'

সুলতা বলে: মানুষের আবার কবে কী হয়? তা বলে কবিতা লিখবেন না? তুমিই বা করো কি? লিখতে বলো না। কবিতা না লিখুন ভ্রমণ-কাহিনী লিখুন। এই তো ছাখো, কেমন চমৎকার চমৎকার ভ্রমণকাহিনী লেখা হচ্ছে। তুমি পড়েছ দিলীপ দাসের, 'বসন্তকের', 'লোপামুদ্রার' লেখা—কী আশ্চর্য আশ্চর্য কথা।

প্রতিমা কিছু পড়েছ, সব সে পড়বে কি করে? সময় কই? স্কুলে পাঁচশ মেয়ের ঝামেলা, আর বাড়িতে ফিরতেই পাঁচটার দস্যিপনা—

—আমার কিন্তু খালি-খালি লাগে বাড়িতে—

সুলতা তার ছেলেমেয়ের কথা বলতে লাগল।

বিকাল গড়িয়ে গেল।

প্রতিমা বলল: এবার উঠি লতাদি। তারপর বললে, তুমি একদিন এসো আমাদের ওখানে।

যাব। আচ্ছা বসো না। আর আধঘণ্টা। উনি তো গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজ ওদের বোম্বাই আপিসের কর্তা এসেছেন। একটা কন্‌ফারেন্‌স্‌ আছে। আমি যেন গাড়ি নিয়ে বেবিদের স্কুলে যাই। চলো। এক সঙ্গেই বেরুব। কিছু দেরী হবে না।

দেবতোষের সঙ্গে দেখা হল না তাহলে। না হওয়াই ভালো। তবু একটা কৌতূহল—কি করে প্রতিমাকে দেখে দেবতোষ?

প্রতিমা বললে: আমি বাসে চলে যাব।

—বাসে যাবে কেন? ··আমি পৌঁছে দেব—গাড়ি আছে।

প্রতিমা বিব্রত বোধ করল। গাড়িতে! কাজ কি? আমি বাসে যাচ্ছি।

সুলতা ততক্ষণে প্রস্তুত হবার জন্য কলঘরে চলে যাচ্ছে।—কেন? আমি পৌঁছে দোব।

অপরাহ্ণ তখন ম্লান। সুলতা বললে: ওঠো।

প্রতিমা মরীয়া হয়ে বলল: আমার বাড়ি মধ্য কলকাতা। তুমি যাচ্ছ লান্সডাউন রোড-এ। কেন মিছামিছি ঘুরবে।

—কেন, সে আমি বুঝব। এখন ওঠো।

প্রায় ঠেলে প্রতিমাকে গাড়ীতে তুলে পাশে বসলো সুলতা—ড্রাইভারকে বললে—ত্বাখো, বউ বাজারের বদন চন্দ লেনে চলো।

প্রতিমা বললে, বউ বাজারই যথেষ্ট হবে—গলিতে ঢুকতে হবে না।

সমস্ত অন্তর তার প্রার্থনা করতে লাগল—না, কিছুতেই না। তার বারো বৎসর আগেকার সেই গলির মধ্যেকার ষাট টাকা ভাড়ার ঘর দুটো যেন সুলতা কিছুতেই না দেখতে পায়। কিছুতেই না, কিছুতেই না। লজ্জা-নিবারণ হরি—নাস্তিকের বিধাতা—প্রতিমাকে রক্ষা করো, রক্ষা করো—রক্ষা করো—

বিকালের ভীড় বাসে, ট্রামে, পথে—মেনকার বাড়িতেও এভাবেই যেতে হয় প্রতিমাকে—এখন প্রতিমা তার থেকে মুক্ত—সুখে গাড়িতে চলেছে! চলে আরাম আছে, স্বস্তি আছে, আনন্দ আছে।—জীবন যে 'গতি' তা বোঝা যায়। জীবন শুধু ভীড় নয়, ধাক্কাধাক্কি নয়। ইতরের মতো পরস্পরের দেহের লাঞ্ছনা নয়! প্রতিমা পাঁচ সন্তানের মা শুষ্ক—ধাক্কাধাক্কি থেকে যদি একটু মুক্তি পেত—অন্তত বাস-ট্রামের এই নির্লজ্জ বুকে পিঠের চাপের থেকে। এত আরামে বসেছে প্রতিমা যে আরামেও স্বচ্ছন্দ হতে পারছে না। সুলতার দিকে তাকিয়ে দেখল—গাড়ির কর্ত্রীর মতো সে নিশ্চিন্তে আরামে হাত ছড়িয়ে বসে আছে।··· এমনি বসতে পারত প্রতিমা—এই গাড়িতেই—দেবতোষের গাড়িতে—দেবতোষের বাড়িতেও—দেবতোষের শয্যায়—বুক ঠেলে কী একটা উপরে উঠছে। গলার কাছে একটা কী বেঁধে আছে—কান্না?

প্রতিমা বললে : থামাও। নাম্‌ব এখান থেকে এক মিনিট গলির মধ্যে। আমি যাচ্ছি।

সুলতা ড্রাইভারকে বললে বাঁএর গলিতে নিয়ে চলো, প্রসাদ।

প্রতিমা আহতের মতো বললো : না। তোমার দেরী হচ্ছে, লতাদি।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা। গাড়ী গলিতে ঢুকছে। ঢুকল। এই তো প্রতিমাদের বাড়ী—গাড়ী ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যাক্। প্রতিমা দেখাবে না তার বাড়ী।

—কোথায় ? জিজ্ঞাসা করে সুলতা।

ফেলে এসেছে।

আবার পিছিয়ে চললো গাড়ী। প্রতিমাকে বলতেই হল প্রসাদকে : দাঁড়ান।

নামতেই পিছনে পিছনে নামল সুলতা।—প্রতাপদা'কে দেখে যাই।

—তিনি আসবেন সেই সন্ধ্যার পরে।

বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল গুটি তিন ছেলেমেয়ে—কার গাড়ীতে মা এলেন ?

সুলতা বললে : এই বুঝি তোমার সেই দস্যিরা, না, প্রতিমা ? চলো, চলো, চলো।

টিফিন কেরিয়রের বাটি হাতে নিয়ে ছেলেদের হাত ধরে সুলতা ঘরে ঢুকে পড়ল। 'বাইরের ঘর' অর্থাৎ খান তিন চেয়ার ও একটি জীর্ণ টেবল আছে উকিলের বৈঠকখানায়। এক পার্শ্বে মলিন তক্তাপোষ, রাত্রিতে সম্ভবত তাই কবি প্রতাপ চৌধুরীর শয্যা। ভেতরের ঘরে সে সবও নাই—মেজ আর মাদুর, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নাতি-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড়। শৃঙ্খলার বিশেষ চেষ্টা নেই, হয়তো সম্ভবও নয়।

এই ভাবেই ফেলে গিয়েছে প্রতিমা ঘুর-দুয়ার স্কুলে যাবার সময়। দেরী হয়ে গিয়েছিল বরং বড় মেয়েটা মায়ের দেরী দেখে আজ একটু তা সামলেও রেখেছে। সে কাজ শিখেছে। সন্ধ্যায় সে আর বাবা মিলেই বাড়ি সামলায়।

সুলতা উঠে বলল—বেশি বসব না ভাই—ওদিকে তো বেবি অপেক্ষা করছে।

এক পেয়ালা চা খাও, লতাদি। কিন্তু সন্দেশ বন্ধ। মরীয়া হয়ে প্রতিমা হাসল।

—বেশ হয়েছে। কিন্তু চা আজ নয়, তুমি বিশ্রাম করো। চায়ে বিদায় হব না। আরেকদিন এসে দুপুরে খাব, প্রতাপদা শুদ্ধ আড্ডা জমাব।

আরও দু'বার বলল প্রতিমা। তারপর মেনে নিল।

—সত্য বলছ?

বেশিবার 'সত্য' বলতে হল না। প্রতিমা গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে তবু আরেকবার বললে: মনে থাকবে—আবার আসছ?

—দেখবে আসি কিনা।

গাড়ী চলে গেল।

প্রতিমার দুই চক্ষু অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল তার পিছনে-পিছনে। অপমান। অপমান। শুধুই অপমানের জন্য এই বাড়ী পর্যন্ত আসা। ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই দেবতোষকে বলবে—কী দেখে এসেছে—প্রতিমার সংসারে। সেই হিসাবে দেবতোষ আর মাঝারি বুদ্ধির স্থূলতা—

চোখে আগুন নিয়েই ঘরে ঢুকল প্রতিমা। তারপর একেবারে ভেতরের ঘরে মাদুরের উপর লুটিয়ে পড়ল—ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল কেন? কেন? কেন? তিন বছরের ছোট মেয়েটা মাকে টানছিল মা, মা।

হঠাৎ পাগলের মতো উঠে প্রতিমা তাকে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল। মেয়েটা কেঁদে উঠল চীৎকার করে।

ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে প্রতিমা তাকে তুলে নিয়ে সবলে বুকে চেপে ধরলে। প্রতিমার দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল—এই প্রথম। প্রথম অশ্রু প্রতিমা-প্রতাপের জীবনের খাতায়—অগ্নি আঁখরে যা আবার লেখা হবে। প্রতাপ লিখবে—আর প্রতিমা? লিখবে—রক্তে, শ্রমে শ্রান্তিতে অশ্রুতে—অশ্রুতেও—তবু লিখবে॥

অমিয়ভূষণ মজুমদার

এপস্ অ্যাণ্ড পিকক্

এখন বেতের চেয়ারের উপরে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছে সৌম্য, কুনুই দুটো উরুর উপরে রাখা। হাত দুটো এইমাত্র অনেক কথা বলেছে, যার সঙ্গে মুখের কথার মিল ছিল না। অন্তত তাই ধারণা হচ্ছে এখন ক্রমশ। অন্তত এই শেষ দু'মিনিট ধরে; আর তারই প্রমাণস্বরূপ যেন সে লক্ষ করছে; হাতের তেলো দুটো যেমন লাল, আঙুলগুলো তার তুলনায় অনেক বিবর্ণ।

হাসল সৌম্য। বলল, "স্বয়ং রবিঠাকুর খেদ করে বলেছেন কাছাকাছি একটা ভদ্রগোছের ভালুকও ছিল না। বর্তমান জীবন এমন ঘটনাহীন যে তাকে ঘোলা জলের ডোবা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।" এই বলেই সৌম্য থামল। আর তার নিজের কাছেও কি পানসে লাগল হাসিটা?

শমিতা সৌম্যের মুখের দিকেই চেয়েছিল। সে লক্ষ করল সৌম্যর চোখের প্রান্ত দুটিতে এলোমেলো কয়েকটা কোঁচকানো দাগ পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে সেটা কি রসিকতার চেষ্টার ফল, অথবা—। অথবা প্রকৃতপক্ষে সৌম্যকে সে যত তরুণ মনে করে নিয়েছে তা হয়তো নয়। আর ভেবে দেখো কেমন বদলে যায় সেই পরিচিত বসবার ঘর। এখন কটা বাজে কে জানে, অনেকক্ষণ থেকেই বিকেলের আলোটার যেন পরিবর্তনই হচ্ছে না। যদিও এটা ভাবা অযুক্তির হবে যে সূর্য হঠাৎ কোথাও থেমে দাঁড়িয়েছে, অথবা আরও আধুনিক ভাষায় পৃথিবীটার পাক খাওয়াতে ঢিলেমি লেগেছে।

সৌম্য উঠে দাঁড়াল, ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বুককেসের মাথায়, টেবলে, দেরাজে কি খুঁজল, ফিরে এসে চেয়ারটাতেই বসলো আবার।

শমিতা বলল, "তুমি কিছু খুঁজছো?" সে গালের তলায় হাত দিয়ে ঝুঁকে ছিল, সোজা হয়ে বসল এবার। "ও, এই যে," সৌম্য বললে। সামনের টিপয়ের উপর থেকে সিগারেটের কেসটাও তুলে নিল সে। যেন সে সেটাকে খুঁজছিল। সিগারেট কেসটাকে পকেটে রাখল সৌম্য যেন বেরুবে এখন।

কিন্তু চেয়ারের পিঠে হেলান দিল বরং। বলল, "মালার্মের কথা বলেছিলে। এখন কি তা হবে?"

শমিতা অনুভব করল শিষ্টতার মত কিছু যেন, গত পাঁচ মিনিটে এই দু বার হল না? রবিঠাকুরের ভদ্রগোছের ভালুকের কথা শুরু করে মালার্মে উচ্চারণ করল সৌম্য এবার।

শমিতা লক্ষ করল সৌম্যর হাতের আঙুলগুলোকে রক্তহীন দেখাচ্ছে। নখগুলো সুন্দর, ম্যানিকিওর করা যেন। তা সত্ত্বেও আঙুলগুলোর বিবর্ণতা চোখে পড়ছে। আর কাঁপছেও যেন সেগুলো।

শমিতা মনে মনে বলল, "আ সৌম্য, তুমি হয়তো কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজছো। কিন্তু নাটক নভেলে ঘটনার কারণ খুঁজতে হয়, কোনো ঘটনাকেই হঠাৎ আনলে পাঠক সেটা মেনে নেয় না, আর সব চাইতে ভালো হয় যদি ঘটনাটার বীজ চরিত্রে নিহিত থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নাও হতে পারে। বরং মেনে নাও ঘটনার পিছনে কারণ নাও থাকতে পারে।"

শমিতা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করল, "তোমাকে একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে না?"

"বরং—।" বলল সৌম্য

আর তারপর সে ভাঁজ করা হাতের মণিবন্ধে চিবুক রাখল। এই প্রথম। এটা গভীর করে চিন্তা করার ভঙ্গি তার, শমিতার চাইতে তা আর কে বেশি জানে:

শমিতা ভাবল, "যদি তা বল তবে একটা ঘটনাকে টেনে টেনে অন্য যে কোনো ঘটনার সঙ্গে যোগ করে দেয়া যেতে পারে। কানাডার সেই এম. পি. যে খেতাব ফিরিয়ে দিয়েছে তার সঙ্গেও যুক্ত করে দেয়া যায়। আর সে ঘটনাটার কথা আজকের কাগজেই আছে। বিটলদের সঙ্গে সে ব্রাকেটেড হতে চায় নি। কিন্তু তা কি এক রকম আতিশয্য নয় মনস্তাত্ত্বিকতার?"

শমিতা উঠে দাঁড়াল। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আর ফুলে ফুলে ময়ূরের মতো চঞ্চল গুলমোরটাকে দেখতে পেলো সে। কিন্তু তক্ষুণি সে সরেও এলো। সৌম্যর চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল, একটু তাড়াতাড়ি করে বলল, "চা করি এখন—তাই নয়।"

অদ্ভুত ফাঁকা শোনাল তার প্রস্তাব?

"কিন্তু কখনও কখনও মনের সূক্ষ্ম চিন্তাকে অবহেলা করতে হয়।" এই ভাবল শমিতা। "হ্যাঁ, এটাকে সে অন্তর থেকেই বিশ্বাস করে। জয়েস পড়তে

এবং পড়াতে সেটাই তার এক নম্বর আপত্তি। এমন কি চিন্তাশীল জেনকে যদি চেতনা তরঙ্গে যুক্ত কর, চরিত্রই লোপ পেয়ে যাবে। অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের যা পড়িয়েছি তাতে চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়েছি, তাই নয়!

"তবে ইদানীং আমার মত বদলেছে। কিংবা মতটা আগেই ছিল এখন তাকে বিবৃত করতে পারি। সংক্ষেপে, চরিত্রকেই একমাত্র মনে করা ভুল। এবং এমন কি একটা ঘটনা ঘটিয়ে চরিত্র এঁকে ফেলা কৌশল হতে পারে, কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না চরিত্রটা স্থির কিছু হয়ে মানুষটার গায়ে এঁটে বসল চিরকালের জন্যে। অন্যদিকে চরিত্র, ঘটনা সংস্থান, কাব্য সব মিলেই নাটক।"

শমিতা বলল, একটু জোরে বেশ স্পষ্ট করেই বলতে পারল সে, "চা করেই আনি। আর তারপর মালার্মেও শুনব। প্রস্তাবটা আমি করেছিলাম, আজ বিকেলেই করেছিলাম। আর লক্ষ কর যদি, সেই বিকেলটাই এখনও রয়েছে।"

বেশ দৃঢ় পদক্ষেপ করে করে শমিতা পাশের ঘরে চা করতে গেল। স্টোভ ধরাল সে। একটু কাৎ করে মাথা বার্নারের সমতলে এনে পিন করল। কেটলি বসাল। ছোট রেফ্রিজারেটারটা খুলল। এখন সময় নয়, তা হলেও কিছু দেবে সে সৌম্যকে চায়ের সঙ্গে। রেফ্রিজারেটার বন্ধ করে সে ফিরে এলো চায়ের টেবলের সামনে। স্টোভটা টেবলে বসানো। দাঁড়িয়ে কাজ করতেই পছন্দ তার। চায়ের ক্যাডি, কাপ প্লেট, চামচ, ছাকনি টেবলের উপরেই ছিল। সেগুলোকে সাজালো শমিতা টেবলের উপরে। তাদের প্রত্যেকের পৃথক আকৃতিগুলোকে লক্ষ করে করে দেখল। স্টোভে সাইলেন্সার দিলেও শব্দ হয়। সে শব্দটাও, তা ক্ষীণ হলেও, শুনতে পেলো শমিতা। যেন মনোযোগই দিল সেদিকে।

খুক্ খুক্ করে কাশলো যেন কেউ। আচ্ছা? তা হলে—। অবিশ্বাস আর স্বস্তির মাঝামাঝি এনে শমিতার মনে এই শব্দ কয়েকটি। পায়ের থেকে ফেল্টের নিঃশব্দ চটিটা খুললো সে। ঠিক পা-টিপে চলা নয়, সেটা কি যুক্তিসঙ্গত হবে? শব্দ যাতে না হয় এমন ভাবে চলে চলে বসবার ঘরের সামনের বারান্দায় এলো ঘরে না ঢুকে। নিচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নেয়ার ভঙ্গিতে আবার সে উঠে দাঁড়াল। এবং তারই মধ্যে সে দেখেও নিতে পেরেছে। সৌম্য সিগারেট ধরিয়েছে—এতক্ষণে। আর তার চেয়ারের পাশের বেতের টেবল থেকে একটা কিছু তুলেও নিয়েছে—হয়তো খবরের কাগজটাই

আবার, অথবা জর্ন্যাল, অথবা—সে যা কিছুই হক। কিছু একটা যে তাই যথেষ্ট।

চায়ের স্টোভের কাছে ফিরে এলো শমিতা। ছোট একটা বেতের চেয়ার এ ঘরেও আছে। শব্দ না করে সেটাকে তুলে আনল সে টেবলের কাছে। একটু বসে নেবে সে। চায়ের জল হতে হতে এবং চা ভিজিয়েও খানিকটা চিন্তা করে নিতে পারে—অবশ্য, এটাকে এমন দুশ্চিন্তার বিষয় করা কি উচিত হচ্ছে ?

ব্যাপারটা যে ভাবে ঘটলো পর পর দেখে গেলেও হয়। ঠোঁটের কোনে একটা আঙুল রেখে, তার ডগাটাকে কোমল করে দাঁত দিয়ে চেপে ধরল সে। লোকে বলেছিল: প্রত্যয় করা কঠিন। কেউ বললো শিব-শিবানি, অন্য কেউ বলল ম-ঝুস্‌ৎ, অন্তত একজন বলেছিল রবিঠাকুরের লাবণ্য-অমিত। লাবণ্য-অমিত রবিঠাকুরের প্রচণ্ড কৌতুক কিনা এ নিয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, অথবা ম-ঝুস্‌ৎ এই যৌগ শব্দটি একটা অপপ্রয়োগ—তা হলেও ভাবটা বোঝা যায়। এ সবই তাদের বিয়ে নিয়ে। যারা উত্তেজিত হয় নি তারাও ঠাণ্ডা খুশিতে বলেছিল বিধিকে যদি না মানো বলে। অ্যাক্‌সিডেণ্ট—যেহেতু কোনো সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না—এমন একটি চমৎকার বিয়ে। কৃশমধ্যা, পীনোন্নতা, সুগৌরী শমিতার—(শমিতার গালে লাল লজ্জা দেখা দিল, সে টেবলের উপরে চামচটার গায়ে আঙুল ঘষল, সে জানে তার বাস্টটা এত ভালো যে সিনেমা অভিনেত্রী বলে দু একজন ভুল করেছে।) আর সৌম্য, নর্ডিক বলতে ঝোঁক আসে। কিন্তু নর্ডিক বলতে আমরা জার্মানদেরকেই বুঝি, আর তার বেশ একটু গাঁট্টাসোট্টা। বরং ভরতকে, ভরতচন্দ্রকে নর্ডিক বলা যায়: বিয়ের সময়ে খাটুনিখাটা, এমন কি কনের পিঁড়িধরা, অন্যদিকে পুলিশের সাব-ইন্‌স্‌পেক্টরের চাকরি করা—এ সবই ভরতচন্দ্র তার নর্ডিক গড়ন নিয়ে বেশ সমাধা করতে পারে। সৌম্যকে কি বলা যাবে ? কিছু বলা দরকারই বা কি ? একটু দোহারা সোনালি রঙের শরীর; চোখে চশমা বটে, তাতে চোখের দীপ্তি ঢাকা পড়ে না। ইণ্টেলেক্‌চুয়্যাল কথাটা দিয়ে শমিতা চিন্তা করে, বাংলা ভাষার প্রতিশব্দগুলোকে তেমন শানানো মনে হয় না। বাকি থাকে অর্থ: উচ্চ মধ্যবিত্ততায় অভ্যস্ত সৌম্য নিজেও এডুকেশন সার্বিসের ক্লাস ওয়ান অফিসর। শমিতা এখনও ক্লাশ টু বটে, ডক্টরেটটা হলে সেও প্রোমোশন পাবে—এটা ধরে নেয়া যায়। দু বছর হল তারা সংযুক্ত হয়েছে।

শমিতার ডক্টরেটটাই তাদের প্রথম সন্তান হবে। ইতিমধ্যে তারা অত্যন্ত লম্বা গড়নের সাদা লালে রঙানো একটা অটো কিনে ফেলেছে। [অটো মানে যাকে আমরা মোটরগাড়ি বলি।] কিন্তু আসল অথচ ছোট্ট একটা কথাও আছে। বিয়ের কথা যখন অগ্রসর হয়েছিল তখন দেখা হয়েছিল সেমিনারে। পরবর্তী বক্তার নাম যখন ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হল তখন সেই পরিচিত নামটি দেখে শমিতা ভেবেছিল ফাঁকি দিয়ে দেখে নেয়া যাবে মানুষটাকে। সৌম্য যখন উঠে দাঁড়াল তখন শমিতা লাল হয়ে উঠেছিল। সে কি খুশিই হয়েছিল! যা সে কল্পনা করেছিল তার চাইতেও ভালো। কিন্তু ব্যাপারটা একতরফা হয় নি। সৌম্যও সুযোগ পেয়েছিল। তার একজন সহকর্মী স্টেশনে দাঁড়িয়ে বলেছিল—ইনি শমিতা রাহা, আমাদের নতুন অধ্যাপিকা। সৌম্য, এত ভালো বক্তা সৌম্য, নির্বাক হয়েছিল। শমিতা যত খুশি হয়েছিল সে কি তার চাইতেও বেশি খুশি হতে পেরেছিল। গাড়িটা চলে গেলে সৌম্য বলেছিল। "আমি সব জানি, আপনিও শুনে থাকবেন। আপনার মত বলুন।" শমিতা বলল, তার আগে তার গাল লাল হয়ে উঠল আবার, হাতের ব্যাগটাকে খুঁটতে খুঁটতে সে বলল, "আমার আপত্তি নেই।" সৌম্য বলল, "আমি আর একটু এগিয়ে যেতে চাই—সৌভাগ্য বলব আমার। আবার দেখা হয় না?" শমিতা একটু ভেবে বলল, "কাল সাড়ে ছটায় মিউজিয়ামের দরজায়।" বিয়ের কথাবার্তা পাকা করতে কর্তারা তিন মাস সময় নিয়েছিল—আর সেই সুযোগে, তাকে পূর্বরাগই বলা উচিত। ঠিক একটা স্বপ্নে দেখা ব্যাপার নয়!

কোথায় যাওয়া যায় পুজোর ছুটিতে? কারগিল, স্কার্দ, ম্যাঙ্গালোর, বাঙ্গালোর, সিমলা, অথবা উটি? এসেছে দেউগিরিতে। নামের জন্য? দুধ খাঁটি? মুরগি সুপ্রচুর? না। পিস, শান্তি। শান্তি, ধীরে ধীরে ঝরে পড়ে লিনেটের ছোট-ছোট পাখা থেকে। দেউগিরি অবশ্য একটা জায়গা, কিন্তু তাদের ইচ্ছামূলক চিন্তা এবং অনুভূতিতে গড়া দেউগিরি কোনো সারভে ম্যাপেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথবা শমিতার শরীর কি সসাগরা একটা মহাদেশ নয়? কিম্বা সৌম্যের প্রশস্ত উঁচু কপাল কি হিমালয়ের কোনো চূড়ার মতো নয়। খানকয়েক মাত্র বই এসেছে, মাত্র খানকয়েক।

গেটের পাশে বিলেতি গাবগাছ। ছোট একটা বাগান, তারপরেই বাংলো ধরনের লাল রঙের বাড়ি। বাগানের কোণে গুলমোর। বাসায় ঢুকবার দরজার পাশে দেয়ালে উঠেছে এমন একটা লতা। শমিতার ধারণা সেটা

আঙুরলতা, যদিও সেটাকে একটু শুকনো দেখাচ্ছে। 'আঙুর' এই শব্দটি অনন্য নয়? আঙুর, দ্রাক্ষা, গ্রেপ,—সব কয়েকটি শব্দ সুশ্রাব্য, সুস্বাদ; এমন কি ক্রিপারের মধুর উচ্চারণ যথেষ্ট নয়, ভাইন। শমিতা আর একটু এগিয়ে যায়, দক্ষিণ ফরাসী দেশের, বিশেষ করে প্রোভেন্সের কথা নাকি তার মনে আসে।

ঠিক যেন রবিঠাকুরের সাজানো গল্প!

কিন্তু এ কথাগুলো এখন মনে হচ্ছে কেন? টিপটে চামচ মেপে চা দিতে গিয়ে হাতটা একটু কাঁপল শমিতার। দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু করতে গিয়ে প্রথম অঙ্কের সার উদ্ধার করার মতো—অথবা, ডাক্তারের হাতের হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের মাথা থেকে শেষ বায়ু-বুদ্বুদের সঙ্গে ওষুধের প্রথম কিছু গড়িয়ে পড়লে ছোট্ট এক টুকরো ভয়ে চোখের পাতা যেমন বার দুয়েক কেঁপে ওঠে তেমন করে কাঁপলো শমিতার চোখের পাতা, অথবা কি কি ঘটে ঘটে শেষে এই চূড়ান্ত ঘটনায় পৌঁছুলো তারা তারই হিসাব নিচ্ছে সে? ছি ছি। কেট্‌ল থেকে টিপটে জল ঢালল শমিতা। বাষ্পটা চায়ের সুগন্ধ বহন করে উঠে এলো টিপট থেকে। হঠাৎ এক বিন্দু জলের মতো কিছু টলটল করে উঠল শমিতার চোখের কোণে।

এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে যদি তা হয় প্রায় স্বগতোক্তির মতো এই সুনির্দিষ্ট চিন্তা করল সে। অথচ প্রায় রোজনামচা লেখার মতো করে গুছিয়ে উঠছে তার মনের মধ্যে ঘটনা পরম্পরা।

আয়নার গোড়ায় চিরুনি রেখে শমিতা শোবার ঘর থেকে বসবার ঘরে এলো। এদিক ওদিক চাইতে টিপয়ের উপরে চোখ পড়ল। সিগারেট কেস নেয় নি সৌম্য। প্রাচীন হাতির দাঁতে যেমন শমিতার ব্যক্তিত্বে যেন তেমন ফাটল দেখা দিল। গৃহিনী শমিতা ভাবল: তা ভালোই সিগারেট কম খাওয়া। ক্যানসার ট্যানসার কি সব বলে। কথাটা কি দিদিমার কাছে শেখা—ষাট, বালাই! অন্য শমিতা ভাবল: নতুন প্যাকেট ছিল বোধহয় দেরাজে। সে টিপয় থেকে সিগারেট কেসটা তুলে নিয়ে ঘ্রাণ নিল। পরিচিত সুগন্ধ। অথবা ম-ক্লুস্‌ৎ হলো না: সৌম্যর সুঘ্রাণ যৌগিক, তার একটা উপাদান এই টার্কিশের পরুষ-সুগন্ধ।

ঘড়িতে দেখল শমিতা সাড়ে ন'টা বাজে। ধারাহীন পরকলার চশমাটা চোখে দিয়ে ইজি-চেয়ারটায় বসল সে। একটা পত্রিকা টেনে নিল সে জর্নালের টেবল থেকে। হাতলের উপরে পা তুলে দিল সে। আর তখন

আমাদের চোখে পড়ল তার দুধে আলতা রঙের বাঁ পায়ের ডিমে প্রায় এক বর্গইঞ্চি মাপের বৃত্তাভাসের মতো কালো একটা জড়ুল আছে।

পত্রিকার পাতায় চোখ দিয়ে বা হাতের একটা আঙুলে গলার সরু হারটাকে পাকাতে লাগল শমিতা। কবোষ্ণ সুখের প্রবাহ যেন তার শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে। অবশ্য সেটা, ডাক্তাররা জানে, সেটা তার সুস্থ রক্তের প্রবাহই যা বহুমুখে সুজীর্ণ, সুস্বাদ ব্রেকফাস্টের থেকে এখন বল সংগ্রহ করছে।

আর ঠিক তখনই পাখিটা ডেকে উঠল। অবিকল যেন পাখি। শমিতার মুখে একটা হাসি দেখা দিল।

ঠিক এ সময়েই বারান্দায় জুতোর শব্দ হলো। যেন আঙুলের ডগায় ভর করে এমন লঘু পদক্ষেপে ছুটে এলো শমিতা দরজার কাছে। তার কি পায়ের শব্দ চিনতে এখনও ভুল হতে পারে! হাতের পোর্টফোলিও স্ফীতোদর।

সৌম্য বলল, "দেখো কি এনেছি, বালা।"

শমিতা পোর্টফোলিও ব্যাগটাকে দু হাতে বুকের উপরে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু তা দু এক পলকের জন্য। তারপরই এক হাত দিয়ে সৌম্যর হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল চেয়ারের কাছে। তাকে চেয়ারে বসিয়ে ব্যাগটাকে রাখলো টেবলে। তোয়ালে আনলো। কপালটা মুছিয়ে দিল। কপালের উপরে কয়েকটি চুল গুছিয়ে দিল আর তাতেও সবটুকু হলো না।

আর সৌম্য বলল: রোজ সংগ্রহ কিম্বা শীকার ভালো হয় না। আজ আমার সৌভাগ্য উদয় হয়েছে। এই বলে সে পোর্টফোলিও ব্যাগ খুললো। বলল, হে ললনে, দেখো এই কুরিয়ার, এই লুমিনিতের সাহিত্যসংখ্যা, হে বীরজায়া দেখো এই টাইমস্ লিট্যারারি সপ্লিমেণ্ট, এই রিভ্যু অব রিভ্যুস। অয়ি সুভগে তোমার জন্য বাংলা পত্রিকা অমৃত ও দেশ একই সঙ্গে সংগ্রহ করেছি, কারণ আফটার অল অথবা অ্যাবভ অল বলব?—তুমি বাঙালি মহিলা। আর এইগুলি দেখো মায়ের চিঠি, মাসীর চিঠি, এটি কোন ভরতচন্দ্রের কাড, বন্ধু নাকি?—মনে পড়ছে বরযাত্রীদের তত্ত্বতাবাস করেছিল যে পালোয়ান সেই বোধ হয়—আর এই মূল্যবান চেহারার খামখানা এটা তোমার এয়ারকণ্ডিশানিং-এর এষ্টিমেট এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

শমিতা বলল: হে বীরশ্রেষ্ঠ, আপনার যে দক্ষিণ বাহু একই কালে

মৃণালের মতো সুখস্পর্শ এবং মহাভুজঙ্গের মতো শত্রুপীড়ক তা আমাকে সতত রক্ষা করুক।

এই বলে শমিতা খিলখিল করে হেসে উঠলো।

সৌম্য বলল: এর আর পর নেই।

কিন্তু—দেখো এরই মধ্যে দেরি হয়ে গেছে। ট্রের উপরে তাড়াতাড়ি পেয়ালা-পিরিচ চামচ, ছাকনি, টিপট গুছিয়ে নিল শমিতা, কেক্ প্যাটির ছোট একটা রেকাবি। তাড়াতাড়ি হেঁটে বসবার ঘরে ফিরে এলো সে। শব্দ করে টিপয়টাকে টানল সে। ট্রেটা রাখতেও মৃদু একটা শব্দ হলো। হাত কাঁপিয়ে হাতের চুড়িগুলো গুছিয়ে নিল সে শব্দ করে করে একটু জোরালো গলায় বললে—'চা এনেছি।'

এই শব্দগুলোর ফল ভালোই হবে, এই ভাবল সে, বিকেলের আলোটায় কম বেশি হতে পারে। তুলনা দিলে এই শব্দগুলোকে বিকেলের এই থেমে যাওয়া সময়ের বিরুদ্ধে। কিংবা অচল নিস্তরঙ্গ সময়ের ডোবায় দাঁড় ফেলা বলা যেতে পারে। আর সে লক্ষ করল সৌম্য চেয়ারের গভীরতায় ডুবে চোখের সম্মুখে খবরের কাগজটাকে মেলে ধরেছে। এটাকেই একটা পরিবর্তন বিন্দু বলা যেতে পারে। শমিতা ঘরের চারিদিকেও চাইল। বসবার ঘরের ডানদিকের দেয়ালে দুটো জানলা। সেদিকেই খাবার টেবল পাতা। টেবলে কাঁচ, ক্রোমিয়াম, পোর্সিলেনের তৈজস। তা থেকে কিছু দূরে মুখোমুখি দুখানা বেতের চেয়ার। তা থেকে আর কিছু দূরে কিছু কাঠ কিছু বেতে তৈরি ইজিচেয়ার একখানা। ইজিচেয়ার আর বেতের চেয়ারগুলোর মাঝখানে টিপয়। তার উপরে সিগারেট, দেশলাই, অ্যাসট্রে। ইজিচেয়ারটার বাঁ দিকে বেতের টেবলে জর্ন্যাল আর খবরের কাগজ। আর আজ সকালের আনা জর্ন্যালগুলোও রয়েছে।

কিছুই বদলায় নি এ কথাটা বললে সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হয় বদলেছে এটাই অন্তত মনে করা হয়েছিল। তা না বলো, টিপয় টানা, ট্রে রাখা এবং চুড়ি গোছানোর শব্দ যেমন তেমন এই জিনিসগুলোর পরিচিত আকৃতিগুলোকে হঠাৎ যেন অবলম্বন করার মতো কিছু মনে হলো, চা করতে উঠে যাওয়া, চা ভিজিয়ে ফিরে আসার রোজকার মতো ঘটনাগুলো যেমন।

শমিতা বলল, "চা দিয়েছি। আর প্যাটিগুলোকে পরখ করে দেখবে নাকি?"

সৌম্য মুখের সামনে থেকে কাগজটাকে সরাল। শব্দও হলো কাগজটাকে সরাতে যেমন হওয়া স্বাভাবিক। জর্ন্যাল-টেবলে আলতো ভাবে ভাজ করা কাগজটাকে ফেলে দিয়ে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই চায়ের কাপটা তুলে নিলো। আর তা দেখে শমিতার মনে হলো ভালোই হয়েছে তা হলে চা করতে যাওয়া।

সৌম্য বলল, "কাগজে সংবাদটা আবার পড়লাম।"

"কোন সংবাদ?" খালি বেতের চেয়ারটার পিঠ থেকে তুলে একটু ঘুরে এসে সেটাতেই বসল। শমিতা নিজের জন্য চা-ও ঢেলে নিলো খালি অপেক্ষমান কাপটাতে।

সৌম্য একটু সময় নিল যেন:

"অবশ্য, এমন কিছু নয়। ওটা বাড়াবাড়িই বলতে পারো। ক্যানাডার সেই এম. পি. যে চিঠি লিখেছে। এ বিষয়ে তোমার মত কি?"

"তুমি কিন্তু প্যাটি ছুঁলে না।"

সৌম্য প্যাটি থেকে একটু ভেঙে নিল। বলল, হেসে হেসে, "এটা কি সমাজে এক সময়ে চলে যাবে? বিট্‌লদের গানের কথাই ধরো।"

শমিতাও হাসলো। বলল, যেমন সে অনেক সময়ে অনেক কথা থেকে সরে আসার জন্য বলে, "যদি বলো ও বিষয়ে আমি ভেবে দেখবো।"

সৌম্য শমিতার মুখের দিকেই চাইল। তখন শমিতার মনে হলো ওভাবে কথাটা এড়িয়ে যাওয়া ভালো হয় নি। কিন্তু কি করে আবার কথাটাতেই ফিরে যাবে তাও সে ভেবে পেল না। সে লক্ষ করল সৌম্যর সোনালি মোমের মতো রগের কাছে যেন লাল কালির মতো লাল হয়ে উঠেছে। যেন অসহ্য চাপ লাগছে সেখানে। আর তারই ফলে যেন অস্বস্তি বোধ করছে সে। কিন্তু সৌম্য, সৌম্য বিটল বা বিটনিক বলে তুমি কি লঘু করতে চাইছ, যেমন পাগল অথবা মাতাল বলে উপেক্ষা করার মনোভাবটা আনা হয়ে থাকে? বিটল বিটনিক পাগল, মাতাল, সমাজে আছে—তাদেরও এদের মধ্যেই ধরে নাও, কিন্তু সে রকম বলা কি—।

না। খবরের কাগজটা তুলে নিল শমিতা। একটু চোখ বুলোতেই সে খবর পেয়ে গেল। বলল, "দেখেছো—ট্রেভেল্যানের এই বইখানার আবার বিক্রি হয়েছে। তা হলে এবার পাওয়া যেতে পারবে।" সৌম্য সাগ্রহে মুখ তুলল, যেমন হলে স্বাভাবিক হয়। রোজকার মতো হয়।

"তাই নাকি ? ইংলিশ সোস্যাল হিস্ট্রি ?"

খবরের জায়গাটাকে ভাঁজ করে সৌম্যর দিকে এগিয়ে ধরলো শমিতা। সৌভাগ্য, সৌভাগ্য !

সৌম্য বলল, "তাই তো দেখছি।"

"এবার থেকে অর্ডার দিতে দেরি করা চলবে না আর।"

চায়ের কাপটা তুলে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল সৌম্য। শমিতা সিদ্ধান্ত করলে ওর মুখের দিকে না চাওয়াই ভালো। ও যা বলবে তা বলুক। কথাটাকে ঘুরিয়ে দেয়া উচিত হবে না।—তা যদি বিটলদের কথাই হয়। কিংবা সৌম্য কি বিট্‌ল কথাটা ইচ্ছা করেই পরিবর্তে ব্যবহার করেছে। অথবা হয়তো ও দুটো ব্যাপারই সৌম্যর চোখে এক। কিছু একটা গলার কাছে অনুভব করল শমিতা। সেটাকে গিলে ফেলাই ভালো ; কিন্তু তা যদি কান্না হয় ? না না। আরও ক্লেদাক্ত হয় না তা হলে।

চা খেলো সৌম্য, সিগারেট ধরালো। হাতের তেলো দুটো একটার গায়ে অন্যটাকে লাগিয়ে ম্যাটিংএর দিকে চেয়ে রইল।

শমিতা বলল, "আচ্ছা, শোন, একটা কথা কি, বলছিলাম—"

হঠাৎ যেন একটা অপরিসীম ব্যথার ছাপ পড়ল সৌম্যর মুখে।

আর শমিতা বরং খবরের কাগজ দিয়ে মুখ আড়াল করল।

আবার কি তাকে আড়ালে থেকে নিজের জীবনের ঘটনাগুলোকে অনুসরণ করে করে কারণ খুঁজতে হবে ? অসাধারণ হয়ে ওঠে না তাহলে ব্যাপারটা ! নভেল নাটকে ছাড়া তা কি কোনো নায়িকা করে ? আর তাই বা কেন—এটা একটা—এর কোনো কারণ হিসাবে কি তার জীবনের কোনো ঘটনাকেই দায়ী করা যায় ? শমিতা ভাবল : কত ঘটনার কথাই তো উল্লেখ করতে পারে সে নিজের জীবন থেকে। এই তো সেদিন—চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে হঠাৎ থামল শমিতা। আয়নায় তার মৃদু হাসি চকমক করে উঠল। আলমারিতে বাক্সে শোয়ানো আঙুরগুলো থেকে নিটোল একটিকে ছিঁড়ে নিল সে। দু-হাতে তেলোর মাঝখানে রেখে যেন তার সুখদায়ক স্পর্শকে অনুভব করল। তারপর দু-হাতের চাপে হঠাৎ সেটাকে ফাটিয়ে দিয়ে রসে ভেজা হাতের তেলো দুটোকে চোখের সম্মুখে মেলে ধরল। সে কি আশা করেছিল তার তেলো দুটো রক্তের মতো লাল অথবা চাঁপার মতো সোনালি হয়ে উঠবে ? আগ থেকে মন

ঢেলে হাত ধুয়ে ফেলে সে আবার চুল আঁচড়াতে শুরু করেছিল। লাল হয়ে উঠেছিল তার মুখ। এই দুঃসাহসিক রোমান্টিকতা অথবা যৌবন-প্রমত্ততার মধ্যে কি দুর্বলতা ছিল? কিম্বা আজ সকালের সেই ঘটনাটা—ইজিচেয়ারের হাতলে পা তুলে দিয়ে সে জর্ন্যাল পড়ছিল। আর ঠিক তখনই পাখিটা ডেকে উঠল। অবিকল যেন পাখি। সেই দ্রাক্ষানিঙড়ানোর সকালেই প্রথম কানে এসে থাকবে। কিন্তু দু-একদিন আগেই শমিতা বুঝতে পেরেছিল সেটা আসলে শিস। (যাকে চলতি কথায় সিটি বলে। কথাটা উচ্চারণ করতে অসুবিধা বোধ করে শমিতা।) বাংলোটার সামনেই বাগান, কিন্তু ডানদিকের রাস্তাটা আর ঘরের দেয়ালের মধ্যে চার-পাঁচ হাত জমিও নেই। সেই রাস্তায় এই সময়েই কেউ জোর শিস দেয়, অজ্ঞাত পাখির ডাকের মতো, কিন্তু তীব্র। খাবার টেবলের ও-পাশে, কাঁচের জানালা দুটোর পরেই রাস্তা। দু-একদিন আগেই, অনুমান করে শমিতা, শিস-ওয়ালাকে দেখতেও পেয়েছিল সে, জানালার কাঁচের মধ্যে দিয়ে। কালো রঙের ড্রেনপাইপ প্যান্ট, সোনালি টি শার্ট, পায়ে নাগরা। মাথার চুল পিছনে কাঁধ, সামনে জ্র পর্যন্ত, শীতকালের কালো রেশমের টুপি হতে পারে। শমিতা পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসেছিল। আর ঠিক তখনই আজ শিসের বদলে গানের সুরটা কানে এল তার। দু-একটা কথা তারপরে আলতো গলায় আনন্দপ্রকাশ—হা-হা, অন্য কলি তারপরে তেমনি আলতো গলায় হো-হো। সুরটা তার জানলা পার হয়ে চলে গিয়েছিল। বল, একে কি তোমরা অপরিণামদর্শী প্রশ্রয় দেওয়া বলবে? তাহলে (ঠোঁটটা কাঁপল শমিতার) নিজের বাসায় ইজিচেয়ারে বসাটাও দোষের বলবে?

অদ্ভুত একটা গরম লেগে উঠল শমিতার। যেন কয়েক বিন্দু ঘাম দেখা দেবে তার কপালে। আঁচল তুলে কপালটা মুছল সে।

সৌম্য পুড়ে-যাওয়া সিগারেট থেকে আর-একটা ধরিয়ে নিল। আচ্ছা এমন করে কি সিগারেট খায় সৌম্য, বেশি খাচ্ছে না। কোথায় যেন পড়েছে সে, মনস্তত্ত্বের বইয়েতেই নিশ্চয়, পুরুষমানুষ সিগারেট সব সময়ে নেশার জন্যই খায় না। না, সময় কাটানোর জন্যও নয়। আপদে-বিপদে, ভয় পেলে, অজ্ঞাত আশঙ্কায় মায়ের স্তন্যে আশ্রয় নেয়ার প্রবৃত্তি সিগারেটকে অবলম্বন করে, অনেক সময়ে। একে কি তাই বলবে, সৌম্যের এই সিগারেট খাওয়া, কিংবা একবারই তো নজরে পড়ল। হিসাবের বাইরে একটা সিগারেট।

শমিতা উঠে দাঁড়াল। বলল, "আলোটা জ্বালি, কি বল? আলোটা জ্বালি।" তাহলে হয়তো বিকেলটা পার হতে পারে।

আলো জ্বালাল শমিতা। আর তা যেন শমিতার সহায় হল। ইলেকট্রিসিটির আধুনিকতাই যেন তার পাশে এসে দাঁড়াল।

জেদি মেয়ে শমিতা, একথা কি কেউ জানে। সৌম্য তো নয়ই। তার পরীক্ষার বিষয়গুলো কখনও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলে সে জেদের পরিচয় পেয়েছে।

সে ভাবল: আর ইতিপূর্বেই অন্তত আর একবার বিকেল থেমে যাওয়ার আগেই জীবনের ঘটনাগুলোকে হাঁটকে দেখেছে সে। সে তো একটা পরীক্ষার সূত্রপাত যার শেষ ধাপই শুধু বাকি। জেদ চাপলে যেমন হতে পারে তেমন করে ঠোঁটের কোন দুটি শক্ত হয়ে উঠল শমিতার। প্রস্তাবটা শুনে শমিতা বলেছিল, "সৌম্য, এই আচমকা সুখ এনে দেয়ার জন্যই তুমি দেবতার মতো বড়ো।" সুখটা আচমকা বটে, টমটমে ওঠার সময়ে এ-কথাটা বললেও প্রস্তুতি চলেছিল ঘণ্টাখানেকের আগে থেকেই।

প্রস্তাবটা শুনে শমিতা কোলাহল করে উঠছিল। "তুমি এত ভালো, এত ভালো সৌম্য। কিন্তু—আচ্ছা, আমরা যদি নিজের কাপপ্লেট নিয়ে যাই?"

"কিম্বা খাবারের ঝুড়ি? তাতে দোকানির আপত্তি নেই। আর মালার্মে কিম্বা বোদলেঅর অথবা দুই-ই, সে আর একদিন, কি বল?"

"আমি পোশাক পালটে নিচ্ছি; তুমি কিন্তু ছাই-নীল গ্যাবার্ডিনটা পরবে। আমি এসে টাই দেখে দেব।"

টাই বাছাই করতে যা একটু দেরি হয়েছিল। লালের জমিতে শাদা আঙুরের মোটিফটা অবশেষে পছন্দ হল শমিতার।

আর দেখ এখন কোথায় ত্রুটি ছিল? সেই টাইটাতে? অথবা কেউ যদি মালার্মে কিম্বা বোদলেঅর অথবা দুই-কেই সরিয়ে রেখে এগিয়ে যায় হাঁস-নামা জলার দিকে সেটা কি ক্লাইম্যাক্সের বীজবাহী ঘটনা সংস্থাপন হতে পারে?

এটা দেউগিরির বৈশিষ্ট্য যে এর ছোট নদীটা হোগলা আর হাতিঘাসের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যায় শহরের আধ মাইল বাইরে। সে নদীকে ঝরণার চাইতে কিছু বেশি বলা যায় না, কিন্তু তা একটা ডোবাতৈরি

করেছে। কোথাও বড় বড় ঘাস জলের উপরে, কোথাও টলটলে জল। জলের উপরে বটের ডাল নুয়ে পড়ে জল ছুঁয়েছে কোথাও। আর সেখানে নেমেছে হাঁসের ঝাঁক। প্রতিবারেই নামে, এবার কিছু আগে। এখনও খবর পায় নি শিকারীরা, অথবা বনবিভাগ কাউকে এখানে শিকারের অনুমতি দেয় না। খুব ভিড় হয় না দর্শকের তার প্রমাণ এই যে হাঁসরা ভয় পেয়ে পালায় নি, অন্তত একশ লোকের ভিড় হয়, তার প্রমাণ ছাতিম গাছের তলায় একটা ছোট শাদা ঘরে একটা ছোট রেঁস্তোরা চালু আছে।

শমিতা উঠে দাঁড়াল, পায়ে পায়ে জানলার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে গরাদটা চেপে ধরল। সে অনুভব করল রেঁস্তোরায় খাবারের ভাঁড়ারি থেকে যা সে খেয়েছে তার কিছুর সম্বন্ধে তার শরীরের খুব আপত্তি দেখা দিয়েছে। একবার লোবস্টার ডিনার খেয়ে এরকম হয়েছিল তার। আর এই শরীরের আপত্তির তীব্র অনুভবটা এই নিয়ে দু বার হল। প্রথম যখন সৌমা তার সেই সেকেলে গল্পটা বলেছিল। সে গল্পটা এখনও যেন সে শুনতে পাচ্ছে। যেন সৌম্য নাবালক-বিবাহের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি দিচ্ছে, এমন শুরু ছিল গল্পের। আর অধ্যাপক-উচিত ভঙ্গিও ছিল, ওটা বোধহয় অভ্যাসের ফল। ধনুকের কাণ্ড ক্রমশ এগিয়ে এসে ছিলার সঙ্গে মেশে, তারপর আবার বেশ খানিকটা বাঁকা হয়ে ছিলার থেকে দূরে সরে যায় কাণ্ডের প্রান্তভাগ দুটো। মনে করা যাক কাণ্ডের এই বাঁকা প্রান্তিক ভাগ দুটোকে কটি বলা হবে। আর বিবাহ, উদ্বাহ, যাই বল তার মধ্যে বহন করার ক্রিয়াটা থেকে যাচ্ছে। এ দুটো মনে রেখে গল্প শোনে। মাঝখানে দাদামশায় তার দুপাশে চোদ্দ বছরের বউ আর ষোল বছরের বর। দাদামশায়ের নাক ডাকছে। তখন বর-বধুর ইচ্ছা হল গল্প করবে। খুবই স্বাভাবিক। দিনমানের গল্প, আর রাত্রির গল্প এক নয়। কি করা যায়? দাদামশায়কে ডিঙোনো যায় না। অনেক ভেবে শুয়ে থেকেই ছেলেটি নিজের ধনুকের কাণ্ডটি দাদুকে ডিঙিয়ে এগিয়ে দিল বউ-এর দিকে। শেয়ানা বউ। সেও কটির ভাঁজে শরীরটাকে রাখল। তারপর ধীরে ধীরে ধনুকের কাণ্ডটা উঁচু হতে শুরু করল বউ সমেত। কি অসম্ভব শক্তি বুঝবে যদি শুয়ে থেকে হাত লম্বা করে একখানা মোটা গোছের বই তোলার চেষ্টা কর। প্রায় পার করে এনেছে দাদামশায়কে, কিন্তু কাণ্ডটি আর

সইতে পারল না। ভেঙে গেল, বউ দাদামশায়ের গায়ের উপরে পড়ল। ঘুমন্ত দাদামশায় আঁচ করছিলেন, অথবা এরকম ঘটনা তিনিও নিজের প্রথম বয়সে ঘটিয়েছেন। বললেন, শুধু—থোরা কুছ দেড় বা।

আর শমিতা এই গল্পের টানে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। বলেছিল, সুন্দর গল্প। কিন্তু ছেলেটার কি দোষ। কাণ্ডটাই তো ভাঙল।

দাদামশায় বলতে চেয়েছিলেন তোমার ধনুকের কাণ্ডটা যদি বউ-এর ভারে ভেঙে পড়ে বুঝতে হবে বিবাহের উপযুক্ত হতে যে ধনুক দরকার তোমার সে ধনুক ব্যবহার করতে থোরা কুছ দেড় বা।

কিন্তু হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল সৌম্যর মুখ। আর তখনই তার গল্পের উদ্দেশ্য বদলে গিয়েছিল।

জানালা থেকে সরে এল শমিতা। মনে মনে বলল, এটা একটা রগরগে কথা, একটা রংদার গল্প। তুমি কি ভাববে সৌম্য তুমি সেই ভগ্নমনোরথ কিশোর? আর এটা খাবারের দোষ নয়। ঠোঁট দুটো কাঁপল শমিতার, সে প্রশ্বাসটাকে চেপে ধরল নিঃশ্বাসের সমতা আনতে। তারা আমাকে অপমান করেছিল। বার বার। থেঁৎলে থেঁৎলে দেয়ার মতো তাদের কথা, নাচের ভঙ্গি, শিস দেয়া আর ছড়াগান আমাকে বার বার অপমান করেছিল তোমার চোখের সামনে। তুমি বলেছিলে ভদ্রলোকের সঙ্গে তেমন ব্যবহারই করতে হয়। তারা জোড়া সাপ খেলানোর মতো হাত দুটোকে হাওয়ায় নাচিয়ে নাচিয়ে, ঠোঁটের কোনে সিগারেটসমেত মাথা তুলিয়ে, ড্রেনপাইপ প্যাণ্ট আর নাগরাসমেত পা নানা কোণে কোণে ফেলে তারা নেচেছিল। তুমি অপমান বোধ করে বলেছিল কিছু, উঠে দাঁড়িয়েছিলে প্রতিবাদ করে। তখন দোকানদারই এসে বলেছিল—এদের সঙ্গে পারবেন না কেউ পারে না চলে যান। সেই হাঁসের হ্রদের ধারে, সেই ছাতিম গাছের তলায়, সেই শাদা চায়ের দোকানেই।

ঠোঁট কেঁপে উঠল শমিতার থর থর করে। তার মুখের সেই অদৃশ্য মোলায়েম কচি কচি পেশীগুলো কুঁচকে কুঁচকে গেল। এভাবেই চোখে জল নামে সাধারণত। কান দুটো পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে। আবার সেই কথাই মনে হল: কান্না বরং ক্লেদাক্ত করবে। কিম্বা কান্নাই যদি তা সব সমুদ্রের চাইতে গভীর এক কান্না হতে পারে। কিন্তু তেমন কান্না হয় না, হয় না বোধহয়।

কিন্তু সৌম্য উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। আর শমিতা তখন ভাবল, বল তোমার ওই ধনুক-ভাঙার গল্পটা কি এ-ব্যাপারে অর্থবহ হয়ে ওঠে না। তা কি গল্প মাত্র থাকে? তার চাইতে সৌম্য আমাদের ফিরে যাওয়াই ভালো। কিম্বা দেউগিরিতে আর নয়! চল ফিরে যাই, চল। কিছু না বলে ফিরে যাই চল।

সৌম্য শোবার ঘরে গিয়ে আলো জ্বালল। বুককেসটার সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। না, এখন আর সে সিগারেট খাচ্ছে না। বরং পিয়ানোতে আঙুল চলার মতো সাজানো বই কয়েকটির পিঠের উপর দিয়ে আঙুলগুলো চলে চলে বেড়ালো সৌম্যর। তারপর সে একখানা বই টেনে নিল। না, এখন আর সে সিগারেট খাচ্ছে না। যদিও মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যাটা সত্যও হয় অনেক ক্ষেত্রে সিগারেট সম্বন্ধে। এটা ভালোই হবে যদি বই-এর জগতে সৌম্য কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারে।

সে কি! সৌম্য ডাকছে?

শমিতা প্রায় নাচার ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল। হ্যাঁ একে ট্রিপিং বলে। ইংরেজির অধ্যাপিকা শমিতার ইংরেজি শব্দটা মনে এল।

সৌম্য বলল, "দেখ আণ্ডারগ্র্যাজুয়েটরা—আচ্ছা তাদের সম্বন্ধে তুমি পড়েছ তো মানে ওদের দেশেও। তাদের সম্বন্ধে, মানে ক্ষমা করার কথা বলছি না। তা তুমি তো জান যেশাস কলেজটা স্থাপন করা হয়েছিল একটা নানারি তুলে দিয়ে কারণ অবশ্য আণ্ডারগ্র্যাজুয়েটদের অত কাছে নানদের থাকাটা কেমন যেন হয়ে উঠেছিল। ওরা একটু কেমন—কিংবা যদি তুমি বল এখন পড়াও যেতে পারে।"

এই বলে সৌম্য হাসল। একটা বই তুলে নিল সেলফ থেকে, দু-একটা পাতা উল্টাল। আবার তেমন করেই রেখে দিল। আর তখন টুপ টুপ করে মিনিটগুলো ঝরে পড়তে লাগল। যেমন চোখের জলই পড়ে। "আচ্ছা, শমি, একটা গল্প বলি এস।" সৌম্য হাসল যেন। "দেখ আমি ঔপন্যাসিক হতে পারি কিনা।" মাসির চিঠি মামির চিঠি শেষ করে কার্ডভরা খামটা তুলে নিল শমিতা। তার মুখে কৌতুকের হাসি দেখা দিল। সত্যি ভরতচন্দ্র। কার্ডটা একটা খামে মোড়া। খামের বাঁদিকের কোণে লেখা ভরতচন্দ্রে নাম ঠিকানা। ঠিকানায় সগর্ব ঘোষণা চাবাগান অঞ্চলের এক থানার অফিসর-ইন-চার্জ। খাম থেকে কার্ডটা বার করল শমিতা। পুলিশের

এস. আই. বোধহয় সাব ইনস্পেক্টর বলে। আরে, আরে অস্ফুটস্বরে শমিতা বলল। দেখ কাণ্ড। কার্ডটায় ভরতচন্দ্রের পাশে তার নবপরিণীতা। ভরতচন্দ্র পাঞ্জাবি-চাদর পরে সভ্যশান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে বটে কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় ভঙ্গিটার আড়াল থেকে তার সেই আর ভঙ্গি উঁকি দিচ্ছে, ব্যাটরা কিম্বা বেহালা-শ্রীর। কার্ডের পিছন দিকে কয়েক লাইনের চিঠি: শমিতাদিদি এতদিনে বিয়ে করলুম, আপনার ও সৌম্যবাবুর আশীর্বাদ চাই। শমিতা বলল সৌম্যকে—দেখ দেখ। বিয়ে করেছে। কি উপহার দিই বল তো। সৌম্য বলল, সম্বন্ধটা না জানলে উপহার বাৎলানো যায় কি? এ তো তোমাদের সেই সৌম্য। খুব পরিবেশন করেছিল, তোমার পিঁড়িও ধরেছিল। উত্তীয়র মতো কেউ নাকি? শমিতা বলল হয়তো: যাও, আমার চাইতে না হোক দু-বছরের ছোট। সৌম্য বলল, উত্তীয় শ্যামার চাইতে কত ছোট ছিল তা রবিঠাকুর রেকর্ড করেন নি।

সৌম্য চশমাটা খুলল, বলল, "গল্পটা শুনছ?"

শমিতা বলল, "বল।"

সৌম্য আবার গল্প শুরু করল: ভরতচন্দ্রর এক ব্যায়ামশিষ্য, নাকি সাগরেদ বলে তাদের?—আমাকে ঘটনাটার কথা বলেছিল। বাসস্টপে দু-তিনজন বিরক্ত করতে শুরু করেছিল। তখন ভরত স্কুলে আর তার শমিদিদি বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। একদিন সঙ্গে সঙ্গে চলছিল ভরত।

হঠাৎ শমিতা বলে ফেলল, দেখ ছোকরা তিনটে বড় বিরক্ত করছে মেয়েদের। আর কথা কি ইয়ং ক্যাভেলিয়ার এগিয়ে গেল। কি মারটাই সে খেল ছোকরা তিনটের হাতে। হৈ-চৈ, সেদিন শমিতাদের কলেজ যাওয়াই বন্ধ।"

শমিতা বলল, "এরকম ঘটেছিল।"

সৌম্য বলল, হাসিই জড়িয়ে রইল তার মুখে, "ছ-মাস বাদে, পুজোর বন্ধের পরে কলেজ খুলেছে আবার। শমিতারা লক্ষ্য করল পর পর কয়েকদিন ভরত রোজ বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকে। পাড়ার মেয়েরা শঙ্কিত। রোগটা কি ওকেও ধরল। তারপর আবার সেই তিন মূর্তির আবির্ভাব। তখন বেশ বোঝা গেল ভরত এদেরই প্রতীক্ষায় ছিল। তার পরের মুহূর্তে হৈ-চৈ, যাকে উইদ গাস্টো বলে, লেপ্ট হুক, রাইট হ্যামার। একি সেই ভরত। বাস ছুটে পালাল। শমিতারা বাড়ির দিকে যে যার গলি। বিকেলে ভরতকে

দেখা গেল শমিতাদের বাড়ির সামনে পথ চলতে। গলায় গাঁদার মালা ছিল না বটে, চোখ দুটিও নীল বন্দ—”

হা হা করে জোরে জোরে হেসে উঠল সৌম্য, চেয়ার ছেড়ে উঠেও দাঁড়াল সে যেন হাসির দমকে। সিগারেট কেসটা খুলল। যেন বিশেষ একটা সিগারেট বেছে নেবে। বলল, “কেমন, বেশ একটা গল্পের প্যারডি নয়!”

কিন্তু, চশমাটা আবার পরল সৌম্য সেজন্যই কি লক্ষে এল, ভাবল শমিতা—রগের শিরা দুটো যেন ফুলে উঠেছে। যেমন নাকি, গল্পে বলে, উত্তেজনার সময়ে হয়। আর তখনই তার মনেও পড়ল গোড়ার দিকে সৌম্য প্রশ্ন করেছিল, তুমি যে মহাভুজগের মতো ঘনালম্পর্শ বাহুর কথা বলেছিলে সে কি কোনো নাটক থেকে? মহাভুজগতুল্য বাহু যা বধূকে রক্ষা করে? তখন এমন দেখিয়েছিল সৌম্যকে।

শমিতা বলল, বলতে গিয়ে মৃদু শব্দ করে গলাটা সাফ করল, “রান্নার দিকে যাই। তুমি বরং পড়।”

রান্নাঘরে এল শমিতা। সে নিজের মনকে শাসন করল—এটা সিকিয়াট্রিস্টদের কেস নয়। জানলা দিয়ে সে অবশ্যই দেখবে না চুরি করে এই ঘরের মধ্যে, চা করতে গিয়ে যেমন সে করেছিল। বেরিয়ে যে-কোনো একদিকে সোজা চলা ভালো, বার বার নানা পথে শুরু করে একই জায়গায় আসার চাইতে। একটু দাঁড়াল সে বারান্দায়। তাড়াতাড়ি শেষ করবে সে রান্না। আর তারপরে যদি সম্ভব হয় এটস নিয়েই না হয় সময় কাটানো যাবে। সৌম্য এটসভক্ত। আর গল্পটা সে ঠিকই বলেছে ভরতের সঙ্গে সেই সূত্রেই পুলিশের পরিচয় আর তারই ফলে সে দারোগা। কিন্তু—

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার ছায়াগুলোকে সে দেখল—এও ভালো এমন উদাস ভঙ্গিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা। বারান্দায় সবুজ সেমিজটা মেলা আছে দেখছি। দুপুরের বিউটিস্যাপ—সৌমাই বলে কথাটা—সে সময়ে গায়ে ছিল তার। লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল দুপুরে স্যাপটা টুটতেই কারণ দুপুরে সৌম্য শোবার ঘরে নিজে সোজা হয়ে বসে পড়ে। আর এখন দেখ সেই বিকেলটাও নেই। কিন্তু বার বার একই জায়গায় আসার চাইতে যেদিকে খুশি চলা ভালো।

স্টোভটা জ্বালিয়ে দিয়ে আবার ঘরে ফিরল শমিতা। না—এটা সাইকাই-

আর্টিস্টদের ব্যাপার নয়। দেখ এখনও ওটার উচ্চারণ আমি নিজেই গুলিয়ে ফেলি। ব্যাপারটা গোলমেলে নয় ?

বেতের চেয়ারে সৌম্য গভীরে ঢুকে বসেছে। তা কি একটা গুহার মতো হতে পারে ? তেমন গভীর ?

পায়ে পায়ে চলে শমিতা চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। কিছু কি বলবে সে ? ঠিক তখনই—অডিকোলনের গন্ধটা তখন নাকে এল তার।

"মাথা ধরেছে ?"

শমিতার মনে হল অডিকোলনের অতিক্ষীণ ধারাটাই যেন রগ থেকে নেমে সৌম্যর চশমার তলা দিয়ে নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে আসছে। এই অডিকোলনের ব্যাপারটা সৌম্যর নিজস্ব—অর্থাৎ তার অবিবাহিত জীবনের একটা বিষয় যাতে শমিতার সংযোগ ঘটতে দেয় না অনেক সময়ে। প্রয়োজন হলে নিজেই ব্যবহার করে। কাউকে জানায় না।

সৌম্য এতক্ষণে আবার একটা সিগারেট ধরাল। বলল, "দেরি হবে ? অথবা আজ না হয় ডেম সিটওয়েলকে নিয়েই আলোচনা করা যাবে।"

"আচ্ছা, দেখো—না হয় তাই হোক। এ ছাড়া আর কি হতে পারে ?"

বিনয় ঘোষ

বাংলার নবজাগরণ—সেকাল ও একাল

'রেনেসাঁশ' ফরাসী কথা—অর্থ to be born again—অথবা after *naissance* বা birth—বাংলা অর্থ নবজীবন, নবজন্ম। একেবারে যার মৃত্যু হয়েছে তার পক্ষে নবজীবনলাভ সম্ভব নয়। এরকম মৃত্যু ব্যক্তিগতভাবে মানুষের হয়, সমাজগতভাবে মানুষের হয় না। অর্থাৎ মানুষের মৃত্যু হয়, কিন্তু মানবসমাজের মৃত্যু হয় না। মৃত্যু না হলেও সমাজের জীবনধারার গতি-পরিবর্তন হয়, জোয়ার-ভাঁটা আসে, স্রোত কখন খর, কখন ক্ষীণ হয়। সমাজ-জীবনের গতিধারা যখন ক্ষীণ হয়ে আসে, ভাঁটা বইতে থাকে, তখনই সমাজের ভিতর থেকে অথবা বাইরে থেকে নতুন জীবনমন্ত্রের আহ্বানে আবার তার বুকে নবজীবনের সাড়া জাগে। সমাজ নবজীবন লাভ করে, অর্থাৎ সমাজের রেনেসাঁশ বা নবজাগরণ হয়। বাংলার সমাজ-জীবনে উনিশ শতকে, ভিতরের ও বাইরের একাধিক কারণে, এইরকম নবজাগরণ হয়েছিল।

হিন্দুযুগে পালবংশের রাজত্বকালে, নবম-দশম শতকে বাংলাদেশে এক বিচিত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ হয়। তারপর প্রায় ৫০০ বছর পরে মুগল রাজত্বকালে ষোড়শ শতকে নব্যন্যায় নব্যস্মৃতি ও শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত নব্য-বৈষ্ণবধর্ম বাংলার সমাজ-জীবনে আর-এক অভিনব জাগরণের ঢেউ তোলে। এর পর নবজাগরণের তরঙ্গ ওঠে প্রায় ৩০০ বছর পরে, ব্রিটিশ রাজত্বকালে, উনিশ শতকে।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে, প্রায় ১০০০ বছরের মধ্যে দেখা যায়, নবজাগরণের বড় বড় তিনটি ঢেউ এসেছে—একটি হিন্দুযুগে পাল আমলে, একটি মুসলমানযুগে মুগল আমলে, আর-একটি ব্রিটিশযুগে। প্রথম ও দ্বিতীয় জাগরণের সঙ্গে ব্রিটিশযুগের নবজাগরণের একটা মৌল পার্থক্য আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় জাগরণের প্রেরণা ছিল প্রধানত 'ভাবগত' বা 'ideological' এবং সেই ভাবও ছিল মূলত ধর্মীয় (religious)। এই জাগরণের কোনো

বস্তুগত নতুন ভিত্তি রচিত হয় নি, যার ফলে সামাজিক গড়নের পরিবর্তন হতে পারে এবং মানসিক গড়নেরও নবরূপায়ণ হয়। সেইজন্য পূর্বের এই জাগরণ সমাজ-জীবনে কোনো স্থায়ী স্রোত সঞ্চারিত করতে পারে নি। জাগরণের জোয়ার ও উচ্ছ্বাসের পর সমাজ-জীবনে আবার ভাঁটার স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে এবং সমাজ ধীরে ধীরে একটি নিস্তরঙ্গ বদ্ধডোবায় পরিণত হয়েছে। উনিশ শতকের জাগরণে এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় নি, কারণ তার বস্তুগত ভিত্তিও খানিকটা রচিত হয়েছিল—যার ফলে সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক গড়ন বা institutional pattern এবং মানুষের মনের গড়নও খানিকটা বদলে গিয়েছিল। এই নবরূপায়িত সমাজ এবং ব্যক্তি-মানসের জন্যই উনিশ শতকের নবজাগরণের ধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি—তার প্রবাহ বহুরকমের উত্থান-পতনের ভিতর দিয়েও অক্ষুন্ন রয়েছে। সমাজের বাস্তব ভিত্তির পরিবর্তন হয়েছে বলেই মানসলোকের পরিবর্তনের ধারা ক্ষীণ হয়ে শুকিয়ে যায় নি, বরং ধীরে ধীরে প্রবল হয়েছে। অবশ্য ব্রিটিশ শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এদেশের নবজাগরণের স্বাভাবিক প্রবাহকে নানাদিক থেকে রুদ্ধ করেছে, কিন্তু তাহলেও সেই ধারাটি একেবারে লোপ পায় নি। এইটাই হল সেকালের নবজাগরণের সঙ্গে একালের নবজাগরণের মৌল পার্থক্য।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সমাজভিত্তির পরিবর্তন ও প্রসার না হলে মানসভিত্তির পরিবর্তন ও প্রসার হয় না—যদিও বা হঠাৎ কোনো ভাবগত প্রেরণাতে হয়, তাহলেও তা স্থায়ী হয় না। উনিশ শতকে ব্রিটিশ আমলে এদেশের সমাজ-জীবনে আঘাত লাগল দুদিক থেকে—উপর থেকে, তলা থেকে—অর্থাৎ সমাজভিত্তিতে ও মানসভিত্তিতে। সমাজভিত্তিকে material base এবং মানসভিত্তিকে ideological superstructure বলা যায়। কোনোদিকের আঘাতই দুর্বল নয়, প্রচণ্ড শক্তিশালী, একেবারে মূল ধরে নাড়া দেবার মতো। কিন্তু এত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও, এবং সমাজের ও মানব-মনের মূল ধরে নাড়া দেওয়া সত্ত্বেও—ভাঙনের তুলনায় গড়নের কাজ নবজাগরণের যুগে অনেক কম হয়েছে—এবং গড়ন ও নবরূপায়ণ যেটুকু হয়েছে তাও অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী নয়। তার কারণ আমাদের রাজনৈতিক দুর্ভাগ্য, বৈদেশিক পরাধীনতার বন্ধনের মধ্যে

আমরা নবজাগরণের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছি—তাই শাসকদের বহু বিচিত্র বন্ধন ও শাসনের মধ্যে আমাদের সেই প্রেরণা স্বাভাবিক বিকাশের পথে প্রবাহিত হয় নি—বরং প্রতিরুদ্ধ হয়ে মধ্যে মধ্যে অন্ধ আক্রোশে পশ্চাদ্‌মুখী হয়েছে বা হবার জন্যে ঝুঁকেছে।

এবারে আমরা যে দুটি প্রেরণা বা stimulus-এর কথা বলেছি—material ও ideological—সেগুলি কি তাই দেখব। প্রথমে সমাজের বাস্তব গঠনমূলে আঘাতের কথা বলি। সমাজের বাস্তব গঠনের প্রাথমিক স্তর বা বনিয়াদ হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (economic structure), দ্বিতীয় স্তর হল সমাজব্যবস্থা (social-institutional structure), তৃতীয় স্তর মানসিক বা ভাবগত স্তর (ideological superstructure). অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ব্রিটিশপূর্ব যুগে, আমাদের দেশে যা ছিল তা কতকটা এইরকমের :

কৃষিকর্ম সর্বাধিক লোকের প্রধান জীবিকা।

গ্রাম্যজীবনই প্রধান—এবং কয়েকটি করে অথবা এক-একটি গ্রামে এমনভাবে গ্রাম্যসমাজ গঠিত ছিল যে প্রাত্যহিক বা আধ্যাত্মিক কোনো প্রয়োজনেই পরনির্ভরতার দরকার হত না, অর্থাৎ বাইরের দিকে তাকাবার দরকার হত না।

নগর ছিল—কিন্তু সেগুলি তীর্থধর্মের নগর, অথবা দু-একটি রাজধানী-নগর আর ছোট ছোট কারুশিল্পপ্রধান নগর।

বাণিজ্য ছিল—বাণিজ্যে লক্ষ্মীরও বসতি ছিল—কিন্তু তার অবাধ স্বাধীনতা ছিল না—সামাজিক মর্যাদা ছিল না—কুলবৃত্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

এই অর্থনৈতিক স্তরের উপর যে সামাজিক স্তর গড়ে উঠেছিল, তার চেহারা ছিল অনেকটা অচল-অনড় মিশরীয় পিরামিডের মতো। পিরামিডের চূড়ায় রাজা-বাদশাহ, যিনি সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—তার তলায় আমলা-অমাত্য ও সামন্তরা, জমিদার-জায়গীরদাররা—তার তলায় বাকি সকলে—কৃষক কারিগর ব্যবসায়ীবণিক পণ্ডিত পুরোহিত। অর্থের দিক থেকে দুটি স্তর—প্রতিটি স্তর fixed বা অচল ও স্থিতিশীল—কারণ অর্থটাই তখন ছিল অচল—তার প্রধান রূপ ছিল ভূসম্পত্তি। এর পাশাপাশি আর-একটি স্তর ছিল, সেটাও fixed বা অচল। সেটি হল কুলবর্ণগত স্তর, বংশবৃত্তিগত

স্তর—প্রধানত এগুলি সামাজিক মর্যাদাগত স্তর—এখানে ব্রাহ্মণপণ্ডিত পুরোহিত সর্বোচ্চ স্তরের মর্যাদার অধিকারী, তারপর বর্ণানুক্রমে অন্যান্যরা। লক্ষপতি ধনিক সদাগর হলেও তার সামাজিক মর্যাদা ছিল অনেক নিম্নস্তরের, ব্রাহ্মণপণ্ডিত দরিদ্র হলেও তাঁর মর্যাদা অনেক উচ্চস্তরের। তাহলে সমাজব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ ছিল দুটি দেখা যাচ্ছে—একটি ভূসম্পত্তিগত বা estate, আর-একটি কুলবর্ণগত বা birth. কোনোটিই পরিবর্তন করার ক্ষমতা মানুষের ছিল না। Estate-এর অধিকারী হওয়া রাজানুগ্রহের উপর নির্ভর করত, নিজের উদ্যম বা কৃতিত্বের উপর নয়, এবং রাজা ইচ্ছা করলে যে-কোনো ভূস্বামী ও সামন্তকে পথের ভিখারীও করতে পারতেন, আবার ভিখারীকেও ভূস্বামীর উচ্চাসনে বসাতে পারতেন। কুলবর্ণ এবং সংশ্লিষ্টবৃত্তি যখন জন্মগত তখন তার পরিবর্তন করার ক্ষমতা মানুষের থাকবে কেমন করে? তার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

ব্রিটিশ ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য জাতির সংস্পর্শে আসার ফলে অষ্টাদশ শতক থেকে আমাদের সমাজব্যবস্থার এই দুটি মূল স্তম্ভতে আঘাত লাগল। কুলবৃত্তিগত ও ভূসম্পত্তিগত সামাজিক স্তরবিন্যাস এই আঘাতে ভাঙতে আরম্ভ করল। অর্থ বলতে যা বোঝাত তার রূপান্তর ঘটল। নতুন অর্থ হল mobile money—সচল অর্থ—এবং সেই অর্থ যে-কোনো বৃত্তি অবলম্বন করে স্বাধীনভাবে উপার্জন করার অধিকার মানুষ পেল। সামাজিক স্তরবিন্যাস এই নতুন বিত্তলব্ধ মর্যাদার উপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। তার ফলে অষ্টাদশ শতকে আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশে ইংরেজদের প্রধান কর্মকেন্দ্র 'কলকাতা' কয়েকটি ছোট ছোট গ্রামসমষ্টি থেকে ক্রমে একটি নগর ও শহর হয়ে উঠছে এবং দেশের লোকের ধারণা হচ্ছে যে ইংরেজদের জমিদারী (তখন এটা ইংরেজদের জমিদারীই ছিল) কলকাতা নগরে এলে, আর কিছু না হোক, অন্তত স্বাধীনভাবে অর্থ-উপার্জন করা যায় এবং তা করতে পারলে ধীরে ধীরে ইংরেজদের কৃপাতেই একটা সামাজিক ক্ষমতা ও মর্যাদার (social power and status) অধিকারী হওয়া যায়। তাই অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকেই দেখা যায় যে আশপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে লোকে ভাগ্যান্বেষণে নতুন নগর কলকাতা অভিমুখে আসতে আরম্ভ করেছে এবং যারা এসেছে তারা ইংরেজদের নতুন প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কাজকর্মের

সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে বেশ অর্থোপার্জনও করেছে। ভাগ্যবান যাঁরা তাঁদের ভাগ্যও ফিরে গেছে এবং এরকম ভাগ্যবানরাই প্রচুর বিত্ত উপার্জন ও সঞ্চয় করে নতুন শহর কলকাতার সমাজে বেশ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছেন। এঁরাই হয়েছেন কলকাতার তথা বাংলাদেশের আধুনিক যুগের, প্রাথমিক পর্বের, new urban aristocracy—নতুন নাগরিক অভিজাতশ্রেণী। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন বাঙালি শেঠ-বসাকরা, মল্লিকরা, Tagore বা ঠাকুররা, শোভাবাজারের রাজা দেব-রা, সিমলের দে-সরকাররা এবং আরও অনেকে।

এই যে নতুন স্তরবিন্যাস হতে থাকল এতে কুলমর্যাদা লোপ পেল যে তা নয়—আজকে বিংশ শতাব্দীতেও কুলবর্ণগত সামাজিক মর্যাদা বিশেষ লোপ পায় নি। তবু তার অখণ্ড প্রতিপত্তি—যা প্রায় নিশ্ছিদ্র ছিল বলা চলে—ধীরে ধীরে তা খণ্ডিত হতে থাকল বিত্তলব্ধ নতুন সামাজিক মর্যাদা দ্বারা।

এই তো গেল নতুন নগরকেন্দ্রের কথা। গ্রাম্যসমাজেও নতুন ভাঙাগড়া আরম্ভ হল এবং আরও ব্যাপকভাবে। ইংরেজদের নতুন নতুন পরীক্ষামূলক রাজস্বনীতি বা revenue policy-র ফলে সেকালের গ্রাম্যসমাজের যে অভিজাতশ্রেণী ছিল তারা দ্রুত ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেল, কারণ তারা নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের চিরদিনের অভ্যাস ও ধারণাগুলিকে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না। তাদের ধীরে ধীরে উচ্ছেদ করে, চিরস্থায়ী রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করে, নতুন একশ্রেণীর অভিজাত জমিদার গ্রাম্যসমাজে সৃষ্টি করা হল—যাঁদের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক নয়—যাঁরা টাকার জোরে জমিদারী নিলেমে কিনে ঠিক ব্যবসায়ীর মতো নতুন জমিদার হয়ে উঠলেন। সুতরাং, যেমন নতুন নগরকেন্দ্রে, তেমনি গ্রামাঞ্চলেও যে new rural aristocracy গড়ে উঠল তাঁরা হলেন নতুন শাসক ইংরেজদের অনুগ্রহজীবী একশ্রেণীর হঠাৎ-অভিজাত বা upstart. এর পর যখন মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের উদ্‌ভব হল—তখন পত্তনিদার দর-পত্তনিদার প্রভৃতিদের নিয়ে বেশ বড় একটা মধ্যবিত্তশ্রেণীর উৎপত্তি হল গ্রাম্যসমাজে—যা পূর্বে কখনও কোনোদিন ছিল না। নতুন rural aristocracy, এবং নতুন rural middleclass—দুটিই গ্রাম্যসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা উদাসীন বিত্তলোভী শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠল। পূর্বের অত্যাচারী জমিদারদের একটা প্রাণের টান ছিল গ্রামের প্রতি। কিন্তু নতুন গ্রাম্য অভিজাত ও মধ্যবিত্তদের অত্যাচারের ফিউডাল রূপটা বদলাল, যদিও নতুন কৌশলে অত্যাচারের

মাত্রা অনেক বেড়ে গেল—তার উপর গ্রাম্যসমাজের সঙ্গে তাঁদের প্রাণের টান রইল না—সম্পর্ক রইল শুধু টাকার সঙ্গে। জমিদার হলেন রাজস্বের contractor, মধ্যস্বত্বভোগীরা হলেন তাঁর অধীন একদল sub-contractor. গ্রামের প্রতি দরদ থাকার এঁদের প্রয়োজন নেই, নির্দিষ্ট রাজস্ব চুকিয়ে যত খুশি চাষীদের শোষণ করে টাকা আদায় করা যায় তাই হল এঁদের লক্ষ্য। এঁরা অধিকাংশই গ্রামে বসবাস করা পর্যন্ত ত্যাগ করলেন—absentee জমিদার পত্তনিদার হয়ে উঠলেন। নগরের aristocracy-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে এঁরা নতুন নাগরিক সমাজে প্রতিষ্ঠালোভী হলেন। ফলে হতাদরে ও নিষ্ঠুর ঔদাস্যে গ্রাম্যসমাজ দ্রুত ভাঙতে আরম্ভ করল, একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। সেকালের কারুবর্গ—তাঁতি কামার কুমার কারুশিল্পী—এরাও নতুন বাণিজ্যপণ্যের প্রতিযোগিতায় হার মেনে উচ্ছন্নে গেল। তা ছাড়া এই সব কারুকারদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আগেকার গ্রাম্য অভিজাতশ্রেণী। যখন এই পুরাতন গ্রাম্য অভিজাতরা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেলেন, তখন পুরাতন কারুশিল্পেরও অবনতি অনিবার্য হয়ে উঠল।

পুরাতন গ্রাম্যসমাজ ভাঙল, কিন্তু নতুন কোনো গ্রাম্যজীবন ও গ্রাম্যসমাজ তার ধ্বংসস্তূপে গড়ে উঠল না। ফলে গ্রামাঞ্চল এক-একটা বিস্তীর্ণ মরুভূমির রূপ ধারণ করল। আর নতুন নগরকেন্দ্র কলকাতায় লোকসংখ্যা বাড়তে লাগল—গ্রাম ছেড়ে নতুন শহরে গেলে হয়তো জীবিকার সমাধান হবে এই আশায় উৎখাত গ্রামবাসীরা শহরমুখী হয়ে উঠল। শহরে এসে তারা হল কুলিমজুর আর নতুন শহুরে অভিজাতদের ভৃত্যশ্রেণী।

এই হল নতুন নাগরিক ও গ্রাম্যসমাজের রূপ—যা ব্রিটিশযুগে নতুন অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে গড়ে উঠল। এর প্রতিক্রিয়া মনোজগতে ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কি হল? কোনো নবজাগরণের লক্ষণ বিশেষ কিছু সমগ্র অষ্টাদশ শতকে বাংলার সমাজে দেখা গেল না। কি দেখা গেল? নবজাগরণের লক্ষণ দেখা গেল না এইজন্যে যে জাগরণ জিনিসটা হল মনের ব্যাপার, বিদ্যাবুদ্ধিজাত চেতনা ও উপলব্ধির ব্যাপার। অষ্টাদশ শতকে নতুন নগরকেন্দ্র কলকাতায়—এদেশের যে নতুন urban aristocracy গড়ে উঠল—তাঁদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় সুশিক্ষিত, রুচিবান ও সংস্কৃতিবান লোক কেউই ছিলেন না বলা চলে। ইংরেজ শাসকরাও যাঁরা তখন ছিলেন তাঁরাও শিক্ষাদীক্ষায়, মনোভাবে ও রুচিতে এদেশের নব্য-অভিজাতদের তুলনায় বিশেষ

উচ্চস্তরের ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন জনসনের যুগের ইংলণ্ডের রূঢ় দুঃসাহসী স্বার্থান্ধ আরামপ্রিয় adventurist ধরনের লোক—ট্যাভার্ন আর কফিহাউসের হুল্লোড় এবং মধ্যে মধ্যে মধ্যযুগের কায়দায় duel লড়ে বীরত্ব প্রকাশ করাই ছিল তাঁদের কালচার। স্বভাবতই শাসকদের এই culture-ই এদেশের নব্যঅভিজাতরা অনুকরণ করলেন। তার ফলে আমাদের সংস্কৃতি তাঁদের পোষকতায় vulgarised হতে থাকল। যেমন ধরা যাক—দুর্গোৎসব। পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব হিসেবে দুর্গোৎসবের যে integrated রূপ ছিল আগে তার রূপান্তর হতে থাকল—অষ্টাদশ শতক থেকে নতুন কলকাতা নগরের নব্যঅভিজাতদের বিকৃতরুচির বিলাসিতার ফলে। হলওয়েল সাহেব কলকাতার বড়বাবুদের এই দুর্গোৎসবকে লক্ষ করেই বলেছিলেন "Gentoo-দের grand feast". উৎসব-পার্বণের রূপ যেমন vulgarised বা বিকৃত হতে থাকল, তেমনি আমোদ-প্রমোদও বিকৃত হল। আমোদ-প্রমোদ ও আভিজাত্যের exhibitionism-এ নব্যঅভিজাতরা পাল্লা দিতে লাগলেন এবং সেখানে দেখা গেল নবাবী আমলের নবাবদের ও বনেদী রাজা-মহারাজাদের court-culture এবং শখ খেয়াল চরিতার্থতার উপাদান এসে ভিড় করল নতুন শহরের রাজসভায়। বুলবুলির লড়াই, পোষা জন্তুর বিয়েতে সমারোহ, বিবাহে শ্রাদ্ধে রাজকীয় বিলাসিতা, বাইজীনাচ, গাইয়ে-বাজিয়ে প্রতিপালন, কবিয়াল পোষণ, এমনকি ব্রাহ্মণপণ্ডিত পোষণ পর্যন্ত নগরের নব্যঅভিজাতদের আভিজাত্যের লক্ষণ হয়ে উঠল। এই সব কারণে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে সামাজিক নবজাগরণের কোনো স্পন্দন বা কোনো চেতনার বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না। অথচ কমপক্ষে একশ বছর কেটে গেল পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে ও ইংরেজদের সান্নিধ্যে।

উনিশ শতকের গোড়া থেকেই এই পরিবেশের পরিবর্তন হতে থাকল। আমরা আগে বলেছি যে এদেশের সমাজ-জীবনে যে নতুন গতিশীলতা (dynamism) সঞ্চারিত হল—তার মূলে ছিল সামাজিক মর্যাদা-প্রতিপত্তির পুরাতন অচল মানদণ্ডের বদলে নতুন সচল মানদণ্ডের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এই সচল মানদণ্ডটি হল—achievement principle—কৃতিত্বের মানদণ্ড—অবশ্যই ব্যক্তিগত কৃতিত্ব। সমাজে পূর্বের গোষ্ঠী, বর্ণ ও কুলের বদলে 'ব্যক্তি' প্রধান হয়ে উঠল—এবং সামাজিক ক্ষমতালাভে ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনে সেই

ব্যক্তির achievement বা কৃতিত্বই প্রধান বিচার্য বিষয় হল, তার কুলবংশ নয়। এর ফলে সমাজে খানিকটা গতিবেগ—যাকে social mobility বলা হয়—সঞ্চারিত হল। কিন্তু গোড়ার দিকে—অষ্টাদশ শতকে এই achievement ছিল প্রধানত বিত্তকেন্দ্রিক—যদিও নতুন বিত্ত হল সচল money, অচল বা fixed landed estate নয়। অবশ্য সচল money-ও শেষে অচল Estate-এর দিকে ধাবিত হল ব্রিটিশের স্বার্থে,—industrialisation-এর অভাবে এবং নতুন জমিদারী স্বার্থ ও মর্যাদা সৃষ্টির ফলে। তাহলেও বিত্তের মূল রূপ হল mobile money. এই নতুন বিত্তকেন্দ্রিক সচলতা অষ্টাদশ শতকে কোনো মানসিক ও সাংস্কৃতিক সচলতার সৃষ্টি করতে পারে নি, বরং তার বিকৃতিতে সাহায্য করেছে। উনিশ শতকে এই সচল 'money'-র সঙ্গে এল 'intellect'—দুটি বস্তুই নবযুগের নতুন দৃষ্টিতে commercially mobile—অর্থাৎ linear graph করে বলা যায় মধ্যে 'Commerce'—তার একদিকে intellect এবং তলায় বা resultant হল money :

intellect————→Commerce
↑ ↓ Money.

Commerce থেকে money, money থেকে commerce ও আরও বেশি money. তেমনি intellect—through commerce—results in money. অর্থাৎ নতুন intellect-ও আর কুলকেন্দ্রিক রইল না—যেমন ছিল আগে ব্রাহ্মণদের। Intellect-ও commercialised হল, mobile হল। বিত্ত ও বিদ্যা—দুটি হল নতুন সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ড। আগে বিত্তের প্রবেশ ঘটেছিল—আঠার শতকে, উনিশ শতকে তার সঙ্গে এল নতুন বিদ্যা ও বুদ্ধি—New education ও intellect।

ইংলণ্ডের সমাজেও এর মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে—Industrial revolution-এর ফলে সমাজে ওলটপালট হয়েছে—গণতন্ত্রের ও নতুন মধ্যবিত্তের চরিত্রেরও রূপায়ণ হয়েছে। এই শিল্পবিপ্লবোত্তর ইংলণ্ডের প্রতিনিধিরা উনিশ শতকের গোড়া থেকে এদেশে শাসনকার্যের দায়িত্ব নিয়ে আসতে আরম্ভ করলেন। ক্লাইভ-হেস্টিংস-কর্নওয়ালিস-এর যুগ ও দৃষ্টির সঙ্গে তাঁদের দৃষ্টির পার্থক্য অনেক। পাশ্চাত্যের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজদর্শন যে ব্রিটিশ শাসকরা বহন করে আনলেন তা নয়, তাঁরা কিছুটা তার পথ পরিষ্কার করতে লাগলেন শিক্ষার সুযোগ দিয়ে, সমাজসংস্কারকর্মে নিজেরা উদ্যোগী হয়ে।

প্রধানত এই দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনা এদেশের লোকের মধ্যেই ধীরে ধীরে দেখা দিল—কেবল নতুন বিত্তের জোরে, নতুন বিদ্যাবুদ্ধির জোরে যাঁরা ক্ষমতাবান হয়ে উঠলেন তাঁদের মধ্যে। নবজাগরণের অগ্রদূত ও পথপ্রদর্শক রামমোহন রায় হিন্দু কলেজের মতো কোনো নতুন শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভ করেন নি, কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা উভয়কেই তিনি কতখানি নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করেছিলেন—সামাজিক প্রয়োজনে ও তাগিদে—তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। কতকগুলি ভাষা তিনি শিখেছিলেন তা আজকের বিদ্বানরাও ভাবতে পারবেন না। এই সাধনা—বিদ্যা ও বুদ্ধির কঠোর সাধনা—তিনি কেন করেছিলেন? বিত্তের অভাব তাঁর ছিল না, কলকাতা শহরে ১৮১৪।১৫ সাল থেকে যখন তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন, তখন শহরে গৃহসম্পত্তি কিনেই জাঁকিয়ে বসলেন। তাঁর সমসাময়িক কলকাতার অভিজাতদের মতো অঢেল অর্থ-ঐশ্বর্য হয়তো তাঁর ছিল না, কিন্তু যা ছিল তাও কম নয়—আভিজাত্য দেখাবার মতো যথেষ্ট। ক্রমে আরও বিত্তলাভের দিকে না ঝুঁকে এবং শুধু বিত্তের জোরে সামাজিক প্রতিপত্তিলাভের চেষ্টা না করে—তিনি কঠোর জ্ঞানসাধনায় ব্রতী হলেন কেন? কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে নতুন বিত্তের মানদণ্ড সামাজিক ভাঙনের ভিতর দিয়ে যে-সচলতা সৃষ্টি করেছে—সেই সচলতা মেকী সচলতা—সমাজবিজ্ঞানীরা যাকে spurious mobility বলেন, সেও তাই। এই স্থূল সচলতা সাময়িক—এর ফলে কোনো মানসিক ও আদর্শগত সচলতা দেশবাসীর জীবনে আসবে না—এবং তা না আসলে সমাজ আবার অচল অনড় হয়ে বিষিয়ে উঠবে। নতুন বিদ্যা, জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোক-স্পর্শেই এই মানসিক সচলতা আসতে পারে। তাই তিনি পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও প্রাচ্যদর্শন, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য বিদ্যা, পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য ধর্মের গভীর অনুশীলনে মনোনিবেশ করলেন। এমন একটি নতুন আলোকের সন্ধানে, যে-আলোক জ্বালিয়ে দিতে পারলে আমাদের দীর্ঘকালের প্রাণহীন অচল আচরণ অভ্যাস অনুষ্ঠান, অজ্ঞানপ্রসূত ধ্যানধারণা ইত্যাদি পরিবর্তিত হতে পারে এবং আমাদের জড়পদার্থের মতো মৃতপ্রায় মন আবার সজীব ও সচল হতে পারে। তাহলে দেখতে পাচ্ছি—বাংলাদেশে নবজাগরণের সূচনা হল - নতুন বিদ্যা ও বুদ্ধির অনুশীলনের ভিতর দিয়ে। এই অনুশীলনের পথ ধরেই এদেশে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা, জীবনদর্শন, রীতিনীতি সব একে-একে প্রবেশ করেছে এবং ক্রমে দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সংঘাতও আরম্ভ হয়েছে। নতুন agents of Westernisation এবং পুরাতন forces of tradition—এই দুয়ের সংঘাতের ভিতর দিয়ে, উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের সূচনা হয়েছে এবং সেই জাগরণের প্রবাহেরও উত্থান-পতন হয়েছে। নতুন বিত্তবানশ্রেণী নয় শুধু, তার সঙ্গে নব্যশিক্ষার প্রসারের ফলে নতুন বিদ্যাজীবী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীরও বিকাশ ও বিস্তার হয়েছে ধীরে ধীরে—এই নতুন বিদ্যাবুদ্ধি-জীবীশ্রেণীই নবজাগরণের আদর্শের ধারক ও বাহক হয়েছেন।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মজুত-উদ্ধার

শুধু কানের ফুলটা নয়, সেই সঙ্গে কাঁঠালের বিচি জামার বোতাম পেন্সিলের টুকরো শিশির ছিপি—

'কী কাণ্ড!'

কেটেকুটে ছারখার করাই যার স্বভাব সে কিনা এমন মজুতদার!

সরযূ বলে, 'ভাগ্যিস ঘরে জল পড়ছিল!'

'ভাগ্যিস!' কোরাসে সবাই সায় দেয়।

ছাদ ফুটো হয়ে ঘরে জল পড়া ভাগ্যের কথা নয়। কিন্তু ঘরে না জল পড়লে মালপত্র সরযূ সরাতে যেত? মালপত্র না সরাতে গেলে উদ্ধার হত মজুত মাল?

জিতেন বলে, 'ইণ্ডিয়ায় আটচল্লিশ কোটি ইন্দুর আছে—কাগজে পড়েছি—বছরে হাজার হাজার মন ফসল তারা—'

'এবার বোঝা গেল চালে টান পড়ত কেন।' ভারিক্কি চালে যাদব মাথা দোলায়। 'পাঁচসিকে দেড় টাকা কিলো চাল—'

'তুমি তো ভাবতে', কমলা ফোঁস করে ওঠে, 'তোমাদের রুটি গিলিয়ে আমরা দুই শাশুড়ী-বোয়ে গণ্ডেপিণ্ডে—'

'ভাবাতে বলেই ভাবতাম।'

'ভাবাতে বলেই ভাবতাম!'

'আহা, তোমরা যদি সাবধান হতে—'

'সাবধান হতে! কেন, সাবধান তুমি হতে পার না? সারাদিন কোন্ রাজকাজটা কর শুনি? কবে থেকে বলছি ঘরটা সারাও সারাও, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, জানালার পাট ভেঙেছে, মেঝেময় খানাখন্দ—কানে গেছে? জুটেছে এক দাবার আড্ডা'—

'বাজে বকো না।'

'বাজে বকো না! হক কথা বললেই—'

ইন্দুরের কাণ্ডে প্রথমে সবাই তাজ্জব। তারপর মজুত-উদ্ধারের আনন্দে ডগমগ। তারপর খেয়োখেয়ি। অথচ একবারও কেউ মুখ ফুটে বলল না যে—

ফোঁস করে যতীন শ্বাস ছাড়ে।

মিহির বলে, 'তোরই তো দোষ বাপু। তুই কেন সেদিন আগবাড়িয়ে—'

'আগবাড়িয়ে!' আজ মনে হচ্ছে বটে আগবাড়িয়ে। কিন্তু সেদিন যদি না আগবাড়িয়ে নতুন ফুল গড়িয়ে এনে দিত—

'তুই যখন সত্যিই—'

'কে বিশ্বাস করত?' মেঝেয় কমলা রেণু, তক্তাপোষে সে বাবা। শোবার আগে রেণু ফুল দুটি খুলে বালিশের পাশে রেখেছে, সকালে একটি উধাও। দরজা বন্ধ।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সেরা ডিটেকটিভও চোর বলে যতীনকেই পাকড়াও করত। বেকার যতীনকে।

'থাকগে! মন খারাপ করে আর কী করবি। তবু যে শেষ অব্দি—ওটা কার কাছে?'

'বৌদি।'

'বৌদি? নিল? হাত পেতে নিতে লজ্জা করল না? বৌদিই না সেদিন'—

শুধু বৌদির দোষ দিলে চলবে কেন। হাজার হলেও সে পরের বাড়ির মেয়ে।

নিজের গর্ভধারিনী মা জন্মদাতা বাবা সহোদর দাদাই কি যতীনকে চোর বলে সন্দেহ করে নি?

'ও ছোড়দা, আমার কী হবে গো!' বলে রেণুর হাউ হাউ কান্নাটা অবিশ্যি খুবই যুক্তিসংগত—শাশুড়ীর আশীর্বাদী কানের ফুলের একটি বাপের বাড়িতে চুরি গেল, দজ্জাল মাগী আর আস্ত রাখবে না—কিন্তু মা বাবা এবং জলজ্যান্ত রোজগেরে বড়দা থাকতে তার হাত ধরে কান্না কেন? তার মুখ চেয়ে কেঁদে ভাসানো কেন?

'বৌদির কাছ থেকে ওটা চেয়ে নিস, বুঝলি।'

'হুঁ।'

'ওটা বেচে—'

কত পাওয়া যাবে? একটি ফুল গড়াতে মজুরি দিতে হয়েছে দুটির।

সেই সঙ্গে পাথর বাবদ পাঁচ টাকা। মজুরিটা পুরো বরবাদ, পাথরের দরুন মিলবে আনা কয়েক। শুধু সোনার দামটুকু। সেখানেও আছে কেনা-বেচার গ্যাঁড়াকল।

'ওটা তোর ন্যায্য পাওনা।'

ন্যায্য পাওনা যতীনের নয়, মিহিরের। শোনামাত্র মিহির সেদিন চল্লিশ টাকা হাওলাত দিয়ে মান বাঁচিয়েছিল।

কিন্তু মান কি সত্যিই বেঁচেছিল? মিহিরের কাছেও?

বাড়ির সবাই ধরে নিয়েছিল যতীনই চোর। চাপে পড়ে এখন ফিরিয়ে দিচ্ছে। পালিশ করিয়ে এনে নতুন বলে চালাচ্ছে। 'একটা নতুন, কোন্‌টা রে? দেখে কিন্তু—' মিহিরও দারুণ অবাক হয়ে যায়। এক সাথে রঙ-পালিশ করাতে দুটোই যে দেখতে হুবহু এক হয়ে গেছে, মিহিরও ভাবতে পারে নি।

কী ডেঞ্জারাস ধড়িবাজ ইন্দুর দ্যাখো! মা বাবা দাদা বৌদি মায় প্রাণের বন্ধুর কাছেও তাকে বেকসুর চোর বানিয়ে ছেড়েছে!

পাল্টা ওদেরও কি চোর বানায় নি যতীনের কাছে?

এক ছেলের রোজগারে সংসার চালাতে মা হিমসিম খাচ্ছে। দুচার আনা পয়সার জন্যে ছেলের কাছে বাপকে হাত পাততে হয়। ওদের কেউ, কিংবা দুজনে যড় করে ফুলটা গায়েব করে থাকতে পারে।

ননদের বিয়েতে তিন ভরির হারটা গেছে। তার কিছুটা অন্তত উসুল করার মতলবে ঘরে জল রাখতে এসে বৌদির হাত-সাফাই আশ্চর্য না। পিছনে দাদার উসকানি থাকাও। বিয়ের পরই যেভাবে বোনটা পর হয়ে গিয়ে শ্বশুরবাড়ির সাথে জোট বেঁধে নানান ছলে বাপের বাড়িকে শুষতে শুরু করেছে!

'কী ভাবছিস?'

'বাঞ্চোৎ!' দাঁতে দাঁত ঘষে যতীন বলে, 'ওই শালা ইন্দুরের গুষ্টির একশা যদি না আমি করি—'

বিষ শুনেই কমলা হাঁ হাঁ করে ওঠে। ছেলেকে মাই খাওয়াতে খাওয়াতে সরযূ হয়ে যায় হিম। ঘর থেকে পড়িমরি করে যাদব ছুটে আসে।

যতীন বলে, 'তোমরা মিথ্যে ভয় পাচ্ছ, মা।'

'মিথ্যে ভয় !' কমলা গলা চড়ায় : ছেলেপিলের বাড়িতে বিষ-মেশানো খাবার ছড়িয়ে রাখে এমন কথা কেউ শুনেছে কখনো ?

শ্বশুরের তোয়াক্কা না রেখে জোরালো সায় দেয় সরযূ : ছোট খোকা যে হামাগুড়ি দিতে শিখে যা পায় তাই মুখে দিচ্ছে—জানে না যতীন ?

'শিগগীর ওটা ডোবায় ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে আয়। গেলি ! গেলি ! গেলি মুখপোড়া !'

বিষ শুনেই বুকটা যাদবের ধক করে উঠেছিল : বারেক পরীক্ষায় ফেল করেই পতিতের কচি নাতিটা যদি মনের দুঃখে বিষ খেয়ে মরতে পারে, পাঁচ বছরের চাকরি থেকে ছাঁটাই যোয়ান ছেলে তবে—

হাত বুলিয়ে বুককে প্রবোধ দিতে দিতে যাদব চেঁচায়, 'হারামজাদা ! বাড়িতে তুমি বিষ এনেছ ? আমাদের খতম করে ঝাড়া হাত-পা হতে চাও !'

অগত্যা যতীনকে হার মানতে হয়।

হাল কিন্তু ছাড়ে না।

পরের দিন আনে পৌনে দু টাকা দিয়ে ইন্দুর-মারা কল। একটা পটলকে ইন্দুর বানিয়ে ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে দেখিয়ে দেয় কলে পড়া মাত্র ঘচাং করে কী ভাবে সেটা দু টুকরো হয়ে যাবে।

'এ একেবারে গিলোটিন, মা। গিলোটিন কাকে বলে জানো তো ? গিলোটিন হল গিয়ে—'

'তুই কি একটা খুনখারাবি কাণ্ড না করে ছাড়বি না ?'

'তোমার কি আক্কেল বিবেচনা বলে কিছু নেই ঠাকুরপো। ছোট খোকা সারা বাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়—'

'তোমরা বুঝছ না বৌদি—'

'বুঝে আমার কাজ নেই ভাই।'

'ওই কল আমি পাততে দেব ভেবেছিস !'

'কী আশ্চর্য ! এ তো আমি দিনে পাতব না। রাত্তিরে, সবাই শুয়ে পড়লে—ও কি ! পটলটা ফেলে দিলে, মা।'

'ঘেন্না !'

'আনকোরা নতুন কল— !'

'ইন্দুরের রক্তে ছিষ্টিসংসার মাথামাখি—ম্যাগো !' ঘটির জলে কুলোয় না, হাত ধোয়ার জন্তে কমলা কুয়োতলায় যায়।

যতীন দপ করে উঠছিল, জিতেনকে দেখে সামলে নেয়

জিতেন বলে, 'তুই কি এবার চাকরির খোঁজ ছেড়ে ইন্দুরের পেছনে লাগলি? আজ কলকাতায় গিয়েছিলি? যাস নি? কেন? বলি কেন যাস নি? তোর না আজ সদাদার সাথে দেখা করার কথা।'

যতীন গুম হয়ে থাকে।

'জবাব দিচ্ছিস না যে? সদাদা নিজে থেকে বলল—'

'আজ না, রববার যেতে বলেছে।

'রববার? বেশ। কিন্তু তোর নিজেরও তো বন্ধুবান্ধব আছে? শুধু সদাদার ভরসায় না থেকে—'

সরযূ বলে, 'ইন্দুর নিয়ে কেন তুমি এত হইচই করছ ঠাকুরপো। কলোনীর কোন্ বাড়িতে ইন্দুর নেই বলতে পারো?'

কমলা বলে, 'কাজ নেই তো খই ভাজ!'

'ইন্দুর মারিবে খাইবে সুখে।' ভাইকে খোঁচা দেবার জন্যে জবর ছড়া কেটেছে ভেবে মোহিত হতে গিয়েই দৃশ্যটা মনে পড়ে যেতে জিতেন থু থু করে ওঠে।

যতীন তবু নাছোড়বান্দা।

পরের দিন সাত সকালে কলকাতায় গিয়ে চাকরির খোঁজে সারাটা দিন কাটিয়ে হতক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে শেষ ট্রেনে।

সবাই খুশি। চাকরি হোক না হোক চেষ্টা তো করছে। বাড়িতে এক বেলা না খেয়ে চেষ্টা!

তার পরের দিন নিয়ে আসে একটা ইন্দুর-ধরা কল। পৌনে দু টাকায় কল ফেরত দিয়ে বারো আনা গচ্চা দিয়ে চোদ্দ আনায়।

'আবার তুই—'

সরযূ বাধা দিয়ে বলে, 'থাক মা। এ কলে কোনো ভয় নেই, সবাই পাতে।'

নাঃ, বৌদি মানুষটা সত্যিই কৃতজ্ঞ। ওই ফুল বেচে দেনা শোধ হত না, কিন্তু মুফতে ওটা পেয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

এক ভাইয়ের কাছ থেকে একটা প্রেজেণ্ট পেয়েছে, আরেক ভাইয়ের কাছ থেকে আরেকটি আদায় করে নেবে।

বৌদি বশে থাকলে দাদাও থাকবে। মা বাবাও তাহলে পেছনে লাগবে না। চাকরে ছেলে বলে কথা!

নিজের ভাগের রুটি দিয়ে রাত্তিরে যতীন কল পাতে। ভাঁড়ার ঘরে।

শত্রুকে সরাসরি খতম করাতেই স্বর্গীয় সুখ। বিষ খাইয়ে বা কচুকাটা করে।

ও দুটোই খারিজ হয়ে যেতে প্রথমটা মুষড়ে পড়েছিল। খানিক পরেই বোঝে নিজের ভুল। শত্রুকে জ্যান্ত বন্দী করাই বেশি বাহাদুরি।

বিষ বা ইন্দুর-মারা কলে তো শত্রুর অন্তিমটা দেখতে পেত না।

উঠোনে নিয়ে গিয়ে কলের মুখ খুলে দেবে। বেরনো মাত্র খপ করে বেড়ালটা কামড়ে ধরবে। বেড়ালের যদি ফস্কে যায়, কাক আছে। তার চোখের সামনে শত্রুর দফা গয়া হবে।

উঁহু, নিজের শত্রুকে নিজের হাতেই খতম করবে। বাঁ হাতে কলের মুখ খুলবে, ডান হাতে একটি ডাণ্ডা। বেরনো মাত্র এক ঘায়ে—

উঁহু, ওতেও ষোল আনা তৃপ্তি নেই। জুতো পরে রেডি হয়ে থাকবে। বেরনো মাত্র পায়ে চেপে ধরবে। আলতো করে।

ক্ষয়ে ক্ষয়ে এমনই পাতলা হয়ে গেছে হাফসোল যে পায়ের তলায় একটা কাঁকড় পড়লেও টের পাওয়া যায়।

পায়ের তলায় ইন্দুরটা ছটফট করবে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুশির শিহরণ বইবে।

আস্তে আস্তে পা রগড়াবে। শত্রুর ছটফটানির শিহরণ প্রাণভরে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবে।

তারপর, উপভোগের ষোলকলা পূর্ণ হলে—আচমকা এক চাপ দিয়ে ফটাস করে পেটটা ফাটিয়ে নাড়িভুঁড়ি—

মাঝরাত্তিরে বিছানায় সারা শরীরে যতীনের রোমাঞ্চ ছোটে।

ঘোষসাহেব তাকে বিনা দোষে ছাঁটাই করেছে।

অকথ্য সাধ জেগেছিল সাহেবের মুখে একখানা ঘুষি বসায়। এক ঘুষিতে দুপাটি দাঁত খসিয়ে ফেলে ফোকলা মুখে হড় হড় করে পুরো হাতটা ঢুকিয়ে দেয়, দিয়ে পেট থেকে সাহেবের নাড়িভুঁড়ি টেনে ছিঁড়ে বের করে এনে হরির লুট দেয়।

কিন্তু সাধটা বুকে হর্দম ঘাই মারা সত্ত্বেও টু শব্দটিও মুখে করতে পারে নি।

কেননা মানুষটা এমনিতে রোগাপটকা হলে কী হবে, অত বড় কোম্পানির

ম্যানেজার। তাগদ যে তার কত স্ট্রাইকের সময় হাড়ে হাড়ে তা সমঝে দিয়েছে।

ঘোষসাহেবের গায়ে আঁচড় লাগলে দারোয়ানগুলো হামলে আসবে। তারা না সুবিধে করতে পারলে পুলিশের পাল।

অমন শত্রুর মোকাবিলা করবে যতীন হেন মানুষ! ঘাড় হেঁট করে অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে।

তাই বলে এখানেও হেরে যাবে? একটা ইন্দুরের কাছেও?

ইন্দুরের পোষা দারোয়ান আছে? পুলিশ আছে? মিলিটারি আছে? পুলিশ-মিলিটারির খবর্দারি করার জন্যে জাঁদরেল গবর্নমেণ্ট মোতায়েন আছে?

ভোর না হতেই যতীন ভাঁড়ারে ছোটে।

কোথায় দুষমন! রুটির টুকরো যেমনকে তেমন।

তবে কি আটা ভেজাল? পচা গমের আটা বলে ইন্দুরের মুখে রুচছে না?

অসম্ভব না। ইন্দুর তো মানুষ নয় যে খিদের জ্বালায় যা পাবে তাই খাবে।

পরের দিন কলকাতা থেকে সাহেব কোম্পানির পাউরুটি কিনে এনে কল পাতে।

ভোর না হতেই ভাঁড়ারে ছোটে।

কোথায় দুষমন! পাউরুটির টুকরো যেমনকে তেমন।

তবে কি কলেরই কোনো দোষ আছে?

কলের দোষ খুঁজতে গিয়ে কলটাকে করে ফেলে কয়েক টুকরো। তারপর এক লাথিতে টুকরোগুলিকে উঠোন পার করে দিয়ে ঝিম মেরে দাওয়ায় বসে থাকে।

দরদী গলায় সরযূ বলে, 'কী পাগলামো শুরু করেছ ঠাকুরপো—'

'থামো!'

'তোমার দাদা কিন্তু আজও—'

'দাদাকে বলো আমার চাকরি হয়ে গেছে। সামনের মাস থেকে—'

'চাকরি হয়ে গেছে? অ্যাঁ? ওমা! সেকথা এতক্ষণ বলো নি! তুমি কী গা!'

ভাগ্যিস কথাটা মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেছে। ভাগ্যিস!

সামনের মাসের এখনও তের দিন। এই তের দিন চুটিয়ে বাড়ির আদর সোহাগ আদায় করে নাও। হাসিমুখে পেট ভরে দু বেলা খাও।

এই তের দিন বাড়ি থেকে নট নড়নচড়ন। আর কলফল নয়, সরাসরি এবার শত্রুর মোকাবিলা।

হওয়া চাকরিও শেষ অব্দি ফসকে যেতে পারে। পাঁচ বছরের বনেদী চাকরি এক চিঠিতে খারিজ হয়ে গেলে পারে না?

জিতেন অফিসে। যাদব দাবার আড্ডায়। মকুন্দর বোনের সাধ খেতে কমলা গেছে সদলবলে।

দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বাপের হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে আকাশের দিকে যতীন চেয়ে ছিল। বৃষ্টিটা ঝেঁপে আসতে হুঁকো রেখে উঠে দাঁড়ায়।

যেমন তেড়ে শুরু হল, আধঘণ্টার মতো নিশ্চিন্ত।

শাবলটা তুলে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢোকে।

দুপাশে দুই ছেলে, মাঝখানে নিজে—প্ল্যান করে যাদব বাড়ি শুরু করেছিল। কিন্তু দুখানা ঘরেই প্রভিডেন্ট ফাণ্ড উবে যেতে ছোট ছেলের ঘরটা আর শেষ করতে পারে নি। হাত দুয়েক পাকা গাঁথনি, তারপর মাটির দেওয়াল, টিনের ছাদ। সিমেণ্টহীন এবড়োখেবড়ো মেঝে। দুটি জানালারই পাট খসে পড়ায় পেরেক দিয়ে পিচবোর্ড সাঁটা।

দরজা বন্ধ করতেই ঘর অন্ধকার। শাবলের এক খোঁচায় পিচবোর্ড ফালা ফালা করে ঘরে যতীন আলো আনে।

বাঁ পাশের তক্তাপোষের উপর রাজ্যের জিনিসপত্র লাট করা। চালের ড্রাম মাঝখানে। পুবদক্ষিণ কোণ ফাঁকা। আগে চালের ড্রাম ওখানে থাকত। জল পড়ে বলে ড্রাম সরাতে গিয়ে সরযূ চোরাই গুদামের হদিশ পায়। আধলা ইট দিয়ে গুদামের মুখ ঢাকা।

ইটটা সরিয়ে ফেলে যতীন গর্তের মধ্যে শাবল ঢুকিয়ে দেয়। বারকয়েক গোঁত্তা মেরে শাবলটা তুলে এনে হাত বুলিয়ে দেখে। রক্ত মাংসের ছিটেফোঁটাও নেই।

থাকবে না জানা কথা। অতগুলো মানুষকে নাজেহাল করেছে যে ধড়িবাজ শয়তান আর সে ওখানে থাকে!

তবে কি ওপাশের গর্তটা? বাঁ দিকেরটা? ডান দিকেরটা? ওইটা? ওইটা? ওইটা?

গর্ত দেখে আর শাবলের কোপ বসায়। শাবল ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে দিয়ে মাটির চাংড়া তুলে ফেলে।

কোথায় দুষমন!

উত্তেজনায় বুক ধড়ফড় করে। মিনিট কয়েকেই ঘেমেনেয়ে ওঠে। কিন্তু না, পিছু হটা চলবে না। সামান্য একটা ইন্দুরের কাছেও—

অকথ্য আক্রোশে কপালের শিরা দপদপ করে। পেশীতে পেশীতে টান ধরে।

তক্তাপোষের ওপাশে নেই তো?

খানিক হিড় হিড় করে টানতেই সামনের দুই পায়া ভেঙে তক্তাপোষটা কাং হয়ে পড়ে, কয়েকটি থালা-বাটি-গেলাস গড়াতে গড়াতে এসে পায়ের পাতা ছেঁচে দেয়।

যতীনের ভ্রূক্ষেপ নেই। দুই চোখ তখন তার ঠেলে বেরিয়ে এসেছে: গ্যাখ কাণ্ড! দেওয়াল-মেঝের খাঁজে অত বড় বড় গর্ত, আর সে কিনা এতক্ষণ ফাটা মেঝেয় শাবল চালিয়ে মরছিল!

লাফ দিয়ে যতীন ওপাশে যায়।

শত্রুর আস্তানার হদিশ মিলেছে। আর নিস্তার নেই। এবার ওদের সবংশে নিধন করবে।

ঘোষসাহেবের কাছে হেরে গেছে বলে সামান্য একটা ইন্দুরের কাছেও—

পাঁঠা বলি দেওয়ার ভঙ্গিতে নীল ডাউন হয়ে বসে যতীন সবচেয়ে বড় গর্তটায় শাবল ঢুকিয়ে প্রাণপণে চাড় দেয়।

দিয়েই 'মাগো!' বলে গলা চিরে আর্তনাদ করে ওঠে।

ছোবলটা একেবারে ঘাড়ের ওপর পড়ে কিনা!

অমল দাশগুপ্ত

একটি গোয়েন্দা গল্প

গোড়াতেই জানিয়ে রাখি আমি গোয়েন্দা নই। না পেশাদার, না শখের। এমনকি গোয়েন্দা গল্পের বই পড়তেও আমার ভালো লাগে না (শার্লক হোমস ছাড়া)। তবুও আমি একবার গোয়েন্দাগিরি করেছিলাম। শার্লক হোমসের মতো একজন সহকারী এখনো খুঁজে পাই নি। তাই নিজেই লিখছি। নিজের গল্প নিজে লেখার একটি অসুবিধে এই যে নিজের কৃতিত্বের ছটাকে সূর্যের আলোর মতো আকাশভুবনে ছড়িয়ে দেওয়া চলে না—খানিকটা বিনয়ের আড়াল তুলতে হয়। উপমা দিতে হলে বলা চলে, বায়ুমণ্ডলের ওজোন-পর্দার মতো, যা সূর্যের আলোর অতিবেগুনী রশ্মি প্রতিহত করে। তবুও আমি আশা রাখি, আমার এই লেখাটিকে স্পেকট্রোস্কোপের বর্ণালীর মতো এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে পারব যে আমার কৃতিত্বের অতিবেগুনী রশ্মি পাঠকদের কাছে অপ্রতিভাত থাকবে না।

গোয়েন্দা গল্পের গোড়াতেই একটি খুন থাকা দরকার, নইলে গল্প জমে না। আমার এই গল্পটি একেবারেই বিপরীত। খুন না হবার গল্প, চারদিকে অনেক আয়োজন থাকা সত্ত্বেও। একালে—যখন মাটির মানুষ আকাশে পাড়ি দিচ্ছে, যখন বস্তুর পাশে পাওয়া যাচ্ছে বিপরীত-বস্তু—তখন গোয়েন্দা-গল্পের পুরনো রীতিটিই বা কেন অপরিবর্তিত থাকবে! আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা ভারতীয়রা যদিও পরমাণু-বোমা তৈরি করি নি, যদিও রকেটে চেপে আকাশে পাড়ি দিই নি কিন্তু অনেক ভৌতিককে (মেটিরিয়াল অর্থে) করে তুলেছি আধিভৌতিক (ইথিরিয়াল অর্থে), অনেক হওয়াকে না-হওয়া। জগতে আনন্দলোকে আমার নিমন্ত্রণ ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন। এই আনন্দলোক এখন শুক্রগ্রহের উপরিতলের মতো ঘন-অবগুণ্ঠিত, পরমাণু-বোমার ভস্মে যা তৈরি। হিরোশিমায় কয়েক মিনিটের মধ্যে দু-লক্ষ মানুষ খুন হয়েছিল। আর সম্প্রতিকালে পরমাণু-

বোমার সাহায্য ছাড়াই ভিয়েতনামের মতো ছোট্ট দেশে আমেরিকানরা দু-লক্ষ মানুষকে খুন করেছে। তার চেয়েও চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত কলকাতার রাজভবনের সামনের রাস্তায়। কামান, বন্দুক, ট্যাংক, জেটপ্লেন—কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় নি। সেই মান্ধাতার আমলের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে আশিজনকে। শার্লক হোমসের গল্পে অজস্র খুনের বিবরণ আমি পেয়েছি। কিন্তু এমন অনাবৃত, উলঙ্গ, মাত্রাতিরিক্ত রকমের জটিলতা-বর্জিত খুন শার্লক হোমসের উর্বর কল্পনাতেও অসম্ভব ছিল।

তাই বলছিলাম, এত যেখানে খুনের ছড়াছড়ি সেখানে সরাসরি খুন নিয়ে আর গোয়েন্দা গল্প লেখা চলে না। আমার ধারণা, হালের গোয়েন্দা গল্পের লেখকরা এখনো এই বাস্তবতা ধরতে পারেন নি। কেননা, বইয়ের দোকানে যে-সব গোয়েন্দা গল্পের বই সাজিয়ে রাখতে দেখি তার প্রত্যেকটির মলাটেই এখনো পর্যন্ত প্ল্যাঙ্কস কনস্টাণ্ট-এর মতো সেই চিরাচরিত খুনের ছবি। অথচ ইতিমধ্যে আমাদের পরিচিত জগৎটা মাটি থেকে আকাশের দিকে, নক্ষত্র থেকে গ্যালাক্সির দিকে, হ্যাঁ-বস্তু থেকে না-বস্তুর দিকে ধাবমান। এখন আর খুন-হওয়ার খুন নয়, খুন না-হওয়ার খুন।

খুন না-হওয়ার খুন! মনে করুন, আপনি একেবারে সুন্দরবনের বাঘের মুখোমুখি। আপনার হাতে বন্দুক আছে, বাঘটি ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই আপনি বাঘটিকে খুন করলেন। আপনি বলবেন, এই তো খুন না-হওয়ার খুন। আমি বলব, না। হাতে বন্দুক আছে, হাতের নিশানা ভ্রষ্ট হবার কোনো কারণ নেই, বাঘ যতো সামনাসামনিই এসে পড়ুক এই পরিণতিটি অবধারিত ছিল। আর ব্যতিক্রম ঘটলেও আক্ষেপের কোনো কারণ থাকত না। যেদিক দিয়েই বিচার করা যাক, এক্ষেত্রে একটি খুন কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। কিংবা মনে করুন, বড়ো রাস্তার ধারে স্কাইস্ক্রেপার বাড়ি উঠছে। অনেক উঁচুতে বিপজ্জনকভাবে বাঁশের ভারার উপরে দাঁড়িয়ে কাজ করছে ছোট্ট একটি মানুষ। নিচে থেকে তাকিয়ে দেখলেও বুক কেঁপে ওঠে। একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে, এক্ষেত্রে খুনকে জয় করা হয়েছে, উভয়তই, মানুষটির দিক থেকে তো বটেই, মানুষটির পরিবারের দিক থেকেও। এক্ষেত্রে একটি খুনকে অনুসরণ করবার জন্যে অনেকগুলো খুন অপেক্ষা করে আছে। কিংবা মনে করুন, সার্কাসের মেয়েটি একটি কাঠের বোর্ডে পিঠ দিয়ে লীলায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। দূর থেকে একজন ষণ্ডামার্কা

লোক মেয়েটিকে লক্ষ করে ছোরা ছুঁড়ছে। যতটুকু হিসেবের গরমিলের জন্যে লুনিক-১ চন্দ্রের পাশ কাটিয়ে মহাশূন্যে উধাও হয়েছিল তার ভগ্নাংশ পরিমাণ এদিক-ওদিক হলেও একটি ছোরা সরাসরি এসে বিঁধতে পারত মেয়েটির বুকে। কিন্তু বিঁধছে না। মেয়েটির দেহটিকে ঘিরে অপরূপ একটি ছবি রচনা করছে। খুনের প্রান্তদেশে থমকে দাঁড়ানো রুদ্ধশ্বাস কয়েকটি মুহূর্ত! তবুও কিন্তু খুন নয়। কিংবা মনে করুন—

কথা না বাড়িয়ে আসল কথাটা বলেই ফেলি। যারা হিমালয়ে ওঠে, যারা সমুদ্রে ডুব দেয়, যারা রকেটে চেপে মহাশূন্যে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে আসে, যারা উঁচু পোস্টের মাথায় দাঁড়িয়ে হাই-টেনশন লাইনে কাজ করে, যারা খাঁচার মধ্যে ক্ষুধার্ত বাঘ বা সিংহের মুখের মধ্যে মাথা বাড়িয়ে দেয়, যারা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির গহ্বরে ঢুকে পড়ে, যারা প্যারাস্যুট নিয়ে ঝাঁপ দেয়, যারা—ফিরিস্তি বাড়াবার দরকার নেই—যারা এমনি আরো সব বিপজ্জনক কাজে প্রতি মুহূর্তে প্রাণকে তুচ্ছ করে চলে, তাদের কৃতিত্বের কোনো তুলনা নেই। তাদের আমি দূর থেকেই প্রণাম জানাই। এমনকি শার্লক হোমসের মতো গোয়েন্দাকেও কোনোদিন এইসব নমস্য ব্যক্তিদের দুঃসাহসিকতার রহস্য সন্ধান করতে হয় নি। আমি শুধু ভাবছি সেই মানুষটির কথা যাকে সারাক্ষণই—

শুরু থেকেই বলি। মানুষটিকে একদিন আমি বলতে শুনেছিলাম যে ওর ছেলেমেয়েগুলো নাকি বাঁচবে না। না, কোনো আততায়ী এসে খুন করে যাবে তেমন আশঙ্কা নেই। আমি প্রশ্ন করতে খুব স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছিল যে বাঁচবে না খেতে না পেয়ে। ভাবুন ব্যাপারখানা! শার্লক হোমস বহু মানুষকে সম্ভাব্য খুন থেকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু আততায়ী যেখানে অশরীরী, খিদে নামক অব্যয় একটি অনুভূতি, সেখানে তিনিও কি কিছু করতে পারতেন? আমার তো মনে পড়ছে না।

প্রথমে আমার মনে হয়েছিল আমারও কিছু করার নেই। তবে কৌতূহলবশেই খোঁজখবর নিয়েছিলাম। সংগৃহীত তথ্যগুলো এই: বয়স— ছত্রিশ। বিয়ে—বারো বছর। সন্তান—চারটি, কোলেরটি ছেলে, বাকি তিনটি মেয়ে, বড়ো মেয়ের বয়স ছ-বছর, ছেলেটির ছ-মাস। চাকরি— অস্থায়ী, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বা গ্র্যাচুইটি নেই, ছুটি নিলে মাইনে কাটা যায়। মাইনে—একশো আশি। ধার—আপিসে তিনশো, মাসে ত্রিশ টাকা করে

কাটা যাচ্ছে; কাবুলিওলার কাছে চারশো, মাসে চল্লিশ টাকা করে সুদ, আসল শোধ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই; বন্ধুবান্ধবের কাছে সব মিলিয়ে প্রায় সাতশো, সুদ দিতে হয় না, এর কাছ থেকে ধার করে ওকে শোধ করা, আবার ওর কাছ থেকে ধার করে একে শোধ করা। স্বাস্থ্য—স্বামী-স্ত্রীর মোটামুটি ভালো, ছেলেমেয়েরা হামেশাই ভোগে, বিশেষ করে জ্বরে ও পেটের অসুখে, মাঝে মাঝে হুপিংকাশিতে ও জটিলতর কোনো অসুখে। বাড়িভাড়া—ত্রিশটাকা। ডাক্তার ও ওষুধ—ছ টাকা। রেশন—বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা। জ্বালানী—কয়লা, ঘুঁটে, কাঠ, কেরোসিন ইত্যাদি বাবদ আট টাকা। মাসকাবারী—তেল, ডাল, মশলা, সাবান, ব্লেড ইত্যাদি বাবদ পনেরো টাকা। কাঁচাবাজার—একদিন পর একদিন একটাকা। দুধ—দিনে একপোয়া হিসেবে প্রায় দশটাকা। আতিথেয়তা—পাঁচ টাকা। যাতায়াত—সাড়ে-সাত টাকা। অন্যান্য খরচ—অনিশ্চিত।

তারপরে যোগ করতে গিয়ে দেখলাম, হিসেবটা কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না।

সেই থেকে আমার কৌতূহল। চোখের ওপরে দেখতে পাচ্ছি, মানুষটি দিনের পর দিন আপিসে আসছে, সিনেমা পত্রিকায় প্রায়-বিবসনাদের ছবি দেখতেও অনাগ্রহ নেই, পরনিন্দার সুযোগ পেলে তো রীতিমতো উৎসাহিত—সে কী করে এতবড়ো একটা হিসেবের গরমিলকে মাসের পর মাস টেনে যাচ্ছে?

সেই থেকেই আমার গোয়েন্দাগিরি। শার্লক হোমসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি শুরু করলাম এমন এক জায়গা থেকে যার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে আমার মূল অনুসন্ধানের কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষটিকে নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন করে আমি জানতে চেষ্টা করলাম, শিশুর সংখ্যা যেখানে চার, দুধের পরিমাণ যেখানে একপোয়া, সেখানে কী করে দিনে পাঁচ থেকে সাত কাপ চা তৈরি হতে পারে? এবারেও জবাব পেলাম খুব স্পষ্ট। একপোয়া দুধে জল মেশালেই তা নাকি আধসের হয়ে যায়, আরো জল মেশালে তিনপোয়া, ইত্যাদি।

কিছুদিন আগে রাস্তায় রাস্তায় একটি পোস্টার দেখেছিলাম। এল-আই-সিতে নাকি ইলেকট্রনিক কম্পিউটর বসছে আর তার ফলে কয়েক-শো কর্মচারীর ছাঁটাই হবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক কম্পিউটর

[সুরেন (... িকঙ্করদা]

[করুণা সাহা

কয়েক-শো মানুষের কাজ করবে একা। ইলেকট্রনিক কম্পিউটরকে বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কার। ইলেকট্রনিক কম্পিউটরে তৈরী রোবোট মানুষ রক্তমাংসের মানুষের চেয়েও অনেক নিখুঁতভাবে ও সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করার ক্ষমতা রাখে। আর অনেক বেশি পরিমাণে তো বটেই। উপরন্তু, মস্ত সুবিধে এই যে রোবোটের খিদে নেই, ক্লান্তি নেই, দুশ্চিন্তা নেই। রোবোটকে লুপ পরাবার জন্যে প্রদর্শনী সাজাতে হয় না বা বেতার মারফৎ প্রচার করতে হয় না। রোবোট হুকুম পাওয়া মাত্রই মস্ত মস্ত কারখানা চালাবে, বিপুল নদী-পরিকল্পনার বাঁধ বসিয়ে দেবে, গ্রহান্তরগামী রকেটকে নির্ভুল কক্ষে স্থাপিত করবে। কিন্তু আশ্চর্য-প্রদীপের দৈত্য শেষপর্যন্ত সামান্য একটি কোঁকড়া চুল সিধে করতে গিয়ে হার মেনেছিল। আমার ধারণা রোবোটও হার মানবে একপোয়া দুধকে আধসের করতে বললে। বা তিনপোয়া। বা—

আমি বুঝলাম, আমাকে পাল্লা দিতে হচ্ছে এমন একজন মানুষের সঙ্গে যে রোবোটকেও টেক্কা দিতে পারে।

একদিন আমি মানুষটিকে ডেকে একটি ছবি দেখালাম। ষোল বর্গইঞ্চি জায়গা জুড়ে কতকগুলো ক্রসচিহ্ন ও কালো ছোপকে ঘিরে অনেকখানি সাদা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে পরে মনে হয়, কী যেন একটা রহস্য ঘোমটা খুলতে চাইছে। মানুষটিকে আমি বললাম যে এমনি ধরনের একুশটি ছবি তোলবার জন্যে কয়েক-শো কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে। এমন সাধারণভাবে কয়েক-শো কোটি বলে গেলাম যেন খরচের পরিমাণটি এক্ষেত্রে ধর্তব্যের বিষয়ই নয়।

মানুষটিও তা ধরল না। অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে তাকিয়ে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল মঙ্গলগ্রহে মানুষ আছে কিনা। যখন শুনল, নেই, তখন একটু যেন হতাশ হল। শার্লক হোমসের শিষ্য আমি তক্ষুনি বুঝতে পারলাম, এই আমার সূত্র। এই মানুষটির তো মানুষের সমাজ থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছে হওয়াটাই স্বাভাবিক!

স্বভাবতই সূত্রটিকে আমি অনুসরণ করতে শুরু করলাম সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বড়ো মেয়েটিকে স্কুলে ভর্তি করাবার কথা ও ভাবছে কিনা। এবারে ও আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করল, স্কুলে পড়লেই কি পণ্ডিত হওয়া যায়? আমি তখন ওকে জিজ্ঞেস করলাম, স্কুলে

না পড়েই পণ্ডিত হয়েছে এমন কোনো দৃষ্টান্ত ওর জানা আছে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে ও তেরেশ্‌কোভার নাম করে বসল।

আমি বিব্রত বোধ করলাম। কেননা আমি নিজেও জানি না তেরেশকোভার পাণ্ডিত্য কতখানি আর সেই পাণ্ডিত্য স্কুলে লেখাপড়া শেখার ফলে কিনা। তেরেশকোভা যদি কোনোদিনই স্কুলের চৌকাঠ না মাড়িয়ে থাকেন—তাতে কি তিনি ম্লান হয়ে যাচ্ছেন? কই, তেরেশকোভার সঙ্গে স্কুলের লেখাপড়ার কোনো সম্পর্ক আছে বলে তো একবারও আমাদের মনে হয় না!

তেরেশকোভার ভোস্তোক যখন পৃথিবীকে পাক দিচ্ছিল, আমি ভাবতাম, পৃথিবী থেকে কত কত উঁচুতে এই মেয়েটি! কবে নেমে আসবে, এই ছিল সারাক্ষণের ভাবনা। তারপরে নেমে আসার পরে আমি একদিন ভোস্তোকের কক্ষপথের একটি মডেল দেখলাম। ও হরি, পৃথিবী যদি একটা কমলালেবু হয় তো ভোস্তোকের অবস্থান তো কমলালেবুর খোসার গা ঘেঁষেই। কোথায় ভ্যান অ্যালেন বলয়, কোথায় চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা, কোথায় ছায়াপথ, কোথায় নীহারিকা, কোথায় সেই অন্তহীন মহাশূন্য! এক সময়ে যা এত দূরে, অন্য সময়ে তা কত কাছে! আসলে, কি-ভাবে ভাবা হচ্ছে সেটাই আসল কথা। মানুষটি হয়তো ভাবছে, স্কুলের চেয়ে হেঁসেলটাই ছ-বছরের মেয়েটির পক্ষে পাঠ নেবার প্রশস্ততর জায়গা। বর্ণপরিচয় প্রথম-ভাগ পাড়ি দিয়ে শ্রীচরণের দাসী লিখতে পারলেই অনেক সময়ে স্ট্রাটোস্ফিয়ার থেকে নীহারিকার জগতে পৌঁছনো চলে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ফোটোন রকেট আবিষ্কারের জন্যে অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই। এই মানুষটির কাছেই পাঠ নেওয়া যেতে পারে।

তখন আমি ভাবলাম, অনুসন্ধানটি চলা উচিত আরো অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। যেমন ধরুন, দেশে বন্যা হয়েছে। বন্যার্তরা ভাবছে কোনো মন্ত্রী হয়তো জলপথে সফর করতে আসবেন ও দুঃখদুর্দশার ছবিগুলো সামনে থেকে দেখবেন। কিন্তু মন্ত্রী আসেন বিমানপথে। কৃতী গোয়েন্দার অনুসন্ধানের পদ্ধতির মধ্যেও এমনি একটি চমক থাকা উচিত।

অনেক ভেবেচিন্তে আমি একদিন নিতান্তই কথার পিঠে কথা বলার মতো করে বললাম যে জেমিনি-৪ থেকে এডওয়ার্ড হোয়াইট যখন মহাশূন্যে বেরিয়ে এসেছিলেন তখন তাঁর শরীরটি ব্যোমযানের সঙ্গে বাঁধা ছিল সোনার দড়ি

দিয়ে। ও আমাকে জিজ্ঞেস করল, দড়িটি কত ক্যারেটের সোনা দিয়ে তৈরি তা আমি জানি কিনা। আমার জানা ছিল না। কিন্তু ওর এই প্রশ্ন থেকেই আমি একটি সূত্র পেয়ে গেলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, চোদ্দ ক্যারেটের সোনার গয়না ও কি পছন্দ করে? এবারেও ওর স্পষ্ট জবাব: সোনার গয়না আদপেই ওর পছন্দ নয়। প্লাস্টিকের গয়না নাকি সোনার গয়নার চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর। সহধর্মিনীরও তাই মত কিনা জানতে চাওয়াতে ও শুধু একটু হাসল। আমার কাছে এই হাসির অর্থ: অবশ্যই তাই।

এতক্ষণে যেন একটু আলোর রেখা। এডওয়ার্ড হোয়াইটের হাতে প্রোপাল্সন পিস্তল ছিল—তবুও তিনি সোনার দড়ি দিয়ে নিজের চলাফেরার এলাকাকে গণ্ডীবদ্ধ করেছিলেন। মহাশূন্যে তাঁর কোনো ওজন ছিল না। তিনি খুশিমতো নড়াচড়া করেছিলেন। কিন্তু এই মানুষটির হাতে জবরদস্ত চাকরির প্রোপাল্সন পিস্তল নেই। জীবনধারণের মহাশূন্যে তাঁর পরম নির্ভর ছিল যে বৌয়ের গয়না দিয়ে তৈরি সোনার দড়িটি—তাও হাতছাড়া। ওদিকে ওজনটি ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

তখন আমি বুঝলাম, আমাকে এমন একজন মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে হচ্ছে যার কাছে লিওনভ বা হোয়াইটের কৃতিত্বও অনেকখানি ম্লান।

আমি কিন্তু এত সহজে হার মানতে রাজি নই। হিসেবে গরমিলের রহস্য আমাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে। এমন একজন দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে শার্লক হোমস কী করতেন বা আদৌ কিছু করতে পারতেন কিনা—অনেক ভাবনাচিন্তার পরেও আমি তার কোনো কূলকিনারা করতে পারলাম না। তারপরে আরো কয়েকবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে শেষপর্যন্ত যে-পথে আমি সাফল্যলাভ করেছিলাম, তার উল্লেখ করেই আমার কাহিনী শেষ করছি।

একদিন আমি একটা বাংলা লেখা থেকে কিছুটা অংশ ওকে পড়ে শোনালাম। লেখাটির বিষয়, নভশ্চরের আহার্য। পঠিত অংশটি নিম্নলিখিতরূপ:

বিকভস্কির আহারের অনুপাত ছিল এই: প্রোটিন ১১৫, স্নেহ ৭৮·৫, কার্বোহাইড্রেট ৩৩২·৫, মোট ক্যালরি ২৫২৬। আর আহার্য-তালিকায় ছিল: কাটলেট, দু-রকমের ভাজা মাংস, মুরগির মাংস, গোরুর জিভ, কিমা, প্যাটি, জেলি, টাটকা কমলালেবু, আপেল, পাতিলেবু ও অন্যান্য ফল, মাছের ডিমের

স্যাণ্ডউইচ, নানা রকমের ফলের রস। এসব খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে নানা রকমের ভিটামিন মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নভশ্চররা দিনে চারবার করে নিয়মিত সময়ে খেয়েছিলেন।

গাগারিন ও তিতোভ টিউব থেকে মণ্ডের আকারে খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন। কন্তু নিকোলায়েভ ও পোপোভিচকে যতদূর সম্ভব সাধারণ খাদ্যের আকারেই আহার্য দেওয়া হয়েছিল। দুজনের খিদেও হয়েছিল বেশ স্বাভাবিক রকম। চিবিয়ে গিলে খেতে তাঁরা কোনো অসুবিধে বোধ করেন নি।

কিন্তু মার্কিন নভশ্চর গর্ডন কুপার মহাকাশ-পরিক্রমার সময়ে খাদ্যের যোগান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য নানা অসুবিধের জন্যে ঠিকভাবে খেতে পারেন নি।

এ-পর্যন্ত পড়তেই ওর চোখদুটো বড়ো বড়ো। আমাকে জিজ্ঞেস করল, খাবার সামনে রয়েছে অথচ খেতে পারছে না—এ-ব্যাপারটা কি-করে সম্ভব ?

এ-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমি ওকে জানালাম যে গর্ডন কুপারের ওজন সাত পাউণ্ড কমে গিয়েছিল।

তখন আমাকে ও জিজ্ঞেস করল, গর্ডন কুপারের কি খিদে পেত না ? আমি ওকে জানালাম যে খিদের কথা গর্ডন কুপার কিছু বলেন নি।

এতদিন পরে, এত চেষ্টার পরে, এই প্রথম দেখলাম ও সত্যিই একেবারে হতবাক। আমি বুঝলাম, প্রতিদ্বন্দ্বী এবার একেবারে আমার হাতের মুঠোয়। তারপরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ওর ভেতরের কথাটি বার করে নিতে আমার বিশেষ অসুবিধে হল না। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম মোটর-রেসের চ্যাম্পিয়ন ড্রাইভার শহরের রাস্তায় দশ-মাইল বেগে মোটর চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে। এক দুর্ধর্ষ মুষ্টিযোদ্ধা নাকি ডেন্টিস্টের কাছে দাঁত তুলতে গিয়ে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল হাতি বুকে নিতে পারে এমন একজন পালোয়ান নাকি ইঁদুর দেখলে পালিয়ে আসে।

তেমনি আমার এই অমিত শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমি আবিষ্কার করলাম তার দুর্বলতম স্থানটিতে।

খিদে। এক সর্বগ্রাসী খিদের আগুনে মানুষটি অসহায়ভাবে পুড়ছে। অসহায়ভাবে পুড়তে দেখছে নিজের পরিবারকে, নিজের তিনটি মেয়ে ও একটি ছেলেকে। এই আগুন থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। কেননা

হিসেবের যে-গরমিলটা তাকে দৈত্যের মতো গ্রাস করতে চায় তাকে ঠেকিয়ে রাখতে হলে এই তার একমাত্র আশ্রয়।

তখন মানুষটিকে দেখে আমি ভৌতিক থেকে আধিভৌতিকে উত্তীর্ণ হলাম। আহা, মানুষ যদি সরীসৃপ হত! একটি ব্যাঙ মুখে পুরতে পারলে সাতদিনের মতো সাপের খিদে মিটে যায়। আহা, মানুষের যদি সাপের মতো হাইবারনেশন থাকত! পুরো একটি শীতকাল তো দূরের কথা, পুরো একটি রাতও খিদের জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। আর খিদে তো শুধু একার নয়, পুরো একটি পরিবারের। আর খিদে তো শুধু ভাতের নয়, আরো অনেক কিছুর। আহা, মানুষ যদি বাতাস খেয়েই খিদে মেটাতে পারত!

অশোক মিত্র

অন্ধকারে রাত্রি লেপে যাক

ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, কিন্তু এখনো পাপপুণ্যবোধ বিচ্যুত হতে পারি নি। ধূর্জটিপ্রসাদ গত হয়েছেন প্রায় চার বছর হতে চলল। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মনিযুক্ত তাঁর কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র এবং অনুরাগীরা মিলে স্থির করেন, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত কতিপয় প্রবন্ধ জড়ো করে গ্রন্থ প্রকাশ হবে। ধনবিজ্ঞান—সমাজবিজ্ঞান—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নানা মহল জুড়ে প্রবন্ধগুলির বিষয়ের বিস্তার হবে, লিখবেন এমন কয়েকজন যাঁরা ধূর্জটিপ্রসাদকে খুব কাছে থেকে জেনেছিলেন, তাঁর স্নেহ পেয়েছিলেন, তাঁর মনীষা ও চরিত্রস্নিগ্ধতার সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছিলেন। কিন্তু, যা হয়ে থাকে আমাদের দেশে, এই প্রস্তাবিত স্মৃতিগ্রন্থের উদ্যোক্তাদের মধ্যে কিছুদিনের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে যায়: পাড়ার সার্বজনীন পুজো একটা ভেঙে যেমন দুটো হয়, ধূর্জটিপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষা উপলক্ষ করে তেমনি সুতরাং দুটো প্রবন্ধসংগ্রহের সিদ্ধান্ত অচিরে গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় সংগ্রহটির উদ্যোগী হয়ে পড়েন রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁর আরেক প্রাক্তন ছাত্র ও অনুরাগীগোষ্ঠী।

এ-সমস্ত ব্যাপারগুলো ঘটে বছরতিনেক আগে। আমি তখন বিদেশে, দু-পক্ষ থেকেই আহূত হই প্রবন্ধ পাঠাবার জন্য, অন্যতম পক্ষ কিছু অর্থসাহায্যের জন্যও অনুরোধ জানান। বিবদমান দুই সুহৃদসম্প্রদায়ের মধ্যে সমব্যবধান বজায় রাখবার সংকল্পে বদ্ধপরিকর আমি, যাঁরা অর্থ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিই; অন্য-পক্ষকে ভরসা দিই যথাশীঘ্র প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেব।

বিদেশে বসেও প্রতিশ্রুতিদ্বয় স্বচ্ছন্দে রক্ষা করা যেত, তা তো হয়ই নি, দেশে প্রত্যাবর্তন করেছি দু-বছরের উপর হল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত না পাঠানো হয়েছে প্রবন্ধ, না পৌঁছে দিয়েছি অন্য পক্ষকে গ্রন্থপ্রকাশের সুবিধার্থ চাঁদা। ধূর্জটিপ্রসাদকে আমরা অনেকেই গভীর শ্রদ্ধা করতুম, অনেক পেয়েছি-জেনেছি-

শিখেছি তাঁর কাছে থেকে, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ভক্তি-অনুরাগে কোনোরকম ফাঁকি ছিল বা আছে তা স্বীকার করা অসম্ভব, অথচ আজ পর্যন্ত প্রস্তাবিত ঐ স্মৃতিগ্রন্থদ্বয়ের একটিও প্রকাশিত হয় নি। আমার মতো আরো বেশ কয়েকজন কথা দিয়ে কথা রাখেন নি, ঝগড়াঝাঁটি আরো গড়িয়েছে, বহু বিভঙ্গের মান-অভিমানের পালা। এতটা সময়ের ব্যবধানে, শেষপর্যন্ত যদিই বা প্রকাশিত হয়, কিছুটা অবান্তরতার প্রশ্ন নিশ্চিত এসে যাবে, অনেকেই হয়তো বলাবলি করবেন, কেমনধারা লোক এঁরা, এতটা গড়িমশি করে পাঁচ বছর গড়িয়ে যাবার পর তাঁরা সময় পেলেন ধূর্জটিপ্রসাদকে তর্পণ করার!

এই অনুযোগ-কটুবর্ষণ অযৌক্তিক হবে না। আমরা, যাঁরা এতটা কালহেলন করেছি, করছি, আমরা প্রত্যেকে কৃতঘ্ন। ঈশ্বরভক্তির মাপকাঠিতে পাপপুণ্যের হিসেবে মগ্ন হতে আমার আগ্রহ নেই, কিন্তু পাপ অত্যন্ত সহজবোধ্য অনুভূতি: ধূর্জটিপ্রসাদের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানানোর উপলক্ষে এ-ধরনের অবমাননার আয়োজন আমার বিবেচনায় পাপ।

পাপবোধের ক্ষমতা পর্যন্ত আমরা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি। অপরাধবোধের মধ্য দিয়ে খানিকটা পাপস্খালনের সুযোগ মেলে। ন'মাসে-ছ'মাসে বিবেক মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, নিজের কাছে নিজেরই মাথা হেঁট হয়, নীরবে আমরা কৃতকর্মের জন্য মার্জনাভিক্ষা করি। এই স্বগত, নিভৃত মার্জনাভিক্ষা হয়তো সুবিধাবাদের অভিব্যক্তি, হয়তো নিছক মতলববাজ, অসাধু অবচেতনা নিজের কাজ হাসিল করে মস্ত খুশি। কিন্তু এই আচরণ যদি অভিনয়ও হয়, তাহলেও অত্যন্ত এটুকু বলা চলে, আর যা-ই হোক, আমার সামাজিক বিবেককে আমি এখনো উড়িয়ে দিতে শিখি নি, পাপে আমার ভয়, পাপ ঢাকবার জন্য তাই এখনো আমার ওষ্ঠাগত আকুলি, ক্ষমা-চাওয়ার অভিনয় করি কারণ আমি অপরাধ সম্পর্কে সচেতন।

কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে এই অপরাধচেতনা পর্যন্ত বিলীয়মান বস্তু। বিবেক নিয়ে বিলাসিতা করার মতো সময় নেই আমাদের কারো, আমরা ব্যস্ত, আমরা সাফল্যের মগডাল থেকে পরের মগডালে আরোহণের কসরতে নিয়োজিত। আমাদের বাড়তি সময় নেই। অতএব বিবেক নেই, স্মৃতি নেই। ধূর্জটিপ্রসাদের স্মৃতি ভাঙিয়ে যদি এই মুহূর্তে আমার কোনো জাগতিক সুবিধা হয়, তাহলে সময় খরচ করতে রাজি আছি, নইলে আর কেন অপচয়গত হওয়া। আমরা সবাই-ই ধনবিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে যাচ্ছি, ন্যূনতম ব্যয়ে উচ্চতম

উপার্জনের সম্ভবপরতার গণিতে আমাদের অখণ্ড আগ্রহ। ধূর্জটিপ্রসাদ-আরাধনায় যখন সতেরো নয়া-পয়সা লাভেরও সম্ভাবনা নেই, তাহলে আর কেন।

হাওয়া বদলেছে, কালের প্রকৃতি অন্যরকম। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে বাক্যব্যয় তাই অনেকের কাছেই অশোভন, প্রায়-প্রতিক্রিয়ালগ্ন কালক্ষেপণ বলে মনে হবে। তাছাড়া, শাদামাঠা কোনো স্তুতিকাহিনী বর্ণনা খুবই জোলো লাগবে, এবং ধূর্জটিপ্রসাদ জোলো পদার্থ আদৌ পছন্দ করতেন না। বাংলাদেশে তাঁর পরিচয় সাহিত্যিক হিসেবে, 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর সুবাদে সেই পরিচয়ের শুরু, 'পরিচয়' পত্রিকার মারফৎ তা পরে ব্যাপ্তি পেয়ে থাকে। প্রবাসে থাকেন, পণ্ডিত অধ্যাপক, ক্ষুরধার বুদ্ধি, গানের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রায়ই একহাত লড়েন, দু-একটা 'মননশীল' উপন্যাস লিখেছেন যেগুলো প্রবন্ধেরই নামান্তর, তর্কে-গল্পে-আড্ডায় তুখোড়, ছুটিতে যখন কলকাতায় আসেন শৌখিন বুদ্ধিজীবীমহলে উজ্জ্বল উৎসাহ ছড়িয়ে পড়ে; তাছাড়া বাঙালি হীনমন্যতার বিস্ময়বিস্ফারিত প্রকাশ, কেমন চকচকে-ঝকঝকে ইংরেজি লেখেন পর্যন্ত; আশ্চর্যরকম সুপুরুষ, দীর্ঘ সুগৌর দেহ, দু-চোখে মেধা-বুদ্ধি-কৌতুকের দীপ্ত আভাস, এমনকি অবঙ্কিম, প্রলম্বিত নাসিকা, তার সামান্য সঞ্চালনেও যেন মনীষা উদ্যত হয়ে আছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে সুচারু পোশাক সম্বন্ধে মস্ত দুর্বলতা: যে-কোনো পোশাকেই ধূর্জটিপ্রসাদকে মহিমাসম্পন্ন মনে হত, ধুতি-চাদরে, ঢোলা পাজামা লখনউই চিকণের কাজ-করা পাঞ্জাবীতে, নিখুঁত-কাটা ইউরোপীয় পরিচ্ছদে। তাছাড়া, আদিবাস যদিও ভট্টপল্লীতে, আলাপে-আলোচনায়-বাগবৈদগ্ধ্যে কী অনায়াস সৌরমণ্ডল অন্বয়, আচরণে-ব্যবহারে ঔদার্যের পরাকাষ্ঠা, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, প্রসঙ্গ থেকে অন্যতর প্রসঙ্গের ঠাসবুননে কেমন অবলীলাক্রম অভিগমন-আগমন। তাছাড়া, বাঙালি বুদ্ধিজীবীমন্যরা শ্রদ্ধার কাকলিতে প্রায়-রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে আসতেন, ধূর্জটিপ্রসাদ সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাস করেন, তিনি বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের পুরোভাগে। আর কী চাই, ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা-অনুরাগ-কৌতুহলের মিশ্রসংযোগের পাত্র কানায়-কানায় উপচে উঠত।

প্রায় তিরিশ বছর ধরে ধূর্জটিপ্রসাদকে শহুরে বাঙালিসমাজ এই শিরোনামায় চিনে এসেছে। এই বিশিষ্ট খ্যাতিযোগ তিনি মজা পেতেন। মজলিশি সামাজিক মানুষ, লোকে তাঁকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা করুক,

এটা তিনি বেশ পছন্দ করতেন। লোকেরা আসুক, তাঁকে ঘিরে বসুক, একটু-একটু কফি পান করুক, একটু-একটু তাঁর এই প্রবন্ধটির, ঐ বক্তৃতাটির তারিফ করুক, এ ধরনের দুর্বলতা তাঁর যথেষ্ট ছিল। অপাপবিদ্ধ দুর্বলতা, যাতে অহমিকার কোনো ছোঁওয়া ছিল না, যা করছি-বলছি চিন্তা করছি তা আমি যাদের ভালোবাসি, পছন্দ করি তারা অনুধাবন করছে, শুনছে, সমর্থন করছে, এই আনন্দ-আকৃতিগত দুর্বলতা, যা বলা চলে লোকপ্রেমেরই গোত্রান্তর। আমার যা দেয়, তা উজ্জ্বলতা, তা আমি অকৃপণ বিলিয়ে যাচ্ছি, তা তো আমার সামাজিক কর্তব্যের সামিল, তোমরা তা গ্রহণ কর। এই নিঃসংকোচ দর্শন আসলে তো যে-কোনো সৃষ্টিশীল শিল্পীর তদ্গত আদর্শ।

জীবনের শেষ কয়েকটি বছর রোগগ্রস্ত অবস্থায় উৎকীর্ণ শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে তাঁকে কাটাতে হয়েছে। যে-উজ্জ্বলতা তাঁর ব্যক্তিত্বের ওঙ্কার, তার প্রকাশ নির্বাপিত করে দুঃসহ সেই শেষের কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বুদ্ধির উপলসংঘাতে যে অজস্র কথারা চতুর্দিকে ছিটকে বেরোতো—রাজনীতি-সমাজনীতির কথা, ধনবিজ্ঞানজড়িত কথা, কবিতার কথা, সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনার কথা, কখনো হয়তো বা দর্শনপ্রসঙ্গ, নয়তো সংগীততত্ত্ব, কিংবা চারুকলার কোনো সমস্যার সূত্র ধরে কথা, অন্য-কোনো মনোভঙ্গির মুহূর্তে শুদ্ধ লোকঠকানো, লোকরাঙানো লোকভ্যাঙানো রঙ্গভরা কথা, মাঝে-মাঝে যা শুনতে-শুনতে মনে হত, হায়, যদি লিখে রাখা যেত, টুকে রাখা যেত, এই উদ্দামতার অপচয় যদি সামান্য-একটু সময়ের জন্যও সংহত করে আনা যেত—, সেই অভিভূত কথা-বলা পর্যন্ত রোগের প্রকোপে ফিসফাস কাৎরানিতে পরিণত হয়েছিল। তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যে দিনের জাগ্রত সময়ে সর্বদা সিগারেট আবদ্ধ থাকত, বুদ্ধির সচ্ছল ঊর্ধ্বগামিতার প্রতিস্বরূপই যেন ধোঁয়ার কুণ্ডলী পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উপরে উঠত; সেই পরমপ্রিয় সিগারেটও তাঁকে পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কফি খেতে ভীষণ ভালোবাসতেন, লখনউর কফিহাউসে প্রতি সন্ধ্যায় নয়তো রবিবারের সকালে চারটা-ছটা টেবিল জুড়ে নিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদকে ঘিরে আড্ডা বসত, সেই বৈঠক একটু পরেই হয়তো ফের জমায়েত হত তাঁর বাদশাবাগের বাড়িতে, নতুন করে কফির সৌরভে স্নিগ্ধ হয়ে নিয়ে; শেষের দু-তিন বছর সেই কফি পর্যন্ত পান করতে পারতেন না, কণ্ঠনালীতে অস্বাচ্ছন্দ্যবোধবশত ক্ষান্ত হতে হত তাঁকে। স্তূপাকৃত বই, বসবার ঘর—পড়বার ঘর—শোবার ঘর উপচে যা রান্নাঘরে গিয়ে

ঠেকেছিল, সেই বই থেকে পর্যন্ত তিনি প্রতিহত হয়ে ফিরতেন মনোনিবেশে অসুবিধা হত, জরাজীর্ণ ভগ্নদশা শরীর প্রতিবাদ জানাত।

উজ্জ্বলতম ধাতু, প্রতিরুদ্ধ-পরিশ্রান্ত ধাতু, ধূর্জটিপ্রসাদকে এই দুই অবস্থাতেই কাছে থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁর অত্যন্ত সন্নিকট স্নেহ দ্বারা সিক্ত হয়েছিলাম অনেকগুলি বছর ধরে। তাঁর স্নেহের বহিঃপ্রকাশেরও রূপান্তর হতে দেখেছি। যে-স্নেহ ছিল মুখচোরা, ঘুরিয়ে-বেঁকিয়ে হঠাৎ আলতো করে ঠেলে দিয়ে যা ব্যক্ত করতে পছন্দ করতেন প্রথম দিকে, সায়াহ্নসময়ে তা মোলায়েম অনুরাগকোমল হয়ে আসে। শুধু একটি স্মৃতিচিত্র এখানে উল্লেখ করব, নিতান্ত ব্যক্তিগত হলেও করব। বেশ-কিছুদিনের জন্য দেশ ছেড়ে চলে যাব, তাঁকে লিখেছিলাম হাতে সময় কম, তাঁর সঙ্গে আলিগড়ে গিয়ে আর দেখা করে আসা সম্ভব হবে না। দু-দিন বাদে ট্রেনে চেপেছি কলকাতা আসার জন্য, কলকাতা থেকে বিদেশের প্লেন ধরব। সন্ধ্যার আবছায়ায় আলিগড় স্টেশনে দশ মিনিটের জন্য ট্রেন থামল, চীৎকার-ভিড়-দুরন্ত শীতের ঢেকে-ধরা-নিবিড় হয়ে আসা কুয়াশা। কামরা থেকে বাইরে তাকিয়ে দেখি, কী করে খবর পেয়েছেন, ধূর্জটিপ্রসাদ দাঁড়িয়ে আছেন, ঝুঁকে-পড়া-শরীর, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, সামনের দিকে ভালো করে দেখতে পারছেন না, অস্ফুট দুটো কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে শ্লেষ্মার আক্রমণ। খুব স্পষ্ট মনে পড়ে না, হয়তো নিচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলাম, অসমর্থ শরীর নিয়ে ঐ শীতের মধ্যে কেন এসেছেন তা নিয়ে হয়তো অনুযোগ জানিয়েছিলাম, প্রত্যুত্তরে ঠোঁটের কোণ দিয়ে হয়তো একটু স্নেহপ্রসন্ন আনন্দে হেসেছিলেন, কিছুই কথা বলা হয় নি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা, একটু বাদে ট্রেনের ঘণ্টা, এক-মুহূর্তের জন্য হয়তো আমার মাথায় একটু হাত রেখেছিলেন, ট্রেনে আমার উঠে-পড়া, ট্রেন চলল, সমস্ত ছায়া-ছায়া কুয়াশা, ধূর্জটিপ্রসাদ তখনো দাঁড়ানো।

আশঙ্কা হচ্ছে, অভিযোগ করা হবে, আমার প্রাগুক্তি সত্ত্বেও, আমি নেহাৎই ব্যক্তিপূজা করছি, ইতিহাসের—যে-কোনো ইতিহাসের—বিচার-বিশ্লেষণে ব্যক্তির স্থান নেই, আমার উচ্ছ্বাসপনা সুতরাং শুধু বেমানানই নয়, তা অযৌক্তিক, তা অবৈজ্ঞানিক। আরো হয়তো বলা হবে, সমাজের বিশাল-জটিল বিবর্তনক্রমের প্রসঙ্গে কতটুকু মূল্যবান কতটুকু ঐতিহাসিক, তাৎপর্যসিঞ্চিত এক অধ্যাপকের জীবন, তাঁর মায়ামমতাদুর্বলতার বিবরণ,

তাঁর অম্বুধা-প্রশ্ন-উৎসাহের বিশদ ব্যাখ্যা? বাংলা সমাজ-সংস্কৃতির দৈনন্দিন আয়নে অন্বয়ে ধূর্জটিপ্রসাদকে এখন যে অবান্তর মনে হয়, তাঁর উপন্যাস-প্রবন্ধাদি ইদানীং যে অপঠিত থেকে যায়, তাঁর নিকটানুরাগীরা পর্যন্ত পাঁচ বছরের মধ্যে যে স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশ করে উঠতে পারেন না, এ-সবই কি প্রমাণ নয় যে জনৈককে বাদ দিয়ে, নির্মম বিচারে অবহেলা করে তবে ইতিহাসের গতি, সে জনৈক যদি ধূর্জটিপ্রসাদ হন, তাহলেও?

মানতে রাজি নই আমি, প্রতিক্রিয়া-আসক্তির অভিযোগের আশঙ্কা সত্ত্বেও নই। কারণ ধূর্জটিপ্রসাদের যে-পরিচয় সাধারণত উল্লিখিত হতে শোনা যায় না, তা তার ব্যক্তিত্বের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে, তা বিশেষ এক পরিমণ্ডল, এমন এক আবহ, যাতে জাদু-ছোঁয়ানো, যে-জাদু মুহূর্তের মধ্যে অন্য-এক আকাশের নীলিমা এনে দিতে পারত। গ্রন্থপ্রিয় বুদ্ধিজীবী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কাতারে-কাতারে ছড়িয়ে আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন, প্রচুর পণ্ডিত লেখক একসঙ্গে দুশোটা বিষয় নিয়ে গবেষণা করবেন, মোটা বই ছাপাবেন, বহু সমালোচক কবিতা থেকে রাজনীতি ধনবিজ্ঞান পর্যন্ত টীকাবিস্তার করে যাবেন। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ নিশ্চয়ই সমাজতন্ত্রের ইশারায় আস্থাশীল, অনেকেই ছাত্রবৎসল, সুহৃদ্‌প্রিয়, আড্ডাখানার প্রেমিক। কিন্তু অণুপরমাণু গুণের ভারাক্রান্ততার কষ্টিপাথরে ধূর্জটিপ্রসাদকে মাপতে যাওয়া বাতুলতা, এবংবিধ গুণাবলী ছাপিয়ে তাঁর মূল্যায়নের উপক্রমণিকা সম্ভব। আমি জাদু শব্দটি ব্যবহার করেছি, কিন্তু জাদুর প্রকৃতিবিশ্লেষণে অপারগ হব। জাদু তা-ই যা সব-কিছু লেপে দিয়ে যায়, কোনো-এক সার্বিক সম্মোহনে পরিপার্শ্বকে আচ্ছন্ন করে। ধূর্জটিপ্রসাদের ক্ষেত্রে তার প্রচ্ছন্ন প্রকাশ হয়তো তাঁর জীবনযাত্রার ভঙ্গিমা, এমন-এক শৈলী যা বিশেষণের বাইরে, অথচ যা পরম মনোহরণপটিয়সী। একসঙ্গে চিন্তার ঔদার্য ও চিন্তার বিস্তার; বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের স্বচ্ছন্দ সমন্বয়; অধ্যয়ন, আনন্দ, কৌতুকপিপাসা, এই তিনকে পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার প্রতিভা; বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার সঙ্গে যুক্তির সুষমাকে যুক্ত করে সশব্দে হেসে ওঠা; পাণ্ডিত্যের কূটকৌশলের সঙ্গে মানবিক সাধারণ এলোমেলো বৃত্তিগুলি জড়ানো: ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর চল্লিশ বছরব্যাপী অধ্যাপনায় এ-সমস্তই দৃষ্টান্তিত করতে পেরেছিলেন। সে এক সময় ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়ে লখনউ শহরের অন্য-কোনো সত্তা চিন্তা করা যেত না, এবং ধূর্জটিপ্রসাদকে বাদ

দিয়ে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাবা যেত না। বিশ্ববিদ্যালয় নামে যে-মুক্ত বিস্তৃত বহুস্তরসমৃদ্ধ বুদ্ধিখচিত পরিমণ্ডলের আভাস, সে সব-কিছুই যেন ধূর্জটিপ্রসাদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে বিমূর্ত হত, বিশ্ববিদ্যালয় মানেই যেন ধূর্জটিপ্রসাদ। আচার্য-উপাচার্যের উপচার তুচ্ছ, কীটতম ছাত্রও মনে-মনে এটা অনুভব করতে পারত বুদ্ধিজীবী হবার গৌরব-আনন্দ-পরিপূর্ণতাবোধ অমেয়, কারণ ধূর্জটিপ্রসাদ বুদ্ধিজীবীদের চূড়ামণি এবং লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধির উচ্ছল প্রবাহের হেতু ধূর্জটিপ্রসাদ সেখানে অধ্যাপনারত। দশকের পর দশক ধরে ছাত্রসম্প্রদায় বুদ্ধির অনুশীলনে উদ্দীপ্ত হতে প্রয়াস করেছে, কারণ তাদের চোখে ধূর্জটিপ্রসাদের ঘোর।

আর যা উল্লেখ করা প্রয়োজন তা ধূর্জটিপ্রসাদের উদ্‌গ্রীব সমাজজিজ্ঞাসা। নিজেকে কোনোদিন মার্কস্‌বাদী বলে জাহির করেন নি, রঙ্গ করে বলতেন তিনি মার্কস্‌তত্ত্ববিদ্‌। স্রেফ চেতনার আশ্রয়ে জীবনবোধের উপান্তে পৌছনো অসম্ভব প্রয়াস, কিন্তু তাঁর প্রয়াসে অন্তত কোনো স্খলন-বিচ্যুতি ছিল না। সমাজের বিবর্তন ইতিহাসের নিয়ম মেনে নিয়ে, ব্যক্তির বিকাশ সমাজের অনুশাসনের অঙ্গুলিহেলনে, এই আর্ষ সত্যগুলি ধূর্জটিপ্রসাদ নির্দ্বন্দ্বচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু, গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তাঁর অধ্যাপনা-আদর্শের অঙ্গ করে নিয়েছিলেন। বিদ্যার সঙ্গে সমাজবোধের অন্বয় না হলে জ্ঞানার্জন তুচ্ছ, রাজনীতি-সমাজনীতি বাদ দিয়ে অস্তিত্ব অসার, অপ্রাকৃতিক: প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তাঁর ছাত্ররা এই উপলব্ধিগত হয়েছে। এই অর্থেই বলা চলে নিরালম্ব শৌখিন অধ্যাপনাকে তিনি ইতিহাসের প্রয়োজনে নিযুক্ত করেছিলেন। সমীক্ষায় ধরা পড়বে, নানা দলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বর্তমানের অনেক রাজনৈতিক নেতা তাঁদের প্রথম প্রত্যয়ের দীক্ষা নিয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে, তাঁর জিজ্ঞাসার আদর্শের আবেগের পীড়নে! অবশ্য, প্রথম যৌবনে বুদ্ধি যা-ই বলুক, শ্রেণীত্যাগের সংকল্প প্রায়ই ধোপে টেঁকে না, পরিপার্শ্বের নিঃশ্বাস এড়িয়ে সমাজবিপ্লবের আরক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে উদগ্র ভূমিকা নিতে গিয়ে আমাদের সমসাময়িক অনেকেই তাই পশ্চাদপসরণ করেছেন, কেউ-কেউ নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের অভ্যস্ত দুর্গে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কিন্তু তাঁদের অসাফল্যের দায়িত্ব তাঁদের একার, ধূর্জটিপ্রসাদকে তা স্পর্শ করবে না।

আপাতত আমরা নির্লিপ্ত, অধ্যাপনা করি, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমাদের নির্লিপ্ততা সঞ্চার করে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে আসি। ধূর্জটিপ্রসাদের স্মৃতি যদি বেয়াড়া অপরাধবোধ জাগিয়ে তোলে, অন্ধকারে রাত্রি লেপে যাক।

ৰ্ষন্দু মুখোপাধ্যায়

গন্ধসূত্র

আমাদের ধোপা রামজীবনের ছেলে দুলাল [illegible]
গেলে রামজীবন কাপড়কাচা ছেড়ে দিল, আর সেই সঙ্গে
াড়া পেয়ে গেল তার বুড়ো বিষণ্ণ গাধাটি। দুলাল হিসেবী ছেলে, গাধাটাকে
ক্রী করবার ফিকিরে ছিল; কিন্তু বুড়ো গাধা কে কিনবে? এবং
ামজীবন বোধহয় তার শেষ জীবনের বিশ্রামসুখ গাধাটাকেও খানিকটা দিতে
চয়েছিল। ফলে তখন সেই স্বাধীন গাধাটিকে আমাদের লোকালয়ে নানা
ায়গায় প্রায়ই দেখা যেতে লাগল। স্বভাবত নিষ্পাপ ছিল সে—পশুপতি
াবের কয়লার ডিপোর পাশে নাবাল মাঠটিতে বিশ্রামসুখে সে চরে বেড়াত,
াড়ার ছেলেরা তার মুখে রশি বেঁধে সওয়ার হতো, সে আপত্তি করত না।
কন্তু কখনো কখনো তাকে বড় চিন্তান্বিত দেখা গেছে। অন্য কেউ লক্ষ
রে নি হয়ত, কিন্তু আমার প্রায়ই মনে হয়েছে তার ভ্রু কোঁচকানো, চোখ
অন্তর্মুখী, কাছারির বটগাছতলায় ললিতের পানের দোকানের পিছনে নিঃশব্দে
াড়িয়ে থেকে সে হয়ত তার বর্ণের ধূসরতার কথা ভাবছে, কেননা পৃথিবীতে
ূসর বর্ণ ও বিষণ্ণতা সম্ভবত একই সঙ্গে জন্মলাভ করেছিল। আমি কৌতূহল-
বশত কয়েকবার তার চোখে চোখ রাখবার চেষ্টা করেছি—কিন্তু তার দুটো
চোখ কপালের দু'দিকে থাকায় সংস্থানগত বাধার ফলে আমি কখনো বুঝতে
পারি নি যে সেও আমার চোখে চোখ রেখেছে কিনা। বস্তুত চলাফেরা
করার সময় সে বিনীতভাবে মানুষ, কুকুর ও বেড়ালদের পথ ছেড়ে দিত, গাড়ি-
ঘোড়া বাঁচিয়ে চলত এবং এ সত্ত্বেও সে সকলের চোখ থেকে নিজের চোখ
লুকিয়ে চলতে পারত। এ সমস্তই গাধাদের সাধারণ গুণ কিনা আমার জানা
ছিল না, কিন্তু কখনো-কখনো মনে হয়েছে গাধাটি বড় বিষণ্ণ, চিন্তাশীল এবং
কোনো রহস্যময় বৈশিষ্ট্যের জন্য সে তার গোষ্ঠী থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির।
পরবর্তীকালে হিপক্রিট মজুমদারও আমার এই মতকে সমর্থন করেছিলেন।

নেশার মতোই কিছু নাছোর বাতিক ছিল হিপক্রিট মজুমদারের।

রাস্তায় ঘাটে বেওয়ারিশ কুকুরগুলো হিপক্রিটকে দেখতে পারত না, কেননা ঘুমন্ত কুকুর দেখলেই তিনি তাদের কানে ধুলোবালি দিয়ে দিতেন এবং তারপর কুকুরের চমকে লাফ দিয়ে ওঠা ও নানা কায়দায় কান ঝাড়বার ভঙ্গি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতেন। কখনো দেখা গেছে হিপক্রিট নির্জন রাস্তায় একটি রোমন্থনরত নির্বিকার ষাঁড়কে পেয়ে গিয়ে গায়ের নস্যিরঙের র‍্যাপারখানা খুলে তার সামনে ধরে দক্ষ বুল-ফাইটারের মতো ষাঁড়টাকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করছেন। অথচ হিপক্রিট ছিলেন অতি নিরীহ স্কুল-মাস্টার—স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে সাধারণ সংসারযাত্রা ছিল তাঁর। কিন্তু আমার মনে হয় হিপক্রিট জীবনের সেই বৈচিত্র্যশূন্যতা ও উদ্দেশ্যহীনতা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর ছেলেমানুষী বাতিক অনেকেই লক্ষ করেছিল, কিন্তু এ নিয়ে সামান্য হাসাহাসি করা ছাড়া আর-কোনো উত্তেজনার সৃষ্টি করে নি, কারণ অনেকেরই ধারণা ছিল যে বেশি দিন মাস্টারি করলে এ ধরনের মানসিক গোলোযোগ দেখা দেওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ক্রমশ লোকেরা সেই এলাকার ষাঁড় ও কুকুরদের মতোই হিপক্রিট সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে, কারণ হিপক্রিট স্কুলে তাঁর ছাত্রদের বুঝিয়েছিলেন যে, যে-কোনো মানুষের দিকে তাকালে তার ভিতরকার আত্মাটিও তিনি দেখতে পান। সে আত্মা কেমন? হিপক্রিটের ধারণায় মানুষের আত্মার আকৃতি আঙুলের অর্ধকর পরিমিত একটি স্বচ্ছ মাছের মতো। এই মাছটি শরীরের কোথাও স্থির হয়ে নেই—মাছটি সারাক্ষণ স্বচ্ছন্দ অথচ রক্তের চেয়েও দ্রুতগতিতে শরীর ও মন, জড় ও চেতনার সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি ছেলেদের আরো বুঝিয়েছিলেন যে পাপবোধ ও অনুশোচনাই পৃথিবীতে একমাত্র পাপ, অত্যন্ত নীতিবিগর্হিত কাজও পাপ বা অন্যায় বলে গণ্য হতে পারে না যদি না অন্যায়কারী সেজন্য অনুশোচনা বা মনস্তাপ ভোগ করে। অর্থাৎ কৃতকর্মের জন্য দুঃখবোধ এবং তজ্জনিত পাপবোধ মানুষকে কষ্ট দেয় এবং এই কষ্টই শাস্ত্রে পাপ বলে উল্লিখিত আছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে নিজের যে ধারণার কথা হিপক্রিট তাঁর ছাত্রদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন তা অনেকটা এরকম—ঈশ্বর এক কাঁচের দোকানের দোকানদার। সেই দোকানের মেঝে দেয়াল সিলিং জুড়ে অসংখ্য রকমের কাঁচ বসানো আছে—মাঝখানে বসে আছেন ঈশ্বর—অসহায়ভাবে নিজের অজস্র প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে আছেন। নিজেকে এই অসংখ্যবার করে দেখা যে কী ক্লান্তিকর তা কেবল ঈশ্বরই জানেন। কখনো বলতেন ঈশ্বর জেলের মতো এক জাল টেনে তুলছেন, সেই

লে অসংখ্য সুন্দর স্বচ্ছ মাছ ধরা পড়েছে দেখে তিনি আনন্দিত হচ্ছেন, মুহূর্তেই গভীর দুঃখের সঙ্গে তিনি সেই মাছগুলিকে আবার জলে ছেড়ে চ্ছেন, কেননা তাঁর ক্ষুধা নেই, কামনা-বাসনা নেই, তৃপ্তি ও মৃত্যু নেই। ন্তু আর সকলেরই অভাব, তৃপ্তি ও সম্মানজনক মৃত্যু রয়েছে। কাজেই াল টেনে ও মাছ ছেড়ে দিয়ে তিনি তাঁর অনন্ত অবসর কাটানোর চেষ্টা রছেন।

এসব কারণে একবার স্কুল কমিটির মিটিঙে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। তনি সত্য অস্বীকার করলেন না। হ্যাঁ, তিনি বাতিকগ্রস্ত, এ কথাও ঠিক যে তনি খুশীমতো ছাত্রদের নিজের মতামত বুঝিয়েছেন, সত্য যে তিনি রাস্তার বওয়ারিশ কুকুর ও ষাঁড়দের বিরক্তি উৎপাদন করেছেন এবং এসব থেকে স্পষ্টই বাঝা যাচ্ছে যে তিনি ক্রমশ শিক্ষকতার অযোগ্য হয়ে পড়ছেন! সুতরাং সই মিটিঙেই ইস্তফা-পত্র পেশ করলেন হিপক্রিট। কমিটিতে তাঁর পক্ষ মর্থনকারী সভ্যরা এই নিয়ে হৈচৈ করেছিল, কিন্তু হিপক্রিট তাঁদের নিরস্ত করেন। তিনি বলেছিলেন যে নিজের মত বা আদর্শের জন্যই যে তিনি চাকরী ছাড়ছেন তা নয়, চাকরী ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা তাঁর বহুদিনের। কেউ যেন এ কথাও না ভাবে যে এর ফলে তিনি সহায় ও সম্বলহীন হয়ে পড়বেন, কেননা তিনি বিশ্বাস করেন যে সবচেয়ে নিঃসহায় লোকটিই সবচেয়ে শক্তিমান। পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুধার্ত জাতিই সবচেয়ে ভয়ংকর বিদ্রোহ করতে সক্ষম হয়। অর্ধভুক্তরাই সবচেয়ে ক্লীব ও অক্ষম, তিনি এই অর্ধভুক্তদের দল থেকে বাদ যেতে চান।

কুকুর ও ষাঁড় সংক্রান্ত ব্যাপারে অভিযোগ করা হলে জবাবে তিনি বলেন যে যদিও এই অভিযোগ এস, পি, সি, এর কাছ থেকে এলেই তিনি খুশী হতেন তবু কমিটির অবগতির জন্য তিনি জানাচ্ছেন যে বৈজ্ঞানিকরা যেমন তাঁদের প্রথম পরীক্ষাগুলি প্রয়োগ করেন ইঁদুর ও গিনিপিগের উপর, তিনিও তেমনি এক ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা কি ধরনের পরীক্ষা তা তিনি স্পষ্ট করে বলেন না। তবে বলেন যে এর ফলে যদি কোনো হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে তবে তিনি দুঃখিত।

যে-সময়ে রামজীবনের গাধাটি ছাড়া পায় তারই কাছাকাছি কোনো সময়ে চাকরি ছাড়লেন হিপক্রিট। চাকরি ছাড়ার পর হিপক্রিটকে আর রাস্তায়ঘাটে কদাচিৎ দেখা যেত। শোনা যায় সে সময়ে তিনি কথাবার্তা বলা একেবারে

বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি প্রায় পনেরো বছর ধরে তাঁর ছাত্রদের নানা কথাবার্তা বলে দেখেছেন। এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি লক্ষ করেছিলেন যে বহুল ব্যবহার ও চর্চার ফলে ভাষা ও বাক্যের শক্তি অনেক কমে গেছে। বাক্য যত মনোহারী কিংবা উত্তেজক হোক না কেন তা আর উদ্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে না। অথচ অতীতে ভাষা ও বাক্যের সুনিপুণ ব্যবহারে জনসাধারণকে বিদ্রোহ ও বিপ্লবে প্ররোচিত করা গেছে। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে কথা কিংবা ভাষার দ্বারা আর নতুন কিছুই করা সম্ভব নয়, কারণ ভাষায় যা যা বলা সম্ভব তার প্রায় সব কিছুই বলা হয়ে গেছে। অথচ মুস্কিল এই যে চিন্তা-ভাবনা করতে গেলেও মনে মনে ভাষার ব্যবহার করতেই হয়। বস্তুত ভাষা এক মায়া, এবং একটু তলিয়ে দেখলে ভাষা থেকে মানুষের নানাবিধ দুঃখও উপজাত হচ্ছে। তাই হিপক্রিট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছিলেন ভাষাহীন কিংবা বাক্যশূন্য চিন্তা-ভাবনা করা সম্ভব কিনা। এ বিষয়ে তিনি কতদূর সাফল্য অর্জন করেছিলেন বলতে পারি না। কিন্তু এ সময়েই আমাদের লোকালয়ের নানা জায়গায় গ্রামজীবনের বুড়ো ও বিষণ্ণ গাধাটিকে দেখা যেতে লাগল।

হিপক্রিট লক্ষ করলেন যে গাধাটিকে দেখে চিন্তাশীল বলে মনে হয়। কিন্তু যতদূর জানা যায় গাধার ভাষা নেই, ব্যাকরণবোধ নেই, তাহলে এই গাধাটি ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকেই কি ভাবে চিন্তা করছে! বাতিকগ্রস্ত হিপক্রিট খুবই বিস্মিত হলেন। বস্তুত গাধাটিকে তাঁর ঈশ্বর-প্রেরিত বলেই মনে হয়েছিল। ইতিপূর্বে হিপক্রিটের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে এলাকার বেওয়ারিশ কুকুরেরা তাঁর সম্বন্ধে সতর্ক ও সচেতন হয়ে উঠেছিল, তাঁর যাতায়াতের পথে ঘুমন্ত কুকুর আর কদাচিৎ দেখা যেত। সম্ভবত হিপক্রিটও কুকুর ও ষাঁড় সম্বন্ধে ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এই অতি ভদ্র, নম্র ও চিন্তাশীল গাধাটিকে দেখে সম্ভবত হিপক্রিটের সেই হতাশাবোধ খানিকটা কেটে গেল। এবং মাঝে মাঝে হিপক্রিটকে গাধাটির সঙ্গে দেখা যেতে লাগল।

আগেই বলেছি যে গাধাটি ছিল অতিশয় ভদ্র ও নম্র প্রকৃতির। অনতিবিলম্বেই সে আমাদের লোকালয়ের ধর্মপ্রাণ নরনারীর মনে করুণা ও দয়া উপজাত করেছিল। আহা, বুড়ো গাধাটা! সকলেই বলত। হিপক্রিটের চাকরী গেলে এই সব ধর্মপ্রাণ নরনারী তাঁর সম্পর্কেও অনুরূপ দয়ার্দ্র ও করুণ মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু এখন হিপক্রিটকে গাধাটির সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে

দেখে অনেকেই এর ভিতরে রহস্যময় কোনো অতিপ্রাকৃত ঘটনার আভাস পেতে লাগলেন। এর একটা কারণ এই ছিল যে বাতিকগ্রস্ত হিপক্রিট ছিলেন অদ্ভুত মানুষ, এবং তিনি প্রায়ই অদ্ভুত কিছু করবেন বলে লোককে আশ্বাস দিতেন। উপরন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণ চিরকালই ভোজবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, হঠযোগ ও অতিপ্রাকৃতে আস্থাশীল। কাজেই তাঁরা হিপক্রিট ও গাধাটির উপর নজর রাখতে লাগলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে হিপক্রিটকে ঠাট্টা-বিদ্রূপও কিছু সহ্য করতে হয়েছিল, এ সময়ে তাঁকে নিয়ে ছড়া বাঁধাও হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের কৌতূহলই জয়লাভ করে। হিপক্রিট বাস্তবিক হঠযোগী না হঠকারী তার মীমাংসার জন্য সকলেই অপেক্ষা করছিল।

আমার মনে হয় হিপক্রিট এর কোনোটাই ছিলেন না। এ সময়ে হিপক্রিট নানাজনের কাছে যে-মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি মানুষকে বিপ্লব ও বিদ্রোহ করবার জন্য উত্তেজিত করতে চান। মানুষ মূলত অসৎ—উপরন্তু তার রয়েছে পাপবোধ এবং ভাবাবেগ। এই দুইই মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে। তিনি লক্ষ করেছেন যে চতুষ্পার্শ্বস্থ সমাজব্যবস্থা মানুষের এই অসৎ বোধকে প্ররোচিত করছে, তার ভাবাবেগকে তাড়িত করছে, তাকে পাপবোধে ক্লান্ত করে দিচ্ছে। মানুষ তার জৈবিক চাহিদাগুলি ও অক্ষমতাগুলির নাম দিয়েছে ছয় রিপু। এর উপর মানুষের রয়েছে কিছু বুদ্ধিজাত কামনা—সে স্বাধীনতা চায়, মুক্তি চায়, বৈরাগ্য ও ঈশ্বরকে চায়। এই কামনাগুলি আরো মারাত্মক, কেননা এগুলি সম্পর্কে মানুষের মহত্ত্বের ভাব রয়েছে। এবং মানুষ অবিরল এই কামনার ঢেউ বিকীর্ণ করে চলেছে। মানুষের পাপাচারের ইচ্ছা ভয়ংকর, সদাচারের প্রতিও তার তীব্র আকর্ষণ রয়েছে। পাপ ও পুণ্য এই উভয়ের প্রতিই তার স্নায়ুছিন্নকারী কৌতূহল রয়েছে। অথচ তোষামোদকারীর মতো তার পিছনে ঘুরছে ভাবাবেগ, কুকুরের মতো তার অঙ্গ লেহন করছে পাপবোধ। অতএব মানুষ বিদ্রোহ করুক। পাপবোধহীন ও ভাবাবেগ শূন্য মানুষ সমান নিষ্কামভাবে পাপ ও পুণ্যের অনুষ্ঠান করুক। বৃক্ষ ও প্রকৃতির ভাবলেশহীনতা মানুষের চেতনার সঙ্গে যুক্ত হোক। আকাশ, নক্ষত্রমণ্ডলী, পশুপাখি ও বৃক্ষলতার ভিতর দিয়ে তা প্রকাশিত হচ্ছে।

অবসরপ্রাপ্ত গাধা ও বাতিকগ্রস্ত হিপক্রিট একই সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। কথা উঠলে হিপক্রিট বলতেন যে মানবজীবনের

মতো শক্ত ধরনের পুরুষ তিনি মানুষের মধ্যেও কম দেখেছেন। কিন্তু জনসাধারণ ক্রমশ হতাশ হচ্ছিল। কেননা হিপক্রিট কিংবা গাধা কেউই কোনো অলৌকিক বিভূতি প্রদর্শন করল না। যতদূর জানা যায় এই সময়েই হিপক্রিট তাঁর পিতৃদত্ত নামটি হারিয়ে জনমতানুসারে 'হিপক্রিট' নামে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। জনসাধারণ যে কেন তাঁর এই নামকরণ করেছিল তা আজো রহস্যাবৃত। সম্ভবত হিপক্রিট গাধাটির বিরক্তি উৎপাদন করছেন এরকম একটা সন্দেহ অনেকে করেছিল, উপরন্তু হিপক্রিট উদাসীন ও ভাবুক সেজে নিজের সংসারটিকে গোল্লায় দিচ্ছেন বলেও অনেকে অভিযোগ করতে লাগল।

হিপক্রিট এ সব নিয়ে মাথা ঘামান নি। তিনি বলতেন যে তিনি চান যে লোকে তাঁকে আঘাত করুক, কিন্তু এই আঘাতের অপরাধবোধ যেন তাদের স্পর্শ না করে। তিনি নিজেও দীর্ঘকাল যাবৎ অসূয়া ও অপরাধবোধহীন একটিমাত্র আঘাতের জন্য অপেক্ষা করছেন। কে তাঁকে সেই আঘাত করতে পারে!

তারপর দীর্ঘকাল হিপক্রিট ও গাধাটিকে নিয়ে লোকে আর মাথা ঘামায় নি। কেননা ইতিমধ্যে হিপক্রিটকে পাগল বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছিল, কিন্তু বিপজ্জনক নন বলে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি। তাছাড়া ক্রমশ সকলেরই বয়স ও ভাবনা-চিন্তা বাড়ছিল। হিপক্রিটকে চোখের সামনে দেখেও অনেকেই তাঁকে ভুলে যেতে লাগল।

কিন্তু দীর্ঘকাল পর ঘটনাটি ঘটল। শোনা গেল রামজীবনের বুড়ো ও বিষণ্ণ গাধাটিকে হিপক্রিট স্বহস্তে হত্যা করেছেন। গাধাটির প্রতি সকলেরই করুণা ছিল, কাজেই এক ক্রুদ্ধ জনতা সমবেত হয়ে দেখল একটি ভোঁতা পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে হিপক্রিট গাধার গলার নলি কেটে বুড়ো বাদামতলায় বসে বিড় বিড় করে বলছেন 'আমি ঈশ্বর, আমি ঈশ্বর।' সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ও প্ররোচনাহীন এই হত্যাকাণ্ড দেখে জনসাধারণ হিপক্রিটের উপর শোধ নিল। বিচলিত না হয়ে হিপক্রিট সেই মার খেলেন, কোনো শব্দ উচ্চারণ করলেন না।

সেইদিনই আমাদের লোকালয়ে তাঁকে শেষবারের মতো দেখা যায়। কেননা এর পরই তাঁকে বহুদূরে এক পাগলদের মেলায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। শোনা যায় তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বিড় বিড় করে বলেছিলেন

যে তিনি মহাজগতের এক শুদ্ধ সংগীত শুনতে পাচ্ছেন যার কথা নেই, ভাষা নেই এবং যার ভিতরে যাবতীয় ধর্ম ও অধর্ম, পাপ ও পুণ্য, বিরোধ ও মীমাংসা লয় পেয়ে যাচ্ছে। তিনি এখন আর এই পৃথিবীর কেউ নন, এখন তিনি ঈশ্বরের হাতে সেই স্বচ্ছ মাছ—ঈশ্বর তাঁকে আবার জলে ছেড়ে দেওয়ার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি ঈশ্বরের চোখে চোখ রেখেছেন। এখন পৃথিবীর মানুষেরা তাঁর (হিপক্রিটের) শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করুক।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

জাদুই রুমাল

পৃথিবীর তাবৎ হতভাগ্য ব্যক্তিদের সহিত আমার কোনো পার্থক্য নাই। আমি প্রতিনিয়তই ভাগ্যের দ্বারা বিড়ম্বিত হইতেছি। ভাগ্যের স্বর্ণ স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইতেছি। শুনিতে পাই ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমার অন্তরে বাহিরে কতকগুলি দুর্বোধ্য জটিলতা নাকি বিচিত্রভাবে সদাসর্বদা প্রকাশ পাইতেছে। আমি কুলও রাখিতে পারিতেছি না, শ্যামও রাখিতে পারিতেছি না। আমি নাকি সময়কে দোষারোপ করিয়া কখনো বা সর্বনাশকেই শিয়রে পাতিয়া আকুলভাবে ক্রন্দন করি। কখনো বা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অবশেষে শক্তিহীনতাজনিত দুর্বলতায় শত্রুর সমীপে গর্দান পাতিয়া ধরিয়া রাখি। ভাবি, সময় কি অপরিবর্তনীয়? কালরাত্রির কি অবসান নাই?

অবশ্য প্রথমে আমি কায়িক পরিশ্রমেই ভাগ্য ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম। দেখিলাম, ইহজগতে ইহা অরণ্যে রোদন ভিন্ন কিছু নয়। প্রতিদিন অমানুষিক পরিশ্রমে আমার সুকঠিন পীড়া হইল। চিকিৎসকের পরামর্শে আমাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম হইতে বিরত থাকিতে হইল।

এই অবস্থায় আমার সম্মুখে দ্বিতীয় কোনো পথ না থাকায় আমি চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেকে জিয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম। ফলে সজ্ঞানে শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলাম। অল্পদিনেই লোকে আমাকে তস্কর বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল। আমি ইহাতেও বিচলিত হই নাই; কিন্তু লক্ষ করিলাম শঠতা এমন এক অস্ত্র যাহা বুমেরাঙের ন্যায় নিজেকেই অধিকাংশ সময়ে ঘায়েল করিয়া বসে। আমি বেশ কয়েকবার আহত হইলাম। অবশেষে অন্য পথ বাছিতে উদ্যত হইলাম।

হ্যাঁ, তুকতাক নামক বিদ্যাটির প্রতি আকৃষ্ট হইলাম আমি। কিন্তু উক্ত বিদ্যাটি আমার আয়ত্তে না থাকায় সস্তায় উহা শিখিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। মনে পড়িল, পঞ্জিকার পাতায় বিভিন্ন ধরনের আশ্চর্য সব বস্তুর উল্লেখ থাকে।

আমি বৃহৎ লাল মূলার বিজ্ঞাপন হইতে শুরু করিয়া চার টাকায় একজোড়া হাতঘড়ির বিজ্ঞাপন অবধি গোগ্রাসে পাঠ করিলাম। আমার দৃষ্টি জাদুই রুমালের প্রতি আকৃষ্ট হইল। উহা অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক বিজ্ঞাপন। জানি না আপনারাও কেহ কেহ আমার মতোই জাদুই রুমাল ও তৎসহ দিব্যজ্ঞানী আতরের সহায়তায় নিজেদের ভাগ্য ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কিনা। আমি করিয়াছি। তাই আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতে বসিয়াছি। সহমর্মী হিসেবে হয়তো বা আমার অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে আপনাদের কাজে লাগিতেও পারে।

পত্রিকা খুলিয়া দেখিলাম কোনো-এক জলন্ধর-নিবাসী দিব্যজ্ঞানী মহাপুরুষ নিজের জটাজুট অবয়ব প্রকাশ করিয়া তাহার স্বপ্নাদ্য আতর ও রুমালের প্রশস্তি গাহিয়াছেন। তিনি মনে করেন, শত্রু নিধন করিতে এমন অব্যর্থ ও অদ্বিতীয় বস্তু ভূভারতে দ্বিতীয়টি আর বর্তমান নাই। তাঁহার কথায়, আপনি কি প্রণয়ে বিজয়ী হইতে চাহেন? মামলায় জয়লাভ করিতে, বেকারত্ব ঘুচাইতে অথবা আপনার অন্যান্য যে-কোনো ধরনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে বদ্ধপরিকর? তাহা হইলে অবশ্যই লোভনীয় শর্তে একশিশি মহাশক্তিধর আতর ক্রয় করুন। এবং তৎসহ বিনামূল্যে একখানি আশ্চর্য জাদুই রুমাল উপহারস্বরূপ গ্রহণ করুন। এই আতর এবং রুমালই আপনার বহু আকাঙ্খিত স্বপ্নের জগৎ রচনা করিতে সহায়তা করিবে।

আমি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া উক্ত একশিশি আতর ক্রয় করিয়া বসিলাম। ছোট সেন্টের শিশির ন্যায় আতরের শিশিটি অত্যন্ত নগণ্য ছিল। উহার গায়ে লেবেলে নানান রঙে লিখিত ছিল দিব্যজ্ঞানী আতর। এই আতর চোখে লাগাইয়া যে-কোনো ব্যক্তি আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলে তিনি তাঁহার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইবেন। এই আতর চোখে লাগাইয়া কোনো ব্যক্তি তাঁহার ইপ্সিত বস্তুর দিকে অগ্রসর হইলে অব্যর্থ ফল পাইবেন।

শিশিটি হাতে লইয়া আমি খুবই উত্তেজনা বোধ করিতে লাগিলাম। ছোট কাগজের মোড়কে ঘিরিয়া উহারা আমার নিকট যে-রুমাল পাঠাইয়া দিয়াছিল তাহার কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমার অন্তরাত্মাকে এই মুহূর্তে চোখের সামনে দেখিতে বড় বাসনা জাগিল। এবং সেই সঙ্গে আতরের শিশি হইতে আতর চোখে লাগাইয়া উহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার জন্যও বড়

ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম। ফলে চটা-ওঠা দাড়ি কামাইবার ছোট আয়নাটি সম্মুখে রাখিয়া চোখে আতর পরিলাম।

দেখিলাম, আয়নার গভীরে ধূম্রজাল সৃষ্টি হইতেছে। নদীবক্ষে শীতকালীন কুয়াশার মতো ধূম্রজাল গাঢ় গাঢ়তর হইয়া বিচিত্র এক অনুভূতির সৃষ্টি করিতেছে। আমি দেখিলাম, আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মতো সেই ধূম্রজাল হইতে একখানি দৈত্যবৎ অবয়ব রচিত হইতেছে। না, সে দৈত্য নহে। আমি তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিলাম। মনে হইল সে আমারই প্রতিবিম্ব।

কিন্তু এমন মনে হইল কেন জানি না। আমারই প্রতিবিম্ব হইলে উহাকে একটি অপরিচিত মুখের মতো মনে হইতেছে কেন? উহার কেশগুচ্ছ অত্যন্ত অবিন্যস্ত। উহার সমস্ত মুখাবয়ব ফুটিয়া একটি ক্লান্তিময় প্রলেপ। উহার বাহুদ্বয় অক্ষমভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে। উহার পদ-যুগলের যেন দেহের ভার ধরিয়া রাখিবারও ক্ষমতা নাই। মনে হইল, উহার চলৎশক্তিই নাই। সর্বোপরি উহার সমস্ত দেহকে আচ্ছাদন করিয়া যে-জালিকা দেখা যাইতেছে তাহা আমার দৃষ্টিভ্রম কিনা বুঝিবার উপায় নাই। আমি দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া উহার দিকে তাকাইলাম। সেই একই জালিকা। যেন জালের ভিতরে ব্যক্তিটিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, কামনা, বাসনা সমস্ত কিছুই ঐ জালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঐ জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইবার লোকটির কোনো ক্ষমতাই নাই। আমি তাহার দিকে বহুক্ষণ অপলক তাকাইয়া রহিলাম। তৎপরে প্রশ্ন করিলাম, কে তুমি?

সে কোনো উত্তর দিল না।

আমি জানিতাম উহার কোনো উত্তর দিবার ক্ষমতাই নাই। তবু কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া পুনরায় আমি প্রশ্ন করিলাম, তুমি কি সত্যি সত্যি আমার প্রতিচ্ছবি? সত্যি সত্যি কি আমার অবয়ব তোমার ঐ কুৎসিত মুখের মতোই দেখিতে?

সে এবারও নিরুত্তর রহিল।

ক্রমে আমার নয়নের ঘোর কাটিয়া গেলে বুঝিতে পারিলাম আমি আমারই প্রতিবিম্ব দেখিতেছিলাম। পারা-ওঠা আয়নায় আমাকে অমন দেখাইবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমি দ্বিতীয়বার চোখে আতর মাখিয়া আয়নার দিকে তাকাইলাম। আমার সমস্ত মোহই ভঙ্গ হইয়া গেল।

আতরের শিশিটির দ্রব্যগুণ সম্পর্কে আমার সন্দেহ জাগিল। কারণ, দিব্যজ্ঞানী পুরুষের প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীটি যে আমার ক্ষেত্রে ভুয়া বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহে হইয়া গিয়াছিলাম। ফলে প্রাথমিকভাবে আমি কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলাম।

এই সময় জাদুই রুমালের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সীতার বস্ত্রহরণের মতো প্যাকেট হইতে কাগজের পর কাগজ খুলিয়া রুমালখানি আমি বাহির করিলাম। উহা বসন্তকালের নবপত্রের ন্যায় কচি ও কাঁচা রঙবিশিষ্ট ছিল। উহা আকারে ছ' ইঞ্চি বাই দু' ইঞ্চি ছিল। ভিতরে কিছু রক্তিম বর্ণ ফুলছাপ। উহা হইতে সুগন্ধ নির্গত হইতেছিল। আমি গন্ধ শুঁকিলাম। ফুলের গন্ধ পাইলাম। ইহাতে চমৎকৃত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ, জলন্ধর সিটি হইতে কলিকাতার দূরত্ব আনুমানিক দেড হাজার মাইল। এই দেড় হাজার মাইল বহিয়া আসিতে কমপক্ষে তিন-চারদিন সময় অতিবাহিত হইয়াছে। এতদূর বহিয়া আসিয়াও রুমাল হইতে ফুলের গন্ধ উবিয়া যায় নাই, ইহা ভোজবিদ্যা বই কিছু নয়। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রুমালখানি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। ফুলগুলি অত্যন্ত সতেজ মনে হইতেছিল। যেন উহাদিগকে রুমালের উপর ছড়াইয়া রাখা হইয়াছে। অনায়াসেই ফুলগুলি রুমাল হইতে তুলিয়া লওয়া সম্ভব। আমি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া রুমাল হইতে ফুলগুলি মুষ্ঠি ভরিয়া তুলিয়া লইলাম। পরে উহাদিগকে সযত্নে একটি ফুলের টবে বসাইয়া দিলাম। স্বভাবতই রুমালটির দ্রব্যগুণ সম্পর্কে আমার আগ্রহ ও বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল।

এই সময় মোড়কের কাগজগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম, উহাতে এই রুমালের দ্রব্যগুণ লিখিত আছে। মনোযোগসহকারে উহা আমি পাঠ করিতে লাগিলাম। বাংলা হিন্দী ইংরাজি প্রভৃতি কয়েকটি ভাষাতেই দ্রব্যগুণগুলি লিখিত ছিল। আমি দেখিলাম সংক্ষিপ্ত ভাষায় উহাদের বক্তব্য এই,—এই রুমাল আদি ও অকৃত্রিম। বিশ্বের সমস্ত দেশেই ইহা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। এই রুমাল ব্যবহারে জীবনে হতাশ ব্যক্তি হতাশামুক্ত হইয়া নব প্রেরণায় জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবেন। আমার মনে পড়িল পৃথিবীতে আমার মতো হতাশ ব্যক্তি অত্যন্ত অল্পই বর্তমান। ফলে রুমালের দ্রব্যগুণ যদি সত্য হয় তাহা হইলে জলন্ধরনিবাসী দিব্যজ্ঞানী মহাপুরুষের প্রতি আমার কেনা গোলাম হইয়া থাকা উচিত।

আমি রুমালের ব্যবহারবিধি পাঠ করিতে লাগিলাম। উহাতে লিখিত আছে, প্রথমে রুমালটি দ্বারা সমস্ত মুখাবয়ব একবার উত্তমরূপে মুছিয়া লউন। পরে আতরের শিশি হইতে আতর যত্নসহকারে নয়নের কোণে একবার মাখাইয়া দিন। ইহার পর আপনি আপনার ঈপ্সিত বস্তুর দিকে অগ্রসর হউন।

ঈপ্সিত বস্তুটি কি? আমি এমন কি বস্তু আকাঙ্খা করি যাহা পাই নাই। হায়; ঈপ্সিত বস্তুর কথা চিন্তা করিতে গেলে আমি কূলকিনারা খুঁজিয়া পাই না। আমার অভাবের পরিসীমা কি? ইহাদের মধ্য হইতে প্রথমে আমি কোন বিষয়টিকে বাছিয়া লইব! আমি একটি দুশ্চিন্তার মধ্যে পতিত হইলাম। পরে অনেক কষ্টে যে-ব্যক্তিটিকে সহসা চোখের সামনে দেখিতে পাইলাম সে আমাদের পাড়ার মুদিখানার মালিক। লোকটির নিকট আমার ঋণের বোঝা দিন দিন বাড়িয়া বিপুল আকার ধারণ করিতেছিল। লোকটিকে দেখিলেই ইদানীং আমার হৃৎকম্প শুরু হইত। ফলে, মস্তিষ্কে একটি দুর্বুদ্ধি চাপিল। লোকটির মৃত্যু কামনা করিলাম। দোকানদারটি মরিয়া গেলে যেন আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঋণমুক্ত হইতে পারি, এইরকম একটি সমাধান খুঁজিয়া পাইলাম।

অতঃপর ঠিক করিলাম, রুমাল দ্বারা মুখ মুছিয়া চোখে আতর মাখিয়া একবার আমি দোকানদারের সম্মুখে দাঁড়াইব এবং তাহার মৃত্যু কামনা করিব। দ্রুতভাবে তাহাই আমি করিলাম এবং দোকানদারের দিকে তাকাইয়া আমি মিটি মিটি হাসিতে লাগিলাম।

দোকানদার আমাকে দেখিয়া খানিকটা বিস্মিত হইল। সে ভাবিল আমি তাহার ঋণ শোধ করিতে আসিয়াছি। আমি বলিলাম, হ্যাঁ, আমি চিরকালের মতো ঋণ শোধ করিতে আসিয়াছি।

ইহাতে দোকানদার সরলভাবে আমাকে প্রশ্ন করিল, ইহার অর্থ কি?

বলিলাম কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝিতেই পারিবেন।

অবশেষে কয়েকদিন পরে আমিই বুঝিতে পারিলাম আতরের শিশি এবং রুমালটি উভয়েই মেকি বস্তু। কারণ, দোকানদারটি বহাল তবিয়তেই দোকানদারী করিতে লাগিল। শুধু তাহাই নয়, সারাক্ষণ তাহাকে আমার এড়াইয়া এড়াইয়া চলিতে হইতেছিল। ইহা দেখিয়া আমি ক্রোধবশত জলন্ধরের ঠিকানায় একটি পত্র লিখিলাম। লিখিলাম, মহাশয় আপনারা যে জাদুই রুমাল ও আতর পাঠাইয়াছেন তাহা আমার মনোস্কামনা পূর্ণ করিতে পারে

নাই। এইরূপ নকল বস্তু পাঠাইয়া আমার মতো একজন সাধারণ ক্রেতার প্রতি শঠকারিতা করার কারণ বুঝিলাম না। এই বিষয়ে আপনাদের কি বলিবার আছে সত্বর আমাকে জানাইবেন। অন্যথায় আমাকে অন্যপথ দেখিতে হইবে।

এই পত্রেই আমি কি ভাবে দোকানদারের সহিত আচরণ করিয়াছিলাম তাহাও বিশদভাবে লিখিলাম। কি ভাবে আমি রুমাল দ্বারা মুখ মুছিয়া আতর চোখে লাগাইয়াছিলাম তাহাও লিখিলাম।

কিছুদিন পর উত্তর আসিল। তাহারা লিখিয়াছে, আপনার চিঠি পাইয়াছি। আপনি আমাদের বহু পরীক্ষিত বস্তুর প্রতি যে অবমাননাকর উক্তি করিয়াছেন তাহার জন্য দুঃখিত। রুমাল হইতে যখনই আপনি ফুলগুলি তুলিয়া লইয়াছেন তখনই রুমালের দ্রব্যগুণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে মনে রাখিবেন। যাহা হউক মানবের সেবা করাই আমাদের উদ্দেশ্য, তাই নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করিলেও আমরা আপনাকে অনুরোধ করিব পুনরায় একশিশি নতুন আতর ও জাদুই রুমাল সংগ্রহ করিতে। তাই লিখিতেছি সত্বর ডাকখরচ এবং ডিসকাউণ্ট বাদ দিয়া আতরের মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। আমরা আপনার নামে বিশেষ যত্নের সঙ্গে প্রস্তুত আতর পাঠাইতেছি। ইতি—

নতুন আতর আসিল। নতুনভাবে উহা আমি প্রয়োগ করিলাম। কিন্তু চোখে আতর মাখিয়া মুদিখানার দিকে যাইবার আমার সাহস হয় নাই। পাছে এইবারও আমি অকৃতকার্য হই এই ভয়ে আমি প্রথমে ছোট একটি পরীক্ষা করিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। কিছুকাল আগে যে-গোয়ালাটি আমাদের জলমেশানো দুধ খাওয়াইত তাহার নিকট আমার শতেক টাকা বাকি পড়ায় সম্মানের ভয়ে নিজের হাতঘড়িটি উহাকে দিয়া একটি রফা করিয়াছিলাম। হাতঘড়িটি আমার ফিরিয়া পাইতে বাসনা জাগিল। আমি মিটি মিটি চোখে খাটালের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। গোয়ালা আমাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

আমি বলিলাম, কি মহাশয়, আমার ঘড়িটি কিরূপ সময় নির্দেশ করিতেছে ?

সে বলিল, ইহার অর্থ কি ?

আমি বলিলাম, অর্থ কয়েকদিনের মধ্যেই জলের মতো পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত অর্থ পরিষ্কার হইয়া গেল। আমি দ্বিতীয়বার বুঝিলাম আতর আর জাদুই রুমাল সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। জলন্ধরনিবাসী

দিব্যজ্ঞানী ব্যবসায়ী আমার প্রতি যথেষ্ট চাতুরী করিয়া তাহার ব্যবসায় মুনাফা বাড়াইতেছে। আমিও ছাড়িবার পাত্র নই। আবার লিখিলাম, মহাশয় আমার নিকট হইতে ধাপ্পাসহযোগে আপনারা যে-অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা অতি সত্বর ফিরত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আপনাদের চাতুরী আমার নিকট পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

কারণস্বরূপ আমি তাহাদের গোয়ালার ঘটনাটি ব্যক্ত করিলাম। এবং ভীতিপ্রদর্শন করিবার জন্য বলিলাম যদি আপনারা আমার কথামতো সমস্ত মূল্য ফেরত না পাঠান তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই আমাকে সংবাদপত্রে সমস্ত ঘটনাটি প্রকাশ করিয়া বসিতে হইবে। তাহা আদৌ আপনাদের নিকট সুখকর বোধ হইবে না।

কিছুদিন অপেক্ষা করিলাম। পরে উত্তর পাইলাম। উহারা লিখিল, মহাশয় আপনি অহেতুক আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি থাকিলে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে। আপনি তো কোন ছার! আমাদের আতর ও রুমাল ঈশ্বরের আদেশপ্রাপ্ত বস্তু। ইহা চালাকি করিবার জন্য, দরিদ্র জনসাধারণকে ঠকাইবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। আমাদের মনে হয়, আপনি গ্রহকোপে পতিত হইয়াছেন। এই অবস্থায় একটি গ্রহশান্তি কবচ অবশ্যই আপনার ধারণ করা উচিত। উপযুক্ত মূল্য পাঠাইলেই আমরা আপনার নামে উক্ত কবচ পাঠাইয়া দিব। এবং সেই সঙ্গে অত্যন্ত যত্নসহকারে বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত আতর ও রুমাল পাঠাইব। এ-ক্ষেত্রে আতর ও রুমালের জন্য কোনো মূল্য দিতে হইবে না। শেষবারের মতো পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ফললাভ না করিলে সমস্ত মূল্যই আপনাকে ফেরত পাঠাইয়া দিব। ইতি—

আমি এ-চিঠির কোনো উত্তর দিব না ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু উক্ত দিনেই একটি বিরক্তিকর ঘটনা ঘটিল। আমাদের রন্ধনশালায় একটি কালো রঙের বিড়াল ঢুকিয়া আমার ভাগের মাছটি মুখে করিয়া পলায়ন করিল। আমি স্ত্রীর সহিত বচসা করিলাম। অশান্তি বাড়িল। পরে আমার খেয়াল হইল, মুদিখানার দোকানদার, গোয়ালা ইত্যাদিদের মতো ঐ মার্জারটিও আমার সহিত সময় বুঝিয়া শত্রুতা করিতে বদ্ধপরিকর। উহাকে একটি চরম শাস্তি দেওয়া আমার উচিত। আমি জলন্ধরে চিঠি লিখিলাম। টাকা পাঠাইলাম। গ্রহশান্তি কবচ ধারণ করিলাম। চোখে আতর মাখিবার পূর্বে

রুমাল দ্বারা মুখ মুছিলাম, পরে মিটি মিটি নয়নে বিড়ালটির অন্বেষণে বাহির হইলাম।

বিড়ালটি আমাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিত আমি বুঝিতাম। ফলে উহাকে একটি মাছের টুকরার প্রলোভন দেখাইয়া কাছে ডাকিতে লাগিলাম। সে কাছে আসিয়া সারা দেহ ফুলাইয়া লোভাতুর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইল।

আমি বলিলাম, কি হে মার্জার, তুমি না সেদিন আমার মাছের টুকরাটি চুরি করিয়া খাইয়াছিলে?

মনে হইল বিড়ালটির যদি বাকশক্তি থাকিত তাহা হইলে সে মুদিআলা এবং গোয়ালার মতোই আমাকে প্রশ্ন করিত, ইহার অর্থ কি?

আমি বলিলাম, দিনকয়েকের মধ্যেই অর্থ বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিবে। এই বলিয়া আমি বিড়ালটির মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলাম।

দিনকয়েক অতিবাহিত হইল। বিড়ালটি বহাল তবিয়তেই বিচরণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে আমার সমস্ত নয়ন আরক্ত হইতে লাগিল। আমি পুনরায় জলন্ধরের ব্যবসায়ীদের নিকট চিঠি না লিখিয়া মনে মনে উহাদের কুশপুত্তলিকা রচনা করিলাম। দাহ করিলাম। শালারা নিপাত যায় না কেন বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলাম।

ইহার পর কয়েকটি দিন অতিবাহিত হইল। আমি জাদুই রুমালকে অবহেলায় ফেলিয়া রাখিলাম। জাদুই রুমাল সংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে যে-পরিমাণ অর্থ ঋণ করিতে হইয়াছিল তাহা এখন ধীরে ধীরে পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। মুদিআলাকে প্রায়শই আমি এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করি। গোয়ালাকে প্রতিদিন সকালবেলা গরু লইয়া দুধ বিক্রয় করিতে যাইতে দেখিলে নিজেকে আমি অত্যন্ত হতভাগ্য বলিয়া মনে করি। কিন্তু এত সত্ত্বেও আমি হাল ছাড়িয়া দেই নাই। আমি জানিতাম, আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এমন কিছু কৌশল রপ্ত করিতে হইবে যাহা অদ্বিতীয়, যাহা অব্যর্থ। কিন্তু জাদুই রুমাল আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিল না। বরং জলন্ধরের দিব্যজ্ঞানী মহাপুরুষটিও যে শেষপর্যন্ত আমার পথের কণ্টকস্বরূপ ব্যবহার করিবে তাহা কে কল্পনা করিয়াছিল। অর্থাৎ কিনা যে-সরিষা দ্বারা ভূত ছাড়াইব ভাবিয়াছিলাম তাহার মধ্যেই যে অপদেবতা মহাশয় পরম নিশ্চিন্তে বসবাস করিতেছে তাহা আমি কিরূপে বুঝিব। পৃথিবীর প্রতি আমার

একজাতীয় বিদ্বেষ ঘনীভূত হইতে লাগিল। আমি অতি শীঘ্রই কিছু একটা অভাবনীয় কার্য করিয়া বসিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম।

অবশেষে এমনই একটি দিনে হঠাৎ অপর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়া বসিল। আমি সেইদিন রন্ধনশালায় নিজহস্তে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া বসিয়াছিলাম। দেখিলাম, গুটি গুটি পায়ে বিড়ালটি আসিয়া দরজার কোণায় দাঁড়াইল। আমার সারা দেহে সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রচণ্ড প্রতিহিংসা জাগিল। আমি কাটারি হাতে লইয়া অবহেলার ভঙ্গি করিয়া প্রস্তুত হইলাম। মনে হইল ধূর্ত বিড়ালটি যেন আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হইয়া পড়িয়াছে। হ্যাঁ, সে পালাইবার চেষ্টা করিতেই আমি তাহাকে লক্ষ করিয়া কাটারিটি ছুঁড়িয়া মারিলাম।

ইহাতে ফল ফলিল। আমি দেখিলাম, এতদিন জাদুই রুমাল যে-কাজ করিতে সক্ষম হয় নাই সামান্য একটা কাটারির দ্বারা তাহা সম্ভব হইল। বিড়ালটি রক্তাপ্লুত দেহে ছড়াইয়া পড়িল। আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝিলাম আমার একটি শত্রু নিপাত হইল।

সেই রাত্রে বহুভাবে আমি বিষয়টিকে ভাবনা করিয়াছি। কিন্তু শত্রু নিপাতের এমন সহজতর উপায় থাকিতেও আমি আশ্বস্ত হইতে পারি নাই। আমার পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল কাটারি যন্ত্রটি এবং তাহার ব্যবহার অত্যন্ত সেকালের ধরনের। ইহার দ্বারা আধুনিক কালে অত্যন্ত সামান্যই ফল পাওয়া যাইতে পারে। এখন, এমন কোনো সুকৌশলী মারণাস্ত্রের প্রয়োজন যাহার ব্যবহারে ভূ-মেদিনী কম্পিত হইতে থাকিবে। পৃথিবীর তাবৎ হতভাগ্য ব্যক্তিরা উহার সাহায্যে সেই সুযোগে নিজেদের ভাগ্য ফিরাইয়া লইতে সক্ষম হইবে। আমি ভাগ্যের স্বর্ণ স্পর্শ পাইয়া রোমাঞ্চিত হইতে থাকিব।

হায়, এমন দিন কি আসিবে না? যদি আসে, তাহা হইলে প্রথমেই আমি জাদুই রুমালের সেই দিব্যজ্ঞানী মহাপুরুষের সম্মুখে গিয়া একবার দাঁড়াইব। মিটি মিটি নয়নে হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিব, কি মহাশয়, আপনাদের জাদুই রুমাল কি এখনো মানবের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে সক্ষম?

দিব্যজ্ঞানী পুরুষ বলিবেন, এই কথার অর্থ কি?

আমি বলিব, অপেক্ষা করুন, অচিরেই বিষয়টি আপনাদের নিকট জলের ন্যায় পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

আমি তখন স্থির নিশ্চিন্ত থাকিব, জলের মতো সমস্ত জিনিসেরই পরিষ্কার হইয়া যাইবার সময় আসিয়া গিয়াছে।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

জবাব

(জনৈক সমালোচক আমাকে শোধনবাদী বলায়)

মাকে মা বোলো না,
আদর কোরো না ছেলেমেয়েদের,
বৌকে লুকিয়ে লুকিয়ে ফুল দিও।
সুন্দর কিছু চোখে পড়লে
চোখ বুজুনো অন্ধকারের পর্দাটা
চারদিকে ঝুলিয়ে রেখো।
নইলে ওরা তোমাকে বলবে,
'শোধনবাদী'।

কারুর যদি ফুল ভালো লাগে,
সে ভালো লাগার সর্বাঙ্গে
রক্ত ছিটিয়ে না দিলে,
তোমার রূপদর্শিতা
তোমার দৃষ্টির সহজাত সুখানুভূতি
ওদের মতে
বিপ্লবসম্মত হবে না!

যদি কোনো খেয়ালে গান গাও,
হাড়ভাঙা খাটুনীর পর
ক্লান্তি বিনোদনের অবকাশে
যদি গুন্ গুন্ সুর ভাঁজো,
তোমার সেই আত্মগত সুরেও

কিছুটা নোনা সমুদ্রধ্বনি না থাকলে
ওরা তাকে গানের মর্যাদা দেবে না,
ওরা বলবে :
ঝদানভকে না মানার শোধনবাদী অধোগতি !

যদি তুমি তোমার দলের বাইরের কোনো মহৎপ্রাণকে
মহৎ বলো,
কোনো মরমী প্রেমিককে জানাও শ্রদ্ধা,
তোমার আদর্শ রসাতলে যাবে !
ওদের অত্যদ্ভুত মত হল :
দলের বাইরের কোনো ব্যক্তির
কোনো ভালো কথা বলার অধিকার নেই !
শান্তির কথা, মীমাংসার কথা,
কেবল ওরাই বলবে।

ওদের খুশি করতে হলে
গলার স্বাভাবিক স্বরকে
অনুত্তেজিত মুহূর্তেও
বীররসাত্মক নিখাদে চড়িয়ে রাখতে হবে।
চোখের সাদা জমিটাকে রাখতে হবে
জবাকুসুমসঙ্কাশ লাল।
আর
প্রত্যেকটি পা-ফেলার ছন্দে
জীইয়ে রাখতে হবে
মাটি-কাঁপানো গুম গুম আওয়াজ !
এগুলি তোমার মধ্যে না থাকলে
তুমি হবে 'শোধনবাদী' !

অথচ ওরা রোজই দাড়ি কামায়,
ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে,

ফুল সোঁকে—বিয়ে করে—চুমু খায়
আর
ম্যালথাসী ভূতের তাড়নায়
সংসারের পোষ্য বাড়ায় না।
সব চেয়ে আশ্চর্য,
প্রয়োজনে ওরা যে কোনো সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে
বেমালুম হাত মেলায়!

ইতিহাস-বিজ্ঞান বার বার
ওদের অর্থহীন গোঁড়ামীর কান মুলে দেয়,
কিন্তু আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করা
ওদের কান
একটুও লাল হয় না।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্থির চিত্র

তুলসীতলায় ফুটে আছে একটি রক্তজবা
শান্ত গাছের পাতাগুলি অনেক নিষেধ করেছে তাকে
এমনভাবে বুকের বসন খুলে রাখতে,
কেননা ঝড় উঠলে তখন আগুন মনে হবে।

দুই
মঙ্গল গ্রহে
আগ্নেয়গিরি
জলে

যেন ভয়ানক
দ্বিপ্রহরে
ক্ষুধার মিছিল চলে,
যেন গর্জায় গুলিখাওয়া আক্রোশে

দিনরাত, দিনরাত

রাম বসু

তাকাই তোমার দিকে

তাকাই তোমার দিকে।
সূর্যদের তুমি বলেছিলে : মানুষ শঙ্খের মত পবিত্র আনন্দ।
বিষাদের অন্য নাম হল শয়তান।
লোকটা মরল তবু চোখের ওপর
থামল না কলকাতা
নিয়ন আলোর মধ্যে কিলবিল করে উঠল বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ, ছুঁচো ও ইঁদুর।
জলদগম্ভীর স্বরে বুদ্ধিজীবী বলে : আহা প্যারী, শিল্পের জননী !

কয়েকটা চৌকোশ সঙ জিভ দিয়ে চেটে নিল পৃথিবীর রঙ
মৃতের মুখের মতো আকাশ এখন, শীতল ও ভাবলেশহীন।
আমার সঞ্চিত স্বপ্ন অধঃপতনের পায়ে মাথা কুটে বলে :
ওগো তুমি আমাকে ছেড়ো না।

যে গাছের নিচে আমি আশ্রয় নিয়েছি তার মজ্জায় মজ্জায় ঘুন ; পচে গেছে :
চতুর মাকড়সাগুলো ডাল থেকে ডালে বোনে চক্রান্তের বাসা।
শঙ্খচূড় পরিত্রাহি আউড়ে যায় চৈতন্যচরিত।

আমার দুচোখে আজ নিরাশার আভা ছাড়া অন্য কোন প্রতিশ্রুতি নেই।
সার্বিক পতন ছাড়া আজ অন্য আলোড়ন নেই।
আখের গোছান ছাড়া অন্য কোন তৎপরতা নেই।
একটি মুখও আজ অবশিষ্ট নেই যেখানে এখনও অতীতের দাগ লেগে আছে?
যেখানে এখনও দেখা যাবে
মানবিক ক্রোধ, স্পর্ধা, নিষ্ঠা, ভালবাসা?

তাকাই তোমার দিকে
যযদেব তুমি বলেছিলে: মানুষ শস্যের মতো পবিত্র আনন্দ।

অসীম রায়

এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের প্রার্থনা

হে পাঠক, তোমাকে ভেবেই আমার যে বিখ্যাত গল্প
আমাকে ডোবায়, আমাকে বানায় এমন কমলালেবুর ছিবড়ে
এমন ক্লান্ত আর অবসন্ন এমন সঞ্চয়শূন্য
আমাকে সহসা দেয় খ্যাতির শিখরে খেবড়ে।

হে পাঠক, আমি যা মনের মধ্যে যত্নে গড়েছি নিত্য
তা ব্যর্থ, প্রচণ্ড ক্লান্তি জাগায় তোমার সর্বাঙ্গে;
এ যেন আদর্শ স্বামী সারারাত বকবকিয়ে
সকালে উঠেই ছাখে, স্ত্রী কই?—অন্য সঙ্গে।

হে পাঠক, কতদিন ঔদাসিন্য-স্তাবকতা জালে
জড়িয়ে জড়িয়ে এই জীবনের দিনগুলি গুনি,
কোনদিন মুক্তি নেই মুক্ত কোন আকাশের নীচে
যেখানে আমার ধ্বনি তোমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনি?

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

জাতীয় মহাসড়কে

পূব সীমান্তের সাদা ও নরম মাটির দেশ থেকে প্রতি শীত ঋতুতে ওদের এই অভিযান পরিচালিত হয়। হাওয়া তখন দুশমন ঘোড়সওয়ারদের হাতিয়ার আর ক্ষিপ্রতায় তাড়িয়ে নিয়ে যায় সকল রোদ—জখম করে সমূহ উত্তাপ। আকাশ মেরু হারণের সাদা শরীর হয়ে অ-বোলা চোখে তাকিয়ে থাকে। শিশির কুয়াশা বিষণ্ণ পাখি পাংশু ছিন্ন পাতা গাছ ও তাড়াহুড়ো ফসল উঠিয়ে নেওয়া নগ্ন মাঠ, সুতরাং, প্রতিটি অভিযানকে প্রতিবারের ন্যায় ক্লান্ত করে। হতাশ করে। শেষে গাঙ পেরিয়ে জাতীয় মহাসড়কে পৌঁছে চলতে চলতে দ্বারকা ব্রীজের কিনারায় ঝুঁকে পড়ে মিছিলের হাতের চেটোয় তোলা একমুঠো মাটির রঙ কিছু আশ্বাস দিতে পারে। যেহেতু এখন থেকেই মাটির রঙটা সোনালি। সোনালি ও দৃঢ় এই মাটি। আমন ধান ফলানো রাঢ়দেশের মাটি।

'ফৈজু, ফৈজুদ্দিন!' দারুণ ব্যস্ততায় অন্ধ লোকটি মিছিলের একপ্রান্ত থেকে ডাকছিল।

ফৈজুদ্দিন মাটির ওপর ঝুঁকে রয়েছে তীক্ষ্ণচোখে। স্বপ্ন না বাস্তব? সোনাদেশ রাঢ়ের দিকে এই প্রথম সফর তার। সফর। বলে না 'ভিখ মাঙতে চলেছি।' বলে—'সফরে যাচ্ছি হামি।' যেন এক অলৌকিক কর্তব্য সম্পাদনে চলেছে। পবিত্র হজ্জ যাত্রার মতো ঈশ্বরের ঘরে। ফৈজুদ্দিন ঠিক এরূপই একটা ভাবাবেগ-আলখেল্লার আকারে চাপিয়েছিল গত সন্ধ্যা থেকে। মনটা কেবল বেয়াদবি করছিল অনর্গল। হেই রে ফৈজুদ্দিন থামরু, তুর বাপজানের ছিল পাঁচটা কাঁটাল গাছ, বারোটা আম গাছ, পাঁচখানা বড়ো বড়ো ক্ষেত···বেটা ফৈজুরে, তু ইটা করিস্ না। ইটা ইজ্জতের খেলাপি। বুড়ি মা লম্প জেলে ঘুমন্ত ছেলের মুখটাদেখার চেষ্টা করছিল। মোল্লাজীর বেটা যাবে রাঢ়ে সফরে। হা খোদা! ফৈজুদ্দিন তখন মায়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল উঠোন পেরিয়ে। হিড়হিড় করে টানছিল বুড়িকে। বুড়ি মোল্লান

কুঁকড়ে গুটিয়ে প্রায় গড়াতে গড়াতে চলছিল। শূন্য মাটির বিস্তার—একপ্রান্তে গুটিকয় গোর। আমকাঁটালের বাগান নেই। হা হা হা হা করে শীতের হাওয়ার টানা হাসি গাঙের পাড় থেকে কাঁটাবাবলার ঝোপ নাড়া দিতে দিতে এগোচ্ছে। বুড়ি কেঁদে উঠেছিল—উটা হামি জানি রে বেটা···ফৈজুদ্দিন অন্ধকারে গর্জে উঠেছিল—তবে হামাকে বারণ করো ক্যানে? ক্যানে? বাচ্চাগুলান চেল্লায়—উদের মা বসে বসে আঁসু ফ্যালে। হা রে বুড্‌টী মা···ইজ্জতটা ধুয়ে ধুয়ে খাবো?

এমনি লড়াই করে ফৈজুদ্দিনকে বেরতে হয়েছে। রাঢ়দেশ সোনার দেশ। সফরে যায় যারা, তারা বলে 'আমরা মুসাফির।' ফৈজুদ্দিনও বলছিল বিড়বিড় করে—'হামি মুসাফির।' সে মুসাফিরের চোখে সোনালি মাটি দেখছিল। হাতের মুঠোয় গুঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছিল! তাদের 'বাগড়ী' অঞ্চলের মতো নরম নয়। এ মাটি দৃঢ়। সংহত ও কঠিন মুখের কোনো প্রতিজ্ঞার ন্যায় অবিচল। সে বিস্মিত হচ্ছিল।

বছরের পর বছর ধরে এই সফরের পালা প্রতি শীত ঋতুতে। ছেলেবেলা থেকে শুনেছিল ফৈজু। এখন হিসেব করে মনে হচ্ছে এর শেষ হবে না কোনোদিনও। শূন্য আম কাঁটালের বাগান আরও অধিক শূন্যতায় ভরে উঠবে। ছায়া শেষ হয়ে যাবে বাঘড়ী দেশ থেকে। সাত নদী শত নালা পদ্মা-গঙ্গা-জলঙ্গী-ভৈরবের উন্মত্ত জলে ক্রমাগত ধুয়ে ফেলবে নরম মাটির বিস্তার। আগাছার জঙ্গল থেকে সাপ-শুয়ার-বাঘের খুনিয়ারা ডাক ভাসবে অর্থহীন আকাশের নীচে। আম-জাম-কাঁটালের বাগান একদিন স্বপ্ন হয়ে যাবে তারপর।

তবু ওরা আদমী। আদমীর একটা ইজ্জত রয়েছে। না-খেয়ে শুকিয়ে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করে এই শীত ঋতুর জন্যে। আমন ধানের দেশ সোনার রাঢ়ে ছুটে চলার সাড়া পড়ে যায়। অথচ সরম। ইজ্জত বড় সরমের উদ্রেক করে। বলে—'সফরে যাচ্ছি হামি। হামি মুসাফির রে ভাই, ভিখমাঙনেওলা না।'

শীতের হাওয়ায় ঠোঁট কালোকুচ্ছিত জোঁক হয়ে গেছে। চাদরটা জড়িয়েছে সারা শরীরে। মাথায় গামছা বেঁধেছে, কান ঢেকেছে। তার ওপর টুপি। ছেঁড়া লুঙি হাঁটু অব্দি শেষ হয়েছে। ধুলোভরা পা দুটিতে কাঁচা চামড়ার পাম্পসু। হাতের লাঠিটা ওই অন্ধ সুলতানের।

'ফৈজু ভাই, ফৈজুদ্দিন হে !' সুলতান ফের ডাকছে।

ফৈজুদ্দিন বিরক্ত। সারা পথ লোকটা তাকে এইভাবে ডাকছে। সোচ্চার কণ্ঠের ঘোষিত নামটা জহ্লাদের কোপ যেন।

গুটিয়ে যেতে হয় ভেতর দিকে। উ নামে ডাকিস না রে ভাই···বলতে গিয়ে থেমেছিল সে।

'হা খোদা, হামার লাঠিগাছটা !'

আফশোষ করছে সুলতান। ফৈজুদ্দিনের হাতে তার লাঠি। ভিড়ের ভিতর গুণ্ঠনবতী একটি কমবয়সী মেয়ে ফিকফিক করে হাসছে—'ডর পেয়েছে অন্ধাটা। একূল ওকূল দু কূল গেল···মরণ !'

পাশে ওর আঁচলের খুট দৃঢ়ভাবে ধরে রয়েছে এক বুড়ো। 'হাসিস না ; আকেলমন্দ আউরত !'

ঝাঁঝানো গলায় গুণ্ঠনবতী বলে উঠল—'লাঠিটা দ্যায় না ক্যানে অন্ধাকে ? বেচারা কখন হতে চেল্লায়···'

'তুই বড়ো বেশরম !'

'ইস্ ! শরম লিয়ে বসিয়ে থুলে না ক্যানে ঘরে ? ক্যানে হামাকে আনলে ইখেনে ?'

'হামি আনুম্, না, তু আলি ?'

গুণ্ঠনবতী চুপ।

'বুল্, ইবার বুল্ শাচ্ কথাটো ?'

লম্বাচওড়া আলজিভহীন লোকটি হাসবার চেষ্টা করছে পাশ থেকে : বুড়ো একবার তাকিয়ে রাগটা থামাল।

'ফৈজু ভাই !'

'বুলো।' ফৈজু সুলতানের হাত ধরল এসে।

'মাটি দেখছিলা ?'

'হুঁ ?'

অন্ধ সুলতান চলতে চলতে থেমেছে। ফৈজুর হাতটা ধরে টানছে। হাত ছুঁকবার চেষ্টা করছে। ফৈজু বিরক্ত হচ্ছিল। 'ফৈজুদ্দিন !'

'উঁ ?'

'ইখানে আদমীরা তিনবেলা ভাত খায় রোজ।' ঢোক গিলল সুলতান ! রোজ উরা ভাত খেতে পায়।'

ওখানে গুণ্ঠনবতী মেয়ে চমক খেয়েছে শুনে। 'হা খোদা!'

বুড়ো ফিসফিস করল—'কী হল রে দেলবাহার?'

'তিন বেলা ভা—ত!' দেলবাহারের বিস্ময় পলকে গুণ্ঠন সরিয়ে দিয়েছে। মুখে অ-বোলা হাসি। নাকছাপিতে ম্রিয়মান রোদ আশার ন্যায় চিকচিক করছে।

বুড়োও তার অভিজ্ঞকণ্ঠে হাসবার চেষ্টা করছিল। একটা প্রবল উল্লাস তার নড়বড়ে হাড়ে উত্তাপ সঞ্চার করছে। তার ফ্যাকাশে চোখ দুটি ফেটে বেরোনর তালে। যেন ধরতে পারছে না ওই নাকছাপিতে যে আশার দীপ্তি—এবং কোণের দিকে জলবিন্দু জমছে। চাপা কণ্ঠস্বরে সে বলে উঠল—'দেলবাহার, তুকে যা যা বুলেছিনু, সব মিলে যাবে দেখবি ঠিক ঠিক। হামি মিছা বুলি না।'

সুলতান ফৈজুর হাতটা আঁকড়ে ধরে আছে। এ ধরার স্পর্শে কাকুতি ঘন হচ্ছে ক্রমান্বয়ে। 'হামাকে একলা ফেলে পালিয়ে যাবা না তো ফৈজু ভাই?'

'ক্যানে?'

'হামি অন্ধা আদমী। হামাকে সবাই হাত ধরে লিয়ে যায়। ফির্ ফেরার সময় হাত ছেড়ে পালিয়ে যায়। বড় দুখ ভাই রে।'

'হামি…' ফৈজুদ্দিন কী বলার চেষ্টা করে পারল না। তার বংশগত উপাধি 'খামরু' শব্দটা নিয়ে কিছু বলার ইচ্ছা তাকে কাবু করছিল। একটা খামারবাড়ির মালিক ছিল তার পূর্বপুরুষ। এই পরিচয় এখন জাতীয় মহাসড়কের পীচপিচ্ছিল পথে, যানবাহনের তুখোড় গর্জনে, শীতকালীন দুপুরের মিছিল ও মৃদু কোলাহলে বড় হাস্যকর। হয়তো এ দলে আরও অনেক খামরু রয়েছে। তাই সে আমতা হেসে চুপ করে গেল।

অন্ধ আফশোস করছে। 'আদমী বড় নেমকহারাম। হামার হাত ধরে বাড়ি বাড়ি মুশাফিরি করে। শেষে সব সওয়ালগুলান লিয়ে পালিয়ে যায়। এমনকি লাঠিটাও। সেবারে একঠাঁই বসে আছি। কুকুর এসেছে ছামুতে। খেদাতে যেয়ে লাঠি পাই না। তাপরে…' অস্ফুটকণ্ঠে কথা শেষ করল সে 'তাপরে বুঝনু দোস্তটা পালিয়ে যেয়েছে।'

'হামি বেইমানি করি না ভাইজান।'

'খোদা হাফেজ!'

'খোদা হাফেজ!' বুড়ো বিড়বিড় করছে। দূরের দিকে দৃষ্টি তার!

ধূসর গ্রামগুলিকে দেখছে—যে চঞ্চলতা এখন সেখানে স্বপ্নেরও অধিক, তাকে অনুভব করার জন্য ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করছে সে।

জাতীয় মহাসড়ক এর নাম। ন্যাশনাল হাইরোড। কাতারে কাতারে যানবাহন চলেছে। কোথাও বুঝি একটা ঘোরতর উৎসব শুরু হয়ে আছে। দ্রুতগামী যানবাহনের চালকেরা প্রতিবারের ন্যায় বিরক্ত হচ্ছে। মিছিল বড় বাধার সৃষ্টি করে। অথচ ওরা জানে এখন ঘোর ব্যাপক শীতকালীন অভিযান এই সব মিছিলের জন্য নির্ধারিত। পুরুষ ও নারী—বৃদ্ধ যুবক শিশু ও বৃদ্ধা-যুবতী বালিকারা, রুগ্ন অন্ধ খঞ্জ বধির ও কিছু অর্ধোন্মাদ—মোটামুটি মিছিলটি পৃথিবীর মানুষগুলির প্রতিনিধিত্ব দাবি করে যেন। এবং মিছিলের মুখগুলি ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। কঠোর হাওয়ার পীড়নে ঠোঁটগুলি পচাটে ও কালচে রঙের। হাওয়া লাশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া শকুনের মতো ক্ষিপ্র। তাছাড়া কে না জানে সীমান্ত শহরের পর ন্যাশনাল হাইরোডের আঞ্চলিক ঐতিহ্য বলতে শুধু এটুকুই টিকে আছে।

কখন বেলা নেমেছে তারপর। রোদ ছায়াকে লম্বা করে শুইয়ে দিয়েছে পিছন দিকে।

প্রশস্ত সড়ক ধারাক্রমিক শব্দ সমূহে থরথর করে কাঁপছে। উড়ন্ত ধুলোয় হলুদ হয়ে আসা পাতা গাছে গাছে বোবা দেখাচ্ছে। সোনালি রঙের এই ধুলো বিষণ্ণ ঘাসে নগ্নমাঠে ছড়িয়ে পড়ছে চাপচাপ। কিছু কিছু মেঘ ইতস্তত। তাদেরও রুক্ষ ও কাতর দেখাচ্ছিল। মিছিলের কোনো সতর্ক চোখ বার বার মেঘগুলিকে দেখছিল।

দেলবাহার ধমকাল—'বুলন্দ্ সামলে চলো। এখুনি পা-খানা পেঁৎলে দিত মোটরগাড়িতে!'

বুড়োর হাত ধরে টানল সে। বুড়ো ঝাঁকুনি দিচ্ছিল। 'আঃ, উবা দেখছে। ছি, ছি!'

'দেখুক। হাত না ধল্লে গিরে যাবা।'

'বেহুদা আওরত!' বুড়ো ওর স্পর্ধায় বিচলিত। ধাক্কা দিয়ে হাত ছাড়াতে গিয়ে পাশের নয়ানজুলিতে গড়িয়ে পড়ে আর কী। স্তূপীকৃত ধুলোয় শরীর বিচিত্তির। ছেঁড়া তুলোর কম্বলে আস্ত ভেড়ার মতো হামাগুড়ি দিচ্ছে। মিছিলের একাংশে হাসির শব্দ হচ্ছিল। এবং দেলবাহারও দুলে দুলে হাসছিল।

'টুপিটা—তোমার টুপিটা ফেলে এলে জী !'

টুপি কুড়িয়ে ফুঁ দিচ্ছে বুড়ো। গোমড়ামুখে পরছে। কিন্তু উঠে এসেই যেন বেমালুম ভুলে গেল। সে তার দেশেঘরে যে সুরসিক ও বাচাল মানুষটি হয়ে বেঁচে থাকে, তাকে এখন আরোপ করার চেষ্টা করল। যেন একটা দারুণ কৌতুককর কাণ্ড ঘটিয়েছে—এভাবে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে থাকল।

দেলবাহার তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল—'হেসো না জী !'

অন্ধ সুলতান ফিসফিস করছে—'কাঁসি না ঢোলক হে ফৈজু ?'

উত্তরোত্তর বদলেছে ফৈজুদ্দিন। বাচালকণ্ঠে মন্তব্য করল—'খাঁটি কাঁসার ঢাকের পাশে ক্যাঁই ক্যাঁকোর ক্যাঁই...'

হি-হি-হি-হি...সুলতান থামাতে পারছে না নিজেকে।

'চুপ। দ্যাখো না, কেমন কটমট করে তাকায়।'

'কটমট করে ! হি-হি...'

'ওই দ্যাখো।'

'হামি দেখি না ফৈজুদ্দিন। হামি অন্ধা।'

পলকে অপ্রস্তুত ফৈজু। চোখ পিটপিট করছে। মনে মনে বলছে—'দিল্লাগী ভালো না। খোদা হাফেজ।'

'ফৈজুদ্দিন !'

'বুলো।'

'গত সনে কার সঙ্গে যেইছিলা ?'

'এই পেথম ভাইজান।'

'মিছে কথা বুলো না ফৈজু। খোদা নারাজ হবেন।'

'হামি মিছে কথা বুলি না। হামার বাপের বাগান ছিল দুটো। ক্ষেত ছিল পাঁচখান...'

সুলতান চুপ করে গেছে। সব হাসি মনের ভেতর ঢাকনা দেওয়া। এ কথা তার সব সঙ্গীই বলেছিল।

আর সব সঙ্গীই তাকে ফেরার সময় নিঃস্ব করে পালিয়ে গিয়েছিল।

'তুমি বিশ্বাস কচ্ছো না ?'

'খোদা হাফেজ বুলো ভাই।'

'হামি ছেঁচা বুলছি না ?'

'যেতে দ্যাও ফৈজু।'

'তাহলে তুম্মো অন্ধা না। তুম্মো মিছে কথা বুলেছো…'

আর্ত চিৎকার করল সুলতান—'ফৈজু! ই ছাখো—হামার আঁখ দুখান ছাখো—' দু আঙুলে চোখ ফাঁক করে দেখাচ্ছে সে। ঘোলাটে কুচ্ছিত পর্দার ওপর রক্তের শুকনো ডেলা। অসহ্য ঘেন্নায় গা ঘুলিয়ে বমি আসে দেখতে।

'তোবা, তোবা! হামারে মাফ করো সুলতান।'

'হামারে ফেলে পালিও না যেন। তাইলে সব বিশ্বাস করবো।' দুজনে দারুণভাবে একত্র হয়ে গেছে এবার।

'দেলবাহার!' বুড়ো ডাকল।

'উঁ?'

'ইবার জাড় এট্টু কম যেন।'

'কম! সাঁজ নামছে তো জাড় শয়তান হচ্ছে মা গে! চামড়াখানাও খুলে দিলে।'

'না রে বিবি। জাড় কমবে। ইটা রাঢ় ছাশ। ইখেনে আদমীরা তিনবেলা ভাত খায়।'

সেই ভাতখাওয়ার অলৌকিক সংবাদ। তাদের দেশে আমীর ব্যক্তিরা দুবেলা ভাত খেতে পায়। নৈলে ছাতু-ভুজা-আম-কাঁটাল। তাও দিনে একবার করে জোটে! দেলবাহার তার অল্প অল্প জানা জগতের ঝুলিটা ফাঁক করে দেখছিল। দেখতে দেখতে ঘোমটা সরে গেছে। শেষ রোদের রঙে ক্লান্ত মুখখানি কিছু বিস্ময়কে ধরে টলটল করছে। কাঁধের দুপাশে উপচে পড়া চুলে সেই বিস্ময়ের ছন্নছাড়া বিস্তার। চুলে একটি লাল তেলচিটচিটে ফিতে জড়ানো। গুটিকয় সাদা কাঁটা খসে পড়ার তালে। 'হামার গে ছাশে চাঁদমিয়া নাকি রোজ ভাত খায়।' বলতে বলতে সে বুড়োর কানের কাছে মুখ আনল। 'এট্টা কথা শুনবা জী?'

'বুলো।'

'সফর করে যখন ছাশে ফিরবা, হামারে তালাক দিবা না তো?'

'ক্যানে?' সজারুর মতো উত্থিত হয়েছে বুড়োর কম্বলঢাকা অস্তিত্বটা।

'হামার বাপ নাই মা নাই ভাই নাই বহিন নাই—'

'দেলবাহার, কাঁদিস না।'

'মামু তুমার সঙ্গে সাদী দিলে। বুললে—একখান ক্ষেত আছে তুমার। সুখে থাকবি বেটি।'

বুড়ো চোখ দুটি থিরথির করে কাঁপছে। 'একখান ক্ষেত আছে! হা খোদা! এক মাসের রুজী চলে না ইতে।' বুড়ো হঠাৎ লজ্জাসরম ভুলে ওর হাত ধরল। 'কিন্তুক তু যদি হামাকে ছেড়ে পালাস দেলবাহার…'

'ক্যানে পালাবো?' চোখ মুছে বুড়োর মুখটা দেখল সে।

'তুর বয়েস আছে। হামি তো গোরে এক পা দিয়ে বসে আছি।'

'ক্ষেতওলা আদমীরা হামাকে বিহা করবে না।'

'ক্যানে?'

'হামি যে সফরে গেয়েছিনু! হামি যে ভিখ মেঙে খেয়েছিনু! দেলবাহার কী যেন গোপন করার চেষ্টা করছে। অন্তত হাসবার ভঙ্গী তা প্রকট করে।

'উতে জাত যায় না।' বুড়ো শান্তকণ্ঠে বলল। জওয়ানী যার আছে, তার জাত আছে।'

'না!' হঠাৎ দেলবাহার তার উপচে পড়া চুলের গোছা সরিয়ে দিল। ইখেনে তাকিয়ে দ্যাখোনি কখনো। এই সাদা দাগগুলান দ্যাখোনি তুমি…'

ধবলকুষ্ঠের চিহ্ন ঘাড়ের পেছনে। বুকের দিকে নেমেছে। বুড়ো দেখছিল। সফরের পথে ভাত খাবার সংবাদে পুলকিতা দেলবাহার এই প্রথম একটা নিশ্চিত ভিত্তিকে পেতে চাচ্ছে। তাই এই প্রকাশ। বুড়ো বুঝছিল। বুঝতে পেরে ঝিম মেরে যাচ্ছিল। কমবয়সী বিবি পেয়েছে—এই বিপুল সুখ ও গৌরবের বোধ কমাস আগে তাকে যেমন অন্ধ করে রেখেছিল—এখনও তাই।

'জর্জিশ।'

'মা গে?'

'এসে পড়েছি মানিক।'

'ঘরবাড়ি কই মা গে?'

'এট্টু পরে দেখবি বাছা।'

দশ বছরের জর্জিশ থমকে দাঁড়াল।

'কী হলো?'

'হামি যাবো না। হামার ডর লাগে মা গে।'

'পাগলা!' হাত ধরে মা টানছে। কোলে আর একটি বাচ্চা। বাচ্চাটির কচি হাত কাপড়ের ফাঁকে শুকনো স্তনটা খুঁটছে।

'না। তু হামাকে সিবারের মতন ফেলে পালিয়ে আসবি!

'রাখাল থাকলে অনেক ভাত খেতে পাবি জর্জিশ।'

জর্জিশ নাক খুঁটছে। গত বছরের ভাত খাবার স্মৃতি তাকে খোঁচা দিচ্ছিল।

'আয় বাপ। সাঁজ হয়ে এল।'

'জাড় লাগে। ভুখ লাগে মা গে!'

'আর এট্রুখানি!'

পরক্ষণেই একটি রূঢ় কণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল—'হুঁসিয়ার!'

মিছিল মুহূর্তে চুপ। প্রতি শীতকালীন সফরযাত্রায় এরূপ কণ্ঠে অকারণ হুঁসিয়ারীর ঐতিহ্য রয়েছে। কোথা হতে প্রতি অভিযানে এই ন্যাশনাল হাইরোডে একজন নায়ক এসে সুমুখে দাঁড়ায়। মিছিল তাকে যথোচিত মর্যাদায় মেনে চলে। এইটেই প্রথা।

এবারের লোকটিকে তারা দেখছে। মিছিলের সবচেয়ে লম্বা। উদ্ধত কাঠকঠোর শরীর। লম্বা চুল কাঁধ ছুঁয়ে আছে। চুল দাড়ি গোঁফ ঈষৎ লালচে রঙের ও ধূলিধূসর। চোখদুটি ক্যাকাসে—নীলাভ তারা। ওর কাঁধে ধূসর একটা তুলোর কম্বল পিঠের দিকে ঝুলে মাটি স্পর্শ করছিল। পথে ঘষা খাচ্ছিল। হাঁটুর নিচেই নেমে আছে কালো লুঙ্গিটা। গায়ে কোনো জামা নেই। এই শীতে জামাহীন চওড়া বুকে কোনো রোমাঞ্চেরও চিহ্ন নেই। গলায় একটা রূপোর তাবিজ কালো কারে বাঁধা। যথার্থ নায়কের ভঙ্গিতে সে লম্বা লম্বা পা ফেলছিল।

সে চিৎকার করে বলল—'হুঁসিয়ার!' তারপর লম্বা আঙুল তুলে মেঘ দেখাচ্ছিল। বিক্ষত জন্তুর লাশের মতো টুকরো টুকরো মেঘ পশ্চিম দিগন্তে জমেছে। মিছিলের মুখে তা প্রগাঢ় ভয়ের চিহ্ন ফুটিয়ে তুলছে ক্রমে ক্রমে।

এখনও দুপাশে নগ্নমাঠ। হেমন্তের শেষ হতে না হতে ফসল উঠে গেছে। নগ্নমাঠে নীলাভ সন্ধ্যার সঞ্চার পলকে পলকে পথের উপর পাগুলিকে আড়ষ্ট করে।

'দেলবাহার! দাঁড়ালি ক্যানে?'

'চলো।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলতে থাকল দেলবাহার।

'ভুখ লেগেছে তুর?'

'নাঃ। চলো।'

'ফৈজুদ্দিন !'

'দোস্ত ?'

'কিছু নয়। চলো, পা চালাও।'

'জর্জিশ !'

'জাড় লাগে, ভুখ লাগে মা গে !'

'পা চালিয়ে চল মানিক।'

মিছিল দ্রুতগতি হয়েছে। লম্বা লোকটি আগে আগে চলেছে তাকে টেনে নিয়ে। একটু ঝুঁকে চলছে সে।

ষোল শতকে বাদশা হোসেন শাহ নাকি এই পথটা বানিয়েছিলেন। গৌড় থেকে পুরী। তার উপর পিচ ঢেলে দেওয়া হল বিশ শতকে। পথের দুপাশে প্রকাণ্ড দীঘি আর পুরনো মসজিদের হেলে-পড়া গম্বুজ।

তেমনি একটা নির্জন মসজিদে মিছিল আশ্রয় নিয়েছে অন্ধকারে।

তখন বৃষ্টি নেমেছে ঝিরঝির করে। শীতের বাতাস আরও উদ্দাম হয়েছে এসময়ে। সকালের আশায় মিছিলটা ফাটলধরা ছাদের নিচে ভাঙাচোরা চত্বরে হুড়মুড় করে এসে গড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু তার আগেই আরেকটা দল কখন সেখানে আগেভাগে আস্তানা গেড়েছিল। গড়িয়ে পড়তে গিয়ে পরস্পর টোক্কর খেয়ে ভীষণ চেঁচামেচি শুরু হয়েছিল।

নায়কোচিত কণ্ঠস্বর ফের তীব্রকণ্ঠে বলল—'খবরদার, চুপ !'

অস্বাভাবিক কণ্ঠের খবরদারি গুমগুম করে বাজছিল গম্বুজের ছাদে। সকলে চুপ করে গেছে। একসময় কে কথা বলল—'তুমরা চলেছ। হামরা ফিরে এনু।' স্বরটা অতি ক্লান্ত ও আচ্ছন্ন। জরো মানুষের স্বর।

'ক্যানে, ক্যানে ?' ক্ষিপ্ত প্রশ্নের ঝাঁক চারপাশে। প্রথমে যে কথা বলেছিল, সে অন্ধকারের খোঁদলে হারিয়ে গেছে যেন। প্রশ্নগুলি ঝরে গেল নিষ্ফলভাবে। আবার সব চুপ। জবাবটা কী হবে, কী হতে পারে—কেউ চিন্তা করতে ভয় পাচ্ছে বুঝি।

হঠাৎ সেই স্তব্ধতা ভেঙে গেল বুড়ো লোকটির খনখনে চিৎকারে। 'বুলবি না বাচ্চারা, কথাটা বুলবি না ?'

ফৈজুদ্দিন কান খাড়া করেছে। সেও জবাব শুনতে চায়। কেন ওরা ফিরে এল ?

'ওদের মায়ের দোহায়—বুল কথাটা…'

কে মৃদুস্বরে বলছে—হয়তো সুলতানই—'শুনবো না হামরা। চুপ বুঢ্‌ঢা, চুপ।'

'না।' বুড়ো আরো জোরে চেঁচাচ্ছে।

'মন খারাপ হবে। থাক, কথাটা চাপা থাক। সফরে বেরিয়ে আন-কথায় কান দিতে নাই।'

'দেলবাহার !'

'ইরা আদমী না বেকুফ ? ইরা…' বুড়ো উপযুক্ত শব্দাবলী খুঁজছিল।

'খবরদার, চুপ সব, চুপ !' নায়ক গর্জন করছে এক কোণ থেকে। এক সময় ইমামসাব যে ধাপের উপর বসে খোতবা পাঠ করতেন—সম্ভবত সেই আসনটাই সে দখল করে নিয়েছে।

সুলতান চুপিচুপি বলল—'পাগলা জুটল বরাতে !'

'মা গে !'

'জর্জিশ ?'

'জাড় লাগে, ভুখ লাগে মা।'

'ফৈজুদ্দিন ?'

'উঁ ?'

'কেউ কথা বুলছে না ক্যানে ?'

'বুলছে তো।'

'কিছু শুনি না। হামার কানদুটাও কালা হল ভাই রে !'

'বড় জাড।'

'চুপ, চুপ। খবরদার !'

'ভিজে গেনু জী। সরো না এট্টু।'

'সকাল হতে দ্যাও।'

'জাড় লাগে, ভুখ লাগে মা গে !'

'সকাল হোক।'

'খবরদার, খবরদার !'

'দেলবাহার, ওরে দেলবাহার ?'

'অমন করছ ক্যানে ?'

'দেলবাহার হামার মউত হবে মনে হচ্ছে। হামি ক্যানে তুকে আনন্থ···তু দুধের বাচ্চা দেলবাহার···'

'রাতটা কেটে যাক। বিহানে সোনার ছাশে নামবো।'···

কথাগুলি অন্ধকারে এইভাবে ভেঙে যাচ্ছিল গড়ে উঠছিল বুদ্বুদের মতো। এবং ওই একটিমাত্র লোক তার অসাধারণ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বার বার বলছিল—'খবরদার, হুঁসিয়ার !'

তারপর সেই জীবন্ত ক্ষুব্ধ বিহ্বল লোকগুলি পরস্পর সংলগ্ন শরীরে বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচবার জন্যে আরও অধিক সংলগ্নতা আশা করে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। ফৈজুদ্দিনের বুকে কার নিঃশ্বাস—কানের পাশে একরাশ চুল, সে অন্ধকারে অনুভব করছিল দেলবাহারকে। অন্ধ সুলতান স্বপ্নে তার লাঠি হারিয়ে ফোঁপাচ্ছিল। বুড়োর বুকে জর্জিশ উত্তাপ সংগ্রহ করে তার বাবার সঙ্গে মাঠের দিকে এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখছিল। আর তার মা তখন স্বপ্নে দেখল রাঢ়ের ফয়েজ খাঁ হাজিকে। বদনায় ওজুর জল এগিয়ে দিতে বলছেন হাজীসাব। কিন্তু সে কিছুতেই এগোতে পারছে না। পায়ে পায়ে শাদা ভাতের কণা মেখে যায় কেবল—পাপের দুঃখে সে চুল ছিঁড়ছে। এবং প্রতি শীতকালীন সফরের নামহীন নায়ক তখন উঁচু আসনে বসে মাথা দুহাতে ধরে ঝুঁকে রয়েছে সুমুখে। সে ঘুমোতে পারছে না যেন। সে যেন ঘুমোতে চায় না। হয়তো সে কোনোদিনই ঘুমোতে পারে না। এদিকে ঘুমন্ত লোকগুলি বার বার তাকে ঘুমের জগতে দেখতে পাচ্ছিল। দেখছিল তার হুঁসিয়ারি কণ্ঠস্বর সব নিষ্ফল মায়া ও মোহে পূর্ণ স্বপ্নের দুয়ার আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুসা, ইসা, মোহাম্মদ—সে যেই হোক, প্রতিবারের ন্যায় এবারেও কেউ তার নাম খুঁজে ব্যাকুল হচ্ছিল না।

এবং শেষ রাতের দিকে কেউ জেগে উঠে না-বলা শব্দগুলি বলে দিল হঠাৎ। না বলে থাকতে পারল না। সে বলে দিল—'রাঢ়ে মাঠ অনাবাদ। ইবার কানা আসমান বর্ষায় এক ফোঁটা পানিও ছায় নি।'

নায়কোচিত কণ্ঠে হুঁসিয়ারি এল সঙ্গে সঙ্গে—'খবরদার, চুপ !'

একটা মিছিল ফিরে যাচ্ছে। আর একটা চলেছে। কেউ কারুর কথা

সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বলতে এটুকুই বোঝায়।

রমানাথ রায়

সামনের সাতাশ

আর পাঁচজনের যা যা থাকে তা ছিল তোমার। যেমন দুটো হাত ছিল, দুটো পা ছিল, একটা মুখ ছিল, দুটো চোখ ছিল, দুটো কান ছিল, একটা নাক ছিল এবং মাথায় যথারীতি চুল ছিল। শুধু তাই নয়, আর পাঁচজনের যা যা থাকে তাও ছিল তোমার। যেমন একটা চাকরি ছিল, একটা বাসা ছিল, একটা বিছানা ছিল, একটা চেয়ার ছিল, একটা আলমারি ছিল, একটা স্যুটকেশ ছিল। এর ওপরেও আর পাঁচজনের যা যা থাকে তাও ছিল তোমার। যেমন একটা বৌ ছিল, একটা ছেলে ছিল, একটা মেয়ে ছিল। কিন্তু আর পাঁচজনের আর যা যা থাকে তা নেই বলে তোমার মনে কোনো সুখ ছিল না। যেমন পাঁচতলা বাড়ি ছিল না, গাড়ি ছিল না, রেডিওগ্রাম ছিল না, বিলিতি কুকুর ছিল না, দারোয়ান ছিল না। তাই সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে যখন ভাবতে, তোমার বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, রেডিওগ্রাম নেই, বিলিতি কুকুর নেই, দারোয়ান নেই তখন তোমার মনটা ভারি খারাপ হয়ে যেত। তুমি তাই কোনোদিন লটারির টিকিট কাটতে ভুলতে না। তবে কাটতে কাটতে ক্লান্ত হয়ে একদিন তুমি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে এক জ্যোতিষীর কাছে হাজির হলে। জ্যোতিষী হাত দেখে বললেন, সামনের মাসের সাতাশ তারিখে তোমার জীবন রাতারাতি পাল্টে যাবে। শুনে খুশি হয়ে জ্যোতিষীকে আরো খুশি করে চলে এলে। আর এই খবরটা তুমি সকলের কাছে বেমালুম চেপে গেলে। বন্ধুবান্ধব দূরের কথা ঘরের বৌকে পর্যন্ত এটা জানালে না। কিন্তু না জানালেও হঠাৎ একদিন দুপুরে অফিসে কাজের ফাঁকে পকেট থেকে টিনের কৌটো বের করে মুখের ভিতর একসঙ্গে দুখিলি পান পুরতে গিয়ে তোমার মুখে একটা অদ্ভুত বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠল। পাশের এক ডেঁপো ছোকরা সেই হাসি দেখে জিজ্ঞেস করল, কি দাদা, হাসছেন যে? লটারির টাকা পেলেন নাকি? তুমি তখন পান চিবোতে

চিবোতে বললে, এখন ঠাট্টা করছ, কর। পরে বুঝতে পারবে। ছোকরা তখন যেন লাই পেয়ে মাথায় উঠে বলল, তখন তো আর আপনার কৃপা পাব না। এখন বরঞ্চ একটু কৃপা করে বৌদির হাতে-সাজা পান খাওয়ান তো দেখি। তুমি তখন কৃপা করে ছোকরার হাতে একখিলি পান তুলে দিয়ে টিনের কৌটটা ফের পকেটে পুরে রাখলে।

শুধু অফিসে নয় বাড়িতেও বৌ একদিন যখন খাটতে খাটতে ঘরের মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে বলল, আর পারি না বাপু, একটা ঝি রাখ, তুমি তখন হাসিটা আর চেপে রাখতে পারলে না। বৌ তোমার হাসির ছিরি দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল, হাসছ যে? বৌ-এর প্রশ্নে হেঁয়ালি করে বললে, এখন বুঝবে না, পরে বুঝবে। বৌ আরো তেতে গিয়ে বলল, তার মনে? তখন হাসিটা সারা মুখে ভালো করে ছড়িয়ে দিয়ে বললে, আর কটা দিন শুধু কষ্ট কর। বৌ তখন মুখঝামটা মেরে বলল, যত সব ভীমরতি। তুমি তখন বেচারা বৌ-এর উপর কৃপা করে তার সঙ্গে রাগারাগি করলে না। তাকে শুয়ে থাকতে দিলে।

একদিন ছেলে এসে বলল, দিল্লী যাব। তুমি তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মুখে সেই বিজয়ীর হাসি এনে বললে, ঠিক আছে। অত ব্যস্ত কেন? একদিন ছোট মেয়েটা বলল, বাবা, একটা হার চাই। তুমি তার মাথার হাত বুলোতে বুলোতে মুখে যথারীতি সেই বিজয়ীর হাসি এনে বললে, সব হবে। একটু সবুর কর।

কিন্তু কেন যেন সাতাশ তারিখ আসার আগেই একটা অঘটন ঘটে গেল। তোমার বৌ চোখ-কান বুঁজে যেন তোমাকে শেষবারের মতো নাকাল করার জন্যে অসুখ বাধিয়ে বসল। তবু তুমি ভড়কে না গিয়ে এক বন্ধুর কাছে হাত পাতলে। এর আগেও বহুবার এই বন্ধুটির কাছে হাত পেতেছ। এবং সে-সব আজো শোধ দিতে পার নি বলে বন্ধুটি যখন এক পয়সা দেব না বলে বেঁকে বসল, তখন তুমি মুখে সেই বিজয়ীর হাসি এনে বললে, বুঝলে, সব পাবে একদিন, সব পাবে।

বন্ধুটি তোমার হাসি যেন দেখতে না পেয়ে বলল, আগে পাই, তারপর দেখা যাবে।

তুমি তখন সেই বিজয়ীর হাসিটা বজায় রেখেই বললে, এটাই শেষবার। শুনে কি যেন ভেবে বন্ধুটি তোমার হাতে কিছু তুলে দিল।

কিন্তু দু-দিন পরে দেখলে শুধু বৌ নয়, ছেলেটিও তোমার সঙ্গে যেন আড়ি পেতেছে। একদিন সে হঠাৎ বলে বসল, পরীক্ষার ফি চাই। তুমি তখন রাগ করে নিজের সখের আংটি বেচে দিলে।

আরও দু-দিন পরে দেখলে শুধু বৌ বা ছেলে নয়, সব্বাই যেন তোমার পিছনে লেগেছে। বাড়িওয়ালা এসে শাসিয়ে গেল, কেস করবে। কয়লাওয়ালা শাসিয়ে গেল, কয়লা দেবে না। মুদি শাসিয়ে গেল, হামলা করবে। ধোপা শাসিয়ে গেল, আর কাপড় নেবে না। এমনকি পাশের দোকানদার যার কাছ থেকে তুমি দীর্ঘ সাত বছর ধরে সিগারেট নিয়ে আসছ সেও শাসিয়ে গেল। কিন্তু বাড়িওয়ালা, কয়লাওয়ালা, মুদি, ধোপা পাশের দোকানদার তোমাকে যা নয় তাই বললেও তুমি কিছু মনে করলে না। কেননা, সাতাশ তারিখের আর বেশি দেরি ছিল না।

তুমি তাই একদিন পান চিবোতে চিবোতে একটা পাঁচতলা বাড়ি দেখে এলে। দাম আশি হাজার। একদিন গাড়ি দেখে এলে। দাম তিরিশ হাজার। একদিন রেডিওগ্রাম দেখে এলে। দাম তিন হাজার। একদিন কুকুর দেখে এলে। দাম পাঁচশ টাকা। একদিন এক দারোয়ান দেখে এলে। মাইনে আশি টাকা। আর সেই সঙ্গে ঠিক করে ফেললে আঠাশ তারিখে কার সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করবে। তুমি জান আঠাশ তারিখের সকালে হালচাল পাল্টে গেছে দেখে সকলেই তোমার চারপাশে ঘুর ঘুর করবে। হেঁ হেঁ করে হাসবে। বন্ধুটি তখন তোমার পিছনে আরো টাকা খরচ করবে। বাড়িওয়ালা ভাড়া চাইতে ভুলে যাবে। কয়লাওয়ালা মণ-মণ কয়লা দিতে চাইবে। মুদি গদ-গদ হয়ে বস্তা বস্তা চাল ডাল দিয়ে যাবে। ধোপা সামনে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইবে। পাশের দোকানদার দামী দামী সিগারেট এনে দেবে। আর ঠিক তখন তুমি কারোর দিকেই ফিরে তাকাবে না। দারোয়ান দিয়ে বাড়ি থেকে সকলকে বার করে দেবে। কেননা, এখন এই সব ছোটমানুষদের সঙ্গে তোমার আর ভাব রাখলে চলবে না। তোমার মান যাবে। তোমাকে তখন মন্ত্রীটন্ত্রীদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হবে। শুধু কি তাই? তখন কত ব্যস্ত হয়ে পড়বে তুমি। ঘুমোবার সময় পাবে না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজে অকাজে এখানে সেখানে গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। কত মিষ্টির দোকান, ফলের দোকান, লোহার দোকান, তামাকের দোকানের উদ্বোধন করতে হবে। কত সাহিত্য-

সভায়, ধর্মসভায়, বিজ্ঞানসভায়, শিল্পসভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করতে হবে। আর তখন তোমার মুখ দিয়ে যা বেরোবে সাংবাদিকরা তাই খস-খস করে টুকে নেবে। এবং পরের দিন কাগজে কাগজে ফলাও করে ছবিসমেত সে-সব আবার ছাপা হবে। কে পায় তখন তোমায়? আর সারাদিন গাড়িতে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে যখন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরবে তখন ঝাছির মতো চাকরের ঝাঁক এসে তোমায় ঘিরে ধরবে। একজন জামা খুলবে, একজন জুতো খুলবে, একজন গা মোছাবে, একজন সরবৎ করবে।

এবং তুমি জান যে এর আর দেরি নেই। সামনের সাতাশ এসে গেল বলে। শুধু যতদিন না আসে, ততদিন একটু যা কষ্ট করা, একটু যা অপমান সহ্য করা।

কিন্তু সাতাশ তারিখ যেন এসেও আসে না। বৌ-এর অসুখ সেরেও আর সারে না। পাঁচজনের তাগাদা থেমেও আর থামে না।

তবে সত্যি সত্যি একদিন তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ পার হয়ে সেই সামনের সাতাশ এসে গেল। তুমি ঘুম থেকে উঠে চোখ-মুখ ধুয়ে ছেড়া চটের থলি হাতে বাজারে গেলে। আলুওয়ালার সঙ্গে অন্যদিনের মতো আর খ্যাচর-ম্যাচর করলে না। সে যা চাইল তাই দিয়ে চলে এলে। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় স্নান করলে, ভাত খেলে, অফিস গেলে। আর প্রতি মুহূর্তে ভাবতে থাকলে, এই, এবার বুঝি কিছু হয়। তবে কিছু হওয়ার আগে অফিসার হঠাৎ দুপুরে ধমক দিয়ে বললেন, এসব কি লিখেছেন, এ্যাঁ? চোখের মাথা খেয়েছেন নাকি? শুনে তুমি ভাবলে, দেই একটা কড়া জবাব। কিন্তু না, তুমি তাঁকে কৃপা করে ছেড়ে দিলে। কেননা, বেচারা জানে না আজ তোমার জীবনে কি সাংঘাতিক পরিবর্তন হয়ে যাবে। যদি জানত তাহলে এই বোকা লোকটা আর তোমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে পারত না। পায়ের কাছে পড়ে হেঁ হেঁ করত। আর শুধু অফিসার নয়, ঠিক আজকেই পাশের ডেঁপো ছোকরাটা বলে গেল, শুনলাম লটারির টাকা পেয়েছেন। বলি, খাওয়াচ্ছেন কবে? তুমি তাকেও কৃপা করে ছেড়ে দিলে। কিছু বললে না। এবং অফিস ছুটির পর ছাতা হাতে ধুঁকতে ধুঁকতে যখন বাড়ির কাছে এলে, তখন ভাবলে, আর কয়েকমুহূর্ত হয়তো বাকি আছে, তারপরেই সব অন্যরকম। সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখে আবার সেই বিজয়ীর হাসিটাও ফুটে উঠল।

পায় নি, তারা সবাই শূন্য হাতে ফিরবে ঘরে। সেই শূন্যতার জ্বালা ঢাকের উপর আছড়ে পড়ছে—ট্যান্ ট্যান্ ট্যান্, টা-র্-র্-র্ টান্।

কাঁসিগুলোও পাশে দাঁড়িয়ে নাকি কান্নার সুরে ক্যান-ক্যান করছিল। এখন সেগুলো থেমেছে। যাদের হাতে রয়েছে ওগুলো—বেশির ভাগই ছেলে-ছোকরা—তারা কেউ বসে কেউ ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে দিয়েছে। নিমাইর নাতি পেল্লাদও কাঁসিটা বুকের কাছে চেপে ধরে বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। নিমাইর ছেলে মুকুন্দ মারা গেছে কয়েক বছর আগে—তখন ঐ পেল্লাদটা ছিল একরত্তি—এখন একটু ডাঁটো হয়েছে। তাই কাঁসি বাজাবার জন্যে এনেছে নিমাই। কিন্তু—। পেল্লাদ রে, আমাগো এত দেরী দেইখ্যা তোর ঠাউরমা নিশ্চয় ভাবত্যাছে, আমরা বুঝি বায়না পাইছি।

ট্যাম-ট্যাম-ট্যাম। আকস্মিক ক্রুদ্ধ আঘাতে কে যেন ঢাকের চামড়া ফাটিয়ে ফেলতে চাইছে।

নিমাইরও মুহূর্তের জন্যে ঐ রকম একটা চামড়া ফাটানো বাড়ি মারতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু সে বেতটা জোরে চেপে ধরে নিজেকে সংযত করল। সেই চেষ্টায় তার এমনিতেই ফোলা শিরগুলো আরো ফুলে উঠল। আর সে সরু বেতটা হালকা চালে একবার ঢাকের গায়ে বুলিয়ে দিল—তুর-তুর-তুর-তুর শব্দে।

নিমাইর বয়স ষাটের কাছাকাছি। পেশল শরীরে শিরাগুলো ফোলা ফোলা। যেন বৃদ্ধ বটের গা বেয়ে ঝুরি নেমেছে। অনেক ভাঙ-চুর ঘটেছে বটের দেহে। আর পেল্লাদ যেন সেই ভাঙচুরেরই অপত্য—একটি শীর্ণ শাখা।

এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় বাজারের এই চত্বরে ওরা দু'জন আসছে পঞ্চমীর দিন থেকে। আরো অনেকের সঙ্গে ওরা এখানে ঢাকের বুকে কাঠি পিটিয়ে ফিরি হাঁকে। বেশির ভাগই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু ঢাকী। চারদিকের উদ্বাস্তু কলোনীর বাসিন্দা এরা।

বাড়ি ও বারোয়ারী থেকে লোক এসেছে—পঞ্চমী থেকেই।

'পঞ্চাশ!' হেঁকেছে ঢাকীরা।

তাতেও হয়েছে দু' চার জনের। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল বাড়ি ও বারোয়ারীর চেয়ে ঢাকীর সংখ্যা বেশি। তখন সব নামতে লাগল। পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী—তিন দিনে নেমে এলো পঁচিশে। একবারে নয়—ধাপে ধাপে

নামল। চল্লিশ, তিরিশ, পঁচিশ। ওরই মধ্যে লক্ষ্মীপুজোটাও ক্রমে ধরা হলো। কয়েকজন ভাগ্যবান কাজ পেল পঞ্চমীতেই। ষষ্ঠীতে পেল আরো বেশ কয়েকজন, পঞ্চমীতে ততটা হতাশা দেখা দেয় নি বাকীদের মধ্যে। ষষ্ঠীতে সেটা খুব প্রকট হলো। সামান্য কারণে কয়েকটা ঝগড়া হয়ে গেল। মুখ শুকনো করে বসে রইল। আরো জোরে ঢাক পিটিয়ে বাড়ি ও বারোয়ারীদের ডাকতে লাগল। ষষ্ঠীর দিনেরও সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো। ঢাকীরা একে একে মাথা নিচু করে ফিরে গেল। আবার এল সপ্তমীর দিন। শেষ আশা। একটা-দুটো ঘরে এখনও ঢাকীর দরকার হতে পারে। সপ্তমীরও দুপুর গড়িয়ে গেল।

নিমাই রোজই আসছে। সকালবেলা চারটি মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়ে পেল্লাদকে নিয়ে। মুখে গোঁজবারও বিশেষ কিছু ঘরে থাকে না আজকাল। দাসী যে তারই মধ্যে কী করে দুটো চিঁড়ে, কি মুড়ি, কি চারটে পান্তাভাত সকালে এগিয়ে দেয় তা কে জানে! দাসী বোধহয় নিজে কিছু খায় না। নিমাই জিজ্ঞেস করে নি—করতে পারে নি। ভেবেছে, পুজোয় বাজাবে আর সেই রোজগার থেকে—। ভেবেছিল—গোটা পঞ্চাশ টাকা রোজগার হবে।

'পঞ্চাশ! খেপেছ!' বলেছে বারোয়ারীর ছোকরারা। তারা শুনিয়ে গেছে—মাইক বসিয়ে নিমাইর চেয়ে অনেক ভালো গাইয়ে বাজিয়ের কেরামতি শোনা যায়। সবাই মাইক বসিয়েছে। নিতান্ত পুজোর নিয়মরক্ষার জন্যেই তারা ঢাকীর কাছে এসেছে। নইলে, তারা কি আর জানে না যে ঢাকের বাদ্যি থামলেই ভালো।

এইসব কথা শুনলে নিমাইর পিত্তি জলে যায়। ঢাকের বাদ্যি শুনেছিস কখনো। হাত কত রকম করে চলে জানিস। কাঠি কত দ্রুত চলতে পারে দেখেছিস! ওরা দেখে নি, শোনে নি। ওরা জানে না। ঢাকীদের প্রতিযোগিতা ওরা দেখে নি। সেসব প্রতিযোগিতায় নানা রকমের বাজনা বাজাতে হয়। আর কার কাঠি কত দ্রুত—তার পাল্লা। সন্ধ্যায় মা দুর্গার সামনে আরতির সময় দুটো বড় বড় ধুনুচি নিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে যখন লোকে উদ্দামভাবে নেচে আরতি করে, তখন সেই নাচের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়। আবার কাঁচা নাচিয়ে হলে তার সঙ্গে নেচে ধীরে বাজিয়ে তাকে সাহায্য করতে হয়—তাকে বাজাবার চেষ্টা করতে নেই—এটুকু বিনয় ঢাকীদের রাখতে হয়।

তারা যে মা দুর্গার অনুগৃহীত মানুষ। মা দুর্গা এলে তাঁর সামনে থাকে ঢাকীরা—তারা বাজনা বাজিয়ে নেচে তাঁকে রাস্তা দেখায়—সবার কাছে সে আনন্দ-সংবাদ পরিবেশন করে। মা-র বোধন, পূজা, ভোগ, আরতি—সব সময়ই ঢাকীদের চাই। মা যেদিন চলে যান, সেদিনও বেদনার বাদ্য বাজিয়ে তাঁকে বিদায় জানায় এই ঢাকীরা। সেইজন্যেই সে আমলে ধনী লোকেরা জমি দিয়ে ঢাকীদের বসত করাতেন। নিমাইরাও চৌধুরীদের কাছ থেকে জমি নিয়ে বাস করত। ঐ জমি থেকেই তাদের বছরের খোরাকি উঠত। আর বাবুদের কাছ থেকেও কিছু পাওয়া যেত—এইতে চলত। মুহূর্তে কোথায় গেল বাবুরা, আর কোথায় গেল ঢাকীরা। বছরের পর বছর পুরুষানুক্রমে মা তাদের যে বিশেষ অনুগ্রহ করে এসেছেন, তা কি বন্ধ হয়ে গেল! ঢাকীর জীবনই তো বাজাবার জন্যে—মা-র কাছে বাজাবার জন্যে। নিমাই তাই শুনেছে তার বাপ-ঠাকুর্দার কাছে। অন্য পুজা-পার্বনে বিয়ে-অন্নপ্রাশনেও তারা বাজায়। কিন্তু ও সবই মা-র দয়ার নানা রূপ। মা নিজে যখন আসেন ঢাকীদের হাত ভরে দেন, যখন নিজে আসতে পারেন না, তখন এর-ওর হাত দিয়ে কিছু পাঠিয়ে দেন। নইলে ঢাকীদের চলবে কী করে! ঢাকীদের কথা সেই কৈলাসে বসেও মা ভোলেন না। এইখানেই তো তাদের আসল গর্ব। এই গর্বে তারা অনেক দুঃখ ভুলে থাকে। তাদের অন্নের কষ্ট আছে। চিরকালই আছে; কখনও কম—বছরের কোনো সময় একটু বেশি। আছে খাটা-খাটুনি। আছে আর-এক মর্মান্তিক দুঃখ। তারা জাতে নিচু। জল চলে না তাদের। বামুন-কায়েতরা কেউ তাদের ঘরে ঢুকতে দেয় না। গরু থেকে আরম্ভ করে নানা মরা জীবজন্তুর চামড়া নিয়ে তাদের কাজ। কাঁচা চামড়া এনে তাকে নুন দিয়ে রোদে শুকিয়ে পাকিয়ে নিয়ে তবে তাতে ঢাক বাঁধতে হয়। চামড়ার এই সংস্পর্শে থাকবার জন্যে হিন্দুসমাজে তারা প্রায় মুচির সগোত্র। মানুষের অধম যেন তারা। নিমাই নিজেই কত যায়গায় শেয়াল-কুকুরের মতো ব্যবহার পেয়েছে। বড় নিষ্ঠুর করুণ অভিজ্ঞতা সে-সব। কিন্তু এ সব মনে রাখতে নেই। এ সব সে ভুলে আছে ঐ গর্বে। মা-র সামনে বাদ্য বাজাবার জন্যেই মা তাদের এই পৃথিবীতে এনেছেন। এ-অধিকার একমাত্র তাদেরই। এ কি কম ভাগ্যের কথা! হাজার লাঞ্ছনা-অপমানেও তাদের জীবনের সার্থকতা কমে না। তাদের ছাড়া মা-র পুজো সম্পূর্ণ হয় না। পেল্লাদ রে, তুই তো এ

হগল কথা জানলি না—আমাগোর উপর মা-র দয়া আছে—কই নাই তরে—কইছিলাম মুকুন্দরে—তর বাপরে—কিন্তু হে তো মইর‍্যা গ্যালো। আর কব না—হগল কথা আহনের কালে পদ্মার জলে ভাসাইয়া দিয়া আইছি চোখের জলের সাথে।

পেল্লাদ বুঝবে না। যেমন বোঝার কথা নয় বারোয়ারীর ছোকরাবাবুদের। ঢাকের বাদ্যি—! চৌধুরীদের প্রতিমা বিসর্জনের সময় কুড়িজন ঢাকী বাজাত—এক তালে। মেঘগর্জনের চেয়েও যেন জোরে। আকাশটা যেন ফাটিয়ে ফেলত। তা তো ওরা শোনে নি। নিমাই তো এখনও চোখের উপর দেখতে পাচ্ছে। নদীর ঘাটে এগোচ্ছে সবাই। নদী কি আর হাসুনদিয়ায় একটুখানি। পদ্মা কি কুমারের তো তবু শেষ আছে। কিন্তু বর্ষার পর মধ্যের কয়েকটা উঁচু ডাঙা ছাড়া সবই তো নদী। খালবিলগুলো তো লাফ মেরে ডাঙায় উঠে এসেছে। মাঠ আর ক্ষেতে জল থৈ-থৈ করছে। সারা পৃথিবীই তো নদী। নদী পৃথিবীটাকে একেবারে জড়িয়ে শুয়ে আছে। আকাশটা মাথা ঝুঁকিয়ে নেমে এসেছে মাঠের ধার ঘেঁসে ঘেঁসে। আরো অনেক পুজোর অনেক ঢাক এসে এখানে বাজনাটা একটু বেতালা করে দিলে। তাও ভালো। আকাশের নিচে, আকাশের ঘেরে এ বাজনা। এই উদ্বাস্তু তল্লাটে ঢাক বাজানো যায়! বাজালে তো ধাক্কা লাগে বাড়িতে, দালানে, কারখানায়। দেওয়াল, দেওয়াল আর দেওয়াল। এত দেওয়াল যে পৃথিবীতে ছিল তা উদ্বাস্তু না হলে নিমাই জানতেই পারত না। এই চারিদিকের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ঢাকের আওয়াজগুলো কেমন চ্যাপ্টা হয়ে যায়, ছোট হয়ে যায়। তুবড়ে যায়। হাসুনদিয়ায় তা যায় না। নিটোল থেকে অনেক বড় হয়ে, শব্দটা জলের উপর দিয়ে ধানক্ষেতের ডগাগুলো ছুঁয়ে একেবারে আকাশ অবধি চলে যায়। আকাশও শব্দ ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু ধাক্কা দিয়ে চ্যাপ্টা করে নয়। স্নেহে কোলে টেনে নেয়, বড় করে পাঠিয়ে দেয়। ঢাকের বাদ্য শুনতে হয় তো সেখানে, এখানে নয়। আর এ-দেশের বাদ্যকররাই বা কী বাজায়! নিমাই দেখেছে—এখানকার বাদ্যকররা পুজোর সব অনুষ্ঠানেই একই বাজনা বাজায়। বোধনেও যা, বিসর্জনেও তাই! বলিতেও যা, আরতিতেও তাই! এক সেই—ট্যান-ট্যা ট্যা-ট্যা, ট্যা-ট্যা, ট্যাট্যা। মা এলে আনন্দে যা বাজাবো, বিদায়ের দিনে দুঃখেও তাই বাজাবো? তাই কি হয়! সব অনুষ্ঠানের বাজনা

আলাদা হবে। অন্তত তাই হয় হাস্নদিয়ায়। তেমনটি না জানা থাকলে বাদ্যকর হিসেবে তার সুনাম হয় না। কাঁচা বাজিয়ে সে। সে কখনও কোনো পাল্লায় প্রতিযোগী হবে না। হলেও লোক হাসবে মাত্র, মেডেল পাবে না।

নিমাইর বুক-ভর্তি আগে মেডেল ছিল। তাই পরেই সে বাজাতো। মেডেল কিছু পেয়েছিল প্রতিযোগিতার পুরস্কার, কিছু উপহার। ভালো বাজিয়েই পেয়েছিল। সে সব বাজনা তো শোনে নি ছোকরাবাবুরা। তবে হ্যাঁ, ঢাক ঢাকের মতোই বাজবে, সে তো আর সানাই নয়। জাত আলাদা, সেটা মনে রেখে শুনতে হবে। এক-একবার নিমাইর মনে হয়েছে ওদের একদিন ঢাক বাজিয়ে শোনায়—যদি ওরা ধৈর্য ধরে কয়েক ঘণ্টা সময় দেয়। বোধন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত একে একে সব শোনাতো তাহলে সে। দেখাতো কত দ্রুত চলতে পারে ঢাকের কাঠি। মেঘের গর্জন শোনাতো। বর্ষায় বানের জল যখন গোঁ গোঁ শব্দে পাড় ভাঙতে ভাঙতে মাঠের ভিতরে ঢুকে আসে, সেই শব্দকে জাগিয়ে তুলত। বৈঠা দিয়ে নৌকো বাইবার সময় জলে বাজনা ওঠে—ছপাৎ—ছল-ছল, ছপাৎ—ছল-ছল। ঢাকের আওয়াজের চেয়ে একেবারেই আলাদা—খুব পাতলা, খুব নরম: তবু সেই বাজনাই ঢাকের কাঠিতে নাচিয়ে তুলত সে। পুব-বাংলায় সব বিয়েতেও ঢাক বাজে। এখানকার লোক শুনে হাসে। হাসনের কিছু নাই, ছোকরাবাবুরা। সানাই আর বিলাতি বাজনার কথা আমরাও জানি। কিন্তু আগেই তো কইছি, সানাই আর ঢাক আলাদা—সেইটুকু বুইঝ্যা তয় হোনতে অবে। নতুন বর-বৌ দুইজনের লাজুক ফিসফিসানি আর বুক-ধুকধুকি আমাগো ঢাকের কাঠির মুখে বাইজ্যা ওঠে।

নিমাই মুকুন্দর বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু না মুকুন্দ, না বৌটা—কেউ রইল না। ওদের আয়ু কম ছিল। ঐ পেল্লাদকে রেখে দুজনে চলে গেছে।

বিয়ে আর একটা হয়েছিল বাড়িতে। সে অনেক বছর আগে। কিন্তু তাও সব মনে আছে নিমাইর। সেবারই দাসী এল নতুন বৌটি হয়ে। সেই ছোট্ট এক ফোঁটা দাসী আজ প্রায় বুড়ী। চুল পেকেছে। দাঁত অবশ্য পড়ে নি। দাসী যে এখন কি করে সংসার চালায়! রোজগার-পত্তর তো কিছুই নেই। অবশ্য তার ছাপ সংসারে প্রকট। অমন যে দাসী সেও এ সপ্তাহে ঠিকমতো দু-মুঠো খাবার জোটাতে পারে নি। ঐ পেল্লাদটাকে

কচু খাইয়ে দুজনে কোনোদিন একবেলা একমুঠো খায়। দেশ ছাড়বার পর থেকেই চলেছে অনটন আর অনটন। ভালো লাগে না নিমাইয়ের। দাসী যে এখনও কী করে মুখে এক-আধ সময় দু-এক টুকরো হাসি ফোটায় তা ভগবানই জানে।

নিমাইর মেডেলগুলো ছিল দাসীর বড আদরের সামগ্রী। সেগুলো একে একে বিক্রি করতে হয়েছে। গোটা-দুয়েক মেডেল দাসী বিক্রি করতে দেয় নি। সে বাজাতে বেরোলে সে দুটো তার জামায় আটকানো থাকে। ছোকরাবাবুরা কতবার সে মেডেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে হেসেছে। কেউ বলেছে চেঁচিয়ে: 'ঘুঁটের মেডেল।' এ সব পরিহাস নিমাইকে বেঁধে। কিন্তু মেডেলই এখন একটা পরিহাস—ঐ অবশিষ্ট দুটো মেডেলই। কারণ মেডেলধারীকে কেউ ডাকে না।

'দাদা, দাদা রে।' পাশ থেকে ঠেলা দিল পেল্লাদ।

চমক ভেঙে গেল নিমাইর। হঠাৎ সে দেখল, সব ঢাকগুলো থেমে নিথর হয়ে গেছে, শুধু তারটা ছাড়া। ঢাক একের পর এক। সাজানো—চীন কাপড়ে। পালকগুচ্ছের ঝাঁটি বাঁধা। কাঁধে নিয়ে বাজাবার সময় ঝুঁটিটা বাঁকা হয়ে উঁচিয়ে একটা শোভা দেয়। ঐরকম বাদ্যরত নৃত্যপর ঢাকীকে নিমাই-এর বহুবার একটা ঝুঁটিওয়ালা বৃহদাকার প্রাণী বলে মনে হয়েছে—ঢাক ও মানুষটা মিলিয়ে যেন একটা জৈবিক আকার। এখন সবগুলই ঢাক মাটিতে—কাঁধ থেকে কেটে বুঝি নামানো। শাদা গোল গোল চামড়াগুলো শূন্যদৃষ্টি বড় বড় ফ্যাকাশে চোখের মতো। কাঁপছে না। নড়ছে না। নিষ্প্রাণ। মৃত। এর মধ্যে তার ঢাকের নিঃসঙ্গ শব্দটাই উদ্ভট ও খাপছাড়া লাগছে।

হঠাৎ থেমে গেল সে। শব্দটা বন্ধ হলো। কিন্তু তখনও তার ঢাকের পাটা—অর্থাৎ চামড়াটা—কাঁপছে। মৃদু কম্পন। ক্রমে মৃদুতর হয়—মিলিয়ে যায়। মৃত্যুর আগে মুকুন্দের দেহে সে একটা কাঁপুনি দেখেছিল—সে ক্রমে কমতে কমতে নিঃস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল।

নিমাইর মনে হলো তার পা-দুটোও কাঁপছে। শুধু পা নয়, বোধহয় সারা শরীরটা। বলি বা আরতির নাচের সময় উদ্দামভাবে নেচে ঢাক বাজাবার সময় গা-গা এইরকম কাঁপত। আরো জোরে—থরথর করে—কাঁপত। লোকে বলত: 'নিমাইর ভর আইছে।'

নিমাই জানে, কোনো দেবতার ভর হতো না তার উপর। উন্মাদনা, বলির হিংস্র রক্তাক্ত উত্তেজনা, আরতির সময় উদ্দাম নৃত্য ও ধুনুচির অজস্র শ্বাসরোধী ধোঁয়া—এই সবই ভর করত, কাঁপাত তাকে। সে এক মত্ততার কম্পন—তাকে ভর বললেও বলা যায়। আর আজ তাকে কাঁপাচ্ছে বার্ধক্য, হতাশা আর দৈহিক দুর্বলতা। খেতে না পেলে শরীর দুর্বল হয়; কাঁপে—সামান্য উত্তেজনায় বা বিনা-উত্তেজনায়। কোনো মত্ততা নেই, প্রাণ নেই। কাঁপতে কাঁপতে ধীরে ক্রমে মিলিয়ে যাবে বোধহয়—মুকুন্দর মতো।

ঢাকীরা উঠতে আরম্ভ করেছে একে একে। আর কেউ আসবে না—না বাড়ি, না বারোয়ারী। সপ্তমীর সূর্য হেলে গেছে। সেই সূর্য মাটিতে ঢাকীদের ছায়া ফেলেছে। ঝুঁটি-বাঁধা পিঠে-কুঁজ নুয়ে-চলা কিম্ভুত প্রাণীদের ছায়ামূর্তি মাটিতে হামাগুড়ি দিতে দিতে চলেছে যেন। একের পর এক কোনো কাজ না করেই ক্লান্ত! পেল্লাদ রে, তোর ঠাউরমা আমাগো দেরি দেইখ্যা এতক্ষণে নিশ্চয় ভাইব্যা নিছে—আমরা কাম পাইছি।

দাসী বোধহয় এতক্ষণ ঘর-বার করছিল। যে-কোনো শব্দে বাইরে এসে দাঁড়াচ্ছিল—কর্মহীন শুকনো মুখ দেখবার আশঙ্কায়। এইবার এত বেলা দেখে হয়তো তার ভরসা এসেছে।

ঢাকীরা ঝুঁকে হেঁটে চলে যাচ্ছে। ওদের পা কি কাঁপছে? অথবা গা? ভর হয়েছে? করুণ হাসল নিমাই। ভরই হয়েছে। তবে কোনো 'দেবতার নয়।' হয়তো ক্ষুধার। ঝুঁটিওয়ালা প্রাণীরা মাটির উপরে কিম্ভুত ছায়া ফেলে ফেলে চলেছে। যেন হামাগুড়ি দিয়ে কী যেন খুঁটছে মনে হয়।

'দাদা, ল। চল।' পেল্লাদ ঠেলা দিল।

'ঠেলা দিস ক্যা, অ্যাঁ? ঠেলা দিস ক্যা?' হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল নিমাই। 'ঠেইল্যা ঠেইল্যা কি তুই আমারে মাইর‍্যা ফ্যালতে চাইস? তয় ফ্যাল—ফ্যাল মাইর‍্যা। দে এটটা মরণ-ধাক্কা—যাই, মইর‍্যা।'

পেল্লাদ মুখ গোঁজ করে একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে রইল।

'আবার রাগ! হুঁঃ! দূরে যাইয়্যা খাড়ানো অইল! এদিকে আয়।'

'না, যাম না।' ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে বলল পেল্লাদ।

'আবার ঘোঁৎঘোঁতানি!' নিমাইর রাগ বাড়তেই লাগল। 'ঘোঁৎঘোঁতানি! শুয়্যারের ব্যাটা শুয়্যার! এদিকে আয় কইত্যাছি!'

'না। আমি চইল্ল্যাম। থাক তুই।' পেল্লাদ তার কাঁসিটা হাতে নিয়ে হনহন করে হাঁটতে লাগল।

সত্যি চলে যাচ্ছে যে ছেলেটা। 'ও পেল্লাদ, খাড়া।'

ছেলেটা দাঁড়াল না।

হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো অসহায় গলায় ডাকল নিমাই: 'পেল্লাদ!… পেল্লাদ।…তোর ঠাউরমার শুকনা মুখের দিকে আমি তাকাবার পারুম না।'

পেল্লাদ একটিবারও থামল না।

নিমাই ঢাক কাঁধে তুলে নিল মাটি থেকে। হাঁটতে লাগল: 'পেল্লাদ।'

পেল্লাদ প্রায় দৃষ্টিসীমার বাইরে গিয়ে পড়ছে। মাইল-দুয়েক দূরের উদ্বাস্তু-ডেরায় থাকে নিমাইরা। সেখানেই যাচ্ছে। দাসীর কাছে। ঠিক গিয়ে নালিশ করবে। বাপ-মা মরা ছেলে। দাসীর চক্ষের মণি। পেল্লাদ রে, আমাগো রাগ করতে নাই—না আমার, না তোর। পুজ্যার এই বচ্ছরকার দিন। মা আইছেন। মা-র দয়া আছে আমাগো উপর। তাঁর সামনে বাইদ্য বাজাই আমরা। আমরা কি রাগ করবার পারি! তাও এই বচ্ছরকার দিনে। কত দুঃখ, কত অভাব, কত কষ্ট সারা বছর ধইর‍্যা মনে জমে। এই সময় সেই মন ধুইয়া নিতে হয়।

পেল্লাদ দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। নিমাই মাটির বুকে একটা কোঁকড়ানো ছায়া ফেলে চলেছে—ঠিক আগের বাদ্যকরদের মতোই।

বচ্ছরকার দিনে দাসীর মুখটা শুকনোই রয়ে গেল। সে-মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারল না নিমাই। মা এলেন। মুখে তো হাসি ফোটবার কথা। এক দিন-কটির জন্যে সবাই আশা করে থাকে। ঢাকীরা আশা করে সবচেয়ে বেশি—এটাই তাদের সবচেয়ে সেরা সময়। যে যত বড় বাবুই হও, এ সময় ঢাকীদের স্মরণ করতেই হবে। কিন্তু এবার—।

হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল, ডান-হাতি ছোট একটা মাঠে একটি দুর্গা-প্রতিমা। তার সামনে বাচ্চারা কলরব করছে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল নিমাই। খুব চেনা মনে হলো প্রতিমার মুখটা। সে সারা জীবন ধরে এ মুখ চেনে। তার বাপ-ঠাকুর্দা তাদের সারা জীবন এ মুখ চিনে গেছে। হঠাৎ একটা প্রিয়জন-মৃত্যুর দংশন-জ্বালা তাকে আচ্ছন্ন করল। মুকুন্দের মরা মুখটা ভেসে উঠল চকিতে। মুকুন্দ রে, তুই এত সকাল-সকাল চইল্যা গেলি! মা-ও চলে যাচ্ছে। তার জীবনে মা-র মৃত্যু ঘটছে। দাসীর মুখটা তাই এত

শুকনো দেখায়। ও আগেই বুঝেছে—যেমন মুকুন্দর মৃত্যুর আশঙ্কা আগেই ওর মনে দেখা দিয়েছিল। নিমাইর বুকের মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দে একটা বান যেন এগিয়ে আসছে। যেমন আসত পদ্মায়, কুমারে। এইবার ভেঙে ফেলবে তার বুকের পাড়টা। এই জীবনে প্রথমে—মা-র পুজোয় সে বাজনা বাজাবে না। মা-র দয়া সরে গেছে। কে নিল সরিয়ে? মা-র দয়া নেই? দয়া আর অনুগ্রহ তাকে ছেড়ে গেছে? সে বাজাবে না এবার—এই বচ্ছরকার দিনে? হাতে খিল ধরিয়ে বসে বসে ধুঁকবে? সেই বানটা বুকের মধ্য দিয়ে আসছে গোঁ গোঁ শব্দে। কী ওটা—দুঃখ, কান্না, রাগ, ক্ষোভ! কে জানে! বানটা এসে গেছে, ধাক্কা দিয়েছে, কাঁপিয়ে নড়িয়ে ভেঙে দিচ্ছে। ঝপ ঝপ করে মাটির চাং পড়ে যাচ্ছে। ডুবিয়ে দিচ্ছে। ভাসিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ঢাকের বুকে কাঠি এসে পড়ল; যেন লাফিয়ে পড়ল—ঐ বুকের উপর উদ্দাম নাচতে লাগল, আর নাচের তাল রাখছে যেন একটা মেঘের বজ্রগর্জন। বাজাবে সে! বাজাচ্ছে। কেউ তাকে থামিয়ে রাখতে পারে না—হাত বেঁধে রাখতে পারে না এই বছরকার দিনে—জীবনের এই প্রথম না-বাজানোর দিনে। কেউ তাকে থামাতে পারবে না। কেউ না, কেউ না। না ছোকরাবাবুরা, না ঐ পেল্লাদ। মা তুমি নিজেও নয়। তুমি বারণ করলেও আমি শোনবো না, শোনবো না। আর তুমি কি সইত্যই বারণ করত্যাছ?

'অ্যায়, ওদিকে যাও। আমাদের ঢাকী আছে।' কয়েকজন লোক নিমাইকে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু তাকে আজ কেউ থামাতে পারবে না।

নিমাই কাঁচা রাস্তাটা ধরে চলল। এই রাস্তাতেই মাইল দুয়েক গেলে তার ডেরা। সেখানে দাসী শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। পেল্লাদটা বোধহয় এতক্ষণে নালিশ করেছে।

মা, তোমার ছামুতে বাজামু ভাবছিলাম, কিন্তু তাড়াইয়া দিল আমারে অরা। দিক। এই রাস্তা দিয়া বাজামু, আর নাচমু। তুমি দেখবা, তুমি শোনবা। তুমি শুইনো, তুমি দেইখো। আহা, দাসী শুইনবার পারল না। না, পারবে। আমি বাজাইতে বাজাইতেই ফেরব দাসীর কাছে।

এ কি! ঢাকের পিঠে কাঠি যেন মেঘের গর্জন করছে। হুঃ! অসুর নাকি! কাঠি মোলায়েম হয়ে এল। তুর-তুরা-তুর তুতুর-তুতুর। তুত্তু-তুত্তুর তুতুর-তুতুর। বোধন। মা আসছেন। জলে ভরে গেছে মাঠ, ক্ষেত। আকাশ

ভারী হয়ে নেমেছে সেই জলে মুখ দেখতে। জল থমকে আছে। শরতের রোদে একটু টান ধরেছে। সকালে সোনা-রোদ দেখা যায়। ক্ষেতে—নিচে মাটি রঙের জল। মাঝে সবুজ, উপর সোনা-রং। ধান উঠছে। ডোঙা বেয়ে চাষীদের ছেলেমেয়েরা জলের মধ্যে চলেছে। অনেকে নেমে ডুব মেরে মাছ ধরছে। 'ও কলিমুদ্দি ভাই, এবার তো ধানপানের অবস্থা ভালোই, কি কও?' মাঠের উপর দিয়ে দিগন্তের দিকে অবাধভাবে ভেসে গেল কথাগুলো—যেন একঝাঁক পাখি পাখার শব্দের ঢেউ তুলে দূরে আকাশে উড়াল দিল। ও-পাশ থেকে পালটা পাখিরা উড়ে এল: 'হ ভাই। আরে এটটু তামুক খাইয়া যাবা নি?' মা আসছেন।

একা ফাঁকা রাস্তায় নিমাই নাচতে নাচতে চলেছে তার ডেরার দিকে। আর বাজাচ্ছে। আর! পেল্লাদটা থাকলে ভালো হত। কাঁসিটার দরকার। না থাকল পেল্লাদ, না থাকল কাঁসি। সে বাজাবে।

মা-র প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তুতুম-তুতুম, তুত্তুম-তুত্তুম। মা জেগে উঠেছেন। মা সবার ভালো করবেন। অন্ন দেবেন, সুখ দেবেন। মাঠে মাঠে ধান-কাটার ধুম পড়ে গেছে। জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে। সময় নেই, সময় নেই। বড় কাজের তাড়া। খাটুনি যাচ্ছে প্রচুর। তবু খুশি আছে মনটা। বৌ-ঝিদেরও কাজের অন্ত নেই। বসে থাকবার সময় নয় বাপু এখন। মা জেগে উঠেছেন। কেমন হাসি-হাসি মুখখানি।

ষষ্ঠীর বাজনা একটু ঢিলে-ঢালা। সপ্তমীর জোর তার চেয়ে একটু বেশি। তবু সে যেন বাচ্ছাদের মেয়েদের নতুন জামা-কাপড় পরবার একটা সুযোগ। বলি বা আরতির সময় একটু দানা বাঁধে। বাজনার নেশা ধরে অষ্টমীতে—মহাষ্টমী।

অষ্টমীর দিনের বলি! ডিমি-ডিমি-ডা-ডা, ডিমি-ডিমি-ডা-ডা। তারপরে ক্রমেই উদ্দাম নৃত্য ও বাদ্য। মোষের গলায় ঘি ডলা হচ্ছে সকাল থেকে। ওদিকে বীরু কাহালী তার কালো শক্ত হাতে খাঁড়া ঘসে-মেজে ঝকঝকে করে ফেলেছে। খাঁড়ার ডগাটা সাপের ফণার মতো। ডিডিম-ডিডিম-ডা, ডিডিম-ডা-ডা। চৌধুরীদের সঙ্গে একবার কাইজা হয়েছিল বিষ্টুপুরের রায়েদের সঙ্গে। মাঠে দাঁড়িয়ে দু-দল সড়কি চালিয়ে রক্তারক্তি করে দিয়েছিল। দুটো লোকের চোখ গিয়েছিল। আর প্রাণ-কাঁপানো চিৎকার—আক্রমণের অঙ্গসজ্জ। রক্ত বইছে কালো ষণ্ডা দেহগুলো দিয়ে। মোষের কালো দেহটা

কাঁপছে—রক্তমাখা মাটি। ঢাকীর মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। উদ্দাম নাচছে। কাঁপছে সর্বাঙ্গ থরথর করে—মোষেরই মতো। ভর হয়েছে। মা-র অনুগ্রহ। জল চলে না, কিন্তু মা-র দয়া আছে।

সন্ধিপূজা! টা-ট্যাম-ট্যাম। ঢাকীর তখন মাতাল লাগছে। রক্তে ভিজেছে মাটি। রক্তের নেশা আছে। বাদ্যকর থামতে পারছে না। নেশায় নাচে, নেশায় বাজায়। আর কী রোদ চড়েছে। ভাদুরে দুপুর। রোদে কুকুর খেপে যায়—চৈত্রের রোদে। মানুষও খেপে। নাচের তালে পৃথিবী ঘুরছে, উঠছে, নামছে।

আরতি! সন্ধ্যা! একটু নরম করে বাজাও। হ্যাঁ, একটু নিচু থেকে ধর। পরে নাচ জমুক, তখন চড়িয়ো, তাল করো দ্রুত। কিন্তু গোড়ায় নাচিয়েকে একটু নেশার মধ্যে আনো। টিটিরি-টিটিরি-টি। দুটো প্রকাণ্ড ধুনুচি নিয়ে ঐ তো নেমেছে নাচিয়ে। ধোঁয়ার বঙ্কিম রেখা টেনে ধুনুচি লতিয়ে উঠছে, দুলছে, নামছে। ধোঁয়া, ধোঁয়া, ধোঁয়া। দম বন্ধ হয়ে আসছে। একের পর এক নাচিয়ে আসছে। বাজনদার সবার সঙ্গেই নাচছে, বাজাচ্ছে। তার থামা নেই। সেরা নাচিয়ে এল শেষে। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে। চোখে তাকানো যায় না। কিন্তু পা চলছে, হাত চলছে, গা চলছে। নবমীর আরতিতে পাগলের মতো হয়ে যাবে। নেশায় সময়ই আচ্ছন্ন। নতুন বিয়ের পর দাসীকে নিয়ে নিমাইর যেমন অবস্থা। সব একটা নেশা দিয়ে ঢাকা যেন। পা ঠিক থাকে না। কাঁপছে। ভয় করছে। পড়ে যেতে হবে নাকি। ঢাকটাকে ভারী লাগছে। ভয়—মুকুন্দ হবার সময় দাসীকে নিয়ে তার বড় ভয় হয়েছিল। মুকুন্দ রইল না। পেল্লাদ রে, ঢাকটা একটু ধরিস রে দাদা, ভাসানের বাজনাডা বাজাই।

বিসর্জন। একি আর বাজনা! এ তো কান্না। পদ্মার শাখা কুমার। পদ্মার শিশুসন্তান। কিন্তু বর্ষায় দামাল হয়েছে। নৌকো আর নৌকো। নৌকায় নৌকায় প্রতিমা। এখন খুব কান পাতলেই মাত্র বৈঠার ছপাৎ-ছপাৎ-ছল শোনা যায়। বেশিটাই চাপা পড়ে যায় মা-র জয়ধ্বনিতে। জয় নিয়ে যাও। জয় দিয়ে যাও। আবার এসো। বছর বছর এসো। জন্ম জন্ম এসো। কিন্তু মুকুন্দ আর এলো না। দাসী আজও রাতের অন্ধকারে মুখ গুঁজে কাঁদে—চাপা কান্না। দাসী রে, তুই এটটু বড় কইর‍্যা কাঁদ, বুক থুইল্যা

কাঁদ, গলা ফাটাইয়া চেঁচা, চোখের জলে কুমারে বন্যা আসুক। ছপাৎ-ছপাৎ-ছল। ছপাৎ-ছপাৎ-ছল। দাসী রে, কত চাপা কান্না আর তুই কাঁদবি! তোর ছাওয়াল গেছে, বৌ গেছে, ভিট্যা গেছে, মাটি গেছে, এবার তোর ঢাকও গেল। ওরে দাসী, বড় কইর‍্যা কাঁদ, বড় কইর‍্যা কাঁদ। তোর কান্দনে আউশের মাঠ ডুইব্যা যাক, পদ্মা খেইপ্যা যাউক, পাড় ভাইঙ্গ্যা যাউক। ছপাৎ-ছপাৎ-ছল। ছপাৎ-ছপাৎ-ছল। উদ্দাম বাদ্যের মধ্যে মা জলশয্যা নিলেন। নৌকো কাৎ হয়ে জল উঠল খোলে। পাটাতন খুলে গেল। গলুই জোরে কেঁপে উঠল। বৈঠা ঝপাং ঝপাং করে পড়তে লাগল। যত কাতই হোক নৌকো, যতই হেলে যাক আকাশ, ঢাকী তখনও বাজিয়ে যায়। শেষ বাজনা। বিসর্জনের বাজনা। মার দেহের উপর জলের আবরণ পড়ে গেছে। ঝাপসা। চোখের উপরেও জলের আবরণ। সেই জলই বেড়ে ঢেকে দিচ্ছে সব-কিছু। বিসর্জনের পর নৌকো ফিরছে একে একে। গোলমাল একটু কমে গেছে। বৈঠার শব্দ শোনা যায়—ছপাৎ-ছল। ছপাৎ-ছপাৎ-ছল। দাসী রে—।

কে? দাসী? তার সামনে দাঁড়িয়ে? শুকনো মুখ। তাহলে নিমাই তার ডেরায় পৌঁছেছে! এত তাড়াতাড়ি কী করে এল! এ কী! দাসীর মুখটা ক্রমে বড় হয়ে আকাশের সঙ্গে যেন মিশে গেল। আর আকাশটা প্রতিমা নামাবার সময়ের টাল-খাওয়া নৌকার মতো কাত হয়ে গেল। আকাশটা যেন হোঁচট খেয়ে পড়ল।

পড়ে গেল নিমাই। দাসী আবার আকাশের কাছ থেকে সরে ছোট হয়ে তার কাছে এসেছে। জল—ঢাকের কাঠি—রক্ত—মাটি। চোখের জলে কুমার ভরে গেছে। তাতে ঢাকের কাঠি দিয়ে কে যেন বৈঠা বাইছে। ছপাৎ-ছপাৎ-ছল। ছপাৎ-ছপাৎ-ছল। রক্ত!

'রক্ত কইত্থন আইল? বলির রক্ত?'

'না, তোমার কপালটা ফাইট্যা গেছে।' কপালে হাত বোলালো দাসী। জিজ্ঞেস করল: 'কী অইছে?'

নিমাই হঠাৎ রেগে চেঁচিয়ে উঠল: 'কপাল ফাটছে রে মাগী, কপাল ফাটছে।' তারপর হঠাৎ শিশুর মতো দাসীর কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে কেঁদে ফেলল: 'মার পুজ্যায় আমি আর বাজাবো না রে দাসী, আমি আর বাজাবো না। এ বছরডাও বাজাইয়্যা নেলাম।'

মুকুন্দকে যেমন করে বুকের কাছে টেনে নিত দাসী, তেমনি করে নিমাইকে দু-হাতে জড়িয়ে বুকের মধ্যে নিয়ে এল।

নিমাই অস্পষ্টভাবে দাসীর বুকের স্পন্দন শুনতে পেল: ছপাৎ-ছপাৎ-ছল, ছপাৎ-ছপাৎ-ছল। বড় চাপা শব্দ। দাসীরই বুকের শব্দ বটে।

একটু বাদে নিমাই আস্তে উচ্চারণ করল: 'ম্যাডেল ডুইডা দে; বেইচ্যা আহি।'

দাসীর বুকের স্পন্দন বুঝি একটু জোরালো হলো। জলের বুকে বৈঠা একটু দ্রুত তালে পড়ছে। কিন্তু তারপরেই দাসী বোধহয় সামলে নিল। আবার সেই নরম পাতলা চাপা শব্দ: ছপাৎ-ছল-ছল ছপাৎ-ছল-ছল।

দাসীকে নিমাই একটু জোরে চেপে ধরল। দাসী রে, তুই এটটু বড কইর‍্যা কাঁদ।

ভবানী সেন

ভারতের কৃষি তটস্থ কেন

স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের পরিকল্পনা চতুর্দশ বৎসর অতিক্রম করে গেল। এখন একথা সবার কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এক গভীর কৃষিসংকটের জন্য ভারতের উন্নয়ন ঠেকে আছে। গ্রামীন জনগণের আর্থিক অবস্থার ভিতরই এই সংকট সর্বাপেক্ষা প্রকট।

ভারতে মোট ৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ লোক গ্রাম অঞ্চলের বাসিন্দা। এদের মধ্যে [illegible] কোটি লোকের মাথাপিছু গড় আয় দৈনিক মাত্র ২৭ পয়সা। তার উঁচুতে ৫ কোটি লোকের ঐরূপ আয় ৩২ পয়সা মাত্র। গ্রামাঞ্চলের সমস্ত লোকের মাথাপিছু দৈনিক গড় আয় ৬৮ পয়সার বেশি নয়। [ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল ইকনমিক রিসার্চের সার্ভে রিপোর্ট, অমৃতবাজার পত্রিকা, ৪. ৮. ৬৫]

এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে জাতীয় আয়ের একটি সামান্য অংশই গ্রামবাসীদের ভাগে জোটে, যদিও জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক উৎপন্ন হয় কৃষি থেকে এবং জাতীয় আয় গড়ে প্রতি বৎসর শতকরা ৩½ ভাগ হারে বেড়েছে গত তের বৎসর ধরে।

জাতীয় আয়ের অসম বণ্টন কেবল শহর ও গ্রামের মধ্যেই নয়, গ্রামীন সম্পদেরও বণ্টনবৈষম্য চাঞ্চল্যকর। গ্রামীন আয়ের শতকরা নয় ভাগ যায় শতকরা এক জনের হাতে, আর শতকরা একত্রিশ ভাগ পড়ে শতকরা ষাট জনের ভাগে। গ্রামীন সম্পত্তির শতকরা মাত্র সাত ভাগ আছে শতকরা পঞ্চাশ জনের হাতে, শতকরা পাঁচ জন একেবারেই সম্পত্তিহীন। [সার্ভে রিপোর্ট, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ] আবাদী জমির অর্ধেকের বেশি শতকরা দশটি পরিবারের হাতে। (মহলানবিশ কমিটির রিপোর্ট)

গ্রামবাসী জনসাধারণের এই অসীম দৈন্যের পিছনে রয়েছে কৃষিসংকটের তীব্রতা এবং গ্রামাঞ্চলে শিল্প-বিস্তারের অভাব, যদিও দ্বিতীয় পরিকল্পনার

গোড়া থেকে শিল্পের উৎপাদন বেড়েছে বাৎসরিক শতকরা ৭½ ভাগ হারে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসর শতকরা আট ভাগ হারে।

কৃষির উৎপাদন যে আদৌ বাড়ে নি তা নয়। ১৯৫২-৫৩ থেকে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে কৃষির উৎপাদন শতকরা ৪২·৬ ভাগ বেড়েছিল। উৎপাদনের এই অগ্রগতিটা নেহাৎ তুচ্ছ নয়, কেননা এই সময়ের মধ্যে দুনিয়ার কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে সর্বসাকুল্যে শতকরা ২৪·৪ ভাগ। (প্ল্যানিং ইন ইণ্ডিয়া, অজিত রায়, ২৩৯ পৃ.)

কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার সময় থেকেই কৃষির অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কৃষি-পরিস্থিতি বিচার করে তার তিনটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে: (১) কৃষি-ক্ষেত্রের একাংশের উৎপাদন বেড়েছে, সর্বাংশের নয়; (২) উৎপাদন বেড়েছে প্রধানত আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি-দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটেছে নিতান্তই নগণ্য; (৩) মোটের উপর ভারতের কৃষি এখন প্রধানত আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল এবং ভারতে জমির উৎপাদিকা-শক্তি পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্নে।

১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬১-৬২ এই দশ বছরের আবাদী জমির আয়তন ২৯ কোটি ৪০ লক্ষ একর থেকে বেড়ে ৩৪ কোটি ১০ লক্ষ একর হয়েছে, তারপর থেকে এই আয়তন একরকম বাড়ে নি বললেই হয়। এই দশ বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদিকা শক্তি বেড়েছে মোট শতকরা ১·৭ ভাগ, অন্যান্য ফসলের মাত্র ০·৮৩ ভাগ।

যাঁরা সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং কৃষিতে তটস্থতার কারণস্বরূপ যাঁরা শুধু সেচ, সার, বীজ, যন্ত্র প্রভৃতির অভাবের কথাই উল্লেখ করেন এবং যাঁদের মতে পরিকল্পনায় কৃষির জন্য অধিক মূলধন বরাদ্দই প্রধান সমাধান, তাঁদের অবগতির জন্য নিম্নলিখিত তথ্যটি উদ্ধৃত করছি:

"রিজার্ভ ব্যাংকের একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় আবিষ্কৃত হয়েছে যে ১৯৬১-৬২ সালে জমির মালিকদের হাত দিয়ে যে মূলধন খরচ করা হয়েছিল তার মাত্র আধা-আধি ব্যয় করা হয়েছিল কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপার এবং গৃহনির্মাণ প্রভৃতিতে, বাকি অর্ধেক খাটানো হয় বাণিজ্য এবং অন্যান্য কাজে।"

[ইউনাইটেড এশিয়া, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫]

উক্ত সমীক্ষা থেকে আরও জানা যায় যে এ যাবৎ পরিকল্পনা মারফৎ যে

অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তার মাত্র শতকরা ৪৫·৪ ভাগ নিযুক্ত হয়েছে কৃষিকার্যে এবং শতকরা ৫৪·৬ ভাগ গেছে ন দানে ন ব্রাহ্মণে, অর্থাৎ এমন সমস্ত কাজে যার সঙ্গে কৃষির কোনো সম্পর্ক নেই।

সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই এমন কিছু আছে যা কৃষির উন্নতির প্রতিবন্ধক, যার ছিদ্র দিয়ে কৃষির জন্য নিযুক্ত মূলধন অন্যত্র চলে যায়। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের যেটুকু উন্নতি ঘটেছে তারও পশ্চাৎপট অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে ঐ সামাজিক ব্যবস্থারই এমন কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে যার জন্য কৃষিতে মূলধন কিছুটা আকৃষ্ট হতে পেরেছে। এই পরিবর্তনের সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতাই কৃষিসম্পর্কীয় উৎপাদনে তটস্থতার প্রধান কারণ।

ধনতন্ত্রের বিকাশ

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের জন্য এবং অন্যান্য ভূমিসংস্কার মিলিয়ে ফলাফল দাঁড়িয়েছে এইরূপ যে প্রায় এক কোটি একর আবাদী জমি থেকে মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের মালিকানা খসে গেছে এবং দুই কোটি চাষী জমিদারের শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে সরাসরি রাষ্ট্রের অধীনস্থ রায়তে পরিণত হয়েছে। এই পরিবর্তনের মানে হল সামন্তবাদী ব্যবস্থার সংকোচন।

এর ফলে খানিকটা পরিমাণে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে।

কৃষিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মানে এই: জমির মালিক অথবা লীজধারী রায়ত কৃষির খরচ-খরচা বহন করে, চাষ হয় ক্ষেত-মজুর খাটিয়ে। উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশ বাজারে বিক্রি করা হয়। যে-কৃষক প্রধানত নিজেই গতরে খেটে চাষ করে এবং চাষের খরচ-খরচাও তার নিজেরই সে কিছু সংখ্যক ক্ষেত-মজুর খাটালেও তার কৃষি-ধনতান্ত্রিক কৃষির অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু যে-কৃষক প্রধানত খেত-মজুর খাটায়, সে কিছু পরিমাণে নিজে মেহনত করলেও তার কৃষি-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পর্যায়ভুক্ত বলে ধরতে হবে। ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য উৎপাদনই ধনতন্ত্রের প্রাথমিক রূপ। উচ্চস্তরে উঠলে আধুনিক যন্ত্রদ্বারা বৃহদায়তনে চাষ হয়। ভারতের কৃষিতে যতটুকু ধনতন্ত্র প্রসারিত হয়েছে তা ঐ পর্যায়ে ওঠে নি, ওঠার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

এখন প্রথমত দেখা যাক কি পরিমাণ জমিতে প্রাথমিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রসারিত হয়েছে।

সাধারণত দেখা যায় (যদিও তার ব্যতিরেক আছে) যে রায়তের জমির পরিমাণ দশ একরের বেশি, অথবা সে-জমি ভাগচাষী দিয়ে চাষ করায় না, তারই জমি প্রধানত ক্ষেত-মজুর খাটিয়ে চাষ হয়। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের অষ্টম রাউণ্ড অনুযায়ী গ্রামীন পরিবারের শতকরা প্রায় চোদ্দ জনের হাতে আছে মাথাপিছু দশ একর বা তার বেশি জমি এবং এইরূপ জমির পরিমাণ সমস্ত চাষের জমির শতকরা চৌষট্টি ভাগ। কিন্তু এর মধ্যে এমন জমিও আছে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভাগচাষী দিয়ে চাষ করানো হয়। কত জমিতে এরূপ ভাগচাষ আছে তার সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় না কিন্তু নানাবিধ সমীক্ষা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে এর অর্ধেক জমিতে অর্থাৎ সমস্ত আবাদী জমির বড়জোর এক-তৃতীয়াংশে প্রধানত ক্ষেত-মজুর খাটে। অন্তত তার বেশি জমিতে নয়।

এই আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ জমি হল ভারতের কৃষিক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক চাষের অন্তর্ভুক্ত। হয়তো তার কমও হতে পারে।

কৃষির উৎপাদনে যা কিছু উন্নতি ঘটেছে তা প্রধানত এই অংশেই ঘটেছে।

কিন্তু এই অংশেরও প্রচণ্ড সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। এই জমিতে যারা মজুর-নিয়োগকারী এবং মূলধনের মালিক তাদের সর্বাধিক অংশের মূলধনের দৌড় মামুলী লাঙ্গল-বলদ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সার, কিছুটা সেচের জল এর বেশি কিছু নয়। ট্রাক্টর চাষ খুবই সীমাবদ্ধ। সারও দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য। সেচের ব্যবস্থা মোট আবাদী জমির এক-চতুর্থাংশের বেশিতে নেই। কাজেই এই জমিরও উন্নতি খুব সীমাবদ্ধ। তবু এই জমিতে মুনাফার জন্য উৎপাদন হয় এবং মূলধন যৎকিঞ্চিৎ হলেও ভাগচাষের চেয়ে কৃষিটা উন্নত।

সামন্তবাদের অবশিষ্টাংশ

বৃহৎ ভূস্বামী—যারা ভাগচাষী নিযুক্ত করে অথবা স্বত্বহীন প্রজাকে জমা দেয় এবং সুদখোর মহাজন হল সামন্তবাদের অবশিষ্টাংশ।

ভূমি-সংস্কার-আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য বহু ভূস্বামী চাষীকে উচ্ছেদ করে জমি খাসদখলে এনেছে এবং তারপর বেআইনীভাবেই ভাগচাষী দিয়ে চাষ চালাচ্ছে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন কর্তৃক নিযুক্ত ল্যাডেজিনস্কী সাহেব এরূপ বহু নজির আবিষ্কার করেছেন, তার ফলে দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রদেশের

বহুক্ষেত্রেই প্রাক্তন মধ্যস্বত্বভোগী বা জায়গীরদার আগের মতোই চাষীদের ভূমিদানের মত পোষণ করছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও ওড়িষ্যায় এখনও প্রকাশ্যভাবেই ভাগচাষ নিয়োগ চলে। ভূমিসংস্কার সত্ত্বেও ভাগ-চাষীকে খাজনা দিতে হয় ফসলে শতকরা পঞ্চাশ, ষাট অথবা তারও বেশি অংশ। অথচ চাষের খরচ-খরচা ভাগচাষী বহন করে।

সুদখোর মহাজন এখনও গ্রামাঞ্চলের প্রধান ঋণ সরবরাহকারী। মহাজনী ঋণ কৃষকদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এই ঋণই কৃষকদের শতকরা নব্বই ভাগ ঋণ সরবরাহ করে। ঋণের সুদ শতকরা পঞ্চাশ টাকা তো হামেশাই আছে। ঋণের বিনিময়ে মহাজন চাষীর ফসল আগাম কিনে নেয় অতি অল্পমূল্যে।

এই সামন্তবাদী শোষণ এখনও কি মাত্রায় প্রবল তার বিবরণ পাওয়া যায় বাৎসরিক খাজনা এবং সুদের পরিমাণ থেকে।

১৯৫০-৫১ সালে কৃষি থেকে মোট আয় হয় ৪২৭০ কোটি টাকা। ১৯৬০-৬১ সালে এই আয় বেড়ে হয় ৫৯৯০ কোটি টাকা। বৃদ্ধির পরিমাণ ১৭২০ কোটি টাকা। এই দশ বছরে ভূস্বামীদের প্রাপ্ত খাজনার পরিমাণ ৬৮৩ কোটি ২৮ লক্ষ থেকে বেড়ে ৯৪২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা হয়। বৃদ্ধির পরিমাণ ২৫৯ কোটি টাকা। এই দশ বছরে সুদের পরিমাণ ২০১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ৬১৬ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা হয়। [প্ল্যানিং ইন ইণ্ডিয়া, অজিত রায়, ২৬৮ পৃ.]। এ-ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিমাণ ৪১৫ কোটি ৬৫লক্ষ টাকা।

অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে বর্ধিত ১৭১০ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ৬৭৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি খাজনা এবং ঋণের সুদ আকারে চলে গেছে। অবশ্য খাজনার মধ্যে গরীব কৃষক ধনী কৃষককে জমি লীজ দিয়ে যে খাজনা পায় তাও আছে, কিন্তু তার পরিমাণ তত বেশি নয়।

তার মানে দাঁড়াল এই যে ১৯৫০-৫১ সালে মোট কৃষিজাত আয়ের শতকরা ৬৮ ভাগ থাকত কৃষকের হাতে (অবশ্য পাইকারি ব্যবসায়ীর লভ্যাংশ না ধরে), ১৯৬০-৬১ সালে তা দাঁড়াল এসে শতকরা ৬৩ ভাগে। অর্থাৎ একদ্বার দিয়ে সামন্তবাদী শোষণের চাপ যেমন কমেছে, অন্য দ্বার দিয়ে আপেক্ষিকভাবে সে চাপ আবার বেড়েছে।

অর্থাৎ যে-মাত্রায় কৃষিজাত ফসলের মোট মূল্য বেড়েছে, তার চেয়ে বেশি হারে বেড়েছে কৃষকের উপর সামন্তবাদী শোষণ। এর সঙ্গে পাইকার

ব্যবসায়ীর মুনাফার হিস্যা ধরলে দেখা যাবে যে কৃষিজাত আয়ের অন্তত অর্ধেক চলে যায় মহাজন, পাইকারি ব্যবসায়ী ও সামন্ত ভূস্বামীর দখলে—কৃষির উন্নতিতে কৃষক অর্থব্যয় করবে কি করে ?

ভূমিসম্পর্কের মুখ্য চরিত্র

কিন্তু ভারতের কৃষিক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তন এতদূর এগোয় নি যাতে স্পষ্ট করে এ সিদ্ধান্তও টানা যায় যে এক-তৃতীয়াংশ জমিতে চলে ধনতান্ত্রিক চাষ এবং দুই-তৃতীয়াংশ জমিতে চাষীরা সামন্তবাদী শোষণের অন্তর্ভুক্ত।

মোটের উপর এই কথাই বলা চলে যে সামন্তবাদী শোষণের ও সামন্তবাদী সামাজিক সম্পর্কের অবশিষ্টাংশ এত প্রবল যে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক যা-কিছু বিকশিত হয়েছে তাও সামন্তবাদী সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ, আবার জাতীয় অর্থনীতিতে স্বাধীন ধনতান্ত্রিক বিকাশের ফলে সামন্তবাদী সম্পর্কের যা-কিছু অবশিষ্ট আছে তাও ধনবাদী অর্থনীতির বিভিন্ন প্রকৃতি দ্বারা বিকৃত। দুইটি পরস্পরবিরোধী সামাজিক সম্পর্ক সমগ্র গ্রামীন অর্থনীতিতে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত হয়ে তার বর্তমান তটস্থতা সৃষ্টি করেছে। কয়েকটি ব্যাপার লক্ষ করলেই তা বোঝা যায় :

প্রথমত, কৃষিক্ষেত্রে অর্থের প্রাধান্য উৎপাদন ব্যবস্থার গতি নির্ধারণ করছে। বাজারে ফসল বেচে কি দর পাওয়া যাবে তার উপর নিভর করছে এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধানচাষীরও চাষ যার জমিতে নিজের প্রয়োজনীয় খোরাকী ধানও যথেষ্ট হয় না। মাথাপিছু জমির পরিমাণ যাদের দশ একরেরও কম তাদের কাছ থেকেই আসে বাজারে বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যের শতকরা তেত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ পর্যন্ত, যদিও আবাদী জমির মাত্র ছত্রিশ ভাগ তাদের হাতে। (নালন্দা বক্তৃতা, কে. এন. রাজ)। এরা ফসল বিক্রি করতে বাধ্য, কারণ চাষের উপকরণ ও সরঞ্জাম তাদের কিনতে হবে টাকা ধার করে আবার সেই ধার তাদের শোধ দিতে হবে ফসল বিক্রি করে। ভাগচাষীর খামারও এমনিভাবে পণ্যের বাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয়ত, যে-কৃষক নিজহাতে চাষ করে না, মূলধন জোগায় এবং ক্ষেত-মজুর খাটায় সেও সামন্তপ্রথাদ্বারা দুইভাবে শোষিত: (১) তাকে মূলধন সংগ্রহ করতে হয় মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে, যার সুদের হার ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় ; (২) গ্রামে যারা প্রভূত জমির

মালিক তারাই অন্য সবার জমির শস্য করায়ত্ত করে এমন দরে যা ধনতান্ত্রিক বিনিময়ের নিয়মের আওতার মধ্যে পড়ে না।

তৃতীয়ত, যারা ক্ষেত-মজুরী করে খেটে খায় তাদের মধ্যে কে প্রকৃতপক্ষে ধনতান্ত্রিক কৃষির মজুর আর কে মালিকের অনুগ্রহভাজন দুঃস্থ অর্ধবেকার তা বুঝে ওঠা কঠিন। কৃষিতে নিযুক্ত মজুরের জীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই স্বাধীনতা এবং সেই সঙ্ঘবদ্ধতা আসে নি যা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সাধারণ নিয়ম।

চতুর্থত, শহরে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের আওতায় ব্যাংক ও পাইকারি কারবারের যে সর্বব্যাপক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার শুঁড়গুলি গিয়ে ঢুকেছে গ্রামীন অর্থনীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। জমির ফসল মজুত হয়ে গ্রামের বড় জোতদারের গোলাতেও থাকে না। তা যখন থাকত তখন গ্রামের চাষী অভাবের সময় জোতদারের কাছে নিয়মিত ঋণ পেত। এখন জোতদারের হাতে মজুত ফসল শহরের পাইকার মারফত সর্বভারতীয় মজুতের অংশরূপে দেশব্যাপী চোরাবাজারে গিয়ে ঢোকে। টাকা এখন গ্রাম্য মজুতকে চলমান করে দিয়েছে সুতরাং তা সাধারণ গ্রামবাসীর নাগালের বাইরে। তাদেরকে বছরের প্রথম দিকে নিজের ফসল অতি সস্তায় বেচে দিতে হয়, আবার বছরের মাঝামাঝি থেকে তারাই হয় খাদ্যশস্যের খরিদ্দার। এজন্য মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করে নিয়ে, ফসল ওঠার সময় আবার ফসলে তা শোধ দিতে হয়। অথচ টাকার সুদ চড়া এবং ফসলের দাম তখন কম।

এমনিভাবে সামন্তবাদী অর্থনীতির টানার সঙ্গে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পড়েন মিলে যে গ্রামীন সমাজটি উদ্ভট রূপ গ্রহণ করেছে তা না পারে উৎপাদনের প্রেরণা সৃষ্টি করতে, না তৈরি করে বিনিয়োগযোগ্য মূলধন।

ছোট চাষীর দেউলিয়া অর্থনীতি

এই উদ্ভট সমাজে ভূমিসম্পন্ন কৃষকদের শতকরা ৭২ পরিবার এমন দুঃস্থ যে তাদের কৃষি থেকে তারা নিজের মেহনতের ন্যায্য মূল্য তুলে নিতে পারে না এবং তাদের ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে। তাদের জন্ম ঋণে, জীবন ঋণে, মৃত্যুর সময়ও উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যায় শুধু অপরিশোধিত ঋণ। এরাই হল স্বাধীন ভারতের কৃষক, নিজের জমিতে নিজে খেটে খাওয়া মানুষ।

পরিবারপিছু এদের জমির পরিমাণ পাঁচ একরেরও কম। মোট আবাদী জমির শতকরা ১৬·৫ ভাগ এই পর্যায়ভুক্ত। কৃষির উন্নতির জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করেন তা এদের হাতে পড়তে পায় না, তা যায় শতকরা বারো-চৌদ্দ জনের হাতে যাদের জমির পরিমাণ দশ একরের বেশি, কারণ তারাই সম্পন্ন চাষী। উন্নয়ন-পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন চাষীরা চির-উপেক্ষিত। সরকারী আপসনীতির বিষময় ফল এরা ভোগ করছে আর সবার চেয়ে বেশি।

মূলত এদের সমস্যাই কৃষির প্রথম সমস্যা।

এদের জন্য চাই আধুনিক ব্যাংকের ঋণ, যাতে তারা ঋণদাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে। সেজন্য চাই ব্যাংকের জাতীয়করণ।

এদের জন্য চাই ফসলের ন্যায্য দর, যার কোনো গ্যারান্টি হতে পারে না কৃষিজাত পণ্যের পাইকারি কারবারের জাতীয়করণ ব্যতীত।

এদের জন্য চাই ন্যায্য ও নির্ধারিত দরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ, যার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে।

এদের জন্য চাই সার, বীজ এবং সেচের সাহায্য যেজন্য যথেষ্ট সরকারী অর্থসাহায্যপুষ্ট সমবায় গঠন অত্যাবশ্যক।

এই সমস্ত ব্যবস্থাতেই সমগ্র কৃষকসমাজের সমস্বার্থ বিদ্যমান।

কিন্তু এদের জন্য এসব সাহায্যের পথে বড় বাধা—গ্রামের পাইকার, মহাজন এবং বৃহৎ ভূস্বামী। এই তিনের কাজই বহুক্ষেত্রে একই ব্যক্তির হাতে। গ্রামাঞ্চলে এরাই হল নতুন কায়েমী স্বার্থ। এই শ্রেণীর উচ্ছেদসাধনের জন্য চাই জমির উচ্চতম সীমার পুনর্নির্ধারণ এবং উদ্বৃত্ত জমির পুনর্বণ্টন।

পুনর্বণ্টনদ্বারা জমি দিতে হবে তাদের যারা একেবারে ভূমিহীন অথবা নামমাত্র জমির মালিক। এইভাবে পুনর্বণ্টনদ্বারা কত জমি কতজনকে দেওয়া যাবে সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা, তাতে গ্রামের নতুন কায়েমী স্বার্থের উচ্ছেদ ঘটবে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের মালিকরা হবে উন্নয়ন সম্পদের অধিকারী, সামাজিক স্বাধীনতা লাভ করবে তারা। এই কাজটিই হল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সর্বপ্রধান অসমাপ্ত কাজ।

এখন গ্রামের যারা কায়েমী স্বার্থ, সেই বৃহৎ ভূস্বামী-পাইকার-মহাজনের সম্মিলিত শ্রেণীই গ্রামের অধিকাংশ লোকের অধিকার আত্মসাৎ করে। পঞ্চায়েত যায় প্রধানত তাদেরই দখলে, কারণ তারাই গ্রামের মোড়ল।

লোকসভা ও বিধানসভার ভোট থাকে ওদেরই পকেটে কারণ অর্থনৈতিক কারণে গ্রামবাসীরা ওদের উপর নির্ভরশীল। সমবায় সমিতি গঠন করুন তাও যাবে ওদের খপ্পরে। ডাঃ কে. এন. রাজ বলেছেন: "সাধারণভাবে সমবায় সমিতিগুলি হয়েছে বিত্তবানদের হাতের যন্ত্র—উন্নয়ন-পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারী সাহায্য আত্মসাৎ করাই তার উদ্দেশ্য।" (নালন্দা বক্তৃতা, জানুয়ারী, ১৯৬৫) গ্রাম-উন্নয়ন পরিকল্পনার বরাদ্দ অর্থ ওরাই আত্মসাৎ করতে পারে কারণ মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীদের ঘনিষ্ঠতা ওদের সঙ্গে। দেশে যতপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তি আছে ওরাই তাদের গ্রামীন ভিত্তি। চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথায় মধ্যস্বত্বভোগীদের যে সামাজিক শক্তি ছিল তা এখন ওদের হাতে, প্রাক্তন জমিদারদের কোনো কোনো অংশকে ওদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। এদের বাদ দিলে শহরের একচেটিয়া মূলধন গ্রামীন অর্থনীতিতে খোঁড়া, কারণ এরাই তার গ্রামাঞ্চলের হাত-পা। গ্রামের সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি এদের হাত থেকে সাধারণ কৃষকের হাতে হস্তান্তরিত করাই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি প্রধান কাজ। এদের হাত থেকে গ্রাম মুক্ত হলেই জাতীয় অর্থনীতি মুক্ত হবে গ্রামীন অর্থনীতির জড়ত্ব থেকে।

বৈপ্লবিক পন্থা

ভারতের কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই এই যে গ্রামাঞ্চলে উক্ত কায়েমী স্বার্থের উচ্ছেদ ব্যতীত ধনতন্ত্রের বিকাশ অসম্ভব, কারণ ঐ শ্রেণীই পুনর্নিয়োগযোগ্য মূলধনের প্রধান অপচয়কারী। অথচ ঐ শ্রেণীর হাতেই কৃষিক্ষেত্রের সামাজিক সঞ্চয় কেন্দ্রীভূত, অর্থাৎ তাকে বাদ দিয়ে কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশসাধন চলে না। কেননা, শিল্পের ক্ষেত্রে এমন কোনো উদ্বৃত্ত সঞ্চয় নেই যা ভারীশিল্পে না খাটিয়ে কৃষিতে খাটালে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বনিয়াদ দৃঢতর হতে পারে। ভারীশিল্পের বিস্তারের জন্যই এখনও মূলধন বিনিয়োগে ঘাটতি আছে। তাই কৃষিক্ষেত্রেই এমন উদ্বৃত্ত সঞ্চয় সৃষ্টি করা প্রয়োজন যা কৃষির উন্নতি ছাপিয়ে শিল্পের ক্ষেত্রেও বিকাশ ঘটাতে সক্ষম।

ডাঃ কে. এন. রাজ দেখিয়েছেন যে "কৃষির উৎপাদন যদি শতকরা পাঁচ ভাগ হারে বাড়ানো যায় তাহলে জাতীয়-আয় বৃদ্ধির এক-চতুর্থাংশ বাঁচানো সম্ভব

হবে এবং সেই সঙ্গে যদি রপ্তানি বৃদ্ধির বর্তমান হার বজায় থাকে তাহলে আগামী দশ বছরের মধ্যে নীট বিদেশী মুদ্রার আমদানী আর আবশ্যক হবে না।" (নালন্দা বক্তৃতা, জানুয়ারি, ১৯৬৫)

সুতরাং এখন সমস্যা এই যে শিল্পক্ষেত্র থেকে মূলধন কৃষিতে সরিয়ে না এনে কি করে কৃষির উন্নতির হার দ্বিগুণ করতে পারি—অর্থাৎ বাৎসরিক শতকরা ২·৫-এর স্থানে শতকরা পাঁচ মাত্রায় ওঠানো যায়।

এখন কৃষির সম্পদ গ্রামীন কায়েমী স্বার্থের হাতে অপচয় হয়; উৎপাদনের উদ্বৃত্ত নিয়ে মজুত সৃষ্টি এবং মজুত বিনিময় চলে আর মহাজনী সুদ ও জোতদারের বর্গাভাগ আকারে ঐ উদ্বৃত্ত আকৃষ্ট হয় চক্রবৃদ্ধি হারে, তারপর পাইকার ব্যবসায়ীর মূলধনে তা খাটে এবং ঐ ব্যবসায়ের মুনাফা আকারে আরও উদ্বৃত্ত শস্য পাইকারের হাতে জমে। সমস্যা এই যে ঐ সম্পদ কি করে সৃষ্টিশীল মূলধনে পরিণত করা যায়। তার জন্য প্রথম দরকার ঐ কায়েমী স্বার্থের উচ্ছেদ।

তার ফলে যে নতুন সমাজ সৃষ্ট হবে তাতে সরকারী সম্পদ ও সমবায় কৃষি একযোগে চলবে সাধারণ মেহনতি কৃষকদের নিয়ে। অর্থাৎ সরকারী ব্যাংক দেবে ঋণ, ভাগচাষ থাকবে না, সমবায় পদ্ধতির ভিতর ভূমিহীন ও ছোট চাষীরা সংঘবদ্ধ হবে, ফসলের পাইকারী ব্যবসায় যাবে সরকারী হাতে। ঋণের সুদ, জমির রেভিনিউ এবং পাইকার ব্যবসায়ের মুনাফা মারফত কৃষিজাত জাতীয় আয়ের যে-অংশ সরকারের হাতে আসবে—তাই আবার সমবায় মারফত নিযুক্ত হবে কৃষির মূলধনরূপে। ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি থেকেই বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্ট হবে।

এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই কৃষির উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব। কিন্তু এই ব্যবস্থার মানেই হল সামন্তবাদের অবশিষ্টাংশের উচ্ছেদ অথচ ধনতন্ত্রবাদ নয়। এইজন্য এর নাম কৃষির অর্থনীতিতে অ-ধনতান্ত্রিক পন্থা। এই অ-ধনতান্ত্রিক পন্থাই ভারতীয় কৃষির উৎপাদনে এবং ভারতীয় কৃষকের সম্পদ সৃষ্টিতে জোয়ার বহাতে সক্ষম।

দেবেশ রায়

একটি দলিলচিত্র

(ক্ষুদিরাম-কানাইলালের স্মৃতিতে)

টাইটেল

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা 'ভারতমাতা'-র মধ্যমদূরত্ব থেকে গৃহীত একটি শট, যেন পর্দার ভিতর থেকে ধীরে-ধীরে ভেসে উঠল, ফুটে উঠল, যেমন সকাল ফোটে ও ভাসে, যেমন বোধি ছড়ায় ও মেলায়। কয়েক সেকেণ্ড সময় এই শটটি স্থির হয়ে থাকবে এ-রকম ধরে নিয়ে যে দাক্ষিণাত্যের কোনো মন্দিরের মূর্তির সামনে দর্শনার্থী যেমন স্থির হয়ে দাঁড়ায়, দর্শকও পর্দার এই মূর্তির সামনে অনড় মুহূর্তচয় যাচে। সেই কয়েকটি সেকেণ্ড কেটে যাবার পর পর্দার ডানদিকের উপরের সমকোণের কাছে প্রাচীন অলংকৃত বাংলা লিপিতে, রাবীন্দ্রিক লিপিতে নয়, চলচ্চিত্রের নামটি ফুটে উঠবে—'ভারতমাতা' বা 'স্বাধীনতার আঠারো বছর' বা 'স্বাধীনতা দিবস—তথ্যচিত্র'—বা অন্য কোনো। এরপর, অর্থাৎ নামকরণ হয়ে যাবার পর, পর্দার চার কোণায় এবং মধ্যস্থলে ছবিটির দু-পাশে একে একে চিত্রনাট্যকার, কলাকুশলীবৃন্দ, অভিনেতৃগণ ও পরিচালকের নামগুলো আসবে। আবহসংগীত শুরু হবে চলচ্চিত্রের নামটির পর থেকে। 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ' 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্' 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' 'আঁখিজল মুছাইলে জননী' 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'—এই ও এই ধরনের অন্যান্য গানগুলির মূলসুরের অনুষঙ্গ মধ্যে মধ্যে এমন অর্কেস্ট্রা রচনা করতে হবে। এই থীমটি যেন ধরা পড়ে যে একটা কোনো সূত্রাকার জলধারা (১) ধীরে ধীরে পাহাড়-পর্বতের অলিগলি পেরিয়ে, (২) গুহা-গহ্বর উৎরে, (৩) একটু একটু প্রসারিত হয়ে, (৪) সমতলে কলনাদী হয়ে, ছড়িয়ে, (৫) শেষে সমুদ্রের তরঙ্গগর্জনে অবসিত হল। এই পঞ্চপর্যায়িক অর্কেস্ট্রার প্রত্যেকটি স্তরে যথাক্রমে বেহালা, ডুগি,

মৃদঙ্গ, গোপীযন্ত্র ও বাজঢাককে প্রধান যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে প্রত্যেকটি স্তরে আনুষঙ্গিক যন্ত্রের সাহায্যে যথাক্রমে আহীর ভায়রোঁ, মালকোষ, ভাটিয়ালি, বাউল ও সারিগানের সম্মেলক সুরটিকে প্রধান সুর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সব নামধাম-পরিচয় শেষ হয়ে গেলে আবহসংগীত আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতমাতার ছবিটি জুম করে লঙ-শটে স্থির হতেই—

সুর :

I সা -জ্ঞা -া -া | -া -া ঋা সন্‌া I সা -জ্ঞা -া -া | -া -া -া -া I
না ০ ০ ০ ই ০ র স না ০ ০ ০ ই ০ ০ ০

I (জ্ঞা -া পা পা | র্পদা -া দপা পা I জ্ঞা -া পা -জ্ঞা | -জ্ঞা -া -ঋা -সন্‌া)I
দা ০ রু ণ দা০ ০ হ ন বে ০ লা ০ ০ ০ ০ ০

এই সুরটি সমবেত পুরুষকণ্ঠে প্রথমে, সমবেত নারীকণ্ঠে তারপরে—এইভাবে একবার করে ছয়বার ও শেষে দুইবার ডিসকর্ডে মিলিত পুরুষ-রমণী কণ্ঠে গীত হয়ে ভারতমাতার চিত্রটির সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাবে। এই শেষ-রচনাটি-ই ছবিটির আবহসংগীতরূপে নিষ্কাসিত এবং পরবর্তী অংশে প্রায়ই ব্যবহৃত হবে। সিকোয়েনস অনুযায়ী এই মূলসুরটির সঙ্গে আরো কিছুটা জুড়ে, যৎসামান্য, বৈচিত্র্য আনা যেতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই, সে সমৃদ্ধির দৃশ্যই হোক আর মৃত্যুর অথবা জন্মের অথবা অভ্রংলিহ ঔদ্ধত্যের বা তৃণাদপি সুনীচ নম্রতার—ঐ মূলসুরটিকে ব্যাহত করা চলবে না।

রেডিও-সংবাদ

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ জাতির প্রতি বাণীতে বলেন ১৯৫০ সালে আমাদের গৃহীত সংবিধানে আছে অনিশ্চয়তামুক্ত মানবজীবনের অন্বেষণ··· সুবিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রী-ই সেই সংবিধানের মূলসূত্র···আমাদের সমাজের ভিত্তিই হল স্বাধীন সংবাদপত্র, স্বাধীন মতামত, স্বাধীন জীবনযাপন আর আইনের শাসন···ভারতরক্ষা আইনে কালিম্পং মহকুমার গোরুবাথান অঞ্চলের বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বলে পরিচিত কৃষ্ণবাহাদুর শর্মাকে ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে বহরমপুর জেলে পাঠানো হয়েছে···কলকাতার ময়দানের জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ভাষণ দেন…বৃষ্টিবিন্দু তাঁর মুখ-বেয়ে ঝরে পড়ছিল, তাঁর পাঞ্জাবি বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল, তারই মধ্যে শ্রীসেন বলেন কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এনেছে, স্বাধীনতার আগে অনেক সময় মাত্র তিন টাকা মণদরে চাউল বিক্রয় হলেও দেশের হাজার-হাজার লোক না খেয়ে মারা গেছে কিন্তু স্বাধীনতার পর যদিও চাউলের দাম যথেষ্ট বেড়েছে কিন্তু জনসাধারণ নিশ্চয়ই উপবাসে নেই…আলিপুর চিড়িয়াখানায় রেওয়ার বিখ্যাত শ্বেতব্যাঘ্র মালিনীর গর্ভে ও তার দোসর নীলাদ্রির ঔরসে দুটি ব্যাঘ্র-শাবক জন্মলাভ করেছে, একটি শাবক শাদা ও অপরটি স্বাভাবিক রং লাভ করেছে, মালিনী ও তার শিশুসন্তানদ্বয় এখন লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করছে।

ক্যামেরায়

বৃষ্টি-ভেজা পিচের রাস্তা কালো কুচকুচ, যেন স্পর্শগ্রাহ্য অন্ধকার। রিক্সার দুটি চাকা—প্রথমে বোঝা যায় না, রিক্সার না গোরুর গাড়ির। রিক্সাওয়ালার দুটি পা, প্রথমে বোঝা যায় না রিক্সাওয়ালার না বলদের। ক্লোজঅপে রিক্সাওয়ালার মুখ, চোখের দৃষ্টি নত, একমুখ দাড়ি, মাথার চুল এলোমেলো, সামনের দুটি উঁচু দাঁত নিচের ঠোঁটের উপর চেপে বসেছে, ঠোঁটের দুই পাশের খাতে বৃষ্টির জলের স্রোত। তারপরই বহু উপর থেকে রিক্সাওয়ালা ও রিক্সাটি, একটি পাখির দৃষ্টিতে দেখা। মুহূর্তে শ্রাবণ গগন—ঝিরিঝিরি বৃষ্টিধারা—বৃষ্টি-ভেজা পথ—গাছ-পালা এক লিরিক্যাল সৌন্দর্যে গ্রথিত।

রেডিও-সংবাদ

এইমাত্র ভারতীয় বিমানবাহিনীর দশখানি জেট বিমান লালকেল্লায় উত্তোলিত জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আকাশে চক্র দিচ্ছে আর অপূর্ব আলপনা আঁকছে আর লালকেল্লার ঐতিহাসিক প্রাকারে সমুন্নত ত্রিবর্ণ পতাকা, নিচে লক্ষ-লক্ষ মানুষ, রৌদ্রস্নাত আকাশ ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী সবাই-ই যেন ভারতের স্বাধীনতার পুণ্যমুহূর্তটিকে আরো একবার যাপন করছেন। শ্রীশাস্ত্রী পতাকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, যে, এই পতাকার মর্যাদা আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে রাখতে হবে, কাশ্মীরে পাকিস্তানই হোক আর নেফা-লাদাকে চীনা-সৈন্যরাই হোক—যে এই পতাকার অসম্মান করতে আসবে ভারতের কোটি-কোটি মানুষের হাতে তারই নিশ্চিত মৃত্যু।

সমবেত জনতা দীর্ঘ করতালিধ্বনি দ্বারা শ্রীশাস্ত্রীর বক্তব্যে সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

আমার কিছু করার নেই, কিছু-ই করার নেই—সুভদ্রা, কেননা আমি তো জানি কিছুতেই আসে না, যায় না। সুভদ্রা, তুমি আমার কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে চাও, হায়, তুমি কি জানো না, অর্জুনের হাতের গাণ্ডীব আজ শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিচালিত। প্রিয়া, মস্তিষ্ক আর হাত—যেখানে ধনুকের ছিলার মতো যোগসূত্রে টানটান শক্তির নয়, সেখানে কিছু আশা করো না। তুমি কি জানো না ভদ্রা, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রথমতম মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ, আমার রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ, আমার সখা শ্রীকৃষ্ণ—আমাকে গীতা শুনিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন আত্মীয়কে আমার আত্মীয় মানা নিষেধ, বন্ধুকে আমার বন্ধু মানা নিষেধ, কুটুম্বকে আমার কুটুম্ব মানা নিষেধ, গুরুকে আমার গুরু মানা নিষেধ, কেননা আমি-ই তো আমি নই, কেননা আমার সত্তাই তো আমার নয়, কেননা আমার গাণ্ডীবের তীরনিক্ষেপটুকুই আমার অধিকারে—শরসন্ধানের দায়িত্ব শ্রীকৃষ্ণের, কেননা শ্রীকৃষ্ণ-ই একমাত্র সত্তা, আমি তার প্রকাশমাত্র। সেই ক্ষণ থেকেই সুভদ্রা, আমি আমার আত্মা হারিয়েছি, আত্মাহীন অর্জুনের কাছে, গর্ভিনী সুভদ্রা আমার, একী তোর অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষার অভিলাষ। কৃষ্ণেই আমার শেষ, কৃষ্ণেই আমার শেষ। গর্ভিনী কোন্ গোপনতাকে শু[illegible]য়ে রাখতে চাস কথা। গর্ভিনী, কোন্ গভীরতাকে জানিয়ে রাখতে চাস [illegible]শা। গর্ভিনী, কোন্ উত্তরণকে হাতে সঁপে দিতে চাস জ্বালা। গর্ভিনী, [illegible]ঘরের দোরে কোন্ ভ্রূণকে পরাবি মালা। গর্ভিনী, কোন্ তর্পনের মন্ত্রে সন্তানের মুখে দিবি ভাত: "তার পিতা অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বাধ্য ক্রীতদাস!" বীরত্ব-তর্পন করে বহুদিন ক্লীবতার দাদন নিয়েছি। এখন সুভদ্রা, তোমার সন্তানের পিতৃত্বে আমার অধিকার নেই। অথচ সেই একই কৌরব, একই যাদব, একই পাণ্ডব। অথচ সুভদ্রা রথরজ্জু তোমার হাতে নেই। সেই যে রাজসভা থেকে তোমারই চালিত রথে পথে বেরিয়েছিলাম! কখন কোন্ অজ্ঞানমুহূর্তে আমার রথের [illegible] থেকে খসে গেল। জানি নি। তারপর আজ আমি পুত্তলীমাত্র [illegible] রজ্জু তাঁর হাতে। নারায়ণ কৃষ্ণ রথ স্থাপন করেন, আমি শর নি[illegible] এমনকি প্রয়োজনবোধে শিখণ্ডীর আড়াল থেকেও, এমনকি প্রয়োজ[illegible]

স্বয়ং ভীষ্মকে লক্ষ করেও, এমনকি প্রয়োজনবোধে···প্রয়োজন, প্রয়োজন, প্রয়োজন,···কার প্রয়োজন ভদ্রা, ধর্মরাজ্য ?—সে তো যুধিষ্ঠিরের ! প্রেম-রাজ্য—সে তো শ্রীকৃষ্ণের ! আমার রাজত্ব কোথায় ভদ্রা। তোমার এই একদা বীর রাজপুত্রের রাজত্ব কই ভদ্রা। গর্ভবাসী তোমার পুত্রকে বল কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে পিতা তার পৌরুষ ত্যেজে কৃষ্ণধর্ম পালন করেছে—ক্লৈব্য বরণ করেছে। "ক্লৈব্যং মাস্ম গময় পার্থ !" হা রে পার্থ, হা রে ভদ্রা। হা রে বীরত্বের উত্তরাধিকারী পুত্র আমার, উত্তরাধিকারহীন তোর এ-পিতার দুয়ারে কেন, কেন, কেন, পিতা তোর শ্রীকৃষ্ণের বাধ্য ক্রীতদাস—বাধ্য ক্রীতদাস—

হা পার্থ, হা পার্থ, হা গাণ্ডীবী, হা অর্জুন, তৃতীয় পাণ্ডব, হায় প্রেম, হায় রক্ত, হায় যুদ্ধ, হায় রথ, হায় রে পুরুষ, হায় সেই যাদবের রাজপথে অশ্বক্ষুরে বিদ্যুৎ-চমক, হায় সেই শিহরিত যদুবংশদল, হায় রথ, হায় বল্গা, হায় রথনেমি, হা সুভদ্রা, অর্জুনপ্রেয়সী, হায় রে সে পলায়ন, সংগ্রাম, রথরশ্মি এ-কোমল মণিবন্ধে ধরা, হায় প্রেম, হা রে আলিঙ্গন, চুম্বন, আকাশ-ফাটানো হাসি, সাগর-মাতানো হাসি, হায় হাসি, হায় হাসি, গাণ্ডীবের টংকারে পার্থ খলখল হাসছে পাহাড়-ভাঙানো কোন্ ধ্বসের মতন, অশ্বখুরের সঙ্গে সংগতে মিশিয়ে ভদ্রা হাসছে নদীর তরঙ্গে ভাসা ফুলের মতন, হায় সেই শুভদৃষ্টি, আকাশের তলে সেই শুভদৃষ্টি, সেই চাকার চমকানো ফুলকি মাথায়-কপালে-বুকে ফুলের মতন, সেই শরাসন মালার মতন, সেই [illegible] মালার মতন, শরাসন থেকে জ্যা-তে পার্থের বাঁ-হাত আঁকে অর্ধবৃত্ত, [illegible] অর্জুন আমার, হায় সেই পথ লুপ্ত হল কুরুক্ষেত্রে, শ্রীকৃষ্ণে আর আত্মবিস্মৃতিতে, আগুনের শেষে যেন ছাই। সেই পথ লুপ্ত হল অর্জুনের···, হা, অর্জুন, হা পার্থ আমার। আর সেই ঘোড়া, সেই চারটি-না-সাতটি ঘোড়া ভুলে গেছি, মনে আছে, ষোল-কি-আটাশ পা একযোগে মাটি ছাড়ছে, মাটি ছুঁইছে, চারটি-কি-সাতটি মাথা কেশরে তরঙ্গ এনে, মাথা ঠুকছে শূন্যতায়, পক্ষহীনতার অভিশাপ ভেবে মাথা ঠুকছে মাটিতে, পাথরে, পক্ষহীনতার শাপ ভুলতে চাইছে ছুটে শুধু ছুটে, পাখা কেটে দিয়েছে বিধাতা—এই অপবাদ ধুতে চাইছে ছুটে শুধু ছুটে, হায় রে, শুধুই অশ্ব, কেন আমরা পক্ষীরাজ নই—ক্ষুরে-ক্ষুরে এই ধুয়ো তুলে, হ্যাঁ আমরা অশ্বই শুধু, পক্ষীরাজ নই, আমরা নই,—ক্ষুরে ক্ষুরে এই ধুয়ো তুলে—বাঁয়ে মোড়ে যেন সাত সাগরের সঙ্গমেতে

তরঙ্গের ভেঙে-ভেঙে পড়া, বাঁয়ে বেঁকে ছুটে যায়, যেন জলপ্রপাতের আছড়ে পড়ে ছুটে-ছুটে যাওয়া, ডাইনে বেঁকে যেন সারা আকাশে সমবেত শ্রাবণের মেঘদল হেলে দোলে খেলে, ডাইনে বেঁকে ছুটে যায়, যেন শ্রাবণের ঢল মাটি ভেঙে ছুটে যাচ্ছে, ষোল-কি-আটাশ পায়ে পেশী কাঁপছে গাণ্ডীবের জ্যা-এর মতন, ষোল-কি-আটাশ পায়ে পেশী নাচছে পার্থের বাঁ-পিঠের মতো, ষোল-কি-আটাশ পায়ে বাঁধা যেন পার্থের তীর, পার্থের তীরে যেন বাঁধা আছে ষোল-কি-আটাশ পা, পার্থের পিঠে যেন চমকিত ষোল-কি-আটাশ পার সমবেত পেশী, পার্থের গাণ্ডীবের রজ্জু কাঁপছে যেন ষোল-কি-আটাশ পার সমবেত পেশী,—মাঝখানে আমি ভদ্রা, সুভদ্রা, পার্থপ্রিয়া, স্বয়ংবরা অর্জুন-মহিষী, আটটি-কি-চৌদ্দটি বল্গা জড়ানো এই দুইটি কব্জিতে, এই দুইটি কব্জিতে, এই দুইটি পাণিতে, পার্থের পাণি যে-দুইটি পাণিকে পীড়ন করেছে, যে-মণিবন্ধ দুটি এই কিছু আগে পার্থের করতলে গাণ্ডীবের পরিবর্তে ছিল, কোন্‌দিকে দৃষ্টি ছিল মনে নেই তখনো ছিল না, আটটি-কি-চৌদ্দটি বল্গা হাতে নিয়ে আমি এই সুভদ্রা সোহাগী, বিস্ফারিত ঠোঁটে আর সহাস বয়ানে একবার চাইছি সম্মুখে—ষোল-কি-আটাশ পায়ে আকাশের বিদ্যুতের ক্ষণে-ক্ষণে জ্বলা আর নেভা, বিস্ফারিত ঠোঁটে আর সহাস বয়ানে একবার চাইছি পেছনে—আকাশের মতো খোলা, আমার প্রেমের মতো খোলা, পাহাড়ের মতো খোলা, আমার মনের মতো খোলা, একটি বিরাট পিঠে পেশী নাচছে, যেন প্রেমমত্ত কোনো হাতি নাচছে, ভাঙছে, যেন নবমেঘোদয়ে ময়ূরের ব্যাপিত কলাপ, আমার পার্থের পিঠে ইন্দ্রধনু ভেঙে-ভেঙে পড়ে, আমি সুভদ্রাসুন্দরী, সম্মুখে অশ্ব ব্যগ্রঘাড়, উদ্যত পদ, সম্মুখে অশ্ব, পিছনে পার্থ ব্যগ্র কণ্ঠে, উদ্যত কর, সুভদ্রাসুন্দরী আমি, হায় পার্থ, আমাকে একবার নিয়ে চল, সেই প্রচণ্ড গতি আর উচ্চণ্ড পৌরুষ উপত্যকায়, পার্থ একবার নিয়ে চল।

দশ মাস দশ দিন ধরে এই গর্ভে পার্থ তোর ভ্রূণ আমি লালন করেছি, বায়ুর সমুদ্র থেকে হৃদ্‌পিণ্ডে নিশ্বাস ভরেছি, পার্থ, তোর ভ্রূণটির বুকে। আকাশ মন্থন করা বাতাস নিয়েছি এই বুকে,—পার্থ, তোর ভ্রূণটিকে বত্রিশ নাড়ী দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছি হৃদয়ে, আনন্দিত আহ্লাদিত শিহরিত রোমাঞ্চিত পুলকিত আমি কোনো মধ্যদিবসের নিভৃতিতে, অথবা নিদ্রিত সুপ্ত বিজড়িত সমাহিত আত্মবিস্মৃত আমি কোনো মধ্যরাত্রির নিভৃতিতে গর্ভের উপরে হাত বুলিয়েছি, একা-একা, মনে মনে ভেবেছি যে কত, গর্ভে আছে পার্থের তনয়, গর্ভে আছে

পার্থের তনয়, গর্ভে আছে পার্থের তনয়, গর্ভে আছে অশ্ব আর পার্থের দুই বিপরীত টানের বিন্দুতে আমার আনন্দ-সত্তা, আমার তনয়, আমার প্রাক্তন আর ভবিষ্য, আর হালচষা মাটির মতন উন্মথিত অন্ধকারের মতন বর্তমান, আহা, বর্তমান, আর পার্থ, তুই এসে দুই করতলে মুখ ঢেকে হাহাকারে দিগবিদিক্ ভরিয়ে তুললি, আর পার্থ তুই এসে, দুই করতলে বুক থেকে, রক্ত নিয়ে অর্ঘ দিস, নিজেরই আত্মাকে: পার্থ মৃত, পার্থ মৃত, পার্থ মৃত, পার্থ প্রেত, পার্থ শুধু শ্রীকৃষ্ণের বাধ্য ক্রীতদাস, আয় পার্থ, আমরা দুজনে আকাশের বজ্র ডেকে আনি, আমার গর্ভের শিশু নিপাত যাক, আয় পার্থ, আমরা দুজনে সমুদ্রের আত্মা ডেকে আনি, আমার গর্ভের শিশু নিপাত যাক্, এতদিন এই দুই স্তনে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে যত দুধ জমিয়ে রেখেছি বীর পুত্রের মুখে তুলে দেব বলে, তা কি শেষে তুলে দিতে হবে উত্তরাধিকারহীন পিতৃহীন, রিক্‌থহীন অনাথ এক ভিক্ষুকের ঠোঁটে,—অস্ত্রশিক্ষা দাও পার্থ, অস্ত্রশিক্ষা দাও, আমার পুত্রের জন্য চাই আমি গাণ্ডীবের উত্তরাধিকার, আমার পুত্রের জন্য চাই আমি এ পৃথিবীভরা শত্রুদল, গর্ভের পুত্রকে তুমি অস্ত্রশিক্ষা দাও, পার্থ, অস্ত্রশিক্ষা দাও।

ক্লীব পিতা ডাকছে তোকে, হে গর্ভের পুত্র শোন, শোন, আজ এক এমন্ যুদ্ধ শুনছি যার শেষে, মরণ মরণ শুধু অবিকল্প মরণের যতি, অথচ সে মরণকে তুই-ই চাইবি, এ তোর নিয়তি, শ্রীকৃষ্ণের ক্রীতদাস পার্থ পিতা শেখাবে তোমাকে, নিষ্ক্রমণ অসম্ভব ব্যূহে প্রবেশের পথ শুধু। অনন্তর মরবি পাকে পাকে।

রেডিও-সংবাদ

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ভিয়েৎকং গেরিলাদের সঙ্গে মৌসুমি যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ার উদ্দেশ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নতুন একটি বাহিনীর অগ্রগামী দল আজ চুলি বন্দরে অবতরণ করেছে। অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যদল ইতিমধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া আমেরিকাকে সৈন্য সরবরাহ করে সাহায্যের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেছে। প্রেসিডেন্ট জনসন ঘোষণা করেছেন সামরিক দিক থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে চ্যালেঞ্জস্বরূপ এবং বিশ বৎসর যুদ্ধ করতে হলেও আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তার সামরিক দায়িত্ব পালন করবে। ইতিমধ্যে সান্‌ফ্রান্‌সিসকোতে তিন থেকে পাঁচ হাজার ছাত্রের

এক মিছিল ভিয়েৎনাম যুদ্ধে আমেরিকার অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভ শোভাযাত্রা করে শহরে অর্ধসমাপ্ত ফেডারেল ভবনের শীর্ষদেশে এক কালো পতাকা উত্তোলন করে। আরো জানা গেছে যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মায়েরা তাদের ছেলেদের ভিয়েৎনাম যুদ্ধে পাঠানোর প্রতিবাদ করে প্রেসিডেণ্ট জনসনের কাছে এক লক্ষ স্বাক্ষর সংবলিত এক আবেদন উপস্থিত করেছে। লস-এঞ্জেলসে নিগ্রো ও শ্বেতকায়দের মধ্যে দাঙ্গায় ১৭ জন নিহত ও ৩০০ জন আহত হয়েছে। সহস্রাধিক অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীর লোকজন লস এঞ্জেলসের নিগ্রো-এলাকায় হানা দেয়।

ক্যামেরায়

বৃষ্টিভেজা পথে সেই রিক্সাটি এসে একটা কিউয়ের সামনে দাঁড়ায়, ক্যামেরা আকাশ থেকে তাকিয়ে আছে যাতে রিক্সা, রিক্সাওয়ালা, শ্রাবণ-গগন, বর্ষণ, প্রকৃতির অন্তর্গত, সেই অন্তর্গতি অব্যাহত রেখে, যেমন বাতাসে পদ্মবনে হিল্লোল আসে, সেই হিল্লোলে পদ্মফুলদলের একটি বিশেষ ভঙ্গি চোখে ধরা পড়ে, যেমন বাতাসে নদীজলে কল্লোল আসে, সেই কল্লোলে অলস নদীর ছোট-ছোট ঢেউয়ের অপর পাড়ে ভেঙে-পড়া চোখে ধরা পড়ে, যেমন বাতাসে ধানক্ষেতে বীচিভঙ্গ ঘটে, সেই বীচিভঙ্গে ধানক্ষেতে একটি সমবেত নাচের মুদ্রা ধরা পড়ে, তেমনি হিল্লোলিত-কল্লোলিত-বীচিভঙ্গমুখর এক সরল রেখার সন্নিহিত হয়ে রিক্সাটি দাঁড়াল। এখানে ক্যামেরাকে তার সরল কবিত্বময়তা রক্ষা করতে হবে। রিক্সাটি থামার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা স্তব্ধ হয়ে থাকবে, ক্যামেরা স্তব্ধ হতেই বোঝা যাবে যে সরল রেখাটির কাছে রিক্সাটি থেমেছে সেটি নিষ্প্রাণ নয়, বৃক্ষকাণ্ডের সরলতা যেমন শাখা-প্রশাখা-পত্র পল্লবে বিনম্র, তালগাছের সরলতা যেমন আকাশে মাথা তুলে সহসা ভাবনায় দিশাহারা, যেন দিক খোঁজে, তেমনি সেই সরল রেখাটির আন্দোলন আছে, নমনীয়তা আছে, সঞ্চরণ আছে। রিক্সাটি রাস্তার পাশে অন্যমনস্ক। রিক্সাওয়ালা, অত উঁচু থেকে তার হাঁটার রকম বোঝা যায় না, শুধু সেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে থাকা রিক্সা থেকে ঐ জীবিত সরলরেখাটির দিকে যাওয়ার গতিটা বোঝা যায়। অন্যমনস্ক, স্থির, মুখথুবড়ে পড়ে থাকা রিক্সা আর সজীব সরলরেখার মাঝখানে ঐ রিক্সাওয়ালার গতি-ই ক্যামেরার বিষয় হবে। রিক্সাওয়ালা গিয়ে ঐ লাইনের শেষে দাঁড়ায়, দাঁড়ানোটা যেন বোঝা না যায়, ঐ লাইনের কাছে গিয়ে

রিক্সাওয়ালা যেন লুপ্ত হয়ে যায়। সেই অবলুপ্তির পর রিক্সাটি আর লাইনের মধ্যস্থ স্থানটি, এতক্ষণ যেটা পূর্ণ ছিল রিক্সাওয়ালার গতিতে, শূন্য হয়ে যায়। এই শূন্যতাবোধটি আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা হঠাৎ আকাশময় একবার ঘুরে বেড়ায়, যেমন চিল ঘোরে ছোঁ মারার আগে, তারপর জুম্ করে বাঁশের মাথায় তেরঙা ঝাণ্ডার ওপর ছোঁ মেরে পড়েই বাঁশ বেয়ে সরসর মাটিতে নেমে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পত্‌পত্ জাতীয় পতাকার নিচে। সারিবদ্ধ মানুষ দাঁড়িয়ে, লাইনের মাথায় একটা উঁচু টেবিলের ওপর দুজন মানুষের মাথা। তাদের একজনকে লাইনের প্রার্থী কার্ড এগিয়ে দিচ্ছে। কার্ডটি দেখে সে "দাও" বলে চিৎকার করছে। পাশের লোকটি একটি করে রেশনকার্ড প্রার্থীর হাতে দিচ্ছে। হয়তো সরকারি লোকজন মহল্লায় মহল্লায় বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে নানারকম তত্ত্ব নিয়ে খানাতল্লাস করে প্রত্যেককে একটি করে পরিচয়পত্র দিয়ে এসেছে। হয়তো সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে দেখিয়ে তারা এখানে রেশন কার্ড নিচ্ছে। হয়তো সরকারি লোকজনের খাতাপত্র অনুযায়ী রেশনকার্ড লিখে-টিখে আগেই তৈরি করা ছিল। এবং আজ স্বাধীনতা দিবসের ছুটি হলেও, যেহেতু এই ক'মাসের দুর্দশাই চায় তাই, এই ছুটিকেও সরকারি লোকজনকে কাজ করতে হচ্ছে। সমস্ত কাজটা হচ্ছে একটা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। ক্যামেরাতে এই যান্ত্রিকতা আনতে হবে। একটি লোকের এগিয়ে আসা, তার উদ্যত বাহু, টেবিলের ওপরের প্রথম লোকটির ডানহাত কার্ডটি নেয়া-দেখা-দেখায় একটি লেভারের মতো ওঠে-নামে, আর 'দাও' ধ্বনিটি যেন সেই লেভারেরই যান্ত্রিক আওয়াজ। টেবিলের ওপরের দ্বিতীয় লোকটির ডানহাতটি একটা বাক্সের ভিতর থেকে রেশনকার্ড তোলা-দেখা-দেয়ায় একটা পিস্টনের মতো। এই সমস্ত গতি কিছুক্ষণ চলার পর, হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, সামনে রিক্সাওয়ালার প্রসারিত হাত, টেবিলের ওপর প্রথম লোকটি ন্যস্ত করতল, দ্বিতীয় লোকটি উদ্যত আঙুল—কিন্তু এই তিনটি হাতকে মেলাবার জন্য মাঝখানে কোনো পরিচয়পত্র নেই। এই তিনজনের প্রসারিত হাতের মাঝখানে শূন্যতা। হয়তো সরকারী লোকজন যেদিন তত্ত্বতালাশ করতে গিয়েছিল সেদিন সে ছিল না। হয়তো যে ফুটপাথে শোয় তার হোল্ডিংশাখা, দেয়া যায় না বলে তাকে পরিচয়পত্র দেয়া হয় নি! হয়তো সে যখন ফুটপাথে থাকে তখন ছাতু-ভুট্টা ইত্যাদি খেয়েই চালিয়ে নিতে পারবে ধরে নিয়ে তাকে পরিচয়পত্র দেয়া হয় নি। হয়তো এমন পরিচয়হীন আস্তানাহীন লোকজনকে

পরিচয়পত্র দেয়া সরকারি নীতি নয়। হয়তো এ লোকটা আদৌ এই শহরের, এই রাজ্যের, এই দেশের—লোকই নয়। যাই হোক তাকে রেশনকার্ড দেয়া হয় না, রিক্সাওয়ালা লাইন থেকে বেরিয়ে যায়। ক্যামেরা আবার আকাশে উঠে নজর ফেলে লাইন আর রিক্সার মধ্যবর্তী স্থানটুকু রিক্সাওয়ালা কীভাবে পেরোচ্ছে !

খাদ্য উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি—সুব্রহ্মণ্যনিয়ম

সংবাদপত্র

নয়াদিল্লী, অগস্ট ১৪—খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যনিয়ম আজ রাজ্যসভায় বলেন পূর্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎসর খাদ্য উৎপাদন প্রায় মোট ৩০'৫০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়াছে—

ক্যামেরায়

বৃষ্টি ভেজা পথের ওপর দিয়ে রিক্সাটা যাচ্ছে ডানাভাঙা পাখির মতো, আর রিক্সার পেছনে একের পর এক পোস্টার পড়ছে :

Alsatian pups highly pedigreed, for sale, Rs. 500/- each Post box no S 303

Ballroom Dancing

Beginners ! All dances taught daily by an I. D. M. A. (Lond)

GRAND HOTEL SIMLA

MUSSORIE CLUB invites you

The white tigers of Rewa are rare and peoples have crossed continents to see them ! TOURIST BUREAU,

Government of West Bengal

ECSTASY, Calcutta
makes your
INDEPENDENCE DAY
Complete
NONSTOP ENTERTAINMENT
from Morning to midnight
with
DELIGHTFUL DELILAH
and
Special Independence Launch session
with
Varieties of foods and Marina, Rizia, Zuleikha

এই কি নিয়তি পার্থ, এরই নাম শ্রীকৃষ্ণের লীলা, এরই জন্য রাজপথে হৃদয়ের স্ফুলিঙ্গ ছড়ানো ?

এই কি নিয়তি ভদ্রা, এরই নাম শ্রীকৃষ্ণের লীলা, এরই জন্য শমীবৃক্ষে গাণ্ডীবের গোপন জীবন ?

এই কি নিয়তি পার্থ, এরই নাম সাম্রাজ্য রাষ্ট্র, এরই জন্য তরঙ্গের শীর্ষে-শীর্ষে মৃত্যু যেন নম্র ফুলদল ?

এই কি নিয়তি ভদ্রা, এরই নাম সাম্রাজ্য রাষ্ট্র, এরই জন্য আগুনের শিখায়-শিখায় মৃত্যু যেন হোরির আবির ?

এই কি নিয়তি পার্থ, এরই নাম ভূমিলোভ, এরই জন্য বৃক্ষে বসা পাখিটির চোখ যেন তীরের তীক্ষ্ণতা ?

এই কি নিয়তি ভদ্রা, এরই নাম ভূমিলোভ, এরই জন্য ছুটে চলা ঘোড়াটির বলগা যেন হাতের নম্রতা ?

এই কি নিয়তি পার্থ, এরই নাম ধর্মরাজ্য, কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির অঙ্কে আমার পুরুষ শুধু নম্র অধীনতা ?

এই কি নিয়তি ভদ্রা, এরই নাম ধর্মরাজ্য, কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির অঙ্কে আমি শুধু যন্ত্র মাত্র, মৃত যান্ত্রিকতা ?

এই কি নিয়তি পার্থ, এরই নাম স্বাধীনতা, পাণ্ডব পক্ষের তুমি শুধুমাত্র এক দক্ষ নরহত্যাকারী ?

এই কি নিয়তি ভদ্রা, এরই নাম স্বাধীনতা, তোমার সন্তান হবে শুধু পাণ্ডবের পক্ষে নরহত্যাকারী — ?

পার্থ, এরই জন্য এত বুক-ভাঙা ভালোবাসা
ভদ্রা, এরই জন্য এত উষ্ণ তাজা রক্তের প্রপাত
পার্থ, এরই জন্য তবে আকাশের বজ্র ডেকে আনা
ভদ্রা, এরই জন্য তবে নদীতে প্লাবন ডেকে আনা
পার্থ, এরই জন্য তবে সিঁথিতে এ সিঁদুরের রেখা
ভদ্রা, এরই জন্য তবে এ পেশীতে মণিহার বাঁধা
হায় পার্থ, পার্থ শুধু পাণ্ডবের ভাড়াটিয়া খুনী
হায় ভদ্রা, পার্থ শুধু পাণ্ডবের ভাড়াটিয়া খুনী
তবে এ গর্ভের শিশু গর্ভেই ফিরে যাক্
তবে এ বুকের দুধ বুকেই শুকিয়ে যাক্
যাক্ গর্ভের শিশু গর্ভেই ফিরে যাক্
ধর্মের সাম্রাজ্যে, সব শিশুরা গর্ভে যাক্
তবে এ বুকের দুধ বুকেই শুকিয়ে যাক্
তবে এ বুকের দুধ বুকেই শুকিয়ে যাক্

ক্যামেরায়

জাতীয় পতাকা উড়ছে, ক্লোজ অপে, তারপর দেখা যায় বাঁশটির কাছে রিক্সাওয়ালা রিক্সা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

রেডিও-সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এ রাজ্যের খাদ্যাভাবের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন যে, দেশবিভাগের পর প্রচুর ধানের জমি পাট চাষে ব্যবহৃত হওয়ায় ও এই রাজ্যে প্রবাসী অন্য রাজ্যের, বিশেষত বিহারের কয়েক লক্ষ লোককে খাওয়াতে হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা এত বেশি। তাঁর জাতির প্রতি বাণীতে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বলেন যে, আমাদের সমাজতন্ত্র দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে সমান সুযোগ ও সুবিধা দিতে চায়, শত শত বৎসর

ধরে যে উপাদান ভারতবর্ষকে রক্ষা করে এসেছে তা হলো এক সৃষ্টিশীল আধ্যাত্মিকতা, আমরা দেহকে তুচ্ছ করি না, কিন্তু আমরা জানি আধ্যাত্মিক জীবনই সকলের চাইতে বড়,—আমাদের দেশের অপরাজেয় শক্তি নিহিত আছে আমাদের জনসাধারণের আত্মত্যাগের শক্তিতে—

ক্যামেরায়

রিক্সাওয়ালার দেহের ভিতর থেকে তার আত্মা চট্ করে বেরিয়ে গিয়ে, রিক্সা সহ-ই, জাতীয় পতাকার বৈরাগ্য-দ্যোতক গৈরিকে বসে। দেখতে খুব অদ্ভুত লাগে: একটা পাখির ছানার মতো আত্মা অতবড় একটা রিক্সা টেনে পতাকার সঙ্গে সেঁটে আছে। তারপর রিক্সাওয়ালার আত্মা রিক্সাসহ আকাশে উড়ে যায়। জনগণমনঅধিনায়ক গাওয়া হয়। রাস্তায় পড়ে থাকে শুধু রিক্সাওয়ালার দেহ, তুচ্ছ দেহটি।

মতি নন্দী

বয়স

সামনের মাসের পয়লা তারিখ থেকে গুণেন ঘোষকে আর অফিসে আসতে হবে না। এইমাত্র সে চিঠি পেয়েছে ম্যানেজারের অফিস থেকে। তার বয়স ষাট বছরে পৌঁছে যাবে এই মাসেই। গুণেন ঘোষ গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে হেসে উঠল।

"এবার তো ছেলেছোকরাদেরই যুগ এসে গেল। আমি যাচ্ছি, তারপর পবিত্র নাগ যাবে। যারা আঠারো-কুড়ি টাকা মাইনেয় ঢুকেছিল সব একে-একে যাবে। দুঃখ হবে কেন, জায়গা জুড়ে কি চিরকাল থাকা চলে?" মুখ নামিয়ে গুণেন ঘোষ কাজে মন দিল। আর-একটা কথাও সেদিন বলে নি।

এর চারদিন পরেই ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বেয়ারার কাছ থেকে সবাই জানল, গুণেন ঘোষ সন্দীপবাবুর পা জড়িয়ে কেঁদে পড়েছিল এক্সটেনশন পাবার জন্য। পায় নি। তিনি বলেছেন, বুড়োহাবড়াদের আর রাখবেনই না। এখন কোয়ালিফাইড, স্মার্ট ছেলে অজস্র পাওয়া যায়। এবার থেকে নাকি দরখাস্ত নিয়ে ইন্টারভিউ করে সব চাকরি হবে।

প্রতাপ জানার পক্ষাঘাত হবার পর থেকেই তার ছেলে সন্দীপ কর্তা হয়ে বসেছে। নিজে গাড়ি চালায়, লিফট না পেলে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় ওঠে। প্রতাপ জানা থাকলে গুণেন ঘোষ যে দু-বছর এক্সটেনশন পেত, সে-বিষয়ে কারুরই দ্বিমত দেখা গেল না। এই বিরাট অফিস আর কারখানা তার একার চেষ্টায় গড়ে তোলার, কর্মচারীদের সঙ্গে তার অমায়িক ব্যবহারের, বিপদে-আপদে অর্থসাহায্যের কথা ইত্যাদি সবই আলোচিত হল সেদিন।

এরপর থেকেই পবিত্র নাগের রাতের ঘুম কমে গেল। গুণেন তার থেকে মাত্র সাত মাসের সিনিয়র। পবিত্রর ছেলে বুড়ো এ-বছরই ডাক্তারি পাশ করল। রোজগার করে দাঁড়াতে এখনো বছর তিন-চার। একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে, আরো একটির বাকি। রাতে যতক্ষণ না ঘুম আসে কানে শুধু বাজে গুণেনের কণ্ঠস্বর 'তারপর পবিত্র নাগ যাবে।'

ব্যাপারটা একদিন খুলে বলল স্ত্রী উমাকে। শোনামাত্র ফ্যাকাশে হয়ে গেল উমার মুখ। শুধু বলল, "রিটায়ার হলে চলবে কি করে? কটা টাকাই বা আর পাবে। জয়ন্তীর বিয়েতে তো চার হাজার তুলেছ।"

উমা পরামর্শ দিল প্রতাপ জানার সঙ্গে দেখা করার। পরদিনই অফিস ছুটির পর পবিত্র হাজির হল মালিকের বাড়ি। ওর মনে পড়ল যখন দর্জিপাড়ার ভাড়াবাড়িতে প্রথম সে প্রতাপ জানার সঙ্গে দেখা করতে যায় পাঁচ বছরের সন্দীপ তাকে বলেছিল, "বসুন, ডেকে দিচ্ছি।"

প্রায় পনেরো মিনিট পর চাকর এসে পবিত্রকে নিয়ে গেল দোতলার এক ঘরে। দেড়-বছরেই দশাসই মানুষটি কঙ্কালসার হয়ে গেছে। বাঁদিক একদম পড়ে গেছে। কথা যা বলেন বোঝা যায় না। ডানহাত কোনোরকমে তুলে ওকে বসতে বললেন। চেয়ারটা খাট ঘেঁষে টেনে পবিত্র বসল।

প্রায় আধঘণ্টা চুপ করে বসে থেকে পবিত্র বাড়ি ফিরল। উমা ব্যগ্র হয়ে জানতে চাইল, উনি কিছু করবেন বলে কথা দিলেন কিনা। পবিত্র ভারি অসহায় বোধ করল। যার নড়াচড়া কথা বলারই ক্ষমতা নেই তাকে কি এসব ব্যাপার জানানো যায়! উমার মুখ দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে গেল।

দিন-তিনেক পর রাতে উমা এসে বসল পবিত্রর বিছানায়। ফিসফিস করে বলল, "সন্দীপবাবুর সামনে চটপটে ভাব দেখিয়ে ঘোরাঘুরি করো না! তোমাকে তো খুব বুড়ো আর দেখায় না।"

"তা কি করে হয়। ওতে কি বয়স কমে?"

"কেন হবে না। ওপরের পাঁচুদাসবাবুর তো সব চুল পাকা, বুঝতে পারবে দেখলে? আর কেমন সিধে হয়ে হাঁটে।"

"ওতো এককালে ফুটবল খেলত, স্বাস্থ্যটা এখনো ভালো। তাছাড়া প্যাণ্ট পরলে অনেক স্মার্ট দেখায়।"

"তুমিও পরবে। বুড়োর প্যাণ্ট তোমারও হবে। দরকার হলে দর্জির কাছ থেকে ছোট করিয়ে আনবে।"

পরের সোমবারই চুলে কলপ দিয়ে, ছেলের প্যাণ্ট এবং নতুন বুটজুতো পরে পবিত্র অফিসে এল। দেখে সবাই হাসল, ঠাট্টা করল। দু-একজন আবার এমন কথাও বলল, রিটায়ারের সময় আসছে বলেই ছোকরা সেজেছে। পবিত্র এ-সবের কিছুই গ্রাহ্য করল না। শুধু খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল কমবয়েসীদের চলাফেরা, রকমসকম।

নতুন জুতোর তলায় ভালো করে ধুলোও লাগে নি। এখনো চলতে গেলে পা হড়কায়। তাই পা টিপে টিপে পবিত্র অফিসের সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। হঠাৎ ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে উঠে আসতে দেখে হকচকিয়ে প্রায় ছুটেই সে নামতে শুরু করল। সিঁড়িটা যেখানে ঘুরেছে তার শেষ ধাপের তিনটি সিঁড়ি উপর থেকে পবিত্র লাফ দিল। হাঁটু মুয়ে পড়ছিল, টাল সামলে উঠতে গিয়ে জুতো পিছলে গেল। ম্যানেজিং ডিরেক্টরই ওকে টেনে তুলল। এবং বেশ সহানুভূতির সঙ্গেই বলল, "সাবধানে নামা-ওঠা করুন। এই বয়সে হাত-পা ভাঙলে আর সারবে না।"

শুনে পবিত্র বিমর্ষ হয়ে পড়ল। বহুক্ষণ ভাবল 'এই বয়সে' বলতে কি বোঝাল? বুড়ো হয়েছি অর্থাৎ শারীরিক অক্ষমতার ইঙ্গিত দিল কি? 'এই বয়সে' মানে কি ষাট বছর বয়স! রাতে উমার কাছে পবিত্র ঘটনাটা বিবৃত করল। ক্ষুব্ধ হয়ে উমা বলল, "নিশ্চয় তোমার বয়সকে ঠেশ দিয়েই বলেছে। হয়তো রিটায়ারের সময় এই ঘটনাটার কথাই ওর মনে পড়বে তখন আর চাকরি বাড়াতে চাইবে না। কেন ওভাবে নামতে গেলে?"

"ওইভাবেই তো সুধেন্দুকে নামতে দেখি।"

পরদিনই উমা আঁশবঁটি দিয়ে জুতোর তলা ঘষে দিল। জুতো পরে চেয়ার থেকে পবিত্র বার পাঁচ-ছয় লাফিয়ে নামল। অফিস বেরোবার সময় ফিসফিস করে উমা বলে দিল, "এখন কিছুদিন একদম সামনাসামনি হবে না। ভুলে যেতে দাও। বড় বড় ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় তো, ছোট ব্যাপার আর কদিনই বা মনে করে রাখবে।"

পবিত্র প্রাণপণ করে চলল যাতে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে তার দেখা না হয়। মাসখানেক পর সন্দীপ জানা তাদের ঘরে ব্যস্ত হয়ে ঢুকে বিল-ইনচার্জ প্রভাকরের সঙ্গে টেবলে হাত রেখে ঝুঁকে কথা বলতে শুরু করল। পবিত্রর টেবলে তখন চায়ের কাপ আর মুখে টোস্ট। ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে দেখেই বিষম খেল। খক-খক করে কাশতে শুরু করল। সন্দীপ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই পবিত্র দম বন্ধ করল কাশি চাপতে। চোখদুটো ঠিকরে পড়ার দশা, মুখের খাবার গিলবার জন্য কোঁত পাড়ল। ঘরের সকলেই তার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে। সন্দীপ খুব সহানুভূতির সঙ্গেই বলল, "আপনার কি কাশির অসুখ আছে? আমাদের ডাক্তারকে দেখিয়ে নিন না।"

পবিত্র জোরে মাথা নাড়তে থাকল।

বাড়ি ফিরে পবিত্র ঘটনাটার কথা উমাকে বলল না, শুধু 'কাশির অসুখ' কথাটা তার মনে পাক খেয়ে ফিরতে লাগল। কি বোঝাতে চাইল? কাশিটা কি যক্ষারোগীদের মতো ছিল? এটা কি ও মনে করে রাখবে? যদি রাখে তাহলে এক্সটেনশন কি পাওয়া যাবে?

কিছুদিন পর অফিসে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা গেল। স্পোর্টস হবে। ইতিপূর্বে কখনো হয় নি। এক ছোকরা সহকর্মী পবিত্রকে পরামর্শ দিল, "দাদা, বুড়োদের জন্য ওয়াকিং রেস আছে, নেমে পড়ুন। সন্দীপবাবু প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউট করবেন। যদি ফার্স্ট-সেকেণ্ড হন, নজরে পড়বেন। আপনি যে ফিজিক্যালি ফিট সেটা তো প্রমাণ হবে।"

কথাটা মনে লাগল। উমাকে বলামাত্রই সে সায় দিয়ে উঠল।

"কতটা হাঁটতে হবে?"

"তা প্রায় আধমাইল।"

"পারবে না?"

পবিত্র কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "খুব জোরে হাঁটতে হবে। ফার্স্ট-সেকেণ্ড না হলে লাভ কি?"

"তা তো বটেই। কাল থেকেই জোরে হাঁটা অব্যেস কর। আমি বরং ভোরবেলা তুলে দেব। পার্কে গিয়ে হাঁটবে।"

পরদিন থেকে পবিত্র হাঁটা অভ্যাস শুরু করল। আলো ফোটার আগেই উমা তাকে তুলে দেয়। পার্কে গিয়ে কয়েক চক্কর হেঁটে বেঞ্চে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বাড়ি ফিরে আসে। একদিন উমা বলল, "চলো আমিও যাই। দেখব তুমি কেমন হাঁটতে পার।"

পার্কের বেঞ্চে উমা বসে রইল। পবিত্র একপাক দিয়ে তার সামনে আসামাত্র বলল, "এ তো বেড়ান হচ্ছে। এভাবে চললে কি ফার্স্ট-সেকেন হওয়া যায়?"

পবিত্র চলার বেগ বাড়াল। তিনপাক দেবার পর হাঁফিয়ে উঠে, উমার পাশে এসে বসল।

"আধমাইল হয়ে গেল!"

"আর পাচ্ছি না।"

"তাহলে হবে কি করে। বুড়োকে ডাক্তারখানা করে দিয়ে বসাতে হবে। বাসন্তীর বিয়ে এই বছরই দোব। আর বলছ পাচ্ছি না? ওঠো ওঠো। আর তো দিন-পনেরো মোটে সময়।"

পবিত্র আরো তিনপাক জোরে হেঁটে এসে বসল। পা কাঁপছে। হাঁ করে শ্বাস নিতে-নিতে উমাকে বলল, "এভাবে কি জোয়ান সাজা যায়!"

উমা কথা না বলে সামনে তাকিয়ে থাকল। পবিত্র হাঁটুতে হাত রেখে ঘাড় নিচু করে কিছুক্ষণ হাঁফাবার পর আস্তে আস্তে বলল, "এতখানি বয়স হল তার আর কোনো দাম রইল না।"

এরপর থেকে রোজই উমা সঙ্গে আসে। পবিত্র চক্কর দিতে থাকে। যখন কাছে আসে উমা গলা এগিয়ে ফিসফিস করে, "জোরে। আরো জোরে।" পবিত্র তাই শুনে হাঁটার জোর বাড়ায়। কখনো-কখনো উমাও হাঁটে ওর সঙ্গে। কিছুটা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। পবিত্র চক্কর সম্পূর্ণ করে এলে আবার কিছুটা সঙ্গে থাকে। রাতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে সে পবিত্রর পা টিপে দেয়।

স্পোর্টসের দিন পবিত্রর সঙ্গে উমাও মাঠে গেল। সামিয়ানা খাটান হয়েছে। অ্যামপ্লিফায়ারে গানের রেকর্ড বাজছে। কর্মকর্তারা তদারকিতে ব্যস্ত। পবিত্র আর উমা একধারে দুটি চেয়ারে বসে রইল। বিরাট এক টেবলে পুরস্কারগুলি সাজান। উমা বলল, "কোনটা তোমাদের?"

"কি জানি। শুনেছি অ্যাটাচি ব্যাগ দেবে।"

"তাহলে বুড়োর কাজে লাগতে পাবে।"

পবিত্র মুখ ফিরিয়ে স্পোর্টস দেখতে লাগল। সকাল থেকে উমা কিছু খেতে দেয় নি। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। কোকাকোলা বিলোনো হচ্ছে প্রতিযোগীদের। পবিত্র উঠে পড়ল। গুটি-গুটি এগোতেই উমা পিছু নিল।

"জল খেতে যাচ্ছি।"

"বেশি খেও না।"

উমা চেয়ারে এসে বসল। পবিত্র দু-বোতল কোকাকোলা শেষ করে তৃপ্ত বোধ করল। ফুরফুরে হাওয়া, রোদটাও মিঠে লাগছে তাই সে ইতস্তত বেড়াতে লাগল। দূরে-দূরে ঘেরা ফুটবল মাঠ। মাঝে-মাঝে ক্লাবের তাঁবু। অনেক মাঠেই ক্রিকেট খেলা চলছে। এধারে মনুমেণ্ট, ওধারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। ট্রামগুলো খেলনার মতো। পবিত্র কিছুক্ষণ ধরে দূরের ট্রাম-বাসের চলা দেখল। একজায়গায় অনেক লোক ভীড় করে। এগিয়ে গেল সে। ম্যাজিক দেখাচ্ছে দাঁতের মাজনের ফিরিওলা।

অবাক হয়ে সে মাজনওলার বক্তৃতা শুনছিল। হাতে টান পড়তেই ফিরে দেখে উমা।

"এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি চলবে? সন্দীপবাবু এইমাত্র এল, যাও সামনে গিয়ে দাঁড়াও। কত লোক তো ঘুরঘুর করছে, কথা বলছে।"

গজগজ করতে-করতে উমা ওকে নিয়ে ফিরে এল সামিয়ানার কাছে। সন্দীপ জানাকে দেখা যাচ্ছে। হেসে-হেসে কথা বলছে, কর্মচারীর ছেলে-মেয়েদের পিঠ চাপড়াচ্ছে, গাল টিপছে। পবিত্র ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একজন বলল, "পবিত্রবাবু আজ ওয়াকিং রেসের সব থেকে ভেটারেন কম্পিটিটর।"

"তাই নাকি!" ম্যানেজিং ডিরেক্টর খুব অবাক হল, "তাহলে তো আপনাকে জিততেই হবে। যদি জেতেন আপনাকে আমি স্পেশাল প্রাইজ দেব।"

পবিত্র কাছে আসতেই উমা ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন। "কি, কি বলল?"

"যদি জিতি, স্পেশাল প্রাইজ দেবে আমাকে।" পবিত্রর কণ্ঠে উমার মতো উত্তেজনা নেই।

"তাহলে তো জিততেই হবে তোমাকে। ওঃ রাধামাধব এইবারটি অন্তত মুখ তুলে চাও। সারাজীবনই তো জ্বালাতন-পোড়াতন হলুম।" উমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ফোঁপানি চাপতে মুখে আঁচল দিল। ম্যাজিকওলাকে ঘিরে এখনো ভীড় জমে আছে। পবিত্র সেইদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

সবশেষে ওয়াকিং রেস। মাঠটা গোল হয়ে দুটো চক্কর দিতে হবে। দর্শকরা চেয়ার থেকে উঠে এসে লাইনের ধারে জড়ো হয়েছে মজা দেখতে। প্যান্টটাকে হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে পবিত্র প্রতিযোগীদের সঙ্গে দাঁড়াল। অফিস এবং কারখানা মিলিয়ে পনেরোজন। সকলেই পয়তাল্লিশ বছরের উপরে। দর্শকরা সকলকেই উৎসাহ দিয়ে কথা বলছে। উমা শুধু একধারে ঠায় দাঁড়িয়ে।

পিস্তল ছোঁড়ার সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল হাঁটা। দর্শকদের মধ্যে হৈ-হুল্লোড়। অনেকে প্রতিযোগীদের সঙ্গে লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল চিৎকার করতে করতে। প্রথম চক্করের সিকি পথ পবিত্র সবার আগে। মাঝপথে দেখা গেল তিন-চারজনের পিছনে। চক্করটা শেষ হবার আগেই পিছনের লোকেরা ওকে ধরে ফেলল। দর্শকদের চিৎকারে দূরের পথিকরাও একবার থমকে এদিকে তাকাল।

পবিত্র অসহায় বোধ করল। পাশের লোকটি তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। উমা কোথায়, তাই দেখতে গিয়ে চোখ পড়ল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে অগ্রবর্তীদের। পবিত্র দমে গেল। খালি পেট

মোচড় দিচ্ছে। ঘাড়টা কাত হয়ে পড়েছে। হাত-দুটো পাঁজরের দুপাশে গাছের ভাঙা ডালের মতো দুলছে। সামনের লোকেদের সঙ্গে তার ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সে চমকে উঠল উমাকে দেখে। লাইনের পাশে সর্বস্বান্তের মতো দাঁড়িয়ে।

"এইভাবে তুমি ডোবাবে।" উমাও ওর সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছে আর তিক্ত হতাশ কণ্ঠে বলছে, "সবাই এগিয়ে যাচ্ছে। এগোও। আরো জোরে হাঁটো, আরো জোরে, এই তো, এই তো।"

চিবুক তুলে, নিঃশ্বাস টেনে পবিত্র জোরে হাঁটতে চেষ্টা করল। মাথাটা দু-ধারে নড়ছে ছ্যাকরা গাড়ির টাল-খাওয়া চাকার মতো। দুটো হাত লগবগ করছে। গোটা শরীর আলোড়িত হয়ে হাস্যকর দৃশ্য তৈরি করল। তবে ওর আগের লোকের সঙ্গে ব্যবধান কয়েক মিটার কমল।

উমা তাল রাখতে ছুটতে শুরু করেছে। আর চাপাস্বরে বলে চলেছে, "এই তো, এই তো। সবাই দেখছে, সন্দীপবাবু দেখছে। কে বলে তোমার বয়স হয়েছে। কে বলে বুড়ো হয়েছ।"

মাঠের দর্শকরা এতক্ষণ নাগাড়ে চিৎকার করে যাচ্ছিল। এখন তারা হঠাৎ চুপ করে, পবিত্র আর উমাকে দেখতে লাগল। কথা বলার দরকার হলে ফিসফিস করছে। পবিত্র দ্বিতীয় চক্করের অর্ধেক পার হয়েছে। প্রথমজন ফিতের দিকে এগোচ্ছে।

"সব্বোনাশ হল। পৌঁছে গেছে যে গো।" উমা দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন পবিত্র মরিয়া হয়ে ছুটতে শুরু করল। প্রতিযোগীরা অবাক হয়ে কেউ-কেউ থমকে দাঁড়াল। সারা মাঠ এতক্ষণ একটা কিছুর প্রত্যাশায় দম বন্ধ করেছিল। এবার হৈ-হৈ করে চিৎকার, হাততালি শুরু করল। পবিত্র সবার আগে ফিতে ছিঁড়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

লাউডস্পীকারে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা হচ্ছে। হাততালি পড়ছে। পবিত্র আর উমা তখন অবসন্নগতিতে ধর্মতলার ট্রাম টার্মিনাসের দিকে হেঁটে চলেছে। কেউ কথা বলছে না। পবিত্র একটু পিছিয়ে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে দু-ধারে তাকাচ্ছে। প্যান্টটা তখনো হাঁটু পর্যন্ত গোটানো।

ট্রামে উঠে পবিত্র উমার সীটের পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। উমা তাকে বসতে বলল না।

পরদিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, চুলে কলপ না দিয়েই পবিত্র অফিসে গেল। ফিরে এল দুপুরে। উমা বিস্মিত হয়ে তাকাবামাত্র সে বলল, "বুড়ো হয়েছি বলে আর রিটায়ার করাতে পারবে না। রিজাইন দিয়ে এলুম।"

সিদ্ধেশ্বর সেন

গ্রহণ

গন্ধর্ব ও পিতৃলোকেও ছায়া
সময় ধরেছে দর্পণ, তোলো
মুখ

ওকী বিবিক্ত
অন্ধকার, ও আলোয়
ফেরে একহারা,
উদয়-অস্তে আমরাই উৎসুক

ঘন মেঘ ধরে অনিশ্চিতের কায়া

হানে বিদ্যুৎ, পাখসাটে তোলে
বজ্র
শূন্য ঝাঁপিয়ে নেমে পড়ে ঘোর
প্রলোভ এবং বর্ষণ

আত্মভুক কী নগরী অহর্নিশ

এসপ্ল্যানেডের অক্ষৌহিনীও, চকিতে
অন্তর্হিত
মাথা বাঁচাবারও খালি নেই কার্নিশ

হেডলাইটেও ঘোচে না চোখের ধন্দ, এ ধারাপাতে
উইণ্ডস্ক্রীনের ভেজা ঘষা-কাঁচে

স্বরূপ-দ্বিখণ্ডিত
স্টীয়ারিঙে ভাঙে গতি, না থামলো
দ্বিধা-ভারাতুর হাতে

ময়দানে গাছগাছালির প্রতিবন্ধ
জোলো-ঝোড়ো হাওয়া চেয়েছে আমায়
ফেরাতে, অন্ধরাতে

তোমাকে বলি নি আমার মনের দ্বন্দ্ব ॥

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

আমি

আকাশ বিঁধি আমি দুরভিসন্ধির
বর্শা-ফলকের মুখে,
রক্তিম রৌদ্রের মদ্য করি পান—
বলে, বলুক নিন্দুকে।

ভগ্নজানু নই, যদিচ ম্রিয়মান !
তুঙ্গ কালজয়ী আশা
অন্ধকারে জ্বালে মায়াবী লণ্ঠন
পথ দেখায় ভালোবাসা।

আহত আর্তেরা চতুর্দিকে, নেই
দৃপ্ত শপথের দেখা ;
কুয়াশা-গুণ্ঠিত দিগ্বলয়ে আঁকি
শাণিত এক মুখ-রেখা।

সময় নখে আঁকে ক্ষতের চিহ্ন,
　　　　　　　　　সকলে ঘোরে দিশাহারা—
বাড়ায় দিকে দিকে শুশ্রূষার হাত
　　　　　　　　　হৃদয়ে ফল্গুর ধারা।

তরুণ সান্যাল

যাত্রা

কী যেন আমার ছিল, কী ছিল আমার হাতে
উঠে চলে যেতে যেন মনে পড়ছে, কী ছিল।　ছিল কী ?
ধুলো বড় পথ ময়
　　　　এবং বালুর বুকে দীর্ঘরেখা ঝড়ের নখের
　　　　　　　বৃষ্টি রাত্রি ময়
কী ছিল, ছিল কী, মনে হয়

জল ঢের নেমে গেছে, বুনো কাদা পাখির নখের ছাপে শুয়ে
কে ছিল তিতির, বেলে হাঁস, বক
　　　　কে ছিলে, কী ছিলে
আচমকা বারুদে গন্ধ, শব্দ, গাছে পাতা শিউরে ঝরা

স্টেশনে উদ্‌ভ্রান্ত মেল থাকে না, রয় না অপেক্ষায়
দ্রুত যেতে মনে পড়ছে, কী ছিল,
　　　　কী রাত্রির নিকটে
　　　　　　　শুধু নক্ষত্রের হীরা··· ?
　　　　না কি পীড়া, ঘোর মর্মপীড়া—
হাতের কয়েকটি পাপড়ি খসে যাচ্ছে
　　　　　　　আমার বয়স ॥

তুষার চট্টোপাধ্যায়

সময়ের স্বরলিপি

এক

কয়েকটা পাঁচশালা পরিকল্পনা পেরিয়ে অলৌকিক আকাশ।
বৃষ্টির বাতাস। পেছন ফিরে চলতে চলতে আর্তনাদ।
তীব্র দ্বিপ্রহর। পেট্রলের ঘ্রাণ বেপাড়ায় ম্লান। তৃষ্ণার গরলে
অমৃতের স্বাদ। কতিপয় জাহাজ স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট হয়।
সেউড়্যের গর্জন। শুঁড়িখানা মন্দির মিনারের পথ টলতে টলতে
অন্ধকার। অসহ্য শীতল। সমগ্র জাহাজখানি দীর্ঘশ্বাসে
দোলে এবং দোলে ॥

দুই

সময় কখন রঙ পাল্টে বন্যা। ক্রমাগত স্রোত নীরবতা ভাঙে!
সময়ের মসৃণ গা বেয়ে সরে যাচ্ছে জল। বিন্দু বিন্দু আকাশ
ধারণ করছে মাছ আর শ্যাওলার উলঙ্গ শরীর।
ক্রমাগত নীল। আমরা ডুবে যাচ্ছি গোলাকার চাঁদ আর
ত্রিভুজ পাহাড়ের দিকে। নেপথ্যে নিখুঁত সেতারে আলাপ
করছেন বয়স্ক সময় ॥

শিবশম্ভু পাল

প্রেম থেকে দূরে

বলো তো কোথায় যাই দরজার বাইরে বড় কোলাহল হাওয়া
প্রতিকূল জলঝড় কাদায় আবিল পথে কতদূর যাব
বন্ধুরা যে যার ঘরে দরজা বন্ধ করে ব্যস্ত তাসে গল্পে কিম্বা
দাম্পত্য আলাপে···আমি তাদের বিরক্তি পেতে চাই না বরং

সেই ভালো কিছুক্ষণ ছাতার আড়ালে থেকে আমি
একা একা দৃশ্য দেখি দুর্যোগের নৈরাশের তীব্র বিক্ষোভের
উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমের আনাচেকানাচে
বিদ্যুৎ চমকায় ঘন মেঘের গর্জনে আর্ত শ্লোগান ফাটায়
নীলিমা বিশাল ব্যাপ্ত নীলিমায় মেঘের বিক্ষোভ
দরজা খুললে চোখে কানে সারা গায়ে ঝাপটা দিচ্ছে হাওয়া
বন্ধুরা যে যার ঘরে বিছানায় আহারে ব্রিজের
চতুরা ন খুঁজে ফেরে ক্ষ্যাপার মতন
সকলেই আমাদের সকলেই যারা এক পালকের পলাতক পাখি
টেরিলিন বেয়নের চিরস্থায়ী ভাজফেলা সুমসৃণ অনিবার্যতায়
ডালহৌসীর খড়কুটো রক্তচক্ষু পোস্টারের গা বাঁচিয়ে কিছু খড়কুটো
খুঁজে ফিরি বাসা বাঁধি পাইকপাড়ায় বড় সাধে
শৈশবের সহজাত তৃষ্ণা দিয়ে আমারও ঘরের
নিবিড় ভিতরে বক্ষে প্রতিদিন প্রতিরাত স্বরচিত পারিজাতখানি
ভালোবাসা দিয়ে যায় সাবেকি দিনের কত জড়োয়া আদর
বলো তো কোথায় যাই দরজার বাইরে বড় কোলাহল হাওয়া
প্রতিকূল জলঝড় মেঘের গর্জনে আর্ত শ্লোগান ফাটায়
নীলিমা বিশাল ব্যাপ্ত নীলিমায় মেঘের বিক্ষোভ…

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

নির্বাসন

ট্রামের জানালা থেকে ভেসে আসা শ্যামলিমা, মেয়েটির মুখ
কোথায় দেখেছি বলে মনে হয় ; চিনিতে পারি না
অকস্মাৎ মুখখানি অতি প্রিয়, স্মরণীয় বলে মনে হয়
অথচ যা কিছু প্রিয় স্মৃতির কোটরে বদ্ধ, চিরনির্বাসিত।

বহুদিন হৃদয়ের কপাট খুলি নি, চকিত আঁধারে তাই বিভ্রান্ত হয়েছি,
এখানে কে যেন ছিল, অস্তিত্ব নিবিড় হয়ে ঘিরে ফেলে ক্রমে
বিশ্রস্ত শয্যায় ম্লান মালাগাছি ; মৃদুগন্ধ অস্থির বাতাসে
অনেক বিষণ্ণ ছায়া করাঘাত করে যায় বাহিরের দ্বারে।

ট্রামের জানালা থেকে স্মৃতি এসে নাড়া দেয় বৈদ্যুতিক তারে
সঞ্চারিত হয় সব তন্ত্রীপথে ; ও যে ছিল বড়ো পরিচিত
বিস্মৃত হয়েছি নাম, যদিও চোখের দীপ্তি মন ভরে রাখে
সহসা হৃদয়পুরে ম্লান হয়ে মুছে যায় শহরের পথঘাট, প্রতিবেশীদল।

কলেজ স্ট্রীটের থেকে ধলেশ্বরী কতদূরে ? শৈশবের গ্রামের সীমায়
এ মুখ দেখেছি যেন ছায়াচ্ছন্ন নদীতীরে, বকুলবাগানে !

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাসানো ভেলায়

এক অঙ্কে

ফুটপাথ।

এক ধারে রাস্তার নিয়ন আলো। মঞ্চ জুড়ে গাড়িবারান্দার তলাটুকু। কড়াৎ করে মেঘ ডেকে বিদ্যুৎ চমকাল। গুরু গুরু মেঘের সাড়া। গাড়িবারান্দার নিচে, দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যে ছেলেটি ভয় পাচ্ছে তার বয়েসের অল্পতার চাইতে ওজনের অল্পতা বেশি। এর পিতৃদত্ত নামটি জানি না। স্বরচিত নাম— অভিমন্যু সেন। সাজসজ্জার পারিপাট্যে একটা বলিহারি যাই সাবধানী ভাব। আর একটা জিনিষ লক্ষণীয় : বেঁটে খেঁটে টাইট ট্রাউজারের ওপর যে গাঢ় রঙের চল জামাটি পরেছে তার বোতাম পেট পর্যন্ত খোলা। রোগা বুকটির ওপর মাঝে মাঝে হাত রাখছে। চেহারার এই আধুনিক বোলচালের সঙ্গে যে মুখখানি মানানো হয়েছে তাতে কোথায় একটু গ্রাম্য ভাবালুতা। যেন পায়ে দলা সন্ধ্যামণি।

ঠিক এই মুহূর্তে গাড়িবারান্দার তলায় ছুটে এসে আশ্রয় নিল অন্য একটি ছেলে। একেবারে অন্য। চলায়, তাকানোয় বলিষ্ঠ স্বাভাবিক ভাব। গায় হাতকাটা গেঞ্জি। পরনে খাকি ট্রাউজার। হাতের স্টার্টার হ্যাণ্ডেলটি কিছু ভারী বলে মনে হয়। একটু রোগার দিক ঘেঁষা হলেও ছেলেটিকে লম্বা-চওড়া বলা যায়। জামা-কাপড় স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে-ভিজে। এর পিতৃদত্ত নাম গণেশ পাল। মুখে ভাবালুতার চিহ্নমাত্র নেই। কিছুটা রুচিহীন সাজসজ্জার তুলনায় আধুনিক রুচিসম্পন্ন মুখ। কিন্তু লাবণ্য আছে।

গণেশ—[হ্যাণ্ডেল দড়াম্ করে ফেলে] ভোগাবে। শালা, আকাশটা হয়ে আছে কি!

অভিমন্যু—আগুন জ্বলবে না। ভেতর বাইরে সব স্যাঁতস্যাঁতে rotton stuff।

গনেশ—ওঃ হো, দেশলাই হবে দাদা? [সিগারেট বার করে]

অভি—আগুন এক জ্বলতে পারে শিরার মধ্যে।

গনে—দেশলাই?

অভি—দেশলাই? [বুক পকেট ছোঁয়] দেশলাই!

গনে—ঐ পকেটটা দেখুন না—প্যান্টের, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাশে হাত দিন।

অভি—[যান্ত্রিকভাবে, যেন না বুঝে খোঁজে] এতে কিছু জ্বলবে না—এতে কিছু জ্বলবে না। [হঠাৎ নাটকীয় ভাবে চেঁচিয়ে উঠে] I say—এতে কিছু জ্বলবে না।

গনে—[চমকে] হ্যাঁ, যা বিষ্টি! [সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করে]

অভি—বিষ্টি! ?

গনে—আমার বাসটা ব্রেক-ডাউন হল—ঐ উইথানটায়। কোমর বরাবর জল উঠে গেল রাস্তাতে! গ্রে স্ট্রীট থেকে ম্যানেজ করিচি—কিন্তু—ব্যস, সভ্য পাড়ায় এসে খোঁদলে পড়লাম। বনেটে জল ঢুকে গেল তার আর কী করব? টিরিপটাই নষ্ট—ভুশ্!

অভি—হয়তো এতক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে।

গনে—হ্যাঁ, সে আর বলতে! বলিহারি যাই মশাই, এই করপোরেশনের রাস্তা। গাড়িটাকে কি রকম করে বাঁচিয়ে রাখি জানেন? যেন পেটের ছেলে।

অভি—Birth, Copulation, Death!

গনে—শালা ভিজে সিগারেটের নিকুচি করিচি [সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দেশলাই ফেরত দেয়]

অভি—[দেশলাই খুব যত্ন করে পকেটে রাখে] বেঁচে থাকাটা কতগুলো ইমেজে পরিণত হচ্ছে। জ্রূণের নিঃসঙ্গতা—

গনে—ঢালবে! মাইরী, আর ঢাললে বাসখানা ভাগাড়ে যাবে। এ শহরে বাস করা দায়।

অভি—এমন যন্ত্রণা। তীব্র কিন্তু subdued—persistent অথচ unknowable.

গনে—এই তো সেদিনকেই একটা যন্ত্রণার ব্যাপার হল। বাস চালাচ্ছি—একস্প্রেস। জানেন তো একস্প্রেস চালান কি জিনিস। এক একটা ট্র্যাফিক লাইট পেরুচ্ছি, যেন জান লড়ে যাচ্ছে।

অভি—হয়তো এতক্ষণ সব শেষ হয়ে গেছে।

গনে—ঠিক আধ সেকেণ্ডের ব্যাপার। এই আমার একস্প্রেস ধক্‌পক্ ধক্‌পক্ করছে—এই ট্র্যাফিক লাইট—এখনও সবুজ, এখনও সবুজ—গেল গেল হলদে হয়ে গেল—দিলুম এ্যাকসেলেটারে এক লাথি কশিয়ে।

অভি—এখান থেকে ঐ bar-টা ফার্লং দুই হবে। ওরা সকলে এসে গেছে এতক্ষণ। যা জল রাস্তায়—ট্রাউজার মাটি হবে। ট্যাক্‌সি! ?

গনে—আমিও, বুঝলেন—ঠিক তাক্ বুঝে তুড়ুম ঠুকে দিলুম। বোঁ করে বেরিয়ে গেল আমার দোতলার একস্প্রেসখানা। বাসের লেডিস্‌রা পেছনে বসে হু হু করে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন। হঠাৎ কোত্থেকে একটা ছেলে ছুটে এসে সামনে পড়ল—ঐ হাজরা বরাবর।

অভি—ট্রাউজারটা তোলা যাবে না। জুতো খুলে লাভ নেই। ট্যাক্‌সি!

গনে—উঃ, ছেলেটা এই—ঠিক এইখানটায়—গাড়িটা স্ট্রেট তুলে দিলুম ফুটপাথে। মড়মড় করে ল্যাম্পপোস্ট চিৎ! লেডিস্‌রা চিৎকার করে চোখ ঢাকলেন। নাঃ—না স্যার, ছেলেটাকে মরতে দিইনি তাবলে।

অভি—এতক্ষণ হয়তো সব শেষ হয়ে গেছে।

গনে—শেষ হয়ে গেছে কী মশাই? গণেশ পাল বেঁচে থাকতে এতটা কেলেঙ্কারী হবার নয়। একটা জান্ নেবার আগে নিজের জান লড়িয়ে দেব। একস্প্রেস্ চালাই।

অভি—একটু হেঁটে গেলেই bar-টা পাওয়া যেত। কিন্তু—

গনে—আমাকেই সাস্‌পেণ্ড করল। [থুতু ফেলে] হারামী, খচ্চর! এ এক যন্ত্রণার চাকরী। কলজে মুঠোয় করে ঘোরা। আজ বাড়িতে মা ভাববে।

অভি—প্রতাপ না এলে [পকেট হাতড়ে] মুশকিলে পড়ব। যা ভেজাচ্ছে, অন্তত গোটা চারেক কড়া পেগ না খেলে গা গরম হবে না। শিরার মধ্যে আগুন জ্বালাবার ঐ একটাই উপায়। অথচ পকেট—

গনে—মাকে ককখনো অ্যাক্‌সিডেন্টের কথা বলি না। মা যা ভীতু!

অভি—এতক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে।

গনে—[ঘুরে অভিমন্যুকে ভাল ভাবে লক্ষ করে] তখন থেকে ঐ কথাটা বলছেন।

অভি—Death is a vulgar visitor.

গনে—কে শেষ হয়ে গেছে ?

অভি—বাবা।

গনে—কার ?

অভি—আমার। এবং a few hundred brothers and sisters await his death. Death! A wealthy man's death is always awaited without emotions.

গনে—উঃ! বাবা, বোঝাটোঝা যায় না যে।

অভি—My father, আমার বাবা মরে যাচ্ছে। সে এক prolonged undignified struggle—sitting round a living corpse. [হঠাৎ] We are all living corpses.

গনে—অ্যা! এঁর বাবা মারা যাচ্ছেন! কী শহর দেখুন, এমন আটকা পড়ে গেছেন—আহা। চলে যান—ভিজে ভিজেই চলে যান, ডুব জল তো নয়। বাবা ঐ একবারই মারা যাবেন। হয়তো এতক্ষণ—চলে যান, চলে যান—

অভি—…'And that all infamy can be condoled by pardon…'

গনে—[নিজে নিজে] বলিহারি ইংরিজি বলার ঘটা। [খানিকটা দেখে] সাজও করেছে বলতে হবে। পরিপাটির দাঁতকপাটি!

অভি—'When the hour comes she enters the dark cell
Of Death, and as a phantom of frail Breath
Re-born she, hateless, gazes upon death…'

গনে—হেই-ই ট্যাক্সি! ও রিক্সোওয়ালা—যাবে ? এঁর বাড়িতে বিপদ।

অভি—Bar-টা বেশি দূরে নয়। দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ভিজে যাব।

গনে—আপনার বাসার কথা বলছেন ?

অভি—Bar—মদের দোকান।

গনে—ও! তাই বলুন, শুঁড়িখানা—bar, জানি জানি। কিন্তু—সে কি ?

অভি—আছে নাকি শুঁড়িখানা ? আশেপাশে ?

গনে—বড় ছেলে ?

অভি—কার ?

গনে—বাবার ?

অভি—কে ?

গনে—আপনি ?

অভি—unfortunately হ্যাঁ।

গনে—এই-ই ট্যাক্‌সি! ভয়ানক জরুরী, বাবা মারা যাচ্ছেন। যাচ্চলে! দাঁড়াবে না। ব্রেক-ডাউনের ভয়, বুঝছেন না ? একবার ব্রেক-ডাউন হওয়া মানে সারাদিনের income যাওয়া। আমার যেমন টিরিপগুলো গেল।

অভি—ওরা হয়তো অপেক্ষা করছে।

গনে—কী রকম স্বার্থপর হয়েছে দেশটা শুনবেন ? সিদিনকে চালের জন্যে লাইন দিইচি, তা সে শ' দুই আড়াই লোক হব! সারাটা রাত দাঁড়িয়ে। এক শালার দোকানী বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে এসে সকাল-বেলা বলল—'চাল নেই!' তাচ্ছিল্য করে। ইচ্ছে হল দাঁতগুলো এক ঘুষিতে উপড়ে দিই। সকলেই জানে গুদোমে চাল ঠাসা। ডবল দামে ব্ল্যাকে বেচবে। আপনাদের পাড়ায় বোধ হয় এতটা নয়। আপনার এসব দেখলে ঠেঙাতে ইচ্ছে করে না ?

অভি—ট্যাক্‌সি! [ভেতর দিকে চেয়ে—উত্তেজিত] হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ডাকছি। ঐ যে ঐখানটায় যাব। ব্যাক করে গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত আসুন না ? ওহো—না, না—আমি অতটা যেতে গেলে জুতো ভিজে যাবে। [গাড়ি চলে যাবার শব্দ] চলে গেল! [আবার ভাবালু]

গনে—বলিহারি যাই জুতোর মায়া।

অভি—এতক্ষণে সব শেষ হয়ে গেল।

গনে—[থুতু ফেলে] মাইরী!

অভি—বাবার মরে যাওয়াটা এমন vulgar লাগছে।

গনে—মুখাগ্নি বড় ছেলেই করে।

অভি—আমি আমারই photographed অতীত frozen shots.

গনে—জন্মালেই মরতে হয়। কথাটা পৃথিবীর চাইতেও বুড়ো।

অভি—'Truth is the greatest teacher excepting tortune…'

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই অভিমন্যু কানে আঙুল দিয়ে কুঁকড়ে উঠল। 'মা, মা' বলে চেঁচিয়ে উঠে দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

ছুটে ঢুকল একটি ছেলে—ইন্দ্রনীল। হাতে বইখাতা। ছাত্র। দেখতে আর পাঁচটা ছেলের মতই। বেশবাস পরিচ্ছন্ন, মার্জিত। তার পেছনে পেছনে ছুটে ঢুকল একটি রোগা, লম্বা, ময়লা মেয়ে। কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত; সাজসজ্জা এলোমেলো। ভিজে পাতলা কাপড় গায় লেপটে আছে। সেদিকে নিজেই মাঝে মাঝে চাইছে। এ হল শ্রাবণী—ইন্দ্রনীলের সহপাঠিনী।

শ্রাবণী—ঝড়জলে এতদূর তো নিয়ে এলে। এবার প্রেমের কথাটথা কিছু বল।

ইন্দ্র—তোমাকে আনতে হয় না তুমি আস।

শ্রা—তুমি টানো। ইন্দ্রনীল! নী-ই-ল, নীল্ নীল্!

ইন্দ্র—পরীক্ষা এসে গেছে—ফার্স্ট ক্লাশ পেতেই হবে।

শ্রা—আমাকেও। কিন্তু তবু বল। কখন কী হয়ে যায়—মনে মনে। বল। শুনতে ভাল লাগে। একই কথা—নানাভাবে।

ইন্দ্র—বড্ড nag কর! খালি exclusive দেখা, কেবল exclusive হওয়া! কথাটথা ফুরিয়ে গেছে। দু'চারদিন দেখা না করে দেখা যাক না? একটা gap period না থাকলে মানুষ কত আর প্রেমের কথা invent করবে? পরীক্ষা এসে গেল।

শ্রা—[ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে] আমি unhappy, unhappy! আমায় এসব rude কথা বোলো না।

ইন্দ্র—আচ্ছা, আচ্ছা বলব না। কথা দাও আমি চলে গেলে পিছু নেবে না?

শ্রা—[সামলে একেবারে অন্য সুরে] নী-ই-ল্! তুমি এমন অসহায়! তুমি কী লিলুর কথা ভাবছ?

ইন্দ্র—কিচ্ছু ভাবছি না। [নিজে নিজে] নেই-আঁকড়া!

শ্রা—তাহলে, [আবার গলায় কান্নার আভাস] বল—আমাকে ভালবাস।

ইন্দ্র—কয়েকবার একসঙ্গে বলে নিলে যদি না কাঁদ তো বলছি—বাসি, বাসি, বাসি ! [নিজে নিজে] নেই-আঁকড়া।

শ্রা—বাসি ! ?

ইন্দ্র—বাসি, বাসি !

[বিদ্যুৎ চম্‌কানোর সঙ্গে সঙ্গে বাজ ডেকে ওঠে]

শ্রা—[কান ঢাকল] উঃ, মাগো !

ইন্দ্রনীল সরে গিয়ে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। স্টার্টার হ্যাণ্ডেল তুলে নিয়ে গণেশ যাব যাব করছে। দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে গেছে অভিমন্যু।

শ্রাবণী ছুটে ইন্দ্রনীলকে ধরতে গেলে সে সড়াৎ করে সরে গেল। শ্রাবণী এবার ছুটে গিয়ে অভিমন্যুকে ধরতে গেলে সে 'মা, মা' বলে উদ্‌ভ্রান্তের মত চেঁচিয়ে উঠে চলে গেল এক কোণে।

এতক্ষণে শ্রাবণী গনেশকে দেখতে পেয়েছে। এক মুহূর্ত থম্‌কে দাঁড়াল। তারপর ছুটে গিয়ে তাকে জাপটে ধরল।

গনে—করেন কি, করেন কি—হ্যাণ্ডেলটা ভারী, পড়ে যাব। দাঁড়ান, আহা, আপনার লাগবে যে—অত ভয় পাবার কী হল ?

শ্রা—আমি বড় একা—আমাকে ছাড়বেন না—please।

গনে—আপনার সঙ্গের সে লোক গেল কোথায় ?

শ্রা—আমি বড় একা।

গনে—দোকা গেল কোথায় ? ওদিকে এক ধাড়ি এক্ষুণি বাজ পড়তেই 'মা, মা' বলে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। হাসি পায়।

শ্রা—একা বড় একা। [গনেশকে আঁকড়ে ধরে] আসুন, একটু জলে হাঁটা যাক। আপনাকে আমার নিজের সব কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে।

গনে—ছাড়ুন, ছাড়ুন, কেউ দেখে ফেললে কী ভাববে ?

শ্রা—আপনিও একা।

গনে—আমি ? যাচ্চলে ! [শ্রাবণীকে ধরে থামের গায় দাঁড় করায়] এ-এ-এই, এইখানটায় দাঁড়ান দিকি। আপনার নরম হাতে স্টার্টারটা বিঁধে যেতে পারে। আমায় এবার যেতে হবে। [দোমনা হয়ে যাব যাব করে] সে দাদা গেলেন কোথায় ?

শ্রা—চলে গেছে। আপনি তো আছেন [হঠাৎ উচ্ছ্বসিত] আমি একা নই, একা নই !

গনে—[নিজে নিজে] দেরী হলে মা ভাববে। ভাবুক। দেখি না কী হয় ! মেয়েটা খাসা। শাড়িটা এমন করে পরেছে—!

শ্রা—ভয় করছে ! যেন নতুন কী ঘটবে মনে হচ্ছে। Premonition ! মজা হবে। আমি বলছি আপনাকে—মজা হবে।

গনে—ট্যাক্সি ডেকে তুলে দিই, কেমন ? পৌছে দিতে পারতাম। কিন্তু ঐ দেখুন ব্রেক-ডাউন বাস। যাবার উপায় নেই। এক্সপ্রেস চালাই।

শ্রা—এক্সপ্রেস্ ! বাঃ কি মজা !

গনে—মজা ? হাসালেন। চলুন ট্যাক্সিতে তুলে দিই।

শ্রা—আমি একা যাব না। কোথাও একা যাব না ! সারাক্ষণ কেন আমি একা হয়ে যাই ? [কাঁদো কাঁদো]

গনে—এ শহরে একা হওয়া যায় নাকি ? হাসালেন একটি ঘরে আমরা আটজন থাকি। একটু একা হতে ইচ্ছে হয়। একা হতে দেয় কই ? [নিজে নিজে] এই সব মেয়েদের দেখতে কিন্তু খুব ভাল লাগে।

শ্রা—যদি নিঃসঙ্গতা পেয়ে বসে—উঃ ! পৃথিবীটা কমে কমে এসে আমাদের মুঠোয় চেপে ধরেছে—উঃ। [নিজে নিজে] লোকটা বার্গম্যানের হিরোর মত ! ওর চেটালো wrist-টা—আহা, যদি—আহা ! হ্যাণ্ডেলটা ওর হাতে দারুণ sensational দেখাচ্ছে। আহা, বুকের ঢিপ্ ঢিপ্ শুরু হল !

গনে—[নিজে নিজে] বেচারা মেয়েটার কী কপাল ! দেখতেও বেশ। কাপড়ের টানগুলো—নাঃ তাকাব না ! কিন্তু—

শ্রা—[নিজে নিজে] একা নই, একা নই। [গণেশকে দেখে] সাদামাটা মাটি ঘেঁষা—যেন কোনো আদিবাসী ! বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে।

গনে—কিছুই হবার নয় ! মা ভাববে। ভাবুক। মেয়েটাকে একা ফেলে যেতে মায়া হয়—ট্যাক্সিতে তুলে দিই—চলে যাক ! ততক্ষণ ?

ততক্ষণ দেখি ! ছোঁয়া তো হয়েই গেছে। এরা বেশ। ভিজে কাপড়ে এমন দেখাচ্ছে। [হঠাৎ] বেল পাকলে কাকের কী ?

[অভিমন্যু এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। খুব তৎপর।]

অভি—ট্যাক্সি, ট্যাক্সি ! [ছুটে এগিয়ে আসে]

শ্রা—[ঘুরে অভিমন্যুকে দেখে অবাক] অভিমন্যু—এইখানে তুমি ?

অভি—আ—শ্রাবণী, পৃথিবীটা গোল।

শ্রা—সেদিন তুমি ওরকম করে চলে গেলে কেন ?

অভি—আ, পৃথিবীটা গোল ! ট্যাক্সি !

শ্রা—সারাক্ষণ পালিয়ে বেড়াও।

অভি—বাবার কাল থেকে বাড়াবাড়ি।

শ্রা—যখনই কোনো decision করতে হয়, বাবার অসুখটা বাড়িয়ে দাও। Escapist !

অভি—সবই জানা হয়ে গেছে। এখন কেবল repeatition.

শ্রা—আমাকে একা ফেলে যেও না অভিমন্যু !

অভি—মা বলছে বাবা মারা গেলে আমায় ঐ সব সন্ন্যাসী মার্কা ড্রেস পরতে দেবে না। কিন্তু I like the sublimity of that costume !

শ্রা—তোমায় দারুন মানাবে।

অভি—আজ সারাটা দিন কান্না আসছে। বাবাই বোধ হয় immediate cause. কিম্বা বৃষ্টি। কিন্তু ওঃ ! এখন যদি আমি একটু drink না করি—ট্যাক্সি ?

[বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই অভিমন্যু তৎপর।]

শ্রা—ওকি, ওকি ! যেও না। আর কি কিছুই বলবার নেই ?

অভি—ট্যাক্সি, ট্যাক্সি !—দেখা হবে। বৃত্তটা ঘুরলেই আবার দেখা হবে। এখন মুড্ নেই।

[অভিমন্যু ছুটে বেরিয়ে গেল। শ্রাবণী ইন্দনীলের দিকে চেয়ে পা বাড়াতেই সে গম্ভীর মুখে বইয়ের পাতা উল্টোতে উল্টোতে বেরিয়ে চলে গেল। শ্রাবণী গণেশকে চেপে ধরে।]

শ্রা—[চিৎকার] ভয় করছে !

গনে—[নিজে নিজে] মেয়েটা বেশ কিন্তু বড় কাঁদে। [শ্রাবণীকে] থাকেন কোথায় ?

শ্রা—আমি যাব না, কিছুতেই যাব না।

গনে—[হঠাৎ বাইরের দিকে চেয়ে লাফিয়ে] হেই ! কে রে [বাজখাঁই গলা] কে রে বাসে উঠছিস ? হেই, ভাগ্ ভাগ। আরে-রে-রে—হেডলাইট খুলে নিচ্ছে যে। মেরে হাড ভেঙে দেব। হেই, হেই !

[চলে যেতে গিয়ে গণেশ শ্রাবণীর নিঃসঙ্গ করুণ মুখের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল।]

গনে—থাকা গেল না। ট্যাক্সিতে তুলে দেব ?

শ্রা—[জোরে মাথা নেড়ে] না, না, না। ও আমি অনেক চড়েছি।

[বিদ্যুৎ চমকাল]

গনে—[ভীষণ ব্যস্ত হয়ে] আরে-রে-রে ! চলি ! হেই, হেই ! চলি ! আ-হা-হা ! চলি !

[গণেশ হ্যাণ্ডেলটা উঁচিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। শ্রাবণী একা একা কি করবে ভালো বুঝতে পারে না। গোল হয়ে ঘোরে।]

শ্রা—এমনি ভাসতে ভাসতে কোনোদিন কোনো মজায় পৌঁছনো যাবে না ?

[শ্রাবণী যেন কাকে খোঁজে। খুঁজবার মতো চোখে বার বার মাথা তুলে তুলে দেখে। বিদ্যুৎ চমকে মঞ্চ অন্ধকার হয়।]

যবনিকা

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

ভারত-পাক যুদ্ধ ও শান্তি

[সম্প্রতি আমার এক বন্ধু শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্যের কাছ থেকে এক চিঠি পেয়েছি। প্রাক্তন কমিউনিস্ট। জানতে চেয়েছিলাম কেমন আছেন ও দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কি ভাবছেন-টাবছেন। তারই উত্তরে এই চিঠি। চিঠিতে তাঁর অস্বাস্থ্য ও অর্থকষ্ট সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে। সেগুলি বাদ দিয়ে বাকী অংশটুকু যথাসাধ্য বানান সংশোধন করে ছাপতে দিলাম, অবশ্য তাঁর অনুমতিক্রমে। কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি। তাঁর চিন্তাধারা ও মতামত তাঁর নিজেরই, আমার নয়। অ. প্র. মি.]

শ্যামল ভট্টাচার্যের চিঠি

বন্ধুবর সুজিত রায়ের সঙ্গে দেখা হতেই যা ভয় করছিলাম ঠিক তাই ঘটল। নির্ঘাত প্রশ্ন করলে: "কি হে, শ্যামল, খুব তো শান্তি শান্তি করে গলা ফাটাতে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নয়, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নয়, বাধল তো ভারত-পাক যুদ্ধ। কি বলেছিলাম! এখন?"

বুঝলাম আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি। নিজের মনেই অপরাধবোধ আগে থাকতেই জেগেছিল। এক অব্যক্ত যন্ত্রণা মনকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। মাথার উপর ছাদ ভেঙে পড়লে বায়ুহীন ভগ্নস্তূপের মধ্যে যখন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে, অবস্থা অনেকটা সেই রকমই। তবে কি এতদিন ধরে যা কিছু বিশ্বাস করেছি, সদম্ভে প্রচার করে এসেছি, সব ভুল, সব মিথ্যা? যুদ্ধ কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে না, বরং আরো উগ্রতর সমস্যার সৃষ্টি করে। এমন কোনো আন্তর্জাতিক বিবাদই নেই আলোচনা বৈঠকের টেবিলে যার সমাধান হতে না পারে। শান্তিকামী শক্তিগুলি এখন যুদ্ধকামী শক্তিগুলির চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যাধিক ও অনেক বেশি জোরালো। সে যুগ চলে গেছে যে যুগ সম্বন্ধে ক্লাউসেভিৎস-এর সূত্রই ছিল বেদবাক্য: "যুদ্ধ হলো রাজনীতিরই জের টেনে চলা, শুধু অন্য উপায়ে।" রাজনীতি থেকে যুদ্ধে উদ্বর্তন এবং যুদ্ধ থেকে রাজনীতিতে অনুবর্তন, ইতিহাসের এই নিয়মটাই পালটে গেছে। রাজনীতি ও যুদ্ধের মধ্যে প্রকাণ্ড এক

দেওয়াল গেঁথে দিয়েছে "ইতিহাস"। সেই দেওয়াল পাহারা দিচ্ছে সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষ, যুগযুগান্ত ধরে যারা হয়ে এসেছে যুদ্ধের বলি। ক্রমশ আরো অধিকসংখ্যক লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠে শান্তির আওয়াজ উচ্চারিত হচ্ছে। সে যুগ চলে গেছে যখন ফিনান্স পুঁজির মালিক সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুম অনুসারেই পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হত। শান্তির সতর্ক প্রহরীরূপে সদাজাগ্রত রয়েছে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে সমাজতান্ত্রিক জগৎ। এই জগতে যুদ্ধের সপক্ষে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক প্রেরণা অবলুপ্ত। ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের বিরাট জয়লাভ ঘটেছে। সদ্য স্বাধীন দেশগুলির সমস্ত স্বার্থ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয়ই, স্থায়ী বিশ্বশান্তির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শুধু জনসাধারণের মধ্যেই নয়, দিকে দিকে পৃথিবীর বহুতর রাজবেদীতেও শান্তিদেবতাকে অধিষ্ঠিত দেখতে পাচ্ছি। এই সব কথা ভেবেছি, অনেককে বলেওছি বেশ একটু বক্তৃতার ঢংয়ে। চটে যেতাম যখন শুনে কেউ কেউ মুখ টিপে হাসত।

যখনই কারো মুখে শুনতাম, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, ক্ষিপ্ত হয়ে পড়তাম। একটু করুণাও বোধ করতাম এই সব লোকের বুদ্ধিহীনতায়। যুদ্ধের বিপদকে ঠেকানো অসম্ভব কেন? কেন? অবশ্যই সম্ভব। পৃথিবীর ভাগবাটোয়ারা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করবে, সে যুগ চলে গেছে। প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে পৃথিবী, সাবালক ও নাবালক দেশগুলিতে আর তা বিভক্ত নয়, সবাই সাবালক, শ্বেতকায় মানবের দায়ভাগ তামাদি হয়ে গেছে। রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের জায়গা জুড়ে বসেছে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। তারো একটা রাজনীতি আছে কিন্তু যুদ্ধের দিকে সে রাজনীতির কোনো অবশ্যম্ভাবী গতিপ্রবণতা নেই। বিশ্বশান্তির কাঠামোর মধ্যে তার জয়লাভও ঘটতে পারে আবার তাকে পরাজিতও করা যেতে পারে। কি তবে বর্তমানে যুদ্ধের বিপদের মূল কারণ? পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, এই দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে জাগতিক প্রতিযোগিতা. এর ফলে কি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী? কখনোই নয়। পারমাণবিক যুগে কোনো সমাজ-ব্যবস্থাই যুদ্ধের দ্বারা নিজের সম্প্রসারণ ঘটাতে পারে না বা সংকোচন রোধ করতে পারে না। পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, সরাসরি এদের সম্মুখসমর তো অচিন্তনীয়। কিন্তু বিপদ আসতে পারে অন্যদিক থেকে। কোনো একটি

বিশেষ জাতি যদি নিরস্ত্র শক্তিপরীক্ষার দ্বারাই হোক বা গৃহযুদ্ধের দ্বারাই হোক, পুঁজিতন্ত্রের বা আধা-পুঁজিতন্ত্রের অবলোপ করে সমাজতন্ত্র অবলম্বন করতে চায় অথবা সমাজতন্ত্রের অবলোপ করে পুঁজিতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন করতে চায় তাহলে একক্ষেত্রে শক্তিশালী পুঁজিতান্ত্রিক দেশের এবং অন্যক্ষেত্রে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক দেশের সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটতে পারে ও দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে আন্তর্জাতিক বিশ্বযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্ট হতে পারে। আভ্যন্তরিক সংঘাত বা গৃহযুদ্ধের সঙ্গে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের এই সর্বনাশা গ্রন্থিবন্ধনকে ছেদন করাই আজ শান্তিরক্ষার প্রধান কর্তব্য। তাই শান্তিরক্ষার দুটি সর্বপ্রধান সর্ত হলো, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং প্রতিটি জাতির পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। প্রথমটির আওতায় পড়ে পুঁজিতন্ত্রের ও সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা, বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভের জন্য যার প্রয়োজন অপরিমিত এবং অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদকে রোধ করার জন্যও। দ্বিতীয়টির আওতায় পড়ে আজো পরাধীন দেশগুলির জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও অর্জিত স্বাধীনতার রক্ষণ ও বর্ধন। সবার উপরে শেষ সত্য এই যে, স্থায়ী বিশ্বশান্তির জন্য চাই সর্বাঙ্গীণ ও জগদ্ব্যাপী নিরস্ত্রীকরণ।

এই মনোময় নৈয়ায়িক সৌধে বাস করতে করতে সৃষ্ট হয়েছিল এক ধরনের আধ্যাত্মিক ঔদ্ধত্য এবং যে সব হতভাগ্যেরা এর বাইরে বাস করে তাদের প্রতি একপ্রকার করুণামিশ্রিত অবজ্ঞা। কিন্তু তলে তলে এই সৌধে ফাটল ধরছিল, সুনিশ্চিত বিশ্বাসের যে শাল গায়ে জড়িয়ে ভেবেছিলাম শীতের কনকনে হাওয়া আমার কিছুই করতে পারবে না, সন্দেহ হতে লাগল সেটা এক অতি পুরাতন জীর্ণ কাঁথা যাতে সুতোর চেয়ে ফুটোর ভাগটাই বেশি। কথা, কথা, কথা! ধারণার স্বৈরতন্ত্র! যেসব থিওরেমের শেষ সিদ্ধান্তগুলি গোড়াতেই ধরে নেওয়া হয়েছে, কী দাম তাদের? শান্তির জটিল ও বিস্তৃত ভাবাদর্শকে ছুরি দিয়ে চিরে ফেললে দেখা যায়, তার মূল কথাটা এই যে, পৃথিবীর সবাই যদি শান্তি চায় তবেই শান্তি সম্ভব। কিন্তু যদি তারা না চায়? বলের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করা হবে, একথা তো যুদ্ধলিপ্সুরা চিরদিনই বলে এসেছে। আজ অবিকল ওই কথাটাই কি শান্তির গ্যারাণ্টি হয়ে উঠেছে? যতদিন এই ধরনের কথাবার্তা চলতে থাকবে ততদিন নিরস্ত্রীকরণের আলোচনা তো একটা প্রহসন মাত্র। প্রত্যেক রাষ্ট্রের

ভৌম অখণ্ডনীয়তাকে মান্য করতে হবে একথা বললে তো ধরেই নেওয়া হয় যে, সকল রাষ্ট্রের ভৌম সীমা সম্বন্ধে সবাই একমত। কিন্তু যদি তা না হয় এবং এই নিয়ে যুদ্ধ বাধে তাহলে একটি বিশেষ ভূমিখণ্ডে কোন্ রাষ্ট্রের অধিকার ন্যায্য, কে আক্রমণকারী এবং কে আক্রান্ত, এ বিচার কে করবে? ন্যায় যুদ্ধ ও অন্যায় যুদ্ধ, এই দুয়ের ভেদাভেদ নির্ণয় করবে কে? যদি প্রতি রাষ্ট্রই বলে, তার অস্ত্রসজ্জাটা আত্মরক্ষামূলক ও শান্তিকামী এবং প্রতিপক্ষের অস্ত্রসজ্জাটা আক্রমণাত্মক ও যুদ্ধকামী, কার কথা বিশ্বাস করব? জনসাধারণ নামে যে অবচ্ছিন্ন, মনগড়া ধারণা আমাদের মনে আছে তার সঙ্গে বস্তুজগতের মিল কতটা, তাদের শক্তি কতদূর? সত্যিই কি জনসাধারণ শান্তি চায়? রাষ্ট্রের প্রকাশ্য ও গুপ্ত প্ররোচকেরা জনসাধারণের মনকে পাভলোভীয় পন্থায় গড়েপিটে তৈরি করতে সর্বদাই ব্যস্ত এবং অবশেষে জনসাধারণের মুখপাত্র বলে অভিহিত দলগুলির চাপেই রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যুদ্ধের দিকে অমোঘভাবে এগিয়ে যায়। জেলার হয়েপড়ে তার বন্দীদের বন্দী এবং অলিম্পাসের দেবতারা গ্যানিমিডের পিঠ চাপড়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

এই সব অনুত্তরণীয় ও কুটিল প্রশ্নে ও সংশয়ে অন্তর যখন জর্জরিত, তখনও একটা বিশ্বাস মনে অটল ছিল। পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি শান্তির বিশাল প্রহরী, আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী, তারা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অনেক ঊর্ধ্বে, তারা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ তো করতেই পারে না, বরং সীমানা বা ভৌম অধিকার নিয়ে কোনো বিবাদ বাধলে তারা পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সামনে এই মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে যে, অনায়াসেই আলোচনার দ্বারা এই সব তুচ্ছ বিবাদের সমাধান করা যায়, এমনকি নিজের ন্যায্য ভৌম অধিকারের খানিকটা নিঃস্বার্থভাবে ছেড়ে দিয়েও। ভূম্যংশের ভাগাভাগি নিয়ে খেয়োখেয়ির চেয়ে অন্য দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ঐক্য ও হৃদ্যতা অনেক বড় জিনিস, ভেবেছিলাম মার্কসবাদ এই রকমই শিক্ষা দেয় এবং কার্যত লেনিন এই ধরনের অনেক আপস করেছিলেন। ভুল ভাঙল যখন চীন নেফা ও লাদাখ আক্রমণ করে ভারতকে উচিতমতো "শিক্ষা" দিয়ে তারপর "মহানুভবতা" দেখিয়ে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল, সৈন্যসামন্ত নিয়ে ১৯৫৯ সালের দখলী রেখায় সরে গেল, কলম্বো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল, তুমি তো বাপু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

নও, রীতিমতো পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে পড়েছ দেখছি, তোমার মধ্যে আন্তর্জাতিকতার ছিটেফোঁটাও আর নেই কেননা তুমি বিনা সর্তে আমাকে সমর্থন করো নি, আমি করছিলাম ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ. আর তুমি বলছিলে, এটা বড়ই দুঃখের বিষয়, ভারত ও চীনের বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে মিটমাট হওয়াই ভালো! সেই থেকে এই প্রশ্ন মনে কাঁটার মতো বিঁধেই আছে, তবে কি কমিউনিস্ট (অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক) রাষ্ট্রও অন্যান্য রাষ্ট্রের মতোই, যারা জাতীয় স্বার্থ, 'রিয়ালপলিটিক' বা 'জিও-পলিটিস' ছাড়া অন্য কিছুই বোঝে না? কমিউনিজম কাকে বলে? বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে কমিউনিস্টরা, অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ই মার্কসের রচনা, এঙ্গেলসের রচনা ও লেনিনের রচনা, এই প্রস্থানত্রয়ীর নামে দৈনিক একবার শপথ গ্রহণ না করে জলগ্রহণ করে না। কমিউনিজম কি সত্যিই এমন একটি শক্তি যাকে নিঃসংশয়ে শান্তির দুর্গ বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে? কোনো রাষ্ট্র নিজেকে কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলে শুধু সেই কারণেই কি মেনে নিতে হবে যে, সেটা বাস্তবিকই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র? উৎপাদনের যন্ত্রোপকরণের সমাজীকরণই কি রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের একমাত্র মাপকাঠি?

উপরন্তু আরো অনেক প্রশ্নই মনে জেগেছিল যেগুলিকে বলা যেতে পারে বিবেকের প্রশ্ন। ভারতে আমরা যারা শান্তি শান্তি বলে চেঁচামেচি করেছি, প্রকৃতপক্ষে শান্তির জন্য আমরা কি করেছি? গান্ধীজি একবার বলেছিলেন, যারা কাছের লোক, নিকটের লোক, তাদের প্রতি কর্তব্যপালনেরই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আমরা বিশ্বশান্তি বিশ্বশান্তি বলে চেঁচামেচি করেছি, কোরিয়া, তিউনিস, আলজিরিয়া, কিউবা ও ভিয়েৎনামে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য অনেক হৈ-চৈ করেছি কিন্তু ভারত-চীন শান্তি ও ভারত-পাক শান্তি, এই দুটি কাছের সমস্যা ও ঘরের সমস্যার সমাধানের জন্য কতটুকু করতে পেরেছি? ভারতের উপর চীনা আক্রমণের সময়ে ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম চীনের নেতাদের উপর, সমর্থন করেছিলাম ভারতকে ও ভারত সরকারকে, স্থির করলাম কমিউনিজম ফমিউনিজম ওসব ছেড়েছুড়ে দেবো, যা বুঝি না তা বুঝি বলে ভণ্ডামি করা শোভা পায় না। তবু মনের তলে তলে অদ্ভুত একটা বিবেকসংকটও অনুভব করেছিলাম। ঘৃণা করতে পারি নি চীনকে ও চীনের মানুষকে। তিব্বত ও চীন সম্বন্ধে ভারত সরকারের প্রচার-বিভাগের

তথ্যচিত্রগুলি এবং 'সন্ধ্যাদীপের শিখা' ও 'হকীকৎ' চলচ্চিত্র ভালো লাগে নি। সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল মনে, তবে কি দেশপ্রেমের অভাব আছে মনে, তবে কি কিছুদিন শান্তি শান্তি বলে চেঁচামেচি করার পর শান্তিকর্মী আর পাঁচজনের মতো দেশপ্রেমিক হতে পারে না? ভারত সরকারের ও বিশেষ করে চিরনমস্য জওাহরলাল নেহরুর উপর অভিমান ও ক্ষোভও জেগেছিল। এই আমাদের ভারত, গৌতম বুদ্ধের দেশ, সম্রাট অশোকের দেশ, কবীর ও চৈতন্যের দেশ, গান্ধীজির ও রবীন্দ্রনাথের দেশ বলে আমরা যার বড়াই করে থাকি, অসংলগ্ন, অজোটবদ্ধ দেশ, শান্তিকামী দেশ বলে যার নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, জাগতিক পরিষদে যার আসনের মর্যাদা কারো চেয়ে কম নয়, তারও কি কর্তব্য ছিল না সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে উঠে উদ্যোগী ও আগুয়ান হয়ে চীনের সঙ্গে সীমানাগত শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করা, এমনকি নিজের আইনগত ভৌম অধিকার কিছুটা ত্যাগ করেও? এখনও কি সে কর্তব্য নেই? চীন যতটা নিচে নেমে গেছে ভারতকেও কি ঠিক ততটা নিচে নামতেই হবে? সেই 'রিয়ালপলিটিক', 'জিও-পলিটিকস', 'পাওয়ার-পলিটিকস' যদি ভারতেরও ব্রত হয়, সেই ভৌম 'ফেটিশিজম'-এর দ্বারা যদি ভারতও চালিত হয়, সেই ঘৃণাতন্ত্রই যদি হয় ভারতেরও সাধনমার্গ, তাহলে নৈতিক মূল্যবোধের স্কেলে ভারতের স্থান চীনের উর্ধ্বে একথা কেমন করে বলি? কেনই বা আমি ভারতের নাগরিক বলে বিশেষ একটা গর্ববোধ করব?

এই যখন মনের অবস্থা তখন সুজিতের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, এই ভয়টাই সবচেয়ে বেশি করে করছিলাম। এখন ভাবতেই ভালো লাগে, কথা বলতে ইচ্ছা করে না। কিছুই তো বলার নেই। শুধু প্রশ্ন, সংশয় ও অন্তর্বেদনার পসরা সাজিয়ে তো আর পৃথিবীর মেলায় দোকান খোলা যায় না। ক্রেতা কোথায়? বিশেষত ভারতে। দেশের আপামর জনসাধারণই ফিলিস্টাইন। সবই ফরমুলায় বাঁধা। অত্যন্ত সীনিক্যাল কথাবার্তা যারা বলে তারাও দেখেছি সবাই একই কথা বলে, একই সুরে, একই ভঙ্গিমায়। মাতালরা ঠিক কোন্ খাদে পড়ে অজ্ঞান হবে, সেটাও বোধহয় আমার খুড়তুতো ভাই বিনোদবিহারী জ্যোতিষার্ণব গুণে বলে দিতে পারে। সুতরাং বলবো কি? কিছু বলতে গেলেই মনে পড়ে যায় অ্যারিস্টটলের উক্তি: "মানুষ হইল একটি সামাজিক জীব।" এটা নিয়ে আগে কত

বাড়াবাড়িই না করেছি। কিন্তু আজ কথাটাকে এত অশ্লীল মনে হয়। মানুষের নগ্ন দেহ ও নগ্ন মনই সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে অর্থপূর্ণ। কিন্তু এই প্রিভিলেজ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। না, ফ্যাশনেবল কথা সুজিতকে বলব না। আজ সুজিত যদি কিছু শুনতে চায় তো ভালোমতো শুনেই যাক। বললাম: "কি, তোমার বক্তব্যটা কি?"

"বলছিলাম, বাধল তো ভারত-পাক যুদ্ধ।"

"সেটা তো কাগজে নিত্যই পড়ছি।"

"এড়াবার চেষ্টা করো না শ্যামল। তুমি বলতে কি না, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ অচিন্তনীয়। দুই দেশের সমগ্র জাতীয় স্বার্থ শান্তির সঙ্গে জড়িত। আমিই বলেছিলাম ভারত-পাক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ঠিক কিনা বলো?"

"সেটা তো বিনোদও বলেছিল। গত ডিসেম্বারেই সে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, ১৯৬৫ সালের মাঝ বরাবর ভারত-পাক যুদ্ধ বাধবেই। আবার গতকাল বৃহস্পতির ও শনির মেজাজটা আঁচ করে বলে গেছে, ১৯৬৬ সালে পূর্ব বাংলা বিদ্রোহ করে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসবে। খড়িপাতা আমার পিতৃপিতামহের ব্যবসায় বটে, কিন্তু জানোই তো আমি ও-লাইন ছেড়ে দিয়েছি।"

"পালাবার চেষ্টা কোরো না শ্যামল। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নয়, এই কথাই তুমি দশ বছর ধরে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে এসেছো। তোমার কথাবার্তা আমার কাছে বরাবরই ছেলেভুলোনো মেঠো বক্তৃতার মতো মনে হয়েছে। শান্তির জগদ্ব্যাপী শিবির, শান্তির অর্থনৈতিক বুনিয়াদ, শান্তির জন্য জনসাধারণের আকুলিবিকুলি, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তিপ্রহরা, যুদ্ধের কোনো নৈতিক ভিত্তির একান্ত অভাব, এই সব কথার কোনো মানে হয় না। অনেক কিছু বিনা পরীক্ষায় ধরে নেওয়া, তারপর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা যে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নয়, শান্তির লড়াই জয়ী হবেই, এটা বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক নয়। তোমরা বিভিন্ন যুগে ইতিহাসকে গায়ের জোরে ভাগ করো এবং তারপর বলো, এক যুগের নিয়ম অন্য যুগে খাটে না, ইতিহাসের নাকি একটা সুনির্দিষ্ট ধারা আছে এবং সেই ধারা বেয়ে প্রতিটি সামাজিক ইউনিট বিকশিত হতে বাধ্য। বাজে কথা। 'যুগ', 'সামাজিক ইউনিট', এই সব পদের কোনো সংজ্ঞার্থ তোমরা দাও

না। এই সব অস্পষ্ট পদ ব্যবহার করে তোমরা যে-সব যুক্তি-তর্কের অবতারণা করো কেউ তার ঠিকমতো জবাব দিতে না পারলেই তোমরা এই আত্মসন্তুষ্টিতে স্ফীত হয়ে পড়ো যে, তর্কে তোমাদের জয় হলো। থিতিয়ে জিরিয়ে একবারও ভেবে দেখা আবশ্যক মনে করো না যে, তোমাদের তথাকথিত যুক্তির জবাব দেওয়াটাই অনেকে সময়ের অপব্যয় বলে মনে করে। তোমরা যদি কিছু প্রচার করতে চাও করো। কে তোমাদের বারণ করছে। কিন্তু এটা ভাবো কেন যে, তোমাদের প্রচার সত্ত্বেও আমি যদি যেমন ছিলাম তেমনই থাকি, তাহলে আমি হয়ে গেলাম অস্পৃশ্য? আচ্ছা সত্যি করে বলো দেখি, কেন তোমরা শান্তির প্রচার চালিয়ে তোমাদের ওই তথাকথিত জগদ্ব্যাপী শিবির গড়ে তুলতে চাও? ওতে তোমাদের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের, ওতে কমিউনিজমের প্রসারের পথ প্রশস্ত হবে, তাই না? তাহলে কি করে আশা করো, পুঁজিতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদ—ও দুটো অবশ্য একেবারেই এক জিনিস নয়—যাকে তোমরা ঘৃণা করো, যাকে তোমরা সারা পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ করতে চাও, সে তোমাদের আগ্রাসী শান্তির অভিযানের সামনে চুপচাপ বসে থাকবে? যদি ঐতিহাসিক লজিক বলে কিছু থাকে তাহলে সেটা এই কথাই বলে, তোমাদের শান্তির স্ট্র্যাটেজি ও ট্যাকটিকসের বিরুদ্ধে পুঁজিতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদ প্রতি পদেই যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি ও ট্যাকটিকস ব্যবহার করবে। এটাই বরাবর ঘটে এসেছে এবং এটাই ঘটতে থাকবে। শান্তির জন্যই তোমরা শান্তি চাও না। অন্য কিছুর জন্য শান্তি চাও। এটাই তোমাদের ব্যর্থতার মূল কারণ। এইজন্য প্রতিটি ক্রান্তিমুহূর্তেই শান্তিরক্ষার জন্য তোমাদের সোভিয়েত ইউনিয়নকে যুদ্ধের হুমকি দিতে হয়। তার জন্য চাই সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক শক্তির ক্রমাগত বৃদ্ধি। নইলে হুমকিটা জোরদার হবে না। আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে যাতে আত্মসমর্পণ করতে না হয় অবিকল সেই কারণেই আমেরিকা পাগলের মতো চেষ্টা করছে যাতে সামরিক শক্তিতে সে সর্বদাই সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে থাকতে পারে। তাই হাসি পায় নিরস্ত্রীকরণের ভণ্ড আলোচনার কথা শুনলে।

"এটা তুমি কিছুতেই বুঝতে চাও না, শান্তি আন্দোলনের মূলগত স্ববিরোধের—তোমাদের ভাষাতেই বলছি—এবং তার একান্ত ব্যর্থতার ফলেই

তোমাদের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ফাটল ধরেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের হুমকি ইদানীং অনেক ক্ষেত্রে তেমন জোরদার হয় নি, পারমাণবিক অস্ত্রের পাহাড় তৈরি করেও তাকে ব্যবহার করতে সে কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত, জাতীয়তাবাদের বিষ ঢুকেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে, সমাজবিকাশের নিয়মাবলীর অমোঘ বিধানকে কার্যকর করার জন্য, প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকতার মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করার জন্য শেষ রাশিয়ানটি পর্যন্ত প্রাণ বিসর্জন দিক, এ-ব্যাপারে ক্রুশ্চভের রাজত্বকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেমন যেন একটু অনীহা দেখা যাচ্ছিল। তাই মাও সে-তুং কিছুকাল মার্কসীয়-লেনিনীয় যোগাসনে বসে ঘোষণা করলেন, ঠিক আছে, শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের তালিকা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাম কেটে দাও, বলো সবাই, আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করে ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের ভিতর দিয়ে যে রাষ্ট্র পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা করতে চায়, সেটা বুর্জোয়া রাষ্ট্র। চীন পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে শুধু জমিয়ে রাখার জন্য ও ফাঁকা হুমকি দেওয়ার জন্য নয়, রীতিমতো ব্যবহার করার জন্য, ত্রিশ কোটি চীনবাসী জীবনদান করবে। তাতে কি হয়েছে! যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নয়? রাবিশ, যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতেই হবে, লেনিন বলে গেছেন, স্তালিনও বলে গেছেন, লেনিন চিরজীবী হোন!

"চীনের এই আদর্শগত সংগ্রামের সামনে দাঁড়িয়ে তোমরা কি করলে? কিছু বক্তৃতা করলে, পুস্তিকা ছাপালে, কিছু নব্যন্যায়ের কচকচানি দেখালে এবং তারপর ভীত হয়ে ঠাণ্ডাই ঘরে পুরে ফেললে নিকিতা ক্রুশ্চভকে, পৃথিবীর একমাত্র মানুষ সত্যসত্যই শান্তিপ্রতিষ্ঠাই ছিল যাঁর জীবনের ব্রত। ভণ্ডামি করে বললে, না, ক্রুশ্চভ বড় বাড়াবাড়ি করছিলেন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রকাশ্য আদর্শগত বিবাদ কিছুদিন বন্ধ রাখতে হবে প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকতার খাতিরে। হাঃ, হাঃ, হাঃ। প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকতা! কি জিনিস! সাপ, ব্যাঙ না বিছা! যে প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকতা পিকিং থেকে বলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন একটা বুর্জোয়া, পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আমেরিকার দালাল, তার নাম মুখে আনাও পাপ, সেই প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকতা আবার ক্রেমলিন থেকে বলে, হাজার হোক চীন তো একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, ওখানে যা দেখা যাচ্ছে তা কিছু নয়, হামটামের মতো একটা 'শিশুসুলভ রোগ' মাত্র। তখন সন্দেহ হয় বর্তমানে তোমাদের ওই বিখ্যাত প্রলেটারীয়

আন্তর্জাতিকতার কোনো প্রকৃত কনটেন্ট আছে কি? ওটা শুধুই একটা বুলি অউড়ে যাওয়া, নিছক আত্মপ্রতারণা। আসলে তোমরা মাও সে-তুংয়ের প্রকৃত খেলাটিকেই বুঝতে পারো নি। ওটা একটা রীতিমতো ঐতিহ্যসম্মত চৈনিক ক্রীড়া। তোমরা কি মনে করো, মাও সে-তুং সত্যসত্যই বিশ্বাস করেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন একটা পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র? আদৌ তা বিশ্বাস করেন না। তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি তোমাদের সকলকে কড়ে আঙুলে জড়াতে পারেন। আসলে তিনি চান সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর চাপ দিয়ে তার শান্তিনীতিকে চুরমার করে দিতে। যে-কোনো যুদ্ধের সম্ভাবনা যেখানেই দেখা দিক না কেন, সেখানেই তিনি তাকে উস্কানি দেবেন এবং তারপর সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটা বিড়ম্বনাময় অবস্থায় ফেলে তাকে টিটকারি দেবেন। কিন্তু চীনের যাতে অযথা বলক্ষয় বা লোকক্ষয় না হয় সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যুদ্ধ ও শান্তি! শান্তি ও যুদ্ধ! তোমরা এটাকে শুধু পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যেকার ব্যাপার বলেই ধরে নিয়েছো। কিন্তু যুদ্ধ তো আজো নানা কারণেই ঘটতে পারে এবং অনেকগুলি কারণ তো প্রাচীন কাল থেকেই কাজ করে আসছে। এই কথা ভুলে গেছো বলেই ভারত-পাক যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তোমরা যথেষ্ট অবহিত ছিলে না। এই তো দুটি রাষ্ট্র দেখছি যাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধার কোনো অর্থনৈতিক কারণ নেই, পঞ্চবার্ষিক যোজনার সাফল্য ও জাতীয় অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, এই সমস্যা নিয়েই তাদের ব্যস্ত থাকা উচিত। এই দিক থেকে কেউ কারো অন্তরায় নয়। অন্ধ জাতীয়তাবাদ বা ধর্মীয় উন্মাদনা যে অর্থনৈতিক বা এমনকি প্রকৃত ও যুক্তিসঙ্গত রাজনৈতিক স্বার্থের হিসাবনিকাশ না করেও রাষ্ট্রকে যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে, একথা তোমরা ভুলে বসে আছো। তাই কিছুই করতে পারো নি এই যুদ্ধকে নিবারণ করার জন্য। ভুল দিক থেকে দেখেছিলে এই যুদ্ধের সম্ভাবনাকে। খালি সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার ও ব্রিটেনের উস্কানি সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করে দিতে দুই দেশের মানুষকে। যে-সব আভ্যন্তরিক শক্তি দুই দেশকেই যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে-সম্বন্ধে কোনো কথাই বলো নি। এইগুলিই যে অবশ্যম্ভাবীরূপে দুই দেশকেই পারস্পরিক যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে একথা তুমি বোঝো নি, আমি বুঝেছিলাম। তুমি জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা তুলে এই ব্যাপারটাকে

ধামা-চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছো। এখন তো যুদ্ধ বাধল। তোমার প্রতিক্রিয়াটা কি? তুমি কি পক্ষাপক্ষ অবলম্বন না করে…"

সুজিত একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে আর তাকে থামানো যায় না, তার বক্তৃতার মধ্যিখানে কেউ যে দু'য়েকটা উটকো মন্তব্যও করবে সে সুযোগও সে কাউকে দেয় না। একটা সুযোগ পেয়ে তখনই তাকে থামিয়ে দিলাম. বললাম, "কি বললে? পক্ষাপক্ষ অবলম্বন? তবে শোনো, পরিষ্কার ভাবে বলছি, আমি ভারতের পক্ষে।"

"তাই নাকি?" সুজিত একটু ব্যঙ্গের সুরে মন্তব্য করলে, "তাহলে অবশেষে পেট্রিয়ট হয়ে উঠলে, সেই পাপীতাপী দেশপ্রেমিক! তুমিই না সেই শ্যামল ভট্টাচার্য যে বলতো তার ইষ্টমন্ত্র হলো ডক্টর জনসনের বাণী: "Patriotism is the last refuge of scoundrels!" নোটবুকে লিখে রেখেছো, রোজ একবার করে পড়ো:"

"ইডিয়টের মতো কথা বলো না। কলেজে ইংরাজি সাহিত্য পড়াও, তোমার কাছ থেকে ইংরাজি ভাষা সম্বন্ধে আর একটু বেশি জ্ঞান প্রত্যাশা করেছিলাম। ডক্টর জনসন কাউকে পেট্রিয়ট হতে নিষেধ করেননি, স্কাউণ্ড্রেল হতেই নিষেধ করেছিলেন। শুধু দেশপ্রেম কেন, ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, ইসলাম খ্রীষ্টধর্ম, অহিংসা, গান্ধীবাদ, এমন কি মার্কসবাদ, সবই স্কাউণ্ড্রেলদের শেষ আশ্রয় হতে পারে। তার মানে এমন নয় যে, এই জিনিসগুলি খারাপ। শুধু স্কাউণ্ড্রেলিজমটাই নিন্দনীয়।"

"এমন কি, মার্কসবাদ! এ কি কথা শুনি আজ শ্যামল ভটচায? তুমি যে অবাক করে দিলে!"

"কেন? অবাক হবার কি আছে? আমি তো এখন আর মার্কসবাদী নই। ছিলাম বটে এক কালে কিন্তু তেমন ভাল মার্কসবাদী কোনোদিনই ছিলাম না। পার্টি লাইন সম্বন্ধে শেষতম বিবৃতি মুখস্থ করে যতটা কমিউনিস্ট হওয়া যায় ততটাই ছিলাম। এখন আর তাও নই। কাজেই তুমি যে বক্তৃতার ঝড় বইয়ে দিলে তার ধাক্কা এখনও সামলাতে পারিনি বটে তবে তাতে 'তোমরা' 'তোমরা' বলে যে খোঁচাগুলি দিয়েছিলে সেগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু সে কথা যাক। মার্কসবাদ সম্বন্ধে বিচার করার ক্ষমতা যে বেশি নেই তবে আগে যতটুকু ছিল এখনও ততটুকু আছে। স্কাউণ্ড্রেলিজম সম্বন্ধে বিচার করার ক্ষমতা ও সাহস আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

তাই যখন মার্কসবাদের নামে চীনের নেতাদের বলতে শুনি, সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র, একটা মস্কো—ওয়াশিংটন অ্যাকসিস গড়ে উঠেছে, ভারত একটা সাম্রাজ্যবাদী, নয়া-উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র, কাশ্মীরী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাই, ভারতই পাকিস্তানকে আক্রমণ করেছে ঠিক যেমন বাষট্টি সালে চীনকে আক্রমণ করেছিল, ঠিক যে মুহূর্তে কিউবার ব্যাপার নিয়ে সোভিয়েত-মার্কিন সংঘাতের ফলে বিশ্বযুদ্ধ বাধো বাধো হয়েছিল অবিকল সেই সময়ে "মহানুভবতা"-র সঙ্গে নেফা আক্রমণ না করলে প্রলেটারীয় বিশ্ববিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণ পার হয়ে যেতো, যে প্রেসিডেন্ট আয়ুব ইসলামের নামে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, সিয়াটো ও সেণ্টো চুক্তির দ্বারা মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যিনি জোটবদ্ধ এবং পূর্বকালের সেই পচা ও দুর্গন্ধ প্যান-ইসলামিজমের আশ্রয় নিয়ে যিনি তুর্কী, ইরান ও ইন্দোনেশিয়ার কাছে অস্ত্রসাহায্য প্রার্থনা করছেন, অবিকল সেই প্রেসিডেন্ট আয়ুবই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শিবিরের বিরাট নেতা এবং তাঁর স্থান মাও সে-তুংয়ের ঠিক নীচেই, তখন বলতে বাধা কি যে, Marxism is the last refuge of scoundrels। এতে মার্কসবাদের নিন্দা করা হয় না, ভণ্ডামির সঙ্গে মার্কসবাদী বুলি আউড়ে যারা যতটুকু রাজনীতিক স্কাউণ্ড্রেলিজমের অনুষ্ঠান করে তাদের ঠিক ততটুকুই নিন্দা করা করা হয়, বেশিও নয়, কমও নয়।"

"তাহলে চীন পাকিস্তানকে সামরিক শক্তির বলে কাশ্মীর দখল করতে এবং ভারত আক্রমণ করতে উস্কানি দিয়েছে, একথা স্বীকার করো ?"

"সন্দেহ কি, এ বিষয়ে।"

"তবে এখন তুমি আর বলতে চাও না যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি শান্তি-রক্ষার দুর্গ ? পথে এসো। অথচ একদিন আমি একথা বললে তুমি কেবল আমাকে মারতে বাকী রাখতে।"

"ভুল করছো সুজিত। ও বিষয়ে এখনও আমার মত বদলায়নি। আমি চীনকে বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে মনেই করি না। শুধু অর্থনীতিক মানদণ্ডেই রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক চরিত্রকে বিচার করা ভুল। রাজনীতিক বিচারও আবশ্যক। হয়ত আরো এগিয়ে বলা যেতে পারে, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিচারও আবশ্যক। চীনে সমাজতন্ত্রের অর্থনীতিক বনিয়াদ তৈরী হয়েছে, কিন্তু চীনের রাজনীতিক উপরতলাতে যাঁরা ক্ষমতা দখল করে কায়েমী

ভাবে অধিষ্ঠিত, তাঁরা চীনকে বানিয়েছেন একটি ক্ষমতাদৃপ্ত, জাতীয়তাবাদী, অতি-শোভনিস্ট যুদ্ধকামী রাষ্ট্র। চীনের রাষ্ট্রনীতিতে আন্তর্জাতিকতার লেশমাত্র নেই, চীনের নেতাদের উক্তিতে সত্যের লেশমাত্র সন্ধান পাওয়া যায় না। সর্বদাই তাঁরা ডবল-স্ট্যাণ্ডার্ড প্রয়োগ করেন। তাঁরা বলছেন, কাশ্মীরের জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া উচিত। তিব্বতের জনগণকে কেন এই অধিকার দেওয়া হবে না? মোঙ্গোলিয়ার জনগণকে কেন এই অধিকার দেওয়া হবে না? মোঙ্গোলিয়ার পার্টিশনকে চিরস্থায়ী করা হচ্ছে কোন্ মার্কসীয় নীতি অনুসারে? লেনিন ও স্তালিন পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে প্রতিটি সংখ্যালঘু জাতিকে বা অনুজাতিকে রাষ্ট্রপরিহারের অধিকার দেওয়া উচিত। চীনের সংবিধানে গোড়া থেকেই এই সুস্পষ্ট নির্দেশ লঙ্ঘিত হয়েছে। কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ! কবে থেকে কাশ্মীরের জনগণ এই মার্কসীয় অধিকার লাভ করল? দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৯-৫৯ দশকে বেচারী কাশ্মীরীদের এই অধিকার ছিল না। ১৯৫৯ সালে ভারত-চীন সীমানা বিবাদ প্রকাশ্যে উগ্রতর হওয়ার সময় থেকেই কাশ্মীরের লোকেরাও এই অধিকার অর্জন করতে শুরু করল, এবং তারপর ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের পরেই মাওলিখিত ইতিহাসের বিধান কাশ্মীরী জনগণকে এই অলঙ্ঘনীয় ঐশ্বরিক অধিকারে ঐশ্বর্যশালী করে তুলল। চীন-ভারত অথবা তিব্বত-ভারত সীমান্তরেখাটা ঠিক কোন্খান দিয়ে টানা হবে এই প্রশ্নের উপরই নির্ভর করছে কাশ্মীরের লোকেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে কিনা, মহান্ মাও সে-তুংয়ের এই অপরূপ মার্কসবাদের কথা শুনলে মনে হয় এ তো সেই ছোটবেলায় নারানমাসির মুখে যা শুনতাম ঠিক তাই, 'উরুত দিয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেল রে বাবা'! সব চেয়ে মজার ব্যাপার কি জানো স্তম্ভিত! পাকিস্তানের নেতারা নিজেরাও কোনোদিন কাশ্মীরের লোকেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা বলেননি। তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে বরাবর চেয়েছেন বলপ্রয়োগের দ্বারা কাশ্মীর দখল করতে। ভারতের সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরে যাওয়ার আগেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনী শ্রীনগরের উপকণ্ঠ পর্যন্ত এসেছিল। সামরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পাকিস্তানের নেতারা আওয়াজ তুললেন, কাশ্মীরে গণভোট নেওয়া হোক। এই দাবী কি কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল? আদৌ নয়। যেহেতু কাশ্মীরের লোকেদের অধিকাংশই

মুসলিম তাই তাদের স্থান পাকিস্তানে, ভারতীয় ইউনিয়নে নয়, এটাই পাকিস্তানের নেতাদের বক্তব্য। অর্থাৎ কাশ্মীরের লোকেরা একটা জাতি বা অনুজাতি নয়, তারা পাকিস্তানের মুসলিম নেশনের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যদি কাশ্মীর একটা বিশিষ্ট জাতিই না হয়, তবে লেনিন-স্তালিন-কথিত জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কাশ্মীরের ক্ষেত্রে কি করে প্রযোজ্য হয়? এ প্রশ্ন পিকিংয়ের ছদ্মমার্কসবাদীদের গুপ্ত বৈঠকে উঠেছিল কিনা ঈশ্বরই জানেন। আমি কি করে জানবো? তবে এইটুকু অন্তত খুব পরিষ্কার যে, চীনের জাতীয় স্বার্থে মাও সে-তুং ও তাঁর পারিষদবর্গ স্থির করলেন, পাকিস্তানের মধ্যযুগীয় দ্বিজাতিতত্ত্বকে একটা মার্কসীয় ন্যায্যতা দান করতে হবে। চীনা কমিউনিজম এখন দুটি মাত্র মূল সূত্রে এসে দাঁড়িয়েছে: (১) "বিশ্বের শ্রমিকগণ এক হও (সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের বিরুদ্ধে); (২) শ্রমিকদের কোনো পিতৃভূমি নেই (চীন ছাড়া)"। তাই পিকিংয়ের নেতারা যখন সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে বজ্রনিনাদ করেন তখন এক এক সময়ে ইচ্ছা হয়, তাঁদের বলি, স্যার—কমরেডগণ, আপনারা তো মার্কসবাদকে একেবারে কেটেকুটে কবরস্থ করেছেন, তাকে সংশোধন করার সুযোগটুকু পর্যন্ত রাখেননি, তবে বৃথা কেন চিন্তিত হচ্ছেন?

"কিন্তু একদিন তুমিও তো বলতে, কাশ্মীরে গণভোট নেওয়ার ব্যাপারে রাজি হওয়া উচিত।"

"হ্যাঁ বলতাম, এমন কি সেদিন পর্যন্তও। তবে কাশ্মীরকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া উচিত একথা কোনোদিন বলিনি। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের মধ্যে নিহিত আছে নিজেদের স্বাধীন হওয়ার অধিকার। কাশ্মীরের পক্ষে ওটা সম্ভব নয়। স্বাধীন কাশ্মীরের দুঃস্বপ্ন মহারাজা হরি সিংও দেখেছিলেন আবার তার অনেক পরে শেখ আবদুল্লাও দেখেছিলেন এবং হয়ত এখনও দেখছেন। ওটা অবাস্তব, অসম্ভব। ইতিহাসের এমন অনেক প্রেসক্রুপশন আছে যেগুলিকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না, যত তিক্তই তারা হোক না কেন। কি জানো সুজিত, তোমার কাছে অকপট স্বীকারোক্তি করি, কাশ্মীর সমস্যাকে বরাবরই আমি ভারত-পাক শান্তির পরিপ্রেক্ষিতেই দেখে এসেছি। মহারাজা হরি সিংকে আমি কোনোদিন ক্ষমা করতে পারিনি। তিনি সাতচল্লিশ সালের ১৫ই আগস্টের অব্যবহিত পরেই যদি স্থির করে ফেলতেন, পাকিস্তানের দিকে চলবেন না ভারতের দিকে চলবেন তাহলে

কোনো গোলমালই হতো না। দু'পক্ষই তা মেনে নিতো। অন্তত তাই বিশ্বাস করি, জানি না সে বিশ্বাস ঠিক কি না। কিন্তু তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পুতুল হিসেবে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলেন। তারপর শ্রীনগরের যখন যায় যায় অবস্থা তখন তিনি আবেদন করলেন ভারতভুক্তির জন্য। অন্তিম কালে সে আবেদন ভারত সরকার যখন গ্রহণ করলেন তাতেও সুখী হইনি। হরি সিং ছিলেন অত্যাচারী রাজা। প্রজাপীড়ন ছাড়া তিনি আর কিছু বুঝতেন না। বর্তমান আজাদ কাশ্মীরের কোনো কোনো জায়গায় কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তির আগেই সত্যকার প্রজাবিদ্রোহ ঘটেছিল বলেই দুয়েকজন ঐতিহাসিক মনে করেন। তারপর ভারত সরকারের বিরুদ্ধে এ অভিযোগও মনে জেগেছিল, যুদ্ধই যদি করতে গেলে, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই করলে না কেন, সামরিক সিদ্ধান্ত সম্ভব নয় বলেই কি শান্তির নামে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দরবারে হাজির হলে? এটা ভাল যুদ্ধনীতিও নয়, ভাল শান্তিনীতিও নয়। গেলেই যদি তবে কেন একথা বললে যে, কাশ্মীর সম্পর্কে একটা ভারত-পাক বিবাদ তোমাদের সামনে উপস্থিত করছি! কি বিবাদ? কিসের বিবাদ? আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ভারতভুক্তি সম্বন্ধে হরি সিংয়ের সিদ্ধান্তের বলেই যদি জম্মু ও কাশ্মীরের উপর ভারতের সার্বভৌমতা সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তবে কোনো বিবাদের লেশমাত্র অস্তিত্বও ছিল না। সরাসরি বলা উচিত ছিল, পাকিস্তানকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করো এবং কাশ্মীর থেকে তার সৈন্যবাহিনীকে সরানোর ব্যবস্থা করো, নচেৎ কাশ্মীরে যুদ্ধের আগুন জ্বলতে থাকবে, নিভবে না। যদি শান্তির জন্যই ভারত ১৯৪৯ সালের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল তাহলে কাশ্মীরের গণভোট নেওয়ার ব্যাপারে সে সময়ে তার কোনো রকম দ্বিধাগ্রস্ততা দেখানো উচিত হয় নি।

"তুমি বিদ্রূপ করে বলছিলে, আমি হঠাৎ দেশপ্রেমিক হয়ে পড়ে বর্তমান ভারত-পাক যুদ্ধে ভারতের পক্ষাবলম্বন করছি। My country, right or wrong, এটাই এখন আমার জপমন্ত্র। কথাটা ঠিক নয় সুজিত। নিজের দেশকেও কঠিন ভাবে বিচার করেছি, এমন কি তার প্রতি অবিচারও করেছি। তুমি বলেছো, ভারত-পাক শান্তির জন্য আমরা শান্তিকর্মীরা কিছুই ভাবি নি, কিছুই করি নি। যদি বলো, সাফল্যের সঙ্গে কিছুই করতে পারি নি, তাহলে কথাটা মেনে নিতে পারি। কিন্তু যদি আমাদের অন্তরের দিকে চাইতে,

দেখতে পেতে সেখানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষ ছিল না, আজো নেই, দেখতে পেতে ভারত-পাক শান্তির জন্য কি রকম আকুলিবিকুলি, কত উদ্ভট জল্পনা-কল্পনা, কী সুতীব্র ও দুঃসহ বিবেকসংকট। পাকিস্তানকে সর্বদাই ভেবেছি নিজের অপর মাতৃভূমি। স্বদেশের সরকারকে কোনোদিন ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দিই নি। তাকে সন্দেহ করেছি, তার বিরুদ্ধে অভিমান করেছি। আজ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান বলছেন, ভারত ও ভারত সরকার কোনোদিন মুসলিম পিতৃভূমি পাকিস্তানকে মেনে নেয় নি, সর্বদাই তাকে শত্রুরাষ্ট্র বলে মনে করে এসেছে, সর্বদাই ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে কি করে পাকিস্তানকে ধ্বংস করা যায়। অতি নোংরা এবং ষোল-আনা মিথ্যা কথা। তবু একথা অস্বীকার করতে পারি নি, ভারতেও এমন সব শক্তি আছে যারা পাকিস্তানের অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারে নি, যারা ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বলে মনে করে, যারা ভারতের মুসলিম নাগরিকগণকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক অথবা অনাগরিক বলে মনে করে। অভিমান হয়েছে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে এই কথা ভেবে যে, তাঁরা এই সব অশুভ শক্তিগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ ও সক্রিয় নন। তাঁদের রাজনীতিক প্রজ্ঞা সম্বন্ধেও সন্দেহ জেগেছে। বারংবার একথা মনে হয়েছে, কেন তাঁরা ষোল বছর ধরে চলে আসা বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর লোকের কাছে জোর গলায় বলছেন না, যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর কাশ্মীরকে পার্টিশন করতে ভারত প্রস্তুত আছে। কেন এই আইনি রূপকথাকে আঁকড়ে থাকা যে, আজাদ কাশ্মীর সমেত সমগ্র কাশ্মীরের উপর ভারতের সার্বভৌমতা অটুট ভাবে বিদ্যমান? ভারত-পাক যুদ্ধ ছাড়া তো আর এই রূপকথাটা সত্য হয়ে উঠতে পারে না। এই সব দেশদ্রোহী চিন্তাও মনের মধ্যে পোষণ করেছি। তার জন্য একটু করুণাও কি ভিক্ষা করতে পারি না?

"তবে আজ কেন ভারতের পক্ষাবলম্বন করছি? কেন এই যুদ্ধকে সমর্থন করছি? এটা ন্যায়যুদ্ধ। এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই ও থাকতে পারে না যে, পাকিস্তানই আক্রমণকারী ও ভারতবর্ষ আক্রান্ত দেশ। ভারত বারংবার পাকিস্তানকে বলেছে, এসো no-war চুক্তি স্বাক্ষর করি। পাকিস্তান রাজি হয় নি। ষোল বছর ধরে পাকিস্তান অবিশ্রান্ত ভাবে কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি রেখা লঙ্ঘন করে এসেছে এবং আন্তর্জাতিক সীমানাকেও সর্বত্র অশান্ত অবস্থায় রেখেছে। কচ্ছ সীমান্ত চুক্তির কালি না শুকোতেই পাকিস্তান হাজার হাজার

সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীকে যুদ্ধ বিরতি রেখার এ পারে পাঠিয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক সীমানা রেখা লঙ্ঘন করে সাঁজোয়া বাহিনীকে বিপুল আকারে চম্ব এলাকায় পাঠিয়েছিল। এ সব তথ্য প্রত্যেক শান্তিকামীকে চিন্তা করে দেখতে হবে। শান্তির নামে এই যুদ্ধকে যদি কেউ সমর্থন না করে তাহলে এ কথা ও বলবো, "peace is the last refuge of scoundrels"। সুদৃঢ় ও অনমনীয় চিত্তে ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া শান্তি প্রচেষ্টার অবিভাজ্য অঙ্গ।

"তাহলে তুমি যুদ্ধটাকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে চাও ?"

"উল্টে আমি চাই, যুদ্ধটা আজই বন্ধ হোক, এখনই বন্ধ হোক। এই যুদ্ধ দুই দেশের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। চীন, ইন্দোনেশিয়া, তুর্কী, ইরান প্রভৃতি যে সব দেশ এই যুদ্ধের আগুনে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে, এই যুদ্ধকে প্রসারিত করতে চাইছে, তারা ভারত ও পাকিস্তানের শত্রু, বিশ্বমানবের শত্রু।"

"কিন্তু ইউ. এন ? এতদিন তো তুমি বলতে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ওরাই পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উস্কানি দিয়ে এসেছে, ইউনোতে ষোল বছর ধরে কাশ্মীর সমস্যাকে সযত্নে জিইয়ে রেখে তারা ভারত-পাক যুদ্ধের ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে।"

"পাকিস্তানকে উস্কানি দেওয়ার ব্যাপারে আমেরিকা ও ব্রিটেন নিরপরাধ নয়। পাকি-মার্কিন সামরিক চুক্তি যে ভারত-পাক যুদ্ধ বাধানোর ষড়যন্ত্র, এ কথা আমরা শান্তিকর্মীরাই সব চেয়ে জোর গলায় এবং প্রথম থেকেই বলেছিলাম, তোমরাই স্তম্ভিত, এ কথা শুনে হাসতে। বলতে কথায় কথায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সব ব্যাপারে টেনে আনা কমিউনিস্টদের একটা ম্যানারিজম হয়ে পড়েছে। দেশ বিভাগ করে এবং দেশীয় রাজন্যবর্গকে 'ক্ষণিক সার্বভৌমতা' নামক সোনার পাথরবাটি দান করে ব্রিটেন ভারত ছাড়ার পর থেকে বরাবরই পাকিস্তানকে তলে তলে বলে এসেছে, লেগে যাও ভারতের বিরুদ্ধে, আমি তোমার পিছনে আছি। কমিউনিজম ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু আমার এই মতামত ঠিক বলে এখনও মনে করি।"

"অথচ ইউনো-র যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সম্মতি আছে। কি তোমার ব্যাখ্যা ?"

"ব্যাখ্যাটা অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু যুদ্ধবিরতি অপেক্ষা করতে পারে না। যে বলে শান্তি চায়, যুদ্ধ থামাতে চায়, তার অভিসন্ধি, অতীত ও বর্তমান দুষ্কার্য,

শ্রেণী চরিত্র, এই সব কিছু সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা শান্তিকর্মীর পক্ষে পাপ। আমি ভারত-পাক শান্তি সম্বন্ধে আমেরিকা ও ব্রিটেনের আন্তরিকতাকে মেনে নিচ্ছি, মেনে নিতে বাধ্য। যদি শয়তান স্বয়ং খুর ও শিং সমেত এসে বলে, আমি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তিস্থাপনা করতে এসেছি, আমি তাকেও অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত আছি। আমেরিকা ভিয়েৎনামে শান্তি চায় না কিন্তু ভারতীয় উপ-মহাদেশে শান্তি চায়, এটা খুবই সম্ভব। এর ব্যাখ্যা কি তা আমি জানি না। ব্যাখ্যা! ব্যাখ্যা! ব্যাখ্যা! পৃথিবীতে যত রকমের ক্ষ্যাপামি আছে, ব্যাখ্যামিই তাদের মধ্যে সব চেয়ে হাস্যকর।"

"তাহলে তুমি মনে করো ইউনো-র যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবটা ন্যায়সংগত?"

"নিঃসন্দেহেই।"

"তাহলে ইউনো-র হাতে ভারত একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দিল না কেন? বেচারী উ থণ্টকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হলো কেন? কেনই বা লালবাহাদুর শাস্ত্রী যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণের ব্যাপারে দু দু'টো সর্ত আরোপ করলেন?"

"ভারত বিনা সর্তেই যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।"

"কিন্তু উ থণ্ট তো তা বলছেন না। তিনি তো ফিরে গিয়ে বলেছেন, কোনো পক্ষই বিনা সর্তে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করে নি।"

"দেখো সুজিত, আমি নিজের দেশকে কঠিন ভাবে বিচার করি এবং এ ব্যাপারেও করেছি। তুমি আমাদের শান্তিকর্মীদের বিবেকসংকটকে বুঝবে না। কি বলছিলে? ভারত সর্তাধীনে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল, থণ্টের এই রিপোর্ট? দীর্ঘ হৃদয়ানুসন্ধানের পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, থণ্টের রিপোর্ট ভুল এবং ঠিক দুইই। ভুল এই জন্য যে, শুধুমাত্র যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবটাকে আলাদা করে বিবেচনা করলে ভারত তাকে বিনা সর্তেই গ্রহণ করেছিল। থণ্ট ভারতকে ও পাকিস্তানকে এক পর্যায়ে ফেলে নিরপেক্ষতার আড়ালে প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছেন। তিনি এবং ইউনো আক্রমণকারী কে এবং আক্রান্ত কে, এই প্রশ্নকে এড়িয়ে গেছেন। আচ্ছা একটা সরল মাপকাঠি প্রয়োগ করা যাক। ৫ই আগস্টের আগেকার লাইনে সৈন্যবাহিনীকে ফিরিয়ে আনতে ভারত রাজি হয়েছিল না হয়নি? হয়েছিল। পাকিস্তান? হয় নি। এই মূলগত পার্থক্যটাকে থণ্ট বুঝতে পারেন নি বা বুঝতে চান নি। তাহলেও সর্ত দুটো কি? প্রথমত, ভারত

যুদ্ধবিরতির পর কাশ্মীরে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের সশস্ত্র দমনকার্য চালিয়ে যাবে। যুদ্ধবিরতি রেখার এপারে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীভুক্ত অনুপ্রবেশকারীদের দমন ভারত-পাক যুদ্ধ নয়। ওটা ভারতের আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষার ব্যাপার। কেউ যেন ওটাকে যুদ্ধবিরতি চুক্তির লঙ্ঘন বলে মনে না করে এ কথা ভারত পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারত ইউনো-কে জানিয়ে দিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য যে ভারতীয় রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এটা প্রশ্নাতীত। এটা সর্ত বটে কিন্তু যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবগ্রহণের সর্ত নয়। যুদ্ধবিরতির পর ইউনো ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ী শান্তির জন্য যে আলোচনা করবে তাতে জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রশ্নকে পুনরুন্মোচন করা চলতে পারে না, এটাই ভারতের পরিষ্কার কথা। যুদ্ধবিরতি তো আর শান্তি নয়। কাশ্মীর কার, এ বিষয়ে একটা চিরন্তন প্রশ্নচিহ্নস্বরূপ একটা যুদ্ধবিরতি রেখা ষোল বছর ধরে চলে এসেছে এবং আরো ষোল বছর ধরে চলতে থাকবে, এই সর্বনাশা প্রহসনের সমাপ্তি ঘটাতেই হবে। ওটা ভারত-পাক যুদ্ধের একটা স্থায়ী প্ররোচনা। ভারত-পাক শান্তির জন্য কয়েকটি বাস্তব সত্যকে মেনে নিতে হবে, ভারতকে, পাকিস্তানকে, ইউনো-কে, সকলকেই। যদি আমার মত জানতে চাও, পরিষ্কার করে বলছি, কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের একমাত্র পথ হলো, যুদ্ধবিরতি রেখাকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় আন্তর্জাতিক সীমানারেখা বলে গণ্য করা। প্রকৃত শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের উচিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এটা ঘোষণা করা এবং পাকিস্তানের এবং সকল রাষ্ট্রের উচিত এটাকে মেনে নেওয়া। চতুর্দিকের এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে নিজের বেদনার্ত হৃদয়ের মধ্যে এই একমাত্র সমাধানই খুঁজে পাচ্ছি।"

"কিন্তু পাকিস্তানের উত্তর কি? পাকিস্তান সরাসরি নিরাপত্তা পরিষদের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেছে। বলেছে, ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই নিজেদের সৈন্যবাহিনীকে কাশ্মীর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাক এবং একটা আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে কাশ্মীরে গণভোট নেওয়া হোক; কাশ্মীর পাকিস্তানে যাবে না ভারতে আসবে। এটা নরকে যাওয়ার সোজা রাস্তা। ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে বর্তমানে কাশ্মীরে গণভোট নেওয়ার একমাত্র নিশ্চিত ফল হলো সমগ্র ভারতীয় উপ-মহাদেশে এমন একটা সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা ও অশান্তি সৃষ্টি করা যার ফলাফলের কথা ভাবলেও

শিউরে উঠতে হয়। পাকিস্তানের এই প্রস্তাবকে গ্রাহ্য করলে শুধু আন্তর্জাতিক আইনকেই ভঙ্গ করা হবে না, শুধু ভারতীয় রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক ও সেক্যুলার চরিত্রকেই বিকিয়ে দেওয়া হবে না, সমগ্র এশিয়ার ও সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষের স্বার্থকে সাম্রাজ্যবাদের ও প্রতিক্রিয়ার কাছে বিকিয়ে দেওয়া হবে, শান্তির ও প্রগতির জন্য জগদ্ব্যাপী সংগ্রাম অনেক পা পিছিয়ে যাবে। এ প্রস্তাব কোনো প্রগতিশীল ব্যক্তি বা রাষ্ট্র কখনই গ্রাহ্য করতে পারে না।

কিন্তু চীন অবিকল ঠিক এই জিনিসটাই চাইছে। শুধু তাই নয়, ভারত-পাক যুদ্ধকে একটা বৃহত্তর যুদ্ধে প্রসারিত করবার জন্য চীনের নেতারা কাপুরুষের মতো ঠিক এই মুহূর্তেই ভারতকে একটা যুদ্ধের চরমপত্র দিয়েছে। মাও-সে-তুংয়ের নবতম 'মার্কসীয়' আবিষ্কার হলো, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনো, এরা জোট পাকিয়ে পাকিস্তানকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায় এবং চীন যেহেতু 'right and wrong' অর্থাৎ ভাল ও মন্দ বা ন্যায় ও অন্যায়ের প্রশ্নকে সব চেয়ে উঁচু স্থান দেয়, তাই চীন দেখবে যাতে ন্যায়ের ও সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয় !! সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের বিরুদ্ধে এই অযৌক্তিক, নিউরটিক ও অপরিসীম ঘৃণা, সত্যের নামে মিথ্যাভাষণে এবং পরুষ ও কুৎসিত বাক্যোচ্চারণে এই পৈশাচিক উল্লাস, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে এই ম্যাকিয়াভেলীয় দৃষ্টিভঙ্গি, যুদ্ধের গন্ধ পেলেই এই নোলা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়া, আমার বহু মার্কসবাদী বন্ধু বলেন, এই সব কিছুই হলো বামপন্থী সুবিধাবাদেরই বিকৃত রূপ এবং প্রকৃতপক্ষে এটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অচেতন যন্ত্র রূপেই কাজ করছে। হতে পারে, কিন্তু আমাকে চিন্তা করতে হবে, মার্কসবাদের মধ্যে এমন কি আছে যে, তার প্রস্থানত্রয়ীর শোলোক আউড়েই, সত্য ও মিথ্যা, বাস্তব ও অবাস্তব, ন্যায় ও অন্যায়, এদের প্রভেদকে উড়িয়ে দিয়ে মার্কসবাদ হয়ে পড়তে পারে চীনা মাওচিন্তাবাদ! তাই মার্কসবাদী না হওয়াটাই নিরাপদ বলে মনে করি। আপাতত বিনয়নম্র চিত্তে যে সব অদৃশ্য শক্তির কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বলেছিলেন তাদের কাছে প্রার্থনা করি, তারা প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান ও প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী, উভয়ের চিত্তকেই শুভবুদ্ধির দ্বারা আলোকিত করুক, তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করুন, তাঁরা বৈঠকে মিলিত হয়ে ইউনো-কে, আমেরিকাকে, ব্রিটেনকে, চীনকে, সবাইকেই বলুন, কাশ্মীরে হস্তক্ষেপ করা

চলবে না, আমাদের ঝগড়া আমরাই মিটিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু ন্যায়সঙ্গত শান্তি যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে ন্যায়যুদ্ধ ভারতকে চালিয়ে যেতেই হবে।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।

ন্যায়যুদ্ধ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিই শেষ কথা। কার্ল মার্কস জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই কি শ্রীকৃষ্ণ বাতিল হয়ে গেছেন? ইতি

ভবদীয়
শ্যামল ভট্টাচার্য

চিঠিটা ছাপতে চান? বেশ, আপত্তি নেই। লোকে আপনাকেও রেনিগেড ভাববে? বেশ তো, দল ভারী হবে। ইতি

ভবদীয়
শ্যামল ভট্টাচার্য

[সুনীল চক্রবর্তী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শুধু বেঁচে থাকা

বসতি আমার ছিলো দক্ষিণ গাঁয়ে
ভাঙা দেউলের পাশে
আজ নির্জনে সমগ্র ভেসে আসে
বরবধূ চলে ময়ূরপঙ্খী নায়ে
বসতি আমার ছিলো দক্ষিণ গাঁয়ে।

পুবেও গিয়েছি, পশ্চিমে ছিলো বাসা—
ধানের মরাই ছিলো নাকি ঘরে ঘরে ?
কার কাছে রেখে গচ্ছিত ভালোবাসা
পরাণ আমার প্রাঙ্গণে কেঁদে মরে ?

নূতন করে কি বাঁচা সম্ভব হবে
বারমাস্যার গানে ?
দুঃখ-সুখের প্রয়াণ বর্তমানে—
শুধু বেঁচে থাকা, হেসে-ভেসে উৎসবে
নূতন করে কি বাঁচা সম্ভব হবে ?

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

অরণ্যের শ্বাসকষ্ট

পৃথিবীর তিনভাগ জল তবু খণ্ডযুদ্ধে মানুষের পিপাসা মেটেনি !
আমরা বিষণ্ণ থাকি হৃদয়ের দোষে ,
সোনালি ফলের থেকে শোকে
অহংকার ভেঙে ভেঙে জ্যোৎস্নার রস
জানি ক্রমে ঝরে যায় ।
জানি, মন্থর নিদারুণ ছোট পায়ে
ফুলের গন্ধ চলে যায় ফুল থেকে ।

এই সব পৃথিবীতে এলে ঘটে, তাহলেও অনন্ত নীলিমা
কি যেন শিখিয়েছিল, কে যেন কি সব কথা বলেছিল কানে—
অরণ্যের শ্বাসকষ্টে কুসুম বাজাতে জানে পাতার বাঁশরী।
কিছুদিন সকলেই রুগ্ন হয় ; কিন্তু ব্যথা হ'লে
আরেক জননী আছে, নানাবিধ পথ্য আনে, ক্রমে উপশম ।
ইচ্ছা হয় ছাদে উঠে বৃহৎ দিগন্তখানি একবার দেখি—
কতকাল দেখি নাই, খেলা হোক ;
অনেক নূতন কুঁড়ি, এদের সাথেই
রুগ্নতার পর এসে প্রথম সাক্ষাৎ করা বিধি ।
ক্রমশ নিজের মুখ পুষ্ট হলে আয়নায় বড় ভাল লাগে ।

কেন চলে যাব, কিছু কাজ আছে শুনেছি প্রভাতে…
মাথায় পৃথিবী নিয়ে জন্মাবধি রয়েছে বাসুকি
আছড়ে ভাঙে নাই আজো ।
বড় ভাল এই মাটি, অক্ষয় চাঁদের নিচে অনন্ত ফোয়ারা,
মানুষের স্নান, খেলা ;
বড় ভাল হেসে ওঠা আঁধারে জ্যোৎস্নায়
মানুষের পদশব্দ হয়ত বা শ্রেষ্ঠতম মধুর বেহালা…
মহাশূন্য থেকে দেখা পৃথিবীর বর্ণ নাকি অদ্ভুত নীলাভ ।

রত্নেশ্বর হাজরা

নির্বাসন

অপরিসর আলোয় কারা তোমার দক্ষিণের মাঠ
কেড়ে নিল ? কারা তোমার
দুপুরের একলা ঘর—নীরবতা রক্তাক্ত করল ! যারা
অকারণ কৃষ্ণচূড়ার ডাল ভেঙে পাপড়ি ছড়ায় তারা কেউ
চেনা ঋতুর পথিক নয়। তুমি
কোন্ ঋতুতে তাদের দেখেছিলে ? কেন
দিঘির কাছে প্রার্থনা হয়েছিলে !

অচেনা পথিকেরা হেঁটে গেলে পায়ের ছাপে উঠোন ভরে যায়
নীরবতা শব্দ হয়ে ওঠে
বুকের মধ্যে আমলকীপাতা ঝরে পড়ে। অথচ
সেই শব্দের মধ্যে পরিচিত ধ্বনিরা নেই, সেই শব্দে
জ্যোৎস্নার শরীর আলোড়িত হয় না। শুধু
দক্ষিণের মাঠ
দুপুরের ঘর
নীরবতা
কেঁপে ওঠে। কৃষ্ণচূড়ার ডাল থেকে পাপড়ি খসে পড়ে—
অশোকতলার বিষাদে সমস্ত বুক ভরে যায়। তুমি
কোন্ ঋতুতে তাদের দেখেছিলে ? কেন
দক্ষিণের দরজা খুলে রেখেছিলে !

পুষ্কর দাশগুপ্ত

আমন্ত্রণ

রাজার প্রাসাদে হবে বারুণী উৎসব
কালকে গোধূলি লগ্নে ঘরে ঘরে   বকুলের গন্ধময়
আমন্ত্রণ লিপি পাওয়া গেছে

বহুদূরে   দিগন্তের ওপারে রাজার
সোনার প্রাসাদ
যেতে হবে ধবল ঘোড়ায়
পথে হ্রদের কাচের বুকে মন্ত্রপূত জল
ছিটিয়ে দিলেই শ্বেত অশ্ব হবে পক্ষবান
নিমেষেই মেঘের সাতটি স্তর পার হয়ে যাবে
          দ্রুত তীব্র পদপাতে চমকাবে নীলাভ বিদ্যুৎ

বারুণী উৎসব   তাই   প্রগাঢ় সাতটি রঙে
প্রাসাদের সাতটি মহল সাজানো উজ্জ্বল
গাঢ় সাতটি গন্ধের বাতাস ভিতরে মন্থর   রাতে
সংগীত গভীর বাজবে   দ্রুত   বিলম্বিত
প্রতি দরজায় আশ্চর্য সবুজ পর্দা   জানলার
পর্দাগুলি প্রবাল রক্তিম
চুমকি বসানো ঘন বেগুনি ঝালর   প্রতি কক্ষে
ঝাড়লণ্ঠনের সারি   ঝলমল দোলানো ঔজ্জ্বল্য

বারুণী উৎসব হবে   যাবে
তাহলে আমিও যেতে পারি
আমি   মায়ামুকুরের সামনে দাঁড়াইনি কখনো একাকী

পরিচয়

বর্ষ ৩৫ । সংখ্যা
আশ্বিন-কার্তিক, ১৩

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : সুবোধ দাশগুপ্ত

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

মাকীয় তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতাবাদ

অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় স্থানকালের আপেক্ষিকতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ব্রিটিশ দার্শনিক বিশপ্ বার্কলে তাঁর 'Principles of Human Knowledge' বইখানির এক জায়গায় লিখেছেন: "I must confess it does not appear to me that there can be any motion other than relative; so that to conceive motion there must be at least conceived two bodies whereoff the distance or posltion in regard to each other is varied." পরবর্তীকালে দার্শনিক মাক্ও নিউটন-কল্পিত চরম শূন্যের (absolute space) কথা অস্বীকার করেছেন। দার্শনিক মাক্ চিন্তার জগতে 'পসিটিভিস্ট'দের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত নয়—এমন কোনো তত্ত্ব বা ধারণায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। যা স্পষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাই বাস্তব; বাকি সব মানুষের ধ্যানকল্পনার সৃষ্টি। ফরাসী গণিতবিদ্ পয়ঁকারের সঙ্গে এ-ব্যাপারে 'পসিটিভিস্টদের' মিল লক্ষণীয়। তাঁর মতে দৃষ্টিগোচর বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা কিংবা নিয়মকানুনের কতখানি বুদ্ধিগ্রাহ্য—তার বিচার গুরুত্বহীন। সেদিক দিয়ে দেশ এবং কালের জ্যামিতিক চেহারা প্রসঙ্গে কোনো চরমপ্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হওয়াও অসম্ভব। গণিতবিদ্ সহজ সরল কোনো গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে দুরূহ কোনো অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করেই খালাস—তাকে উল্টেপাল্টে—বুদ্ধি দিয়ে—চিন্তা দিয়ে—বোঝা অনাবশ্যক। জ্যামিতিক ধ্যানধারণার প্রতিষ্ঠাও এত সহজ ভিত্তিতে হবে যার ফলে যে কোনো অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ ঘটনাবলীর সরলতম অথচ নিখুঁত

একটা বর্ণনা সম্ভব হয়। পরবর্তীকালে আইনস্টাইনের চিন্তাধারার সঙ্গে উপরোক্ত চিন্তার মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অন্যদিকে চরমশূন্যের অস্তিত্ব-সম্পর্কে নিউটনের কল্পনাকেও উড়িয়ে দিলেন দার্শনিক মাক্ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে। মাকের মতে বিশ্বের যে-কোনো বস্তুরই ভর (mass) তার পারিপার্শ্বিক আর আর বস্তুসম্ভারের অবস্থিতির উপরে একান্তভাবে নির্ভরশীল। মহাশূন্যের দিকে দিকে বিস্তৃত অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ স্থানীয় বস্তুর স্থিতিশীলতা বা জাড্যকে (inertia) নিয়ন্ত্রিত করছে। দ্রুত আবর্তনশীল কোনো জলপূর্ণ পাত্রকে পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে ধারের জল বৃত্তাকারে স্ফীত হয়ে উঠেছে ঠিক মাঝখানে গভীরতার সৃষ্টি করে। এবার দর্শককে জলাধারের চারপাশে পাক খেতে দিলে তার কাছে পাত্রটি অবশ্যই আগের মতো ঘূর্ণমান ঠেকবে—অথচ এ-ক্ষেত্রে উপরোক্ত অভিজ্ঞতাটি দ্বিতীয়বার ঘটবে না। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিউটন বলেছেন পাত্রটি যখন চরমশূন্যের পরিপ্রেক্ষিতে আবর্তিত হবে শুধুমাত্র তখনই কেন্দ্রাতীগ (cetrifugal) বলের উদ্ভব হবে—যার ফলে মাঝখান থেকে জল সরে গিয়ে ধারের দিকে জমবে। নইলে কদাচ নয়। দেশ এবং কালের চরমত্বকে অস্বীকার করে যখন আপেক্ষিকতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হল তখন বোঝা গেল নিউটন-কল্পিত চরমশূন্য আর কিছুই নয়—সুদূরস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের আধারস্বরূপেই তার অধিষ্ঠান। শুধুমাত্র নিউটনের জলভরা পাত্রই নয়, আবর্তনশীল পৃথিবীর বুকে, সূর্যকে ঘিরে বিভিন্ন গ্রহের প্রদক্ষিণ করার পেছনে অথবা সৌরজগতের বাইরেও বিভিন্ন ঘটনায় কেন্দ্রাতীগ বলের প্রভাব এত সুস্পষ্ট যে একে বিশ্বজনীনই বলা চলে। আর সেইজন্যেই নিউটনের পক্ষে এ-সবের বাইরে কোনো চরম এবং ধ্রুব পরিপ্রেক্ষিতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। এই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে আবর্তনশীল যে-কোনো বস্তুমাত্রেই কেন্দ্রাতীগ বলের সঞ্চার ঘটবে। এখন একটা প্রশ্ন—দূরের নক্ষত্রপুঞ্জকে যদি পৃথিবীর চারপাশে আবর্তনশীল বলে কল্পনা করা যায় তাহলে পৃথিবীতে কি কেন্দ্রাতীগ বলের আবির্ভাব ঘটবে না? খুব সংগত কারণেই নিউটনের মতে এর উত্তর নেতিবাচক। দার্শনিক মাক্ যুক্তি দিলেন যেহেতু এরূপ ঘটনার সত্যতা কোনোদিনই মানব অভিজ্ঞতার বিচারে অথবা নিরীক্ষার আলোয় যাচাই করা সম্ভব নয় সুতরাং এ-বিষয়ে বিশেষ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া একমাত্র কেন্দ্রাতীগ বলের আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করার জন্যেই নিউটন চরম-

শূন্যের ধারণাকে আমদানী করলেন। দ্বিতীয় কোনো অভিজ্ঞতায় উপরোক্ত ধারণার প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয় নি।

আইনস্টাইন পরবর্তীকালে তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের বিকাশে কোথাও মাকীয় তত্ত্বকে পুরোপুরি অবহেলা করেন নি বরঞ্চ দেখিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত সমীকরণের সঙ্গে তত্ত্বটির গভীর সম্পর্ক আছে। আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্বের আলোচনায় আসার আগে এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে তিনি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের (Gravitational field) ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নিউটনের ধারণা অনুযায়ী দুই বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষীয় ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘটে সরাসরি (action at a distance) এবং মুহূর্তমধ্যে (instantaneous)। আইনস্টাইনের তত্ত্বানুযায়ী দুই বস্তুর অন্তর্বর্তী মহাশূন্যও মহাকর্ষীয় ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে অর্থাৎ কিনা যে কোনো বস্তু থেকে স্বতঃউৎসারিত মহাকর্ষীয় প্রভাব তার পারিপার্শ্বিক দেশকালকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তাকে এমন এক বিশেষ অবস্থায় উত্তীর্ণ করবে যার মাধ্যমে দ্বিতীয় বস্তুটির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটবে। এক্ষেত্রে বস্তুদ্বয় এবং অন্তর্বর্তী মাধ্যম—এই ত্রয়ী একত্র অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়মকানুন মেনে চলবে। যেমন শক্তির (energy) অক্ষয় অব্যয় চরিত্রের সাক্ষাৎ ঘটবে ত্রয়ীর মিলিত অবস্থায়, এদের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নয়। এ ছাড়া এই মহাকর্ষীয় বস্তুর প্রভাব এক বস্তু থেকে ভিন্ন বস্তুতে প্রসারিত হবে আলোর গতিবেগে—মুহূর্তমধ্যে নয়। মনে রাখতে হবে আইনস্টাইনের এই মহাকর্ষতত্ত্বের আগেই কিন্তু বৈদ্যুৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রতত্ত্ব (electromagnetic field theory) সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ম্যাক্স্‌ওয়েলের সমীকরণের মাধ্যমে এর অসাধারণ সাফল্যও প্রমাণিত হয়ে গেছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদে মাকীয় তত্ত্বের চরিত্রটি সবসময় খুব স্পষ্ট না হলেও তিনি যে এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, 'Meaning of Relativity' বইখানির এক জায়গায় বিজ্ঞানী আইনস্টাইন লিখেছেন: "In a consequential theory of relativity there can be no inertia of matter against space but only inertia of matter against matter. If therefore a body is removed sufficiently far from all other masses of universe its inertia must be reduced to zero." এই উক্তির সূত্র ধরে এগোলে দেখা যাচ্ছে বিশ্বজগতের সীমা যেখানে অসীমে বিলীন হয়েছে

মাকীয় তত্ত্ব অনুযায়ী বস্তুর ভর সেখানে শূন্যে এসে ঠেকছে। কিন্তু আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব অনুযায়ী বস্তুজগতের থেকে এই অনন্ত পথের দূরত্বে মহাশূন্যের চেহারাটা বক্রতাবিহীন সরল সাদাসিধে হয়ে যাচ্ছে এবং ইউক্লিডীয় জ্যামিতির নিয়ম মেনে চলা এই সরল চেহারার স্পেসেও বস্তুর জাড্য বা inertia অস্বীকৃত হচ্ছে না। তাই আইনস্টাইনের ধারণায় এবং মাকীয় তত্ত্বে এই জায়গায় একটা ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে। পরে অবশ্য আইনস্টাইন দ্বিধামুক্ত হতে চেয়েছেন তাঁর সমীকরণে নতুন একটি সংখ্যার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে।

এ কথা স্পষ্ট যে দার্শনিক মাকের মতে যে-কোনো বস্তুর ভর বা তার জাড্যর (inertia) জন্য দায়ী পারিপার্শ্বিক বস্তুসম্ভার। শুধুমাত্র তাদের উপস্থিতিই নয়, মহাশূন্যে তাদের সংস্থান এবং পারস্পরিক দূরত্বও বস্তুর ভরকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এদিক দিয়ে মাকীয় তত্ত্বের পরিণাম কিন্তু সুদূরপ্রসারী। যে-কোনো বস্তুর পারিপার্শ্বিক জগতের যদি একটা বিসম চেহারা থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন দিকে নক্ষত্রপুঞ্জের সংস্থানে অথবা তাদের পারস্পরিক দূরত্বে যদি হেরফের ঘটে তবে বস্তুটির ভরও একেক দিকে একেক রকম হবে। ফলত একই মানের বল (force) বিভিন্ন দিক থেকে প্রয়োগ করলে বস্তুটির ত্বরণের মাত্রা সবদিকে সমান হবে না। তার মানে বস্তুটি কোনোদিকে বেশি স্থিতিশীল—কোনোদিকে বা কম। অবশ্য এ-ব্যাপারে নেতিমূলক অভিজ্ঞতা বিশ্বজগতের সুষম চেহারাকেই সমর্থন করে।

খুব সম্প্রতিকালে (১৯৬৪) ফ্রেড হয়েল এবং জে. ভি. নারলিকার আবিষ্কৃত নতুন মহাকর্ষ তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই সূত্রে করা যেতে পারে। এই দুই বিজ্ঞানী মাকীয় তত্ত্বকে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন। সবচেয়ে আকর্ষক ব্যাপার হচ্ছে এঁরা আবার নিউটনের ধারণায় অর্থাৎ দুই বস্তুর মধ্যে সরাসরি ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ধারণায় ফিরে গেছেন। ইতিমধ্যে প্রথমে সোয়ারশ্চাইল্ড্ এবং পরে টেট্রোড ও ফকার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দুই আধানের (charge) পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ক্ষেত্র তত্ত্বকে (field theory) পরিহার করলেন। তাঁদের মতে দুই আধানের মধ্যে যোগাযোগ ঘটবে সরাসরি—কোনো বৈদ্যুৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের মাধ্যমে নয় এবং এই সরাসরি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এক থেকে আরেক আধানে সঞ্চারিত হবে আলোর গতিবেগে। তবে মজাটা হচ্ছে পরিণামে এই নতুন তত্ত্বও

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণে এসে ঠেকেছে। হয়েল এবং নারলিকার মহাকর্ষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি খুঁজলেন গণিতের জগতে—যার ফলে দার্শনিক মাকের তত্ত্বকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নতুন এক মহাকর্ষ তত্ত্বের জন্ম হল। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো বস্তু স্বকীয় মহাকর্ষের প্রভাবে পারিপার্শ্বিক দেশকালকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে কোনো বস্তুর ক্রিয়াকাণ্ড, গতিবিধি—এসব নির্ভর করে আশেপাশের বস্তুসমূহের পরে। হয়েল এবং নারলিকারের চিন্তায় কিন্তু দূরের নক্ষত্রপুঞ্জই স্থানীয় ঘটনায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব সঞ্চার করছে—এমনকি বস্তুর পুরো ভরটাই দূরের জগতের পরে নির্ভরশীল। হয়েল এবং নারলিকার তাঁদের নতুন মহাকর্ষ তত্ত্বে বলেছেন—দুই বস্তুর মধ্যে যোগাযোগ ঘটবে সরাসরি—মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র-মারফৎ নয় এবং দ্বিতীয়ত একের প্রভাব অন্যে সঞ্চারিত হবে ঠিক আলোর গতিবেগে। তবে এঁদের তত্ত্বেও বিশেষ এক আদর্শ অবস্থায় আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণে এসে পৌঁছতে হয়। নতুন মহাকর্ষ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দুই বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণা প্রবন্ধের এক জায়গায় আলোচনা করছেন—সৌরজগতের বাইরে আর সব বস্তুকে যদি সরিয়ে ফেলা যায়—তাহলে কি হবে? নিউটন বা আইনস্টাইনের ধারণা অনুযায়ী বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু নতুন তত্ত্বের আলোকে দেখলে পরে দেখা যাবে স্থানীয় মহাকর্ষে প্রভাব বহুগুণ বেড়ে গেছে। পৃথিবীর আকর্ষণী ক্ষমতা বেড়েছে। দেশকালের বক্রতা বেড়েছে—আর সূর্য খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। "Take away a half the distant parts of the universe and the earth would be fried to a crisp."—এ হয়েল এবং নারলিকারের কথা।

সুতরাং বর্তমান তত্ত্বানুযায়ী বস্তুবিহীন শূন্য জগতের ধারণা যেমন অর্থহীন তেমনি বিশ্বজগতে একটিমাত্র বস্তুর অবস্থান কল্পনা করাও অলীক! অন্তত দুটি বস্তুর কমে কোনো বাস্তব জগতের সৃষ্টিই সম্ভব নয়। আইনস্টাইনের তত্ত্বে বিশ্বজগতে একটিমাত্র সদস্য বস্তু—পারিপার্শ্বিক দেশকালের জ্যামিতিক চেহারায় বক্রতার সঞ্চার করে অবস্থান করতে পারে দ্বিতীয় কোনো বস্তু বা দর্শকের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও। ঠিক এই ধরনের কোনো জগৎ কল্পনা করতে গিয়ে মানুষের মনে একটা দ্বিধা কিংবা অস্বস্তি থেকেই যায়—কেননা যে-কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার অস্তিত্বকে স্বীকার করার আগে কোনো-না-কোনো মাপকাঠিতে তাকে বিচার করতেই হয়।—এদিক দিয়ে হয়েল-নারলিকারের তত্ত্বে কোনো সমস্যাই দেখা দেয় না—কেননা সেখানে দুটি বস্তুর কমে কোনো জগৎ তৈরি হতে পারে না। আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে—নতুন মহাকর্ষ তত্ত্বে বিশ্বের প্রতিটি মূল বস্তুকণা একই ভরবিশিষ্ট এবং দৃশ্য বস্তুসমূহ এই সব মূল কণা দ্বারাই গঠিত। তবে দুই বিজ্ঞানী মূল বস্তুকণার গঠন কিংবা প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত বিশেষ কিছু বলতে পারেন নি।

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি

কেবল প্রত্যক্ষ চাল এবং চলন দিয়ে কোনো রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ ধারাগুলিও নির্ধারণ করা যায় না। বিভিন্ন আভ্যন্তরিক উৎস, বিভিন্ন অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া এবং সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন চালিকাশক্তি বিশ্লেষণ করেই ঐ ধারাগুলির হদিস পাওয়া যায়। এই চালিকাশক্তিগুলির মধ্যে পড়ে—পররাষ্ট্রনীতির আর্থনীতিক ভিত্তি; শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য; আভ্যন্তরিক কর্মনীতির সঙ্গে বিভিন্ন যোগাযোগ; বিভিন্ন রাষ্ট্র নিয়ে গড়া এক-একটা ব্যবস্থা; বিভিন্ন মৈত্রী, চুক্তি, জোট নিয়ে গড়া এক-একটা ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিবেশের প্রভাব; আজকের দিনে সমাজতন্ত্র আর ধনতন্ত্র এই দুই বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার তাৎপর্য, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিশ শতকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় সবপ্রধান দেশ হয়ে দেখা দিল। এখানেই রয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির আর্থনীতিক ভিত্তি। মার্কিন মূলধনের পক্ষে তার জাতীয় কাঠাম অতি সংকীর্ণ হয়ে উঠল। ১৯৬৩ সাল নাগাদ তার রপ্তানি যে-আকার ধারণ করল সেটা মোট জাতীয় উৎপাদনের সঙ্গে আনুপাতিক তুলনায় অন্যান্য প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশের চেয়ে কমই, কিন্তু মোট যে-পরিমাণ মার্কিন পণ্য আর মূলধন বিশ্ববাজারে গিয়ে পড়তে থাকল সেটা সুবিপুল। বিদেশে বিনিয়োগ-করা মার্কিন মূলধনের পরিমাণ বেড়ে ১৯৬২ সালে দাঁড়াল ৮০০০ কোটি ডলার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ-করা বিদেশী মূলধনের চেয়ে ৩৩০০ কোটি ডলার বেশি)। বিদেশে মার্কিন মূলধনের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ১৯৫০ সালের ১১৮০ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ১৯৬৩ সালে দাঁড়াল ৪০৬০ কোটি ডলার। যুদ্ধোত্তর কালে বিদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "সাহায্য" কর্মসূচী বাবদ বরাদ্দ উঠল ১০,০০০ কোটি ডলারে।

১৯৬২ সালে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় শিল্পক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ ২০০ একচেটিয়া

কারবারের মধ্যে ১২৪টি ছিল মার্কিন ; মোট খাটানো মূলধনের শতকরা ৭১ ভাগ সেগুলিরই। ঐ বছরই ধনতান্ত্রিক ছুনিয়ায় বৃহত্তম ৫০টি ব্যাঙ্কের মধ্যে ১৭টি ছিল মার্কিন ; মোট আমানতের শতকরা ৪৩ ভাগ ছিল সেগুলিতেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরই বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিক্ষেত্রে মার্কিন প্রাধান্ত হয়ে উঠেছিল কার্যত একচেটিয়া ধরনেরই : মোট শিল্পোৎপাদনের প্রায় পাচ-ভাগের তিন-ভাগ ; বিশ্ববাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ, ধনতান্ত্রিক ছুনিয়ায় মজুদ সোনার তিন চতুর্থাংশ, মূলধন রপ্তানিতে কার্যত একক (যদিও পরে অবস্থাটা বেশ কিছুটা সংকুচিত হয়ে ১৯৪৮ সালের সঙ্গে তুলনায় ১৯৬৩ সালে দাঁড়ায়—শিল্পোৎপাদন শতকরা ৫৪ থেকে ৪৫ ভাগ, রপ্তানি শতকরা ৩২ থেকে ১৭ ভাগ, মজুদ সোনা শতকরা ৭২ থেকে ৩২ ভাগ)।

তবে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসম বিকাশের নিয়মটার মর্ম হল ধনতান্ত্রিক ছুনিয়ায় প্রধান শক্তিগুলির মধ্যেকার শক্তিসাম্য। সেটা পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান রয়েছে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের নাগালের বাইরে। তাছাড়া, এই অসম বিকাশের ব্যাপারটা নিছক অর্থনীতিক নয়। এটা সামরিক এবং রাজনীতিকও বটে। ধনতান্ত্রিক ছুনিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একচেটিয়া অধিকারী বললেই হয় ; সামরিক-রাজনীতিক চুক্তিসংস্থাগুলির মেরুদণ্ডও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই (অতলান্তিক চুক্তিসংস্থার সামরিক ব্যায়ের তিন-চতুর্থাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বহন করে)।

বিশ্ব ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান মোটামুটি বজায় রাখতে পেরেছে।

তবে, সমাজতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের মধ্যেকার শক্তিসাম্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে সমাজতন্ত্রেরই অনুকূলে। বিশ্ব অর্থনীতিক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের উপর তদনুযায়ী প্রতিকূল ক্রিয়া না ঘটে পারে নি। ধনতান্ত্রিক ছুনিয়াটাকে একেবারে একটা 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় কারবারে' পরিণত করা সম্ভব হল না ; বহু-বিজ্ঞাপিত "আমেরিকান যুগ" সংক্রান্ত পরিকল্পনাও তাই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসক মহলগুলির ভিতর যাঁরা মোটামুটি যুক্তিসম্মত ধারায় চিন্তা করতে পারেন তাঁরা এইসব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে একটু সুস্থভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হলেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্প্রসারণকামী লক্ষ্য এবং সম্ভাবনাগুলিকে অন্তত কিছু পরিমাণে পৃথিবীর নতুন

শক্তিসাম্যের বাস্তববাদী মূল্যায়নের মাপে দাঁড় করাবার চেষ্টা না করে তাঁরা পারেন নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় পররাষ্ট্রনীতির আর্থনীতিক ভিত্তি তাই খুব স্পষ্ট; সেই শত-কোটি ডলারী কারবারগুলির স্বার্থানুযায়ী 'ঠাণ্ডাযুদ্ধ', নিরস্ত্রীকরণ-বিরোধিতা আর কমিউনিজমবিরোধিতার চালিকাশক্তিটি এইভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকার ১৯৬৪ সালের ২রা জানুআরি তারিখের সংখ্যায় ওয়াল্টার লিপ্‌ম্যান বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেসে রয়েছে মহাপরাক্রমশালী, চূড়ান্ত-ক্ষমতাশালীই একটা অংশ; তারা সামরিক ব্যয়ের জন্যে বরাদ্দের যে-কোনো মাত্রাই সমর্থন করবে। কিন্তু সেই বরাদ্দের ক্ষুদ্রাংশও বেসামরিক কিংবা জনজীবনের প্রয়োজনে সরিয়ে নেবার ঘোর বিরোধিতা করবে। তা সত্ত্বেও মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির আর্থনীতিক ভিত্তি সংক্রান্ত মূল্যায়নে অতি-সরল ধরনধারণও বর্জনীয়। পররাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থনীতিক প্রেরণা এবং উদ্দেশ্য বিভিন্ন রাজনীতিক, সামরিক, রণনীতিগত এবং মতাদর্শগত উদ্দেশ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে; অর্থনীতি আর পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে সম্পর্ক খুবই জটিল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যাপার।

একচেটিয়া মূলধন যে সমরূপ কিংবা সমপ্রকৃতি নয়, সে-কথাটাও মনে রাখা দরকার। যুদ্ধের প্রয়োজন সংক্রান্ত বিভিন্ন কন্‌ট্র্যাক্টের ব্যাপারে বিভিন্ন শিল্প, বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকা আর বিভিন্ন একচেটিয়া কারবারি জোটের স্বার্থ খুবই বিভিন্ন। যেমন কিনা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন শিল্পে যুদ্ধে-প্রয়োজনীয় উৎপাদনের অংশ হালেও ছিল নিম্নরূপ: রসায়ন শিল্পে শতকরা ৫ ভাগ, ধাতু থেকে উৎপাদন শিল্পে শতকরা ৮ ভাগ, রেডিও শিল্পে শতকরা ৩৮ ভাগ, জাহাজনির্মাণ শিল্পে শতকরা ৬১ ভাগ, বিমান এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে শতকরা ৯৪ ভাগ ইত্যাদি। তেমনি, সমগ্র শিল্পের সঙ্গে তুলনায় যুদ্ধোৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা শতকরা অবশ্য ৭·৩ ভাগ। কিন্তু সকল রাজ্যে এত কম নয়, যথা, কান্‌সাস-এ সেটা শতকরা ৩০ ভাগ, ওয়াশিংটন, নিউ মেক্সিকো, কালিফোর্নিয়া, কনেক্টিকাট, আরিজোনা এবং উটা-য় সেটা শতকরা ২০ থেকে ২৯ ভাগ। তার উপর, যুদ্ধ কারবারের পাহাড়প্রমাণ মুনাফা যায় মুষ্টিমেয় বৃহত্তর একচেটিয়া কারবারগুলির হাতে। যেমন কিনা, ১৯৫৭-১৯৬২ সাল কালপর্যায়ে শত কোটি ডলারের ঘরে কন্‌ট্র্যাক্ট পেয়েছিল পাঁচটা

গোষ্ঠী—জেন্‌রল ডাইন্যামিক্‌স্‌, বোয়িং, লক্‌হীড এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌, নর্থ অ্যামেরিকান অ্যাভিয়েশান আর জেন্‌রল ইলেক্‌ট্রিক।

শুধু তাই নয়। যুদ্ধ কন্‌ট্র্যাক্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো-কোনো কারবারি গোষ্ঠী প্রয়োজন হলে অপেক্ষাকৃত সহজেই তাদের উৎপাদনের ধারা বদলে বেসামরিক খাতে চালিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু অন্যান্যের ক্ষেত্রে তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই! এইভাবে, এই সব কারবারি গোষ্ঠীর মধ্যেও নিরস্ত্রীকরণের প্রতি বিভিন্ন মনোভাব দেখা দিতে পাবে।

নিরস্ত্রীকরণ, ঠাণ্ডাযুদ্ধ, 'পুর্ব-পশ্চিমে'র মধ্যে বাণিজ্য ইত্যাদি প্রশ্নে, কিউবা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, কঙ্গো ইত্যাদি সম্পর্কে মার্কিন কর্মধারা কিভাবে নির্বাচিত হয়, তাই বুঝে দেখা যাক। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসক মহলগুলির মধ্যে, তাদের বিভিন্ন একচেটিয়া কারবারি গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব-বিরোধ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে একটা স্থায়ী উপাদান হয়ে উঠেছে।

একচেটিয়া কারবারিরা তাদের আর্থনীতিক আর শ্রেণীগত স্বার্থ অনুসারেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ কর্মধারা নির্ধারণ করে। কিন্তু তাই বলে ব্যাপারটা অত সোজাসুজি হয় না—ঐসব কারবারিরা নিজেদের হাতে ধরেই পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করে দেয়; এবং রাষ্ট্র হল বৃহৎ কারবারিদের দ্বারা নিযুক্ত নিছক আজ্ঞাবহ তাও নয়। রাষ্ট্রের ভূমিকাটাকে খাটো করে দেখা চলে না। রাষ্ট্রীয় কাঠামের মধ্যে কোনো শ্রেণী সংগঠিত থাকে সমগ্র শ্রেণী হিসাবে,—সে শ্রেণীর একটা অংশ কিংবা একটা জোট হিসাবে নয়। সরকার যেমন কর্মনির্বাহক সংস্থা, তেমনি শাসকশ্রেণী-ব্যবস্থায় সম্প্রদায়ও বটে। রাষ্ট্রের একটা আপেক্ষিক স্বাধীনতাও আছে, এর একটা সক্রিয় ভূমিকা আছে। ভৃত্য থেকে প্রভু হয়ে উঠবার জন্যে রাষ্ট্রের ঝোঁক থাকে নিরন্তর। এমনকি, কখনও কখনও রাষ্ট্র কাজ করে শাসকশ্রেণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও—তখনও রাষ্ট্র দাঁড়ায় ঐ শাসকশ্রেণীর সমগ্র স্বার্থেরই সপক্ষে, যেসব ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণী তার নিজ স্বার্থ সম্পূর্ণত উপলব্ধি করে উঠতে পারে না। তাছাড়া, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্র গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রও বহু পরিমাণে বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং ভূমিকা সংক্রান্ত এই উপাদানগুলিকে খাটো করে দেখবার বিরুদ্ধে মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা হুঁশিয়ারি জানিয়ে গেছেন। পররাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে, বিশেষত যুদ্ধ-শান্তির প্রশ্নে রাষ্ট্রের ভূমিকা, বিশেষত মার্কিন রাষ্ট্রপতির

ভূমিকা যে বেড়েছে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান অনুসারে যুদ্ধ ঘোষণা করবার অধিকার কংগ্রেসেরই ; উভয় 'সভার' যুক্ত অধিবেশনে এ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার কথা। তবু, রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই। পরবর্তী ক'বছরে মার্কিন রাষ্ট্রপতিদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দেওয়া হয় কতকগুলি বিষয়ে—যেমন, নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি অনুসারে যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ করবার প্রাথমিক কর্তৃত্ব। ১৯৫৫ সালের 'ফরমোজা প্রস্তাব'ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ; তাইওয়ান নিয়ে যুদ্ধ বাধাবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারকে দেওয়া হয়েছিল ঐ প্রস্তাবে। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসের 'বার্লিন প্রস্তাবও' তেমনি আর-একটি দৃষ্টান্ত। অপরাপর দৃষ্টান্ত হল—১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসের 'কিউবা প্রস্তাব'ও : এতে তেমনি, কিউবার বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করবার অধিকার দেওয়া হয় মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে। ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সংক্রান্ত প্রস্তাব : ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবলম্বিত প্ররোচনামূলক কাযকলাপ যা আগেই চালানো হয় তার প্রতি অনুমোদন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় চুক্তি সংস্থার যে-কোনো সদস্য দেশের সাহায্যার্থে সামরিক শক্তি নিয়োগ করবার অগ্রিম অধিকার দেওয়া হয় এই প্রস্তাবে।

দুই

স্বরাষ্ট্রনীতি আর রাষ্ট্রপতির মধ্যেকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও স্বীকার করে। রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রাটিক উভয় পার্টির নির্বাচনী কর্মসূচীতেও সেটা পাওয়া যায়। বর্তমান ব্যবস্থা, অর্থাৎ কিনা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা—'জীবনযাত্রার মার্কিন প্রণালী'—তাঁরা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর যেমন স্বদেশে, তেমনি সমগ্র "গণতান্ত্রিক দুনিয়ায়"। পৃথিবীর সর্বত্র "প্রয়োজনীয়" যে-কোনো হস্তক্ষেপ করবার "দায়দায়িত্ব" তাঁরা এইভাবেই গ্রহণ করেন। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডীন রাস্‌ক্-এর একটি সাম্প্রতিক বিবৃতিতে মার্কিন শাসকমহল এবং তাঁদের মুখপাত্রদের অসংখ্য ঘোষণার প্রতিধ্বনি করে বলা হয়েছে যে, এই গোটা গ্রহটার—এর জল, স্থল, আকাশ আর মহাকাশ-ভাগেরও দেখ-ভাল করবার দায়িত্ব তাঁদেরই! তিনি বলেন, এ তিনি বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন "জাতীয় স্বার্থেরই" কথা!

এঁদের অসংখ্য মুখপত্রে সর্বক্ষণ এই ধরনের "জাতীয় স্বার্থেরই" প্রচার করা হয়ে থাকে ;—যেমন, "ভিয়েৎনামে আমাদের উপস্থিতি আমাদের জাতীয় স্বার্থের অনুযায়ী ; সে-বিষয়ে আমরা স্থিরনিশ্চিত হয়েছি। তবে, আমাদের উপস্থিতি যে ভিয়েৎনামীদের জাতীয় দায়িত্ব অনুযায়ী, এ-কথা তাদের আমরা বিশ্বাস করাতে পারি নি" ('স্যাটার্ডে রিভিয়ু')।

তবে, স্বরাষ্ট্রনীতি আর পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে সম্পর্কের প্রধান মর্মবস্তু হল তার শ্রেণীগত ভিত্তি, অবশ্য বুর্জোআ রাজনীতিবিদেরা সেটা স্বীকার করতে চান না। 'যাতে একচেটিয়া কারবারের ভাল তাতেই দেশের ভাল',—এই হল তাদের স্বরাষ্ট্রনীতি : তাই তাঁরা অনুসরণও করছেন। কিন্তু তাঁরা দেখাতে চান, তারা যেন এই শ্রেণী যা করে আসলে লিঙ্কনের ধারাটাকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তবু, বৃটিশ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবীর মতো বুর্জোআ আদর্শবিদ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভক্তকেও সে-কথা প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। পেন্‌সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, বর্তমান আমেরিকা সেই বিশ্ববিপ্লবের প্রেরণাদাতা আর নেতা আর নয়। বর্তমান আমেরিকা বরং বিশ্বপ্রতিবিপ্লবেরই নেতা।

তবে, পররাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে মতাদর্শগত উপাদান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে-ভূমিকায় ব্যবহার করেছে তেমনটি আর কোনো ধনতান্ত্রিক দেশে দেখা যায় না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তৎপরতা সৃষ্টি এবং ত্বরান্বিত করবার জন্যে সেগুলি হয়েছে মতাদর্শগত আবরণ। 'মন্‌রো ডক্‌ট্রিন' আমেরিকানদের জন্যে আমেরিকার প্রকৃত অর্থ হল—'ইয়াঙ্কিদের জন্যে আমেরিকা'। চীন এবং পরে অন্যান্য অঞ্চলে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার সংক্রান্ত কর্মনীতির আবরণ ছিল 'ওপন্ ডোর ডক্‌ট্রিন'। 'সারা-পৃথিবীর পুলিশ' হতে চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করে তার 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন'। ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কর্মসূচী হল মার্কিন 'লিবারেশন ডক্‌ট্রিন্'। কোথায়ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে সেটাকে "শূন্যস্থান" নাম দিয়ে সেখানে মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের কর্মনীতি প্রচারিত হয়েছে—তার মতাদর্শগত আচরণের নাম 'আইজেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিন।' এর কোনো কোনো 'ডক্‌ট্রিনে'র একটা মিশ্র স্বরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক প্রকৃতিও দেখা যায়। যেমন কিনা, কেনেডি সরকারের 'নিউ ফ্রন্টিয়ার'-এর অর্থ দাঁড়াল—অপেক্ষাকৃত নমনীয় এবং কুশলী কর্মকৌশলে পররাষ্ট্রনীতি আর নয়াউপনিবেশবাদ [illegible]।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বি-পার্টির পররাষ্ট্রনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্রের প্রকট প্রকাশ ঘটেছে। ডেমোক্র্যাট ট্রুম্যানের আমলে এল একটা মস্ত পরিবর্তন—সামরিক জোটে না-জড়াবার চিরাচরিত কর্মনীতি বর্জন। এই কর্মনীতির অন্যতম প্রধান রচয়িতা ছিলেন সেনেটে তখনকার রিপাবলিকান দলের নেতা ভ্যাণ্ডেনবুর্গ। 'রিপাবলিকান' রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারকে ১৯৫২ সালে কোনো কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট দলের কর্তা পার্টির প্রার্থী মনোনীত করতে চেয়েছিলেন। আসলেও এই আইজেনহাওয়ারের পররাষ্ট্রনীতিকে নাকি তাঁর রিপাবলিকান পার্টির প্রতিনিধিদের চেয়ে দৃঢ়তররূপে সমর্থন করেছিল ডেমোক্র্যাটরা। তবে হালের ক'বছরে এই দ্বিপার্টির ব্যবস্থায় কিছুটা চিড় ধরবার লক্ষণ দেখা গেছে। অবশ্য সে-চিড়টা প্রকাণ্ড নয় ব্যবস্থাটাকে বজায় রাখবার চেষ্টাই বরং প্রবল।

দ্বিপার্টির ব্যবস্থাটায় যে-সংকট দেখা দিয়েছে তার মূলে রয়েছে পররাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে তীব্র সংগ্রাম এবং শান্তি আর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনের প্রসার। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির পিছনে প্রধান সামাজিক শক্তি হল ট্রেড ইউনিয়নগুলি, কিন্তু বেশ কিছু ট্রেড ইউনিয়ন শান্তি-আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। দুই-কোটি নিগ্রোর সংগ্রামও শান্তি-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট. তার উপর, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার অগ্রগতি, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নবীন রাষ্ট্রগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাবপ্রতিপত্তি; এসব মিলে যেমন আমেরিকায় নিগ্রো আন্দোলনের সহায় হয়েছে, তেমনি মার্কিন সরকারকেও ঐ আন্দোলনের প্রতি কন্‌সেশন দিতে বাধ্য করেছে। আবার, সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে এই নিগ্রো আন্দোলন মার্কিন সরকারের পররাষ্ট্রনীতির উপরও একটা প্রভাব বিস্তার করে। (এই সমগ্র প্রক্রিয়াতে স্বরাষ্ট্রনীতি আর পররাষ্ট্রনীতির মধ্যেকার পারস্পরিক দ্বন্দ্বটাও স্পষ্ট।) সেই হিসাবেই. পারমাণবিক পরীক্ষানিষিদ্ধকরণ চুক্তির জন্যে ১২০০ আমেরিকান বিজ্ঞানীর যুক্ত দাবি, ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে শান্তির আবেদনে ১৫০০ বিজ্ঞানীর স্বাক্ষর, ইত্যাদি ঘটনাও বিশেষ তাৎপর্যসম্পন্ন। কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত বিপ্লব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটিয়ে দিচ্ছে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধের প্রকৃতি সম্বন্ধে সংশয় আশঙ্কা রয়েছে; সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দুই ব্যবস্থার বিভিন্ন আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক আর কারিগরি শক্তির

মূল্যায়নেও বিভিন্ন মত আছে, শাসক বুর্জোআরা সে-সব বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি উপেক্ষা করতে পারে না। সব মিলিয়ে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে বিভিন্ন সরকারের উপর জনমতের চাপ উপেক্ষণীয় নয়; সরকারের স্বেচ্ছাচারের সীমানাও খর্ব হচ্ছে, এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ষোল আনা উপেক্ষা করা চলছে না বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বুর্জোআদের আদর্শবিদেরা অস্বস্তি এবং বীতরাগ প্রকাশ করছেন।

তিন

পররাষ্ট্রনীতির অনুধাবন করবার বস্তু হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র, এক-একটা নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। দুই বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার ধারা, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙনের দরুন তাতে পরিবর্তন, এবং অসম বিকাশের দরুন সাম্রাজ্যবাদী সামরিক গোষ্ঠীগুলির কাঠামে বিভিন্ন পরিবর্তন, এই সব প্রক্রিয়া বহুলাংশে, কখনও চূড়ান্তভাবেই, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে।

দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার ধারা কখনও কখনও মার্কিন স্বরাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রতিযোগিতার অবস্থায় গভীর আর্থনীতিক সংকট রোধ করতে হবে। ব্যাপক বেকারি এড়িয়ে চলতে হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মনীতি সংক্রান্ত কোনো কোনো দলিলেও এ-মর্মের কথা স্পষ্ট প্রকাশ করা হয়। তাঁদের সামাজিক এবং জাতি সংক্রান্ত কর্মনীতিক্ষেত্রে অন্তত কিছুটা নমনীয়তাও আসে ঐ রকমেরই বিচার-বিবেচনা অনুসারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলি সম্বন্ধে মার্কিন কর্মনীতি, নয়াউপনিবেশবাদী কর্মনীতি বহুলাংশেই দুই ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রাম আর প্রতিযোগিতার ধারা অনুসারেই নির্ধারিত হয়। নবীন রাষ্ট্রগুলির অ-ধনতান্ত্রিক পথ ধরবার চেষ্টা রোধ করাই এই নয়াউপনিবেশবাদী কর্মনীতির মূল কথা।

মার্কিন সেনেটের পররাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী সংক্রান্ত কমিটির বিভিন্ন সংস্থা মিলে যে-রিপোর্ট তৈরি করেছিল সেটাই ১৯৬০ সাল থেকে মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতির ভিত্তি হিসাবে রয়েছে। এই রিপোর্টে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছিল: সোভিয়েত ইউনিয়ন যে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং যে-সাহায্য দেয় তার দুর্জয় আকর্ষণশক্তি টানছে সদ্যস্বাধীন দেশগুলিকে; এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে কোনো

না কোনো রকমের সমাজতান্ত্রিক ধারাই উন্নয়নের প্রধান ধারা ; উন্নয়নশীল দেশগুলি এইভাবে 'হাতছাড়া' হলে বিশ্বশক্তিসাম্যের মূলগত পরিবর্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকূলে ঘটে যাবে ('আইডিঅলজি অ্যাণ্ড ফরেন অ্যাফেয়ার্স,—ওয়াশিংটন, ১৯৬০ ; 'ওয়ার্লড ওয়াইড অ্যাণ্ড ডমেস্টিক ইকনমিক প্রব্লেম্‌স্‌ অ্যাণ্ড দেয়ার ইম্‌প্যাক্‌ট্‌ অন্‌ দি ফরেন পলিসি অফ দি ইউনাইটেড স্টেট্‌স্‌'—ওয়াশিংটন, ১৯৫৯)।

ধনতান্ত্রিক শিবির এবং বিভিন্ন সামরিক জোট নিয়ে গড়া ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটছে। যুদ্ধোত্তর কালের গোড়ার দিকে মার্কিন নেতৃত্বে যে-আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব শেষ হয়ে আসছে। বিশ্ব অর্থনীতিক্ষেত্রে এবং ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অর্থনীতিক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ সংকুচিত হয়ে আসছে ; ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় দেখা দিয়েছে নতুন নতুন আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক কেন্দ্র—তীব্রতর আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জর্জরিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শিবির।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই আনুকূল্যে পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্র আবার দাঁড়িয়ে উঠেছে। কিন্তু শক্তি লাভ করে তা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে ফাটল যেটা ধরেছে সেটা প্রথমত আমেরিকা আর পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে। 'ইউরোপীয় অখণ্ডতা' স্থাপনে উৎসাহ দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই—সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরুদ্ধে ; কিন্তু তা এখন আমেরিকার বিরুদ্ধেই গুরুতর আর্থনীতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

বিশেষ করে দ্য গল পশ্চিম ইউরোপের রাজনীতিক অখণ্ডতার যে-পরিকল্পনা দিয়েছেন তার লক্ষ্য হল মার্কিন প্রভাব সীমাবদ্ধ করা ; দ্য গলের ভাষায় 'ইউরোপীয় ইউরোপ' গড়ে তোলা। 'ইউরোপীয় অখণ্ডতা'র বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবার জন্যে তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো কোনো মহলে কথা উঠেছে। জেনরল নরস্টাড-এর নেতৃত্বে রিপাবলিকানপন্থী একটি 'স্টাডি গ্রুপ' বলেছেন যে, আমেরিকানরা এতদিন অপরাপরকে ঐক্যবদ্ধ হতে পরামর্শ দিয়ে এসেছেন—এখন অন্যান্যকে আমেরিকানদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করাবার সময় হয়েছে। তাঁদের রিপোর্টে সোজা প্রশ্ন তোলা হয়েছে : পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির ঘনিষ্ঠ আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক ঐক্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থানুযায়ী কিনা।

বিভিন্ন আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠাতে, সে প্রক্রিয়াতেই বিভিন্ন পুরন জোটে সংক্রামিত হচ্ছে অবক্ষয়। আর নতুন নতুন রাজনীতিক সমবায় দেখা দিচ্ছে—যদিও এখনো তা পাকাপাকি হয় নি। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্যারিস সন্ধিচুক্তি অনুসারে গড়া প্যারিস-বন অক্ষ তার একটি দৃষ্টান্ত, আবার হালে তাতে চিড় ধরেছে তাও লক্ষণীয়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ই মতভেদের কারণ।

পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-বিরোধের ঘনীভূত অভিব্যক্তি ঘটেছে অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার সংকটের মধ্যে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিভাগের প্রাক্তন কর্মকর্তা রোন্যাল্ড স্টীল লিখেছেন যে, প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সামরিক মৈত্রী হিসাবে এই সংস্থাটি অতীতের একটা জীর্ণ মনুমেন্টের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি এর দুটি প্রধান কারণ দেখিয়েছেন: (১) অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে যে-বিপ্লব ঘটে গেছে তার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সমগ্র ইতিহাসে এই প্রথম আর অভেদ্য নেই; (২) আর্থনীতিক-পরাক্রম এবং প্রবল রাজনীতিক উদ্যোগ নিয়ে দেখা দিয়েছে পশ্চিম ইউরোপ। এইভাবে অতলান্তিক চুক্তি-সংস্থার পুরন ভিত্তি নষ্ট হয়ে গেছে এবং এর ভবিষ্যৎ হয়ে উঠেছে সংশয়ময়, এমনকি অবাঞ্ছিত (রোনাল্ড স্টীল—'দি এণ্ড অব অ্যালাইয়্যান্স: আমেরিকা অ্যাণ্ড দি ফিউচার অব ইওরোপ'—নিউইয়র্ক)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতকাল যে-কোনো অস্ত্রশস্ত্রের নাগালের বাইরে ছিল ততকাল যুদ্ধের অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র পারমাণবিক অস্ত্রশক্তির ষোল আনা সহায় পাওয়া যাবে বলে অতলান্তিক চুক্তিসংস্থার ইওরোপীয় সদস্য-দেশগুলি নিঃসন্দেহ ছিল। কিন্তু অবস্থা বদলে গেছে। প্যারিস কিংবা পশ্চিম বার্লিনের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিউইয়র্ক কিংবা ওয়াশিংটনের বিপদের ঝুঁকি নেবে তার নিশ্চয়তা কি। কেনেডি একবার সেই রকমের নিশ্চয়তা দিলে তার জবাবে দ্য গল যা বলেছিলেন সেটার অর্থ দাঁড়িয়েছে যে, পরবর্তী রাষ্ট্রপতির উপরও বাধ্যবাধকতা বর্তায় এমন প্রতিশ্রুতি কোনো মার্কিন রাষ্ট্রপতি দিতে পারেন না। "জোট যতই ব্যাপকতর হয় ততই যুক্ত কর্মকাণ্ডের দাবি অধিকতর গুরুতরভাবে এবং সরাসরি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে"—এই অতীত অভিজ্ঞতা দেখিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির একজন বিশিষ্ট তত্ত্ববিদ হেনরি কিসিঙ্গার "কোআলিশন ডিপ্লোম্যাসি ইন দি নিউক্লিয়ার এজ"-শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন: "বরাবরের ঐ সমস্যা আরও বড় হয়ে উঠছে এই

পারমাণবিক যুগে।…পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ যা প্রচণ্ড তাতে সাহায্য সংক্রান্ত দায়দায়িত্বের উপর নির্ভরযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হয়।"

সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটগুলিতে যেসব সংকট দেখা দিয়েছে তার বিশ্লেষণ এবং তাৎপর্য স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় হতে পারে। তবে, দ্য গলের নেতৃত্বে ফ্রান্স যেভাবে চলছে, প্রস্তাবিত "বহুপক্ষীয় পারমাণবিক বাহিনী" নিয়ে যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, অস্ত্রক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেরকম 'কর্ম-বিভাগ' চাইছে সেটা পশ্চিম ইওরোপীয়দের দৃষ্টিতে কতখানি অবাঞ্ছিত, এই রকমের উপাদানগুলির উল্লেখমাত্রই এখানে যথেষ্ট। অতলান্তিক চুক্তি-সংস্থায় এইসব দ্বন্দ্ব-বিরোধ কোনো কোনো পরিস্থিতিতে সংস্থাটাকে ভেঙে ফেলতেও পারে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী জোটগুলির ভিত্তি হিসাবে রয়েছে একটা অপরিবর্তিত শ্রেণীস্বার্থ এবং সেটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের দ্বন্দ্ব-বিরোধগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় না।

নতুন অবস্থার সঙ্গে সংগতিবিধানের প্রয়োজনবোধও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো কোনো মহলে দেখা দিয়েছে। অধিকতর দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং সুস্থমতি কোনো কোনো রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী এবং লেখক সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে সহ-অবস্থান মেনে নেবার পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন। সারা পৃথিবীর উপর নেতৃত্ব আর পুলিশি খবরদারি করবার অবাস্তব কর্মনীতি ছেড়ে বাস্তব সুযোগ-সম্ভাবনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্বে সীমাবদ্ধ থাকবার জন্যে তাঁরা আহ্বান জানাচ্ছেন।

তবে, পরিবর্তিত, বর্তমান শক্তিসাম্য উপেক্ষা করে এগিয়ে চলবার ঝোঁকও প্রবল। তাদের মতে মিত্রদের প্রশ্রয় না দিয়ে ঠাণ্ডাযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা আর আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের অবস্থায় তাদের জড়ো করে রাখাই সহজ পন্থা!

চার

পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে পশ্চিমী শাসকমহলগুলির মধ্যে যে-আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব রয়েছে সেটা ১৯৬৪ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে খুবই প্রভাবান্বিত করেছিল। নির্বাচনী অভিযানে প্রধান বিষয়ই ছিল পররাষ্ট্রনীতি। উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল ফাশিস্ত চক্রগুলির প্রতিনিধি এবং রিপাবলিক্যান পার্টি থেকে মনোনীত প্রার্থী আরিজোনার সেনেটর ব্যারি

গোল্ডওয়াটারের পররাষ্ট্রনীতি-সংক্রান্ত কর্মসূচী ছিল একেবারে সরাসরিই যুদ্ধের কর্মসূচী: সহ-অবস্থান আর নিরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে; সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে আলোচনা, বাণিজ্য ইত্যাদি বন্ধ; কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সর্বতোমুখী সর্বাত্মক অভিযান; সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ এবং সোভিয়েত বলটিক প্রজাতন্ত্রগুলি, উক্রাইন, আর্মেনিয়া অবধি সমস্ত সমাজ-তান্ত্রিক দেশের বলপূর্বক "মুক্তি"; মিলিটারির হাতে আরও ক্ষমতা—পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাসমেত; কিউবায় আক্রমণ; ভিয়েৎনামে অ্যাটমবোমা বর্ষণ; বার্লিন প্রাচীর ধ্বংস, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ডেমোক্রাটিক পার্টির নির্বাচনী কর্মসূচীতেও কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল এবং আক্রমণমুখী বক্তব্য ছিল; কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে ডেমোক্রাটরা শান্তি এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের ব্যবস্থাবলীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তদনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিও ঘোষণা করা হয়েছিল। ডেমোক্রাটিক প্রার্থী জনসন সোজা বলেছিলেন যে, বর্ধিত আন্তর্জাতিক উত্তেজনা আর উত্তেজনা প্রশমনের মধ্যে, যুদ্ধ আর শান্তির মধ্যে বেছে নিতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চরম প্রতিক্রিয়াশীল, জাতিবিদ্বেষী, আক্রমণমুখী, ফাশিস্তমনোভাবাপন্ন মহলগুলি সমর্থন করেছিল গোল্ডওয়াটারকে। মৃত্যু-ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্যে অনেকেই এবং আরও অনেকে গোপনে গোল্ডওয়াটারকে অর্থসাহায্য দিয়েছিল। গোল্ডওয়াটারকে কোনো ভৌগোলিক এলাকার প্রার্থী বলে মনে করাটা ঠিক নয়। এই সমর্থকেরা ছিল সমস্ত ভৌগোলিক এলাকারই, সেটা নাম করে করেও দেখান যায়।

সবচেয়ে বড় এবং অপেক্ষাকৃত বেশি পরাক্রমশালী একচেটিয়া কারবারি-সমেত প্রায় সমস্ত একচেটিয়া কারবারিই সমর্থন করেছিল জনসনকে। গোল্ডওয়াটারের মতো বেসামাল লোককে কর্ণধার করতে তারা ভরসা পায় নি। গোল্ডওয়াটারের পক্ষের ভোটদাতাদের সবচেয়ে বড় অংশ ভোট দিয়েছিল রিপাবলিকান পার্টির পক্ষে তাদের দাঁড়াবার রেওয়াজ অনুসারে এবং জাতি-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে।

গণতন্ত্রসম্মত বিভিন্ন অধিকার বিপন্ন দেখে এবং রকেট-পারমাণবিক মহাযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জড়িয়ে পড়বার বিপদের মুখে গোল্ডওয়াটারবিরোধী একটা অঘোষিত 'ফ্রন্ট' গড়ে উঠেছিল—সমস্ত রকমের প্রগতিশীল ব্যক্তি আর

ধারা এবং সমস্ত রকমের সুস্থমতি শক্তি ছিল তার মধ্যে। এই নির্বাচন হয়ে উঠেছিল যুদ্ধ-শান্তির প্রশ্নে গণভোটের মতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে বিভিন্ন সামাজিক শক্তির নিজ নিজ সুনির্দিষ্ট অবস্থানে দাঁড়াবার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে এবং সেটা যে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বসম্পন্ন উপাদান হয়ে উঠছে, তারই পরিচয় পাওয়া গেল এর থেকে।

গোল্ডওয়াটার পরাস্ত হলেও, যেসব প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী শ্রেণীশক্তি আর রাজনীতিক শক্তি ছিল গোল্ডওয়াটারি ঝোঁকের পিছনে তারা মার্কিন সরকারের উপর চাপ দিয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে এখনও নিজেদের কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করাবার জন্যে সচেষ্ট আছে। পররাষ্ট্রনীতির দ্বিপার্টিয় ভিত্তিটাকে পুনঃস্থাপন করবার জন্যে উভয় পার্টি চেষ্টা করছে।

নির্বাচনের পর বেশি দেরি হয় নি—মার্কিন সরকারী কর্মনীতিতে আক্রমণমুখী ধারা সুস্থির হয়ে উঠতে চাইছে। প্রতিহিংসাকামী পশ্চিম জার্মানদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র দেবার উগ্র উদ্যোগ, কিউবার বিরুদ্ধে অব্যাহত প্ররোচনা, কঙ্গোয় সামরিক হস্তক্ষেপ, জাতিসংঘে সংকটসৃষ্টি, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রে সামরিক অভিযান, সর্বোপরি ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের উপর দীর্ঘস্থায়ী বিমান-আক্রমণ, ইত্যাদি ঘটনা তার সাক্ষ্য।

পাঁচ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং পররাষ্ট্রীয় কর্মসংস্থার ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রবল—তবু, বিভিন্ন বিষয়ী সবজেকটিভ উপাদানের চেয়ে সমকালীন বিভিন্ন বাস্তব চালিকাশক্তির প্রভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয়ে আসছে এবং তাইই হতে থাকবে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণী-শক্তির ভারসাম্য শান্তি এবং সমাজতন্ত্রেরই অনুকূলে পরিবর্তিত হতে থাকবে, এমন মনে করবার কারণ রয়েছে। ইতিহাস এবং বিশ্ব বিপ্লব প্রক্রিয়ার মধ্যে সবসময়ই এটা-ওটা প্রতিবন্ধ, বাধাবিপত্তি, এমন কি সাময়িক পশ্চাদপসরণও থাকেই—তবু, বিকাশের সাধারণ ধারাটা খুবই স্পষ্ট। বিশ্ব সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ভিত্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে, বিশ্ব অর্থনীতিতে তার অংশ বেড়েই চলেছে; পৃথিবী জুড়ে শান্তি, প্রগতি আর সমাজতন্ত্রের শক্তি বাড়ছে; আন্তর্জাতিক

কর্মনীতিক্ষেত্রে সুস্থিতিসাধনের সক্রিয় উপাদান হিসাবে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির আন্তর্জাতিক প্রভাবপ্রতিপত্তি বাড়ছে।

ধনতান্ত্রিক শিবিরের ভিতরে—অর্থনীতিক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ কমতে থাকবে এবং কর্মনীতি নির্ধারণের ডিক্টেটরি ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হতে থাকবে। সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটগুলিতে যে-দুর্বলতা সংক্রামিত হয়েছে সেটা নিছক আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব-বিরোধের অভিব্যক্তি ছাড়াও অন্তত কিছু পরিমাণে আমেরিকার মিত্রদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী, উদারনীতিক লোকেরও ফল। (রোন্যাল্ড স্টীল তাঁর উপরে উল্লিখিত বইয়ে লিখেছেন: "অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার মধ্যে···আজ লক্ষ্যগুলি নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। রুশ আক্রমণ-অভিযানের কথা কেউ আর বিশ্বাস করে না, উত্তর অতলান্তিক মৈত্রী সংস্থা আজ যে-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেটা ঐ অভিযানের বিরুদ্ধে ইওরোপকে কি করে রক্ষা করা যায় তা নিয়ে ততটা নয়, যতটা ইউরোপে রাশিয়া এবং পশ্চিমের মধ্যে কি রকমের রাজনীতিক মীমাংসা হবে তাই নিয়ে।") মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিবাচনে গোল্ডওয়াটার দাঁড়ালেন দেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ইউরোপীয় মিত্রদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে-উদ্বেগ নানা উপায়ে প্রকাশও করা হয়েছিল। বাইরের সমগ্র রাজনীতিক পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে এবং বিভিন্ন সামরিক আর রাজনীতিক জোটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান যা দাঁড়িয়েছে সেটা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পক্ষপাতী বাস্তববাদী ধারাগুলিরই অনুকূল। পশ্চিম ইওরোপের বিভিন্ন দেশে প্রগতিশীল এবং বামপন্থী শক্তিগুলির অগ্রগতিও ঐ প্রক্রিয়ার সহায়ক। ইওরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এবং ইওরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রসারও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

লেনিন বলে গেছেন যে, বিশ্ব আর্থনীতিক সম্পর্কের সাধারণ ধারাটির শক্তি কোনো কোনো বৈরী রাজনীতিক বাসনা আর চেষ্টার চেয়ে ঢের বেশী। উপযুক্ত সময়ে এই ধারাটি শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় সহায়ক হবে। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং অন্যদিকে বিভিন্ন ইওরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশ আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও মধ্যে বাণিজ্যবৃদ্ধি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে

বাণিজ্যের উপর যেসব বাধানিষেধ রয়েছে সেগুলি অপসারণের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন—১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হোয়াইট হাউসে ২০০ বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর সম্মেলন, ইউ. এস. চেম্বার অব কমার্স, অ্যামেরিকান ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ম্যানেজার্স এবং আমেরিকার বড় বড় কারবার আর ব্যাঙ্কের ৯২ জন কর্মকর্তার যে-দলটি ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসে মস্কো গিয়েছিলেন।

তবে, বিপরীতমুখী বিভিন্ন শক্তি এবং উপাদানও সক্রিয় রয়েছে: সোভিয়েত-আমেরিকান সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলবার চেষ্টায় বাধা দেওয়া হচ্ছে। পরস্পরের বিরোধী মতাদর্শগত এবং সামাজিক-রাজনীতিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত যেসব দ্বন্দ্ব রয়েছে এই দুই দেশের মধ্যে সেগুলির গুরুত্ব কিছুতেই খাটো করে দেখা চলে না।

পৃথিবীতে যে-নতুন শক্তিসাম্য দেখা দিয়েছে, আর পারমাণবিক যুগে যুদ্ধের যা সম্ভাব্য পরিণতি, তার মুখে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে সামনাসামনি আক্রমণ হতে পারছে না; কিন্তু অলিগলি দিয়ে এগোবার চেষ্টা চলছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরে অনৈক্য সৃষ্টি করবার সম্ভাবনা হিসাবে রেখেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতির নতুন মূলকৌশল এবং কর্মকৌশল পরিচালিত হচ্ছে।

তথাকথিত "সামরিক অবস্থান থেকে" পরিচালিত দেউলিয়া কর্মনীতি বর্জন করে নমনীয় এবং প্রচ্ছন্ন কর্মকৌশল অনুসরণ করবার পক্ষপাতী যাঁরা —যেমন কেনান, ষ্টীল, লিপম্যান, ফুলব্রাইট এবং আরও কেউ কেউ—তাঁরাও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে "কীলক ঢুকিয়ে দেবার", মতভেদ চাগিয়ে তুলবার এবং সংঘাত বাধাবার কর্মধারা প্রচার করছেন। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডীন রাস্ক-এর ১৯৬৪ সালের ২৫এ ফেব্রুয়ারি তারিখের বক্তৃতায় সেটাকে সরকারী কর্মধারা হিসাবেই ঘোষণা করা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি স্বভাবতই এই শত্রুতার বিরুদ্ধে সদাসতর্ক থাকতে বাধ্য। এর ভিতর থেকেও নতুন করে দেখা যায় যে, একালের মূল দ্বন্দ্ব-বিরোধ হল সমাজতন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে।

সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণমুখী সম্প্রসারণকামী কর্মনীতির পথে প্রধান অন্তরায় হল সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থনীতিক, রাজনীতিক এবং সামরিক শক্তি। যেখানেই বিশ্ব-শান্তি, মুক্তি এবং স্বাধীনতা বিপন্ন হয় সেখানেই সেই বিপদের

বিরুদ্ধে প্রবল রক্ষী হয়ে দাঁড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন। এরই সঙ্গে সঙ্গে, সমস্ত দেশেরই সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করে তুলবার জন্যেও সোভিয়েত ইউনিয়নের চেষ্টার ত্রুটি নেই। তবে, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান একতরফা হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসকমহলগুলির মনোভাব কি হবে, তাই নিয়েই কথা। গত নির্বাচনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রথম পদক্ষেপগুলি—ভিয়েৎনামে, কিউবায়, ডমিনিকন প্রজাতন্ত্রে, কঙ্গোয়, অন্যত্র—উদ্বেগেরই কারণ হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি যে-আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে তার থেকে উদ্ভূত সমগ্র বাস্তব পরিস্থিতিই চূড়ান্ত নির্ণায়ক উপাদান হয়ে দেখা দেবে।

ব্রুনো আপিৎস্

দু মিনিট

১৯০০ সালে লাইপজীগে ব্রুনো আপিৎসের জন্ম। কৈশোরেই তিনি প্রগতিপন্থী যুব-আন্দোলনে যোগ দেন। কিছুকাল থিয়েটারের দলের অভিনেতা ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার পর ১৯২৭ সালে ব্রুনো লিখতে শুরু করেন। ১৯৩৩ সালে নাৎসী সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তিন মাস পরে মুক্তি দেয়—আবার পরের বছর গ্রেপ্তার করে। তিন বছর পরে তাঁকে বুখেনভাল্ড বন্দীশিবিরে পাঠানো হয়; যুদ্ধশেষে সেই শিবির উঠে যাওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি সাংবাদিকের ও থিয়েটার আর ডেফা ফিল্ম স্টুডিয়োর নাট্যকার হিসেবে কাজ করেন। বেতারের উপযোগী তিনি অনেক নাটিকা লেখেন। তবে তাঁর সবচেয়ে নামজাদা উপন্যাস হল 'নেকেড অ্যাণ্ড উলভ্স্'; বুখেনভাল্ড শিবিরের বন্দীদের অসমসাহসিকতা আর মৃত্যুঞ্জয়ী বীরত্বের মর্মান্তিক কাহিনী এতে বিবৃত হয়েছে। বইটির অনুবাদ হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়। চলচ্চিত্রে এবং টেলিভিশনেও এর রূপায়ণ হয়েছে। এই হৃদয়গ্রাহী উপন্যাসটির জন্য লেখক জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

খ্রীষ্টোৎসবের আগের দিন শহরের বন্দীনিবাসটি একেবারে নীরব নিঃশব্দ। দরজায় তালা লাগানোর আর খোলার ঘর্ঘর আওয়াজ, কারারক্ষীদের হাঁকডাক তর্জন, লোহার সিঁড়িতে বন্দীদের ওঠানামার খটখট শব্দ—সবই আজ স্তব্ধ। বন্দীদের জেরা করতে ডাকার জন্য যে-ঘণ্টা বাজানো হয় তার তীক্ষ্ণ মর্মভেদী স্নায়ুবিদারী ধ্বনি পর্যন্ত আজ শোনা যায় না।

নিচের তলায় অফিসঘরে বসে একটি সার্জেন্ট চুরুট টানতে টানতে খবরের

কাগজখানি পড়ছে। ক্যালেণ্ডার আর ওর পিছনের দেয়ালের মাঝখানটায় এভারগ্রীণের একটি গুচ্ছ রাখা হয়েছে। কেবল কারারক্ষীরা ছাড়া অন্য সব পাহারাদারই আজকের এই উৎসবে আনন্দ করবে বলে বাড়ি গিয়েছে।

চারিদিক ঘিরে রয়েছে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা!

কারাকক্ষ পরিষ্কার করতে গিয়ে কয়েদীরা কর্মব্যস্ত দিনগুলির কচকচি কোলাহলও যেন জঞ্জালের মতো ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। শুধু রয়েছে বন্দীদের সেলের বন্ধ দরজার বাইরের হিমশীতল নীরবতা। কারাগারে আর তিলধারণের স্থান নেই। এক-একটি সেলে পাঁচজন ছ'জন করে লোক রাখা হয়েছে। কেবল দোতলায় ১৪৬ নম্বরের সেলে একটি কয়েদীকে একা রাখা হয়েছে। নাৎসি জার্মানির গোয়েন্দা পুলিশের কয়েদী সে, নাম তার লুড্ভিগ গেরমার।

সে এখানে এসেছে বেশিদিন নয়। শহরের যেদিকে ও থাকে, সে-পাড়ার কমরেডদের সকলকেই কয়েকমাস আগে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু ওকে ধরে এনেছে এই সবে দিন পনের হল। একদিন ভোর পাঁচটায় হঠাৎ দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল খুব জোরে। হেডি চমকে বিছানায় উঠে বসে বলে—“লুড্ভিগ, কে এল বলো তো?”

“ওরাই এসেছে”—শুকনো ম্লান হেসে ও ফিসফিস করে বললে।

ছোট্ট খাটে শিশুটি শান্তিতে ঘুমোচ্ছিল। আগন্তুক লোকগুলো শোবার ঘরের সব জিনিসপত্র যখন তছনছ করছিল, তখনই সে কেবল একবার জেগে উঠল। হেডি তাড়াতাড়ি ওকে কোলে নিয়ে শান্ত করল।

এ-ও দু'সপ্তাহ আগেকার ঘটনা। এর মধ্যে একবার মোটে, বন্দী হবার তিনদিন পরে গেরমার ওর স্ত্রীকে দেখতে পেয়েছে। সেল থেকে বের করে ওকে লোহার সিঁড়ি দিয়ে নাবানো হল। ভাবলে, জেরা করার জন্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু ওকে অন্য একটি ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে অনেক লোক—সবাই ওর অজানা। হঠাৎ দেখে অন্য কয়েদীদের সঙ্গে সে-ও বসে আছে—তার স্ত্রীর মুখোমুখি। সবাইরই বাড়ির লোক এসেছেন দেখা করতে।

হেডি ওকে দেখে যেন প্রচণ্ড এক ধাক্কা পেল মনে। ক'দিন দাড়ি কামানো হয় নি, তাছাড়া মারের চোটে মুখখানা বিকৃত হয়ে গেছে।

গেরমার নিজে বুঝতে পারে নি যে ওকে কেমন দেখাচ্ছে। ওর কাছে আয়না নেই বলে জানে না যে ও কি অদ্ভুত বদলে গেছে।

যাঁরা দেখা করতে এসেছিলেন তাঁদের সবাইকে একটু পরেই আবার কারারক্ষী পুলিশরা তাড়া করে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। কয়েদীদের ফিরিয়ে নিল তাদের নিজেদের সেলে। ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি চলছিল। হেডি আর লুড্‌ভিগ পরস্পরকে দেখে অভ্যস্ত হবার আগেই টের পেল তাদের বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তখনও যে একটি শব্দ পর্যন্ত বিনিময় হয় নি সে খেয়াল হবার আগেই লুড্‌ভিগ দেখল হেডি প্রায় দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। সে কোনোমতে ঠেকে-ঠেকে মাত্র দু-চারটি কথা উচ্চারণ করল। হেডির ব্যথাতুর মুখখানা কান্নায় ফেটে পড়ছিল।

"তুমি কিছু ভেবো না হেডি। আমি ফিরে আসব। বড়দিনে আমি ঠিক বাড়ি যাব। খোকাকে আমার আদর দিও।"

কথাগুলি বলে ওর মুখে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটল। তখন সে ভুলে গেছে যে তার উপরের মাড়িতে দাঁত নেই। প্রথম দিনই ওরা সব দাঁত ভেঙে দিয়েছিল। তাতে মুখখানা অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে।

সেই যে গ্রেফতারের একটি ঢেউ চলেছিল, তারই টানে গেরমার সবশেষে ধরা পড়েছে। সব কমরেডরা বন্দী হওয়ায় তাদের নবগঠিত গুপ্তদল একেবারেই ভেঙে গেছে। পুলিশ অধ্যক্ষ জোকার মারপিট করে বন্দীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করেছেন। তিনি অবশ্য লোক খুব ভদ্র, মারের ব্যাপারে নিজে থাকেন না। কেউ যদি গুপ্ত কথা বলতে রাজী না হয়, তবে তাকে একটি সেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সে ঘরে থাকে একটা ছোট টেবিলে এক টাইপরাইটার, ঘরের মাঝখানে একটি চেয়ার, কোণায় একটি জলের কল। তার পাশে একটা নোংরা রক্তমাখা তোয়ালে ঝুলছে।

অবাধ্য কয়েদীদের জেরার জন্য প্রস্তুত করবে বলে ছজন পুলিশের লোক এখানে সাধারণ পোশাকে কাজে নিযুক্ত থাকে। "আচ্ছা, তুমি কিছু বলবে না মনে করেছ, দাঁড়াও শূয়ার কাঁহাকা। পনের মিনিটের মধ্যে তোমাকে পাখির মতো গান গাওয়াব।"—এই বলে কয়েদীকে জোর করে চেয়ারে বসান হয়। দুটি লোক ওর হাত-দুখানা চেয়ারের পিছন দিকে টেনে মুচড়ে ধরে। অন্য দুজন পা-দুটো মাটির সঙ্গে জোরে চেপে দাঁড়ায়। একজন পিছন থেকে ওর চুল ধরে টেনে রাখে। ষষ্ঠজন ওর দু-পায়ের ফাঁকে সামনে

দাঁড়িয়ে থাবার মতো মুঠো দিয়ে দমাদ্দম ঘুষি মারে। প্রচণ্ড আঘাতে বন্দীর চিৎকার ক্রমে গোঙানিতে মিলিয়ে যায়। লোকটি যথেষ্ট কাবু ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে বুঝলে ওরা চেয়ারটিকে টেবিলের উপর তুলে দিয়ে তাকে কর্তার হাতে সমর্পণ করে। মাঝে মাঝে লোকটি হয়তো অচেতন হয়ে পড়ে, তখন কল খুলে জোরে জোরে জলের ঝাপটা দিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হয়।

কমরেডদের মধ্যে অনেকেই কিছুতে টলে না। কেউ কেউ যখন মারের চোটে রক্তমাখা কিম্ভুতকিমাকার মাংসপিণ্ড হয়ে পড়ে, তখন মনের জোর হারিয়ে অনেক সময় দলের লোকের নাম-ধাম বলে ফেলে। জোকার এইভাবে এ-দলের সব খবর সংগ্রহ করে। সে জেনেছে শহরের সেই অংশে ঠিক কি ধরনের কাজ চলছে। এখন এই দলের সঙ্গে সমস্ত জেলার গুপ্তদলের সংযোগের সূত্র কোথায় সেটি তাকে জানতে হবে। কেবল একটি লোকই এই যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। গেরমার হল সেই লোক। তাই সে-ই জোকারের শেষ ভরসা। পরবর্তী বড় সংগঠনের সঙ্গে মিলিত হবার সেতুও সে-ই।

ওর দলের অন্য লোকদের উপর যে-সব নৃশংস অত্যাচার চলে, গত চোদ্দদিন ধরে ওর উপরও তাই চলেছে। অনেকবারই তাকে সেই সেলে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যারা তাকে মারধোর করে তাদেরই মতো শক্ত শরীর তার, তাই এতদিন সব সহ্য করেও সে টিঁকে আছে। লোহাকে যেমন পিটিয়ে শক্ত করা হয়, তাকেও যেন সেভাবে ওরা আরো বেশি দৃঢ় করে তুলেছে। জোকার তার পছন্দসই প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছে।

রাগের ধমকে তাই বলে—"এখান থেকে তুমি আর জ্যান্ত ফিরছ না বাছা। হয় তুমি মুখ খুলবে, নয়তো মেরে শেষ করব।"

খ্রীষ্টোৎসবের আগের রাত গভীর হয়ে এল—চারদিক নিঝুম নিথর।

টুলের উপর হাত-দুখানি পেতে গেরমার তার উপর বসে আছে। শব্দহীনতার অশুভ ইঙ্গিত তাকে সচকিত করে তুলেছে।

ঘরের মধ্যে একটি মোটে আলোর বালব তারের জালের মধ্য থেকে মৃদু আলো ছড়াচ্ছে। সে কেমন যেন উত্তেজনায় শক্ত হয়ে বসেছিল।

উপরের নিদন্ত মাড়ি শুকিয়ে এসেছে, সেখানে জিবটা নাড়াচাড়া করছিল। মাথার ভিতরটা যেন খালি হয়ে গেছে, এমন ওর মনে হয়। হঠাৎ ছাদের সেই আলোটির দিকে ওর চোখ পড়ল। মাথা যেন আবার কাজ করতে শুরু করল।

ওর ইচ্ছে হল টুলটা সেলের মাঝখানটায় টেনে নিয়ে যাবার। তারপরে দৌড় আরম্ভ করার আগে যেমন একবার নিচু হয়ে আবার একটা হাত তুলে লাফিয়ে উঠতে হয় সেই ভঙ্গিতে লাফ দিলে হয় ভাবছে......আবার ভাবে, বালবটা ভাঙতে হলে বোধহয় অনেকবার ওকে চেষ্টা করতে হবে...... ভাঙা কাঁচগুলোর নিশ্চয় ক্ষুরের ধার..... হঠাৎ দেখল, বুড়ো আঙুল টিপে ধরে ও নিজের নাড়ির গতি লক্ষ করছে। মাথায় সাড়া জাগতেই আবার সে প্রকৃতিস্থ হল।

গেরমার দাঁড়িয়ে পড়ল। সেলের এধারে-ওধারে হেঁটে বেড়াতে শুরু করল। যে-চিন্তাগুলি ওকে প্রলুব্ধ করছে, সেগুলোকে ও মন থেকে তাড়াতে চাইছে। সে জানে কেন তারা এসে ওর মনকে অধিকার করল— যন্ত্রণাকাতর দেহমন থেকে ও মুক্তি কামনা করছে।

'হয় তুমি কথা বলবে, নয়তো তোমায় আমি খুন করেই ফেলব।' 'তুমি কিছু ভয় পেয়ো না হেডি, বড়দিনে আমি নিশ্চয় বাড়ি আসব।'...... তার চিৎসমুদ্র মন্থন করে যে-আবর্ত জেগে উঠেছে—তাতে এই কথা-কটি যেন একই সঙ্গে পাশাপাশি সাঁতার কেটে চলেছে। মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এর থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল। এই চিন্তাগুলিই ওকে প্রলুব্ধ করেছে হাত বাড়িয়ে ছাদের ওই বালবটিকে ভেঙে ফেলতে।

কী অসহ্য এই নিশ্চল স্তব্ধতা—কেন কেউ এই নির্জনতা ভেঙে ফেলে না? ধাক্কায় ধাক্কায় দরজা কেন খুলে যায় না? দাও, দাও আমাদের বেরিয়ে যেতে দাও—কাতর হয়ে ভাবে গেরমার।

হঠাৎ সে সজোরে হেসে ওঠে। সেলের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো হাসে গেরমার। ওর মুখ থেকে হাসির শব্দ এমনভাবে ঠিকরে বেরোয় যেন সেই ধ্বনি কোনো ক্ষতগহ্বর থেকে ঠেলে আসছে।

'বড়দিন, বড়দিন'—বলে সে এমন চেঁচায় যেন হাটে ঢেঁটরা পিটোচ্ছে।

সেই হাসি ক্রমে তীব্র আর্তনাদে পরিণত হল। গেরমার মুখ ফিরিয়ে

দেয়ালের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কপালটাকে দেয়ালে ঠেকিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

কাঁদতে পেরে যে ওর কী ভালো লাগছে……উষ্ণ বর্ষণের মতো ওর সমস্ত যন্ত্রণা যেন গলে গলে যাচ্ছে। বিশালদেহ বলিষ্ঠ একটি লোক—সে শিশুর মতো কাঁদছে।

মনে মনে বলে, আমি কাঁদছি কেবল কাঁদতে আমার ভালো লাগছে বলেই…কারণ বড়দিনে তোমাদের সঙ্গে আমি বাড়িতেই থাকতে চাই। আদরের হেডি, আমার খোকা…তোমরা কিন্তু রাগ কোরো না…আমি এত আসতে চাই তোমাদের কাছে…কিন্তু জানি কিছুতেই তা সম্ভব হবে না!

হঠাৎ সেলের দরজায় লোহার গরাদটি খোলার শব্দ হল। দুবার জোরে চাবি ঘোরানো হল—তারপর কারারক্ষী এসে দরজার সামনে দাঁড়াল।

গেরমার ঘুরে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে চোখ বড় করে ওর দিকে তাকিয়েই রইল। সে শুধু বললে, 'এসো।'

গেরমার তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংবরণ করতে পারে না। বিশৃঙ্খল চিন্তাধারা এখনও তাকে অস্থির করছে। কোনোমতে জামায় বোতাম লাগিয়ে সেল থেকে বেরিয়ে এল। তারপরে কারাকক্ষের পাশের ফাঁকা চত্বর পেরিয়ে লোহার সিঁড়ি বেয়ে নিচের তলায় নেমে এল।

গেরমার ভাবলে, নিশ্চয় হেডি এসেছে। তার মনে যে-চিন্তা এতক্ষণ চলেছিল, তার স্মৃতির রেশ এখনও রয়েছে।

অপর একটি কারারক্ষী তাকে পুলিশ-স্টেশনে নিয়ে এল। গেরমারের এই পথটি জানাই ছিল, কারণ ওকে জেরা করার জন্যে অনেকবারই সেখানে নেওয়া হয়েছে। এবার কিন্তু সে স্বেচ্ছায় এসেছে, কারণ তার মনের ভিতরে একটি আনন্দ-সম্ভাবনার আশা জাগছে। হেডি নিশ্চয়ই এসেছে, সে-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কারারক্ষী ওকে যে-ঘরে নিয়ে গেল সেখানে কেবল জোকার একাই বসে আছে।

নিজের মনের নৈরাশ্য সম্বন্ধেও সে সচেতন হল না। যে-উত্তেজনা ভিতরে চাপা ছিল তার মধ্যে কেমন একটা শিথিল ভাব এসে গেল—যেন হৃৎপিণ্ডের চারিদিক নিঃসাড় হয়ে গেছে।

এক লহমায় অবস্থাটি এবার সে হৃদয়ঙ্গম করল। সবুজ ফিতের সম্বন্ধে

বাঁধা সাদা একটি প্যাকেট টেবিলের উপরে রয়েছে। জোকার চেয়ারের পিঠে কোটটি ছুঁড়ে ফেলেছে, সেটা সেখানেই ঝুলছে। গাঢ় নীল রঙের স্যুট পরে জোকার নিজের ডেস্কে বসেছে। ধবধবে সাদা শার্টের কাফ নজরে পড়ে। এখান থেকেই সে নিশ্চয় কোথাও উৎসবে যোগ দিতে যাবে।

"বোসো বোসো, হের গেরমার।"

ডেস্কের সামনের চেয়ারটি দেখিয়ে দিয়ে জোকার দরজায় দাঁড়ানো কারারক্ষীকে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিল চলে যেতে। একটি সিগারেট নিজে ধরিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিল।

বললে, "সিগারেট নাও।"

গেরমার মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

জোকার সেটা গায়ে না মেখে প্যাকেটটি একপাশে ঠেলে রাখল।

"আমি যে এমন সময়ে ডেকে পাঠিয়েছি তাতে তুমি নিশ্চয় খুব অবাক হয়েছ।"—বলে আরো এগিয়ে এসে ডেস্কের কোণায় বসল।

"আজই খ্রীষ্টোৎসবের আগের দিন, গেরমার।"

তার আজকের দিনের চেহারা হাবভাব সবেরই মতো এই কথাগুলোও সম্পূর্ণ ঘরোয়া রকমের শোনাল। গেরমার উত্তর দেয় না। সে ভাবে তার স্ত্রীর কথা, ছেলের কথা—কতদূরে রয়েছে তারা—কিছুতেই তাদের কাছে পাওয়া যাবে না—তারাও কত নিঃসঙ্গ…ভাবতে ভাবতে সে তার মনের বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠে, তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়।

"গত চোদ্দদিন ধরে তোমাকে দেখে তোমার প্রতি আমার মনে শ্রদ্ধা জেগেছে। তুমি চমৎকার ছেলে গেরমার। এ ধরনের লোককে অভিনন্দন জানানো উচিত। তোমাকে আমি বাড়ি যেতে দেব। আজই…এখনই…"

চট করে উঠে সে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে শুরু করল। আর রাগ করে নিজেকেই গালাগাল দিতে লাগল!

"দূর ছাই! আমিও তো একটা মানুষ। বড়দিনের সময় এখন। অন্য সকলে একটু সুখ পাক, এটাই কি আমাদের কামনা হওয়া উচিত নয়? একবার ভেবে দেখ…তোমার স্ত্রী, তোমার ছোট্ট খোকা…হঠাৎ দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল…তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে…ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি গেরমার, তারা যে কি খুশি হবে সে ছবি আমি কল্পনা করতে পারি।"

গেরমারের মাথাটি বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে। চোখের জলের ধারায়

যে-বেদনা প্রশমিত হয় নি, তা আবার নতুন করে জেগে ওঠে। সে ভালো করেই বুঝতে পারে তার মন ভেঙাবার চেষ্টাতেই শয়তানের এটি এক অন্য ধরনের চাতুরী।

গেরমারের খুব কাছে সরে এসে জোকার আবার পিছন থেকে বলে চলে—

"এতে কিছু লাভ নেই গেরমার। তোমাদের দল সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। আর তোমার কাছ থেকে তোমাদের জেলার দলের নেতার নাম যদি নাও পাই, সে আমি অন্য উপায়ে জোগাড় করব। হয়তো কটা দিন বেশি লাগতে পারে, তাতে কিছুই যায়-আসে না। আমার এমন তাড়া কিসের?"

সে থামল! গেরমার বসে আছে। তার মুখের ভাব উদাসীন আর চোখ শুকনো। জোকার রয়েছে উৎসুক প্রতীক্ষায়। আবার গেরমারের কানে এসে সেই স্বর বাজে···তার মগজে যেন হুল ফুটতে থাকে:

"আচ্ছা বেশ, আমি তোমার কাজ সহজ করে দিচ্ছি। আসল নামটা আমাকে বলার দরকার নেই। তুমি শুধু ছদ্মনামটাই না হয় বল। বাকী সব আমি খুঁজে বের করব। কেবল ছদ্মনামটি আমাকে বললেই তুমি বাড়ি যেতে পারবে গেরমার। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। এই এক্ষুণি।"

গেরমার জানে সব মিথ্যে, সমস্তই ভান। তবু নিজের মনের সঙ্গে তাকে দুঃসহ সংগ্রাম করে যেতে হয়।

বড়দিনের আর-একদিন মাত্র বাকী। আমি গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ছি··· ওরা যে কী খুশি হবে সে তো আমি বুঝতে পারছি।

গেরমার দেখল, আবার হাত দুখানি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠছে। এতক্ষণ তা ওর নজরে পড়ে নি। জোকার পা-দুটো ঈষৎ ফাঁক করে একটি হাত কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গেরমার ওর সঙ্গে কথা বলবে বলে মাথা উঁচু করে ওর দিকে ঘুরে বসল।

বললে, "এবার আমাকে সেলে পাঠিয়ে দিন।" জোকার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, "কি আপসোসের কথা।" দরজার কাছে কারারক্ষীকে ডাকতে গিয়ে হঠাৎ সে দু-হাতে কপাল ঢাকে। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলে,

"ও হো, আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। তোমার উপহারটি নেবে না? তোমার স্ত্রী এটি এনেছেন।"

ডেস্কের সামনে গিয়ে ছোট্ট পরিপাটি প্যাকেটটি নিয়ে এল। গেরমার উত্তেজনায় ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আমার স্ত্রী কি এখানে এসেছিল ?"

জোকার প্যাকেটটি আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে যেন ভেবে ভেবে বললে,

"তিনি তো এখনো এখানেই আছেন। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। খোকাটিকেও সঙ্গে এনেছেন। কী মিষ্টি হয়েছে বাচ্চাটি !"

গেরমারের সমস্ত অন্তঃকরণ আর্তনাদ করে উঠতে চাইল। কান্নার আবেগ চাপবার চেষ্টায় মনে হল ওর বুক ভেঙে যাবে। জোরে জোরে ওর নিঃশ্বাস পড়ে। অন্ধভাবে সে ডেস্কের দিকে এগোয়। বলে—"আমার স্ত্রী ? আপনি বলছেন আমার স্ত্রী ? কোথায় সে ?"

জোকার মৃদু হাসে, ঘুরে ডেস্কের কাছে গিয়ে ওর চিঠির কেস থেকে এক টুকরো চিঠির কাগজ বের করে।

"এই যে তোমার মুক্তির ছাড়পত্র। এই আমি সই করছি।" এ কথা বলে সে কাগজটি সই করে। গেরমার অর্ধচেতনভাবে সব দেখে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে, "সে কোথায় ?"

জোকার উত্তর দেয়, "তোমার অপেক্ষায় অফিসঘরে তিনি বসে আছেন।"

গেরমার আধবোজা চোখে ওর দিকে তাকায়। বলে, "এখানে কেন এল না ?"

জোকার আবার হাসে—হাসিতে যেন বন্ধুত্ব মাখানো। বলে, "আমি যে বড়দিনে তাঁকে একটি উপহার দিয়ে অবাক করে দিতে চাই।" আবার ডেস্কটা ঘুরে গেরমারের খুব কাছে গিয়ে সই-করা কাগজখানি ওকে দেখায়।

"কী সৌভাগ্য তোমার ! অবশ্য তার আগে ছোট্ট একটা কাজ তোমাকে করতে হচ্ছে। কাজটা কি বুঝতেই তো পারছ। কিন্তু তার পরেই আমরা দুজনে নিজের নিজের বাড়ি ফিরব। কী মজা হবে, বল দেখি গেরমার ?"

লোকটির চোখে গেরমার একটি অদ্ভুত ক্রুর দৃষ্টি দেখতে পায়। সে তখনো জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। এবার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি সংহত করে হৃদয়াবেগ দমন করল। যতক্ষণ চিত্ত শান্ত না হয়, ততক্ষণ নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ গুণতে লাগল। ক্রমশ ওর মুখের মাংসপেশী শিথিল হয়ে এল।

যখন বুঝল যে আর্ত দেহমন তার আগেকার স্থৈর্য ফিরে পেয়েছে, তখন ধীর স্বরে সে বললে, "এখান থেকে আফিসঘরে যেতে কত সময় লাগে ?"

জোকার ভ্রূকুটি তুলে তাকায়, কারণ সে বোঝে না এ প্রশ্নের কারণ কি ? বলে. "দু মিনিটের বেশি নয়।"

"ছদ্মনামটা জানা আপনার কি নেহাৎই প্রয়োজন ?"

"নিশ্চয়। তা না হলে তার বিনিময়ে কি তোমাকে মুক্তি দিতে রাজী হতুম ?"

গেরমার আবার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বশে আনে।

শান্তভাবে বলে, "বেশ ভাল, আমি আপনাকে দু মিনিটের মধ্যেই নামটা বলব।"

জোকারের মুখখানা উজ্জ্বল দেখায়।

"এবারের বড়দিন তোমার পক্ষে আনন্দের হোক, গেরমার।" বলেই ছুটে ডেস্কের কাছে গিয়ে জোকার নোটবই থেকে এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে নেয়। তার পরে পেন্সিল হাতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে।

এখনও গেরমার আধবোজা চোখে ওর নড়াচড়া লক্ষ করে যাচ্ছে। অবশেষে বলে, "আমি দু মিনিটের মধ্যেই আপনাকে নামটি বলব, কিন্তু সে বলব কেবল আমার স্ত্রীর সামনে।"

জোকার পেন্সিল ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে ধরা পড়ে গেছে। রাগে আগুন হয়ে একদৃষ্টে সে গেরমারের দিকে তাকায়। গেরমার আর হাসি চাপতে পারে না।

ব্যর্থ রাগে কাঁপা গলায় জোকার বলে, "সে হয় না হে, ধূর্ত শয়তান, অত তোমার চালাকি চলবে না।"

জোকার বাধা দেবার আগেই গেরমার প্যাকেটটি ছিনিয়ে নিয়েছে। পাখির পালকের মতো হালকা সেটি। খুলে দেখে তাতে রয়েছে চকোলেটের একটি খালি বাক্স।

জোকার ভ্রূকুঞ্চিত করলে। তারপর ডেস্কের উপরে বোতাম টিপল। শান্ত্রী এসে পড়ে তাড়াতাড়ি। এক লাফে গেরমারের সামনে গিয়ে জোকার দাঁড়াল।

"ব্যাটা শূয়ার", বলে উন্মত্ত আক্রোশে গেরমারের বিদ্রূপতির্যক মুখের উপরে প্রচণ্ড থাপ্পড় লাগাল। এক ফোঁটা রক্ত এসে পড়ল জোকারের সার্টের

আস্তিনের সাদা কাফের উপর। গর্জে ওঠে, "এই শুয়োরটাকে এক্ষনি এখান থেকে নিয়ে যা।" গেরমার কারারক্ষী শান্ত্রীর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

কয়েদীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে! গেরমার যখন লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠে নিজের সেলে ফিরল—তখনকার নিঃসঙ্গ নিস্পন্দতা আরো ভয়াবহ। শান্ত্রী তাকে বন্ধ করে রেখে চলে গেল।

সেলের গাঢ় অন্ধকার ঘন হয়ে ওকে ঘিরে রইল। দু সেকেণ্ড মাত্র গেরমার সেলের মধ্যিখানে এসে দাঁড়ায়। অনুভব করে তার দেহের সব শক্তি যেন নিঃশেষে বেরিয়ে গেছে। চরম ক্লান্তিতে আবার দেয়ালে কপাল ঠেকিয়ে, চোখ বুজে সে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু আর কাঁদল না।

"আমি আসতে পারলুম না……আমার উপর রাগ কোরো না।" তার অন্তরের অন্তঃস্থলে যে নিঃসীম অন্ধকার উদ্বেল হয়ে উঠছে তারই কানে কানে যেন কথা কটি সে উচ্চারণ করলে।

বহুদূরে ঘর্ঘর শব্দে একটি ট্রাম চলে গেল।

অনুবাদ : মলিনা রায়

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

বিস্মৃতির কালো ছাপে মিলিয়ে যেতে-যেতেও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসরে মিলিয়ে যায় নি, এমন মুখও দেখছি কম নয়। পরিমাণেও প্রকৃতিতেও। কালির আঁচড়ে সে সব অনেক মুখই তবু ধরা দেয় না। তুলির আঁকেই ফোটা সম্ভব হত। কিন্তু সে আমার স্বপ্নাতীত। শব্দের স্থূল আয়োজনই আমার কিছুটা আয়ত্ত। কাগজের পাতাতে চলছে তা সঞ্চয়। মাসিক পত্রের খেয়াতরীতে তা পার করছি অনেকদিন ধরে। এখন থেকে 'পরিচয়'-এর মাসিক খেয়ায় দু-এক আঁটি করে সেই জমানো ফসল তুলে দিতে পারব যতক্ষণ ঠাঁই মিলে। বাকীটা কিছু থাকবে খাতার পাতায়। বেশিটাই মনের মাঠে।

কলকাতায় আমার কলেজ জীবন মাত্র ছয় বছরের (১৯১৮-১৯২৪)। তারও একটা বড় অংশ আবার ছুটির দিনের নোয়াখালির জীবন। কলকাতার বাইরের কলেজ-জীবন, কতকটা কলকাতার উল্টো জীবন। যৌবনের জোয়ার দুই পাড় ছাপিয়ে বান ডেকে আসছিল তখন। সে কথাটা বুঝেও যেন বুঝবার দরকার বুঝতাম না তখন। ঘটনার পরম্পরায় ভাবতে গেলে তার পরিমাণ হয় না। কলকাতাই তো একটা ক্রমপ্রকাশিত অনুভূতি, আর ক্রম-বিকশিত উপলব্ধি—অন্তত আমার কাছে। এই প্রায় পঞ্চাশ বৎসরে তা বুঝতে হয়েছে। সেই প্রথম পাঁচ-ছয় বৎসরে যারা আমার সেই 'মেট্রোপলিটান সিটি'কে জেনে-না-জেনে গড়ে তুলেছেন তাঁদের অনেক মুখই এখনো আমার চোখে প্রত্যক্ষ—অনেকে তাঁরা আমার প্রথম বয়স থেকেই আত্মীয় বন্ধু—চারুলাল মুখোপাধ্যায়, উপেন সেন, অমুতোষ সেনগুপ্ত, উপেন রায়, দীনেশ গুহ প্রভৃতি নোয়াখালির তখনকার বন্ধুরা। আরও অনেকে আমার কলকাতায় পাওয়া ছাত্রাবাসের সতীর্থ—সজনীকান্ত রায়,

বিমলাকান্ত সরকার, সতীন্দ্রনাথ বসু, শিবদাস রায়, সুধেন্দু ঘোষ, লালা গোপালপ্রসাদ, বিভূতি দত্ত, সুধাকান্ত দে, শিবশরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল রায়, গিরিধর চক্রবর্তী প্রভৃতি। আর হার্ডিং, হোষ্টেলের যুগের অন্তত বিনয় মুখোপাধ্যায়। কলেজের সহপাঠীদের মধ্যে তেমনি রবীন্দ্রনাথ বসু, ধীরেন্দ্রনাথ পাল, অন্নদা দাশগুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীর সেনগুপ্ত প্রভৃতি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রদের নাম ভুলতে পারা যায় না। প্রেসিডেন্সি কলেজের সে বৎসরের কেউ কেউ কম সুহৃদ ছিলেন না—পতঞ্জলি ভট্টাচার্যের ও বিজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা-শুনায় সে সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে, কিন্তু দেখা-শুনার অভাবেই কি অসিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কিম্বা যতীন্দ্রনাথ তালুকদারের সঙ্গে এককালের সম্পর্ক কিছুমাত্র খর্ব হয়েছে? এসব বন্ধুদের বন্ধুরাও তখন অপরিচিত থাকতেন না—এমনকি, দাদার বন্ধুরাও না। অবশ্য সহপাঠী ও সমকালীন সে-সব ছাত্ররাই তো ছাত্রজীবনের সব নয়। আরেকটা দিক আছে—অধ্যাপকরা। তবে সাধারণত ছাত্ররা তাঁদের মনে রাখে, অধ্যাপকরা হাজার-হাজার ছাত্রকে মনে রাখবেন কি করে? দু-একজন যে মনে রেখেছেন তার কারণ পরেকার জীবনের দেখা সাক্ষাৎ—যেমন, অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত, কালিদাস নাগ—আমার প্রথম কলেজ-জীবনের দুই প্রিয় অধ্যাপক,—পরেকার জীবনে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল দে। স্কটিশের সাহেব অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে দূর থেকে। অন্য অধ্যাপকদেরও আমাকে জানবার কারণ ছিল না—আমি সংকোচে থাকতাম সুদূরে। তবু মনে রাখবার মতো অধ্যাপক আমরা না দেখেছি তা নয়—ডাক্তার স্টিফেন, জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতিও ভুলবার মতো কেউ নন। তবু কখনো যদি মনখুলে বলি তাহলে বলতে হবে—কার পড়া কতদিন শুনেছি ক্লাশে তা বলা কঠিন। সে-প্রসঙ্গ থাক—অন্তত এখন।

সেই পাঁচ-ছ' বছরের কলেজ-জীবনের সহপাঠী ও সমকালীনদের কথা দু-দশ পৃষ্ঠায় শেষ হবে না—তা শেষ করা উচিতও নয়। 'পরিচয়'-এর দিক থেকে ক'পাতায় তা বলা উচিত, তা বিচার না করে যার কথা না বলা অনুচিত তার কথাই বলা বোধহয় প্রথম প্রয়োজন। 'পরিচয়'-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কথা। তার উপক্রমণিকা হিসাবেও তবু না বললেই নয় কলেজের আমার প্রধান সহপাঠীর কথা।

কলেজ থেকেই গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে।

কালের গতির সঙ্গে তা এখন আন্তরিকতায়, আত্মীয়তায় নিবিড়তর। সে ছিল ক্লাশে 'রোল নম্বর ১'—ওই সংখ্যাবাচক নামটা গুণবাচক হয়ে উঠছিল, নামও তাই জানা গেল রবীন্দ্রনাথ বসু। রবিও জানে না—চশমা-চোখে, উজ্জ্বল দৃষ্টি, ওই দীর্ঘ গৌরবর্ণ ছাত্রটিকে আমাদের কোনো কোনো সহপাঠীদের প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়েছিল 'অগ্রগণ্য'। আজ এই জীবনের শেষদিকে এসে সাহস করে বলতে পারি একটা কথা। আমার বৎসরের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ছাত্রের সঙ্গে, পূর্বে ও পরে, আমার পরিচয় হয়েছে। এ সৌভাগ্য অমূল্য। দুচারজন নিজের গুণে হাইকোর্টের উচ্চচূড়ায়ও বসেছেন, দু-একজন প্রশাসনে উচ্চচূড়ায়—ইচ্ছা করেই পূর্বে তাঁদের নাম করি নি—দুর্জনের সঙ্গে পরিচয় তাঁরা অস্বীকার হয়তো করবেন না—কিন্তু তাতে তাঁদের গৌরব বর্ধিত হবে না। যাক, এসব সত্ত্বেও যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে—কে সেই শ্রেষ্ঠদের মধ্যে ছিল শ্রেষ্ঠ? আমি আমার দাদার কথা তুলে বলব—রবীন্দ্রের মতো ক্ষুরধার বুদ্ধি আর কারও দেখি নি। অথচ, বন্ধুসমাজে বাক্যমুখর হলেও রবি কিন্তু আসলে 'শাই'—সপ্রতিভ হয়েও সসংকোচ। আত্মপ্রচার থাক আত্মপ্রকাশেও কুণ্ঠিত। বাড়ির ছোট ছেলে সে—মনোবৈজ্ঞানিকরা বলবেন, তা কি আর বৃথা হয়? বাবা বেঁচে ছিলেন, মা নেই, দাদারা সুপ্রতিষ্ঠিত। আত্মনির্ভর হবার শিক্ষা তবু রবি পেয়েছিল ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ী হবার সাহস বোধহয় পায় নি সে পরিমাণে। তার সংকোচ আমার সংকোচ, দুই সংকোচের রচিত পার্থক্য কাটে প্রথম সেকেণ্ড-ইয়ারে। একটা লেখা সে ছাপার হরফে পড়েছে, জানাল তা আমাকে। বি-এ ক্লাশের 'তিন-বৎসরী আপনি' ঘুচে গেল তার একখানা পোস্টকার্ডে। তখন ফল বেরুচ্চে। সুখবর দিতে উচ্ছ্বসিত আনন্দে উৎসারিত হল সম্ভাষণ 'তুমি'। 'আপনি' ত্যাগের পরে আপন হতে দেরি হল না। তাই সে হল আমার বন্ধুদের বন্ধু; তারপর আমার ভ্রাতা, মা-বাবা সকলের কাছেই আপনজন। সেই কারণেই আত্মীয় আমিও তাঁদের পরিবারে পর থাকি নি। তার বৃদ্ধ পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে সস্নেহ আদর পেতাম। শেষ পরীক্ষায়ও রবি অপরাজেয় ছিল, তবু কপালের লেখায় কিছু তা খর্বিত হয়, প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান তার লভ্য হয় নি। কপালের লেখায় তাকে কাজে যেতে হয়েছিল প্রথম পাটনায় দাদাদের কলেজে এক বৎসরের মতো এক শ' টাকায় ইংরেজির অধ্যাপক হয়ে।

কলকাতার বাইরে—বোধহয় বাড়ির বাইরেও—সেই তার প্রথম রাত্রিযাপন। দাদার কাছে সে আমার মতোই আপনার হয়। তবে ছিল এক বৎসর। ইংরেজ ডাক্তাররাও তারপর আর তার পরীক্ষায়-পাশ-করা ডিপুটিত্ব ঠেকিয়ে রাখতে পারল না—এক বছর আগে কিন্তু তা করেছিল। রবিও সরকারী চাকরির হাওয়ায় ত্রিশ বৎসর জেলায়-জেলায় ঘুরে চলে। মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গে তখন সাক্ষাতে ছেদ পড়ত। কিন্তু আমার ভাইবন্ধুদের সঙ্গে নয়। মায়ের সঙ্গে নয়। লক্ষ্মীর সঙ্গে নয়। আমিও বাদ যেতুম না। অবসর গ্রহণের আগে রবি এসে ঠেকল 'কমিশনার অব লেবর'-রূপে কলকাতায়। ত্রিশ বছর সরকারি চাকরি ও হাকিমির মেজাজ যে কোনো মানুষকে হাসি কমাতে, কথা কমাতে এবং বন্ধুত্ব কমাতে অভ্যস্ত না করে ছাড়ে না। কিন্তু একটা মানুষ অন্তত দেখলাম যে সেই চাকরি-চক্রের পথ হালকা পায়ে, হালকা দেহে, হালকা মনে পরিক্রমা করে করে বেরিয়ে এল। আর বেরিয়ে এল হাসিতে মুখর হয়ে, কথার কৌতুক-সরলতা নিয়ে, আর প্রাণে নিয়ে অভিজ্ঞতার আশীর্বাদ—প্রসন্নতা, গভীরতা। যতদূর বুঝি বিষয়কর্মে তবু রবি পেয়েছিল একটু স্বচ্ছন্দ আশ্রয়, অন্তঃপুরেও রবি পেয়েছিল একটি নিভৃত পরিবেশ। কিন্তু নিজের মধ্যেই ছিল তাঁর নিজস্বতার উৎস। সে এক অদ্ভুত জিনিস। মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা—নিজের ব্যাপারে। নিজেকে নিয়ে যে হাসতে পারে, পৃথিবীতে সে-ই আত্মজ্ঞানী। রবি বেশ হাসতে পারে নিজের বিষয়বোধেঃ 'ছেলেবেলা থেকেই তো জানো ঝোঁক।' শেয়ারের বাজারেও তাই বরাবর ছাত্র বয়স থেকে খেলেছি। হারলে সামলাতে পেরেছি, জিতলেও সামলে গিয়েছি। স্কলারশিপের টাকায় পড়েছি। তা বাঁচিয়ে শেয়ারেও খেলেছি—মুঠো থেকে সিকিটা-আধুলিটাও কি সহজে গলে বেরুতে দেখেছ?' এজন্যই আমি তাঁর থেকে একবার পাঁচ টাকা ধার নিয়ে ফেরত দিই নি। বলেছি, আমাকে 'তোমার ওজন্যই মনে থাকবে।' অবশ্য শুধু সেজন্য নয়। নানা কারণে রবি আমাকে মনে করে—ভালো খাবার এলে তো নিশ্চয়ই, দশটা কাজেও। আদর-আপ্যায়নও বাজে খরচটাও তো রবি বাদ দিতে পারে নি। আর শুধু আমাকে যে সে ভোলে নি, তাও নয়। মাকেও সে মনে করে রেখেছে বরাবর। আর মাও মৃত্যুশয্যায় তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, জানতে চেয়েছেন তাঁর পারিবারিক কুশল। তাঁরও ভুল হয় নি মানুষ চিনতে। টাকা-কড়িতে যদি চোখ থাকেও, রবির

চোখে তবু সর্বদা উজ্জ্বল কৌতুক, সরলতা, এবং যা অবিশ্বাস্য—একটু দার্শনিক অনাসক্তি। হাকিমী করেছে, লেবর কমিশনার হয়েছে, শেয়ারের বাজি ধরেছে। তবু জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতির সর্ব বিষয়ে রবি আজীবন সর্বভুক পাঠক। আর তারপর কমিউনিজম সোস্যালিজম সকল ইজমকে মেনেও শেষপর্যন্ত ভক্ত 'গান্ধীজম'-এর। এ নিয়ে আমরা ক'ভাই কম কৌতুক পরিহাস করি না। এ নিয়ে সেও কৌতুক করতে পারে। সে কৌতুক থেকে গান্ধীবাদও বাদ যায় না—অন্য বাদও না। আবার, নিজেকেও সে বাদ দেয় না, আমাকেও না। 'তুমি তো আজ হয়েছ কমিউনিস্ট। কিন্তু তোমার থেকেই তো শুরু—তুমিই দিয়েছিলে রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্কলিত গান্ধীজীর ওই লেখা-সংগ্রহ—আর আজও তো তা থাকে আমার হাতের কাছে।' কথাটা মিথ্যা নয়। সে একদিকে লেখে শ্রমিক আইন সম্বন্ধে বই, আর দিকে আবার লেখে গান্ধীজীর শ্রমিক-সমস্যা সম্বন্ধে সমাধান-বিষয়ক আলোচনা। মানতে হবে, যাই লিখুক লেখা চমৎকার। আর, তার অনেক কথাই সত্য, তাই প্রায়ই তা মালিকদের কাছে অনুপাদেয়।

মুনাফার শিকার যে মানুষ শিকার, একথাটা রবি সত্যকার গান্ধীভক্তির জন্যই এক-আধটুকু না বলে পারে না। আশ্চর্য নয় যে, এমন লেবর কমিশনার মালিকদেরও অরুচি। একজন দিকপাল তো মুখ্যমন্ত্রীকে রবির মুখের সামনেই বলেন: "ওঁকে কেন লেবর কমিশনার করেছেন? ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়ে দিন প্রোফেসর করে।" তাঁর এ কথাটায় আমিও সায় দিই।—ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে সে ব্যবস্থা করতে পারে নি দেশ। এখনো কি পারে? রবীন্দ্রের বিদ্যাবুদ্ধি, কৌতুকবোধ, সাহিত্যবোধ, জীবনবোধ, মূল্যবোধ—আর আলোচনার প্রসাদগুণ, যা বিদেশী ভাষায়ও অকুণ্ঠিত—এ সবের আরও পরিচয় যদি দেশ পেত! অবশ্য তাতেই কি পেত মানুষটির সম্পূর্ণ পরিচয়?

রবি বসুকে দেখে যেমন ক্লাশের '১নম্বর' বলে মনে হয়েছিল আরেকজন সহপাঠীকে দেখেও তেমনি মনে হয়েছিল 'অদ্বিতীয়'। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তা প্রমাণিতও করেছেন। স্কটিশের সজনী দাস ছাড়া আমার আর কোনো সহপাঠী তাঁর মতো কৃতিত্বের অধিকারী হন নি। অবশ্য একদিক থেকে সজনীর কৃতিত্ব অধিকতর। সুধীন্দ্রনাথের মতো সৌভাগ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে সে জন্মায়, নি তাকে আপন ভাগ্য অর্জন করতে হয়েছে। সেই

ছল বল কৌশল, সুধীন্দ্রনাথের কিছুই প্রয়োজন হয় নি। ব্যক্তিত্বের ওরূপ স্বাভাবিক রাজমহিমা তাই সজনী কেন, আর কারও ছিল না। সে মহিমা সুধীন্দ্রনাথকে অদ্বিতীয় করেছে, শুধু তাঁর সাহিত্যের কীর্তি নয়। তার প্রমাণ আমরা তাঁর সহপাঠীরা। তাঁর সাহিত্য-জীবনের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় সে তুলনায় অল্প। সে পর্বের কথা অন্যেরা বলেছেন, বলবেন। আমার বিশেষ পরিচয় ছাত্রজীবনের সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে। পাঁচ বৎসর আমরা একসঙ্গে পড়ি। তখনো তিনি সাহিত্যে প্রকাশিত হন নি; কিন্তু তখনি তিনি আপন ব্যক্তিত্বে স্বপ্রকাশ।

স্কটিশের নিয়ম ক্লাশে ছাত্রদের রোল নম্বর অনুযায়ী একাদিক্রমে বসা। অধ্যাপক হাজিরা খাতা খুলতেন, এক-দুই করে ছাত্রদেরই নিজ নিজ নম্বর হেঁকে জানিয়ে যায়। সেই ধারাবাহিকতার মধ্যে পিছন থেকে একটি নম্বর ধ্বনিত হল ইংরেজিতে 'টু এটটি থ্রি' (?)। ইংরেজসুলভ উচ্চারণভঙ্গি, তদপেক্ষাও আত্মপ্রত্যয় সমৃদ্ধ কণ্ঠ, যেন গভীর এক ঘোষণা। অধ্যাপক চমকিত হলেন, তাকালেন মুখ তুলে, আমরাও তাকালাম পিছনে। প্রায় শেষের বেঞ্চে উপবিষ্ট সেই '২৮৩' দেখবার মতোও। সুচিক্কণ ধোপ-দোরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবী আরও অনেকের ছিল, কিন্তু এমন বিশিষ্টতা তা আর কারও অঙ্গে লাভ করে নি। সুসম্পন্ন ঘরের লক্ষণযুক্ত সুবেশ ও সুরূপ ছাত্র আরও ক্লাশে আছে। বরং রূপের দিক থেকে সুধনীন্দ্রনাথ তখন ত্রুটিহীন ছিলেন না। প্রথম যৌবনে সুধীন্দ্রনাথকে ধনী ঘরের স্নেহ-পালিত সন্তানেয় মতো কমনীয় স্থূলকান্তি যুবকের মতো দেখাত। ছাত্রজীবনের শেষে একবার তিনি বেশ কিছুদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাথার চুল পাতলা হয়ে আসে, মেদ-মাংস ঝরে যায়, গোল মুখের ছাঁদ হয়ে দাঁড়ায় দীঘল। সুধীন্দ্রনাথ তখনি হন প্রকৃত সুপুরুষ—দীর্ঘদেহ, পরিণত সুন্দর মুখমণ্ডল, বুদ্ধিতে ভাবনায় চক্ষু মৃদু-উজ্জ্বল। তবু কলেজে প্রথম দর্শনেও তাঁকে যে মনে হয়েছিল অদ্বিতীয় তার কারণ তখনো তাঁর মুখে ছিল সেই স্বাভাবিক মহিমা—যা চোখে না পড়ে পারে না। আর তাঁর কণ্ঠস্বর, শব্দোচ্চারণ, বাগভঙ্গি, তাতেই কৃত্রিম হলেও মনে হোত ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। ক্লাশের পড়ায় সুধীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল না, ছিল রঙ্গমিশ্রিত নিস্পৃহতা। কোনোদিন উৎপাত করেন নি, অধ্যাপনার সময় নীরবে কাটাতেন। পিছনের উঁচু গ্যালারিতে বসে আপনার মনে একের পর এক বাইরের সাহিত্য নিঃশেষ করতেন। ঐটুকুই ছিল তাঁতে আমাতে মিল। আর সেই

সূত্রেই পরিচয় হয়—তবে একটু পরে। পরিচয় জেনেছিলাম প্রথম দু-চার দিনেই—সুধীন্দ্রনাথ হীরেন্দ্রনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র। আর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে কে, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক জীবনে তিনি কী, তা তখনকার দিনের সকলেই জানতেন—জানতাম কলকাতা আসার পূর্ব থেকেই। বেদান্ত ও এটর্নির পেশা, থিয়োসফি ও বাস্তববুদ্ধি, সাহিত্য-পরিষদ ও জাতীয় শিক্ষাপরিষদ ও বিভিন্ন স্বদেশীয় সংগঠন—এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে সমন্বয় ও পরিচালনা—বিচিত্র মনীষা দ্বারাই সম্ভব হোত। শুনেছি, সুধীন্দ্রের প্রথম শিক্ষা মিসেস্ বেসান্টের কাছে। তাই সুধীন্দ্রনাথের বৈদগ্ধবিলাসেও পিতা বাধা দিতেন না। উত্তরাধিকারে যে সুধীন্দ্রনাথ অনন্যসাধারণ, কুলগত, পিতার মনীষার সঙ্গেও পিতৃব্যের অভিনয়পটুতাতে যুক্ত—এই ধারণাই প্রথম হয়েছিল। ধারণাটা একেবারে মিথ্যা মনে হয় না। কিন্তু শুধু ধারণা নয়, তার পূর্ণ রূপও দেখা গেল অচিরে।

দিনের পর দিন দেখতাম এই সুদর্শন যুবকের হাতে এক-একখানা নতুন বই। সে-সব বই বা লেখকের নামে আমার চোখ লোভে চকচক করে উঠত, মনে সম্ভ্রম জাগত। কিন্তু সংকোচবশে থাকতাম দূরে। সংকোচের সঙ্গে আরও একটি জিনিসও যুক্ত ছিল—একটু আত্ম-সচেতনতা। ক্লাশের বাইরে সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব অচিরেই বহু সহপাঠীকে আকর্ষণ করে। কেউ কেউ তাঁরা বুদ্ধিমান, নতুন নতুন বই পাঠে কৌতূহলী ও কৃতজ্ঞ। অনেকেই তবু ব্যক্তি-মহিমায় আকৃষ্ট, তাঁর বাক-মহিমায় উৎফুল্ল, সেই আভিজাত্য-অভিমানের আনুষঙ্গিক পার্শ্বচর। সুধীন্দ্রনাথ রাজা, রাজার বোধহয় পারিষদ না হলেও চলে না। কিন্তু সে পদের প্রতি আমার লোভ ছিল না। দূর থেকে তাঁদের কল-কোলাহল, স্তুতি-প্রশংসা যা কানে পৌঁছত তাতে অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে অখ্যাতির কিছু ছিল না। সুধীন্দ্রনাথ ইংরেজিতেই কথা বলতেন বেশি। মিসেস্ বেসান্টের নিকট বাঙলা শিক্ষার অবকাশ ছিল কম। সংস্কৃত ও ইংরেজি ফরাসি প্রভৃতিতে সুধীন্দ্রনাথের তখন থেকেই বিশেষ অধিকার। বরং বাঙলাই তিনি পরে শেখেন। কথাবার্তায়, আলাপ-আলোচনায় ইংরেজিই ছিল তাঁর স্বাভাবিক ভাষা। বিশুদ্ধ উচ্চারণে কোনো ভাষা বলা হলে সে ভাষার যথার্থ রূপ বুঝা যায়। সুধীন্দনাথের মুখে ইংরেজির সে গৌরব সুরক্ষিত হত। শ্রোতারা পুলকিত হতেন। আর, সেই সপ্রশংস দৃষ্টি ও কণ্ঠ পারিষদমণ্ডলীতে সুধীন্দ্রনাথও

নিশ্চয়ই মঞ্চ-অভিনেতার মতো তৃপ্ত হতেন। নিজেকে মনে করতেন পরিচ্ছদে বাগবৈদগ্ধ্যে অস্কার ওয়াইল্ডের জুরী! কখনো সুধীন্দ্রনাথ পরিহাস-ছলে বলতেন নিজের ভাবী কীর্তির কথা, অবশ্য ইংরেজিতে—"আমি যে বৎসর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হব—", কিংবা, "আমি যখন নোবেল প্রাইজ পাব—"। সেদিনে এই দুই আকাঙ্ক্ষাই ছিল তাঁর কাছে সর্বোচ্চ ও সমতুল্য। দু-দিকেই ছিল তাঁর আকর্ষণ। এই স্বপ্ন যাঁকে আঠার-উনিশ বৎসরে নাড়া দেয় তাঁকে শুধু পারিষদ-প্রিয় বলে ভাবতে পারতাম না। তবে বুঝতাম—এ মণ্ডলীতে 'চাল'ও তার পক্ষে অপরিহার্য। একটু অভিনয়ও চাই, রাজোচিত বেশভূষাও চাই,—শুধু রাজটীকায় রাজাকে চিনতে পারে ক'জন? শুধু ব্যক্তিত্বের মহিমায় অন্তত ওরূপ সমাজ অভিভূত হয় না। এসব ধারণাতেই দূরে ছিলাম। কিন্তু ক্লাশে আসন দূরে নয়। পরিচয় সাধনার জন্য মাঝখানে রবি বসুর মতো বন্ধুও ছিলেন। তা ছাড়া, আমার হাতেও যে নতুন নতুন বই প্রতিদিন থাকে, সুধীন্দ্রনাথেরও তা চোখ এড়ায় না। একদিন নিজেই চেয়ে বসলেন একটা সস্তা দামের সেরূপ বই—'জন বুল্স আদার আয়লণ্ড'। আমারও সূত্র হয়ে গেল তারপর বই চাইবার। বই-এর বন্ধনে পরিচয় সহজেই বাড়ে। দেখলাম—সুধীন্দ্রনাথ জন্ম-অভিজাত। অভ্রান্ত প্রমাণ তাঁর শালীনতা, সতীর্থের সঙ্গে তাঁর স্বচ্ছন্দ আলাপ-আলোচনা এবং তার চেয়ে বড়ো কথা, নিরভিমান অভিজাত ব্যবহার। নেই দলপতির চাল, সেই সচেতন মহিমা প্রকাশের নামগন্ধও আমাদের সঙ্গে কথাবার্তায় সুধীন্দ্রনাথের থাকত না। সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক ঔৎসুক্যে দেখেছি তিনি সমধর্মীর মতো সুহৃৎ। পারিষদ-প্রিয় রাজা নন, আলোচনা-প্রিয় সুহৃদ। তাঁকেই আমি বলি অভিজাত শালীনতা, সহজাত স্বাভাবিক সৌজন্যের বলেই, অনুভব করতে হয় যাকে সম্ভ্রান্ত। আমার এই ধারণাটা ক্রমেই সুদৃঢ় হয়, পরে নির্ভুল হয়ে ওঠে। ছাত্রজীবনের শেষের একটি বছর কাটে এম-এ ক্লাশে ও ল-ক্লাশে। আমরা ক'জন স্কটিশের ছাত্র, আপনা থেকে পরস্পরের একটু বেশি আপনার। দিনের পর দিন বেঞ্চে পাশাপাশি বসেছি, সকল রকম কথা, মন্তব্য, আলোচনা সবই অন্তরঙ্গের মতো হোত—পাঠ্য বই, অপাঠ্য বই, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, রাজনীতি-সমাজনীতি, কোনো কিছুই অনালোচ্য থাকত না। সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য এম-এ ক্লাশে এক বৎসরের বেশি পড়েন নি—ল-ও না। যথাসময়ে ক্লাশে আসা, রীতিমতো ক্লাশ করা, তাঁর পোষাত না। এম-এ ছেড়ে দেবার পক্ষে আরও একটা কারণ ঘটে।

ক্লাশে প্রায়ই আসতেন বেশ বিলম্বে। সেই সযত্ন মাজা-ঘষা প্রসাধন, শুভ্র-পরিপাটি বিলাসী পরিচ্ছদ, স্থির নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে অধ্যাপকের পাশ দিয়ে দেরিতে এসে ক্লাশে আমাদের পাশে বসতেন এমনভাবে যেন এইটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক এবং শোভন। অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের ক্লাশে সুধীন্দ্র এরূপেই সেদিনও এসেছিলেন যখন অধ্যাপকের হাজিরা নেওয়া শেষ হচ্ছে। অধ্যাপক মহাশয়ের সুধীন্দ্রের দিকে চোখ পড়ল—মুখে ফুটল স্মিত হাস্য। আবার হাজিরার রোল নম্বর বলার উচ্চারণভঙ্গিতে কানও খাড়া হোল, চোখের কোণ দিয়ে তিনি ছাত্রটিকে দেখে নিলেন। তারপর পড়া শুরু হতেই তিনি সুধীন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ, তুমি পড়ো।'

'আমি!' সুধীন্দ্র চমকিত হলেন। তারপর হেসে দাঁড়ালেন।

অধ্যাপক ঘোষও সহাস্যে বললেন, 'হাঁ, পড়ো দেখি।' বেশ কৌতুকের হাসি ও দৃষ্টি তাঁর।

'পড়ব?—আমার যে বইও নেই।' সুধীনও সকৌতুকে বললেন।

চসারের ক্যাণ্টারবারি কাহিনীধারার "প্রোলোগ" পড়া হচ্ছে। আমরা তাড়াতাড়ি নিজেদের বই সুধীন্দ্রকে দিলাম।

অধ্যাপক তখনো হেসে বললেন, 'বই নেই! ভালো কথা। এই যে, পেয়েছ বই? বেশ আরম্ভ করো—'

'কোথায় আরম্ভ হবে?'—কুণ্ঠাহীন কৌতুকে সুধীনও 'ক্যাণ্টারবেরি টেলস,-এর 'প্রোলোগ' খণ্ডের পাতা এমনভাবে উল্টোচ্ছেন যেন সবই হাসির কাণ্ড। হাসির কাণ্ডই ছিল। কিন্তু হঠাৎ অধ্যাপক ঘোষের ভাবান্তর হল। গম্ভীর হয়ে উঠলেন তিনি: 'তার অর্থ? বই নেই, পড়া কোথায়, কিছুই জানো না'—ক্রুদ্ধ, রুষ্ট হলেন অধ্যাপক, 'ক্লাশে এসেছ।' একটু থেমে বললেন, 'এমন ছাত্র আমার ক্লাশে আমি চাই না' (কথা চলছিল ইংরেজিতে, আই ডোনট ওয়াণ্ট টু হ্যাভ্ সাচ স্টুডেণ্টস ইন মাই ক্লাস)।

সুধীন্দ্রও ইংরেজিতে উত্তর দিলেন বেপরোয়া কণ্ঠে, 'আমাকেই বা চান কেন তবে?' (দেন, হোয়াই হ্যাভ্ মি?)

একেবারে রঙ্গ থেকে অগ্ন্যুৎপাত। অধ্যাপক আগুন হয়ে বললেন—'চলে যেতে চাও? যাও—যাও—' ইত্যাদি।

'নিশ্চয়'—সুধীন্দ্র স্থির গম্ভীরভাবে সামনের উঁচু বেঞ্চ সরিয়ে বের হলেন।

জুতোর ঠক ঠক শব্দ তুলে সুস্থির সদর্প দীর্ঘ পদক্ষেপে ক্লাশ থেকে অধ্যাপকের পাশ দিয়ে বের হয়ে চললেন।

অধ্যাপক তখন ক্রোধে অস্থির। 'কী স্পর্ধা, কী স্পর্ধা'। হাজিরা খাতা নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'কত রোল নম্বর ?' ডাক দিয়ে বললেন, 'কত রোল নম্বর তোমার ?'

সুধীন্দ্র এক পা ক্লাশের বাইরে দিয়েছিলেন। সেভাবেই মুখ ফিরালেন, এক পা ক্লাশের ভেতরে—সেখান থেকেই অদ্ভুত সুস্পষ্ট উচ্চারণে বললেন রোল নম্বর। আর অদ্ভুততর সব্যঙ্গ উচ্চারণে ঘাড় বাঁকিয়ে অধ্যাপককে 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

সমস্ত অঙ্গ, পদক্ষেপ, কণ্ঠস্বর, ভঙ্গিতে যেন অধ্যাপককে নস্যাৎ করে দিয়ে সুধীন্দ্রনাথ রাজোচিত মহিমায় দ্বারভাঙ্গা ভবনের পশ্চিম বারান্দা দিয়ে জুতোর শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা পরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি—পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কি বলবেন জানি না, কিন্তু পিতৃব্য অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নিশ্চয়ই বলতেন—'ক্যাপিটেল!'

অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের মতো মানুষও সেদিন অধ্যাপনায় আর স্বচ্ছন্দ হতে পারলেন না। তারপরে এল এ-ব্যাপারের দ্বিতীয় অঙ্ক। স্যর আশুতোষের সামনে সুধীন্দ্রের ডাক পড়ল—বিচার হবে। আমরাও ভাবিত হলাম। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কিছুদিন পূর্বে স্যার রাসবিহারী ঘোষের সমস্ত সঞ্চয় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এর জন্য সংগ্রহ করে নিয়েছেন—তাতেই কিছু পরে মানিকতলা ছেড়ে এখনকার যাদবপুরের কারিগরী বিদ্যালয়ের পত্তন সম্ভব হয়। স্যর আশুতোষেরও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন সে-সম্পত্তি না পেয়ে বিশেষ আশাভঙ্গ হয়েছে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতি তাঁরা অসন্তুষ্ট। সুধীন্দ্রের পরিচয় কি স্যর আশুতোষ জানতে পারবেন না ? সুধীন্দ্রকে বললাম, 'যাই হোক, পিতাকেও ঘটনাটা বলে রাখুন।' জানতাম—পুত্রের আত্মবিকাশের পথে পিতা কখনো বাধা দেন না। কিন্তু এ-আচরণ তিনিও সমর্থন করবেন না। তবু তিনি বিচক্ষণ লোক। যথা দিনে যথা সময়ে সুধীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যর আশুতোষের ঘরে উপস্থিত হলেন। আমরাও ফলাফল জানবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম। পরদিন শুনে নিশ্চিন্ত হলাম, স্যর আশুতোষ—আশুতোষ। সুধীন্দ্রের থেকে ভবিষ্যতে যথারীতি পড়াশুনার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাঁকে এবার সস্নেহে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। সুধীন্দ্রের অবশ্য প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হয় নি। কারণ, এর পরে একদিন মাত্র তিনি ক্লাশে আসেন। তাও অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের ক্লাশ। তারপর পড়া ছেড়ে দেন এম-এও, ল'-ও ; পরে এটর্নির শিক্ষানবিশীও।

ক্রমশ

আধুনিক জাপানী কবিতা

আমার গানগুলি

লোকে ভাবে আমি শব্দের মজুতদার
যেহেতু আমার গানগুলি সংক্ষিপ্ত।
গানে আমার বাদ দিই নি তো কিছুই
এমন কিছু নেই যা যোগ করতে পারি তাতে।
আমার আত্মা সাঁতার দেয় ফুল্‌কো ছাড়াই, যেন মাছের বিপরীত।
এক-নিশ্বাসে গান গাই আমি।

একদিন রাত্রে

ঘরে ঘরে
জ্বালাও উজ্জ্বল আলো :
প্রতি ফুলদানিতে
সাজাও আফিম-ফুল আর গোলাপ :
সান্ত্বনা দিতে নয়
তিরস্কার করতে।
ছাখো, একটি স্ত্রীলোক এখানে
প্রশংসা ভুলল
সাড়া দিতে গেল ভুলে—
আর তুচ্ছ কারণে
হঠাৎ ভারি কান্না পেল তার।

এক ইঁদুর

আমার ঘরের চালে বাস করে এক ইঁদুর।
আর যা কিচকিচ শব্দ করে ও,
মনে হয় যেন এক ভাস্কর
সারা রাত্রি ধরে মূর্তি খোদাই করে চলেছে।

আর যখন ও ইঁদুর-বৌকে নিয়ে নাচে
ঘুরঘুর ঘুরপাক খায় যেন ঠিক ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া,
চালের যত ময়লা আর ধুলো তখন ঝুরঝুর করে পড়ে
আমার এই কাগজটায়—
আমি তখন লিখছি।
কিন্তু বেচারি তা জানবে কী করে ?
আমি কিন্তু লেখা থামিয়ে ভাবি :
ইঁদুরদের সঙ্গে সহবাস আমার !
আহা, ওরা ভালো খাবার, ভালো বাসা পাক।
আচ্ছা, ঘরের চালে ওরা একটা ছেঁদা করুক-না,
আর মধ্যে মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখুক আমাকে।

—ইয়োসানো আকিকো (১৮৭৮-১৯৪২)

প্রতিদানহীন প্রেম

সোনালি মুকুল এ্যাকেশিয়া ফুল ঝরে যায়
ঝরে যায় ওরা ম্লান হেমন্ত-আলোয়।
আমার বেদনা প্রতিদানহীন প্রেমের
পরেছে প্রেমের পাতলা পশমী পোশাক।
জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে গুণটানা-পথে হেঁটে যাই
ঝুরে ঝুরে মরে মৃদুনিশ্বাস সে-তোমার,
সোনালি ও লাল এ্যাকেশিয়া ফুল ঝরে যায়।

বিধর্মীদের গুপ্ত গীতি

[বিগত ষোড়শ শতকের শেষার্ধে পর্তুগীজ ও স্পেন-দেশীয় যাজকরা জাপানে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম প্রচার করেন। এ-কবিতায় তাঁদের উল্লেখ আছে।]

এক অধঃপাতিত যুগের বিধর্মী শিক্ষায় আমি বিশ্বাসী, বিশ্বাস রাখি সেই
খ্রীষ্টিয়ান ঈশ্বরের ডাকিনীবিদ্যায়,

সেই সব কৃষ্ণবর্ণ জাহাজের মাল্লাদের প্রতি, লালচুলোদের সেই
বিস্ময়কর দেশে,

সেই উজ্জ্বল রক্তবর্ণ কাচ, তীক্ষ্ণ সুগন্ধি কারনেশন
দক্ষিণী বর্বরদের সুতীবস্ত্র, আরক আর রঙিন মদে আমার অসীম আস্থা।

প্রার্থনার মন্ত্র-জপা কটা-চোখো ডোমিনিকানরা স্বপ্নের মধ্যেও আমায় বলে
নিষিদ্ধ ধর্মের সেই ঈশ্বরের কথা, বলে রক্তে-রাঙা ক্রুশকাঠের কথা
আর সেই চতুর যন্ত্রটার, যা সর্ষেদানাকেও আপেলের মতো বড়ো দেখায়
আর সেই অদ্ভুত যো-হুকুম দূরবীণের, যা নজর দেয় স্বর্গের দিকেও।

ওরা তৈরি করে পাথরের প্রাসাদ, শ্বেতপ্রস্তরের শুভ্র রক্ত
উপচে পড়ে স্ফটিকের বাটিতে বাটিতে ; শোনা যায়, রাত্রি নামলে
জ্বলে তাই দাউদাউ-শিখায়।

সেই সুন্দর বৈদ্যুত-স্বপ্ন ক্রমে ক্রমে মিশে যায় মখমলের ধূপের ধোঁয়ায়
আর চাঁদের দেশের যতো পাখি-প্রাণীদের প্রতিচ্ছায়া চমকে চলকে যায়।

শুনেছি, বিষাক্ত গাছপালার ফুলের নির্যাস নিঙড়ে তৈরি ওদের অঙ্গরাগ,
ক্ষয়া পাথর-নিষ্কাশন তেল দিয়ে আঁকা হয় মেরী-মায়ের মূর্তি ;
লাতিন বা পর্তুগীজ ভাষার পাশাপাশি-সাজানো নীল হরফগুলো
মনোরম বিষণ্ণ স্বর্গীয় সংগীতে পূর্ণ, প্রতিধ্বনিত।

প্রবঞ্চনার পুরোহিত সন্তরা, অনুগ্রহ করো আমাদের,
যদি এক শতাব্দী বিন্দুবৎ হয় মুহূর্তে, রক্তমাখা ক্রুশকাঠে যদি আমরা মরি
তবু কিছু না, কিছু না ; আমাদের প্রার্থনা, রহস্যভেদ করো, সেই আশ্চর্য
রক্তিম স্বপ্নের রহস্য :
হে খ্রীষ্ট, আকাঙ্ক্ষার ধূপের ধোঁয়ায়-ধরা এতগুলি দেহ আর আত্মা
আমাদের, আমরা প্রার্থনা করি আজ।

—কিতাহারা হাকিউশু (১৮৮৫-১৯৪৩)

রাতের রেলগাড়ি

উষার পাণ্ডুর আভা—
কাচের দরজায় আঙুলের ছাপগুলো বরফ,
আর শাদার আভাস-লাগা গিরিশ্রেণীর চূড়া
স্থির, যেন পারদ।
যাত্রীরা এখন ঘুমে।
ইলেকট্রিক বাতিটাই খালি দপদপ করছে, একান্ত ক্লান্ত।
বার্নিসের গা-বমি-করা মিষ্টি গন্ধ,
এ-রাতের রেলগাড়িতে
এমনকি আমার সিগারেটের অস্পষ্ট ধোঁয়াও
গলায় লাগছে।
না জানি ওই মহিলার—ওই পরস্ত্রীর—আরও কত খারাপ লাগছে সেটা।
ইআমাশিনা কি এখনও ছাড়াই নি আমরা?
হাওয়া-বালিশের মুখটা খুলে দিয়ে
তার ক্রম-সংকোচন লক্ষ করছেন মহিলাটি।
হঠাৎ বিষণ্ণতার মধ্যে আমরা পরস্পরের নিকটবর্তী হলুম।
সকালের সংলগ্ন সময়ে
ট্রেনের জানলা দিয়ে যখন আমি তাকালুম—
অজানা অঞ্চলে এক পাহাড়ি গাঁয়ে
দেখলুম সারে সার ফুটে আছে শাদাটে কোলাম্বাইন।

—হাজিওয়ারা সাকুতারো (১৮৮৬-১৯৪২)

শীত এসে গেল

অকস্মাৎ তীব্র তীক্ষ্ণ শীত এসে গেল।
ইআত্সুদের শুভ্র ফুল কোথায় মিলালো
গিংকো গাছগুলো বদ্‌লে সারি সারি হল ফুলঝাড়ু।

ঘুরে ঘুরে কুরে কুরে শীত এসে গেল।
শীত, যাকে ঘৃণা করে লোকে,
গাছেরা ফেরায় মুখ, পোকারা পালায় যাকে দেখে সেই শীত গেল এসে।

এসো শীত !
কাছে এসো, কাছে বসো, শীত !
আমিই শীতের শক্তি ; শীত-যে আহার।

ভিতরে সেঁধোও শুষে, সুতীক্ষ্ণ খোঁচায়
অগ্নিকাণ্ড শুরু করো, ডোবাও তুষারে—
ছুরির ফলার মতো ক্ষিপ্র তীব্র শীত এসে গেল।

—তাকামুরা কোতারো (১৮৮৩-১৯৫৬)

প্রথম বসন্ত

মধ্যরাত্রে
বৃষ্টি আর তুষার মেশামেশি, ঝরে পড়ল,
গড়িয়ে পড়ল ফোঁটায় ফোঁটায় নিরানন্দে—বাঁশের বনে।
স্বপ্নটা ছিল—অপর কারো হৃদয় সম্পর্কে।
যখন জেগে উঠলুম
চোখের জলে হিম হয়ে গেছে বালিশ।
—ও আমার হৃদয়, তোমার এ কী হল ?
লম্বা জানলাগুলোয় মৃদু সূর্যালোক আসছে,
লোহা-কারখানা থেকে আওয়াজ উঠছে গুনগুনিয়ে।
আমি বিছানা ছেড়ে উঠলুম
কাঠি দিয়ে নর্দমার কাদা দিলুম খুঁচিয়ে ;
পঙ্কিল জল ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল।
ছোট্ট টিকটিকিটা নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে স্রোতের মুখে।
মাঠে মাঠে
কালো মাটির চাঙড় তুলি আমি।
গমের চারা গজিয়ে ওঠে সবুজ, সবুজ।
—ও হৃদয়, মাটিকে বিশ্বাস করতে পারো।

—কিতাগাওয়া ফুইউহিকো (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম)

একটি মৃত্যু

হেমন্ত আকাশের ম্যাড়মেড়ে রঙ্
কালো ঘোড়ার চোখে আলোর ঝিলিক
জল যায় শুকিয়ে, লিলি যায় ঝরে
হৃদয় শূন্য, শূন্য।

দেবতারাও আসে নি, সাহায্যও জোটে নি
জানলার কাছে মরে আছে একটি স্ত্রীলোক।
আর শাদা আকাশটা দৃষ্টিহীন
তুষার-বাতাস হিমশীতল।

ও যখন প্রসাধন সারত জানলার পাশে
বাহু দুটোকে মনে হোত, বাহুলতা, পেলব
আর সকালের সূর্যালোক চুঁইয়ে পড়ত
জলধ্বনি ঝরে পড়ত ফোঁটায় ফোঁটায়।

রাস্তায় রাস্তায় প্রচণ্ড কলরব :
শিশুদের কণ্ঠস্বর রনরনিয়ে উঠছে।
কিন্তু বলো দেখি, কী গতি হবে এই মানুষটার ?
ক্ষয়ে ক্ষয়ে এ কি মিলিয়ে যাবে শূন্যতায় ?

—নাকাহারা চুইয়া (১৯০৭-১৯৩৭)

অনুবাদ : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

প্রদ্যোৎ গুহ

শলোকভ

এবার সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেলেন শলোকভ—সোভিয়েত সাহিত্যের সম্মানিত প্রধান পুরুষ। তাঁকে নিয়ে মোট তিনজন রুশ লেখক এই বিশ্বনন্দিত পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হলেন। অপর দু-জন ইভান বুনিন ও বরিস পাস্তেরনাক। স্বদেশে প্রবল প্রতিক্রিয়ার ফলে অবশ্য পাস্তেরনাককে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করতে হয়।

বুনিন আর পাস্তেরনাক, তাঁদের নিঃসন্দেহ সাহিত্যপ্রতিভা সত্বেও, পুরস্কৃত হয়েছিলেন প্রধানত রাজনৈতিক কারণে। বুনিন ছিলেন দেশত্যাগী আর পাস্তেরনাক সোভিয়েত-ব্যবস্থার সমালোচক। শলোকভ তা নন। তিনি সোভিয়েত ব্যবস্থার একনিষ্ঠ সমর্থক, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য (প্রসঙ্গত, তিনিই একমাত্র কমিউনিস্ট লেখক যিনি নোবেল প্রাইজ পেলেন), গৃহযুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর মর্যাদার তুলনা হতে পারে একমাত্র গর্কির সঙ্গেই।

সুপ্রিম সোভিয়েতের ডেপুটি, অকাদেমির সদস্য—সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর জনপ্রিয়তার তুলনা নেই। তার বইয়ের বিক্রির সংখ্যা বিশ-ত্রিশ লক্ষ। চৌত্রিশটি ভাষায় তার অনুবাদ হয়েছে। তাঁর মহাকাব্যোপম উপন্যাস "দ্য কোয়ায়েট দোন" শেষ করতে লেগেছে চৌদ্দ বছর। ১৯২৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে চারখণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়। শেষ খণ্ডটি যেদিন প্রকাশিত হল তার আগের দিন রাত্রি থেকে বইয়ের দোকানের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মস্কোর অগণিত জনসাধারণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সাহিত্য-সম্মানে ভূষিত, এ-বছর সাড়ম্বরে সারা সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে তাঁর ষষ্ঠিতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল। আর এ-বছরই পেলেন তিনি নোবেল প্রাইজ, 'কোয়ায়েট দোন'-এর শেষ খণ্ড প্রকাশিত হবার ঠিক পঁচিশ বছর পরে। সন্দেহ নেই, এই দেরীর কারণ রাজনৈতিক—শলোকভের কমিউনিস্ট মতবাদ। তাঁকে পুরস্কার দিতে দেরী হয়েছে, নোবেল কমিটিও

তা স্বীকার করেছেন, অবশ্য কি কারণে তা তাঁরা ব্যাখ্যা করেন নি। তবে কথায় আছে 'বেটার লেট দ্যান নেভার'। পুরস্কার দেবার জন্তে তলস্তয়, চেহ্ভ, গর্কিকে তো আর পাওয়া যাবে না।

দোন অঞ্চলের মানুষ, শলোকভ তাঁর সাহিত্যে দোন অঞ্চলের মানুষের জীবন-গাথাই রূপায়িত করেছেন। 'টেলস্ অব দোন' তাঁর প্রথম গল্প-সংগ্রহ। সমালোচকদের মতে যদিও তা কোনো মহৎ সাহিত্যকর্ম নয়, তাতেই এর স্থচনা। তারপর 'কোয়ায়েট দোন', 'ভার্জিন সায়ল আপটার্নড', 'দে ফট ফর দেয়ার কানট্রি' 'ম্যানস্ ফেট' ইত্যাদিতে সেই একই অঞ্চলের কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন শলোকভ।

রুশ সাহিত্যের মূলধারার অনুপ্রেরণাতেই সম্ভবত শলোকভ প্রথম থেকেই মহাকাব্যোপম উপন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'দ্য কোয়ায়েট দোন' সব দিক থেকেই 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস'-এর আদলে রচিত। কী স্থাপত্যে, কী শিল্পী-রীতিতে, কী চরিত্র-চিত্রন পদ্ধতিতে, সর্বত্রই তলস্তয়ের প্রভাব সুস্পষ্ট। তলস্তয়ের অনুসরণেই তিনি ব্যক্তি-জীবন ও ইতিহাস, যুদ্ধ এবং গৃহস্থালীর চিত্র, জনসাধারণের আন্দোলন ও ব্যক্তি মানুষের আবেগকে এক সূত্রে গেঁথেছেন, দেখিয়েছেন কি ভাবে সামাজিক আবর্তন পরিবর্তিত করে ব্যক্তিগত নিয়তিকে, রাজনৈতিক সংগ্রাম নির্ধারিত করে বিভিন্ন ব্যক্তির সুখ এবং সর্বনাশ। গ্রিগরি মেলেকভ এবং অ্যাকসিনিয়ার প্রণয়কাহিনী যদিও 'দ্য কোয়ায়েট দোন'-এর কেন্দ্রকাহিনী এবং তাই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে সচলও রাখে তবু সেই সঙ্গে তা আবার সমগ্র কসাক জীবনকেও ছুঁয়ে যায়, দোন তীরবর্তী এই আধাসামরিক আধাকৃষিজীবী এই খণ্ডজাতির সামাজিক রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারকেও রূপায়িত করে। আবার জারের আমল, প্রথম মহাযুদ্ধ, বলশেভিক বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধেরও তা বিস্ময়কর জীবন্ত দলিল। বলতে কি, শেষের খণ্ডগুলি, বিশেষ করে তৃতীয় খণ্ড তো খবরের কাগজের বিবরণ, সরকারী ঘোষণা ও অন্যবিধ তথ্যে বেশ কিছুটা ভারাক্রান্তই। সে দিক থেকে 'কোয়ায়েট দোন'-কে গল্পাকারে ইতিহাসও বলা যায়। তবু 'কোয়ায়েট দোন'-কে শুধু সামাজিক-রাজনৈতিক দলিল হিসেবে দেখাটা ভুল হবে— 'কোয়ায়েট দোন' সত্যকারের সাহিত্যকর্ম, বাস্তবতা সেখানে পুনর্নির্মিত, মানুষ জীবন্ত, লেখকের জীবন-দর্শন শিল্পসম্মতভাবে রূপায়িত।

কমিউনিস্ট শলোকভ তাঁর রাজনৈতিক আনুগত্য তাঁর সাহিত্যে কখনও গোপন করেন নি, পার্টির সদস্যদের তিনি আকর্ষণীয় বীর চরিত্ররূপে, 'পজেটিভ হিরো' রূপেই এঁকেছেন—কিন্তু তার রাজনৈতিক মতবাদ তিনি কখনও পাঠকদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেন নি, বা মাদুলীর মতো স্থানে-অস্থানে ঝুলিয়ে রাখেন নি। তাঁর মতবাদ তাঁর দৃষ্টিকে আবিল করে নি, আরও স্বচ্ছ করেছে, তাই তাঁর বর্ণনাও যথাযথ এবং সত্যমূলক। আর তাই রুশ পাঠক গ্রিগরির ভাগ্যবিবর্তনের মধ্যে নিজেদের সাম্প্রতিক অতীতকে সহজেই চিনে নিতে পারে।

দোন অঞ্চলে সোভিয়েত হুকুমতের প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য হয় নি, কসাকেরা নতুন ব্যবস্থাকে প্রথমে মেনে নিতে পারে নি—দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তারা কমিউনিস্ট নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। এই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হয়েছে রুশিয়ার আরও বহু অঞ্চলেই—'কোয়ায়েট দোন' তাই শুধু দোন অঞ্চলেরই কাহিনী নয়, সারা রুশ দেশেরও কাহিনী। সে কাহিনী আবার বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সংশয় ও সন্দেহের, অচলায়তন ও পরিবর্তনের সংঘাতের কাহিনী—আর শলোকভ তাকে রূপায়িত করেছেন জীবন্ত মানুষের মধ্য দিয়ে, তাদের জীবন, তাদের চিন্তা ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে। কাহিনীকে শলোকভ তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের লেজুর করেন নি. জোর করে কোনো বক্তব্যকে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করেন নি প্লটকে। তিনি শুধু কতগুলি ঘটনাকে, বহুখাতে প্রবাহিনী জীবনকে তুলে ধরেছেন পাঠকের চোখের সামনে।

চরিত্র-চিত্রণ দক্ষতায় আধুনিক সাহিত্যে শলোকভের জুড়ি মেলা ভার। 'কোয়ায়েট দোন'-এ অসংখ্য চরিত্রের ভিড়—শলোকভ শুধু যে প্রধান চরিত্র-গুলিকেই অসীম যত্ন নিয়ে এঁকেছেন তাই নয়, অপ্রধান চরিত্রগুলির তুচ্ছ খুঁটিনাটিও তিনি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন নি।

সোভিয়েত পাঠকের কাছে 'কোয়ায়েট দোন'-এর আর-একটি আকর্ষণ—দোন অঞ্চলের নিসর্গের, ঋতুচক্রের বর্ণাঢ্য প্রতিকৃতি।

'কোয়ায়েট দোন'-এর বিশালতা আরও এক অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ। পটভূমির বিশালতায়, চরিত্র এবং ঘটনার ঠাসাঠাসিতে, প্রকৃতি-পটের বৈচিত্র্যে—মহাদেশোপম রুশিয়ার বিরাটত্বই যেন এখানে আভাসিত। উপন্যাসের ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে বিচ্ছুরিত শক্তির দীপ্তি। কসাকদের প্রবল জীবন, গ্রিগরির

দুঃসাহসিক কার্যাবলী, অ্যাকসিনিয়ার প্রতি তার দুর্বার আকর্ষণ, বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের বজ্রনাদী বিস্ফোরণ, আবেগের তীব্রতা—সবকিছুকেই অদ্ভুত শক্তিমত্তায় স্পন্দমান করে তুলেছেন শলোকভ। আর এদিক দিয়ে ধ্রুপদী রুশ সাহিত্যের তিনি সুযোগ্য উত্তরসূরী।

শলোকভের দ্বিতীয় মহাগ্রন্থ 'দ্য ভার্জিন সয়েল আপটার্নড'—সোভিয়েত ইউনিয়নে যৌথ কৃষি প্রবর্তনের কালে যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তারই সাহিত্যিক প্রতিরূপ। কৃষিজমির যৌথকরণ এবং কুলাকদের উচ্ছেদ ছিল ত্রিশের যুগের জ্বলন্ত সমস্যা। 'দ্য কোয়ায়েট দোন' অসমাপ্ত রেখে শলোকভ এই বিষয়ে একটি উপন্যাস রচনায় হাত দেন। ১৯৩২ সালে 'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড' প্রধানত একটি সামাজিক রেখাচিত্র, কিন্তু এ উপন্যাসের জনপ্রিয়তা শুধু এ কারণেই নয়। 'কোয়ায়েট দোন'-এর তুলনায় কিছুটা নিষ্প্রভ হলেও, 'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড'-এরও প্রধান আকর্ষণ মানবিক মহানাটক।

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দাভিদভ একজন প্রাক্তন শ্রমিক। ১৯৩০ সালে বাছাই করা যে পঁচিশ হাজার পার্টি সদস্যকে গ্রামে পাঠান হয়েছিল যৌথকৃষি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে দাভিদভ ছিল তাদের একজন। দন নদীর তীরে গ্রেমিয়াচি লগ গ্রামে এসে দাভিদভ সরাসরি রাজনৈতিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নেতৃত্ব করে কুলাক বিরোধী অভিযানে আর সেই সঙ্গে ধরা পড়ে লুশ্‌কা নামে বিশ্বাসঘাতিনী এক মোহিনীর প্রেমের ফাঁদেও। যৌথখামারের সভাপতিরূপে দাভিদভের নির্বাচনে প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়।

'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় প্রথম খণ্ডের ঠিক সাতাশ বছর পরে, ১৯৬০ সালে। এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্লট আবর্তিত হয় গ্রামে লুকিয়ে থাকা একদল প্রতিবিপ্লবীর চক্রান্তকে কেন্দ্র করে। চক্রান্ত অবশ্য ব্যর্থ হয় কিন্তু প্রতিবিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করতে গিয়ে নিহত হয় দাভিদভ ও নেগুলনভ। তবু কাহিনীর পরিসমাপ্তি আশাবাদী সুরেই।

এই উপন্যাসেও নতুন করে শলোকভের চরিত্র-চিত্রন দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। ময়দান্নিকভ, দাভিদভ, নেগুলনভ, পিতামহ শচুকর প্রভৃতি চরিত্রগুলি কায়াপরিগ্রহ করে বইয়ের পাতা ছেড়ে যেন বেরিয়ে আসে।

বিপ্লবীদের মতো প্রতি-বিপ্লবীদের চরিত্রও সমান যত্ন নিয়ে আঁকেন শলোকভ।

শলোকভের তৃতীয় সুবৃহৎ উপন্যাস 'দে ফট ফর দেয়ার কান্ট্রি' এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। ১৯৪৩ থেকে ১৯৬০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পত্র-পত্রিকায় এর কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে ধারাবাহিক ভাবে। ইংরেজি 'সোভিয়েত লিটারেচার' পত্রেও তা মুদ্রিত হয়েছে ইংরেজি জানা পাঠকদের জন্যে। যুদ্ধের উপর শলোকভের আর দুটি বড় গল্প হল—'দ্য রাশ্যান ক্যারেকটর' ও 'ম্যানস ফেট'। 'দ্য রাশ্যান ক্যারেকটারে' শলোকভ রুশ জাতীয় চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বল রঙে এঁকেছেন। একজন সাধারণ রুশ নাগরিক, যুদ্ধ এসে যার শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে দিল—'ম্যানস ফেট' তার ভাগ্য বিবর্তনের এক আবেগঘন সাহিত্যিক রূপায়ণ।

শলোকভ-এর প্রায় সব লেখারই বাংলা তরজমা হয়েছে কোনো-না-কোনো সময়ে। অবশ্য তা পাঠ করে বাঙালি পাঠক মূলের স্বাদ কতটা পাবেন বলা কঠিন। কসাকদের মুখের ভাষা এবং প্রবাদ-প্রবচনকে শলোকভ এমন নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন যে তার স্টাইল, কোনো সমালোচকের ভাষায়—'despair of translators'। আর বাঙালি অনুবাদক তো তরজমা করেন ইংরেজি তরজমা থেকে।

কোনো কোনো সমালোচক শলোকভকে বলেছেন 'the poet of a disappearing agricultural world'। কথাটা এক অর্থে সত্যি। যদিও শলোকভ বেশ কয়েকটি পাঁচসালা সাতসালা পরিকল্পনার সমসাময়িক, কলকারখানা নিয়ে তিনি কখনও কিছু লিখতে উৎসাহ বোধ করেন নি। প্রথম জীবনে কিছুকাল অবশ্য তিনি মস্কোতে বাস করেছিলেন, শ্রমজীবী হিসাবে জীবিকা অর্জনও করেছিলেন। তারপরই তিনি ফিরে আসেন নিজের গ্রাম ভেশেনস্কায়ায় সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে। সেখাই তিনি থাকেন, মস্কোয় আসেন কদাচিৎ। তার প্রিয় হবি মাছধরা, শিকার এবং পশুপালন।

বহু দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন, ক্রুশ্চেভের ভ্রমণসঙ্গী হিসাবে তিনি এমন কি আমেরিকাও গিয়েছেন—কিন্তু ইওরোপ বা আমেরিকা তাঁকে মোটেই আকর্ষণ করে নি। ইওরোপ-আমেরিকা বা বড় বড় শহরের জাকজমকের চেয়ে নিজের শান্ত গ্রামটিতে থাকতেই তিনি ভালোবাসেন। সরল শ্রমজীবী

মানুষের সাহচর্যই তাঁর অভিপ্রেত। যথার্থ মাটির মানুষ তিনি, দোন অঞ্চলের মানুষ তাঁর সাহিত্যে দোন অঞ্চলের মাটির গন্ধ পাওয়া যায়।

শলোকভ কমিউনিস্ট, বুদ্ধি দিয়ে ততটা নয় যতটা হৃদয় দিয়ে। হৃদয়বান মানুষ হিসেবেই তিনি কমিউনিজমকে গ্রহণ করেছেন। লেখক হিসাবেও তিনি হৃদয়বান। তার সাহিত্যে বুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তিরই প্রাবল্য। তত্ত্বের কচকচি তিনি পছন্দ করেন না। সাহিত্যনীতির আলোচনায় তিনি বড় একটা যোগ দেন না—কিন্তু যখন মুখ খোলেন তখন কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসে তিনি এক কথায় সমস্ত সোভিয়েত সাহিত্যকে 'ধূসর একঘেয়েমী' বলে নাকচ করে দিয়েছিলেন। কবি-সাহিত্যিকদের বলেছিলেন মস্কো শহর ছেড়ে এসে গ্রামে "সত্যিকারের সাধারণ মানুষের" মধ্যে বসবাস করতে। আমাদের কবির মতো তিনিও জানেন সাহিত্যে 'নকল শৌখিন মজদুরির' স্থান নেই। শহরে বাস করে, কফিখানায় আড্ডা জমিয়ে, দু-চারটে মার্কস-লেনিনের বদ হজমের উদ্‌গার তুলে জনসাধারণের সাহিত্য রচনা করা যায় না। সে ধরনের রচনা না সাহিত্য না জনসাধারণের। তার স্থান একমাত্র আস্তাকুঁড়েই।

শলোকভ সাহিত্যও করেন, রাজনীতিও করেন। কিন্তু সাহিত্যের রাজনীতি থেকে তিনি সর্বদাই দূরে থেকেছেন। শলোকভ স্তালিন-প্রশস্তি কখনও করেন নি তা হয়তো নয়, কিন্তু লেখকদের প্রতি অবিচার হলে তার প্রতিবাদও তিনি করেছেন। সমালোচনার ফলে নিজের উপন্যাসও হয়তো তিনি সংশোধন করেছেন তবু লেখক সংঘের মাথামোটা আমলাদের বা নির্বোধ সমালোচকদের নির্মম সমালোচনা করতেও তিনি কখনও পেছপা হন নি।

পুরস্কার সাহিত্যকৃতির মানদণ্ড নিশ্চয়ই নয়। এবং শলোকভেরও এই নতুন পুরস্কার লাভ নয়। কিন্তু যোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করলে পুরস্কারের মর্যাদা বাড়ে। সন্দেহ নেই শলোকভকে পুরস্কৃত করায় নোবেল পুরস্কারেরই মর্যাদা বেড়েছে। আর যে পুরস্কার দেবার জন্যে চার্চিল ছাড়া লোক খুঁজে পাওয়া যায় না সে পুরস্কারের মর্যাদা যে একেবারে তলায় এসে ঠেকেছিল নিতান্ত অন্ধ ছাড়া কে তা অস্বীকার করবে?

পুস্তক-পরিচয়

সংগ্রহ-গ্রন্থ

বাংলা কবিতা। সম্পাদক : শান্তি লাহিড়ী। সাহিত্য। চার টাকা

এটি একটি সংকলন গ্রন্থ। নামপত্রে লেখা আছে "বাংলা কবিতা, চতুর্থ পর্যায়, পশ্চিম অলিন্দ।" চতুর্থ পর্যায়টিই আগে প্রকাশিত হয়েছে। চর্যাপদ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা কবিতার একটি 'প্রতিনিধি সংকলন' চারটি পর্যায়ে ভাগ করে চার খণ্ডে প্রকাশ করা আলোচ্য সংকলনের সম্পাদকের উচ্চাভিলাষ। উচ্চাভিলাষ হিসাবে এটি অভিনন্দনীয়। কিন্তু কেউ কেউ যেমন নাটকের জমাটি শেষ অঙ্কটি আগে-ভাগে লিখে বসে থাকেন, আলোচ্য প্রকাশক এবং সম্পাদকও তেমনি চতুর্থ পর্যায়ের আধুনিক খণ্ডটিকেই সর্বাগ্রে প্রকাশ করেছেন। উনিশশো আটাশ ও তার পরে জাত কবিদের কবিতা নিয়েই এই সংকলন।

বলা বাহুল্য ব্যাপারটি ঠিক সুবোধ্য নয়। যদি সম্পাদকের এই অভিপ্রায়ই মনে ছিল (তাঁর কথা থেকেই সে ধারণা হয়) যে বাংলা কবিতার "পূর্ণাঙ্গ শরীর সৃষ্টির" একখানি ছবি তিনি আঁকবেন, যদি তিনি ভেবে থাকেন চর্যাপদ থেকে সাম্প্রতিক মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলা কবিতার ক্রমবিবর্তন তিনি দেখাবেন, তাহলে তাঁর বাংলা কবিতা চতুর্থ পর্যায়ের সমালোচনা আপাতত স্থগিত রাখতে হয়। কেননা আমরা জানি না আদি-মধ্য-বর্তমানের বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলা কাব্যের কোন্ প্রতিশ্রুতি তিনি লক্ষ করেছেন—কাজেই কিসের পরিণতি তিনি দেখাচ্ছেন তাও জানি না। পূর্ণাঙ্গ শরীর যখন পাওয়া যাবে তখনই তার দেহসৌষ্ঠব বিচার করা যাবে। একটি কর্তিত অঙ্গের কি বিচার সম্ভব? কাজেই যে নেপথ্যচারী রহস্যময় ব্যক্তি—যিনি কবি বা সাহিত্যের প্রকাশক কিছুই নন অথচ সম্পাদককে মদত্ দিয়েছেন তাঁর অবদানের মূল্য বোঝার সময় এখনও আসে নি। ধরা যাক সম্পাদকের লিখিত ভূমিকার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি একান্তই বাহুল্যমাত্র, ধরা যাক ঐ অনুচ্ছেদটির কথা ভুলে গেলেই সংকলনটির প্রতি যথার্থ সুবিচার করা হবে। তাহলেও সম্পাদকের বক্তব্যের

সারবত্তা স্বীকার করা খুবই দুরূহ। প্রথম অনুচ্ছেদে সম্পাদক মহাশয় বলেছেন যে বাংলা কবিতার সংকলন গ্রন্থগুলি ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিপ্রসূত। "কয়েকটি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নির্বাচন যে হয় নি তা নয়, তবে সে ক্ষেত্রেও সংকলনগুলি কবিতার কোনো-একটি বিশেষ চরিত্রকে অনুসরণ করেছে।" সংকলনগুলি সে কারণেই প্রকাশিত হয় এবং পঠিত হয়। বুদ্ধদেববাবুর সংকলনের মধ্যে বুদ্ধদেববাবুর কবি-ব্যক্তিত্বকে বৃহত্তর অর্থে পরোক্ষভাবে অনুভব করা যায়, বিষ্ণুবাবুর সংকলনে বিষ্ণুবাবুকে। আর, নির্বিশেষ চরিত্র নিয়ে যদি কোনো কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়ও তবে তার নির্বিশেষত্ব অক্ষমের হাতে পড়ে চরিত্রশূন্যতায় পর্যবসিত হয়। অথচ ভূমিকাটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি তাঁর প্রস্তাবিত বাংলা কবিতার যে-সংকলনের কথা বলেন তার নিঃসন্দেহেই একটা চরিত্র আছে। এবং সে চরিত্রকে রূপায়িত করলে একটা ভালো সংকলনই হবার কথা। নির্বিশেষ মান নির্ণয়ের জন্য প্রচেষ্টা সকলেই করে থাকেন—এভাবে চেষ্টা করতে করতেই সংকলনগুলি বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি ভূমিকাটির কোনো কোনো অংশ আক্ষরিকভাবেই বুঝতে পারি নি। সম্পাদক মহাশয় বলছেন: "কখনো কোনো কবিতার সংকলন প্রকাশিত হলেও সেগুলি প্রায়ই নিবেদিত অথবা অনূদিত কবিতার সংকলন অথবা কোনো বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পাদিত।" দৃষ্টিকোণহীন সম্পাদনা বলতে কী বোঝায় আমার জানা নেই, নিবেদিত কবিতা এবং অনূদিত কবিতাও ঠিক বুঝলাম না।

প্রকাশক মহাশয়ও বইখানি বুঝতে ভুল করেছেন দেখা যাচ্ছে। কভার পেজের ভিতরে যে-বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে তাতে "বাংলা কবিতার পঞ্চম দশক" বলে যে দৃষ্টিভঙ্গিসূচক কথাগুলি বলা হয়েছে তার মানে কি? বাংলা কবিতার পঞ্চম দশক বলতে কী বুঝব? নিশ্চয় বিংশ শতকের পঞ্চম দশক? তাহলে উনিশশো আটাশের আগে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা বাদ গেলেন কেন? ঐ দশকই যদি লক্ষ্য হয় তবে ঐ দশকে লিখিত কবিতাগুলিই বিচার্য হবে না কি? তবেই তো দশকের চেহারাটা ফুটবে। তা নইলে উনিশশো আটাশের শুভলগ্নে অথবা তারপরে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাই পঞ্চম দশকের আত্মাকে বোঝেন, বাকিরা কিছু বোঝেন না এ-রকম মানে দাঁড়িয়ে যাবে না?

আসলে এটি একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ। সংকলয়িতার ভূমিকা এ-গ্রন্থে কিছু

নেই। একমাত্র লিখিত ভূমিকাটুকুই তাঁর ভূমিকা। এবং যেহেতু সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার সংগ্রহ-গ্রন্থ সেইহেতু স্বনিয়মেই বেশ কিছু সংখ্যক উৎকৃষ্ট কবিতা এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। এই হল এ-গ্রন্থের উজ্জ্বল দিক। শঙ্খ ঘোষের দুটি কবিতা, অলোকরঞ্জনের অন্তত একটি কবিতা, তারাপদ রায়ের একটি কবিতা কবিদের ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব-সূচক হয়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থাপনায় আরও একটু যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। তাঁর 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' যতখানি তাঁর কবিত্বের পরিচায়ক অন্যগুলি ততখানি নয়। সিদ্ধেশ্বর সেন ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থাপনা সব থেকে ভালো। এঁদের সবকটি কবিতাই এঁদের পূর্ণ স্বাক্ষরকে বহন করছে।

তাছাড়া এমন অনেক কবিতা রয়েছে যেগুলি মোটামুটি ভালো। আর কে না জানেন এ কথা যে বর্তমান বাংলাদেশে মোটামুটি ভালো কবিতার সংকলন না-হওয়া রীতিমতো কঠিন ব্যাপার।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সীমান্তবাঙলার পরিচয়

সীমান্তবাঙলার লোকযান। ডঃ সুধীরকুমার করণ। এ. মুখার্জি এণ্ড কোং। বারো টাকা।

লোকযান বা ফোকলোর সম্পর্কে আগ্রহ বাংলাদেশে ইদানীং বিশেষভাবে বেড়েছে। লোকজীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপার সম্পর্কে পুরোনো আমলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদাসীনতা এবং কখনো হয়তো-বা উন্নাসিকতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ এক সময় ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন: 'অনেকের নিকট এই সকল…নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য বর্তমান কালে বঙ্গসমাজে অতিশয় সুলভ হইয়াছে।'

ভাগ্যক্রমে এই 'গম্ভীর প্রকৃতির লোক'-এর সংখ্যা এখন কমছে। নানা দিকে নানা উদ্যোগ ও কর্মচিহ্নও ব্যাপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অচলায়তনেও সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্য বিশেষ পত্রে সংযুক্ত হয়েছে। ফোকলোর সম্পর্কিত সর্বভারতীয় পত্রিকা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে লিখিত বইয়ের সংখ্যাও বাংলা ভাষায় বর্ধমান।

ডঃ সুধীরকুমার করণ তাঁর 'সীমান্তবাঙলার লোকযান' বইতে বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমান্তভূমির লোকজীবনের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেছেন। এই অঞ্চলের ইতিহাসকে তুলে ধরবার প্রয়োজন খুবই বেশি ছিল। কারণ সীমান্ত বরাবরই অবহেলিত অঞ্চল। বিশেষত সীমান্তবাঙলার একটি অংশ—মানভূম—বহুদিন বাঙলাদেশের বাইরে থাকায় লোকলোচনের ঈষৎ অন্তরালে পড়ে গিয়েছিল। তাই এই বহুদিনের প্রবাসীর ঘরে ফেরার পর তার সঙ্গে নতুন করে একবার পরিচয় হওয়া দরকার ছিল। সে যেন ঘরে ফিরেও প্রবাসী না থাকে।

এই পরিচয়সাধনের ভার নিয়েছেন সৌভাগ্যক্রমে এমন একজন যিনি এখানকার মাটিতে জন্মেছেন, বাস করেছেন। ফলে, এ-বই নিতান্ত ডি. ফিল.-লোভী অধ্যাপকের খামচে-খামচে তোলা বিক্ষিপ্ত বিষয়ের সংকলন নয়, একটি অঞ্চলের লোকজীবনের অখণ্ড পরিচয়—সামগ্রিক ইতিহাসমূলে জাত ও বিকশিত। প্রতি ছত্রেই বোঝা যায়, লেখক অঞ্চলবিশেষের এই জীবনকে বাইরে থেকে দেখেন নি, ভিতর থেকে দেখেছেন। এ-রচনা একদিকে খুব খাঁটি, অন্যদিকে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির একটা স্বাদও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে—যে-ব্যক্তিকতা এ-জাতীয় বইতে দুর্লভ এবং বৈজ্ঞানিক মতে হয়তো বা অনভিপ্রেত। এই ব্যক্তিকতায় অবশ্য সাহিত্যগুণ বেড়েছে, আবার পরিসরের বৈজ্ঞানিক মিতি-তীক্ষ্ণতা কমে গেছে। হয়তো এর চেয়ে কম পরিসরে এ-বই লেখা চলত। কিন্তু লেখক বোধহয় পরিসরের পরিবর্তে সমগ্র সীমান্তবাঙলার একটি পরিবেশ-রচনার দিকে মন দিয়েছেন বেশি। এ যেন শুধু বিজ্ঞানকে জানা নয়, দেশকে জানা, মাটিকে জানা।

পুরুলিয়াকে কেন্দ্রভূমি ধরে একটি আঞ্চলিক পরিমণ্ডলের লোকসংস্কৃতি তাঁর অনুসন্ধেয়। এই অঞ্চলটির বিশেষত্ব লক্ষণীয়। বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের সঙ্গমবিন্দুতে এটি স্থিত। তাছাড়া এখানে এর চারপাশে আছে সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী মানুষের বসতি। ফলে এখানকার জনজীবনে বিচিত্র সংস্কৃতি-স্রোতের এক সম্মিলন।

বইটির চারটি ভাগ, প্রথম ভাগে 'লোকযান' কথাটির ব্যাখ্যা (সুনীতিবাবু ফোকলোরের বাংলা করেছিলেন 'লোকযান', লেখক এখানে সেই শব্দটি নিয়েছেন) এবং সীমান্তবাঙলার ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক পরিচয়। দ্বিতীয় ভাগে আঞ্চলিক পার্বণের কথা। কামিনা, ঝাঁপান, করম, ইঁদ, ভাদু, বিঁধা,

বাঁধনা, টুসু এই পর্বগুলির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন লেখক। তৃতীয় ভাগে সীমান্তবাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের কতগুলি শাখার আলোচনা: নৃত্যগীত, ঝুমুর, সীমান্তবাঙলার গানে বৈষ্ণব উত্তরাধিকার, সীমান্তবাঙলার বাইজী ও ঝুমুর, কাঠিনাচ ও ঝুমুর, দাঁড়ঝুমুর ও টাঁড়ঝুমুর, ভাদুরিয়া ঝুমুর, লোকায়ত বিবাহ-সংগীত, সীমান্তবাঙলার আদিম বিশ্বাস, গ্রামদেবতা, লোককথা ইত্যাদি। চতুর্থ ভাগে দেড়শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী এক লোকসংগীত-সংকলিকা।

এই সেদিনও মানভূম প্রশাসনিক বাংলাদেশের বাইরে ছিল। এ-জেলা সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজের বিস্মৃতি বা জ্ঞানাল্পতা ছিল—এ কথা অপ্রিয় হলেও সত্য। মানভূম এখন পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থ প্রাণময় এক মানভূমকে বঙ্গীয় শিক্ষিতসমাজের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করবে। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের গবেষণার দিকটি ছাড়াও এ আমাদের পক্ষে কম লাভের কথা নয়।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

সাহিত্যপত্র

'সাহিত্যপত্রে'র (শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭২, মূল্য ২.০০) স্বাগত করতে চাই। দীর্ঘকাল পরে এ পত্রের পুনরাবির্ভাব আমাদের বিশেষ আনন্দের কারণ। আপন বিশিষ্টতায় 'সাহিত্যপত্র' চিরদিনই বিশিষ্ট; আর সে হিসাবে জিজ্ঞাসু পাঠকের নিকট সম্মানিতও। জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকার এবং গল্প উপন্যাসের যুগ এখন এ দেশে এসে গিয়েছে। আসা অনিবার্য শিক্ষার সুবিস্তারে। এ দেশে শিক্ষার সুবিস্তার থাক, বিস্তারও উল্লেখের অযোগ্য। কিন্তু জনশিক্ষার যথার্থ প্রয়াস অপেক্ষা পরিমিতসংখ্যক এই শিক্ষিতদেরও রুচি ও দৃষ্টিকে অর্থকরী প্রয়োজনে বিক্ষিপ্ত করার প্রয়াস অনেক বেশি প্রবল। শারদীয় সাহিত্যের এবারকার প্লাবনে গণ্ডা-গণ্ডা উপন্যাস ও গল্পের কচুরিপানায় তাই এমনি দুর্ভার যে, এরপরে হয়তো শারদীয় সাহিত্য ক্রমে ঠিকা লেখা গল্পেউপন্যাসে অসহ্য দুর্গন্ধেরই আকর হয়ে উঠবে। এরই মধ্যে দু-একটি ক্ষুদ্রতর পত্রের দান তবু আমাদের শারদীয় সুস্থতাবোধকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এসব সহযোগীদের আমরা অভিনন্দন জানাই। আর সেই সঙ্গে সাহিত্যপত্রকে জানাই তাঁদের অন্যতম প্রধান প্রতিভূরূপে আমাদের সাধুবাদ। কবি বিষ্ণু দে-র ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প-সাহিত্যে আধুনিকতা' অবশ্য এ সংখ্যার প্রধানতম আকর্ষণ। আশা করি তা পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হবে, এবং অন্য বাঙালি পাঠকও তা থেকে বঞ্চিত থাকবে না। তা ছাড়া, কবিতা-গল্পেও সাহিত্যপত্রের বিশিষ্টতা এ সংখ্যায় অক্ষুণ্ণ। আমাদের নতুন করে আশান্বিত করেছে কিন্তু এ সংখ্যার 'গ্রন্থ-সমালোচনা' ও 'টীকা-টিপ্পনী'—তাতে লেখকদের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, আর সম্পাদকদেরও পাওয়া যায় সযত্ন সেবার পরিচয়। বাঙলা সাহিত্যের আরও বৃহত্তর মণ্ডলীতে 'সাহিত্যপত্রের' সমাদর আমরা তাই কামনা করব।

গোপাল হালদার

সমাজতন্ত্রে প্রেম, যৌনচেতনা ও নীতিবোধ :

প্রেমের সংজ্ঞা কি ?—উন্নততর, সুন্দর জীবনরচনায় দুই হৃদয়ের সম্মিলন। কিন্তু এই সংজ্ঞার পেছনে যে-বিষয়টি উহ্য তা হল সার্থকতর জীবনগঠনে উদ্যোগী নরনারীর যৌনসম্পর্কের পরিচয়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নৈতিকতার পৃষ্ঠপটে প্রেম ও যৌনচেতনার উপর চিত্তাকর্ষক বিতর্ক চলছে হাঙ্গেরিতে। 'দি নিউ হাঙ্গেরিয়ান কোয়ার্টারলী'র এপ্রিল-জুন, ১৯৬৩, সংখ্যায় 'যৌননীতি প্রসঙ্গে বিতর্ক' প্রবন্ধে লেখক অটো হামোরি বিতর্কটি সাধারণ্যে প্রকাশ করেছেন। প্রশ্ন উঠেছে : স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার মৌলিক সমস্যাবলী সমাধানের পরও এখনও পর্যন্ত এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতার ক্রমবর্ধমান সংখ্যাটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুখ বা শান্তির সামাজিকভাবে সৃজনোন্মুখ শক্তিকে কেন প্রতারিত করছে ? ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টি সমগ্র সমাজের চিন্তা আকর্ষণ করে। হাঙ্গেরিয় জনমত এ ব্যাপারে সচেতন। তাই প্রশ্নটিকে নিছক প্রেমের গণ্ডী থেকে সাধারণভাবে মানবিক সম্পর্ক এবং ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে সমাজের আত্মীয়তা—অর্থাৎ সামগ্রিক আকারে নৈতিকতার বৃহত্তর পরিধিতে উত্তীর্ণ করা হয়েছে। এরই ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে জীবন্ত বিতর্ক। 'নতুন লেখা' (Új irás) নামক এক সাহিত্য-সাময়িকীতেই এর সূত্রপাত।

বিতার্কিকগণ সুস্পষ্টভাবে দুটি পৃথক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছেন। একপক্ষের বক্তব্য : 'নৈতিকতার তাগিদেই নীতিবোধ' : গোঁড়াপন্থী এই চিন্তাধারা যেরূপ বর্জনীয়, 'যৌননীতির ক্ষেত্রে কেবল বিবাহের মাধ্যমেই নৈতিকতা দাম্পত্যজীবনে যৌনসম্পর্কে সুপরিস্ফুট হবে' এ চিন্তাও সেরূপ প্রতিক্রিয়াশীল। কারণ যুব-বয়সে আয়োজিত বিবাহসমূহের এক তৃতীয়াংশেই ঘটে বিচ্ছেদের করুণ পরিণতি। আসলে প্রেমের পেছনে জৈবিক তথা মানসিক সুখপ্রদানের প্রধান হাতিয়ার যৌনচেতনা। বাঁচার অস্তিত্বকে সার্থক করে তুলতে হলে সেই যৌনবোধকেই গোঁড়া নৈতিকতার ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে, বিবাহের পারম্পর্য ক্রিয়াকে নয়। তাছাড়া, ধর্মের অসার 'চিরন্তন' নীতিফলকগুলি যাঁরা কমিউনিস্ট নীতিবোধে আমদানী করতে চান তাঁরা নীতিশিক্ষাকে যান্ত্রিক পেষণে জর্জরিত করে তোলেন ; সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা নৈতিক যন্ত্র ব্যবহার করবে না—নৈতিক মুক্তির আস্বাদ

যোগাবে : সেখানেই নীতিশিক্ষার প্রাচীন নিরিখে নৈতিকতার অলঙ্ঘনীয় দায়িত্বের সঙ্গে হৃদয়গত সুখের নিরন্তর সংঘাত রূপান্তরিত হবে নিবিড় বন্ধনে।

অপরপক্ষের মতে প্রথমোক্ত চিন্তাধারানুযায়ী কতিপয় নৈতিক রীতি পুনর্বিচারের প্রস্তাব নিঃসন্দেহে গ্রহণীয়, কিন্তু পাশাপাশি ফলাফলের উপর সতর্ক দৃষ্টিপ্রসারও অত্যাবশ্যক। কারণ তা না হলে আবেগপ্রবণ নৈতিক নৈরাজ্যবাদ বাস্তবায়িত হতে পারে। এ পক্ষের বক্তব্য : প্রেমের সততা নির্ণয়ের জন্য সীমানা নির্ধারণে যৌন সম্বন্ধের বিকাশ কোন সময় শুরু হওয়া উচিত, অনভিজ্ঞ তারুণ্যে এর বাস্তব প্রয়োগ কিভাবে সম্ভব প্রভৃতি জটিল থেকে জটিলতর প্রশ্নের সকল উত্তর "প্রতিক্রিয়ার গোঁড়ামী" বরবাদের পূর্বে পর্যালোচনা করার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট সমাজে যৌননীতিবোধ কোনো স্বতন্ত্র আকার ধারণ করতে পারে না। এই পটভূমিকায় হিংসাত্মক ব্যভিচার বা সচেতন বিশ্বাস-ভঙ্গ কেবল "যৌননীতি চিন্তা"রই হয়, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অসম্মানজনক কার্যরূপে অভিহিত। কিন্তু যৌনচেতনা আত্ম-সংরক্ষণের চেতনা থেকে কোনোক্রমেই পৃথক নয়। তাই যৌনবোধকে যাঁরা ক্লেদাক্তরূপে দেখতে অভ্যস্ত তাঁদের বোঝা উচিত যে মৃত্যুভয়ে ভীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বন্ধুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বান্ধবীর সঙ্গে কোনো ছেলের রাত্রিযাপনের চেয়ে অনেক বেশী দূষণীয়।

আপাতদৃষ্টিতে বিতর্কটিকে "উষ্ণ যুবমননে"র সঙ্গে "প্রাজ্ঞ মধ্যপন্থা"র বিরোধ মনে হতে পারে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে কিন্তু এ বিতর্ক দুই ভিন্ন যুগের মননশীলতার লড়াই নয়। আজকের দুনিয়ায় আত্মিক সচেতনতার পুনরুজ্জীবন অর্থাৎ যুগোপযোগী নতুন মানসিকতার বিকাশে প্রাক্তন পরিত্যাজ্য কঠোরতা অপসারণের পাশাপাশি ঐতিহ্য বিশেষকে সুরক্ষিত করার মধ্যেই এর মূল উদ্দেশ্য নিহিত। তাই এই উত্তপ্ত, মননধর্মী আলোচনায় যোগ দিয়েছেন তরুণ লেখক, যুবক দার্শনিক, সাহিত্যিক ছাত্র, বিদ্যালয় শিক্ষক, বেতার প্রচারকর্মী ঐতিহাসিক, প্রমুখ বুদ্ধিজীবী যাঁদের স্থির লক্ষ্য সঠিক পথ ও পন্থাবলম্বনে মার্কসীয় চিন্তাধারার ব্যবহারিক প্রয়োগকে পুষ্টতর করে তোলা।

সুমিত চক্রবর্তী

সুবর্ণরেখা

শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত বর্তমান যুগ ও তার শিল্পসম্ভাবনা প্রসঙ্গে বলেছেন: "It is an age that might call for a passionate involvement, ruthless exposure of hypocrisies of the past and the present, and the exploration of a new synthesis of wider dimensions of the past of the artist." তাই মনে হয় আজকের জীবনের সঙ্গে যে দুজন চলচ্চিত্র-পরিচালকের যোগ সবচেয়ে নিবিড়—সেই ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনই যুগের এই দাবি মেটাতে পারেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে মৃণাল সেন অবশেষে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জগৎকে এই শিল্পমাধ্যমে পরীক্ষামূলক নব্যরীতিতে মূর্ত করার পথটি খুঁজে পেয়েছেন—'আকাশকুসুম'-এ। যুদ্ধ ও স্বাধীনতা-উত্তরজীবনের বীভৎসতা, অসততা এবং তারই সঙ্গে জীবনের যা কিছু ভালো যা কিছু সুন্দর তার প্রতি প্রচণ্ড মমত্ববোধ যদি কোনো শিল্পীকে গভীরভাবে আলোড়িত ও মথিত করে থাকে, তবে তিনি ঋত্বিক ঘটক। তাঁর সেই যন্ত্রণা ও বেদনাবোধ কিংবা জীবনের আলোকিত দিকগুলি বারবার প্রকাশের পথ খুঁজেছে 'মেঘে ঢাকা তারা' 'কোমল গান্ধার' বা 'সুবর্ণরেখা'য়।

'সুবর্ণরেখা' ছবিটির চরিত্রগুলিকে দেশভাগের শিকার বলে দেখানো হয়েছে। তারা এক নতুন পরিবেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠা চায়, পুনর্বাসন চায়। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্যে আজ গোটা নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে। তাই ঐ কটি উদ্বাস্তু চরিত্র আমাদের সকলেরই আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্যোতক। আদর্শ শিক্ষক হরপ্রসাদ যৌথভাবে সংগ্রাম করার জন্যে "নবজীবন কলোনি" গড়ে তুলতে যায় আর তারই বিশেষ বন্ধু সচ্চরিত্র খাঁটি মানুষ ঈশ্বর এই যৌথ সংগ্রাম থেকে দূরে সরে এককভাবে চেষ্টা করে এক নতুন সুখের জীবন গড়ে তোলার, সঙ্গে তার ছোট বোন সীতা ও একটি অনাথ বালক অভিরাম। সুবর্ণরেখার তীরে ছাতিমতলায় একটি ফাউন্ড্রিতে কাজ করে ঈশ্বর, আর স্বপ্ন দেখে সীতা ও অভিরামকে মানুষ করে তোলার, তাদের একটা সুন্দর জীবন উপহার দেবার—যে জীবনের

সুখস্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ কল্পনা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয় তার বর্তমান জীবনের গ্লানি ও ক্লেদ। সীতা ও অভিরাম সভ্যতার এক বিরাট ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়েও অনাগত এক সুখের দিনের জন্যে প্রস্তুত করে চলেছে নিজেদের। এদিকে ঈশ্বরের যে স্বার্থবোধ তাকে সহ-সংগ্রামীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে এনেছিল সেই স্বার্থবোধই তাকে পচনশীল সমাজের সঙ্গে আপস করে চলতে শেখাল। জীবনের মূল্যবোধ তার কাছে পাল্টে যেতে থাকল। ঈশ্বরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিল সীতা ও অভিরামের জীবনবোধ। সীতা ও অভিরাম তাদের আদর্শের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে ঈশ্বরের অন্ধকার পরিমণ্ডল থেকে বিদায় নিল। জীবনের সমস্ত মূল্যবোধ হারিয়ে, জীবনের কাছে পরাজিত পর্যুদস্ত ঈশ্বর অবশেষে অর্ধোন্মাদ। ওদিকে যৌথ-সংগ্রামে আদর্শবান হরপ্রসাদের পরাজয়ও ঘটেছে এ-যুগের কপটতা ও নিষ্ঠুরতার কাছে; সেও আজ অর্ধোন্মাদ। জীবনযুদ্ধের দুই পরাজিত সৈনিক মুক্তি খোঁজে গড্ডলিকাস্রোতে "মধুর জীবনে"। সীতা ও অভিরামের সুন্দর জীবন এই বীভৎস জগতের ও যুগের আবহাওয়ায় বাঁচতে পারে না। তারা তাদের সুন্দর জীবনের অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন উত্তরাধিকারসূত্রে দিয়ে যায় তাদের সন্তানকে। জীবনের প্রচণ্ড ঘৃণ্য রূপের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ঈশ্বর ও হরপ্রসাদের অন্তর্জলী যাত্রা শুরু হয়। ঈশ্বর, হরপ্রসাদ, সীতা বা অভিরাম যে জীবন পায় নি হয়তো বা তাদের উত্তরপুরুষ বিনু তার দেখা পাবে। ভেঙে-পড়া নুয়ে-পড়া ঈশ্বরকে পথ দেখিয়ে বিনু তার নতুন ঘরের খোঁজে চলতে থাকে।

গোটা স্বাধীনতা-উত্তর যুগটা ধরার চেষ্টা করা হয়েছে সহজ সরল এই কাহিনীতে যাকে ঋত্বিকবাবু বলতে চেয়েছেন "গাথা" বা ক্রনিক্‌ল্‌। সাধারণভাবে বিচার করলে এই কাহিনীর কয়েকটি দুর্বলতা ধরা পড়ে। যেমন, ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৫ ('৬২তে তৈরি হলেও মুক্তি পেয়েছে এই বছরে)—এই ১৭ বছরের গণ্ডীতে ছোট সীতা ও অভিরাম, বড় সীতা ও অভিরাম এবং তাদের সন্তানকে ধরে রাখা যায় না। কিংবা কো-ইন্সিডেন্সের উপর অস্বাভাবিক ভর দিয়ে কাহিনীর অগ্রগমন (যথা হরপ্রসাদের পুনরাবির্ভাব, স্থানীয় স্টেশনেই বাগ্দী-বৌ-এর মৃত্যু কিংবা অ্যাক্সিডেন্টে অভিরামের মৃত্যু ইত্যাদি)। কিন্তু আমার আগাগোড়াই মনে হয়েছে যে সাল-তারিখটা অত বড় করে দেখার কোনো প্রয়োজনই ঋত্বিকবাবু বোধ করেন নি।

বিশেষ করে জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস, গান্ধীজীর মৃত্যু, মহাশূন্যে মানুষের জয়যাত্রা—এই ঘটনাগুলি এ-যুগের সংগ্রাম, পাপ ও কীর্তির কথাই ঘোষণা করে, বিশেষ কোনো স্মরণীয় দিন বা তারিখকে চিহ্নিত করার জন্যে উল্লিখিত নয়। তেমনি হরপ্রসাদের ফিরে আসা বা অভিরামের মৃত্যু (যা কিনা দর্শকরা আগেই আঁচ করতে পারেন) পরিচালক সচেতনভাবেই ঘটিয়েছেন, দেখাতে চেয়েছেন এই দুষ্ট সমাজে সব সংগ্রামের পরিণতিই এক এবং সুন্দর শান্তির জীবনের ধ্বংস অমোঘ ও অনিবার্য। এই সব মিলে এবং ঋত্বিকবাবুর ন্যারেটিভ ভঙ্গির মধ্যে অভিনয় ও ঘটনাসংস্থানে অভিনব নাটকীয়তা আমদানী করে, কয়েকটি স্টাইলাইজড শট ও সংগীতের সাবজেকটিভ ব্যবহারে (ঈশ্বরের উচ্চাশার সূচক ফউন্ড্রীর ঝকঝক শব্দ। শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনিতে একই সঙ্গে নস্টালজিয়া ও নতুন জীবনের ব্যাঞ্জনা লভ্য)। এক নতুন ফর্মের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ফর্ম চলচ্চিত্রশিল্পের ব্যাকরণসম্মত কিনা জানি না, তবে খোলা মন নিয়ে ভাবা যেতে পারে যে শিল্পরসবোধে ঈপ্সিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারলে (এবং আমার মনে হয় 'সুবর্ণরেখা' তা পেরেছে) এ-জাতীয় সৃষ্টিকে টেকনিকাল কারণে নস্যাৎ করা উচিত হবে কিনা।

জীবনের প্রতি অসীম মমত্ববোধ ও ভালোবাসার পরিচয় ছবিটির আগাগোড়া পরিব্যাপ্ত। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় যেমন পার্বতী, 'কোমল গান্ধার'-এ যেমন শকুন্তলা তেমনি 'সুবর্ণরেখা'য় চিরদুখিনী সীতার পৌরাণিক ইমেজ সার্থক ও সুন্দর। আন্দোলিত ধানের শীষের সঙ্গে বসুমতীকন্যা সীতাকে একাত্ম করে দেওয়া, কুয়োতলার দৃশ্যে মুহূর্তমধ্যে এক সরল সাঁওতালী মেয়ের ইমেজ নিয়ে আসা অথবা বহু অগ্নিপরীক্ষার পরও সীতার মুখমণ্ডলের অন্তিম প্রশান্তি ও দীপ্তি অবিস্মরণীয়। এই জীবনপ্রেমী শিল্পী সভ্যতার ধ্বংসস্তূপে সীতা ও অভিরামের প্রাণোন্মাদনা অনুভব করেছেন, কঠিন শিলার মাঝে জীবনের প্রতীক সীতাকে আবিষ্কার করেছেন, শালবনে পৃথিবীর সমস্ত যন্ত্রণার ঊর্ধ্বের এক প্রেমের উত্তাপ পেয়েছেন। তাই 'সুবর্ণরেখা'র উপসংহার আমার কখনোই আরোপিত মনে হয় নি। ঋত্বিকবাবু জীবনকে এত গভীরভাবে ভালোবাসেন বলেই আজকের ক্ষয়িত বিধ্বস্ত জীবনের উপর তাঁর ক্ষোভ ও আক্রমণ প্রচণ্ড। বিভিন্ন ঘটনায়, ইমেজে, প্রতীকের ব্যবহারে তিনি জীবনের এই কদর্য দিকটা ফুটিয়ে তুলেছেন। ছবির আরম্ভে নিজেদের মধ্যে মারামারি ও বিভেদ থেকে শুরু করে একক

স্বার্থে দলত্যাগ, পুরনো ম্যানেজারের পাগল হয়ে যাওয়ার ও ম্যানেজার-পদে নিজের নিয়োগের সংবাদ গ্রহণ, বোনকে চড় মারা, সামাজিক প্রতিষ্ঠার খাতিরে অভিরামের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, মানুষের অগ্রগতির উপর অনাস্থা ও বিশ্বাসহীনতা ও ঈশ্বরের দীর্ঘকালের অধস্তন কর্মচারী মুখুজ্জের লেখা চিঠি পর্যন্ত এমনি নিদর্শনের অন্ত নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত ও অধুনা পরিত্যক্ত এয়ার-স্ট্রিপ, তৎসংলগ্ন ধ্বংসস্তূপ, একটি প্রাগৈতিহাসিক ভয়ংকর প্রাণীসদৃশ জঙ্গি বিমানের ভগ্নাবশেষ এবং ক্ষীণকায় সুবর্ণরেখাকে যুদ্ধোত্তর সভ্যতার এক বিকৃত রূপ বলে ধরে নিতে পারি। এই ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে সীতা 'ভোর ভয়ি' গান গাইছে আবার এরই সঙ্গে দেখি ভেঙে-পড়া ঈশ্বর ও হরপ্রসাদ একাকার হয়ে যায় আমাদের 'দলচে ভিতা' দেখাতে গিয়ে রামবিলাসের বাড়িতে গুরুজীর আসর, সিরামিক-কলায় উৎসাহী রামবিলাস-পত্নীর 'সুইট্জারল্যাণ্ড' গমনের খবর এবং সবশেষে একটি বারের দৃশ্য ফেলিনির তুল্য কর্ম। মৈত্রেয়ীর অমৃত-কামনা ও নচিকেতার ব্রহ্মজ্ঞানলাভের বিপরীতে এক কুৎসিত ভোগাসক্ত জীবন এখানে দেখানো হয়েছে। ঈশ্বরকে ক্লোজ-আপে এখানে মনুষ্যেতর প্রাণী বলে প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বরের প্রায়ান্ধ চোখে কোলকাতার রাস্তার চোখ-ধাঁধানো আলোর প্রতিফলন তাকে আরো অন্ধ করে। তার পাপ তার নিষ্পাপ বোনের জীবনে অনিবার্য সর্বনাশ ডেকে আনে।

ছবিটির একটি অসার্থক ও একটি অবান্তর অংশের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। জমিদারের লাঠিয়ালদের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংগ্রামের তীব্রতা কখনোই দর্শক হিসেবে অনুভূত হয় নি। খবরের কাগজের আফসের দৃশ্যগুলি নিতান্তই অবান্তর ও অসংলগ্ন মনে হয়েছে। পরিচালকের পাশাপাশি নাম উল্লেখ করতে হয় আলোক-চিত্রশিল্পী দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক যোশীর যাঁরা 'সুবর্ণরেখা'র প্রতিটি ইঞ্চি চলচ্চিত্রের ভাষায় রচনা করার জন্যে অসাধারণ যত্ন নিয়েছেন।

বিভাস চক্রবর্তী

সুবর্ণরেখা। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—ঋত্বিক ঘটক। মূল কাহিনী—রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা। চিত্রগ্রহণ—দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। শিল্পনির্দেশনা—রবি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা—রমেশ যোশী। পরিচয়লিপি লিখন ও প্রচার পরিকল্পনা—খালেদ চৌধুরী। সঙ্গীত—ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খাঁ। অভিনয়ে—অভি ভট্টাচার্য, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, জহর রায়, সীতা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল, অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ।

অতিথি

"অতিথি" ছবির অধিকাংশ আলোচনাতেই প্রশংসার উচ্ছ্বাসের মধ্যে এদেশী চলচ্চিত্র-সমালোচনার যে-চেহারাটা বেরিয়ে আসে, সেটা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। অনেকেরই এ ছবি ভালো লেগেছে, সেটা এমন কিছু দোষের কথা নয়। প্রশ্ন ওঠে সেই ভালো লাগার প্রকাশ বা গুণবিচারের মাপকাঠি নিয়েই। দুটো কথা এ ছবি সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা হয়েছে। এক নম্বর, ছবিতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত অনুসরণ, আর দু নম্বর, ছবির দৃশ্যসৌন্দর্য। কেউ কেউ আবার আর একধাপ এগিয়ে ছবির গতি সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনায় যেতেছেন। সমস্ত আলোচনার প্রকৃতি বিচার করলে দুঃখের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে দেশে চলচ্চিত্র-আন্দোলন বেশ কিছুটা পুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বেশির ভাগ চলচ্চিত্র-সমালোচকই এখন পর্যন্ত চলচ্চিত্রের স্বধর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নন। বোঝা গেল না হয় যে "অতিথি" ছবিতে পরিচালক রবীন্দ্রনাথের মূল গল্পের রস সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন। তাতে হয়েছেটা কি? তার ফলে কিংবা একমাত্র তার ফলেই কি চলচ্চিত্র হিসেবে "অতিথি" একটা রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি হয়েছে? এই যুক্তির সারবত্তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি নে। রবীন্দ্রনাথের গল্প পড়ে আমার যে রসানুভূতির উদয় হয় সেই রসাস্বাদের জন্য আমি নতুন করে আবার ছবি দেখতে যাব কেন? দর্শক নিশ্চয়ই এমন কোনো দাবি করবে যে-চাহিদা গল্প পড়ে তার মেটে নি এবং চলচ্চিত্র-পরিচালক যদি সত্যিকারের শিল্পী হন, তবে তিনিও নিশ্চয়ই তাঁর মাধ্যমের সাহায্যে এমন কোন অনুভূতি দর্শকদের মধ্যে সঞ্চার করবেন যা সাহিত্যপাঠ-নিরপেক্ষ। সাহিত্যের বিষয়বস্তু তাঁর উপাদান হতে পারে শুধু আর বেশি কিছু নয়। গল্প বা উপন্যাসের চিত্ররূপে যথার্থ সৃষ্টিশীল চলচ্চিত্র পরিচালকের কাছে আমরা চাইব নতুন রস, নতুন ব্যাখ্যা (যদি তার ফলে মূল রচনার থেকে চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনা সংস্থান এবং সাহিত্যিক বক্তব্যের ক্ষেত্রে ভয়ংকর বিচ্যুতি ঘটে, তাতেও আপত্তি করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই), শুধুমাত্র বিশ্বস্ত অনুবাদ নয়। তাই গল্প বা উপন্যাসের সত্যিকারের সৃষ্টিশীল চলচ্চিত্রায়ণে কাহিনীর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এ প্রসঙ্গে শেক্সপীয়রের কাহিনী নিয়ে ছবি করবার কথা সংগত কারণেই আসতে পারে। এখানেও চিত্রানুবাদ এবং মৌলিক চলচ্চিত্র সৃষ্টির তফাতটা খুব সহজেই

চোখে পড়ে। অলিভিয়ের কিংবা কোজিনিৎসেবের শেক্সপীয়র-চিত্র নিঃসন্দেহে নিপুণ অনুবাদ এবং সে বিচারে উপভোগ্যও বটে (যদিও প্রকরণভেদে প্রকৃতি ভেদ এগুলিতেও বর্তমান), কিন্তু শেক্সপীয়রের নাটক পড়ে আমার যে অনুভূতি হয়, এ ছবিগুলিতে কিন্তু তার থেকে আলাদা কোনো ভাব আমার চোখে পড়ে না। কিন্তু শেক্সপীয়র-আখ্যান নিয়ে যখন কুরুসোয়ার তৈরি ছবি দেখি, তখন সেটা আমার কাছে একটা মৌলিক চলচ্চিত্র-সৃষ্টি বলে মনে হয়। কুরুসোয়া শেক্সপীয়র-কাঠামো একেবারেই অনুসরণ করেন নি, শুধুমাত্র কাহিনীসূত্রটিকে চলচ্চিত্রের ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন এবং নিজস্ব ব্যাখ্যাও দিয়েছেন (এ কাজে ওয়েলস এবং ক্যাস্টেলানিও বেশ কিছুটা অগ্রসর যদিও তাঁরা কুরুসোয়ার মতো সার্থক নন), যেমন করে শেক্সপীয়র নিজে প্রচলিত কাহিনী নিয়ে নিজের নাটক তৈরি করেছিলেন। সেইজন্যই কুরুসোয়ার "থ্রোন অফ ব্লাড" শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ থেকে আলাদা হয়েও তার সমকক্ষ শিল্পসৃষ্টি বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের দেশেও অপু-চিত্রাবলী এবং "চারুলতা" পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সত্যজিৎ রায় মূল কাহিনীর আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি এবং ভিন্ন মাধ্যমে কাহিনীগুলিতে নতুন ব্যাখ্যা অবতারিত করে দর্শককে রসানুভূতির এমন স্তরে নিয়ে গেছেন, যা শুধুমাত্র বিভূতিভূষণ বা রবীন্দ্রনাথ পড়লে সম্ভব ছিল না। অবশ্য আমাদের দেশে মুশকিলটা আরো বেশি। মৌলিক চলচ্চিত্রকার তো দূরের কথা, সক্ষম চিত্রানুবাদকও ধারে কাছে খুব বেশি নেই। কাজেই এখানে সাহিত্যের চিত্ররূপে মৌলিক কিছু আশা করাও অন্যায়। তাই "অতিথি"তে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পেলেও কিছুটা সন্তুষ্ট থাকা যেত, কারণ তপন সিংহকে সেখানে দেখা যাবে না এত স্থিরনিশ্চয়। এদিক দিয়েও অবশ্য এ-ছবি আমাকে নিরাশ করেছে। তারাপদ নামে সেই "আসক্তিবিহীন ব্রাহ্মণবালক", উন্মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে যার হৃদয়ের মেলবন্ধন ঘটেছে, তার কোনো চেহারাই পরিচালক ধরতে পারেন নি। যদিও খোলা মাঠের মধ্যে তারাপদকে দিয়ে প্রচুর চলাফেরা, দৌড়ঝাঁপ করানো হয়েছে (হয়তো এই ঘোড়দৌড়ের মধ্যেই অনেক সমালোচক বের্গস-কথিত গতির আভাস লক্ষ করেছেন), কিন্তু কখনই পটভূমিকা আর চরিত্রের একাত্মতাবোধ সম্ভব হয় নি এবং সেইজন্যই তারাপদ ওয়াণ্ডারলাস্ট দর্শকের চোখে ধোঁয়াটেই রয়ে গেছে। তারাপদর চরিত্রচিত্রণও অসম্পূর্ণ। তাকে দেখে কখনই মনে হয় না যে মুক্ত প্রকৃতির

ডাকে সাড়া দিতে সে সবসময়েই আগ্রহী। বরং কিছুটা খেয়ালী বেশ খানিকটা ক্ষ্যাপাটে গোছের ভাবই তার চরিত্রে লভ্য।

আর কারণে-অকারণে বিকশিত দন্তপংক্তি ছাড়া সারল্য বা নিষ্পাপ চিত্তের কোনো পরিচয়ই লভ্য নয়। অপু যেমন চেতনার প্রথম মুহূর্ত থেকেই বিশ্বপ্রকৃতির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে তার রস গ্রহণের চেষ্টা করে, তারাপদর মানসিকতায় সেই রোমান্টিক বিস্ময়বোধ একেবারেই অনুপস্থিত। সে যে ঘরে থাকতে চায় না, বাইরের পৃথিবীর প্রতি তার সেই অজ্ঞাত আকর্ষণ একমাত্র গ্রামের লোকদের কিছু সংলাপের মধ্যে দিয়ে অনুভূত হয়। তাছাড়া তার আর কোনো প্রমাণ ছবিতে পাই না। তাই গ্রামে নতুন কোনো আগন্তুক এলেই তারপদর তার সঙ্গ নেওয়া এবং নেপথ্যে একটি বিশেষ গানের সুর বাজলেই পথে বেরিয়ে পড়া আমার কাছে একেবারে অবান্তর মনে হয়। শুধু তারাপদই নয়, কোনো চরিত্রই ছবির মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে না। মনে হয় যেন অয়েল-পেন্টিং কিংবা ছবির অ্যালবাম থেকে চরিত্রগুলি নেমে এসেছে, জীবনের আভাসমাত্র তাদের মধ্যে নেই। সেইজন্যই ছবির কাহিনীর মধ্যে তাদের সুখ-দুঃখ, আবেগ-অনুভূতির অংশভাক হওয়া রসিক দর্শকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কাহিনীর চরিত্রগুলিরই যখন কোনো আদল ছবিতে ধরা পড়ে না, তখন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের পসরা সাজিয়ে চলচ্চিত্রগুণ আমদানীর প্রচেষ্টা হাস্যকর বলেই মনে হয়। এবং এখানেই আমার আলোচ্য এই ছবির দ্বিতীয় দোষ (সমালোচকের মতে যা এর অন্যতম প্রধান গুণ), অনাবশ্যক সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াস। এখন কথা হচ্ছে এই যে সুন্দর জায়গায় গিয়ে ক্যামেরা চালালে তো নয়নলোভন ছবি উঠবেই, এতে আর সিনেমা-পরিচালকের বিশেষ কৃতিত্বটা কি? আসলে ক্যামেরার কাজ তো সুন্দর দৃশ্যরচনা করাই নয়, চিত্রভাষার মাধ্যমে ঘটনা ও চরিত্রের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বিস্তার। সে জায়গায় "অতিথি"র চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ। যখনই প্রাকৃতিক দৃশ্য ছেড়ে ক্যামেরা ঘরের মধ্যে এসেছে এবং নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে (তারাপদ-চারুর কলহ ও অভিমানের দৃশ্যটি একেবারেই সাধারণ বাংলা ছবির বিশ্বজিৎ-সন্ধ্যা রায় মার্কা ছবির ছাঁচে ঢালা), তখনই চিত্রগ্রহণের শোচনীয় দৈন্য প্রকট হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, সিনেমার প্রাকৃতিক দৃশ্য তো আর ক্যালেণ্ডারের ছবি নয়, যে সুন্দর দেখতে পেলেই কাজ ফুরিয়ে গেল। পটভূমিকার সঙ্গে

যদি ছবির চরিত্রগুলিকে মেলানো না যায়, তাহলে আলাদা সুন্দর দৃশ্যের কোনো দামই নেই। পিক্টোরিয়ালিজমের এই সর্বনাশা মোহই চলচ্চিত্র হিসেবে "অতিথি"র ব্যর্থতার একটা বড় কারণ। তাছাড়া অপটু অভিনয়, দুর্বল সম্পাদনা, সংগীত ও সংলাপের অপরিণত প্রয়োগও ছবির রসগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আসলে পরিচালক মূল কাহিনীর গলদগুলিকেই এড়াতে পারেন নি। সেখানেও চরিত্রের অস্পষ্টতা ও কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতির অভাব বর্তমান বলে আমার মনে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ লেখনী ভাষা ও কাব্যমহিমায় গল্পের ফাঁক ভরাট করেছে এবং পাঠকমনে এক ধরনের অনুভবসঞ্চারে সক্ষম হয়েছে। মৌলিক চলচ্চিত্রকার কাহিনীর এই সাহিত্যিক ত্রুটি সযত্নে পরিহার করে নিজস্ব মাধ্যমে একটা স্বাধীন সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু নির্মম সত্য এই যে তপন সিংহ তো আর সিনেমা-শিল্পী নন, তিনি সস্তা পিকচার-পোস্টকার্ডের কারিগরমাত্র।

মৃগাঙ্কশেখর রায়

অতিথি। প্রযোজনা—নিউ থিয়েটার্স (একজিবিটার্স) প্রাইভেট লিমিটেড। রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও সংগীত—তপন সিংহ; আলোকচিত্রশিল্পী—বিমলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়; সম্পাদনা—সুবোধ রায়; শিল্পনির্দেশনা—সুনীতি মিত্র; ভূমিকা—পার্থ মুখোপাধ্যায়, বাসবী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মিতা সিংহ, সলিল দত্ত, বঙ্কিম ঘোষ।

আধুনিক চেক চলচ্চিত্রে নতুন ধারা ও 'ভ্র ক্রাই'

যুদ্ধোত্তর সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র মূলত সাবজেক্টিভ ইমেজ নির্ভর, একথা ক্রমশ প্রায়-প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হতে চলেছে। কয়েক বছরের মধ্যে মাধ্যমের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত আন্দোলনের প্রয়াসগুলির মধ্যে এ-ধারণা সুস্পষ্ট। ক্যামেরার চোখ এখন সম্পূর্ণ জীবন সম্পৃক্ত। শুধু বহিরঙ্গ নয়, জীবনের অন্তরঙ্গতা এখন চলচ্চিত্রানুসন্ধানের ধ্যানমানস। এর আরেকটি দিকও আছে। তার ফলে স্রষ্টার মানসিক দৃষ্টি এখন শুধু লেন্সের এক নির্দিষ্ট বৃত্তের পরিধিতে ও গবাক্ষ লণ্ঠনের আলোয় মানবপরিবারকে দর্শন করে তৃপ্ত নয়। বরং উল্টোপথে, ক্যামেরা এখন সংস্থাপিত শিল্প-প্রবক্তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণে।

মনের চলিষ্ণু প্রবাহের উঁচু-নিচু খাতে তার ওঠা-নামা কখনও প্রশান্তিতে স্থির, কখনও বা অশান্ত চঞ্চল। এর তাগিদে আবশ্যিক কারণেই আঙ্গিকগত পরিবর্তন এসেছে। ফ্রীজ, স্টিল-এর প্রয়োগ, স্টপ-অ্যাকশন বা জাম্প-কাট্ প্রভৃতি রীতিগত পর্যায়ের প্রয়োগফলে অনিবার্যভাবে চলচ্চিত্রের ইমেজ ক্রমশ ব্যক্তিক ভাবনার প্রকাশবাহী হয়ে পড়েছে। হয়তো যার আপেক্ষিক ঘনত্বের ফলে কখনও বা তাকে নৈর্ব্যক্তিকও বলা চলে। কিন্তু, ইদানীং কালের চলচ্চিত্রে উল্লেখযোগ্য লক্ষণীয় হিসেবে দেখা যায় যে প্রায় সমভাবের চিত্রকল্পের বুনোনি, 'স্কুল'-এর ভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন মানস-দর্শনেরও বাহন হতে পারছে। যে ইমেজগুলি রচনার পশ্চাতে ফরাসী নুভেল ভাগের (বা কখনও আমেরিকার নিউ সিনেমার, যেমন মেইজের 'কোয়ায়েট ওয়ান') 'আউটসাইডার্স ফিলজফি' সক্রিয়, তা প্রবক্তার হাতবদলের সঙ্গে চিরন্তন দর্শনের সঙ্গেও ঠাঁইবদলে তেমনই স্বতঃস্ফূর্ত। একদা বেয়ারিমানকে ফরাসী ও আমেরিকার নবতরঙ্গ প্রসঙ্গে এক তুলনামূলক প্রশ্ন করা হয় যার উত্তরে তিনি আলোচ্য আঙ্গিকের ক্রম-স্বতঃস্ফূর্তির কথা উল্লেখ করেন (তিনি আরও জানিয়েছিলেন এর সাবলীলতার প্রতি তার ঈর্ষা আছে)। চেকোস্লোভাকিয়ার নব আন্দোলন তদাপেক্ষা নবতম। আর তার কেন্দ্রমূলে বিশেষ একটি দর্শনের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। তবুও তার সৃজনধারায় নির্ঝরিণীর প্রবাহবেগের পরিচয় মেলে। য়ারোমিল ইরেজের 'দ্য ক্রাই' যার একটি উত্তম নিদর্শন।

চেক-চলচ্চিত্রের বিশ্বব্যাপী ঐতিহ্য তার পাপেট-চিত্র বা অ্যানিমেশন রচনায়। ত্রঙ্কা বা Zeman-এর কিছু সৃষ্টির সঙ্গে আমরাও অপরিচিত নই। কিন্তু, যুদ্ধোত্তর চেক কাহিনী-চিত্রের নৈরাজ্য সম্পর্কেও আমরা সম্যক অবহিত। একমাত্র ভাভ্রার মুষ্টিমেয় চিত্র বাদ দিলে সেখানে দর্শনীয় বিশেষ কিছু দুনিরীক্ষ্য। এমনকি উইসের ছবিও আমাদের প্রার্থিত প্রত্যাশার গভীরে নিয়ে যেতে পারে না। বিশেষ করে সমাঞ্চলিক পোলিশ সৃষ্টির পাশাপাশি সেগুলি যেন অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হতে থাকে। অনুর্বরতার এই বন্ধ্যাত্বের দ্বারা বর্তমান চেক-চিত্রের নব উৎসের পরোক্ষ কারণ রচিত। কারিগরী উন্নতি বা বিভিন্নতার সঙ্গে তারা বিষয়কেও বিচিত্রতার নানা অংশে (যার প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল) ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। নিপীড়িত ইহুদী কিশোরী এবং আশ্রয়দাতা চেক-যুবকের প্রেমোপাখ্যানজনিত মর্বিডিটি থেকে

মুক্ত আজকের চেকোস্লোভাকিয়ার চলচ্চিত্র আধুনিক জীবনের আলো-আঁধারির আবর্তে নিমগ্ন। মার্কিন 'ওয়েস্টার্ন'-এর প্রতি ব্যাঙ্গচ্ছোরিত 'লেমনেড জো'-তে যার খণ্ডিত আভাস এবং ইয়েজের 'ক্রাই' ছবিতে যার অখণ্ড প্রতিবেদন।

অন্তঃদর্শনের সার্বিক মেজাজে ইয়েজ বিরচিত আলোচ্য চিত্র সৌরসন্তান মানুষই পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামে রত এই কথা যেন আজকের নগর-জীবনের পটভূমিতে বলেছে। ইয়েজ, অধিকন্তু, গভীরতর মানবিক প্রত্যয়ের মধ্যে ডুব দিয়েছেন। নারী-পুরুষের চিরন্তন সম্পর্কের মন্ত্রোচ্চারণও ধ্বনিত হয়েছে বারংবার। এখানে এক মানবসন্তানের জন্মলগ্নে তার পিতা-মাতার স্মৃতচারণাগুলি যেন এলোমেলো বৃষ্টির মতো ঝরেছে (চিত্রনাট্যের চলতি gradation ঐচ্ছিক নিয়মে অবহেলিত)। কিন্তু সে যেন বিশেষ এক ধারায় মিলিত অবশেষে। বারে-বারে সেখানে মানুষের সর্বকালীন চেতনার রাজ্যে উপস্থিত হয়েছে অস্তিত্ববাদের আর্তি। ভালোবাসার আকুল প্রয়াস। পৃথিবীর মৃত্তিকা প্রথম স্পর্শের ক্রান্ত মুহূর্তে নবজাতকের অনাবৃত ক্রন্দনে তার আনন্দ-যন্ত্রণার আকুতিই ধ্বনিত। তার প্রথম ক্রন্দন তার প্রথম আর্তি। জীবন-সংগ্রামে আরও এক পদক্ষেপের যোজনা। এমনি করে সভ্যতার প্রেক্ষাপটে প্রবাহ এগিয়ে যায়। স্লাভেক আর ইভাঙ্কা সেই চলোর্মিতে ক্ষণিক মুহূর্তে বদ্ধ দুটি স্থির চিত্র। অনন্তরেই যারা সেই শোভাযাত্রায় বিলীন হবে (সমাপ্তির 'ফ্রীজ', এর ঠিক বিপরীত মুখে রচিত : চলমান জনস্রোতের সঙ্গে স্লাভেককে গতিস্তব্ধ করে যেন জনতার অংশে পরিণত করা হয়েছে। তাই, চূড়ান্ত আবেদনে আলোচ্য বক্তব্যই শ্রুত)।

ইয়েজ জীবনের ঘনিষ্ঠ শিল্পী। জীবন সম্পর্কে তার এক বিশেষ ধরনের 'রেভারেন্সে'র স্বাদ পাওয়া যায়। যে জীবন মৃত্যুহীন। নবজন্মের চক্রে চির আবর্তিত। উজ্জ্বল শুভ্র আকাশকে পিছনে রেখে সাবজেকটিভ ক্যামেরা দিয়ে ফলন্ত স্ট্রবেরীজের শাখাগুলিকে যখন ট্র্যাক-ব্যাক করা হয়েছে (সম্পূর্ণ অন্যভাবনা প্রকাশে রেনে যেমন তার হিরোশিমায় ক্যাক্টাস ব্যবহার করেছিলেন) তখন অন্তরীক্ষে বাকের সুরসৃষ্টি রণিত হয়। শিশুর জন্মের পূর্বমুহূর্তে সেই সুরই আগমনী হয়ে বেজেছে। অন্তর্বাঞ্জনায় যেন 'শিশুতীর্থ' কবিতার শেষ-লাইনের মতো প্রতিধ্বনি শোনা যায়—'জয় হোক মানুষের, ঐ নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের।'

'ক্রাই'তে অতীত চারণের ক্ষণগুলিতে স্নাভেক ও ইভাঙ্কার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ দৃশ্যাবলী থেকে শুরু করে বহির্জগতে পথ-ঘাট, পার্ক-উদ্যান, অফিস-স্কুল-হাসপাতাল প্রভৃতি প্রসঙ্গে ক্যাণ্ডিড ক্যামেরার সৃষ্টি এক গীতিকাব্যিক লাবণ্যে মণ্ডিত। কখনও এই চিরচেনা ইমেজগুলিকে সাজিয়ে সাজিয়ে প্রবক্তার আপন অবচেতনের গভীরে সৃষ্ট ভাবকল্পনার উৎসরণ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে চিত্রকল্প যেন সৃজনধর্মী স্বগতোক্তিতে পরিণত। য়ুরোপীয় আধুনিক চলচ্চিত্রে স্বাভাবিক নিয়মে এই ছবিতেও যৌনতা বা যৌনবোধ আছে। ক্যামেরা এখানে মানবদেহের রৈখিক পথ থেকে দ্রুত নানা ভাস্কর্যের রেখায় উত্তরণ করেছে বা ফিরে এসেছে। এবং ইমেজের পূর্ণ বা কখনও আংশিক যোগ্য সংস্থাপনে সামগ্রিকতায় আধুনিক ভাস্কর্যের অ্যাবস্ট্রাকশন আনবার প্রয়াস দেখা যায়। আলোচ্য বিষয়ে ক্যামেরার গতিশীলতা প্রায় তুলি চালানোর মতো সাবলীল। নিরঙ্কুশভাবে তাকে 'জার্ক' শূন্য করে যেন এই কথা প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে যে মাধ্যমের যান্ত্রিকতা এখানে অনুপস্থিত। প্রসঙ্গত, 'অন্য' ইমেজের দ্বারা অপর ভাব প্রকাশের কথাও উল্লেখ্য। মিলন দৃশ্যাবলীতে নেপথ্যে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক সংলাপের খণ্ডিতাংশ যোজনা করে ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলি 'স্টিল' দেখানো হয়েছে। যা প্রায় সবই বার্ধক্য ও জরার প্রতিচ্ছবি। কখনও কিছু হিসেবী বা সাবধানী মানুষের চেহারা। যাদের দেখলে মনে হয় সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি আছে। কিংবা, নার্শারি স্কুলে টেলিভিশন মেরামতির প্রসঙ্গ। সেখানে শিশুদের মনের নিষিদ্ধ-গোপন ভাবনা শুনতে শুনতে স্নাভেক যেন আপন শৈশবে ফিরে গেছে। ইরেজ তখন তার মুখের আত্মবিস্মৃত হাসিকে 'ফ্রীজ' করে দিয়েছেন এবং অনুরূপভাবে পরপর দেখানো হয়েছে নানা শিশুমুখের বা তাদের কল্পিত অবস্থার স্থির ছবি। তারা সবাই চেকোস্লোভাকিয়ার নয়। নেপথ্যে অভিজ্ঞতাগুলি আবৃত হয়ে চলেছে। আধুনিক জীবনের অকাল বিশুষ্ক শৈশবের রূপ সকল দেশেই এক।

'ফ্রীজ'-এর অন্যান্য চতুর প্রয়োগগুলি বুদ্ধিগ্রাহ্য। বিশেষভাবে পারিবারিক ফটো-অ্যালবামের পাতায় ইভাঙ্কার কিশোরকালের এক জন্মদিন প্রসঙ্গে। ফ্রেম রচনায় কখনও কখনও আন্তোনিওনির প্রভাব সুস্পষ্ট। বিশেষভাবে ইন্-ডোর শটে। সিঁড়ির ব্যবহার বা হাসপাতালে এক দৃষ্টিকোণ থেকে টেলিফোনকে দেখানো জানালার কাঁচে ইভাঙ্কার ছবি আঁকা প্রভৃতিতে তার

সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকতে পারে। কিন্তু, বিরাট দেওয়ালে একটি মাত্র তৈলচিত্র রেখে এবং পাদদেশে কালো শয্যার স্বল্পতম রেখার সঙ্গে কালো পোশাক-পরা ইভাঙ্কার নিঃসঙ্গতা প্রায় সম্পূর্ণ আন্তোনিওনীয় ঢঙে রচনা করা হয়েছে। নগর-জীবনে যেমন কখনও আধুনিক বাড়িগুলির পারস্পেকটিভ-এ নগরবাসীরা দৃশ্যমান।

ইরেজ তার আপন দেশীয় বর্তমান মানুষের অতি স্বাভাবিক চিন্তা বা কথাবার্তা (এখানে সংলাপ চলিতার্থে নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিকারী নয় ও সেই কারণে প্রয়োজনীয়) ইত্যাদির খুঁটিনাটি নৈকট্যে সেলুলয়েড-বন্দী করতে পেরেছেন। সেখানে ডকুমেন্টারির আভাস থাকলেও তা শিল্পগ্রাহ্য বা মানবিকতা স্পৃষ্ট। তার ফলে পরিচালকের আধুনিক সমাজ চেতনা 'ক্রাই' ছবিতে চিহ্নিত। আজকের চেকোস্লোভাকিয়ার সমাজ-চিত্রে যৌনবাদিতা এবং রাজনীতিবোধ সম্পর্কে তিনি অকপট। ছবিতে তার উপস্থাপনা (যেমন এক চলচ্চিত্র-সমালোচকের ইতালীয় ফিল্ম্ আলোচনা বা শিল্পী-বন্ধুর স্টুডিও থেকে খাটে করে ন্যুড-স্টাডি বহন করা প্রসঙ্গ প্রভৃতি) নানাভাবে এসেছে। কিন্তু তার প্রয়োগ অসুস্থ লক্ষণযুক্ত নয়। আর মানবিক গণ্ডীর মধ্যেই। আধুনিক মানুষের জীবন-দলিল রচনার ব্যাপারে নতুন এই চেক চলচ্চিত্রকারদের কাপট্যহীনতা শিল্পের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততারই প্রমাণ।

দ্য ক্রাই পরিচালনা—য়ারোমিল ইরেজ; চিত্রনাট্য—য়ারোমিল ইরেজ ও লুডভিক আসেনাক; অভিনয়—ইয়োসিফ আব্রাহম্, ইভা লিমালোভা।

চেকোস্লোভাক পিপল্স্ রিপাবলিকের দূতাবাসের সহযোগিতায় সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা কর্তৃক প্রদর্শিত।

বাংলায় আর্থার মিলার : চতুর্মুখ-এর 'অনেকের মৃত্যু'

বছরকয়েক আগে নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে নাট্যকার-পরিচালক এল্‌মার রাইস্‌ তাঁর ছাত্রদের কোনো এক কাল্পনিক রেপার্টরি থিয়েটারের জন্যে নাটক নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ; এই সমীক্ষায় ছাত্রদের নির্দেশ দেওয়া ছিল, লাভক্ষতির হিসেবে তাঁদের না গেলেও চলবে। একান্নজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জন—মোট চব্বিশজন—আর্থার মিলারের 'ডেথ অফ এ সেলসম্যান' মঞ্চস্থ করতে চেয়েছিলেন [অপ্রাসঙ্গিক হলেও সম্পূর্ণ সমীক্ষার ফলাফলটা তুলে ধরবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না— 'ইডিপাস রেকস'-এর কথা তুলেছিলেন ১৭ জন, 'হ্যামলেট' ১৬ জন, 'দ গ্লাস মেন্যাজেরি' ১৫ জন, 'লং ডেজ জার্নি ইনটু নাইট' ১৪ জন, 'দ চেরি আর্চার্ড' ১১ জন, 'ডিজায়ার আণ্ডার দি এলমস' ১০ জন, 'আওয়ার টাউন' ৯ জন, 'ওথেলো', 'মেজর বার্বারা', 'স্ট্রীট সীন', 'দি ইম্পর্টানস অফ বীইং আর্নেস্ট' ও 'মোর্নিং বিকামস ইলেকট্রা' ৮ জন। যে-কোনো দেশে শিক্ষিত তরুণ নাট্যকর্মীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিকল্পনায় যে-সব নাটকের চিন্তা স্বতঃজাগ্রত, তারই পরিচায়ক এই সমীক্ষা], উক্ত নাটকের প্রথম প্রযোজনার দশ বছর পরেও। সেই নাটক বাংলাদেশের নবনাট্য আন্দোলনে এসে পৌছল দেখে আনন্দ হয়। আশা হয়, 'দ ক্রুসিবল' কিংবা 'অল মাই সানস'-ও হয়তো এবার এসে পৌছবে, হয়তো মিলারের পরিণততম নাট্যকীর্তি 'আফটার দ ফল'-ও।

সাধন মৈত্রের রূপান্তরে মিলারের নাটকের অনেক অংশই বাদ গেছে, নয়তো বদলে গেছে। মিলারের নাট্যচিন্তায় আসল তত্ত্বটা বোধহয় অনেকটা এইরকম : সমাজের বেষ্টনীর মধ্যে নৈঃসঙ্গ্য বা বিচ্ছিন্নতার যে নেতিবাচক অভাববোধ ব্যক্তিসত্তাকে পীড়া দেয়, তার পেছনে এক ইতিবাচক আকাঙ্খা— পরিবার ও শৈশবের অন্তরঙ্গ সম্পর্কবন্ধনের মোহ—বর্তমান। পরিবারকে পেছনে ফেলে সমাজকে আশ্রয় করার সাধনা, ও সেই সাধনার ব্যর্থতায় পরিবারবন্ধনের জগতে ফিরে যাবার চেষ্টায় হার মেনে ফিরে আসা—এই নিয়েই বোধহয় 'ডেথ অফ এ সেলসম্যান'-এর কল্পনা। এই বাস্তববাদী

জীবনচিন্তার সঙ্গে থিয়েটারের প্রতীকতাকে যুক্ত করার সচেতন প্রয়াস মিলারের মনে ছিল। প্রকাশবাদের পরিমিত প্রয়োগে মিলার এই রীতির "আশ্চর্য শর্টহ্যাণ্ডকে মানবিক, 'অনুভূত' চরিত্রায়নের স্বার্থে ব্যবহার" করেছিলেন, অর্থাৎ প্রকাশবাদী থিয়েটারের আন্তর ভাবনা থেকে বিচ্যুত করে এই নীতিকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। ফ্ল্যাশব্যাক নয়, "অতীত-বর্তমানের সচল সমসংঘটন,…কেননা, আপন জীবনের যৌক্তিকতার সন্ধানে ব্যর্থ উইলি লোমান এখন ও তখনের ব্যবধান মুছে দিয়েছে।…সাধারণ স্বীকৃত কর্মের পূর্বপ্রত্যাশিত ও অভীষ্ট কর্মফলের সঙ্গে সেই কর্মেরই অতর্কিত অপ্রত্যাশিত অথচ যুক্তিসিদ্ধ উত্তরফলের সংঘাতই এই নাটকের মূল সংঘাত এবং বোধহয় চূড়ান্ত আয়রনি।" মিলারের বিচারে, ট্র্যাজেডির সত্য ব্যক্তির আপন ব্যক্তিত্বের স্বরূপ তথা সমাজে-পরিবারে আপন স্থান আবিষ্কারের প্রয়াস। উইলি লোমানের আত্মহত্যায় আত্মাবিষ্কারের তাৎপর্য সমাজ-পরিবারের দৃষ্টিকোণের বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার আয়রনিতে বিধৃত হয়, মিলারের 'রিক্ওয়ায়েম্' অংশে। অথচ এই অংশটি শ্রীমৈত্রের ভাষ্যে বর্জিত। ট্র্যাজেডি রচনার চিন্তা মাথায় ছিল বলেই মিলার সুকৌশলে 'সেল্সম্যান'-এর বিক্রেয় পণ্যটি ইচ্ছে করেই অনুক্ত রেখে গেছেন, নায়ককে আর্কিটাইপাল চরিত্র দেবেন বলে, "লোকে যখন জিজ্ঞেস করে, উইলি কী বেচে, কী আছে তার থলিতে, আমি শুধু বলতে পারি, সে বেচে নিজেকে।" কিন্তু শ্রীমৈত্র শশধর সামন্তকে ওষুধের কারবারী বলে চিহ্নিত করে মূল নাটকের ব্যাপ্তিকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। ১৯২৮-এর লাল শেভরলে থেকে স্টুডিবেকারের পতন অমোঘ পতন নয়, বরং সামাজিক অর্থমর্যাদার সামান্য ব্যত্যয় অথচ সংযোগহীনতার গভীর মানসসংকটে নাট্যকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ। মিলার যে সযত্ন নিষ্ঠায় উইলি লোমানের আর্থিক মর্যাদার উত্থান-পতনের সূক্ষ্ম তারতম্য রচনা করেছেন, তার যথাযথতা মানসসংকটেও যথাযথতার ছাপ ফেলে। অথচ শশধর সামন্তের আর্থিক অবস্থার আভাসরচনায় অস্পষ্টতা, কিংবা দারিদ্র্যের উপরেই জোর দেওয়ার ফলে নাটক 'পেথস'-এর দিকে ঝুঁকেছে। বিফ ও হ্যাপি লোমানের খামারের স্বপ্ন আর বিবেকানন্দ-নবকুমারের সিনেমার স্বপ্নের মিল কোথায়, বুঝলাম না। নাগরিক সমাজের সমাজব্যবস্থায় খাপ খাওয়াতে না পেরে পলায়নপরতা ও সেই সমাজেই আরো ঠুনকো মহলে পৌছবার সাধ কি অভিন্ন ?

মূল নাটকের বিস্তার রূপান্তরে যেমন ব্যাহত হয়েছে, প্রযোজনাতেও তেমনিই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ১৯৪৮-এর ব্রডওয়ের প্রযোজনায় (এলিয়া কাজানের প্রয়োগপরিকল্পনায়) বাড়িটির কঙ্কালপ্রতিম মূর্তি একটি প্ল্যাটফর্মের উপর স্থাপন করা হয়েছিল; প্ল্যাটফর্মের সামনে ও পাশের অংশগুলি অবিশেষিত রেখে হোটেলের ঘর, রেস্তোরাঁ, পেছনের বাগান, বা শেষ অংশের গোরস্থানরূপে ব্যবহার করা হয়েছিল; একেবারে পেছনে ব্যাকড্রপে চারপাশের অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসের ভিড় লোমানদের ছোট্ট বাড়িটার উপর যেন প্রচণ্ড আক্রোশে ঝুঁকে পড়ে। জো মিয়েলজিনারের মঞ্চপরিকল্পনায় 'ছোট্ট মানুষের' অনিশ্চিত ভঙ্গুর অস্তিত্বের দ্যোতনা ছিল। বাড়ির অভ্যন্তর-পরিকল্পনায় ঘর ও আসবাবের রচনায় সামাজিক স্টেটাসের পরিচয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছিল। ১৯৪৯-এ লণ্ডনে ফীনিকস-এ পল মুনি অভিনীত প্রযোজনায় মঞ্চকেন্দ্রে একটি পুরনো রেফ্রিজেরেটর 'স্টেটাস সিম্বল'-এর কাজ করেছিল। লণ্ডনের প্রযোজনায় জো মিয়েলজিনারের মঞ্চস্থাপত্যে 'ডিটেলস'-এর বাহুল্য ও মৃদু আলো পেছনের ব্যাকড্রপের সঙ্গে মিলে উইলি লোমানের দম-আটকানো পরিবেশ রচনা করেছিল। চতুর্মুখের প্রযোজনায় বাড়িটি স্থাপত্য এমনি কোনো প্রতীকমূল্য লাভ করতে পারে নি। দ্বিতল স্ট্রাকচারের উপরের তলে কোনো দেয়ালের ইঙ্গিত না থাকায় পুত্রদ্বয়ের শয্যাকক্ষ বিসদৃশভাবে খোলা ছাদ হয়ে পড়েছে। শশধর সামন্ত চারিদিকে বাড়ির চাপে হাঁপিয়ে ওঠে, কিন্তু তার কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য থিয়েট্রিকাল ইঙ্গিত নেই।

১৯৫৬ সালে 'অ্যাটল্যাণ্টিক মানথলি' পত্রিকার এক প্রবন্ধে নাট্যকার মিলার এই নাটকের অভীষ্ট অভিনয়রীতির আভাস দিয়েছিলেন: "কেউ যখন তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে, তখন সে এক স্তরের ভাষা ব্যবহার করে, হয়তো খুব সরল এক ভাষা, উপলক্ষের অন্তরঙ্গতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক বিশেষ কণ্ঠস্বর, এক বিশেষ বাচনভঙ্গি। কিন্তু সেই লোকই যখন অপরিচিতদের ভিড়ে এসে দাঁড়ায়, রাজনীতিজ্ঞকে যেমন দাঁড়াতে হয়, তখন তার পক্ষে সাজানো কথা, এমনকি কবিতার মতো কথা, সূত্রবৎ কথা, বা রূপকালঙ্কারের দিকে হাত বাড়ানো সহজ ও স্বাভাবিক মনে হয়। তার দেহভঙ্গিমা, দাঁড়ানোর কায়দা, কণ্ঠস্বর, সবই জীবনের চেয়ে বড় হয়ে যায়; তার চরিত্র নয়, তার ভূমিকাই তাকে এই অভিনয়ের অধিকার দেয়।" অভিনয়ের এই নির্দেশ শশধর সামন্তের ভূমিকায় শ্রীঅসীম চক্রবর্তী অনুসরণ

করেন নি। অবশ্য যৌবন ও যৌবনান্তের অভিনয়ে পার্থক্য তিনি রক্ষা করেছেন; চশমা পরে ও চশমা ছেড়ে বয়সের পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করে কণ্ঠস্বরের ও বাচনের গতীয়তার তারতম্যে সেই পার্থক্য তিনি রক্ষা করেছেন। কিন্তু পরিবারে ও সমাজে দুটি ভিন্ন ভূমিকা রচনা করতে পারলে যে বাড়তি ডাইমেনশন লাভ হত, নাটক সেখানে পৌছতে পারল না। কর্মক্ষেত্রে কর্মরক্ষার চেষ্টায় কিংবা প্রতিবেশী গোপাল সান্যালের সঙ্গে শেষ কথোপকথনে শশধরের নিজের ছিন্নভিন্ন ব্যক্তিত্বকে জোড়াতালি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টার চিত্ররচনার যে-সুযোগ ছিল, শেষপর্যন্ত গোপাল সান্যালের চাকুরি গ্রহণে অস্বীকৃতির মধ্যে যে আত্মসম্মানবোধের ক্ষীণ রেশটুকু বর্তমান, তার কোনো পরিচয় শ্রীচক্রবর্তীর অভিনয়ে এল না। নটবর সামন্তের চরিত্রের স্টাইলাইজেশন যুক্তিসংগত; কিন্তু অস্বাভাবিক আড়ষ্টতার চেয়ে অস্বাভাবিক গতীয়তা ও স্বাচ্ছন্দ্যই কি আরো সংগত স্টাইলাইজেশন হত না? নটবরের সাফল্যের প্রতিশ্রুতি শশধরকে টানে, কিন্তু তার প্রায় আশ্রয়হীন সীমাহীন মুক্তিকে সে ভয় পায়। সমাজবিচ্ছিন্ন সমাজবিচ্যুত নীতিনিয়মরহিত সেই অনর্গল ক্ষমতা নটবরের গভীরতর আত্ম-প্রত্যয়, পরকে সাহায্য করে আত্মসন্তোষ লাভের আশঙ্কা ও প্রচণ্ড গতীয়তায়, রূপসজ্জায় প্রায় অন্যজাগতিক জৌলুসে মূর্ত হতে পারত। ফুটবলখেলোয়াড় বেপরোয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের রুক্ষতা নিতান্তই আদুরে ধনীর দুলালের ক্লীবতার সঙ্গে খাপ খায় না। অতীতস্মৃতির দৃশ্যাবলীতে তারা একই সঙ্গে দুর্বিনীত ডানপিটে ও আদুরে ভালোমানুষ হতে গিয়ে শেষপর্যন্ত বড়লোকের ছেলের অবাস্তর অবাস্তব জনপ্রিয় টাইপে পরিণত হয়ে পড়ে। পরবর্তী অংশে ছোট ভাইয়ের সিনেমা-সাধের মধ্যে এমন একটা ইতরতা এসে পড়ে, যাতে মূল নাটকের গভীর সংকট অনেক হালকা হয়ে যায়, শিল্পসভ্যতার শক্ত বাঁধুনির মধ্যে নিজের স্বরূপকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস নিতান্তই সহজ ও সস্তা 'সাকসেস্'-এর মোহ হয়ে দাঁড়ায়। বয়সের ভেদ কিছুটা কমিয়ে এনে একই অভিনেতাদের দিয়ে অতীত ও বর্তমানের বিবেকানন্দ ও নবকুমারের ভূমিকা অভিনয় করা গেলে এই নাটকের প্রযোজনার পূর্বতন ঐতিহ্য রক্ষিত হত, বিশেষত যখন এই পরিবর্তনে কোনোই লাভ দেখা গেল না। বরং শেফালী সামন্তের ভূমিকায় চিত্রিতা মণ্ডলের আনুপূর্বিক সংগতিপূর্ণ চরিত্রায়ন উল্লেখযোগ্য। স্বামীর প্রতি অন্ধ আস্থা, পুত্রদের প্রতি

ভালোবাসা, অযৌক্তিক আশা ও যুক্তিযুক্ত আশঙ্কার টানাপোড়েন মুহূর্তে মুহূর্তে তিনি রচনা করেছেন। মূল নাটকে চূড়ান্ত নিষ্ক্রমণে ন্যাচরালিজম ভেঙে থিয়েট্রিকালের শৈলীসিদ্ধির অবিস্মরণীয় মুহূর্তটি শশধরের নিষ্ক্রমণে ন্যাচরালিজম-এর নির্জীব ক্ষীণপ্রাণ অস্তিত্বেই বাঁধা পড়ে রইল—এ-অনুযোগও রয়ে গেল।

দুর্বলতা সত্ত্বেও মূল নাটকের জটিলতর বিন্যাসে পৌঁছতে না পারলেও, 'জনৈকের মৃত্যু' সাম্প্রতিক মধ্যবিত্ত জীবনের একটি বিশ্বাসযোগ্য ডকুমেন্টেশন রচনা করেছে। মানববোধের বিপর্যয়ে অনিশ্চিত নিরাপত্তার ভঙ্গুর আশ্রয়ে জীবনধারণের চেষ্টা, মূল্যবোধের সংকটে পরিবার-সম্পর্কের বিপর্যয় এবং এই দুইকে ঘিরে ছোট ছোট সংঘাতে বিক্ষুব্ধ এক সংসারবৃত্তের রূপায়ণে চতুর্মুখ সফল হয়েছেন। ১৯৬০ সালে 'এ ভিউ ফ্রম দ ব্রিজ' নাটকের এক নতুন মুখবন্ধে মিলার বলেছেন: "আমার মনে হয়, থিয়েটার যেন সাইকো-সেকশুয়ল রোম্যান্টিকতার ক্ষেত্রের দিকে পিছু হটে চলেছে; এই পিছু হাঁটা চলেছে এমন একটা সময়ে যখন ঘরে-বাইরে প্রচণ্ড সব ঘটনা ঘটছে, এমন সব ঘটনা যাদের কথা তুলতেই হয়, যাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়। এক কথায়, থিয়েটারে শুধু সহানুভূতির কাঁদুনিতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। ভুল বোঝাবুঝির আরেকটি অসহায় শিকারের মূর্তি দেখবার কল্পনাতেই আমি অধৈর্য হয়ে উঠি। আমার মনে হয়, কোমল অনুভূতিগুলি নিয়ে যেন বড় বেশি বাড়াবাড়ি চলেছে। আমি এমন একভাবে লিখতে চেয়েছি, যাতে শুধু অনুভব নয়, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সম্ভাবনাও উন্মোচিত হয়। দর্শকদের কান্নায় ভাসিয়ে দেওয়া, নয়তো অনাদি যুগের সাসপেনসের মায়ায় দর্শককে বেঁধে ফেলা, নয়তো এক কথায় জীবনকে নাটুকে করে তোলার চেষ্টা আমার কিছু নিদারুণ বিরক্তিকর লাগে, নিরর্থক ঠেকে।" ১৯৬০ সালেই সাত মাস পরে 'হার্পার্স ম্যাগাজিন'-এর এক প্রবন্ধে মিলার আবার বলেন: "আমি শুধু এমন এক থিয়েটার চাই যেখানে জীবনযাপনে আগ্রহী কোনো প্রাপ্তবয়স্ক এমন নাটক পাবেন যাতে তাঁর নিজস্ব কালপরিবেশে জীবনধারণের তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁর বোধ গভীরতর হবে। আমি শুধু সেনসেশন-এর থিয়েটার দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মানুষকে শুধু বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত স্নায়ুতন্ত্রের সমাহাররূপে দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে উঠেছি। ঐ পথের শেষে প্যাথলজি, আমরা প্রায় সেখানেই পৌঁছে গেছি।"

চতুর্মুখের 'জনৈকের মৃত্যু'-ও কি প্রায় সেই ভয়ংকর চোরাবালিতেই গিয়ে পৌছল না ?

জনৈকের মৃত্যু। রচনা—সাধন মৈত্র (আর্থার মিলারের 'ডেথ্ অফ্ এ সেল্‌সম্যান' অনুপ্রাণিত)। নির্দেশনা—অসীম চক্রবর্তী। সংগীত পরিচালনা—চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মণি বিশ্বাস। আলোকসম্পাত—আশুতোষ বড়ুয়া। মঞ্চ-পরিকল্পনা—অনঙ্গমোহন রায়। অভিনয়ে—অসীম চক্রবর্তী, জিতেন ঘোষ, চিত্রিতা মণ্ডল, লোকনাথ চন্দ্র, বারীন মুখোপাধ্যায়, দুলাল মিত্র, গোকুল বোস, জগৎ মিত্র, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেণু ঘোষ, তৃপ্তি দাস প্রমুখ। শ্রী প্রেক্ষাগৃহ, ৪ জুলাই, ১৯৬৫।

শ্বতায়নের 'মৃত্যুর চোখে জল' ও 'লঘুগুরু'

মনোজ মিত্রের সুপরিচিত একাঙ্ক নাটিকা 'মৃত্যুর চোখে জল' শ্বতায়নের প্রযোজনায় প্রধানত বৃদ্ধের ভূমিকায় শ্রীমিত্রের অভিনয়ের উপরই নির্ভর করেছে। সম্পূর্ণ ন্যাচরালিস্টিক পদ্ধতির অভিনয়ে ক্ষীণ স্বর ও ক্ষীণতর শ্রান্ত অঙ্গচালনায় শ্রীমিত্র চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বৃদ্ধের প্রাণ-ধারণের প্রচণ্ড ঈপ্সাই যদি নাটকের বিষয় হয়, তবে প্রশ্ন থেকে যায়, বৃদ্ধের আকুতিও কি শেষপর্যন্ত এক অত্যন্ত অভ্যস্ত সাংসারিক প্রবৃত্তির রূপমাত্রেই নিঃশেষ হয়ে গেল না? শেষ অংশে রবির মা-র কাতর আবেদন, "কেঁদে তুমি জানিয়ে দাও ওদের, আমরা দু'জনে এ-ঘরে এখনো বেঁচে আছি"—এর তাৎপর্য কথায় হয়তো প্রকাশ পেল, কিন্তু থিয়েটারের ভাষায় প্রকাশ পেল কি? অবশ্য আলোকসম্পাতে শ্রীকণিষ্ক সেনের নাট্য-পরিকল্পনাশক্তির অভাবহেতু শোচনীয় ব্যর্থতা নাটকটির কোনো চরিত্রানুগ 'ফ্রেমিং' যোগাতে পারল না। প্রযোজনায় সুপারকল্পিত কোনো স্টাইলের চিন্তা না থাকায় নাটকটি রয়ে গেল নিতান্তই ডকুমেন্টারি ধাঁচের—অর্থাৎ দিনানুদৈনিক জীবনের এক অভ্যস্ত ঘটনার অনুলিপিমাত্র। অথচ নাট্যকার শ্রীমিত্রের বোধহয় তা অভিপ্রেত ছিল না। তিনি নাটকে থীমের গুরুত্বে বিশ্বাসী; তিনি অন্যত্র লিখেছেন: "মানুষ বলতে আমি শুধু তার নৈতিক আত্মাকে বুঝি, আর জানি তার স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি—এই নৈতিক শক্তির স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিতে। নাটক এই সত্যকে পরিচ্ছন্ন পরিস্ফুট করবে এবং সভ্যতার ভিত্তিতে যে নৈতিক সমর্থন তার প্রতি দর্শকের বিশ্বাস উৎপাদন

করবে। থিয়েটারে যে-দর্শক ঢুকবে সে আর বেরিয়ে আসবে না। তার বদলে আসবে একটি সতেজ সন্দেহমুক্ত শক্তিমান প্রাণ।" (দ্র. শারদীয় গন্ধর্ব, ১৩৭১: 'নাটকে থীমের চিন্তা')। ঋতায়নের 'মৃত্যুর চোখে জল' নাট্যকারের বাঞ্ছিত সেই লক্ষ্যে পৌছতে পারে নি। অভিনয়ে একমাত্র শ্রীমিত্রই উল্লেখ্য। অন্যেরা সাধারণভাবে যে-মান রক্ষা করেছেন, আরতি মিত্র সেখানে পৌছতে পারেন নি; কথোপকথনের সজীব স্বাচ্ছন্দ্যে তিনি ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন বাচনের আড়ষ্টতায়।

একই সঙ্গে অভিনীত ঋতায়নের অন্য নাটক অতনু সর্বাধিকারীর 'লঘুগুরু' অস্কার ওয়াইল্ড-এর 'দি ইম্পর্টানস অফ বীইং আর্নেস্ট' অবলম্বনে রচিত, অথচ এই স্বীকৃতি সেদিনকার অভিনয়কালে একবারও শোনা গেল না, স্মারকপুস্তিকারও কোনো উল্লেখ পাওয়া গেল না। বিদেশী নাটক থেকে এই অঘোষিত অপহরণ পেশাদারী থিয়েটারব্যবসায়ীদেরই শোভা পায়, নবনাট্য আন্দোলনের নিষ্ঠাবান কর্মী অতনু সর্বাধিকারীর কাছে আমরা কখনও প্রত্যাশা করি না। প্রথম নাটকে যেমন স্টাইলের অভাব অসাফল্যের কারণ হয়, দ্বিতীয় নাটকে সুচিন্তিত স্টাইলের বাঁধুনিতে ঈষৎ অতিশয়িত ভঙ্গিসর্বস্বতা, ধ্বনিপ্রয়োগে কুকুর ও বেড়ালের ডাকের ঈষৎ দুর্বিনীত উপমা, এমনকি প্রথমাঙ্কের সমগ্র মঞ্চপরিকল্পনার সুচতুর ব্যবহার ও প্রবেশ-প্রস্থানের আসা-যাওয়ার রসিকতা, সব মিলে নাটককে স্বচ্ছন্দ গতি যোগায়। স্টাইলের ঐক্যই নাটকের প্রাণস্বরূপ স্নিগ্ধ কৌতুকের সুর প্রতিষ্ঠা করে।

অঞ্জিষ্ণু ভট্টাচার্য

মৃত্যুর চোখে জল। রচনা—মনোজ মিত্র। পরিচালনা—সুধীর চক্রবর্তী। অভিনয়—মনোজ মিত্র, শান্তা সেনগুপ্তা প্রমুখ। আলোকসম্পাত—কণিষ্ক সেন। মঞ্চ-পরিকল্পনা—কুমকুম মুন্সী ও বৃন্দাবন কুণ্ডু।

লঘুগুরু। রচনা—অতনু সর্বাধিকারী। পরিচালনা—মনোজ মিত্র। অভিনয়—মনোজ মিত্র, গণেশ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানব চন্দ্র, শান্তা সেনগুপ্তা, সুজিত পাল, শঙ্করীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, প্রমুখ। আলোকসম্পাত ও মঞ্চ-পরিকল্পনা—পূর্ববৎ। রঙমহল, ৬ জুন, ১৯৬৫।

মুক্তমতি : সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের বিতর্ক

মতান্ধতা ও ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞানীমহলেও নতুন করে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। তাঁরা মনে করেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার যতটুকু অগ্রগতি হওয়া সম্ভব ছিল, মতান্ধতারই জন্যে তার অনেখানি অগ্রগতি ব্যাহত ও স্তব্ধ হয়েছে। তাছাড়া, কোনো-কোনো বিজ্ঞানী 'জন্ম, উৎপত্তি, প্রজনন ও প্রজাতি' তত্ত্বের নবরূপকার চার্লস ডারউইনকেও 'ভাববাদী' ও 'প্রতিক্রিয়াশীল' বিশেষণে বিভূষিত করেছিলেন। মুক্তমতির অভাব ও মতান্ধতা-ই যে তার জন্যে দায়ী, তা সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক বিভিন্ন আলোচনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

সোভিয়েত বুদ্ধিজীবীদের বিখ্যাত মুখপত্র 'লিতেরাতুরনায়া গাজেতা'-য় গতবছর ১৭ই নভেম্বর অন্যতম বিশিষ্ট সোভিয়েত বিজ্ঞান-লেখক ওলেগ পিসারঝেভস্কি এর একটি প্রবন্ধ "Let Scientists Argue" (বিজ্ঞানীরা আলোচনায় নামুন") প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশ কংগ্রেসের পর যে শুভপরিবর্তন দেখা দেয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তভাবে চিন্তা করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনুশীলন ও আত্মসমালোচনা করার জন্যে বিজ্ঞানীদের কাছে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। তাছাড়া ব্যক্তিপূজা ও মতান্ধতার জন্য এতদিন সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞানের আশানুরূপ অগ্রগতি কিভাবে ব্যাহত হয়েছে, তার বিভিন্ন দিকের সমস্যা সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়া মাত্রই 'লিতেরাতুরনায়া গাজেতা'-র তরফ থেকে 'জীববিজ্ঞানে অগ্রগতি' সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে আলোচনার জন্য একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ স্তরের বেশ কিছু সংখ্যক পদার্থবিদ, রসায়নবিদ, জীব-বিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও লেখকরা যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কয়েকজন সোভিয়েত বিজ্ঞানীও ছিলেন। দীর্ঘ চারঘণ্টাব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন এই আলোচনায় মোট ষোলজন বিজ্ঞানী ও লেখক যোগদান করেন।

সেমিনারের বিশদ বিবরণ "জীববিজ্ঞানের যুগের চৌকাঠে পা দিয়ে" ("On the Threshold of the Biological Age") ২৪শে নভেম্বর 'লিতেরাতুরনায়া গাজেতা'-য় প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য, আলোচনাটি বেশ উত্তপ্ত ধরনেরই হয়েছিল।

মতান্ধতা ও ব্যক্তিপূজার কুফল, বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য মুক্তচিন্তার পরিবেশের সৃষ্টি করা, জীব-বিজ্ঞান-শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠক্রমকে নতুন করে ঢেলে সাজানো এবং চার্লস ডারউইনের তত্ত্বের নতুন করে মূল্যায়ন সম্পর্কেই আলোচনা সেমিনারে প্রাধান্য পেয়েছিল। তাছাড়া যোসেফ স্ট্যালিনের আমলের কোনো কোনো বিজ্ঞান-অধিকর্তা, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীমহলে বহুবিতর্কিত সোভিয়েত জীববিজ্ঞানী লাইসেংকোর মতবাদের তীব্র সমালোচনা করা হয়।

লেখক তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ "Let Scientists Argue"-এর দীর্ঘ উপসংহারে লিখেছেন : 'জীব-বিজ্ঞানের যে-সব শাখায় দীর্ঘকাল ধরে বদ্ধাবস্থা ছিল, জীবন ও বাস্তবতা এখন যেখানে নানান নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটিয়েছে, সেগুলির সমাধানের জন্য জীব-বিজ্ঞানীদের-ই অগ্রসর হয়ে আসতে হবে। কেননা, তাঁরা ছাড়া তো আর কেউ এর সমাধান করতে পারেন না। এই সমস্যাগুলি তাঁদের সামনে কাজের নতুন সম্ভাবনাও খুলে দিয়েছে। জীববিদ্যার ক্ষেত্রে অনেকগুলি জরুরী ব্যবহারিক দিক রয়ে গেছে,— যেমন পশু-প্রজনন ও তাদের নির্বাচনের প্রজনন-তাত্ত্বিক নীতিগুলি—ক্রমেই এদিকে প্রয়োজন বেড়ে যাচ্ছে। জীবাণু, ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাস গবেষণা ইতিমধ্যেই নিজস্ব-ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। ক্যান্সার-জেনেটিকস, ইমিউনো-জেনেটিকস, বিকীরণজাত রোগের জেনেটিক-তত্ত্ব—এগুলি আজ খুবই দৃষ্টি আকর্ষণকারী হয়ে উঠেছে। উদ্ভিদ বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সমস্ত নতুন দিক, যেগুলিকে তার "apical points" বলা যায়, তা দ্রুত বিকাশলাভ করছে। বিজ্ঞানের এই সব নতুন নতুন দিকে কাজ করার জন্য তরুণ বিজ্ঞান-গবেষকদের বহুল পরিমাণে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

নতুন গবেষণাকর্মীরা যাতে বেশি বেশি করে এদিকে আসতে পারেন, তারজন্য বিশেষ জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে, যাতে এ-ব্যাপারে কোনোরকম কৃত্রিম অন্তরায় না থাকে। এখনও, অনেক প্রাচীন-পন্থী লোক রয়েছেন, যাঁরা বিজ্ঞানের নতুন দিকের বিকাশগুলিকে পুরনো পন্থায় বিচার করতে চান,

বলেন যে, জীববিজ্ঞানে "মিচুরিনবাদের বিরুদ্ধে অভিযান" হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে "স্থায়ী প্রতিকার" প্রয়োজন ইত্যাদি।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো একটি সমস্যা, দুটি বিরোধীগোষ্ঠীর মধ্যে "প্রথম লড়াইয়ে-ই" সমাধা করে ফেলা যায়, এর চেয়ে আর ক্ষতিকর ধারণা কিছু থাকতে পারে না। বিজ্ঞানের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য প্রশ্নটি হলো, একপক্ষ তার প্রতিপক্ষকে "ধরাশায়ী" করে ফেলবে তা নয়, তা হলো যে, আন্তরিকতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে তুলে ধরা।

অবশ্যই, উত্তপ্ত বিতর্ক চলতেই থাকবে। উইলিয়ামস ও লাইসেংকোর জটিল কৃষি-জীববিদ্যার ধ্যান ধারণাগুলি শুধুমাত্র উদ্ভিদ-বিকাশের মৃত্তিকা-স্বাস্থ্য বিষয়ক-ই নয়, উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতি সংক্রান্তও এবং তত্ত্বের ব্যাপারে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মধ্যে অনেককিছু বিতর্কমূলক থাকতেই পারে।

অপরপক্ষে, জীববিদ্যার ক্ষেত্রে অণ গঠনের পর্যায় সংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রশ্ন এত দ্রুতগতিতে বিকাশলাভ করছে যাতে প্রতিদিনই অজস্র নতুন নতুন সমস্যা বিজ্ঞান-গবেষণার সামনে হাজির হচ্ছে। এই সবকিছুকেই একটা সাধারণ সমাধান বাতলে দিয়ে চুকিয়ে ফেলা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন হলো বিজ্ঞানের ব্যাপক ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞের গভীর গবেষণাকাজে অংশগ্রহণ।

প্রাপ্ত তথ্যগুলি সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও মত-বিনিময়ের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক সত্যটি অধ্যবসায় ও সৃজনশীল প্রয়াসের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রক্রিয়াই হলো স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়। এবং তার সঙ্গে আরও একটি বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি সম্পর্কেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরী।

জীববিদ্যায় মিচুরিনের সৃজনশীল অধ্যবসায় ও তার সাফল্য নিশ্চিত-ই জীববিজ্ঞানের নতুন বৈজ্ঞানিক সাফল্যগুলিকে তাঁর স্মরণে-চিহ্নিত করার দাবি রাখে। কিন্তু দুর্ভাগ্যত, "মিচুরিন-পন্থী" এই নামের আড়ালে অনেক সময় ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা ও গোঁড়ামীকেও চালানো হয়। বস্তুত, মিচুরিন ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ মৌলিক ও বহুমুখী সৃষ্টিশীল প্রতিভা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও সংকীর্ণতার ঢের উর্ধ্বে ছিল। উদাহরণত, মিচুরিনকে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানী ভ্যাভিলফের বিরুদ্ধে অনেক সময় দাঁড় করিয়ে দেখানো হয়, অথচ বাস্তবজীবনে এই দুজন ছিলেন তাঁদের বৈজ্ঞানিক কাজে ও ব্যক্তিগত বন্ধুত্বে পরস্পরের অতি কাছাকাছি।

অনেকেই জানেন না যে, বিশের যুগের (১৯২৩) গোড়াতে মিচুরিনকে যাঁরা বৈজ্ঞানিক কাজে সহায়তা জুগিয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন বিজ্ঞানী ভ্যাভিলফ; মিচুরিনের রচনাবলীর প্রকাশ, সম্পাদনা ও তার ভূমিকা প্রকাশ করেন তিনি-ই। সোভিয়েত বিজ্ঞান-আকাদেমির মাননীয় সদস্যপদে মিচুরিনকে নির্বাচনের জন্য মনোনীত করেন তিনি।

তাই, জীববিজ্ঞানের কাজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মিচুরিনবাদী উদ্যোগ প্রকাশিত হোক, সে-উদ্যোগ হলো সাহসিক প্রয়াসেব, নতুন, বলিষ্ঠ, প্রগতিবাদী এবং সম্পূর্ণত-ই জনগণের স্বার্থানুসারী। সুতরাং বিজ্ঞানীদের কর্তব্য হলো প্রকৃত 'যুক্তিস্থাপনায়'।

ওলেগ পিসারঝেভস্কি-এর প্রবন্ধের যৌক্তিকতা ও বিষয়টির অত্যধিক গুরুত্ব অনুধাবন করেই লিতেরাতুরনায়া গাজেতা-র তরফ থেকে সেমিনারটির আয়োজন করা হয়েছিল।

সেমিনারে আলোচনার সূত্রপাত করেন ইন্সটিটিউট অব হিস্ট্রি অব নেচার এণ্ড টেকনিক অব দি ইউ. এস. এস আর অ্যাকাদেমি অব সায়েন্সস-এর ডিরেক্টর অধ্যাপক বি. কেডরভ।

'আধুনিক জীব-বিজ্ঞানে অগ্রগতি' সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেই তিনি তাঁর দীর্ঘ আলোচনীতে বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক জীবনের সঙ্গে সংগতিবিহীন যে-সমস্ত পন্থা অনুসরণ করা হচ্ছিল, তার জন্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে গত কয়েক বছরব্যাপী তর্কবিতর্ক চলছিল। কিন্তু কোনো কোনো ব্যক্তির মতান্ধ ধারণার জন্য কোনো সমালোচনা করা, মতভেদ প্রকাশ করা ও এই সমস্ত ভ্রান্তিগুলিকে শুধরে নেওয়া সম্ভব হয় নি। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশ কংগ্রেসের পর যদিও সুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, তবুও সমস্ত দোষ-ত্রুটিকে এখনও শুধরানো যায় নি। এবং "বিজ্ঞান-ভাবনায় বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে সংঘাতের উপায় ও পন্থা সম্পর্কে সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণের সময় এসেছে।" ("It is time for an earnest and precise definition of the methods and forms of struggle between different trends in science.") আর মুক্তভাবে সৃষ্টিশীল আলোচনার মাধ্যমেই সমস্ত দোষ-ত্রুটির সংশোধন করে বিজ্ঞান-গবেষণায় আশানুরূপ অগ্রগতি সম্ভব।

সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক কেডরভকে সমর্থন করে বিশিষ্ট প্রজননতত্ত্ববিদ্

ডঃ এস. আলিখানিয়ান বলেন: সত্যি-ই এখনও সোভিয়েত ইউনিয়নে কিছুসংখ্যক বিজ্ঞানী আছেন, যাঁরা তাঁদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না, এমন সমস্ত মূল্যবান বিজ্ঞান-গবেষণার ফলাফলকেও নিন্দা করতে পেছপা হন না। অথচ দেখা গেছে, এই সমস্ত গবেষণার ফলাফল জাতীয় অর্থনীতিতে যুগান্তর আনতে পারে। তাছাড়া প্রজননতত্ত্ব ও মাইক্রো-অর্গেনিজম-এ এত ভালো গবেষণা হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো এত বড একটি বিরাট দেশে নির্দিষ্টভাবে বিজ্ঞানের এই বিশেষ বিভাগে কাজ করার জন্য কোনো ইন্‌স্টিটিউট নেই। কারণ? কারণ, প্রজননতত্ত্ব (Gene theory) কে ভাববাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল আবিষ্কার বলে বিভূষিত করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, লাইসেংকো বলেছিলেন: "Muta-genic factors-কে ব্যবহার করা প্রগতিশীল বিজ্ঞান ও সুসম্বন্ধ নির্বাচনের পদ্ধতি নয়।" সে মনারে ডঃ আলিখানিয়ান আরও বলেছিলেন: সোভিয়েত ইউনিয়নে অনেক উৎসাহী, অভিজ্ঞ ও কৃতী জীব-বিজ্ঞানীরা আছেন, যাঁরা গাছের প্রজননে Mutation-কে প্রয়োগ করে খুব ভালো ফল পেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কি পরিস্থিতিতে কোথায় কিভাবে কাজ করছেন? তাঁরা নিশ্চয়ই কৃষি-বিজ্ঞান আকাদমির গবেষকদের মতো সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। আর সেজন্যই প্রজনন-বিজ্ঞানে খুব ভালো কাজ হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নকল্পে তার প্রয়োগ এত কম। গবেষণাগারের গবেষণালব্ধ ফলাফলকে যত তাডাতাড়ি সম্ভব প্রয়োগ করা অবশ্যই কর্তব্য।

অতঃপর বিশ্ববিশ্রুত রুষ-রসায়নবিদ অ্যাকাডেমিশিয়ান এ. শকোলভ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন: গাছের প্রকৃতি নির্ভর করে মৃত্তিকার উপর। মৃত্তিকাই খাদ্য-সামগ্রী সরবরাহ করে। আর আবহাওয়া গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে নিশ্চিত করে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষি-বিজ্ঞান গবেষণায় এতদিন এই মূল বিষয়গুলিকেই ভুলে যাওয়া হয়েছিল।

বিশ্ববিখ্যাত ডারউইনবাদী জীব-বিজ্ঞানী এ. পারোমনোভ বলেন: "ডারউইনবাদকে তার প্রকৃত তাৎপর্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যে-ডারউইন দেখিয়েছিলেন যে এভলিউশনের তথ্যটুকু প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না, তার কারণসমূহও জানতে হবে, তাঁকে ভাববিলাসী বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। যে ডারউইনের তত্ত্বের ভিত্তি ছিল জৈব অভিব্যক্তির কারণনির্ণয়

ব্যাখ্যা, যিনি কর্ষিত গাছপালা ও গৃহপালিত প্রাণীর নিয়ন্ত্রিত অভিব্যক্তির তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁকে বলা হল এক অতিসামান্য এভলিউশনিস্ট। ডারউইন জীব-বিজ্ঞানকে জড়বাদী ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলেন, অথচ তাঁকেই কেউ-কেউ প্রায় ভাববাদী ধরে নিয়েছিলেন। তথাকথিত সৃষ্টিশীল ডারউইনবাদকে যাঁরা প্রসারিত করতে গেলেন, তাঁরা নিজেদের তাত্ত্বিক বলে দাবি করেন এবং শেখান যে, সমগ্র প্রজাতি ও প্রজাতিভুক্ত প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে স্বার্থের ঐক্যসূত্র বর্তমান। একেই কি আমরা ডায়ালেকটিকস বলব ?" ("We must restore Darwinism in its true sense. Darwin, who pointed out that, besides establishing the fact of evolution, we must also know its causes, was held to be a man of contemplative mind Darwin whose theory was based on the causative analysis of organic evolution, who founded the theory of guided evolution of cultivated plants and domestic animals, was called a trivial evolutionist. Darwin put biology on a materialistic basis yet some persons ranked him nearly as an idealist. So called creative Darwinism was elaborated by people who called themselves theoreticians and taught that a harmony of interests existed between the species as a whole an every individual. Are we to call this dialectics ?") তার ফলে, পারোমনোভ-এর বক্তব্য অনুযায়ী, ১৯৪৮ সালের পর থেকে বিবর্তনবাদ-সম্বন্ধীয় কোনো গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করা হয় নি এবং এ-সম্বন্ধে কোনো পাঠক্রমও তৈরি করা হয় নি।

সেমিনারে জীব-বিজ্ঞানী ডঃ ভি. এফ্রোইমসন তাঁর আলোচনাতে বলেন : ত্রিশ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে অত্যধিক ফসল উৎপাদনের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ১৯৩৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় প্রকাশনী বিভাগ থেকে লাইসেংকোর তৈরি একটি রিপোর্ট : "Jarovization—a Powerful Means of Raising Crop Yields," প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে লাইসেংকো "Jarovization"-এর মাধ্যমে বেশি করে ফসল উৎপাদন সম্ভব এবং তার প্রয়োগে তিনি খুব ভালো ফল পেয়েছেন বলে দাবি করেন। কিন্তু শ্রেণীশত্রুদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন, তিনি তাঁর রিপোর্টে বলেন।

লাইসেংকো তখন বলেছিলেন, শ্রেণীশত্রুদের মধ্যে কিছুসংখ্যক "Kulak" বিজ্ঞানীও আছেন।

ডঃ এফ্রোইমসন বলেন: স্ট্যালিনের আমলে এই রিপোর্ট সম্পর্কে মতভেদ প্রকাশ করা খুবই অসম্ভব ছিল। রিপোর্টটির কথা শুনেই স্ট্যালিন, 'বাহবা, লাইসেংকো, বাহবা' বলে লাইসেংকোকে অভিনন্দিত করলেন এবং "Jarovization"-এর পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলো।

"Jarovization"-এর মাধ্যমে ফসল বাড়ানোর পরিকল্পনায় উৎপাদিত ফসলের যে-পরিসংখ্যান তখন দেখানো হয়েছিল, এ-সম্বন্ধে ডঃ এফ্রোইমসন বলেন: "But these figures, like many others, were faked. We have not heard of jarovization for the past 20 years and we know that, since the middle of the XIX century it has not been applied on a big scale by any one, either here or abroad."

বিশ্বখ্যাত পদার্থবিদ অ্যাকাডেমিশিয়ান এম. লিওনোটভিচ জীব-বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ আগামীদিনের তরুণ জীব-বিজ্ঞানীদের উপর নির্ভর করছে বলে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। তাই, তিনি বলেন, সমস্ত দোষ-ত্রুটি সংশোধন করার জন্যে সব প্রাকৃত-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞানের উচ্চতর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পাঠক্রমকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজানো উচিত। বিজ্ঞানের সমস্ত পাঠ্য বইগুলিতে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রতিফলন থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

সেমিনারের আলোচনাতে আর যাঁরা বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জীব-বিজ্ঞানী ডঃ এ. স্টুডিটস্কি ও ডঃ এ. নেইফাক।

সেমিনারের একেবারে শেষের পর্যায়ে চারঘণ্টাব্যাপী এই উত্তপ্ত বিতর্কের এক সারাংশ দান করেন পদার্থবিদ ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভি. গ্যাব্রিলফ।

তিনি বলেন: এই আলোচনা ও মতবিনিময়ের উদ্দেশ্য হলো জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজ যে বিতর্ক চলেছে, আগ্রহী ব্যাপকতর জনমণ্ডলীকে সে সম্পর্কে অবহিত করা।

প্রধান প্রধান কথাগুলি বলা হয়েছে। আমাদের সামনে জরুরী কাজটি হলো যে, গোঁড়ামীর অবসান ঘটানো এবং বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলির খোলাখুলি আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই খোলাখুলি আলাপ-

আলোচনার মধ্য দিয়েই বিশেষজ্ঞরা দেখতে পারবেন যে, আজকের অবস্থায় কোন সমস্যাটি সবচেয়ে জরুরী ও কোনগুলি হলো তার পরে বিবেচ্য। এই আলোচনা যাতে সৎভাবে অগ্রসর হতে পারে, সেজন্য সংবাদপত্রগুলিরও সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে।

জীব-বিদ্যার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যে-সমস্ত সাফল্য লাভ করা গেছে, সেগুলির পরিচয় ও ব্যাখ্যাদান করাও আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কোনটি ঠিক এবং কোনটি ভুল সে-বিষয়ে একটা পরিষ্কার বিবৃতি দেওয়া প্রয়োজন। ভুল এই অর্থে, যা হলো বিজ্ঞান ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল,—কৃষি-বিজ্ঞান, কৃষি-রসায়ন ও তত্ত্বগত জীব বিদ্যার দিক থেকে।

চারঘণ্টাব্যাপী এই নিরবচ্ছিন্ন আলোচনায় যে ষোলজন বিজ্ঞানী ও লেখক যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সারা-ইউনিয়নের কৃষি-বিজ্ঞান আকাদমির সদস্য ভি. ক্লেচোভস্কি, জীব-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান ভি. সাখারোভ, দার্শনিক ভি. ক্রেমিয়ানস্কি, এস. মিকুলিনস্কি ও এম. ভেদোনাফ এবং লেখক ভি. দানিন এবং ও. পিসারঝেভস্কি। প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ বিশিষ্ট বিষয়ে আন্তরিকতা ও আবেগের সঙ্গে বলেন এবং দেখান যে, তাঁদের জীবনব্যাপী বিজ্ঞান-সাধনা, অভিজ্ঞতা ও চিন্তাই তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

নানা বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়। যেমন, ভেষজ-বিজ্ঞান, প্রজনন-বিজ্ঞান, সোভিয়েত ইউনিয়নে লিসাইনের উৎপাদন, শঙ্করজাতীয় ভুট্টা উৎপাদনের প্রজনন-তত্ত্ব প্রভৃতি। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনার মধ্য দিয়েও যা ফুটে ওঠে, তা হলো, সোভিয়েত বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ ও সোভিয়েত দেশের জাতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ-ভাবনার প্রসঙ্গটি-ই।

জ্যোতির্ময় গুপ্ত

ভিয়েৎনাম ও আমেরিকা

ভিয়েৎনামে আমেরিকার মূঢ় ও কুৎসিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষের বুদ্ধির ও বিবেকের লড়াই ক্ষান্ত হয় নি।

আর্ল রাসেল একান্ন বছর ধরে ব্রিটেনের লেবর পার্টির সভ্য ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী মিস্টার উইলসন গদিতে বসার পরদিন থেকেই ভিয়েৎনাম যুদ্ধের ব্যাপারে আমেরিকাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এসেছেন বলে লজ্জায় ও ঘৃণায় রাসেল তিরানব্বুই বছর বয়সে তাঁর পার্টি কার্ড ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। এই চিরকিশোর মহামনীষীকে প্রণাম নিবেদন করি। যেটাকে তিনি অন্যায় মনে করেন তার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হওয়ার ক্ষমতাকে তিনি এই বয়সেও হারিয়ে ফেলেন নি।

বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক টয়েনবি ভিয়েৎনাম যুদ্ধের নিন্দা করে বলেছেন, আমেরিকাকে পৃথিবীর বিবেকরক্ষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার অধিকার কে দিয়েছে? উত্তর ভিয়েৎনাম বা চীন যদি জেনিভা চুক্তি ভঙ্গ করে থাকে, তার প্রতিকারের দায়িত্ব আমেরিকার একার নয়। জাতিসংঘ রয়েছে কি করতে?

নাট্যকার আর্থার মিলারকে আর্টিস্টস এইড বিলের সমর্থনকল্পে আহূত এক সভায় আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তিনি যান নি। বলেছেন, যখন কামান কথা বলছে তখন লেখকেরা নীরব থাকতে বাধ্য।

নিউ ইয়র্কে বিশ হাজার লোকের এক জনসমাবেশে বৈদেশিক ব্যাপার সম্বন্ধে নামকরা মার্কিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হ্যানস মরগেনথাউ বলেছেন, ভিয়েৎনাম যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। তিন কারণে তিনি এই যুদ্ধের বিরোধী: (১) এটা অন্যায় যুদ্ধ; (২) এ যুদ্ধ আমেরিকা জিততে পারবে না; (৩) যুদ্ধটা চলতে থাকলে তার ফল হবে মার্কিন সরকার যা প্রত্যাশা করছেন ঠিক তার উল্টো। সপ্তদশ প্যারালাল সম্বন্ধে মরগেনথাউ মন্তব্য করেছেন: "জেনিভা চুক্তিগুলিতে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র খাড়া করা হচ্ছে না, সপ্তদশ প্যারালালটা দুই তথাকথিত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বা সামরিক সীমারেখা বলে গণ্য নয়।

ওটা শুধু একটা প্রশাসনিক বিভাগরেখা, ক্ষণস্থায়ী বলেই ওটাকে হ্যানোই সরকার মেনে নিয়েছিল এবং সকলের মনেই এই বিশ্বাস ছিল যে, অনতিবিলম্বে সমগ্র ভিয়েৎনামই হ্যানোই সরকারের শাসনাধীন হবে।"

ফ্রান্স ভিয়েৎনাম যুদ্ধ জিততে পারে নি, আমেরিকাও জিততে পারবে না। ভিয়েৎনামে অন্যায় যুদ্ধ চালাতে গিয়েই চতুর্থ ফরাসী রিপাবলিকের পতন ঘটেছিল। আমেরিকাও যদি ভিয়েৎনামের অন্যায় যুদ্ধে নিজের সন্তানদের বলি দিতে থাকে তাহলে নিরর্থক রক্তক্ষয়ের ফলে নিজ আমেরিকাতেই গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়বে। আমেরিকাই ভিয়েৎনামকে চীনা কমিউনিজমের কোলে ঠেলে দিচ্ছে, নচেৎ স্বাধীন ও স্বকীয় ধারায় ভিয়েৎনামী কমিউনিজমের স্ফূর্তিলাভ দেখা যেতে পারত। যুক্তি ও শুভবুদ্ধির যে-কণ্ঠস্বর অধ্যাপক মরগেনথাউর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে তাকে অভিনন্দন জানাই। কেন মার্কিন সরকার ভিয়েৎনামে এই অন্যায়, উন্মত্ত ও আত্মঘাতী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, এটা আজ আমেরিকাবাসীদেরই প্রশ্ন।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

গণতন্ত্রের অপহ্নব

রাজনৈতিক কারণে কোনো ব্যক্তিকে অনির্দিষ্ট কাল বিনা বিচারে আটক রাখার পাপের বিরুদ্ধে 'পরিচয়'-এর পাতায় অতীতে বার-বার আমাদের লিখতে হয়েছে। দুঃখের ব্যাপার দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও সেই অবাঞ্ছিত প্রয়োজনের হাত থেকে আমাদের নিষ্কৃতি মেলে নি। গণতন্ত্রের প্রসারের চেষ্টার পাশাপাশি আজো দেশে চলেছে গণতন্ত্রের সেই পুরানো অপহ্নব। আজো এই বাংলাদেশের কয়েদখানায় আটক রয়েছেন বেশ কয়েক 'শ রাজবন্দী।

মানবিক দাবি এ-ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সহজ—অপরাধের প্রমাণ যথারীতি আদালতের সামনে পেশ করে অবশ্যই যে-কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে কিন্তু নিছক অপ্রকাশ্য রাজনৈতিক সন্দেহের বশে কোনো মানুষকে অমন বিনা বিচারে আটক রাখা চলবে না অনির্দিষ্ট কাল ধরে। দেশ যখন আক্রান্ত অথবা যুদ্ধবিরতি যখন প্রকৃত নিরাপত্তার উদ্রেক করতে পারে নি সারা দেশে, সেখানে ঐ গণতান্ত্রিক নীতি অচল—এমন কথা যাঁরা বলেন তাঁদেরও কিন্তু মানতে হবে যে দেশের কোনো রাজনৈতিক

দলই দেশরক্ষার সর্বাধিক দায়িত্ব অস্বীকার করেন নি এই সংকটমুহূর্তে। সংকটের উদ্ভব কি করে হল অথবা তার নিরাকরণ হবে কোন পথে সে-সম্পর্কে মতের হয়তো গরমিল থাকতে পারে কিন্তু তার জন্য মানুষকে বিনা বিচারে আটক রাখা গণতন্ত্র ও সভ্যতাবিরুদ্ধ কাজ হবে নিশ্চয়ই। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তির দেশরক্ষার ঘোষণায় সরকারের সংশয়ও থেকে থাকে তা হলেও প্রকৃষ্ট পন্থা হবে তাঁকে মুক্ত করে তাঁর ঘোষণা অনুসারে তাঁকে কাজ করার সুযোগ দেওয়া। আর সে ক্ষেত্রে সত্যই যদি তিনি দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজে প্রবৃত্ত হন তাহলে দেশবাসী নিশ্চয়ই আজ তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারবেন অমন অপচেষ্টা থেকে—তাঁদের সমর্থন ছাড়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয় যথেচ্ছ অনাচার চালিয়ে যাওয়া।

খ্যাতিমান অভিনেতা ও নাট্যপরিচালক শ্রীযুক্ত উৎপল দত্তকেও কিছুদিন হল ঐ দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে আরো অনেকের মতো। কোনো স্পষ্ট অভিযোগ তুলে তাঁকে আদালতের সামনে হাজির করা হয় নি—শুধু বিনা-বিচারে আটক রাখা হয়েছে সন্দেহবশে। 'পরিচয়' এর পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই কামনা করবেন যে অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে তাঁকেও মুক্তি দেওয়া হবে অচিরেই।

সংশ্লিষ্ট আরো একটি ব্যাপারে আমরা বিশেষ উদ্বেগ বোধ করছি। দেখা যাচ্ছে উৎপলবাবুর গ্রেপ্তারের পর মিনার্ভা থিয়েটর মঞ্চে এখনো নিয়মিত অভিনীত 'কল্লোল' নাটকটির বিজ্ঞাপন কয়েকটি দৈনিকপত্র আর ছাপছেন না। শুনেছি ঐ পত্রিকাগুলির কর্তৃপক্ষ নাকি অস্বীকার করেছেন ঐ বিজ্ঞাপন ছাপতে। অথচ উৎপলবাবুর গ্রেপ্তারের আগে পর্যন্ত তাঁরা নিয়মিত সে-বিজ্ঞাপন ছেপেছেন তাঁদের কাগজের পাতায়। গ্রেপ্তারের ফলে 'কল্লোল' নাটক বা অভিনয়ের নিশ্চয়ই কোনো তারতম্য হয় নি গুণাগুণের মাপকাঠিতে। তাই পত্রিকা কর্তৃপক্ষের এই আচরণ সত্যই হতবুদ্ধিকর।

অথচ দুর্নীতিমূলক আচরণের জন্য আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত বা তিরস্কৃত মহামান্যদের প্রতিষ্ঠানগুলির বিজ্ঞাপন ছাপতে এঁরা কুণ্ঠাবোধ করেছেন এমন কোনো খবর আমরা জানি না।

আর ঐ বিজ্ঞাপন বন্ধ করার ব্যাপারে যে-পত্রিকা প্রধান উদ্যোগী সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার তার পরিচালকেরাই বছর দুই আগে সাড়ম্বরে ধ্বজা তুলে ধরেছিলেন 'শিল্পীর স্বাধীনতা'র!

চিন্মোহন সেহানবীশ

প্রভাতী তারা ও নতুন যুগের সূর্যোদয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৮ সনে "মডার্ন রিভিয়ু" পত্রিকায় রুশিয়া সম্পর্কে লেখেন: "......কিন্তু খাঁটি আদর্শের পতাকা হাতে নিয়ে যদি সে ব্যর্থ হয় তবে সে ব্যর্থতাও প্রভাতী তারার মতোই বিলীয়মান হবে এবং অভ্যুদয় ঘটাবে নতুন যুগের সূর্যোদয়ের।" রুশিয়ার বিপ্লবের প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে বলেছিলেন যে সত্যের অভিমুখে মানবজাতির প্রভাতকালীন মিছিলে ভারতকেও যোগ দিতে হবে। ১৯১৭ সনে রুশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সোভিয়েত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে ওই কথাগুলি লেখায়।

তারপর, রবীন্দ্রনাথই ১৯৩০ সনে সমাজতন্ত্রের পীঠভূমি রুশিয়া সফর করে এসে "এ-যুগের তীর্থক্ষেত্র" দেখার কথাকটি লিখে গেলেন।

আজ, ১৯৬৫ সনে দাঁড়িয়ে, ১৯১৭ থেকে চারটি দশক আরও ৮টি বছরও পার হয়ে, বিস্মিত হয়ে তাকাতে হয় সেই সোভিয়েত ভূমির দিকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সার্বিক-মানবিক প্রগতিতে এক অসামান্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ সর্বমানবের সামনে তুলে ধরেছে। যেন এ কথা আগেই ধরা ছিল যে, সভ্যতার এই নবপীঠভূমি থেকেই একদিন মানুষের মহাকাশচারণার যুগের উদ্বোধন ঘটবে "স্পুৎনিক"-এর প্রতীকে।

সফল সমাজতন্ত্র গড়ার পর সোভিয়েত জনগণ এখন সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে তার উচ্চতর স্তর, কমিউনিজমের বৈষয়িক-কারিগরি বনিয়াদটিকে শক্ত করে গড়ে তুলতে। বিশ্বের সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাষ্ট্রের ৪৮ বছরের মধ্যে এই অসাধারণ সাফল্যের পিছনের কারণ কী, অনেকেই প্রশ্ন করে: "রাশিয়ান মিরাকল?" কিন্তু "মিরাকল"-এর পিছনের "মিরাকল"?

"এক মহাপণ্ডিত জার্মান দার্শনিক বৃটিশ মিউজিয়মে বসে এক অত্যন্ত শক্তিধর সামাজিক দর্শন পদ্ধতির বিন্যাস ঘটালেন। অবশ্যই, আমরা বলছি, কার্ল মার্কস নামক ব্যক্তিটির কথা। তাঁর হাতে একটিও বন্দুক, কামান, ট্যাঙ্ক কি জেট বিমান অথবা ক্ষেপনাস্ত্র ছিল না। সে যা হোক, তাঁর ব্যাপক বৈজ্ঞানিক রচনাবলীই আজকের দিনে পশ্চিমী দুনিয়ার সামনে সবচেয়ে বড় ব্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"—এই কথাগুলি নেওয়া হয়েছে মার্কিন অধ্যাপক জেমস. বি. হ্যাসন-এর লেখা থেকে।

শেষপর্যন্ত বুর্জোয়া তাত্বিকদের মুখ থেকেই আজ এ-স্বীকৃতি না বেরিয়ে পারছে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজয়ী ভাবধারাই লেনিন-প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রের চমকপ্রদ সাফল্যের, "মিরাকল"-এর মূলে।

ইউনেস্কোর সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সারা পৃথিবীতে আজ সর্বাধিক প্রকাশিত গ্রন্থাবলী হল মার্কস, লেনিন—এঁদের রচনাবলী। মার্কসবাদের বিকাশ ও তার বিজয়ী-শক্তির প্রসঙ্গে লেনিন লেখেন: "আগামী ঐতিহাসিক দিনগুলিতে মার্কসবাদ আরও বেশি মাত্রায় বিজয়ী হয়েই চলবে।" আজকের সোভিয়েত রাষ্ট্র লেনিনের এই কথারই সত্যতা প্রমাণিত করছে।

১৯১৮ সনে রবীন্দ্রনাথ যে "প্রভাতী তারা"র আলোর রেখাটি দেখেছিলেন, "নতুন যুগের সূর্যোদয়ে" আজ তা সারা বিশ্বকে উদ্ভাসিত করার দিকেই চলেছে।

নির্মলাশীষ সেন

সম্পাদকীয় রদবদল

বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হওয়ায় কিছুকাল ধরে শ্রীমঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে পরিচয় এর কাজকর্ম দেখা-শুনা করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই সম্পাদকীয় দায়িত্ব থেকে তাঁকে মুক্তি দেবার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন। তাঁরই সনির্বন্ধ অনুরোধে একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে পরিচয়-এর পরিচালকমণ্ডলী অবশেষে তাঁকে মুক্ত দিতে সম্মত হয়েছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় অবশ্য সম্পাদক-মণ্ডলীর সদস্য থাকছেন এবং সেই হিসাবে পরিচয় তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবে না।

গত এক দশকের অধিককাল ধরে পরিচয় সম্পাদনার প্রধান দায়িত্ব শ্রীচট্টোপাধ্যায়ই বহন করে এসেছেন বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে, এ-প্রসঙ্গে পরিচালকমণ্ডলী তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছে।

পরিচালকমণ্ডলী আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছে শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচয়-এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন। এ-ছাড়া সম্পাদকমণ্ডলীতে নতুন যোগ দিলেন শ্রীপার্থ বসু। এই তরুণতর

সাহিত্যকর্মীদের সহযোগিতায় পরিচয়-এর উত্তরোত্তর উন্নতি হবে বলেই বিশ্বাস।

গ্রাহকদের প্রতি

অনিবার্য কারণবশত পরিচয়-এর আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা যুগ্ম-সংখ্যারূপে প্রকাশিত হল। এই কারণে গ্রাহকেরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন তার প্রতি দৃষ্টি রেখে এই সময়ের মধ্যে যাঁদের গ্রাহক চাঁদা শেষ হবে তাঁদের মেয়াদ এক সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ যাঁদের ১২ সংখ্যা পাবার কথা তাঁরা ১২ সংখ্যাই পাবেন, যাঁদের ছটি সংখ্যা পাবার কথা তাঁরাও তাই পাবেন।

বিয়োগপঞ্জী

অস্কার লাঙ্গে

বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত, অর্থনীতিবিদ ও ভারতবন্ধু অস্কার লাঙ্গের গত ২রা অক্টোবর লণ্ডনে মৃত্যু হয়েছে। লাঙ্গের মৃত্যুতে কেবলমাত্র তাঁর স্বদেশ পোল্যাণ্ডই তার কৃতীসন্তান হারায় নি, বিশ্বের সমাজতন্ত্র-চিন্তার এক বিশাল জগৎ তাঁর তিরোধানে শোকার্ত: দেশ-বিদেশের অগণিত মানবপ্রেমীর সঙ্গে আমরাও তাঁর মৃত্যুতে স্বজন বিয়োগবেদনা অনুভব করছি। ভারতের পরিকল্পনামূলক আর্থনীতিক উন্নয়নে যাঁদের অবদান আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করব, অস্কার লাঙ্গে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিশেষভাবে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখায় তাঁর স্পষ্ট হাতের ছাপ ছিল। আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অস্কার লাঙ্গেকে ভারতের জন্য পোল্যাণ্ডের 'শ্রেষ্ঠতম উপহার' বলেছিলেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনাকালে তিনি বেশ কিছুদিন এই কলকাতায়, ভারতীয় স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিট্যুটে, কাটিয়ে গেছেন।

লাঙ্গের জীবনে, সমাজতন্ত্র-ভাবনা তাঁর আবাল্য সঙ্গী। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি মার্কসের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর শহর টোমাসংসোতে এক শ্রমিকসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ১৯০৪ সালে এক বস্ত্রশিল্প-উদ্যোক্তা পরিবারে ঐ শহরেই তিনি জন্মেছিলেন। কৈশোরেই তাঁর নিজের শহরের শ্রমিক-সংগঠন ও সমাজতন্ত্রী যুব-সংগঠনের সঙ্গে তিনি সংযোগ স্থাপন করেন। মার্কসবাদ ছাড়াও নৃতত্ত্ববিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধর্ম এবং প্রাচ্যবিদ্যায় তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। প্রথম যৌবনে তিনি রকফেলার ফাউণ্ডেশন স্কলারশিপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য যান। ঐ সময়েই, অ্যাকাডেমিক অর্থনীতিবিদদের—বিশেষভাবে অস্ট্রীয় অর্থনীতি চিন্তাধারার পণ্ডিতদের বহুখ্যাত সমাজতন্ত্র-বিরোধিতার যুক্তি-তর্কাতীতভাবে তিনি খণ্ডন করেন। এই অর্থনীতিবিদদের মতে 'যেহেতু' সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণের মূল্য নির্ধারণ করা 'অসম্ভব', সুতরাং যুক্তিগতভাবে উৎপাদনের উপাদানসমূহের সুবিন্যাস সম্ভবপর নয়। লাঙ্গে ও তৎকালীন আমেরিকান ইকনমিক অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি এফ. ডব্লু. টেলরের সহযোগে 'অন দি ইকনমিক

থিয়োরি অব সোশ্যালিজম' পুস্তকটি রচনা করে—সমাজতন্ত্রের যে মূলধন-তন্ত্রের চেয়ে উন্নততর আর্থনীতিক অবস্থা—অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন, কিন্তু তাঁর সমাজতন্ত্র-বিষয়ক চিন্তার জন্য পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁকে দ্রুত ফিরে যেতে হয়। এর পরে তিনি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অর্থনীতি ও সংখ্যাতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। এই সময়েই তাঁকে অ্যাকাডেমিক অর্থনীতির তিনটি ধারা পরম্পরা, যথা, নিও-ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি তত্ত্ব, কেইনসী তত্ত্ব ও কল্যাণমূলক অর্থনীতি তত্ত্বের প্রবক্তাদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হতে হয়। মূলধনতন্ত্রের আভ্যন্তরিক বৈপরীত্য ও সংঘাতের জন্যই যে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্বাভাবিকভাবে সম্ভবপর নয়—এ-কথাটা একেবারেই আলোচনা না করে, মূল-নতন্ত্রকেই চিরায়ত ও ধ্রুব ব্যবস্থা বলে মেনে নিয়ে এঁরা অর্থনীতিকে তত্ত্বের উপস্থাপনা করেছেন। ফলে, নব্য-ক্ল্যাসিকালদের মতে একমাত্র অনড় মজুরীর হারই বেকারীর কারণ বলে বোধ হয়েছে। পরিবর্তমান সুদের হার ও মজুরীই যেন স্বাভাবিক অর্থনীতিকে ভারসাম্য আনতে সক্ষম। অন্যদিকে কেইনসীয়গণ মনে করেন মূলধনের ক্রমহ্রাসমান কার্যকারিতাই বিনিয়োগের হ্রাস ঘটিয়ে বেকারী আনে। সুদের হার এক বিশেষ সীমার নিচে নামানো যায় না বলেই, হ্রাসমান মূলধনের কার্যকারিতা অপূর্ণ কর্মসংস্থানই স্বাভাবিক করে তোলে। কেইনসীয়গণ অবশ্য মূলধনতন্ত্রের এই আভ্যন্তরিক তথাকথিত বিরোধ স্বীকার করেন। ফলে, তাঁরা সরকারী আয়-ব্যয় নীতিকে মর্যাদা দেন। কল্যাণবাদী অর্থনীতি-বিদগণ কেউ বণ্টনগত খণ্ড পরিকল্পনা রচনা করে, কেউ-বা নিরঙ্কুশ সর্বজ্ঞ নির্দেশকারী—যার, বা যাদের মূল্যবোধই কল্যাণমূলক অবস্থা ও ব্যবস্থা নিরূপণ করতে সক্ষম বলে—নানা বিতর্কের ধূম্রজাল সৃষ্টি করেন। লাঙ্গে নিও-ক্ল্যাসিক্যালদের—মূলধনতন্ত্রের উৎপাদনক্ষমতা ও উৎপাদন-সম্পর্কের বৈপরীত্যগত বিরোধ তাঁদের অস্ত্র দিয়েই বুঝিয়ে দেন। কেইনসীয়দের সঙ্গে সরকারী আয়-ব্যয় সাপেক্ষ স্বল্পকালীন সাফল্যের বিষয়ে একমত হয়েও—একচেটিয়া মূলধনতন্ত্র যে এই স্বল্পস্থায়ী প্রতিকারগুলিও কার্যকর করতে দেবে না—তা স্পষ্ট দেখিয়ে দেন। কল্যাণবাদী অর্থনীতিজ্ঞদের নিকটে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানার গুণগত পরিবর্তনই যে যথার্থ কল্যাণের স্বরূপ—তা বিতর্কের মাধ্যমে স্পষ্ট করে তোলেন। এক কথায়,

অ্যাকাডেমিক অর্থনীতিবিদদের, তাঁদের নিজেদের পদ্ধতিতেই—তাঁদের অন্তঃসারশূন্যতা বুঝিয়ে দেন।

১৯৪৫ সালে পোল্যাণ্ড নাৎসীকবলমুক্ত হবার পর জাতিসংঘে তিনি নতুন পোল্যাণ্ডের অন্যতম প্রবক্তা হন। ১৯৪৭ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। পোলিশ সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের ও পোলিশ রাষ্ট্রের বহু দায়িত্বশীল পদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের জন্য—মূলধনতন্ত্রে ব্যবহৃত ও পরীক্ষিত বহু পদ্ধতিরও তিনি সুপারিশ করেন। সমাজতন্ত্রের উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে তাঁর অবদান ইতিমধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আলোচনা ও প্রয়োগের বিষয় হয়েছে। পণ্ডিত, হৃদয়বান, কলারসিক, মানবপ্রেমিক এবং আমাদের শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ অস্কার লাঙ্গের তিরোধানে তাঁর স্বদেশ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শোক পালন করেছে।

তরুণ সান্যাল

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবেদন করবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার হৃদয়ে স্মরণ করতে হয়—আমাদের কোনো-কোনো সুহৃদ আজ আর নেই। সংগীতজ্ঞ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের বিয়োগে দেশের বহু মানুষই বেদনাহত হয়েছেন, সংগীত-জগতেরও বিশেষ ক্ষতি হয়েছে। সংগীতশিল্পীদের নিকট তিনি ছিলেন বহুমান্য উপদেষ্টা, বেতার-সংগীতেরও অন্যতম প্রধান শিল্পনির্দেশক; আর তার বাইরেকার সংগীতরসিক বৃহৎ সমাজে সুরেশবাবুর শিষ্টতা ও অমায়িকতা, মর্যাদাময় সুস্থ ব্যবহার, জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ তাঁকে সর্বরকমেই প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন করেছিল। নিতান্ত অকালে তিনি গত হয়েছেন, তা বলা চলে না; তাঁর অভাব তবু বহুদিকেই অপূরণীয়। ওস্তাদি গানে শুধু বিশেষজ্ঞ বলে নয়, তাঁর মতো লোকসংগীতের রসজ্ঞ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষাগুরুও ছিল বিরল। ঠিক জানি না, তাঁর সংগীতবিষয়ক লেখা পুস্তকাকারে গ্রথিত ও প্রকাশিত হয়েছে কিনা, কিন্তু সে-সব লেখাও তাঁর বক্তব্যে বিশিষ্ট। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সংগীতশাখার তাঁর সভাপতির ভাষণের কথা আমাদের এখনও মনে পড়ে—সংগীতরসিকেরা তাঁর কথা শ্রদ্ধা ও আদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

যে-সব গুণী তাঁর উপদেশে উপকৃত তাঁরাও অনেকে আজ কৃতী; সংগীতবিদ্যারও আজ সমাদর সর্বত্র। আশা করব, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের নাম ও তাঁর দান সঞ্জীবিত থাকবে—বিয়োগেই তা বিলুপ্ত হবে না।

অশোক গুহ

সাহিত্যিক অশোক গুহের বিয়োগ অকালেই ঘটল। আমাদের অনেকের নিকট অপ্রত্যাশিতও সত্য বটে, কিছুকাল যাবৎ তাঁকে তত সুস্থ মনে হয় নি। কিন্তু এত শীঘ্র তিনি বিদায়গ্রহণ করবেন, তা তবু কল্পনাতীত ছিল। আমরা তাঁর সুন্দর সুস্থদেহ, হাস্যমুখ সম্ভাষণ-আলাপে গত বিশ-পঁচিশ বৎসর যাবৎ এতই অভ্যস্ত ছিলাম যে, ভাবতেই পারি নি তাকে হারাতে হতে পারে। অনুবাদ-সাহিত্যেই তিনি প্রথম পদার্পণ করেন, আর সেখানে তাঁর কৃতিত্ব প্রায় তৎক্ষণাৎ পাঠকের চিত্ত হরণ করে, সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের দেশে একটা ধারণা প্রায় প্রচলিত ছিল—সাহিত্যে যাঁর হাত অপটু, অনুবাদ করে তিনি পটুতা অর্জন করতে পারেন। আজ অবশ্য এ-ধারণা বিদূরিত হয়েছে। স্পষ্টই বুঝা গিয়েছে দু'ভাষায় অধিকার থাকা তো চাই-ই, অনুবাদকের চাই সাহিত্যিক অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে আরও অনেক সূক্ষ্মতর চেতনা ও শক্তি ভাষার প্রাচীর পার করে মূলকে ভিন্ন ভাষার, এমনকি ভিন্ন ঐতিহ্যের ও ভিন্ন সামাজিক-মানসিক দৃষ্টির মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়া কঠিন কাজ। অনুবাদ তাই একটা বিশিষ্ট বিদ্যা, ভাষাবিজ্ঞানের এক নতুন শাখা হিসাবে কোনো-কোনো দেশে তা বিশেষ পাঠ্য ও গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশেও অনুবাদের মানকে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন, অশোক গুহ তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান লেখক বলে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালি পাঠকের মনের দিগন্তকে তিনি প্রসারিত করে দিয়েছেন।

মূল সাহিত্যসৃষ্টিতে অশোক গুহ কিছুদিন পূর্বে হস্তার্পণ করেছিলেন। আর তাতে তাঁর শক্তির যথার্থ পরিচয়ও আমরা লাভ করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-ক্ষেত্রে তাঁর দান আর যথেষ্ট হতে পারল না। এই অনুজস্থানীয় সুহৃদের অকাল বিয়োগ তাই আমাদের আরও গভীর বেদনার কারণ হয়ে রইল।

গোপাল হালদার

ধূর্জটিপ্রসাদ প্রসঙ্গ

শারদীয়া 'পরিচয়ে' শ্রীযুত অশোক মিত্রের "অন্ধকারে রাত্রি লেপে যাক" প্রবন্ধের জন্যে ধন্যবাদ। ধূর্জটিপ্রসাদ-প্রসঙ্গে এ রকম আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

শ্রীমিত্র চমৎকার লিখেছেন: "হাওয়া বদলেছে, কালের প্রকৃতি অন্য রকম, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে বাক্যব্যয় তাই অনেকের কাছেই অশোভন, প্রায় প্রতিক্রিয়া লগ্ন কালক্ষেপণ বলে মনে হবে।"...

বিশেষ করে সেই কারণে লেখাটি ভালো লাগলো, যেমন ভালো লেগেছিল কিছু আগে ডঃ শিশির [illegible] রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য" গ্রন্থে ধূর্জটিপ্রসাদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখে।

তাঁর প্রাক্তন ছাত্র এবং অনুরাগীরা 'তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত কতিপয় প্রবন্ধ জড়ো করে' একখানি গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন এটা বাস্তবিক সুসংবাদ।

তা সম্ভব হোক বা না হোক 'পরিচয়ে'র পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু করা যেতে পারে মনে করি। যেহেতু তিনি বিশেষ করে 'পরিচয়ে'র লেখক ছিলেন সে কারণে এ ব্যাপারে 'পরিচয়ে'র কিছুটা দায়িত্বও আছে বোধ হয়। কিছুকাল আগে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মতিথিতে যেমন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছিল, সে রকম ভাবে 'পরিচয়' গোষ্ঠীর আর-একজন অগ্রণী লেখক এবং মনীষী ধূর্জটিপ্রসাদ-সম্পর্কিত রচনাদি সংগ্রহ করে 'পরিচয়ে'র 'ধূর্জটিপ্রসাদ সংখ্যা' প্রকাশ করা যায় কিনা ভেবে দেখতে বলি। এ-ও যদি সম্ভব না হয় অন্তত পক্ষে ধূর্জটিপ্রসাদকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন এবং তাঁর অনুরাগী এঁদের ('পরিচয়' সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে এরকম অনেকে আছেন) দিয়ে লেখানো কিছু প্রবন্ধ-স্মৃতিচিত্র ইত্যাদি প্রকাশ করা যেতে পারে।

কথা উঠতে পারে এ জিনিস তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই হওয়া উচিত ছিল। তা ঠিক। তবু বলা যেতে পারে "দেরী হোক, যায় নি সময়।"

'পরিচয়ে'র একজন সাধারণ পাঠক এবং ধূর্জটিপ্রসাদের সামান্য অনুরাগী হিসাবে এ নিবেদন রাখলাম।

অরুণ [illegible]চৌধুরী
[illegible]

পরিচয়

বর্ষ ৩৫ । সংখ্যা ৫
অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : সুবোধ দাশগুপ্ত

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৩৫ । সংখ্যা ৫

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মোঙ্গোলিয়ার জনগণরাজ্যে

পশ্চিমবাংলা সরকারের একটি দফতর আছে, যার কাজ হল উপজাতি কল্যাণ। বোধ হয় একজন উপমন্ত্রী এর ভার নিয়ে আছেন। হঠাৎ এই বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট (১৯৬২-৬৩) হাতে আসায় দেখলাম যে ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে পশ্চিমবাংলায় 'তপশীলভুক্ত' উপজাতীয়দের সংখ্যা হল বিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার আটশো তিরাশী (২০,৬৩,৮৮৩)। একটা তপশীলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে এদের কেউ নিম্নস্তরের মানুষ ভাববার মতো ধৃষ্টতা রাখবেন না ভরসা করি। এদেরই মধ্যে আছেন নেপালী, যাদের সম্বন্ধে সেদিন দেখলাম ইয়োরোপে একজন নামজাদা বিদ্বান্, হলাণ্ডের য়ুট্রেখট্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোয়াণ্ট লিখেছেন যে অর্থব্যবস্থা প্রায় আদিম হলেও নেপালে শিল্পের কোনো কোনো শাখায় এমন উৎকর্ষ ঘটেছে যে মার্কসবাদী পদ্ধতিতে এই অসংগতির ব্যাখ্যা খুব সহজ হবে না। পশ্চিম বাংলার তপশীলী উপজাতির মধ্যে আরও রয়েছেন সাঁওতাল যার সান্নিধ্যে ভদ্রজনের কপটতায় ক্লান্ত বিদ্যাসাগর শান্তি পেতেন, যার সরল, সত্যসন্ধ তেজস্বিতা সম্ভবত সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে তারাশঙ্করের পরিকল্পিত উপন্যাসে কিছুটা চিত্রিত হবে।

এই বিশলক্ষাধিক উপজাতীয়ের কতটা কল্যাণ আমাদের স্বাধীন ভারতীয় গণরাজ্যে হয়েছে বা হচ্ছে তার হিসাব কষতে বসি নি। এদের কথা মনে হল এজন্য যে সম্প্রতি যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম সুদূর মোঙ্গোলিয়াতে—যে-দেশ সম্বন্ধে আমাদের প্রায় সকলেরই ধারণা খুব অস্পষ্ট, যে দেশের বাসিন্দা সম্পর্কে আমরা অনেকে ভাবি যে তারা হয় লামা নয় যাযাবর জাতীয় লোক, আমাদের দেশের অবহেলিত উপজাতীয়দেরই তারা শামিল,

সভ্যসমাজে প্রায় ধর্তব্যই হয়তো নয়। যারা কিছু ইতিহাসের খোঁজ রাখেন তাদের কাছে অবশ্য এরকম ধারণা হাস্যকর, কিন্তু সাধারণত আমরা ভেবে থাকি মোঙ্গোলিয়া হল একেবারে যাকে বলে পাণ্ডববর্জিত দেশ, বৈচিত্র্যসন্ধানী পর্যটক ছাড়া কারও কাছে সে দেশের তেমন কোনো দাম নেই। নিজের চোখে দেখে এসেছি বলে জোর করে বলতে পারি যে এই দেশ নিয়ে আমরা যারা হলাম অনগ্রসর দুনিয়ার মানুষ তারা বাস্তবিকই গর্ব করতে পারি। এশিয়ায় এই মোঙ্গোলিয়াই প্রথম সোশালিস্ট সমাজব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, আর সেখানকার ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, মানবিক পরিস্থিতিতে তাদের যে কৃতিত্ব তাকে অসাধ্যসাধন বলতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করছি না।

মোঙ্গোলিয়ার আয়তন বিপুল। পনেরো লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এই দেশের অনেক এলাকা অত্যন্ত দুর্গম। দক্ষিণে বিস্তৃত মরুভূমি, যার নাম হল গোবি—কিন্তু অনেকে শুনে আশ্চর্য হবেন এই বিরাট মরুভূমি একেবারে দুরতিক্রম্য নয়, এর স্থানে স্থানে বেশ বসতি আছে আর সেখানকার বাসিন্দারা 'গোবি' বলতে পাগল। বালির মধ্যে সুগন্ধি ঘাস কোনো কোনো এলাকায় জন্মায় যার মায়ায় যেন তারা বাঁধা পড়েছে; তাদের প্রবাদে, কাহিনীতে, জীবনে এই ঘাসের সুরভি মিশে গিয়েছে। আগে শুধু উট আর ঘোড়া নিয়ে মোঙ্গোলরা গোবি মরুভূমি দিয়ে যাতায়াত করত; আজ আরও চলেছে মোটর, কোথাও কোথাও গাড়ির সারি চলে নিয়মিতভাবে, বহুদূর থেকে প্রয়োজনীয় সম্ভার এনে পৌঁছে দেয়।

মোঙ্গোলিয়ার আয়তন হল ব্রিটেনের সাতগুণ—আমাদের দেশের তুলনায় কিছু ছোট হলেও পৃথিবীর বৃহত্তম দেশগুলির মধ্যে তার স্থান। কিন্তু মোঙ্গোলিয়ার লোকসংখ্যা হল তেরো লক্ষের বেশি নয়; রাজধানী উলান বাটর-এ থাকে প্রায় দু' লক্ষ, আর বাকি এগারো লক্ষ সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। সর্বদেশের ধনিক সাহায্যে পুষ্ট, ইহুদীদের রাজ্য ইজরায়েল আয়তনে অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তারও জনসংখ্যা বিশ লক্ষের কিছু উপরে! আর গোড়াতেই তো দেখলাম আমাদের পশ্চিমবাংলার তপশীলভুক্ত উপজাতীয়দেরই সংখ্যা হল মোঙ্গোলিয়ার চেয়ে ঢের বেশি। এত বৃহৎ দেশে অতি অল্পসংখ্যক লোক অসংখ্য বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নতুন সমাজ গড়ছে—সুদীর্ঘ অতীতের বিচিত্র ও বিপর্যয়ী বোঝা তাদের কাঁধ ভেঙে দিতে পারে নি। বহুবিধ বঞ্চনা ও বিড়ম্বনার যে পরম্পরা হল মোঙ্গোলীয় জনগণের

ইতিহাস, তার ভার তাদের পঙ্গু করতে পারে নি। এ দেশ থেকে সেখানে গিয়ে নিজেদের অক্ষমতার কথা ভেবে একটু যেন অস্বস্তি লাগে, অপ্রতিভতার ভাব আসে, মনে হয় বর্তমানে আমাদের নিয়তিই বুঝি এমন যে বলতে হয়—"যত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না"। ক্রমে ব্যর্থতার কুয়াশা অবশ্য কাটে। অসাধ্যসাধন তো কোনও বিশেষ দেশের একচেটিয়া কাণ্ড নয়; আমরাও কি এদেশে প্রকৃত সমসুযোগের জীবন প্রতিষ্ঠার মূল্য দিতে পারব না?

একটু অপ্রত্যাশিতভাবে এবং অকস্মাৎ একদিন আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় দফতর থেকে খবর এল যে মোঙ্গোলিয়ার জনগণতন্ত্রের চল্লিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে-উৎসব হবে, সেখানে সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হয়েছি। এর মানে শুধু উৎসবে উপস্থিত হতে পারা নয়, তারপর যতদিন খুশী সেদেশে থাকারও অনুরোধ রয়েছে। মনে পড়ে গেল কয়েক বৎসর আগেকার কথা। মোঙ্গোলিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত ৎসেদেনবাল (Tsedenbal) যিনি একই সঙ্গে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির (যার পুরো নাম হল মোঙ্গোলিয়ন পীপলস রেভল্যুশনরি পার্টি) সম্পাদক, দিল্লীতে যখন এসেছিলেন, তখন রাষ্ট্রপতি-ভবনে এক ভোজসভার শেষে জওয়াহরলাল নেহরুকে কৌতুক করে বলেছিলাম যে তিনি তো মোঙ্গোলিয়া যাবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিতে যেন ভুল না হয়! অবশ্য তা হবার নয় জেনেই এ কথা বলেছিলাম, তিনিও জানতেন। শেষ পর্যন্ত জওয়াহরলালের মোঙ্গোলিয়া যাওয়া হয় নি। আমার ভাগ্যে যে শিকে ছিঁড়বে কখনও, তা ভাবতে পারি নি। আর সস্ত্রীক এমন দূর যাত্রায় পাড়ি দিতে পারা বড় কম সুযোগ নয়। পরে অবশ্য জেনেছিলাম যে আমাদের মধ্যে অনেকেরই বিদেশে নিমন্ত্রণ পেলে সাহেবসুবোদের দেশে যাওয়ার আগ্রহ বেশি, মোঙ্গোলিয়া তাদের হয়তো তেমন করে টানত না। আমার কিন্তু ঢের বেশি পছন্দ সেই সব দেশে যাওয়া যাদের সঙ্গে অতীত যুগে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গে কিছু পরিচয় তো বহু পূর্বেই ঘটেছে; আজ যদি বলিদ্বীপে যেতে পাই তো কুবেরের রাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিমন্ত্রণও (যা কখনও আসবে না!) ঠেলতে পারি।

১১ জুলাই ছিল উলান্ বাটরে উৎসবের দিন। ব্যক্তিগত কারণে আমাদের পক্ষে তার আগে রওয়ানা হওয়া সম্ভব হয় নি। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে

আমরা মোঙ্গোলিয়া পৌঁছেছিলাম; উৎসবের কোলাহল তখন নীরব, কিন্তু "এবার কথা কানে কানে" বলে মোঙ্গোলিয়া যেন আমাদের কাছে টেনে নিয়েছিল। প্রায় পক্ষকাল মাত্র সেদেশে আমরা কাটিয়েছি, কিন্তু স্বল্প পরিচয়েও গভীর আত্মীয়তা স্থাপিত হতে পারে। ফেরার সময় মনে হয়েছিল যেন আমাদের হৃদয়ের একাংশ সেই দূর দেশে রেখে আসছি।

আজকাল ভারতবাসীর পক্ষে বিদেশ পর্যটন এমনই কঠোর বস্তু যে কোথাও গিয়ে সেদেশের সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক অনুভব করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিদেশী মুদ্রার স্বল্পতা আমাদের আজ এতই নিদারুণ যে সরকারী প্রতিনিধি কিম্বা মুষ্টিমেয় ধনপতি (যাঁরা আইন মেনে কিম্বা না মেনে বিদেশে টাকা আগলে রাখার ব্যবস্থা করেছেন) ভিন্ন কেউই স্বচ্ছন্দচিত্তে বিদেশ বিহার করতে পারেন না। সোশালিস্ট দেশ থেকে নিমন্ত্রণ এলে কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব; একবার সেদেশে গিয়ে পৌছতে পারলে আর বিন্দুমাত্র গণ্ডগোলের আশঙ্কা নেই। 'পশ্চিমী' দেশগুলি থেকে নিমন্ত্রণ এলেও মাঝে মাঝে কিছু কিছু খট্‌কা থাকে। একবার কমন্‌ওয়েল্‌থ পার্লামেণ্টারি কনফারেন্স করতে অষ্ট্রেলিয়া যেতে হয়েছিল, সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন অষ্ট্রেলিয়ান্ সরকার, কিন্তু তারা আগেভাগেই জানিয়ে রেখেছিলেন যে হোটেল বা অন্যত্র বখশিস, কাপড়-চোপড় কাচার খরচ, অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসাদির ব্যবস্থা, ইচ্ছামত আহার বা পানীয় বাবদে ব্যয়, সম্মেলনের নির্দিষ্ট কর্মসূচীর বাইরে কোথাও যাওয়ার বা থাকার খরচ প্রভৃতির দায়িত্ব তাঁরা নিতে পারবেন না। কথাটা অবশ্য খুবই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু সোশালিস্ট দেশের আতিথেয়তা কোনো যুক্তির ধার ধারে না। তাদের নিমন্ত্রণে একবার তাদের দেশে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে অতিথিকে রাজার হালে রাখতে তারা কসুর করবে না। আপনার স্বাস্থ্য দিব্য অটুট থাকলেও তারা বলবে, পরীক্ষা করিয়ে নিতে ক্ষতি কি, মাঝে মাঝে 'চেক্‌-আপ' তো দরকার, ইত্যাদি ইত্যাদি, আর কোথাও কোনো সুবাদে আপনাকে কিছু খরচ না করতে হয় তার ব্যবস্থা করবে। সৌহার্দ্যের এই প্রাচুর্যে মাঝে মাঝে অস্বস্তি পেতে হয় বটে, কিন্তু সোশালিস্ট দেশের এই দরাজ দাক্ষিণ্যকে "জিন্দাবাদ" বলতে ইচ্ছা করে, নতুবা আমাদের মতো নিঃস্বের পক্ষে স্বপ্নপ্রয়াণ বিনা বিদেশ ভ্রমণ সম্ভব হয় না!

মোঙ্গোলিয়া যাবার রাস্তা আমাদের হল—দিল্লী থেকে মস্কো, সেখানে

দেড়দিন একরাত কাটিয়ে উলান্ বাটর যাত্রা। এটাকে বেশ একটু ঘুর পথ বলা চলে—পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে যেতাম কলকাতা থেকে হংকং হয়ে পিকিং, তারপর উলান্ বাটর। কিন্তু বিধি বাম—এই সোজা পথ আমাদের পক্ষে বন্ধ। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, চীনা কর্তৃপক্ষের ক্রিয়াকলাপে শুধু যে আমরাই ক্লিষ্ট এবং চিন্তিত নই, তা লক্ষ করলাম মোঙ্গোলিয়া গিয়ে: কমিউনিস্ট জগতে কয়েক বৎসর ধরে যে-বিতর্ক চলছে, তাতে মোঙ্গোলিয়ার পার্টি চৈনিক চিন্তা অনুসরণ করতে পারে নি, চীন দেশে বহু মোঙ্গোলিয়ানের বাস এবং স্বাধীন মোঙ্গোলিয়া সম্বন্ধে চীন রাষ্ট্রের মতিগতি কখন কি ঝোঁক নেয় সেদিকে মোঙ্গোলিয়াকে সতর্ক থাকতে হয়—তাই মোঙ্গোলিয়া আর চীনের পরস্পর সম্পর্কে আজ উষ্ণতার রীতিমতো অভাব। তবু মোঙ্গোলিয়ার সরকার তুচ্ছ কটুকাটব্য বর্জন করে এমন মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়ে থাকে যা লক্ষ না করে পারা যায় নি। বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলেই বোধ হয় এমন বৈশিষ্ট্য মোঙ্গোলিয়ার আচরণে দেখলাম। অপর দিকে থেকে এরই আর-এক উদাহরণ হল উলান্ বাটরে মোঙ্গোলিয়ান বিজ্ঞান আকাদেমি ভবনের সামনে স্টালিনের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তরমূর্তির অবস্থিতি। সোভিয়েটের সঙ্গে মোঙ্গোলিয়ার একান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; সোভিয়েট সরকারের অটুট, অবারিত সহায়তা বিনা মোঙ্গোলিয়ার বর্তমান সাফল্য সম্ভব হত না; পার্টিগত ভাবে দুই দেশের কমিউনিস্টরা সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু যেহেতু স্টালিনের বহু অপকর্ম নিয়ে কঠোর অথচ প্রয়োজনীয় সমালোচনা হয়েছে, সেহেতু তাঁর সমগ্র ঐতিহাসিক ভূমিকা ভুলে গিয়ে স্টালিনের নাম মুছে দেওয়া আর যত্রতত্র তাঁর প্রতিকৃতি হঠাৎ হটিয়ে দেওয়ার মতো মানসিক হঠকারিতা মোঙ্গোলিয়া দেখায় নি। আরও লক্ষ করলাম যে মহামতি লেনিন সম্বন্ধে অপরিসীম শ্রদ্ধার বহু নিদর্শন সত্ত্বেও কতকটা নামাবলী পরিধানের মতো চারদিকে তাঁর ছবি টাঙানো আর কথা সাজিয়ে রাখার বাড়াবাড়ি সেখানে নেই। আবার মোঙ্গোলিয়ান বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ নেতা সুহে-বাটর (১৮৯৩-১৯২৩) এবং চোইবালসান্ (মৃত্যু ১৯৫২)-এর স্মৃতি জাগরূক রাখার বিবিধ ব্যবস্থা সুচারুভাবে করা হয়েছে। এঁদের সমাধি সৌধ অনেকটা মস্কোর লেনিন-সমাধির ছাঁচে গড়া বটে, কিন্তু স্বকীয় বিপ্লবী কৃতিত্ব সম্বন্ধে মোঙ্গোলিয়ানদের সংগত ও স্বাভাবিক গর্ব প্রকৃত সৌষ্ঠব সহকারেই সেখানে প্রকাশিত দেখলাম।

সকাল পৌনে দশটা নাগাদ দিল্লীর পালাম বন্দর থেকে আকাশ যাত্রা। প্লেন সোজা দৌড় দিল আর এত উঁচু দিয়ে যে গগনভেদী পর্বতের পর পর্বতচূড়া অনেক নীচে পড়ে রইল। "পৃথিবীর মানদণ্ড" বলে কালিদাস হিমালয়কে অভিহিত করেছিলেন, তাকে বলেছিলেন "দেবতাত্মা"—এই হিমালয়েরই শাখা-প্রশাখার অভ্রংলিহ গরিমা অবশ্য মাঝে মাঝে চোখের পরিধির মধ্যে আসছিল। এয়ার ইণ্ডিয়ার এই বিমান চমৎকার চলে কিন্তু যায় যেন বড় দ্রুত আর বড় বেশি উঁচু দিয়ে। মনে পড়ল ১৯৫৪ সালে প্রথম সোভিয়েট যাত্রার কথা—কাবুল থেকে ছোট্ট অথচ গাঁট্টাগোট্টা সোভিয়েট প্লেনে তারমিজ হয়ে তাশখন্দ যাওয়ার সময়। সে-প্লেনে যাত্রীদের আরামের আয়োজন ছিল স্বল্প আর হাজার পনেরো ষোল ফিট উঠলে 'অক্সিজেন' নিতে হত, তবে এই সামান্য তকলীফের খেসারৎ মিলত যখন পামীরের পাহাড়ের গায়ে যেন হাত দিতে পারা যায় মনে হত, যে পাহাড় একেবারে নিছক পাথর, অনেক সম্ভব-অসম্ভব কায়দায় মাথা-চাড়া-দেওয়া পাথর। যাক্, এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে স্বাচ্ছন্দ্য অশেষ, আর আমাদের চালকেরাও অতি সুনিপুণ, কোনও দেশের বৈমানিকের তুলনাতে তাঁরা নিরেশ নন। এই লাইনের প্লেন বড় ব্যস্তসমস্ত, মস্কো হয়ে লণ্ডন হয়ে নিউইয়র্ক পাড়ি দেওয়া এর কাজ—অনেক ওপর থেকে একবার তাশখন্দের দেখা মিলল, আর মস্কো যখন পৌছানো গেল তখন বেলা দেড়টাও বাজে নি, যদিও মস্কোর ঘড়িতে দেড়টা হল আমাদের চারটে।

আগে-দেখা মস্কো বিমান বন্দরের চেহারা বদলেছে—আয়তন বেড়েছে, বন্দোবস্ত সরেশ হয়েছে, দেখতে মনোরম হয়েছে। মস্কো আর সোভিয়েট দেশের অন্যত্র যেখানেই এবার গেলাম, পরিবর্তন দেখলাম—মস্কোর বহু এলাকা তো একেবারে চেনা যায় না, আর যাবেই বা কেমন করে, কারণ সেখানে আনকোরা নতুন সব অঞ্চল বানানো হয়েছে। কাকে যেন বলেছিলাম যে মস্কোয় যখনই আসি দেখি ক্রমাগত অদলবদল চলেছে, তবে দুটো ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন নেই—যেদিকে তাকানো যায় নতুন বসতবাড়ির বা শিল্পালয় গড়ে ওঠার দৃশ্য প্রত্যেকবারই দেখলাম, আর দেখলাম লেনিনের সমাধি-সৌধের সামনে সারাদিন অনবরত প্রকাণ্ড লম্বা 'কিউ', এ-দৃশ্যেরও কোন পরিবর্তন ঘটে নি। যাই হোক মস্কো সম্বন্ধে লিখতে বসি নি, আর আমাদের লক্ষ্যস্থল মোঙ্গোলিয়া তখনও যথেষ্ট দূর। মোঙ্গোলিয়ান দূতাবাস আর

সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের নিতে এসেছিলেন দুজন। তাঁদের কল্যাণে আমাদের কুটোটি পর্যন্ত নাড়তে হল না, কাস্টমস পরীক্ষাতেও হাজির হতে হল না, বিন্দুমাত্র গা না ঘামিয়ে মোটর যোগে শহরে আমরা চললাম, মালপত্র গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। আমরা তখন ছিলাম মোঙ্গোলিয়ান পার্টির অতিথি, আর ফিরতি পথে যখন সোভিয়েটে কিছুদিন ছিলাম তখন আতিথ্য এল সোভিয়েট পার্টির পক্ষ থেকে। তাই এমন নির্ঝঞ্ঝাটে, প্রায় যেন রাষ্ট্রদূতের সুযোগ সুবিধা উপভোগ আমরা করতে পেলাম। আমাদের জীবনযাত্রার ধরনে হিংসে করার মতো বিশেষ কিছু কেউ দেখবেন না, কিন্তু যারা বিদেশ ভ্রমণের ঝামেলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা রাখেন, তারা এ কথা শুনে আমাদের হিংসে করলে আশ্চর্য হব না।

মোঙ্গোলিয়ান আতিথেয়তার আস্বাদ কিছুটা পাওয়া গেল মস্কোয় দেড় দিন কাটাবার সময়, কিন্তু আসল বস্তুর পরিচয় মিলেছিল খাস মোঙ্গোলিয়া পৌঁছবার পর। তবে পৌঁছবার পালাটি খুব সহজ ছিল না; রাত দশটা সাড়ে দশটার সময় মস্কো ছেড়ে পরদিন সকাল দশটা নাগাদ উলান বাটরে হাজির হব ভেবে হিসাব করা গেল যে ঘণ্টা বারোর ব্যাপার। প্লেনে চোখ বুজে, ঘুমিয়ে এবং কিছুটা দেখতে দেখতে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু হরি হরি —আমরা টাইম্-টেবিলে যা দেখছিলাম তা হল 'মস্কো টাইম', অর্থাৎ মস্কোয় যখন সকাল দশটা, তখন উলান্ বাটরে সূর্যদেবের 'রুটিন্'-এর কল্যাণে আরও পাঁচ ঘণ্টা কেটেছে, বিকেল তিনটে অন্তত বেজেছে। ষোল ঘণ্টা প্লেনযাত্রার জন্য তাই তৈরি হতে হল—মস্কো থেকে জগদ্বিখ্যাত ট্রান্সাইবীরিয়ান্ রেলপথে গেলে উলান্ বাটর পৌঁছাতে দিনছয়েক লাগে জেনেও কিছু উল্লাস বোধ করা গেল না। দূরত্বের বিপুল ব্যবধানকে দ্রুতধাবী আকাশযান আজ জয় করেছে, এ-সব চিন্তা দিয়েও ষোলঘণ্টার ভাবনাকে ঢাকা গেল না। মানুষ যে খেতে পেলে বসতে চায় আর বসতে পেলে শুতে চায়, আর কিছুতেই যে তার স্বস্তি নেই, এ খুব ঠিক কথা।

মস্কো থেকে চড়া গেল সোভিয়েট 'টি-ইউ' প্লেনে—বেশ বড়সড়, সব ব্যবস্থা ভালো, আর দুর্ঘটনা নাকি এতে কখনও হয় না। তবে আমরা আসছিলাম এয়ার ইণ্ডিয়ার বোইং-য়ে চড়ার পর, তাই কয়েকটা তফাৎ সহজেই চোখে পড়ল। এয়ার ইণ্ডিয়ার যাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যব্যবস্থা শুধু যে প্রচুর

তা নয়। (সোভিয়েট প্লেনেও প্রায় তেমনই), কিন্তু যাত্রীকে আরামে রাখার অবিরাম আয়োজন লক্ষ না করে উপায় নেই। সেখানে সুবেশিনী সুদর্শনা 'এয়ার-হোস্টেস্'-দের অত্যন্ত ক্লান্তিকর যাত্রীর সামনেও সুরভিত সৌজন্যের লেপটে-রাখা মুখোস না খোলার শিক্ষায় অভ্যস্ত হতে হয়। বিমানে আরোহীরা সাধারণত বিত্তবান্; তাদের কারও কারও চাহিদা এমন যে সাধারণ বুদ্ধিতে তাকে বলা চলে 'আবদার' আর তার জবাবে কিছু পরিমাণে আসতে বাধ্য সেই গুণ যার লোকায়ত নাম হল 'আদিখ্যেতা'। ফলে নানা দেশের সওয়ারী নিয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার (কিম্বা অনুরূপ) আরামপোত যখন বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ছোটে, তখন মাঝে মাঝে এমন খণ্ড দৃশ্য চোখে পড়ে যা সোভিয়েট প্লেনে একেবারে অভাবনীয়। যাত্রীকে নিয়ে বাড়াবাড়ি সেখানে নেই; এমন কি, প্লেন ওঠার পরে আর নামার আগে আসনের সঙ্গে নিজেকে 'বেল্ট্' দিয়ে বেঁধে নিলেন কিনা, তারও তেমন তদারকি নেই। ঘণ্টা বাজিয়ে দরকার হলে 'হোস্টেস'-কে ডাকুন, কিন্তু নিজে থেকে বারবার আপনার স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে বেড়াবার কারও গরজ নেই। দেখবেন হোস্টেস-দের চেহারা আর সাজগোজ মোটামুটি ভালো—একটু যেন মনে হল যে ১৯৫৪ সালের প্রায় কাঠখোট্টা ভাব মোলায়েম হয়ে এসেছে—কিন্তু কেউ যে নিজেকে 'আহামরি' রূপে দেখাতে চাইছেন তার লেশমাত্র চিহ্ন নেই। হয়তো আপনার মনে হবে একটু বেশি আরাম পেলে মন্দ হত না। কিন্তু বিমান-সেবিকাকে দেখে তার চেয়েও মনে পড়ে যাবে—'তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা'! হয়তো বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, আর বলতেই হবে যে সোভিয়েট প্লেনে খাদ্যবস্তুর পরিমাণ হল আমাদের প্রয়োজনের হিসাবে অনেক বেশি প্রচুর—সন্দেহ নেই যে পশ্চিম ইয়োরোপের তুলনায় তারা খায় বেশি। কিন্তু সেখানেও একটু গণ্ডগোল আছে, কারণ শাদা এবং কালো রুটির টুকরোগুলো প্রকাণ্ড আর মাঝে মাঝে সুখাদ্য মাংসখণ্ড এমন যে তাকে চর্বণ করা সহজসাধ্য নয়, অথচ অপরাপর যাত্রীরা স্বচ্ছন্দে আহার করে যাচ্ছে দেখা যাবে। তাই একটুও চোখে লাগল না যখন ইর্কুট্স্ক্ বিমানবন্দরে প্রাতরাশের সময় দেখা গেল যে প্রত্যেকের সামনে রয়েছে। (অন্যান্য খাদ্য ছাড়া) চারটে করে ডিম, আর অনেকেই অবলীলাক্রমে একের পর একটা খোলা ভেঙে তার সদগতি করাচ্ছেন।

উলান্ বাটর যাবার সময় মস্কোতে আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন এক

ইতালিয়ান দম্পতী—স্বামী ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য, পার্লামেণ্টের প্রাক্তন সদস্য। প্রাণোচ্ছল মানুষ, সদাহাস্য মুখ, আর হাবভাব এমন যে ইংরেজের চোখে মনে হবে যেন কামিজের বাজুতে হৃদয়টিকে ঝুলিয়ে রেখেছেন। তুলনায় স্ত্রী খুবই সংযত, আর না হয়েও বেচারীর উপায় নেই, কারণ সর্বদাই স্বামীপ্রবর ভাবে ভঙ্গীতে বাক্যে এবং বিন্দুমাত্র অপ্রতিভতার ধার না ধেরে পত্নীপ্রেম প্রকাশ করছেন। আমাদের গন্তব্যস্থল এক, এবং এদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন আমরা খুবই আনন্দে ছিলাম। সমস্যা ছিল শুধু ভাষা নিয়ে। আমার প্রায়-ভুলে-যাওয়া ফরাসী প্রয়োগ করতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে লাতিনের দুহিতা হলে কি হবে, ফরাসী এবং ইতালিয়ানে তফাৎ অনেক, এবং আমাদের বন্ধুরা ইতালিয়ান ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বোঝেন বা বলেন না। পরে মোঙ্গোলিয়াতে আমাদের দোভাষী জানতেন ইংরেজি, আর তাঁদের দোভাষী জানতেন ইতালিয়ান—মাঝে মাঝে এই ত্রিবিধ মধ্যস্থতায় কথোপকথন চলত। কিন্তু এতে পরস্পর হৃদ্যতার কোনো বাধা ঘটে নি, একবর্ণ বুঝছি না জেনেও ইতালিয়ান বন্ধুটি অনর্গল অঙ্গভঙ্গী সহকারে নানা বিষয়ে বলে চলতেন, আর নিজের 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' দেখে একটু যেন পরাজিত ভেবে বিমর্ষ হতে গিয়ে দেখতাম যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে উভয় বিদেশীর বহুবিষয়ে কথাবার্তা স্বচ্ছন্দেই চলেছে। মনে পড়ে গেল যে আমাদের ঋষিরা শব্দকেই ব্রহ্ম বলেছেন, বাক্যার্থকে কখনও অতবড় সংজ্ঞা দেন নি।

গভীররাত্রে প্লেন থামল সাইবীরিয়ার রাজধানী অম্‌স্কে (Omsk)—তখন ঘনান্ধকার, পরে দিনের আলোয় এই বিস্তীর্ণ শিল্পনগরী আমরা দেখেছিলাম। তারপর বহুদূর পার হয়ে ইর্‌কুট্‌স্ক্ (Irkutsk), সোভিয়েট দূরপ্রাচ্য অঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে প্লেন বদলে চড়লাম তুলনায় ছোট জাহাজে, যার পাইলট এবং হোস্টেস্ মোঙ্গোলিয়ান, যাত্রীদের মধ্যে অনেকেও দেখলাম মোঙ্গোলিয়ান (কিংবা তদনুরূপ কোন জাতিভুক্ত)। সোজা উলান বাটর থেকে প্লেন না বদলে মস্কো যাওয়া যায়—আমরা ফেরার সময় সেভাবে গিয়েছিলাম। অনেক দূর থেকে দেখা গেল বিখ্যাত বৈকাল হ্রদ, বিপুল এর আয়তন আর এর এক প্রান্তে বিরাট এক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। লম্বা পাড়ি দিয়ে তখন আমরা ক্লান্ত, তাই এইসব ব্যাপার নিয়ে খুব বেশি চাঞ্চল্য বোধ করা গেল না। উলান বাটরে পৌঁছতেও তখন আর দেরি নেই।

আমাদের চেনা ডাকোটার মতো এই প্লেন খুব বেশি উঁচু দিয়ে যাচ্ছিল না। সাইবীরিয়ার লম্বা গাছে ভরা জঙ্গলের দৃশ্য ইর্‌কুট্‌স্ক্‌ থেকেই বদলে আসছিল। এবার দেখা গেল এক ধরনের পাহাড়, যা সারির পর সারি বেঁধে মোঙ্গোলিয়ার অধিকাংশ জুড়ে আছে। অনেক দূরে পশ্চিমে আর উত্তরে আছে বরফের পাহাড়, যার চূড়ার বরফ কখনও গলে না, কিন্তু সারা দেশ জুড়ে আছে এমন পাহাড় যাকে মাঝে মাঝে টিলা বললে ভুল হয় না—কিন্তু টিলার পর টিলা আর পাহাড়ের পর পাহাড় চলে গেছে, ঠিক যেন মাটি ভেদ করে ঢেউয়ের পর ঢেউ ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ সে ঢেউয়ে তাণ্ডব নেই, আছে শান্তির হাতছানি। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বলে মোঙ্গলদের একদা খ্যাতি ছিল; চেঙ্গিস খান, কুবলাই খান প্রমুখ সমরনায়কের কৃতিত্ব ইতিহাসে অতুলন। মোঙ্গল ঘোড়সওয়ার আর তীরন্দাজ নিয়ে তারা জগজ্জয়ের অভিযানে নেমেছিলেন। কিন্তু মোঙ্গোলিয়ার নিসর্গ দৃশ্য কঠোর নয়. মনে হয় তার গিরিকান্তার মরু উৎপাদনে কৃপণ হলেও অন্তরের প্রসাদে প্রচুর। উপত্যকা ভিন্ন কোথাও বৃক্ষের আশ্রয় সেদেশে নেই। পাহাড়ের গায়ে তরুলতা অতি বিরল, কিন্তু প্রায় সর্বত্র আছে তৃণ যা আমাদের দুর্বাদলের মতো স্নিগ্ধ ও শ্যামল না হলেও মনোরম। এই তৃণ মোঙ্গোলিয়ার বিপুল পশু সম্পদকে ধারণ করে আছে, আর এই খর্বতৃণাস্তৃত ভূমিস্তূপগুলি সারা দেশকে যেন এক নিতম্বখচিত শোভায় মণ্ডিত করেছে।

ঢেউ খেলানো পাহাড়ের মালা দিয়ে ঘেরা শহর হল উলান বাটর। রাস্তা কেবল ওঠে আর নামে বলে বিমানবন্দর থেকেই স্পষ্ট দেখা গেল শহরের চেহারা। শহর আর শহরতলী মিলে দু লক্ষের বেশি লোক থাকে না সুতরাং বিরাট শহর যে নয় তা বলাবাহুল্য। কিন্তু ইতিহাসের হিসাবে যে দেশকে বেশ কয়েক শতক পিছিয়ে থাকা বলে আমাদের ধারণা তার আধুনিক যুগসম্মত চেহারা সুন্দর লাগল। যখন পৌছলাম তখন সেখানে অপরাহ্ন; পাকা, বাঁধানো রাস্তা, সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত বলে ভিড় বেশি নেই, গাড়ির সংখ্যা কম তবে মালপত্র নিয়ে লরী যাতায়াত করছে প্রায়ই, মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে কেউ যাচ্ছে দেখা গেল, আর শহরের বাইরে মুক্ত প্রান্তরে সারি সারি তাঁবু—এখনও দেশের অর্ধেকেরও বেশি লোক বাস করে তাঁবুতে, গ্রামাঞ্চলে তো তাঁবুতে থাকাই রেওয়াজ যদিও শহরের মতো সেখানেও ক্রমশ পাকা বাড়িতে বাস করার ব্যবস্থা এগিয়ে চলেছে। পাশের মাঠে

তাঁবুর সারি আর দূরে শহরে মধ্যস্থলে আধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত সু-উচ্চ হর্ম্যরাজি, মাঝে মাঝে কারখানার চিমনী, কোথাও বা একটা প্যাগোডা, আর চারদিকে যেন লাইন দেওয়া পাহাড় দেখতে দেখতে সরকারী অতিথি নিবাসে আমরা পৌঁছে গেলাম। সেখানে বন্দোবস্ত একেবারে প্রথম পংক্তির হোটেলের মতো, কোথাও খুঁৎ তো আমরা দেখলাম না। অতীতের বোঝা থেকে আবর্জনার ভাগ দূর করছে বলেই যেন তারা ঐ পুরোনো দেশে নতুন জীবন গড়ে তোলার কাজে সকল চেতনাকে একাগ্র করে আর মনের উদ্দীপনাকে সংহত করে নামতে পেরেছে।

তিব্বতের মালভূমি থেকে প্রশান্ত মহাসাগর আর চীনের বিরাট প্রাচীর থেকে সাইবীরিয়ার গহন অরণ্যের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নানা যাযাবর জাতি উপজাতির বহুকাল হতে বাস। এদেরই মধ্যে ছিল মোঙ্গল আর তুর্ক আর তাদের শাখাপ্রশাখা। মোঙ্গোলিয়া বলতে যে এলাকা বোঝায় তার ইতিহাস অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত জানা যায়। যে দুর্ধর্ষ হূন-এরা আমাদের দেশেও দাপট দেখিয়েছিল আর অ্যাটিলার নায়কত্বে রোমান সাম্রাজ্যের দরজায় হানা দিয়েছিল, তারা মোঙ্গোলিয়ায় রাজত্ব করেছে। তারপর এসেছে তুর্কী আর তাদেরই কুটুম্ব তাতারদের শাসন। খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, ঘরছাড়া মোঙ্গোলদের একত্রিত করে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে কুবলাই খান আর চেঙ্গিস খান-এর মতো মহারথী প্রচণ্ড শক্তি ধারণ করে এশিয়া-ইয়োরোপের সব রাজাবাদশাকে থরহরি কম্পমান করে ছেড়েছিলেন। এখনও পুরোনো কারাকোরম্ শহরে এর অনেক স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। তারপর ১৯১১ সাল পর্যন্ত প্রায় আড়াই শো বৎসর ধরে চীনের মাঞ্চু সম্রাটবংশ মোঙ্গোলিয়াকে পদানত করে রাখে। এটা খুব দুরূহ কাজ ছিল না, কারণ যাযাবর প্রথার সঙ্গে সামন্ততন্ত্র মিশে সেখানে এক উদ্ভট সমাজরূপের উদ্ভব ঘটেছিল, যা বিদেশী শক্তির কাছে পদানত না হয়ে পারে নি। ইতিমধ্যে অনবরত লড়াইয়ে লেগে থাকার অপর পিঠ হিসাবে ভারতবর্ষ থেকে তিব্বত পার হয়ে লামা-মার্কা বৌদ্ধ ধর্মও সেখানে প্রচলিত হয়েছিল। হয় যুদ্ধে (বা আনুষঙ্গিক কর্মে) লিপ্ত হয়ে থাকা নয় সংসার থেকে নিবৃত্তি নিয়ে মঠবাসী ধর্মযাজক হওয়া। এ ছাড়া কোনো বৃত্তি ভদ্র বলে পরিগণিত ছিল না—ইতর জন মেহনৎ করবে, মাঠে খেটে কিংবা লড়াইয়ে মরবে, ধর্মের সান্ত্বনা ছাড়া অন্য কোনো স্বস্তি

তাদের জন্য নয়, এই ছিল ধারণা। ১৯১৯ সালেও দেখা যায় চীন দাবি করছে তথাকথিত বহির্মোঙ্গোলিয়ার উপর কর্তৃত্ব, আর মোঙ্গোলিয়া সে দাবি অস্বীকার করতে থাকলেও সেখানে রাজত্ব করছেন যিনি, তিনি ভগবান্ বুদ্ধের অবতার ("জীবন্ত বুদ্ধ") বলে পরিগণিত। সঙ্গে সঙ্গে দেশের পুরুষ সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি ছিল মঠের সন্ন্যাসী, যারা সম্পূর্ণ পরশ্রমজীবী এবং প্রায় সকলেই অল্লাধিক অশিক্ষিত। এই ধরনের দুরবস্থা থেকে আর কোনোও দেশ এত দ্রুতবেগে কোথাও কোনো কালে এগিয়ে যেতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

মোঙ্গোলিয়ার প্রথম সার্থক বিপ্লব ঘটে ১৯২১ সালে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন তখন ভারতবর্ষের জীবনে জোয়ার এনেছে। কিন্তু মোঙ্গোলিয়ার বিপ্লবের কথা আমরা বিশেষ জানি না, আর কিছু জানলেও তার প্রকৃত মহিমার খোঁজ রাখি না। এই যুগান্তকারী ঘটনার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও আপাতত নেই। শুধু মনে রাখা দরকার—আজকের সোশালিস্ট সমাজ গঠনে ব্যাপৃত মোঙ্গোলিয়াকে বুঝতে হলে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। ১৯১৯ সালের শেষ দিকে চীনের চেষ্টা হল মোঙ্গোলিয়াকে পুরোপুরি হস্তগত করা। আবার সোভিয়েত বিপ্লবে রাশিয়া থেকে উৎখাত আভজাতদের মধ্যে দুঃসাহসী কেউ কেউ মোঙ্গোলিয়াতে আস্তানা গড়তে চাইল, জাপানের সাম্রাজ্যলোলুপ শাসকদের সঙ্গে হাত মিলাল। সেই দুর্দিনে দুই তরুণ নেতা, সুহে-বাটর এবং চোইবালসান একজোট হয়ে জনগণের বিপ্লবী পার্টি নাম দিয়ে সংগঠন খাড়া করলেন—আজও মোঙ্গোলিয়ার কমিউনিস্টরা এই ইতিহাসপূত নাম বহন করছেন। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সোভিয়েটের লালফৌজের কাছ থেকে সহায়তা এল; তখন থেকে আজ পর্যন্ত মোঙ্গোলিয়া আর সোভিয়েটের মৈত্রীবন্ধন অটুট। বুদ্ধের অবতার বলে যিনি জনসমাজে নিজেকে পরিচিত করেছিলেন, তাঁকে 'খান্' উপাধি দিয়ে রাজাসনে বসাতে হয়েছিল, কারণ তখনকার পরিস্থিতিতে প্রাচীনের সঙ্গে যোগসূত্র একেবারে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয় নি, কিন্তু বিপ্লবের পূর্ণ জয় অল্পকালের মধ্যে অবধারিত হয়ে গিয়েছিল।

সুহে-বাটর-এর জীবনাবসান ঘটে ১৯২৩ সালে। বিপ্লবের প্রধান নায়ক বলে তিনি কীর্তিত, যদিও রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি তিনি দেখে যেতে পারেন নি। সামন্তশাসনের শিরদাঁড়া ভাঙার ব্যবস্থা অবশ্য তাঁর জীবদ্দশাতেই আরম্ভ

হয়েছিল। ১৯২৪ সালের নভেম্বরে মোঙ্গোলিয়ার পার্লামেন্টে ("হুরাল") বোদগিয়া খান্-এর মৃত্যুর পর নূতন লোকতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হয়, সোভিয়েটের সহায়তায় মোঙ্গোলিয়া পুঁজিবাদকে পাশ কাটিয়ে সোশালিজমের লক্ষ্যে হাজির হওয়ার উদ্যোগিতায় প্রবৃত্ত হয়। এই সংবিধানেরই চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম উপলক্ষে সেদেশে উৎসবের অনুষ্ঠান হয়েছিল। নির্বিঘ্নে এই চল্লিশ বৎসর যে কাটে নি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মোঙ্গোলিয়ার মানুষ তাদের দিক্‌নির্ণয়ে ভুল করে নি; ১৯৪৫ সাল থেকে সেখানে জনগণতন্ত্র চলছে, সোশালিস্ট সমাজের অভিমুখে সেদেশের অগ্রগতি বহু জটিল সমস্যা সত্ত্বেও অব্যাহত।

নূতন মোঙ্গোলিয়ার সমুজ্জ্বল প্রতীক হল উলান্ বাটর। সেদিন পর্যন্ত যেখানে মধ্যযুগীয় কুয়াসা জমাট হয়ে ছিল, সেখানে আজ নূতন, মুক্ত জীবনের হাওয়া বইছে। হাসপাতাল, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, শিশুসদন, গ্রন্থাগার, সভাগৃহ, বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্র. ছাপাখানা, শিল্পালয়, থিয়েটার—এগুলিই সেখানকার দ্রষ্টব্য। অথচ কিছুকাল আগে পর্যন্ত সেখানে সমাজ ছিল নির্জীব, মানুষ ছিল ঘুমন্ত, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ছিল লামা (বহুক্ষেত্রেই অশিক্ষিত ও অসদাচারী বলে যাদের দুর্নাম) আর মুষ্টিমেয় ধনাঢ্য বাদে বাকি সবাই ছিল ক্রীতদাসের শামিল, পশুপালন ও আদিম কৃষিকর্মের কঠোর, সংকীর্ণ, ঊষর পরিবেশে যারা জীবন যাপন করত। বিশ্বের হিসাবে যারা ছিল মূক, নতশির "ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী" তারাই আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মানুষের যে সত্যের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যা হল "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ," তারই প্রকাশ যেন সেখানে ঘটেছে।

স্বাধীন মোঙ্গোলিয়ার প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসরের জীবনে অসাধারণ অগ্রগতি ঘটেছে। যাযাবর বৃত্তি আর সামন্ততন্ত্রের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ থেকে তারা এখন সোশালিজমের পথে শুধু পা ফেলা নয়, সোশালিস্ট সমাজই গড়ছে। ১৯৪৮ থেকে তারা পরপর কয়েকটা পরিকল্পনা নিয়ে চলছে—শিল্পবিকাশের শতকরা হার ছিল ১৯৪৮-৫২ সালে ১·৪, যা ১৯৫৩-৫৭ সালে বেড়ে দাঁড়াল ১৩, আর ১৯৫৮-৬০ সালে শতকরা ১৭·৯। পঁচিশ বৎসর আগেকার তুলনায় সেখানকার শিল্পোৎপাদন প্রায় দশগুণ বেড়েছে; আর সমগ্র উৎপাদনের

মধ্যে শিল্পের ভাগ এখন প্রায় শতকরা পঞ্চাশ। গ্রামাঞ্চলে সবাই এখন কৃষি সমবায়ে যোগ দিয়েছে; ১৯৫৮ সাল থেকে পতিত জমিতে চাষের আয়োজন হয়েছে বলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন পাঁচগুণ বেড়েছে, খাদ্যশস্য ব্যাপারে মোঙ্গোলিয়া আজ আত্মনির্ভর। সেদেশে ৩৩৭টি বড় কৃষিসমবায় আছে, ৩২টি রাষ্ট্রপরিচালিত খামার, আর কৃষির কলকব্জা তৈরী ও মেরামত এবং পশু কল্যাণের ব্যবস্থার জন্য ৪০টি কেন্দ্র রয়েছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্কুল, ক্লাব, দোকান, সিনেমা, ডাক্তারখানা আর পশুচিকিৎসালয় সংলগ্ন। যেদেশ প্রায় পূর্ণ নিরক্ষর ছিল, সেখানে আজ নিরক্ষরতা একেবারে লোপ পেয়েছে বলা যায়। ১৯৬৪ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল দেড়লক্ষ; তখন সারাদেশের লোকসংখ্যা বোধহয় বারো লক্ষের বেশি ছিল না। উচ্চশিক্ষায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২১ হাজার ছাত্র পড়ছে। শহরে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের জন্য বিনাবেতনে ও বাধ্যতামূলক ভাবে সাত বৎসরের শিক্ষার ব্যবস্থা; গ্রামাঞ্চলে এখনও চারবৎসরের বেশি বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রবর্তন সম্ভব হয় নি। সারাদেশে কুড়িটি ছাপাখানা, চল্লিশটি খবরের কাগজ আর কুড়িটি সাময়িকপত্র রয়েছে। দেশের সর্বত্র বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং প্রয়োজন হলে হাসপাতালে রাখার বন্দোবস্ত আছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল; তিনি একজন পুরোনো বিপ্লবী এবং চিকিৎসক, বললেন দূর-দূরান্তরে যারা বাস করে তাঁদের জন্যও ব্যবস্থা হয়েছে, যদিও এখনও সব অসুবিধা দূর হয় নি।

১৯৬০ সালের হিসাবে জাতীয় আয় সেখানে ছিল মাথাপিছু ২,৫০০ 'তুগরুগ' যা হল ৬০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৩০০০ টাকার কিছু বেশি। শীঘ্রই নাকি এই সংখ্যা প্রায় শতকরা ষাট আরও বাড়বে। কিন্তু থাক এ-ধরনের সংখ্যা হাজির করার দরকার নেই—আমরা কি দেখলাম তারই কিছু বিবরণ দেওয়া যাক।

উলান বাটরে সর্ব অঞ্চলে আমরা গিয়েছি—কোথাও বিলাসিতা দেখি নি, কিন্তু দারিদ্র্যের কটু চিহ্নও চোখে পড়ে নি। তার মানে এ নয় যে শহরের বাইরে কিম্বা গ্রামাঞ্চলে লোকে এখন আর তাঁবুতে কিম্বা দুনিয়ার গরীবের যা হল পেটেণ্ট সেরকম কুটিরে বাস করে না। পায়খানার ব্যবস্থা যে কোনো কোনো জায়গায় আদিম তা-ও দেখেছি, তবে তাতে কিছু আশ্চর্য বোধ করা অন্তত আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতবড় দেশে যাতায়াত ব্যবস্থা এখনও

অনেক উন্নতির অপেক্ষা রাখে, আর লোকসংখ্যা নিতান্ত কম অথচ দেশের আয়তন বিরাট বলে এ-সমস্যার সমাধান কোনোক্রমে সহজ নয়। বিশেষ প্রয়োজনে এরোপ্লেনের বেশ নিয়মিত বন্দোবস্ত রয়েছে, কিন্তু সাবেককালের ঘোড়া চড়ে কেউ কেউ এদিক ওদিক যাচ্ছে দেখা গেলেও মোটর গাড়ি বা বাসেই দূরযাত্রা সারতে হয়। গ্রামাঞ্চলের রাস্তা বলতে বোঝায় পাহাড়ের কোল আর তাই বেয়ে ক্রমাগত ওঠা-নামা করতে করতে এই গাড়িগুলি যেভাবে যায় তাতে প্রথমে অবাক হতে হয়, তারপরে মজা লাগে। কোথায় বসতি তা বোঝা যায় যখন দেখা যায় পালে পালে গরু, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, 'য়াক,' এমন কি উট চরে বেড়াচ্ছে—মোঙ্গোলিয়ার সবচেয়ে বড় সম্পদ হল এই পশুসংখ্যা, পশম হল তাদের সোনা, ঘোড়া তাদের বন্ধু, তাদের সঙ্গী, তাদের কথা ও কাহিনীর এক নায়ক বিশেষ। 'আয়েতানবুলাগ' কৃষিসমবায় ক্ষেত্রে গিয়ে শুনলাম সে এলাকায় বাস করে দু'হাজার লোক, চাষের কাজ কিছু হয় তবে প্রধান সম্পত্তি হল আশীহাজারেরও বেশী গবাদিপশু, যাদের অনেককে দূরবিস্তৃত পাহাড়ী ময়দানে চরে বেড়াতে দেখা গেল। কো-অপারেটিভের কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রথমে অপ্যায়িত করলেন ঘোড়ার দুধ দিয়ে—বিরাট গামলা থেকে বেশবড় চীনামাটির পাত্রে বারবার দুধ ঢেলে দিয়ে অতিথি সৎকার এদের জাতীয় রীতি। আমাদের জিভে এই দুধ একটু বিস্বাদ লাগে, একটু চোলাই করা হয় বলে এই পানীয়ের তারে তেতো আর অম্বল-মেশানো একটা ভাব আছে, কিন্তু অভ্যস্ত হতে পারলে এ-দুধের মতো পুষ্টিকর নাকি কিছু নেই, যক্ষ্মারোগেও এই দুধ বুঝি ঔষধ বিশেষ! যাই হোক, ঘোড়ার দুধ না খেলেও মোঙ্গোলিয়াতে গরু, ছাগল, 'য়াক্' প্রভৃতির দুধ প্রচুর পাওয়া যেত, আমাদের দৈয়ের মতনও জিনিস পেয়েছি। খায় যে তা.া ভালো, তার প্রমাণ পেয়েছি সর্বত্র। রুগ্ন গোছের কেউ বড় একটা চোখে পড়ে নি। স্ত্রীপুরুষ সকলেরই দৈহিক গঠনে দুর্বলতার চিহ্ন নেই, শালপ্রাংশুর সংখ্যা অল্প নয়, আর মেয়েদের চেহারায় দৃঢ়তার সঙ্গে কমনীয়তার মিশ্রণ। সমবায়ের নেতা এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন করলাম; রাশিয়ান কেতায় বারবার 'টোস্ট' চলল কিন্তু এশিয়ার মানুষ হিসাবে আমাদের বিশেষ নৈকট্য অনুভব না করে পারা গেল না। আমার কনুই লেগে খানিকটা ঘোড়ার দুধ টেবিলে পড়ে যাওয়ায় কোথায় আমি অপ্রতিভ বোধ করছি, না তাঁরা বলে উঠলেন যে অতিথির হাতে দুধ পড়ে যাওয়া নাকি

মস্ত একটা সুলক্ষণ! টেবিলে যারা বসেছিলাম তাদের কার ছেলেমেয়ে কটি, এ-খবর সবাইকে জানানো হল (এদিক থেকে রাশিয়ানরাও আমাদেরই মতো)—তারপর তাদের স্কুলবাড়ি আর লাইব্রেরি আর দোকান আর সিনেমাঘর ইত্যাদি দেখিয়ে পরম আত্মীয়ের মতো বিদায় নেওয়া হল।

আমরা কিছুকাল কাটালাম "তেরেলগে" বলে এক বিশ্রামকেন্দ্রে। এটা হল একেবারে গ্রামাঞ্চলে, তবে জায়গাটা ভারি সুন্দর। চারদিকে কিছুটা শিলং অঞ্চলের মতো পাহাড়, তবে ক্রমাগত বাঁকে ভরা, আর যে বাঁকটা একটু চওড়া তা দিয়ে খরস্রোতা নদী বয়ে চলেছে; পাথরে আর নুড়িতে মাঝে মাঝে তার প্রবাহকে আটকাচ্ছে, ঘুরিয়ে দিচ্ছে, আর জল তো কলশব্দ করে চলেইছে। এমনি জায়গায় এই বিশ্রামনিবাস বানানো হয়েছে, যাতে পালা করে দেশের স্ত্রীপুরুষ এখানে এসে স্বাস্থ্য ও মনের স্ফূর্তি সঞ্চয় করতে পারে। আমাদের থাকার বন্দোবস্ত ছিল নিখুঁত। বিদেশ থেকে আমন্ত্রিত আরও কিছু ব্যক্তি সেখানে ছিলেন। অবশ্য অধিকাংশ মোঙ্গোলিয়ানদের বাসব্যবস্থা আমাদের মতো উচ্চস্তরের ছিল না; সকলের জন্য আলদা ঘর এবং সংলগ্ন স্নানগার দেওয়া সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু একই সঙ্গে প্রায় তিনশো লোক সেখানে ছিলাম; খাওয়ার সময়, খেলা বা ব্যায়ামের জায়গায়, বেড়াতে গিয়ে, কিম্বা প্রতি রাত্রে সিনেমা কি নৃত্যগীত কি অন্য কোন প্রমোদব্যবস্থা উপলক্ষে পরস্পরকে লক্ষ করা যেত, মাঝে মাঝে আলাপও হত। তাদের দেখেছি স্বচ্ছন্দ ও প্রফুল্ল, নিজের দেশসম্বন্ধে তাদের গর্ব অনুভব করতে পেরেছি, সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী ভূমিকা সম্বন্ধে তাদের অনেকে বেশ সজাগ। সোভিয়েটের সঙ্গে বহুদিনের মৈত্রী ও সহযোগিতার কল্যাণে রুশভাষা সেখানকার শিক্ষিতেরা প্রায় সকলেই জানে—নানাদিকে জীবনধারায় ইয়োরোপের প্রভাবও তারা অনেকটা গ্রহণ করেছে (এটা বোধহয় বর্তমান যুগের শিল্পবিকাশেরই আনুষঙ্গিক, তা আমরা অনেকে পছন্দ করি বা না করি)! মোঙ্গোলিয়ার সৌভাগ্য যে তার বিড়ম্বিত অতীতেও কখনও নারীজাতি নিছক পুরুষের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয় নি—বোধহয় তাই স্ত্রীপুরুষে ব্যবহারে অস্বস্তি ও জড়তা দেখলাম না। বেশ আনন্দেই আমরা এই বিশ্রাম নিবাসে কদিন কাটিয়েছি, আর লক্ষ করে সুখী হয়েছি যে উঠোনে এবং পাহাড়ের গায়ে স্থাপত্যের অনেক নিদর্শন ছিল যার বিষয়বস্তু ছিল মোঙ্গোলিয়ার পশুসম্পদ কিম্বা শ্রম ও যৌবনের কল্পিত

রূপ, কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়। মোঙ্গোলিয়ার অন্যত্রও লক্ষ করা গেল যে তাদের চিত্রশিল্পীরা প্রধানত স্বদেশের নিসর্গ দৃশ্যকেই রূপায়িত করেছেন।

উলান বাটরে এবং অন্যত্র দেখেছি কারখানার সংলগ্ন শিশুসদন—মা যখন কর্মব্যস্ত, তখন শিশুদের সেখানে রেখে নিশ্চিন্ত। শিশুর হাসির কাছে দুনিয়ার সব সৌন্দর্য-ই তো পরাজিত। সোশালিস্ট দেশগুলির অনেক দোষত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু শিশু-কল্যাণ ব্যাপারে তাদের ঐকান্তিক আগ্রহ মোঙ্গোলিয়াতেও আমাদের মুগ্ধ করেছে—আমাদের মতো গরীব দেশ থেকে যারা যাই, তাদের কাছে এই একবস্তুর জন্যই সোশালিজম মন ভরে দেওয়ার শক্তি রাখে। বারো তেরো লক্ষ যেদেশের জনসংখ্যা, সেখানে এ-ধরনের আয়োজন বড় কম কথা নয়। মেহনতী মানুষ প্রায় সকলেই যে মাঝে মাঝে রাষ্ট্রের খরচে স্বাস্থ্যনিবাস বা বিশ্রামকেন্দ্রে থাকতে পারে, এ তো মোঙ্গোলিয়ার মতো দেশের পক্ষে কম কৃতিত্ব নয়। আমরা কোথায়, একবার তা ভাবলে এই কৃতিত্বের নিরূপণ সম্ভব হতে পারে। আর আমরা কোথায় পড়ে আছি তা বেশ মনে লাগে যখন মোঙ্গোলিয়ার থিয়েটার বা অপেরায় গিয়ে দেখি যে বাস্তবিকই যারা পরিশ্রম করে, সেই স্ত্রীপুরুষ সারাদিন খাটাখাটির পর অন্তর দিয়ে চাইছে এবং পাচ্ছে সেই রস যা কেবল শিল্পের মধুচক্র থেকেই মিলে থাকে।

১৯৩২ সালেও উলান বাটর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯৫, আর বিষয়বিভাগও ছিল অল্প কয়েকটি। আজ সেখানে কয়েক হাজার ছাত্র এবং নানা বিষয়ে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা। বিজ্ঞান আকাদেমির গ্রন্থাগার দেখলাম —বৌদ্ধযুগের পুঁথি, আর ছবি আর মালা ইত্যাদির যে-সংগ্রহ সেখানে, তার সমকক্ষ পৃথিবীতে অল্পই আছে। আমাদের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে গিয়েছেন, আর গিয়েছিলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য স্বর্গত ডক্টর রঘুবীরা যিনি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে মোঙ্গোলিয়ায় অজস্র মূল্যবান জিনিস নিয়ে এসে সরকারী জিম্মায় সেগুলি দেন নি, নিজস্ব গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রেখে দেন। (তৎপুত্র ডক্টর লোকেশচন্দ্র এখন তার জিম্মাদার)। হয়তো দিন আসবে যখন ভারত ও মোঙ্গোলিয়ার সুপ্রাচীন সম্পর্ক সম্বন্ধে সহজে বহু তথ্য আহৃত হবে, বর্তমান যুগে আমাদের মৈত্রী আরও সুগঠিত ও সুষ্ঠু-রূপে দেখা দেবে।

কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত মোঙ্গোলিয়া ইউনাইটেড নেশনসের সভ্যপদ

পায় নি ; অনেক লড়াই করে (সুখের বিষয় ভারত সর্বদা মোঙ্গোলিয়ার পক্ষে থেকেছে) ১৯৫৯ সালে তারা সভ্যপদ পায়। আমরা যখন ছিলাম, তখন উলান বাটরে ইউনাইটেড নেশনের পক্ষ থেকে নারীদের অধিকার সম্বন্ধে এক আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা বসেছিল। যে-হলে সভা বসে, সেটি সুন্দর। আয়োজনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। একই সঙ্গে নানা ভাষায় অনুবাদ নিখুঁতভাবে হল। ভারতবর্ষ থেকে শ্রীমতী লক্ষ্মীমেনন্ সভায় ছিলেন। আর দেখে বড় ভালো লাগল যে সভা পরিচালনা করলেন এক মোঙ্গোলিয়ান মহিলা। শুনলাম তিনি খ্যাতিমতী লেখিকা, বিপ্লবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেছেন বহুদিন। মোঙ্গোলিয়ার ঝলমলে আনুষ্ঠানিক পোশাকে এই সৌম্যদর্শনার প্রসন্ন, আত্মবিশ্বাসদীপ্ত আচরণে যেন স্বদেশের মর্যাদা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

ফেরার সময় যখন নিকট হচ্ছে, তখন একদিন আমাদের বন্ধু, মোঙ্গোলিয়ার প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শাগদরসুরেন (ইনি ভারতে মোঙ্গোলিয়ার প্রথম রাষ্ট্রদূত হয়ে আসেন) তখনও আমরা কোনো বৌদ্ধমঠ দেখি নি জানতে পেরে তার বন্দোবস্ত করে দিলেন। এই মঠগুলিতে আগে মোঙ্গোলিয়ার যুবশক্তির বৃহদংশের জীবন্ত সমাধি ঘটত ; সুতরাং আজকের মোঙ্গোলিয়াতে এদের সম্বন্ধে উৎসাহিত বোধ করার মতো বড় কেউ নেই। উলান বাটরে একটি প্যাগোডা অনেকদিন হল মিউজিয়মে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসীরা নিপীড়িত অবস্থায় থাকেন না, মোঙ্গোলিয়ান বৌদ্ধদের নিজস্ব সংস্থা রয়েছে, শান্তি আন্দোলনের একজন নেতা হলেন প্রধান লামা। তা ছাড়া এর্দজেন্‌ৎসু-র মতো জায়গায় বহু প্রাচীন মঠ সাগ্রহে রক্ষিত অবস্থায় আছে। আমরা গেলাম উলান বাটরেই প্রধান মঠে—দেখলাম সংস্কৃত অক্ষরে প্রবেশপথে লেখা রয়েছে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' (যে-মন্ত্র ছিল ভারতবর্ষ থেকে তিব্বত থেকে মোঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বৌদ্ধ বিশ্বাসীদের ছাড়পত্র বিশেষ), আরও দেখলাম সযত্নরক্ষিত পুঁথি আর মূর্তি আর ছবি আর মণিমাণিক্য। "নমো তস্‌সো ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্ সো" আউড়ে প্রধান পুরোহিতকে পুলকিত করলাম, গৌতম বুদ্ধের কর্মভূমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি বলে সাদরে অভ্যর্থিত হলাম, যথারীতি অশ্বদুগ্ধ পাত্র সামনে এল, বিদায়ের সময় রেশমের ছোট্ট চাদর হাতে পেলাম। আমরা যখন ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, তখন একটা ছোটখাট ভিড় সঙ্গে আসার চেষ্টা করছিল, তবে দেখা গেল

তারা প্রায় সবাই বৃদ্ধ বৃদ্ধা আর সঙ্গে কিছু শিশু। মঠপ্রাঙ্গণে যুবাবয়সী বড় কাউকে দেখা গেল না, যদিও দুই একজন লামা বয়সে তরুণ মনে হল।

প্যাগোডার বৃহত্তম প্রকোষ্ঠে বুদ্ধমূর্তি এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবিধ উপাস্যের প্রতিকৃতির সামনে উপবিষ্ট বহু লামা একত্র মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন, আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেও নিরাসক্তভাবে তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে নিজ কর্তব্য করতে থাকলেন, মাঝে মাঝে শুধু শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদি নয়, শুনলাম তূর্যধ্বনি ও ঢক্কানিনাদ—চারদিক চকিত হয়ে উঠল, বৃদ্ধবৃদ্ধা ভক্তের দল যুক্তকরে দাঁড়ালেন, আমাদের উপস্থিতিতে মনোযোগ বিপথে গেলেও ভক্তিভরে সবাই বুদ্ধমূর্তির দিকে তাকালেন। ধূপের গন্ধে ধূম্রাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠ আমোদিত, অত্যুচ্চগ্রামে হলেও গুরুগম্ভীর মন্ত্রধ্বনিতে পরিবেশ প্রাণবন্ত, আর ভক্তজন মুখে যেন কিসের অব্যক্ত প্রত্যাশা—যুগ যুগ ধরে যে অপার্থিব বিস্ময় সৃষ্টি করতে চেয়েছে ধর্মানুষ্ঠানের মাদকতা, তার অল্পস্পর্শ পেলাম।

মোঙ্গোলিয়ার জনগণরাজ্যে গিয়ে অপর যে বিস্ময় দেখে এসেছি, একান্ত পার্থিব বিস্ময় হলেও কিন্তু তার মোহ কাটাতে পারব না। এ-বিস্ময় সৃষ্টি করেছে সেখানকার মানুষ, তাদের শ্রম, তাদের বিপ্লব, তাদের চারিত্র্য, তাদের দার্ঢ্য, তাদের অদম্যসাহস কর্মযোগ। এ-বিস্ময়ের সঙ্গে অলৌকিক কোনো লীলার সম্পর্ক মাত্র নেই, মন্ত্র মাহাত্ম্যের সম্মোহনজাল থেকে এ মুক্ত। তাই মোঙ্গোলিয়া গিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসও বোধ করেছি। সেদেশের বিপুল ব্যাপ্তিতে উদাসীন, অপ্রগলভ, অক্লিষ্ট, অক্লান্ত স্তব্ধতা একদা ধর্মের ইন্দ্রজালকে আহ্বান করে এনেছিল, আর আজ সেখানেই শোনা গেছে মানুষের জয়গান, যে-মানুষের কাছে জীবনই যথেষ্ট প্রেরণা। আমরাও চলব জীবনের যাত্রাপথে, স্মরণ করব 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর অজর বিধান, 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'—"চলতে চলতে যে শ্রান্ত তার আর শ্রীর অন্ত নেই, হে রোহিত, এই কথাই চিরদিন শুনেছি। যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখা হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলতে চায় না, সে শ্রেষ্ঠজন হলেও ক্রমে নীচ হতে থাকে; অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।"

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

ফুল ফুটুক না ফুটুক

আর্নল্ড ওয়েস্কারের 'Roots' নাটকের
শেষ দৃশ্য অবলম্বনে রচিত একাঙ্ক।

এ নাটকের চরিত্রগুলি ব্যঙ্গচিত্র নয়, এরা জীবন্ত (কল্পনা-অনুসারী), কাজেই এদের ব্যঙ্গচিত্রোপম করে তুললে নাটকের মূল উপজীব্য ক্ষুণ্ণ হবে। এদের জীবনকে নিষ্করুণ ভাবেই আঁকা হয়েছে, কিন্তু এদের সম্পর্কে মনোভাব আর যাই হোক বিতৃষ্ণার নয়। অভিনয়ে কোথাও বিতৃষ্ণা ফুটে ওঠা নাট্যকারের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার নামান্তর মাত্র হবে। আমি এদেরই একজন: শুধুমাত্র আমি এদের নিয়ে, যেমন নিজেকে নিয়ে, বিব্রত এবং চিন্তিত।

—ওয়েস্কারের নাট্যত্রয়ী 'চিকেন স্যুপ উইথ্ বার্লি', 'রুটস্' ও 'আ'য়ম্ টকিং অ্যাবাউট্ জেরুজালেম'-এর শুরুতে অভিনেতা ও প্রযোজকদের কাছে নাট্যকারের নিবেদন।

বীথি মজুমদার ॥ বাইশ বছরের তরুণী, চিন্ময় বসুর বাগদত্তা।
সরমা মজুমদার ॥ বীথির মা।
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ॥ বীথির বাবা।
বাদল মজুমদার ॥ বীথির দাদা।
কৃষ্ণা মজুমদার ॥ বাদলের স্ত্রী।
অলকা বসু ॥ বীথির দিদি।
গোকুল বসু ॥ অলকার স্বামী।

[পর্দা উঠলে দেখা যাবে একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সেই ঘর যে ঘর একই সঙ্গে বসবার, শোবার এবং খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ডানদিকে ভেতরের ঢোকার দরজা। পেছনে বাঁদিকে দরজা দিয়ে ভেতরের ঘরে যাওয়া যায়, ডানদিকে রান্নাঘরের দরজা। একেবারে বাঁদিকে একটা তক্তাপোষ, তাতে বিছানা গোটানো। একটা খবরের কাগজ পড়ে আছে। খাটের তলায় বাসনপত্র, চালের হাঁড়ি, আসন, পুরনো তোরঙ্গ ইত্যাদি। বাঁদিকে খাটের সামনে একটি হাতলভাঙা চেয়ার। ডানদিকে পেছনে একটা মিটসেফ, তার উপর উল্টোরথ জাতীয় পত্রিকা। তার পাশে ছোট্ট টেবিল, টেবিলে 'ওপর' আয়না, চিরুণী, পাউডার ইত্যাদি। ডানদিকে মাঝখানে আলনা-ভর্তি কাপড়-চোপড়, আলনার তলায় জুতো রাখার ব্যবস্থা। ডানদিকে সামনে একটা শস্তা হঠাৎ-কিনে-ফেলা ইজি চেয়ার। এধার ওধার দুটো মোড়া, দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধাই নীতিবাক্য, ক্যালেণ্ডার, পায়ের ছাপ ইত্যাদি ঝুলছে। এর মাঝে বেখাপ্পা একটি আধুনিক চিত্রকলাও স্থান পেয়েছে।

শনিবারের প্রায় বিকেল। পর্দা ওঠার সময় মঞ্চ খালি]

বীথি ॥ (ভেতরের ঘর থেকে) মা! মা! কি করছো এতক্ষণ ধরে?

সরমা ॥ (রান্নাঘর থেকে)···কুচো নিমকিগুলো ভাজছি। প্রায় শেষ হয়ে এল।

বীথি ॥ তাড়াতাড়ি করো। ট্রেন হাওড়ায় চারটেয় পৌঁছয়। ও কিন্তু সাড়ে চারটের মধ্যেই এসে পড়বে।

সরমা ॥ মিছিমিছি চেঁচামেচি করিস নি বাপু, এখনো তিনটেই বাজে নি। (একটা প্লেটে স্তূপীকৃত নিমকি নিয়ে ঢোকেন)···চিন্ময় কুচো নিমকি ভালবাসে বলছিলি না?

বীথি ॥ হ্যাঁ, খুব ভালোবাসে।

সরমা ॥ ভালোবাসলেই ভালো। নয়তো এই এককাঁড়ি নিমকি খাবে কে?···বেছে বেছে আজকেই বৃষ্টি হোলো। ভগবান পোড়ারমুখো বৃষ্টি পাঠানোর আর সময় পেলে না!···

(দূরে স্কুলের ঘণ্টা বাজে)

···ঐ করপোরেশন ইস্কুল ছুটি হোলো।

বীথি ॥ মা, তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে নাও! নয়তো তুমি ঠিক ঐ হলুদ মাখা শাড়ী নিয়েই ওর সামনে বেরোবে।

সরমা ॥ তুই এমন ভাব করছিস যেন লাটসাহেব আসছে আমাদের বাড়িতে। আসবে তো আমাদের হবু জামাই।

(কথা বলতে বলতে বাঁদিকে বেরিয়ে যান)

মঞ্চ কয়েক মুহূর্তের জন্য শূন্য থাকে। ডানদিকের সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পাওয়া যেতে থাকে, তার সঙ্গে টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসে। ডানদিক দিয়ে প্রবেশ করে বাদল এবং কৃষ্ণা। বাদলের পরনে খাকী ট্রাউজার, সাদা সদ্য ধোপভাঙা শার্ট, ঘাড়ে টার্কিশ রুমাল, চকচকে স্যু জুতো। কৃষ্ণার পরনে রঙিন ছাপা শাড়ি, সব মিলিয়ে সুশ্রী চেহারার এক তরুণী।

বাদল ॥ কই, সব কোথায় গেলে? তাড়াতাড়ি এসো—আমার খিদে পেয়েছে।

কৃষ্ণা ॥ কি যা তা বলছো! আজ তো কত বেলায় ভাত খেলে!

বাদল ॥ সে তো দেড়ঘণ্টার ওপর হয়ে গেছে, আমার আবার খিদে পেয়েছে। (চিৎকার করে) কিরে বীথু, যে-মালটিকে দেখতে এলুম সে কোথায়?

বীথি ॥ এখনো আসে নি।

বাদল ॥ আমার যে খিদে পেয়ে গেলো রে! কখন আসবে সে?

বীথি ॥ তোমার তো সবসময় খিদে পায়, দাদা।

বাদল ॥ হ্যাঁরে, সে ছোকরা কি কমিউনিস্ট, নাকি?

বীথি ॥ হ্যাঁ।

বাদল ॥ বাঙাল?

বীথি ॥ হ্যাঁ।

বাদল ॥ (নিজের মনে) সোনায় সোহাগা। মিলেছে ভালো।

কৃষ্ণা ॥ তা, সে করে কি? সবসময়ে কি লালঝাণ্ডা নিয়ে লেকচার দেয়?

বাদল ॥ হ্যাঁরে, তুই এখানে আসার পর থেকে ওর কোনো চিঠি পেয়েছিস?

বীথি ॥ না!

বাদল ॥ কিরকম প্রেম করে বাবা। একমাসে একটা চিঠি লেখে না!

(দেওয়ালে ঝোলানো ছবি দেখতে সুরু করে। একটু দেখেই···)

···বড্ড খটোমটো!

কৃষ্ণা ॥ ওটা কি? গাছ না কি গো?

[বাঁদিক দিয়ে বীথি ঢোকে। পরনে টকটকে লাল শাড়ী, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা]

বাদল ॥ স্বাগতম ভগিনী। হ্যাঁরে, এই ছবিটা তো আগের বারে দেখিনি। কোণে কার নাম লেখা বুঝতে পারছি না।

বীথি ॥ আমি এঁকেছি। চেয়ে বসোনা যেন। দিতে পারবো না।

বাদল ॥ তুই কি ভাবলি আমি এটা নিয়ে যাব। আমার দায় কেঁদেছে। তোমার ঐ খটোমটো ছবির চেয়ে আমার গণেশ মার্কা ক্যালেণ্ডারই ভালো। তা হ্যাঁরে, তুই আবার ছবি আঁকা ধরলি কবে থেকে? আগে তো এসব রোগ ছিল না তোর।

বীথি ॥ চিন্ময়ের কথায় আমি আঁকা শুরু করেছি। ও বলে, 'আঁকো, ছবি আঁকো। লক্ষ লক্ষ মানুষ জানে না তাদের জীবনটা কেমন। ছবিতে তাদের জীবনটা ফুটিয়ে তোলো। আমাদের আশ্বাস দাও জীবনটা সুন্দর।'

বাদল ॥ অ। তা এতো শুধু খানকতক গাছ। মানুষ কই?

বীথি। মানুষের মুখ আঁকতে আমার ভালো লাগে না।

কৃষ্ণা ॥ বেশ শাড়িটা তো তোমার ঠাকুরঝি।

বীথি ॥ এ শাড়িটা চিন্ময় কিনে দিয়েছে গত জন্মদিনে। ও বলে, লাল হোলো বিদ্রোহের রঙ। আমাদের সবাইকে বিদ্রোহ করতে হবে। তুমি অগ্নিশিখা হয়ে আমাদের পথ দেখাবে। তাই এই শাড়ি তোমায় দিলুম।

কৃষ্ণা ॥ সবসময় বক্তৃতা দেয়, তুমি···তোমার ভাল লাগে?

বীথি ॥ কী জানি, শুনতে বেশ লাগে।

বাদল ॥ মজুমদার বংশের বাকি মহাত্মারা কোথায়?

বীথি ॥ বড়দি আর জামাইবাবু এখুনি এসে পড়বে। মেজদিরা বোধহয় শেষ পর্যন্ত আসবে না।

বাদল ॥ কেন গৌরীর কি হয়েছে?

বীথি ॥ আর বোল না! মেজদির সঙ্গে আর কথা বন্ধ!

কৃষ্ণা॥ সেতো তুমি চাকরি করতে যাবার পর থেকেই প্রায় দু বছর হোল—দুজনে ঝগড়া।

বীথি॥ তোমার সঙ্গে মার ঝগড়া হয়েছিল কেন, বৌদি?

বাদল॥ তুই তো জানিস, মা কি ভীষণ একগুঁয়ে।

কৃষ্ণা॥ একদিন আমি এসেছিলুম মার সঙ্গে দেখা করতে। মা বললেন র‍্যাশন অফিস থেকে র‍্যাশন কার্ডগুলো নতুন করিয়ে আনতে। আমি বললুম কয়েকদিন দেরী হবে, বাচ্ছাটার জ্বর? মা ফট করে বলে উঠলেন—'তুমি আসলে কাজটা করে দিতে চাও না।' আমি বললুম, 'আপনি একটু নিজে করে নিন না মা।' মা বল্লেন 'আমার শরীর খারাপ।' আমি দোষের মধ্যে বলেছিলুম—'দেখে তো শরীর খারাপ মনে হচ্ছে না!' ব্যস, সেই থেকে কথা বন্ধ। আজ কি করবেন কি জানি!

বীথি॥ মা কিন্তু একেবারে অন্য কথা বলছে।

বাদল॥ মা সব সময় ঝগড়া করে।

কৃষ্ণা॥ তা মাই-ই বা কি করবেন বল। এই ঘিঞ্জি বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা কাটান। বাবাও সব সময় মার সঙ্গে ঝগড়া করেন।

বীথি॥ সত্যি আমাদের বাড়িটা কি যেন!

বাদল॥ মহাত্মা মজুমদার বংশ।

[অলকা ও গোকুল ডানদিক দিয়ে ঢোকে]

অলকা॥ কিরে, সব কেমন আছিস?

বাদল॥ এই যে মহাত্মা বংশের আরেকজন এলেন।

অলকা॥ মহাত্মা বংশ না পাগল বংশ। হ্যাঁরে বীথু, চিন্ময় আসে নি এখনও?

বাদল॥ না, মাননীয় হবু-জামাই মহাশয়ের জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

অলকা॥ আমার কিন্তু বাপু ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

কৃষ্ণা॥ তোমাদের বাড়ির সব্বাই—খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো কথা বলতে পার না।

বাদল॥ (গোকুলকে)··· গোকুলদা, তোমার সেই গোলাপী ইউনিয়ন তৈরি কতদূর?

অলকা॥ বাদল, কিসের ইউনিয়ন রে?

বাদল ॥ সে কি, গোকুলদা তোকে বলে নি ?

গোকুল ॥ এই বাদল, কি বাজে বকছ ? এখুনি তোমার দিদি আমায় খেয়ে ফেলবে।

বাদল ॥ আরে দিদি সে ভীষণ ব্যাপার…একদিন…বুঝলি আমাদের ক্যান্টিনে আমি, গোকুলদা, সত্যেন, আর নিতাই বসে টিফিন করছি… এমন সময় দেখি জেনারেল ফোরম্যান আর টেলিফোন এক্সচেঞ্জে যে মেয়েটা বসে—দুজনে খুব হাসতে হাসতে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল…গোকুল দা তাই দেখে বলে উঠলো বেড়ে আছে বস, আমাদের এরকম পার্ট টাইম একটা দুটো জোটে না রে ? নিতাই তাই শুনে বলল, আচ্ছা, আমাদের যেমন মাঝে মাঝে এই রকম ইচ্ছে জাগে, অনেক মেয়েরও নিশ্চয় তেমনি মনে হয়। গোকুল দা হঠাৎ বলল, আচ্ছা, এই রকম ছেলে আর মেয়েদের একটা বেশ গোলাপী ইউনিয়ন করলে কেমন হয় বলতো ? ধর, দু দলই একটা করে গোলাপী ব্যাজ লাগাবে যাতে সহজেই বুঝতে পারা যায়, আর একটা কোড তৈরি করতে হবে। যখন দরকার হবে তখন ব্যাজ পরা কোনো মেয়েকে দেখলে গিয়ে জিজ্ঞেস করব, আপনি চায়ে ক চামচ চিনি খান ? যদি বলে 'দু চামচ' তাহলে বুঝতে হবে মেয়েটাও রাজী—'

গোকুল ॥ আঃ কি ঝামেলা করছো ? চেপে যাও না। তোমার দিদি এখুনি—

বাদল ॥ আহা লজ্জা পাচ্ছ কেন, গোকুলদা ? তারপর বুঝলি দিদি, যদি কোনো মেয়ে বলে 'চার চামচ' তাহলে বুঝতে হবে তার অবস্থা খুব খারাপ …কি রকম ?…

[দীর্ঘ বিরতি]

অলকা ॥ যদি কোনো মেয়ে বলে ষোল চামচ চিনি খায় তাহলে তোর গোকুলদা আর পালাবার পথ পাবে না।

বীথি ॥ ছিঃ দিদি, তোমরা এত মোটা রসিকতায় আনন্দ পাও কি করে ?

অলকা ॥ থাক, থাক, তোর বিয়েটা হোক, তখন দেখব।

বীথি ॥ তোমাদের মতো ভোঁতা রসিকতা করলে ও আমাকে ডাইভোর্স করবে।

অলকা ॥ মা কি করছেন রে ?

বীথি ॥ (নিজে ছবি দেখছিল এতক্ষণ)…কাপড় ছাড়ছে।

[বীথির উত্তর শুনে অলকা ভেতরের ঘরে যায়]

কৃষ্ণা ॥ বাবা ?

বীথি ॥ হেড অফিসে গেছে, এ মাসের কমিশনের হিসেব করতে, এখুনি ফিরবে।

কৃষ্ণা ॥ কাল রাতে কি দারুন বৃষ্টি হোল, না ? আর কী ভীষণ ঝড়।

বীথি ॥ চিন্ময় ভীষণ ভালোবাসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানলার পাশে বসে বৃষ্টি দেখবে।

বাদল ॥ রাত জেগে বৃষ্টি দেখে ? ওর যা সব কথা বলিস শুনে কেমন লাগে, বড় অদ্ভুত ছেলে বাপু তোমার ঐ চিন্ময় !

বীথি ॥ একটু পরেই দেখতে পাবে, কেমন ছেলে !

গোকুল ॥ ওর ভাই বোন আছে কোনো ?

বীথি ॥ ভাই নেই ; এক বড় বোন ঝাড়গ্রামে থাকে !

কৃষ্ণা ॥ কেন কলকাতার মেয়ে, ঝাড়গ্রামে যেতে গেল কেন ?

বীথি ॥ ওর স্বামী ঝাড়গ্রামে থাকে, ওখানে সব কাঠের জিনিসপত্র বানায় দুজনে মিলে…ওরা বলে কলকাতায় মানুষ থাকে না…সব যন্ত্র নয় জন্তু।

গোকুল ঠিকই বলেছে, একেবারে আদত্ কথা বলেছে।

[কৃষ্ণচন্দ্র ডানদিক দিয়ে ঢোকেন। শস্তা কাপড়ের শার্ট-প্যান্ট পরনে, হাতে সেলস রিপ্রেজেনটেটিভের ব্যাগ]

বীথি ॥ বাবা এসে গেছে।

বাদল ॥ (বাবা শুনতে না পায় এমন গলায়)…মজুমদার বংশের মধ্যমণি।

কৃষ্ণ ॥ কিরে, তোরা সব এসে গেছিস ?

বীথি ॥ বাবা, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে জামা কাপড় ছেড়ে এস। ও কিন্তু এখুনি এসে পড়বে।

কৃষ্ণ ॥ ঘ্যান ঘ্যান করিসনে বাপু আমার যখন খুশী যাব।

[অলকা ও সরমা বাঁদিক দিয়ে ঢোকে। সরমার বেশ পরিবর্তিত ; ছিমছাম দেখাচ্ছে]

সরমা ॥ (স্বামীকে) বসে রইলে যে ? যাও হাত মুখ ধুয়ে এস চট করে।

কৃষ্ণ॥ নাও ঠ্যালা। কি পেয়েছো বলতো? এ চুপ করে তো ও চ্যাচায়, বলি ব্যাপারটা কি? সে ছোকরা কি নবাব বাহাদুর নাকি?

সরমা॥ ছাখ, তোরা ছাখ তোদের বাবাকে। চিন্ময়ের সব কথা শুনে ও ঘাবড়ে গ্যাছে। ছাখ, ছাখ:

কৃষ্ণ॥ বাজে কথা না বলে আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে। (হঠাৎ চিৎকার করে) নিজের বাড়িতেও কি আমি দুদণ্ড শান্তি পাবো না।

বীথি॥ কি হয়েছে বাবা, তোমার? অফিসে কোনো গণ্ডগোল হয়েছে?

কৃষ্ণ॥ (কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে)···আজ Sales Incharge ডেকে বল্লে 'আপনার শরীর খারাপ যাচ্ছে, আপনি এখন অফিসেই বসুন, Sales-য়ে বেরোতে হবে না আর'। তার মানে পুরো T. A. বাদ···বসে বসে কলম পিষতে হবে, আর মাস শেষে মাইনে দেবে একশ চল্লিশ।

বীথি॥ তুমি অন্য কোনো কোম্পানিতে চলে যাওনা, বাবা।

কৃষ্ণ॥ সব জায়গায় ঐ এক হাল বুড়ো Salesman-দের। কত ধানে কত চাল বুঝবি কেমন করে তোরা।

অলকা॥ (বীথিকে)···ওকি রে, তোর চোখে জল কেন? দেখিস, বাবা ঠিক সামলে নেবে।

সরমা॥ (স্বামীকে)···থাকগে, তুমি এখন হাতমুখ ধুয়ে নাওগে যাও। ওসব কথা পরে ভাবা যাবে। যাহোক করে চলে যাবেই।

কৃষ্ণ॥ (ভেতরে যেতে যেতে)···চিন্ময় ছোকরা সাঁতার জানে তো রে বীথু? সাঁতরে না এলে অন্য উপায়ে আজ আর বাবাজীকে এসে পৌছুতে হচ্ছে না।

[বেরিয়ে যায়]

সরমা॥ (চোখের জল সামলে) হ্যাঁরে, তোরা একবার চা খাবি নাকি এখন? বোস তোরা, আমি জলটা চাপিয়ে দিইগে।

[বাঁদিকে বেরিয়ে যায়]

[গোকুল খাট থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা নিয়ে চোখ বুলোতে থাকে। অলকা ব্যাগ থেকে পানের ডিবে বার করে, পান খাবার উদ্যোগ করতে থাকে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ।]

কৃষ্ণা॥ তোমার বাচ্চা কার কাছে রেখে এসেছ বড়দি?

অলকা ॥ পাশের বাড়ির গিন্নীর কাছে। তোমার মেয়ে কার কাছে রয়েছে?

কৃষ্ণা ॥ মার কাছে। মা আর বাবা কদিন হলো আমাদের ওখানে এসেছে।

গোকুল ॥ বলতো, বাদল, আজ কে জিতবে?

বাদল ॥ কে আবার? মোহনবাগান।

গোকুল ॥ আমারও তাই মনে হয়।

কৃষ্ণা ॥ চিন্ময়ের বোনের ছেলেপুলে আছে?

বীথি ॥ দুটি ছেলে।

গোকুল ॥ যমজ, না, আলগা, আলগা।

বীথি ॥ কি অসভ্যতা হচ্ছে জামাইবাবু।

অলকা ॥ আঃ কি যাতা বকছ।

গোকুল ॥ বারে, আমি কি বললুম।

সরমা ॥ (ঘরে ঢুকতে ঢুকতে)…জল চাপিয়ে দিয়েছি।

বাদল ॥ সেই মামলাটার রায় বেরিয়েছে। যে-ছোকরা বুড়িকে লাঠিপেটা করেছিল, তার ছ'বছর জেল হয়েছে…

সরমা ॥ বেশ হয়েছে। আমি হলে আরো বেশি বছরের মেয়াদ হুকুম করতুম। যত গুণ্ডার আড়ত হয়েছে কলকাতা শহরে। আমি যদি জজ হতুম, দুদিনে এই বদমায়িসি ঠাণ্ডা করে দিতুম।

বীথি ॥ (লাফ দিয়ে উঠে) ঠিক আছে মা, আমরা তোমায় জজ বানালুম। (বর্ষাতি টুপি মার মাথায় পরিয়ে হাতে একটি ছাতা গুঁজে দেয়) …নাও তুমি জজ হোলে। এবার ঠিক মতো বিচার করে তোমার রায় দাও।

সরমা ॥ আমি ওকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেব।

বাদল ॥ বাঃ। মামলাটার আগাগোড়া আগে বুঝিয়ে বলো? কথা নেই বার্তা নেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেই হলো?

সরমা ॥ আমি বলব 'যাও বাছা, ঘানি টানগে এবার'।

বীথি ॥ বাঃ কারণ দেখাও, জেলে যাও তো যে-কেউ বলতে পারে। তুমি তো জজ হতে চাইছিলে, কারণগুলো বলো জজেদের মতো।…কোন ধারায় কোন শাস্তি দিচ্ছ বুঝিয়ে বলো! কি হোলো মা? বলো।

[সবাই মার দিকে ঝুঁকে পড়ে, মা বাক্‌শক্তিরহিত]

সরমা ॥ কেন···আমি···আমি···ওকে···ওঃ আমাকে জ্বালাসনে বাপু।

বীথি ॥ কী হলো? এবার চুপ কেন?

সরমা ॥ চুপ কেন মানে? আমি ছাই কি করে জানব কোর্টে কি বলে? আমি কি জজ সাহেব নাকি?

বীথি ॥ তা হলে ঘরে বসে বসে লোকের বিচার করো কেন? কোনো লোক অন্যায় করলে কখনও তলিয়ে দেখবে না, কথা নেই বার্তা নেই (আঙুল মটকে) 'ওর গর্দান নিয়ে নাও', কখনও ভাবনা চিন্তা করব না, খালি ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা। এই তো বাবার রোজগার কমে গেল—একবারও ভাবার চেষ্টা করেছ এবার কি হবে! এই তো সবাই রয়েছে, সবাই মিলে আলোচনা করতে পারতে তুমি।

সরমা ॥ কোনো দরকার নেই। আমার ব্যাপারে যে সে নাক গলাবে সে আমি হতে দেব না।

বীথি ॥ কিন্তু দাদা, বৌদি, জামাইবাবু, আমি, আমরা কি যে সে? আমরা সবাই একই পরিবারের লোক।

সরমা ॥ হোকগে। আমার ব্যাপারে তোমাদের মাথা ঘামানর দরকার নেই।

বীথি ॥ কিন্তু মা—

সরমা ॥ চুপ কর বীথি। দু দিন বাইরে চাকরি করে তোর বড় বাড় বেড়েছে। এবার এসে থেকে তুই বড় বড় কথা বলছিস।

বীথি ॥ ওঃ মা। তুমি এত একগুঁয়ে মা!

সরমা ॥ তোর মতে না মিললে তো সবাই একগুঁয়ে।

[জামা কাপড় বদলে কৃষ্ণচন্দ্র ঢুকলেন]

কৃষ্ণ ॥ চায়ের কদ্দুর?

সরমা ॥ (লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে যেতে যেতে) দেখেছ! জল চাপিয়ে এসেছি—ভুলেই গেছি একেবারে।

[বেরিয়ে যায়]

অলকা ॥ ভাল কথা, জানিস বীথি, গৌরী একটা ট্রানজিস্টর রেডিও কিনেছে?

বীথি ॥ হাঁ, সেদিন মেজদির বাড়ি গিয়েছিলুম দেখলুম এককোণে পড়ে আছে।

বাদল ॥ অথচ প্রথম যখন কিনল তখন দিনরাত রেডিওর পাশে ঘুরঘুর করতো, আর এখন—

কৃষ্ণা ॥ এখন পড়েই থাকে। মেজ ঠাকুরঝি বলে 'সেই ঘুরে ফিরে একই প্রোগ্রাম, আর ভাল লাগে না'। গোড়ায় গোড়ায় কি কাণ্ডটাই না করতো বাপু, আদিখ্যেতা।

বীথি ॥ আঃ বৌদি, পরচর্চা বন্ধ করো।

কৃষ্ণা ॥ পরচর্চা আবার কোথায় করলাম ঠাকুরঝি? আমি বলছিলুম, রেডিও কোম্পানির প্রোগ্রাম কি বাজে।

বীথি ॥ মোটেই না, তুমি পরচর্চাই করছিলে।

কৃষ্ণা ॥ তা ভাই আমাদের তো আর চিন্ময়বাবুর সঙ্গে আলাপ নেই যে ভালো ভালো কথা পাখি পড়া কোরে শিখিয়ে দেবে আর সব সময় সেগুলো উগরে দেবো।

বীথি ॥ আমি মোটেই সব সময় চিন্ময়ের কথা বলি না। আমি শুধু ওর কাছে যা শুনি তাই বলি।

[সরমা ভেতর থেকে: শুনছ, স্টোভটা কি রকম দপদপ করছে, একটু ঠিক করে দিয়ে যাওনা। কৃষ্ণচন্দ্র 'আঃ জ্বালালে' বলে ভেতরে চলে যান]

বীথি। আচ্ছা শোন, আমি একটা ধাঁধা বলছি তোমাদের, ভেবে বলতো কি হবে উত্তরটা?

গোকুল ॥ তোমার ধাঁধা মানেই তো জ্ঞানের কথা।

বীথি ॥ ওর আসতে তো খানিকটা দেরী আছে, ততক্ষণ এই জ্ঞানের কথা নিয়েই একটু মাথা ঘামাও না। বাসরঘরের জামাইঠকানো ধাঁধা নয়, কী বলব, যাকে বলে একটা নৈতিক সমস্যা…নৈতিক মানে…ভালো মন্দের সমস্যা…তোমরা না কিছুতেই চিন্তা করতে চাও না…শোনো…চারটে কুঁড়েঘর রয়েছে—

বাদল ॥ কী ঘর?

বীথি ॥ কুঁড়েঘর—মাটির দেওয়াল…খড়ের চাল…ছোট ছোট…যাতে মানুষ থাকে সেই কুঁড়েঘর…একটা ছোট নদী, তার একধারে দুটো আর একধারে দুটো কুঁড়েঘর। একদিকের একটাতে থাকে একটি মেয়ে অন্যটায় এক সন্ন্যাসী। অন্যদিকে একটায় শ্যাম আর একটায় যদু।…আর নদী

পারাপার করার এক মাঝি। এবার মন দিয়ে শোন—মেয়েটি শ্যামকে ভালোবাসে কিন্তু শ্যাম মেয়েটিকে ভালোবাসে না। এদিকে যদু মেয়েটিকে ভালোবাসে, কিন্তু মেয়েটি যদুকে ভালোবাসে না।

গোকুল ॥ ইনকিলাব!

বীথি ॥ একদিন মেয়েটি শুনল শ্যাম—মানে যে মেয়েটিকে ভালোবাসত না—সেই শ্যাম বিদেশে চলে যাচ্ছে। তাই শুনে ও ঠিক করলো শ্যামকে গিয়ে শেষবারের মতো বোঝাবে যাতে শ্যাম ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তখন ও কি করলো জানো···ও মাঝিকে গিয়ে বললো পার করে দিতে। মাঝি বললো 'পার করে দিতে পারি, কিন্তু তোমার যা কিছু আছে—সব এপারে ছেড়ে যেতে হবে—শাড়ি, গয়না, সব কিছুই।'

কৃষ্ণা ॥ ওমা মাঝিটা এরকম বললো কেন?

বীথি ॥ কেন বললো সেটা বড় কথা নয়, বললো। তখন মেয়েটি মহা ফাঁপড়ে পড়ে ঠিক করলো সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে উপদেশ চাইবে। সন্ন্যাসীকে সব কথা বলাতে উনি বললেন, 'মা, তুমি নিজে যা ভালো বোঝো তাই করো।'

বাদল ॥ কি কচুপোড়া উপদেশ হলো এটা?

বীথি ॥ আঃ, সে যাই হোক। তিনি এরকম বললেন। তখন মেয়েটা অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করলো সে মাঝির কথাই মেনে নেবে।

গোকুল। মার কৈলাস।

বীথি ॥ আঃ গোকুলদা।

গোকুল ॥ বাঃ তুমি খারাপ খারাপ গল্প শোনাবে সেটা কিছু নয়, আর আমি···কি বললুম···

বীথি ॥ আমি খারাপ খারাপ গল্প করছি না, আমি মেয়েটির প্রবেলমটা বলছি—

বাদল ॥ আচ্ছা গল্প বাবা তোর—

বীথি ॥ থাম না দাদা, শোন। হ্যাঁ তারপর···আমি কোনখানটায় বলছিলুম?···হ্যাঁ, মেয়েটি তো মাঝির কথা মেনে নিল। মাঝিও কোনো বদমায়েসি না করে ওকে পার করে দিল। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে, মেয়েটি ঐ অবস্থায় শ্যামের কাছে গিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে কাকুতি মিনতি করতে লাগল। শ্যামও রাজী হয়ে গেল। মেয়েটি ওর ঘরে রয়ে গেল। কিন্তু ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে মেয়েটি দেখে শ্যাম পালিয়েছে। তখন

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে যত্নর কাছে গিয়ে সব খুলে বলে সাহায্য চাইল। কিন্তু যত্ন সব শুনে মেয়েটিকে দুরদুর করে তাড়িয়ে দিল। তখন মেয়েটি বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, সঙ্গীহীন···মেয়েটি আত্মহত্যা করলো। এবার সবাই বলো, হুট করে বলে দিওনা—ভেবে চিন্তে বলো মেয়েটির দুর্দশার জন্যে কোন লোকটা সবচেয়ে বেশি দায়ী।

[সবাই কিছুক্ষণের জন্যে চিন্তামগ্ন ; বীথির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত]

কৃষ্ণা ॥ আমার মনে হয় মেয়েটা নিজেই দায়ী।

বীথি ॥ কেন ?

কৃষ্ণা ॥ বাঃ, ও ওরকম করে গেল কেন ?

বাদল ॥ নইলে মাঝি যে নিত না।

কৃষ্ণা ॥ না গেলেই পারতো মেয়েটা।

বাদল ॥ বাঃ, ও যে ভালোবাসতো···'

অলকা ॥ কি জানি বাপু, আমি এসব কুটকচালে ধাঁধার উত্তর দিতে পারবো না।

বীথি ॥ গোকুলদা ?

গোকুল ॥ আমাকে জিজ্ঞেস করো না। আমি নিজে কিছু বলি না, পাঁচজনে যা বলে, আমি তাতেই আছি।

কৃষ্ণা ॥ আমাদের চিন্ময়বাবু কি বলেন ?

বীথি ॥ ও বলে, মেয়েটার দায়িত্ব শুধু ওর বিবস্ত্র হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু এছাড়া ওর উপায় ছিলো না, কারণ ও ভালোবাসে। কিন্তু এরপর ও দুটো বাজে লোকের পাল্লায় পড়লো।···একজন ওকে ভালোবাসতো না কিন্তু ওর দুরবস্থার সুযোগ নিল। অপরজন বলতো 'ভালোবাসি,' কিন্তু ওর দুর্দশায় সাহায্য করার মতো জোর ছিল না তার ভালোবাসায়। এই দ্বিতীয় লোকটি যার ভালোবাসায় মেয়েটি বাঁচতে পারতো, সে সরে দাঁড়ানোর জন্যেই মেয়েটির অমন হলো। সুতরাং ওর দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি।

অলকা ॥ চিন্ময় তাহলে সব ব্যাপারে রায় দিয়ে দেয় দেখি।

বীথি ॥ ও বলে, 'পৃথিবীতে এমন কোনো অপরাধ নেই যা আমি ক্ষমা করতে পারি না'।

কৃষ্ণা ॥ আমাদের চিন্ময়বাবু তাহলে সবজান্তা ?

বীথি ॥ 'পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না, কিন্তু

কতকগুলো মৌলিক প্রশ্নে আমাদের নিশ্চিত থাকতে হবে। না হোলে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠবে।'

বাদল ॥ ও কি মনে করে সবাই ওর কথা শুনবে।

বীথি ॥ 'শুনতে হবেই, আমাদের প্রত্যেককে তর্ক করতে হবে, যুক্তি দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে, চিন্তা করতে হবে। না হোলে আমাদের মধ্যে পচন ধরবে আর সেই পচন ছড়িয়ে পড়বে সারা জীবনে'।

অলকা ॥ শোন মেয়ের কথা।

বীথি ॥ (ক্রমেই উত্তেজনা বাড়ছে)…'জীবনের যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর তার আরাধনা করা যদি স্বপ্নবিলাস হয়, তা হলে আমি স্বপ্নবিলাসী। কিন্তু আমি স্বপ্নবিলাসী নই বীথি, আমি বিশ্বাস করি মানুষের সম্মানবোধ, মানুষের মহত্ত্ব, মানুষের সাম্য এবং মানুষের'—

গোকুল ॥ এ যে, সাংঘাতিক কমিউনিস্ট।

বীথি ॥ 'আমি এক মানুষের কবি।'

[বাইরের দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ]

বীথি ॥ (গলায় অদ্ভুত উত্তেজনা) মা, মা, ও এসেছে, ও এসে গেছে।

[বীথি বেরিয়ে যায়। মা ও বাবা ঘরে এসে ঢোকেন]

সরমা ও কৃষ্ণা ॥ কি, এসে গেছে ?

[সবার মুখে প্রতীক্ষার ছাপ]

বীথি ॥ (ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে) কি কাণ্ড দেখ তো। আজ নিজে আসবে আবার চিঠি লিখেছে। মা, তোমার একটা পার্শেল আছে।

কৃষ্ণা ॥ বোধ হয় কাশ্মীরী শাল। আমার প্যাকেটটাও আজ সকালের ডাকে এসেছে।

সরমা ॥ কাশ্মীরী শাল। আমি তো কাউকে পাঠাতে বলি নি।

কৃষ্ণা ॥ বাঃ, আপনিই তো একদিন বললেন, 'বৌমা, দেখ, বিজ্ঞাপন দিয়েছে, সস্তায় কাশ্মীরী শাল, বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থাও করেছে, দাও না অর্ডার পাঠিয়ে।' আমি তো আপনার কথা শুনে দু জায়গায় একখানা করে পাঠানোর কথা লিখে দিলুম, টাকাও পাঠিয়ে দিলুম।

সরমা ॥ সে যা বলেছিলুম, বলেছিলুম, আমি বাপু ও জিনিষ নিচ্ছি নে।

কৃষ্ণা ॥ কিন্তু মা, আমার স্পষ্ট মনে আছে আপনি—

সরমা ॥ আমি নেব না, ব্যস নেব না।

[বীথি চিঠিটা পড়ছে। চিঠির বিষয়বস্তু ওকে বাক্‌শক্তিরহিত করে দিয়েছে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে]

সরমা ॥ কি হলো রে তোর? কই দেখি কি লিখেছে।

[চিঠিটা বীথির হাত থেকে নিয়ে নিরুত্তাপ গলায় ঘোষণাপত্র পড়ার মতো করে পড়তে থাকেন]

…সুচরিতাসু, শেষ পর্যন্ত কিছু করা যাবে না। নতুন সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখার অধিকার আমার নেই। এটুকু স্বীকার করার মতো সৎসাহস অন্তত থাকা উচিত। যদি আমি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হতাম তাহলে হয়তো সব ঠিক করে নেওয়া যেত।

.. কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছো আর পাঁচজন বুদ্ধিজীবীর মতো আমিও দুর্বল, বিকৃত। এই সেদিন অব্দি রাজনীতি করেছি দেশকে সুন্দর করবো বলে। নিজের জীবনকে যে সুন্দর করতে পারে না, সে আবার এই বিরাট দেশের দায়িত্ব নেবে। তোমাকে অনেক সময় অভিযোগ করেছি চিন্তাহীন বলে, একগুঁয়ে বলে, নিশ্চেষ্ট বলে। কিন্তু তোমাকে দোষ দেওয়ার কি অধিকার আমার আছে বলো? তুমি ছুটিতে বাড়ি গেলে, নিজেকে একা পেলাম। ভেবে দেখলাম, তোমাকে যা যা করতে বলেছি আমি নিজে তা করে উঠতে পারি নি। তোমাকে যে জগতের স্বপ্ন দেখিয়েছি, সে জগতে আমার নিজেরই অধিকার নেই। তুমি ছিলে তাই বিশ্বাস করাতুম নিজেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আজ ব্যর্থতার চেহারাটা এত বিরাট হয়ে আমার সামনে দেখা দিয়েছে যে একে অস্বীকার করা যায় না। তাই তোমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলো। আমি আর—

বীথি ॥ (চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে)…চুপ করো, মা।

সরমা ॥ ও, এই তাহলে আসল ব্যাপার?

কৃষ্ণ ॥ কি, চিন্ময় আসছে না?

সরমা ॥ এই তাহলে আসল কথা?

কৃষ্ণ ॥ কি হোলো, ওকি আসছে না?

বীথি ॥ না।

[অস্বস্তিকর নীরবতা]

অলকা ॥ (নরম গলায়)…আশ্চর্য। তুই বুঝিস নি যে এরকম হতে পারে?

[বীথি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ে]

সরমা ॥ তাহলে? আমরা একগুঁয়ে!

অলকা ॥ আঃ, মা। দেখতে পাচ্ছো না বেচারী কাঁদছে?

সরমা ॥ হ্যাঁ সে তো দেখতেই পাচ্ছি। দেখছিই তো সে আসবে না। আর আমি বোকার মতো সারা দুপুর ধরে মিষ্টি করলুম, নিমকি ভাজলুম।

কৃষ্ণা ॥ তোমাদের কি এতো মন কষাকষি হয়েছিলো?

বীথি ॥ (যেন প্রথম আবিষ্কার করলো)…ও সবসময়ে চাইতো, আমি ওকে সাহায্য করি। কিন্তু আমি কক্ষনো করি নি। একবার ও আমাকে টাইপ শিখতে বললো। দু'দিন করে আমি ছেড়ে দিলুম। যেই দেখলুম ভুল হচ্ছে, আর পারলুম না। আমি কিছুতেই নিজের ভুল শোধরাবার জন্য জোর করতে পারি না।

সরমা ॥ এবার তাহলে সব আসল কথা বেরুচ্ছে!

বীথি ॥ ও আমাকে বারবার বলতো, গাছপালার ছবি না এঁকে মানুষ আঁকতে, আমি কিছুতেই মানতুম না।

সরমা ॥ তুই তাহলে কিছুতেই মানতিস না?

অলকা ॥ মা, দোহাই তোমার, চুপ করো।

বীথি ॥ আমাকে কত বই এনে দিত পড়ার জন্যে, কিন্তু আমি কিছুতেই মন দিতে পারতুম না।

বাদল ॥ (বিদ্বেষহীন ভাবে)…আর এত যে আলোচনা হতো তোদের মধ্যে বলছিলি?

বীথি ॥ আমি কক্ষনো আলোচনা করি নি। ও কত বলতো, 'আলোচনা করো, প্রশ্ন করো, বিচার করো'—আমার কি রকম ভালো লাগতো না।

কৃষ্ণা ॥ তাতেই, ও রেগে যেত?

বীথি ॥ আমি যে কোনোদিন ধৈর্য ধরতে শিখি নি।

সরমা ॥ এইবার সব কথা বেরুচ্ছে।

বীথি ॥ আমি কিছুতেই ধৈর্য রাখতে পারতুম না। একদিন ও আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেছিলো, 'একটুও বোঝো না, বোঝার চেষ্টা পর্যন্ত করো না!' ওর চোখে সেদিন কি প্রচণ্ড ভয় দেখেছিলাম।

সরমা ॥ আর ও এতক্ষণ আমাদের বলছিলো!

বীথি ॥ আমি কোনোদিন বুঝি নি ও কী চায়—বোঝার যে দরকার ছিল তাই বুঝি নি কোনোদিন।

কৃষ্ণ॥ আর এসে পর্যন্ত মেয়ে আমাদের জ্ঞান দিচ্ছিল—'প্রশ্ন করো, চিন্তা করো, আলোচনা করো, মেনে নিও না'—কত কথা!

সরমা॥ বেগুন গাছে কি আর আম ফলে? ফলে না।

বীথি॥ (ক্লান্তভাবে) তুমি তাতে গর্ববোধ করছো? ঐখানে বসে তুমি নিশ্চিন্তে মজা দেখছ তোমার মেয়ে তার বাগদত্ত স্বামীকে ধরে রাখতে পারলো না বলে? নিজের দিকে তাকাও, তোমরা সব্বাই, আমি তোমাদের আপনজন···আমাকে তোমরা সাহায্য করতে পারো না? আমি তোমার মেয়ে···আমি হেরে গেছি···আমার সমস্যা কি তোমাদের সমস্যা নয়? আমায় সাহায্য করো···আমায় বলো···কী করবো আমি···ওঃ ভগবান···একটা কিছু বলো তোমরা···(ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে)।

কৃষ্ণ॥ তাহলে, এখন কি করা?

সরমা॥ কী আবার করা বসে বসে চা খাওয়া আর এগুলো গেলা।

অলকা॥ মা তুমি কী? দেখছ ও কাঁদছে।

সরমা॥ কাঁদছে তো আমি কি করবো? আমার কী দোষ? আমি যা পেরেছি করেছি। সারাদুপুর খাবার বানিয়েছি···সে এলে তাকে আমি ছেলের মতোই যত্ন করতুম ··কিন্তু সে এলো না···সারাগুষ্টি এসে বসে রইলো তার রেয়াৎ করবে বলে···সে এলো না···তা আমি কি করবো এখন?

বীথি॥ ওঃ মা···আমি···আমি তোমাকে···তোমাকে ঘেন্না করি··· আমার স্বপ্নের জীবন ভেঙে যাচ্ছে আমারই দোষে···আর তুমি···তুমি আমার মা হয়ে···ওঃ আমি তোমাকে ঘেন্না করি···ঘেন্না করি···ঘেন্না করি···

সরমা॥ [সশব্দে বীথির গালে চড় মারে। এই রূঢ়তায় প্রত্যেকেই অস্বস্তি বোধ করে] ঢের হয়েছে, চুপ কর।

কৃষ্ণ॥ কী হলো? তুমি মেয়েটাকে মারলে কেন?

সরমা॥ চুপ করো তুমি। অনেক সহ্য করেছি আমি। বাড়ি ফিরে অব্দি বলতে লেগেছে আমি এই করি না, আমি সেই করি না···ওর কথার আদ্ধেক আমার মাথায় ঢোকে না, ঢোকার দরকারও নেই···'আমি তোমাদের আপনজন'···বি. এ. পাস করেই ও বাইরে চাকরী নিয়েছে···আমি বুঝি না ও আর আমাদের সঙ্গে থাকতে চায় না? এবার ফিরে অব্দি ওর মাথাভর্তি গজগজ করছে বড়ো বড়ো কথা···সেগুলো আমাদের শোনাচ্ছে···এদিকে ও নিজেই সে সবের মানে বোঝে না···আমাকে যার জন্যে ও কথা শোনায়

ও নিজেই তাই করে…(বীথির মুখের উপর) কী আমি ঠিক বলছি? বল, বলছি না?…তুই যখন আমাকে বলিস একগুঁয়ে, তখন তুই বুঝিস চিন্ময় তোকে বলে একগুঁয়ে…তুই যখন বলিস আমি কিছু বুঝি না, তখন তুই মনে মনে জানিস তুই নিজে কিছু বুঝিস না…যখন তুই বলিস আমি চেষ্টা করি না, প্রশ্ন করি না, তখন তুই ভাবিস না, তুই নিজে কেন চেষ্টা করিস না, প্রশ্ন করিস না। আমাকে দোষ দিচ্ছিস তুই? সবসময় আমার দোষ। আমার কি দোষ ··আজ ক'বছর হোলো তুই আমার কাছে থাকিস?… (নিজের মনে) মনে করে আমি খুব সুখে আছি…শান্তিতে আছি…এই ঘিঞ্জি অন্ধকার বাড়িতে থাকতে আমার ভালো লাগে মনে করিস? ভালো লাগে না…আমার ঘেন্না করে…যদি আমি একা থাকতে পারতুম তাহলে তোদের কারো মুখ দেখতুম না কোনোদিন···কারো না…বেশ তো আমি বোকা…আমি গাধা…আমি চিন্তা করি না এসে পর্যন্ত তো সেই কথাই শোনাচ্ছিস…আমি অক্ষম···আমি কাউকে সাহায্য করতে পারি না…ভালো করে শুনে নে, আমি তোকে সাহায্য করতে পারি না—

বীথি॥ না, মা, তুমি পারো না। আমি জানি তুমি পারো না।

সরমা॥ ওখানে দাঁড়িয়ে লাটসাহেবের নাতনীর মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলো না। বলো…আমাকে উত্তর দাও…আমরা তো চিন্তা করি না…কথা বলতে পারি না…তুমি এবার চিন্তা করো…কথা বলো।

বীথি॥ (গভীর বিষন্নতার সঙ্গে) আমিও পারি না, মা। তুমি ঠিক বলেছো, 'বেগুন গাছে কক্ষনো আম ফলে না'…তুমি ঠিক বলেছো…আমি তোমারই মতো ফাঁকা…চিন্তাহীন…একগুঁয়ে…আমি কথা বলি না, ভাবি না, প্রশ্ন করি না…বাঁচার যন্ত্রগুলো আমার নেই…আমার জীবনে শেকড় নেই… সাজানো গাছের মতো—

বাদল॥ কী নেই?

বীথি॥ শেকড়…যা দিয়ে আমরা মাটি থেকে জীবন খুঁজে পাই…যা দিয়ে আমরা জীবনের রস শুষে নিই·· শেকড় যা আমাদের জীবন দেয়—যা আমাদের বাঁচিয়ে রাখে…যা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি—হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের জীবন সুরু হয়েছে…মানুষ ভাবছে·· পরিশ্রম করছে… আর বেড়ে উঠছে…ক্রমেই জীবনটা আরো বড় হয়ে উঠছে—কিন্তু আমরা সেই বিরাট জীবনটার সঙ্গে আমাদের যোগটা কোথায় ভাবি? ভাবি না—

গোকুল ॥ কী বলছো বীথি, আবোল তাবোল কী বলছো ?

বীথি ॥ কী বলছি আমি ? আমি কি বলছি ? আমি···আমি কথা বলছি···কথা···আমার কথা শোন···আমি বলছি দু'হাজার বছর ধরে মানুষের জীবন গড়ে উঠছে আমরা সে কথা ভুলে গেছি···আমি বলছি···আমরা জানি না আমরা কী—আমরা কোত্থেকে এলাম···এই বড়ো জীবনটা থেকে আমাদের যেন কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে···কাটা ডালের মতো প্রতিমুহূর্তে আমরা শুকিয়ে যাচ্ছি···গাছ যেমন মাটি থেকে রস নেয় তাতেই সে বাঁচে, তেমনি আমরাও জীবন থেকে রস নিলে তবেই আমরা বাঁচি। কিন্তু আমরা জানি না জীবনের সঙ্গে আমাদের কোথায় যোগ···আমরা কেমন করে বাঁচবো তবে ? বল···বল তোমরা···কেমন করে বাঁচবো···বলো, কেমন করে ?

কৃষ্ণা ॥ আমরা তো বাপু সেজন্য কেউ দুঃখ করছি না।

বীথি ॥ তাই তুমি ভাবো···তাই তুমি বিশ্বাস করতে চাও···কিন্তু নিজের দিকে একবারও ভালো করে তাকাও কখনো···এসে পর্যন্ত তুমি এই এক ঘণ্টায় কিছু বলেছ ? কিছু করেছ ? মানে বলার মতো বলা ? করার মতো করা ? এমন কিছু যাতে বোঝা যায় তুমি বেঁচে আছ ? বাঁচার মতো করে বেঁচে আছ ? মেজদির বাড়ি সেদিন গিয়েছিলুম···দুর্ভিক্ষের কথা বললুম···যুদ্ধের কথা বললুম···ও কি বললো জান ? বললো 'কী আর হবে ? বড়জোর না খেতে পেয়ে, নয় তো বোমা খেয়ে মরবো। এই তো !' ও কেন এমন কথা বলে জানো···ও ভয় পায়···ও ভাবতে পারে না·· ও ভাবতে চায় না···তাহলে যে কষ্ট করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে···বড্ড ঝামেলা···আমরা সবাই···সব্বাই জীবনকে ভয় করি আর ঝামেলা বলে এড়িয়ে যাই···আমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ি···সব যেন বিস্বাদ লাগে, বিরক্ত লাগে—

সরমা ॥ গৌরীর বিরক্ত লাগার কী আছে ? কলের গান আছে, আবার একটা রেডিও কিনেছে,···ও যদি বিরক্ত হয়, তবে আমরা তো মরেই গেছি বাপু !

বীথি ॥ হ্যাঁ, আমরা কলের গান বাজাই,···নয়তো রেডিও শুনি···আর নয়তো সিনেমায় যাই—জীবন থেকে পালানোর কী সব সহজ রাস্তা। কিন্তু বাঁচা মানে বই পড়া, আর গান শোনা নয়, বাঁচা মানে প্রশ্ন করা,···শুধু প্রশ্ন করা···আমরা···আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ লোক দেশ জুড়ে রয়েছে—আমরা কখনো বাঁচার জন্য কষ্ট করি না, শুধু পালাই—ঠিক বলছি না আমি ?···

বলো আমি ঠিক বলছি কিনা ?···আমরা লড়াই করতে ভয় পাই, তাই আমরা এত জড়, এত নির্জীব···চিন্ময় বলে, এই আমাদের প্রাপ্য···ও বলে, আমরা যেমন জীবনকে ফাঁকি দিই, জীবনও তেমনি আমাদের ফাঁকি দিচ্ছে—

গোকুল ॥ তাহলে আমরা নির্জীব···আমাদের বাঁচার কোনো মানে নেই !

সরমা ॥ তাহলে আমাদের জীবনের কোনো দাম নেই তুই বলতে চাস ?

বীথি ॥ দাম আছে ? আমাদের জীবনের কোনো মূল্য আছে ?···তুমি বিশ্বাস করো আমাদের জীবনটা বাঁচার মতো জীবন ? আমি করি না··· আমি বিশ্বাস করি না···কেউ করে ? ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া থেকে সব প্রেসিডেণ্ট, প্রাইম মিনিস্টার এসে যখন বলেন, 'ভারতীয় মহান জনতা'— ওঁরা নিজেরা তা বিশ্বাস করেন ভেবেছো ? আমাদের সব লীডার, যাঁরা আমাদের ভোট নিয়ে আমাদের শাসন করেন আর স্তোকবাক্য দেন 'মহান জনতা' বলে সেগুলো কী সত্যি কথা ? ওঁরা জানেন আমাদের বাঁচার চেষ্টাই নেই···আমাদের বাঁচিয়ে কী হবে ? ভালো ভালো শিল্পী, সাহিত্যিক, গাইয়েরা আমাদের দিকে নাক উঁচু করে তাকান···আর ভাবেন 'কাদের জন্য সৃষ্টি করবো, এরা বুঝবেও না···বোঝার চেষ্টাও করবে না···এদের জন্যে কিছু করে কী লাভ ? তারপর সেই সুযোগ নিয়ে কারা আমাদের কাছে আসে জানো ?···আসে আধুনিক গান···অশ্লীল হিন্দী ছবি···বস্তাপচা নীতিবাক্যে ভরা বাংলা ছবি···আসে সস্তা সিনেমার ম্যাগাজিন···রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ ···আসে অশ্লীল ছবির বই···ড্রেন পাইপ। জীবনের সব ভালো জিনিস যাদের কাছে ব্যবসার পুঁজি তারা আসে···তাদের বেসাতি নিয়ে···তারা বলে তোমাদের ভালোমন্দ আমরা বুঝি, এই তোমাদের পছন্দ···পয়সা দাও আর পছন্দসই মাল নাও···আর আমরা—আমরাও বিশ্বাস করি এই তো আমাদের পছন্দ···আমরা পয়সা দিই আর ওদের পছন্দসই জিনিস দিয়ে মন ভরাই···ওরা বলে অশ্লীল গন্ধ চাই, নাও·· লারে লাপ্পা গান চাই, নাও··· ফিল্মস্টার চাই, নাও···সস্তায় পাস করার জন্যে নোটবই চাও, নাও—আর আমরা দু-হাত তুলে ওদের আশীর্বাদ করি আমাদের কষ্ট বাঁচাচ্ছে বলে··· আমাদের বাঁচার কষ্ট বাঁচাচ্ছে বলে দু-হাত বাড়িয়ে ওদের ছকে মাপা জগতটাকে বুকে তুলে নিই···ওঃ, চিন্ময় ঠিকই বলে···আমাদেরই তো দোষ। বাঁচার মাশুল দেবে না···আমরা মরবো না তো কে মরবে ? ঠিকই বলে ও, এই নোংরা জীবনটা আমরাই আঁকড়ে ধরেছি···আমরাই···আমরা···

[হঠাৎ বীথি থেমে যায় যেন নিজের কথা শুনছে। আস্তে আস্তে মুখ প্রচণ্ড আবিষ্কারের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে]

শুনছো তোমরা? তোমরা শুনছো? শুনছো আমার কথা? আমি··· আমি নিজে কথা বলছি। আমি···মা, বড়দি, দাদা, শুনছো তোমরা···আমি আর শেখানো কথা বলছি না···আমি···আমি নিজে কথা বলছি।

সরমা॥ ওঃ বক্‌বক্ করে কানের পোকা বার করে দিলে একেবারে। নে বাপু তোরা চা-টা খেতে শুরু কর···ও দম ফুরোলেই থামবে।

[অন্য সবাই খাওয়ার দিকে মন দেয়। আস্তে আস্তে সবায়ের কথার গুঞ্জনধ্বনি বাড়তে থাকে]

বীথি॥ তোমরা আমার কথা শোন·· কেউ একজন আমার কথা শোন··· চিন্ময়·· শেষ পর্যন্ত কিছু করা যাচ্ছে···আমি···আমি পারছি···আমি নিজে··· আমি একা শুরু করতে পারছি···আমি পারছি···

[পরিবারের সকলের গুঞ্জন ছাপিয়ে বীথির শেষ চিৎকার শোনা গেল। তবু ওরা নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলে চললো। বীথি যাই করুক না কেন ওদের জীবন অপরিবর্তিত বয়ে চলবে। বীথি অবশেষে একা বাঙ্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে—এমন সময়—]

পর্দা

'রুট্‌স্'-এর প্রথম অভিনয় ২৫শে মে, ১৯৫৯। জন্ ডেক্‌স্‌টারের পরিচালনায় কভেণ্টির বেলগ্রেড থিয়েটারে অভিনীত এই নাটকে বীটি ব্রায়াণ্টের ভূমিকায় (রূপান্তরে বীথি) অভিনয় করেছিলেন শ্রীমতী জোন প্লোরাইট্ (স্যর লরেন্স্ ওলিভিয়রের সহধর্মিনী)। 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' প্রথম অভিনীত হয় মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে এ বছর ২৯শে অগস্ট, নান্দীকারের প্রযোজনায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায়।

এই নাটক অভিনয়ের জন্য কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র নান্দীকার গোষ্ঠীকে জানালে ভালো হয়।

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

নাটকের এই শেষ অঙ্কটার পাঠভেদও আছে। সুধীন্দ্রনাথ যখন 'পরিচয়'-এর পত্তন করে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আসর গড়েছেন, বহু গুণীজনের তখন সেখানে সমাগম হতো। অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ ছিলেন তাঁদের অনেকের শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় অধ্যাপক। তাঁদের মুখে শোনা—অধ্যাপক ঘোষের সঙ্গেও সুধীন্দ্রের সেখানে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ছিল। প্রসন্ন মনে অধ্যাপক সুধীন্দ্রকে দেখিয়ে তাঁদের বলেছেন—'বাবু বই ছাড়া আসতেন ক্লাশে।' সুধীন্দ্রও সলজ্জ সম্ভ্রমে অনুযোগ দিতেন—ক্লাশের পাঠ্য বইতে কারও মন বসে? সেই বন্ধুদের ধারণা—ক্লাশের সেই ব্যাপারটারও নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল স্যর আশুতোষের সঙ্গে সুধীন্দ্রের সাক্ষাৎকারের পূর্বেই—অধ্যাপকের সঙ্গেই ছাত্রের সাক্ষাতে। তাঁদের অনুমান—তা ঘটে থাকবে পিতা হীরেন্দ্রনাথের নির্দেশেই। কারণ, ত্রুটিটা নিশ্চয়ই ছাত্রের। আর অধ্যাপকের কাছে ত্রুটি স্বীকার না করা সাহসের কথা নয়, বেয়াদবি। সেদিন শুনলে এ ভাষ্যটা আমাদের তত তৃপ্তি দিত না, বয়সটা তখনো মাত্র একুশ-বাইশ। আজ কিন্তু এই দ্বিতীয় ভাষ্যটা মিথ্যা হলেই লজ্জিত বোধ করব। অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষকেও ক্ষমাশীল উদার বলতে হবে। তবু মানি—সুধীন্দ্রনাথের সেদিনকার সেই ক্লাশ ত্যাগ, সেই 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলার ভঙ্গি, যে-কোনো শ্রেষ্ঠ অভিনেতার কাম্য হোত।

অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের এই অভিনয়-শক্তি তাঁর অতিসচেতন শিল্পি-সত্তারই আরেক দিক। এই শিল্পিসত্তার অনুশীলনই তিনি পড়া ছেড়ে মুখ্য কর্ম বলে গ্রহণ করেন, তাই তাঁর সাহিত্যসাধনা। ছাত্রজীবনের শেষে জানতাম—তিনি কবিতার খাতা ভরাচ্ছেন; কিন্তু তা প্রকাশে কুণ্ঠিত। একদিন শুনলাম তিনি রবীন্দ্রনাথের সকাশে আপনার শক্তির পরীক্ষা দিচ্ছেন—বুঝলাম কবির বিষয়ে যে ঔদাসীন্যের ভাব তিনি দেখাতেন

তা ছিল অভিনয়। কে বলবে তাঁর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শেষ প্রবন্ধটাও তেমনি অভিনয়ের দুর্বুদ্ধি কিনা, না, প্রমত্ততা। একটা কথা, কবির সুপারিশে হঠাৎ তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হল 'প্রবাসীতে' (?) 'কুক্কুট'। শোনা যায়—কবিকে সুধীন্দ্র বলেন, কবিতা যে-কোনো বিষয়ে লেখা যায়। কবির হাতে ছিল বৃহৎ মুর্গী-আঁকা সে-মাসের 'শনিবারের চিঠি'। তিনি বললেন—'তাই নাকি ?' ছবিটা দেখিয়ে বললেন, 'লেখো দেখি এ-বিষয়ে কবিতা।' তারই ফল 'কুক্কুট'। তার শেষ কথা 'বাণী দে, বাণী দে'—রাত্রির অন্ধকারের প্রার্থনাপূরক। এই বোধহয় ছাপার অক্ষরে সুধীন্দ্রের প্রথম প্রকাশ। এ কবিতা ছাপা হলে তার আভিধানিক শব্দ-আড়ম্বরে সকলেই চমকিত হন। 'শনিবারের চিঠি'তে তাই শ্রীযুক্ত জীবনময় রায় তার ব্যঙ্গানুকরণ লিখলেন 'মৎকুন'—তার শেষ কথা 'পানি দে, পানি দে'—মাথা ঠাণ্ডা হোক কবির। উভয় কবিতাই বিস্মৃত; কিন্তু উপভোগ্য সেই স্মৃতি।

সুধীন্দ্র নিজের মতো করে যে-সাধনা করেন তা সামান্য নয়। আমার বিশ্বাস মাইকেল ভিন্ন আর-কোনো বাঙালি কবি এতটা বিশ্ব-সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক ছিলেন না। সে সাধনার শেষে সুধীন্দ্র যখন 'পরিচয়' প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন তার কিছু পূর্বে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হয়। তখন ত্রিশের রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশ টলমল। সুধীন্দ্র কথায়-কথায় বললেন, 'তিনি দেশের ও-উদ্দীপনায় কোনো আগ্রহ বোধ করেন না।' কথাটা কিন্তু অভিনয়মূলক। 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় তার সাক্ষ্য রয়ে গিয়েছে—পৃথিবীর ভাঙা-গড়ায় তিনি যে পক্ষেই যখন থাকুন নিরপেক্ষ বা উদাসীন থাকেন নি। 'পরিচয়'-এরও সেইটা প্রধান গৌরবের কথা। পুরাতন পরিচয়গোষ্ঠীও অবশ্য তার সেই বিশ্ববীক্ষার সাক্ষী। একান্তভাবে সুধীন্দ্র সাহিত্যচর্চাই করেছেন, এমন নয়। সাংবাদিকতা করেছেন, জীবিকার্জনের দায় না থাকলেও ব্যবসায়িক বৃত্তি গ্রহণ করেছেন; সাহিত্য-শক্তির মতোই নিজের বৈষয়িক বুদ্ধি-বিচক্ষণতারও অবহেলা করেন নি। 'পরিচয়'-এর হস্তান্তর ব্যাপারে যাঁরা তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছেন, তাঁরাও তাই মনে করতেন। তাঁর সহপাঠী হলেও সে কথাবার্তায় আমার যোগ ছিল না। ঘটনাক্রমে তার পরে 'পরিচয়' পরিচালনার দায়িত্ব আমার ওপর পড়ে—আজও তা থেকে মুক্ত নই। এ-কথা আমি মানি—

সুধীন্দ্রনাথ যে আদর্শ ও পদ্ধতিতে ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পরিচালনা করেছিলেন তা সত্যই বিশেষ কৃতিত্বসূচক। দেশের শিক্ষিত মানুষেরাও একবাক্যে তা অভিনন্দিত করে। আমরা জেলে ও জেলের বাইরে তা সাগ্রহে তখন পাঠ করতাম। কিন্তু সেখানে—সেই আদর্শে, সেই পদ্ধতিতে—অটল থাকা মাসিক 'পরিচয়'-এর পক্ষে অসম্ভব হয়। কালান্তরের মুখে সুধীন্দ্রনাথও তার হাল ধরতে অক্ষম হয়ে পড়েন। সে অধ্যায়ে 'পরিচয়'-এর রূপান্তরও তাই অনিবার্য ও স্বাভাবিক। তা'ই ঘটে। শুনেছি সুধীন্দ্রনাথ তাতে খুশি ছিলেন না; আর নতুন পরিচালকদের উপরও খুশি হন নি। খুশি আমিও হই নি—কারণ নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সেই প্রথম ত্রৈমাসিক দু-বৎসরের গৌরব 'পরিচয়'-এর আর সুস্থিররূপে আয়ত্ত হল না। সে অকৃতিত্ব প্রথমত আমার মতো তার পরিচালকদের, অবশ্য কারো একার নয়। কিন্তু এ আলোচনা আপাতত অপ্রাসঙ্গিক। সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের বিকাশের পক্ষেই বা কতটা প্রাসঙ্গিক তাঁর ছাত্রজীবনের প্রসঙ্গ? এইটুকু যে, শুধু অভিনয় নয়, আভিজাত্যও সুধীন্দ্রনাথের স্বভাবগত। এই আভিজাত্য বৈষয়িক নয়, সাংস্কৃতিক। এবং সত্যকার অভিজাতের মতোই তিনি সাধারণ্যের থেকে সুদূর, কিন্তু যে-মানুষ আত্মমর্যাদাবান তার নিকট মর্যাদাবান সুহৃদ।

পরবর্তী জীবনে বহু বহু ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয়েছে তখনো মুগ্ধ হয়েছি—তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্যে ও পুরাতন সুহৃদ-সম্মত আচরণে আলোচনায়। সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি আপনার ব্যক্তিত্বের মহিমাকে আপনার কবি-কৃতিত্বের যোগে সুচিরস্থায়ী করেছেন। এখানে সে-বিচারও নিষ্প্রয়োজন—বাঙলা কবিতার আধুনিক ধারা যাঁরা সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাতে ভাবাধিক্যের বদলে মননশীলতার ও ললিত মাধুর্যের বদলে গাঢ় ঘননিবদ্ধ দার্ঢ্যের প্রয়োজন ছিল। তিনি সেদিকে দৃষ্টিও ফিরিয়েছেন। মালার্মে ছিল তাঁর কাব্যাদর্শের পথিকৃৎ—সে ফরাসী পথটা আমি চিনি না—তা বাঙলায় এসে ঠেকেছে কিনা জানি না। তবে বাঙলা সাহিত্যের অপেক্ষা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভারসংকট ছিল সুধীন্দ্রের কাছে অনেক বেশি সত্য। বরং বাঙালি জগৎটা সে পরিমাণে তাঁর আপনার হয় নি, বাঙলা ভাষাও নয়। সহজাত কবি-কৃতিত্বের সঙ্গেই তাই মিশিয়ে আছে কৃত্রিমতা—আভিজাত্যের সঙ্গে অভিনয়।

সুধীন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়েই আরেকজন গুণীলোকের সঙ্গে আমাদের এম-এ ক্লাশে ও ল-ক্লাশে পরিচয় হয়। তিনি স্বর্গীয় অরুণ চন্দ বার-অ্যাট-ল। আমাদের চেয়ে তিনি ক্লাশে ও বয়সে একটু বড়। আমাদের বছরের ছাত্র ছিলেন বোধহয় তাঁর অনুজ অশোক চন্দ। দু ভাই-ই ১৯২১-২২-এ ননকোঅপারেশনে পড়া ছেড়ে ছিলেন। অশোক চন্দ মহাশয় বোধহয় অল্পপরেই বি-এস-সি পরীক্ষা দেন। আর পাশ করে মনোনীত হয়ে ফিন্যান্স সার্ভিসে যোগ দেন। সেখানে তাঁর কৃতিত্ব এখন সর্বত্র বিদিত, রাজনীতিকদেরও একটু চক্ষুশূল। কিন্তু ছাত্র-জীবনে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি তখন। পরিচয় হলো শেষদিকে দ্বিতীয় ছাত্র অরুণ চন্দ মশায়ের সঙ্গে। তিনি তখন ইউনিভার্সিটির অসমাপ্ত পড়াটা আবার শেষ করতে এসেছেন। আলাপী, বুদ্ধিমান, নানা বিষয়ে ওয়াকিবহাল অরুণ চন্দ আমাদের কয়জনার বেশ নিকট সতীর্থ হয়ে যান। পরে তিনি ব্যারিষ্টার হয়ে এসে শিলচরে বসেন, আসাম আইন সভায় তিনি ছিলেন কংগ্রেস দলের নেতা। স্বভাবতই বারবার দণ্ডভোগ ও তাঁর ঘটে। ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বরে যখন তাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হয়েছিল আমি তখন কারামুক্ত—তখনো দেখলাম তিনি সেই মুক্ত-মন হৃদয়বান সতীর্থই আছেন। সমাজে রাষ্ট্রে তিনি তখন বিখ্যাত সুযোগ্য নেতা। দুর্ভাগ্য যে কিছুকাল পরেই তিনি পরলোকগত হন। আসামের রাজনীতিতে একটা প্রয়োজনীয় স্থান তাতে শূন্য থেকে যায়— আর তার ফলটা এখনো দেখতে পাই।

রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে আমাদের সময়কার আমরা অনেকেই পাক খেয়েছি। সাহিত্য ও সংস্কৃতিরই বরং সে তুলনায় আকর্ষণ ছিল কম। তবু যখন এখনকার রাজনীতির ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করি—তখন আমার মানতে হয় বেশিদিন রাজনীতিতে আগ্রহ কেউ বড় দেখাতে পারেন নি। এখন তো সহপাঠীদের মুখ সে সমাজে দেখি না? কি হোলো কার? এ হিসাব-নিকাশের পূর্বে কলেজ জীবনের হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিই।

কলেজী পড়াশুনার উৎসাহ আমি বেশি পাই নি,তা বলেছি। অবশ্য অন্য পড়াশুনায় মন তখন মেতে উঠেছিল—হস্টেলে কলেজে সেদিকে সুবিধাও পেয়ে গিয়েছিলাম। বই সাময়িকপত্রের অভাব সেখানে নেই। দেশে সমাজে জীবনে তখন নকোঅপারেশনের যৌবন জলতরঙ্গ। কার সাধ্য তা রোধ করে? কিন্তু রাজনীতির জোয়ারও বাইরের পড়াশুনায়

বিশেষ বাধা দেয় নি; পাঠ্যবই ও পরীক্ষা সম্বন্ধেই তা আমাকে করেছিল বীতস্পৃহ। আই-এ পরীক্ষায় ভালো ফল হলো না। বি-এতে ননকোঅপারেশনের পুরো ঝড়। ঠিক করেছিলাম, পরীক্ষা দোব না। কাজে নামলাম। কিন্তু বার্দোলীর সিদ্ধান্ত এলো—আন্দোলন পরিত্যক্ত হলো, আমারও কাজ ফুরোল। পরীক্ষার ঠিক একমাস আগে পরীক্ষা দিতে কলকাতা এলাম। ভাবলাম অনার্স দোব না, পাস্-কোর্সে পরীক্ষা দোব। হেদুয়ার বেঞ্চে বসে রবীন্দ্রের সঙ্গে যখন ও বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত স্থির করছি তখন সে আমার পড়াশুনার হিসাব নিলে। দেখলে আমি অনার্সের বইগুলিই বরং কিছু পড়েছি, পাসের বই-ই পড়ি নি। সেই আমাকে অনার্স দিতে প্রবুদ্ধ করলে—বোঝাল, পাসে খারাপ করলেও অনার্সের জোরে তা কাটিয়ে উঠতে পারব। সে একমাস আমি দিনরাত পড়লাম—সত্যই দিন করলাম রাত, আর রাত করলাম দিন। পরীক্ষার কাগজেও কলমটা বেশ তেজে চলল,—পড়ার বোধহয় জোর ছিল না তাই কলমটাই জোর চালাতে হল একমাসের পড়ায় ফার্স্ট ক্লাশ স্বপ্নের অগোচর। একমাত্র দাদা ছাড়া আর সবাই বললেন আমার ভাগ্য। দাদা বললেন, যোগ্যতা। দাদারও ভুল ভাঙল এম. এ'র বেলা। এম.এ আর ল দুই ক্লাশেই আমি যোগ দিয়েছিলাম পড়ার চেয়ে খেলার বেশি আড্ডাতে ও নানা হৈ-চৈতে। দুটো বছর জমে ছিল। রাজনীতি ও সাহিত্যের দুর্বায়ুও ছাড়ে নি একেবারে। ভাগ্যও তাই এবার মোড় ঘুরল। এম.এ পরীক্ষার শেষ তিন মাসে দুটো বাধা এল—বেপরোয়া হৈ চৈ'র জন্য হার্ডিং হস্টেল আমাকে ছাড়তে হলো। শৃঙ্খলা মানি না, গেলাম যে-হোটেলে সেখানে আমার আশেপাশে বিনয় মুখুজ্জের মতো উড়নচণ্ডী বন্ধুদের একটা দুর্বার আড্ডা প্রতিকূল আবহাওয়ায় পড়াশুনা বাধা পেত। অন্যদিকে দুর্বুদ্ধি বশে ল ক্লাশেও দু বেলা পড়ার সুযোগ গ্রহণ করলাম। এর উপর পরীক্ষার চাপ। স্নায়ু ও আয়ুর উপর দুয়ে সবে বড় অত্যাচার হোলো। তারপরে পরীক্ষারও তিন তিনটি মারাত্মক ভুল করলাম। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস ছিল ভালো পড়া। হাতে ঘড়ি ছিল না। তার একার্ধের উত্তর লিখতে বারো আনা সময় কাটিয়ে অন্যার্ধ শেষ করলাম সিকি সময়ে। দুয়ে মিলে মান বাঁচল, কিন্তু হাতে বিশেষ উদ্বৃত্ত রইল না। আরেকদিন প্রশ্নোত্তরে এমন ভুল করলাম যে বেশ ঘাটতি পড়ল। তখনো যে থামলাম না তার কারণ—

পরীক্ষা আমার কাছে দুঃসহ হচ্ছিল। মান বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করলাম প্রবন্ধে। তাতে সত্যই ক্ষতিপূরণ হোতো। কিন্তু কে জানত সে উত্তরের পরীক্ষক যে তিনিই, যিনি সেদিনের প্রসিদ্ধ মার্ক-কৃপণ অধ্যাপক। আমার উত্তরে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে যা দিলেন তাতে ঘাটতি পূরণ হোলো না—বরং আরও একটু বাড়ল। ফলে শিকে ছিঁড়ল না বিশ্ববিদ্যালয়ের।

পরীক্ষা চিরদিনই আসলে ভাগ্য পরীক্ষা, অনিশ্চিত এবং কৃত্রিম একটা কৌশল। তার চেয়েও বিশ্রী কিছু হতে পারে—ক্যানভাসিং এর পরীক্ষা। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে ও বস্তুর অভাবে আমার ক্ষতি তখন হয় নি—কিন্তু বন্ধুদের কারও কারও হয়েছে। তখনকার মতো আমি বিশেষ ব্যাহত বোধ করি নি। পরে কিন্তু আমিও দেখেছি সে আঘাত কর্মমূল পর্যন্ত স্পর্শ করে আছে। আজও চল্লিশ বছর পরে আমি স্বপ্নে দেখি—পরীক্ষার উত্তর লিখছি, সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, আমার লেখা হচ্ছে না। শুধু আমার কেন, এ দুঃস্বপ্ন ঘুমে আরও অনেকেরই বুকে চেপে বসে, যায় নি, শুনেছি। আমার তো এখন বদ্ধমূল ধারণা—আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতিতে কপালের পরীক্ষা আট আনা, উত্তর লেখার কুশলতার পরীক্ষা চার আনা, বাকী চার আনা পড়াশুনার, তার মধ্যে এক আনা বিদ্যাবুদ্ধির। কোনো পরীক্ষা পদ্ধতিই ত্রুটিহীন হবে না, জানি। তাই বলে পরীক্ষা পদ্ধতিটা কি এমন অমানুষিক হতে হবে? অবশ্য পরীক্ষার ফলাফলটা আমাদের দেশে আর্থিক-সামাজিক ক্ষেত্রেও চরম দাম পায় বলেই এ পদ্ধতিটা এদেশে এত অসহনীয় বিভীষিকা।

দ্বিতীয় কোনো বিষয়ে বা বিভাগে এম-এ দিয়ে হারানো দামটা আবার আদায় করবার মতো উৎসাহ আমার আর হলো না। অথচ ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে বইপত্র পড়বার আগ্রহ আমার বরাবর ছিল। সমাজ-বিজ্ঞানেও জিজ্ঞাসা ছিল। ভাষাতত্ত্বের গবেষণায়ও আনন্দ পেয়েছি।

আসল কথাটা সেই 'লাগল না, লাগল না'—কলেজের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার দিকটা আমার মনে লাগল না। রাজনীতির জোয়ার তখন; তাছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ে আমার ঔৎসুক্য। কলেজের সীমানায় পৌঁছতেই জীবন উজান বইতে চায়। পাঠ্য বইএর বাঁধা পাড়ের মধ্যে তা বদ্ধ হলো না। বইবার মত খাত হোস্টেলে ও কলেজে অনুরূপ আয়োজন-অনুষ্ঠানেও কিন্তু দু একটু ছিল। অগিলড়ী হস্টেলের হাতে-লেখা পত্রিকায় কলম চালাবার

জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন সুধাবাবু। বাংলা ছেড়ে ইংরেজিও লিখেছি, নিঃসন্দেহে কাঁচা ও অপাঠ্য। নামকরা এই জন্য যে, লেখার সংকোচ সর্বঘাতী হতে পারে নি। লাইব্রেরির সিনিয়র সুহৃদ আমাকে তার সহকারী করে নিলেন প্রথম বৎসরেই, ক্রমেই সে লাইব্রেরী হলো আমার দায়িত্ব। অর্থাৎ বই বাছাই করা, বই কেনা প্রভৃতির ভার প্রধানত আমার উপর। সে যে কী আনন্দের অধিকার, তা এখন বলে বোঝানো অসম্ভব। যুদ্ধের পরে তখন নতুন বিলিতী বই আসছে। ইংরেজি ফরাসী জর্মান ছাড়া রুশ, নরওয়েজীয় ও সুইডিশ প্রভৃতি কনটিনেন্টাল সাহিত্যের আমদানীর তখনি সাধারণভাবে সূচনা হল। মাসে মাসে নতুন বই আসে, নতুন পৃথিবীর সঙ্গে হয় প্রতিদিন পরিচয়। নতুনের সন্ধানে মন উন্মুখ। আমার পড়ার নেশায়ও নতুন রঙ ধরে। অবশ্য স্কটিশ চার্চজ কলেজে লাইব্রেরির ভাণ্ডার ছিল সমৃদ্ধ। বই পড়বার সুযোগও অবারিত। খোলা তাকেও মেলা বই। পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নেবার ও তাতে মন্তব্য করবার সুবিধাও ছাত্রদের কি কম? তবু কর্তৃপক্ষ হার না মেনে খোলা তাকে বই রাখলেন। ছেলেরাই ক্রমশঃ হার মানল দেখলাম। সে কলেজের বিলিতী পত্র-পত্রিকার সরবরাহও মন্দ নয়। ক্লাশের অবসরে সেই স্ট্যাণ্ড-এ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখনকার অ্যাথিনিয়ম, স্পেকটেটর, স্যাটারডে রিভিয়ু ও টাইম্স্ লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়েছি। একটা কথা থেকে আরেকটা, সেটা থেকে তৃতীয় একটা, এরূপ সূত্র ধরে মন এগিয়ে যেত দূর দূরান্তরে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। আজও মনে পড়ে একদিন ওরূপ একটি সাহিত্যপত্রে জানলাম—ইংল্যাণ্ড ডান্-এর কবিতার নূতন সমাদর। আর একদিন—কোনো-একটি লেখকের অপ্রকাশিত লেখার কথা পড়লাম। তাঁর নাম একেবারে ভুলে গেলাম না তাঁর রীতির অভিনবত্বের জন্য—জেমস জয়েস্। নিত্যকার অপেক্ষাও অভিনবের চমক চোখে বেশি লাগে—বিশেষত সে বয়সে। পৃথিবীজোড়া যুদ্ধান্তের ভাঙা-গড়ার ঝড়, পুরোনোর প্রতি উদ্ধত অনাস্থা ঘোষণা ও নতুনের জন্য অশান্ত আগ্রহ। শুধু সাহিত্যে নয়, রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে সর্বত্র সেই জিজ্ঞাসা তখন প্রচণ্ড। 'সবুজের অভিযান' প্রবল।

কলেজের পড়াটায় মন লাগল না, লাগত তাই এসব পড়ায়। ওই জিজ্ঞাসায়, সবুজের অবুঝপনায়, কর্মোন্মাদনায়, আর কর্মহীনতার অশান্ত দংশনে। তাতেও কলেজের বিদ্যাটার প্রতি আস্থা ক্ষয় হোত। কিন্তু তাই বলে বাঙালির ছেলের

ডিগ্রির মোহ যায় না, লেখাপড়ার লোভও না। জীবনাগ্রহ, জিজ্ঞাসা, উৎসাহ-উদ্দীপনা কলেজের বাইরেও আপনার প্রকাশক্ষেত্র চায়। খুঁজে নেয়, গড়ে তোলে। জাতির দিক থেকে দেখলে রাজনীতির ক্ষেত্রটাই তখন প্রধান ক্ষেত্র। কিন্তু তাতে সকলের উৎসাহ থাকে না, কারোই প্রায় সর্বক্ষণ থাকত না। আমাদের বন্ধুমণ্ডলী আবার রাজনীতির বাইরেই আপনাদের প্রাণস্রোতের আবেগে ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত। সেই প্রাণাবেগের নিয়মেই আমরা আবিষ্কার করলাম আমাদের প্রকাশ পথ—ছুটির দিনের আমাদের শহর-মাতানো হাসি হুল্লোড়, বেপরোয়া আলাপ-আলোচনা-আড্ডা, দুরন্ত কোলাহল, কলরব, ছুটোছুটি লুটোপুটি, খেলাধুলা—সবে মিলে যৌবনের অভিযান দানা বেঁধে উঠল, জন্মাল সেই নোয়াখালি শহরের একটা আয়োজনে। জন্মাল একটা প্রতিষ্ঠান। 'সবুজসঙ্ঘ' নোয়াখালির জীবনে একটা বিস্ময়—তার আদিও নেই অন্তও নেই। মনে হয়, বাঙলা দেশের জীবনে ও ইতিহাসের তা একটা পদচিহ্ন—'সবুজের অভিযান'। জরাজীর্ণ দেশে অবশেষে সত্যই হয়তো কবির ও কর্মীর আহ্বানে ও অনুপ্রেরণায় দেখা দিচ্ছিল যৌবনের আবির্ভাব।

পাবলো নেরুদার নতুন কবিতা

অসম্ভব ভুলে থাকা

(সোনাটা)

যদি প্রশ্ন করো আমি কোথায় ছিলাম
শুধু বলতে পারি 'কিছু ঘটেছিল' এই।
বলতে হবে ঝঞ্ঝাকৃষ্ণ পৃথিবীর কথা
কেবল বাঁচার দায়ে আত্মক্ষয়া নদীটির কথা
শুধু জানি পাখিদের পরিত্যক্ত জঞ্জাল, এবং
আমাদের ঢের পিছে রেখে আসা সমুদ্র, বা
অশ্রুমতি বোন।

এত কেন বিভিন্ন আদল মুখে, কেন এক দিন
অন্য দিনে মিশে যায়? কেন কালো রাত
মুখের উপরে ঘন হয়ে বসে? কেন
এতগুলি মানুষ মরেছে?
যদি প্রশ্ন করে বসো কোথা থেকে এলাম এবার
ফের কথা শুরু করব ভাঙাচোরা বস্তুপুঞ্জ নিয়ে
বড় তেতো রান্নার বাসন নিয়ে
প্রায় পচা পশুদের নিয়ে, আর
আমার পীড়িত আত্মা নিয়ে।

সাক্ষাৎ যাদের সঙ্গে হয়েছিল, তারপর
যারা চলে গেছে
তারা সব স্মৃতিটুকু নয়,
বিস্মৃতির আলস্যে নিমগ্ন হয়ে হলুদ পায়রাটি তারা নয়

সেই তারা যাদের সমস্ত মুখ আর্দ্র অশ্রুপাতে
গলা চেপে ধরেছে আঙুল, আর
যা কিছু-বা ঝরে যায় পত্রপুঞ্জ থেকে
চলে যাওয়া দিনটিকে ছায়া-ছায়া মনেপড়া,
কিংবা যে-সব দিন চলে গেছে আবছা হয়ে
আমাদের শোকের শোণিতে ধুয়ে ধুয়ে।

তাকাও
এবং চেয়ে দেখ এই ভায়োলেট
চড়ুই
ওসব কিছু আমাদের ভালোবাসা ছোঁয়া
আর
দেখতে পারো স্মিতনম্র নন্দিত চিঠির দীর্ঘ পুচ্ছে ছিল
সময় ও মাধুর্যের এলেমেলো হাল্কা পায়ে হাঁটা
যতটুকু দাঁত বসে সেইটুকু, তার ঢের গভীরে যাবো না
কামড় দেবো না স্তব্ধতায় ক্রমে জেগে ওঠা প্রতিধ্বনিটিতে
জানি না, কী বলতে হবে :
এতগুলি মানুষ মরেছে
এবং কত না সমুদ্রের
প্রাচীর ভেঙেছে সূর্য লাল
এবং কত না চূড়ো
নৌকাগুলি আহত করেছে
এবং কত না বাহু
চুম্বনের চতুর্দিকে ঘন হয়ে ছিল
এবং কত না কিছু
যদি পারা যেতো
ভুলে থাকা ॥

কুঁড়ের দল

ওরা ঘুরেই চলবে
এই সব ইস্পাতের জিনিসপত্তর নক্ষত্র তারায়
আর পরিশ্রান্ত ঢের মানুষ আরও উপরে উঠবে
পাশব করে তুলবে স্নিগ্ধ চাঁদকে, আর
সেখানেও গড়ে তুলবে ওদের কারখানা।

টসটসে আঙুরের এই সময়ে
দ্রাক্ষাসব সবে মজে উঠেছে
সমুদ্র আর পর্বতমালার মধ্যেকার ভাঁজে ভাঁজে।

এখন চিলিতে চেরিগাছগুলির নাচনে ঘোর লেগেছে
কালো রহস্যময়ী মেয়েরা ধরেছে গান
গিটার বাজছে, জলরাশি ঝকমক করছে।

সূর্য ছুঁয়ে যায় প্রত্যেকটি দুয়ার
আর গমের নিহিত বিস্ময় ঘনিয়ে আনে।

পয়লা মদে খয়েরী রঙ ধরেছে
মিষ্টি শিশুর মতো মিঠে,
দোসরা মদ তো এখন টগবগে জোয়ান
কোনো মাল্লার হাঁকের মতো ভরাট,
তিসরা মদ এখন যেন টলটলে চুনি,
আফিমফুল আর আগুনে মিশে একাকার।

আমার বাড়িতে আছে সমুদ্র আর মাটি, দুই-ই,
আমার বধূর আছে ডাগর চোখ
বুনো হেজেল ফলের মতো রঙ,

যখন রাত্রি নেমে আসে, সমুদ্র
শাদা আর সবুজে পোশাক পরে নেয়
আর তারপর চাঁদ
সমুদ্রশ্যাম যুবতীর মতো
ঘুরন্ত ভাসমান ফেনায় ফেনায় স্বপ্ন দেখে।

আমার এ-গ্রহটি বদলাবার কোনো সাধ নেই ॥

অনুবাদ : তরুণ সান্যাল

তারাপদ রায়

স্মাইল প্লিজ

স্মাইল প্লিজ, আপনারা প্রত্যেকেই একটু হাস্থন,
দয়া করে তাড়াতাড়ি, তা না হলে রোদ পড়ে গেলে
আপনারা যে রকম চাইছেন তেমন হবে না,
তেমন উঠবে না ছবি। আপনার ঘাড়টা ডানদিকে
আর একটু, একটু সোজা করে প্লিজ, আপনি কি বলছেন,
ঘাড়-টাড় সোজা করে দাঁড়ানো হ্যাবিট নেই, তবে,
কি বলছেন অনেকদিন, অনেকদিন হাসার অভ্যাস,
হাসার-ও অভ্যাস নেই? এদিকে যে রোদ পড়ে এলো,
এ রকম ঘাড়গোঁজা বিমর্ষ মুখের একদল
মানুষের গ্রুপ ফটো, ফটো অনেকদিন থেকে যায়,
ব্রমাইড জলে যেতে প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর।

বিশ-পঁচিশ বছর পরে যদি কোনো পুরানো দেয়ালে
কিংবা কোনো অ্যালবামে এরকম ফটো কেউ দেখে,
কি বলবেন, বলবেন, ক্যামেরাম্যানের ত্রুটি ছিলো,
ঘাড় ঠিকই সোজা ছিলো, সব শালা ক্যামেরাম্যানের,
সেই এক বোকার সাটারে এই রকম ঘটেছে।

সেবাব্রত চৌধুরী

বারমাস্যা

হারানো রতন খুঁজে এসেছিলো যারা,
তারা যায় নিরাশায় আমাকে বাজিয়ে ;
শাদা পাথরের মতো গানগুলি অবিরত
সাজিয়ে রেখেছে এক শহুরে সভ্যতা।

সাত দিন ঘুরে ফিরে মাটির মেজাজে
দেখি এক ফেরিওলা হাঁকে, গঙ্গামাটি ;
তাহলে রেলের কাছে যে-যুবারা মরে আছে
তারাও পায় নি বটে মৃত্তিকার ঘ্রাণ।

মানুষের কাছাকাছি গাছের স্বভাব
রেখে চলা বড় দায়, কেননা মাছের
বাজারে মাছির ভারী উৎপাত উমেদারী,
সরিষা তেলের স্নেহ অদর্শনে বাড়ে।

অতএব কবিতারে বলি ডেকে, তুই যা রে
মুকুন্দরামের মতো ফুল্লরার জিভে।
হারানো রতন খুঁজে যারা আসে ঝোপ বুঝে
শাদা পাথরের গানে জানাবো সখ্যতা।

সুমিত চক্রবর্তী

'জীবনের পথপ্রান্তে ভুলে যাব মৃত্যুর শঙ্কারে'

"যে সময় বোমাবর্ষণ হয়, প্রতাপ বাজারের সামনে এক দোকানে জনতা উৎকর্ণ হয়ে পাক-প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর যুদ্ধবিরতির পূর্বাহ্নে প্রদত্ত শান্তি-ভাষণ শুনছিল। এমন কি বিমানের তীব্র শব্দও সাধারণ মানুষের মনে কোনোরূপ আশঙ্কার ছায়া ফেলতে পারে নি, কারণ ছেহার্টার প্রত্যেকের স্থিরবিশ্বাস ছিল অসামরিক এলাকায় কখনই বোমা পড়বে না।" কথাগুলো বলছিলেন ছেহার্টার জননেত্রী বিমলা ডাঙ্। কথার খাঁজে খাঁজে চোখে ভাসছিল বোমাবর্ষিত অঞ্চলটির চারপাশের নিষ্প্রাণ শবগুলির নৃশংস দৃশ্য, এক একটি মর্মান্তিক আর্তনাদের করুণ শব্দ কানের বাদ্যযন্ত্রে তুলছিল শূন্যতার হাহাকার। হঠাৎ বৈদ্যুতিক স্রোতের আঘাতে শক্তিহীন ব্যক্তির মতো আমিও অকস্মাৎ হতচেতন হয়ে পড়েছিলাম।

অমৃতসর শহর থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে বৃহৎ সুতাকল আর চিনির কারখানায় সমৃদ্ধ শিল্প-উপনগরী ছেহার্টা। এই ছেহার্টাতেই গত ২২শে সেপ্টেম্বর বিকেল চারটের সময় কল-কারখানার দ্বাররুদ্ধ হওয়ার পনেরো মিনিট আগে এক মন্থর সায়াহ্নে কর্মচঞ্চল বাজার আর বিশ্রামরতা গৃহপ্রান্তের উপর পাক বিমান বহর বোমাবর্ষণ করে। এই আক্রমণ সংগঠিত হয় যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পূর্বে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানালেন ঘটনার প্রাক্কালে কোনোরূপ বিপদ সংকেত আসেনি। তার কারণ বিমানগুলি মাটি থেকে একশো ফিটের নীচ দিয়ে উড়ে আসায় তাদের গতিবিধি সদাসতর্ক র‍্যাডার যন্ত্রে ধরা পড়ে নি যার দরুণ যথাসময়ে বিপদসংকেত প্রেরণ অথবা বিমান-বিধ্বংসী গোলার সাহায্যে বিমানগুলি ভূপতিত করার কোনো প্রয়াস সম্ভব হয় নি। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণামে ৫৬ জন নিরপরাধ পৃথিবী থেকে নির্দয়ভাবে বহিষ্কৃত হন; ১০০ জনের ভাগ্যে ঘটে আহত হয়ে ধ্বংসস্তূপের আবর্জনায় পরিজন-হীন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ১০ লক্ষ টাকার সম্পত্তির সামগ্রিক ক্ষতিসাধন উপলব্ধি করার নির্মম পরিহাস।

কুলদীপ সিংয়ের স্টেশনারি দোকানের কাজ তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যু-গহ্বর থেকে জীবনের প্রান্তদেশে ফিরিয়ে এনেছে। তিনি অক্ষত। কিন্তু তাঁর সামগ্রিক পরিবার অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, বোন আজ নিশ্চিহ্ন। কর্তার নগরে প্রথম যে-বোমাটি পড়ে তার আঘাতেই কুলদীপের ঘর ধ্বসে পড়ে তিনজন নিষ্পাপের প্রাণহানি ঘটায়। প্রতাপ বাজারে ঘড়ির দোকান ছিল হরবংশ সিংয়ের। তিনি এবং তাঁর ছোট ছেলেমেয়ে দু'টি সর্বাগ্রেই ইতিহাসে পরিণত হন। তাঁর স্ত্রী ও মা গুরুতররূপে আহত। এরই পাশে ছিল উজাগর সিংয়ের সাইকেল দোকান। সেটা ভূপতিত, সে সঙ্গে উজাগরের দুই ছেলে আর দুই মেয়েও। উজাগরের দোকানের সামনেই ছিল তিলক রাজের সাইকেল সারানোর কারখানা। এখানে বসে গল্প করছিল তিলকের ছোট ভাই প্রেম ও যশপাল। হাজার পাউণ্ডের প্রথম বোমাটির প্রচণ্ড শিহরণে মুহূর্ত মধ্যে দুজনেই কবরস্থিত হয়ে পড়ে। মৃতদেহ সনাক্তের সময় একজনের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

প্রতাপ বাজারের উপর মূল বোমাবর্ষণ হলেও ভল্লাগলির শ্রমিক বসতিতেই সর্বাধিক মৃত্যু ঘটেছে। আমীর চন্দের স্ত্রী নন্দা প্রথম গোলার শব্দেই সচকিত হয়ে বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের সদ্য তৈরি ট্রেন্‌চে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে যেই ঢুকতে যাবেন ঠিক সে সময়েই বোমার টুকরা ছিটকে এসে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করে। কিষণ চন্দ ছিলেন সুতাকল শ্রমিক। বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। ভল্লাগলির মুখে তিনি জীবন বিসর্জন দিলেন। বিল্লার বাবা করম চন্দও আর কোনোদিন বাড়ি ফেরেন নি। বিল্লা আর তার বড়দা তিরতের পায়ে চোট লেগেছে। বিল্লার মা আমাদের দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

প্রতাপ বাজারে যে-কটা দোকান ধ্বংস হয়েছে তার মধ্যে ঘড়ির দোকান ও সাইকেল ছাড়াও আছে মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ও হালুয়ার দোকান। এই হালুয়ার দোকানের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন পিতা-পুত্র জগৎ সিং ও তেজা সিং। বোধহয় তাঁদেরই একজনের নরমুণ্ড বোমাবর্ষণের অব্যবহিত পরে হালুয়ার দোকানের ওপর দিয়ে আকাশ-চেরা বৈদ্যুতিক তারে আটকে গিয়ে মর্মন্তুদ বিভীষিকার রূপ পরিগ্রহ করে। প্রতাপ বাজারের পেছনে শ্রমিকদের নতুন বাসস্থল কর্তার নগর। এখানে বেশি লোক হতাহত হয় নি, কিন্তু সম্পত্তির ক্ষতিসাধন এখানেই সর্বাধিক। এখানকার জীর্ণ ভগ্নস্তূপের পাশে খোলা

মাঠে অনুষ্ঠিত হলো বিকেলে জনসভা। সে জনসভায় মেহনতী কণ্ঠস্বর সোচ্চার হয়ে যূথবদ্ধ আওয়াজ তুলল "হিন্দুস্থান কী একাই—জিন্দাবাদ"। তারপর যখন বিলীয়মান গোধূলি নিবিড়ভাবে ছেহার্টার বোমাবর্ষিত সমগ্র অঞ্চলটিকে শেষবারের মতো আলিঙ্গন করছে তখন উঠে দাঁড়ালেন আশা সিং। নিরক্ষর গ্রাম্য লোক-কবি। অথচ তাঁর সাম্প্রতিকতম মুখে রচিত কাব্যে পাথুরে মুখগুলিকে নিমেষ-মধ্যে আবেগরুদ্ধ করে তুলল, প্রত্যেকটি পংক্তি হৃদয়ের বাঁধ ভেঙ্গে নিয়ে এল স্বচ্ছ সজল অশ্রুধারা।

করম চন্দ, হরবংশ সিং, নন্দা, কিষণ চন্দদের অমর স্মৃতিধন্য আজ অমৃতসরের স্বাধীনতা-পরবর্তী অধ্যায়ে নতুন পীঠস্থান। দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য অতিথির নিত্য গতায়াতে ছেহার্টা জানে সারাভারতের মানচিত্রে তার স্থায়ী আসন সুরক্ষিত। আর সে চিন্তার বিকাশে সাহায্য করেছে পাঞ্জাবের ভ্রাতৃপ্রতীম রাজ্য বাংলাদেশ। ছেহার্টা রিলিফ কাউন্সিল দপ্তরে দুর্গতদের জন্য এ-পর্যন্ত সংগৃহীত ১০,০০০৲ টাকার মধ্যে বাংলাদেশের অবদান ১,০০০৲ টাকা। আর তাতেও ৫০১৲ টাকা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ স্বকীয় প্রচেষ্টায় তুলে দিয়েছে। ছেহার্টা মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি সৎপাল ডাঙ্ (যিনি সদ্য স্থাপিত রিলিফ কাউন্সিলেরও সম্পাদক) জানালেন: বাংলাদেশ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বহু পূর্বেই ছেহার্টার আর্তনাদে সাড়া দিয়েছে।

কিন্তু এই পটভূমিকায় সরকারী শ্লথতা ও বিরূপধর্মী মনোভাব সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছেহার্টার সাধারণ মানুষ যেখানে বলিষ্ঠ নেতৃত্বগ্রহণের জন্য চিরজাগ্রত রিলিফ কাউন্সিলের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সেখানে যে ধারণাটি খুব সুপ্রচলিত তা হলো: এমন সতর্ক প্রহরায় না থাকলে ছেহার্টা বস্তুতই নিঃস্ব হয়ে পড়ত এতো তোলপাড় সত্ত্বেও। অধিবাসীরা অভিযোগ করেন: মন্ত্রীরা আসেন, চলে যান, হয়ত ক্ষেতের ধারে শিল্পপোষ্যদের নিয়ে ফিসফাস করেন—কিন্তু আহত-নিহতদের পরিবারবর্গের সঙ্গে সহজভাবে প্রাণের কথা বলতেও সঙ্কুচিত হন। সরকার যে নিহত ব্যক্তিদের পরিবার-বর্গের জন্য সর্বমোট ১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা দিয়েছেন একথা ঠিক। কিন্তু সেখানেও অসাম্য প্রকট: যেসব পরিবারে ভরণপোষণরত কর্তাব্যক্তিটি নিহত সে পরিবারগুলির প্রত্যেকটি যখন ১,৫০০৲ টাকা পেয়েছে, তখন নারী গৃহপরিচালিকা নারীবিহীন পরিবার সিকি পয়সাও পায় নি। এ থেকে

সমাজে নারীদের অস্তিত্বের প্রতি সরকারী অবজ্ঞার চিত্রটি নিশ্চয়ই এই সময়ে সুখদায়ক নয়।

তবু ছেহার্টার অগণ্য কর্মঠ বীর শ্রমজীবী জানেন কোনো আক্রমণেই তাঁরা ভেঙে পড়বেন না। পাক আক্রমণের পশ্চাৎপটে সংগ্রামরত জোয়ানদের জন্য এঁরা তৈরি করেছিলেন ক্যান্টিন, এঁরাই চোরাকারবারি গুপ্তচরদের গ্রেপ্তারে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিলেন। জালিয়ানওয়ালার স্মৃতিপূত অমৃতসর নতুনভাবে স্বাধীনতার বিনিময়ে ছেহার্টায় রক্তের খাজনা দিয়ে প্রত্যয়সিদ্ধ অঙ্গীকারকে আবার শাণিয়ে তুলেছে। মাত্র কিছুদিন আগে অমৃতসরের সুতাকল ধর্মঘটের সময় ছেহার্টার দায়িত্ব-সচেতন শ্রমিকরাই রক্তপতাকা হাতে নিয়ে মজদুর একতা ইউনিয়নের নেতৃত্বে মালিক স্বার্থ সংরক্ষণে নিয়োজিত সরকারী প্রতিক্রিয়ার নির্মম নিপীড়নকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দমনের চরম আঘাতের সামনে ধর্মঘটকে বৃহত্তর ব্যাপক আকার দিয়ে সার্থক করে তুলেছিলেন; জয়লাভও হয়েছিল করায়ত্ত। সেদিন বিপন্ন মালিকশ্রেণী ধুয়া তুলেছিল: দেশরক্ষার জন্য ধর্মঘট বানচাল কর। আজ আক্রান্ত মাতৃভূমির প্রতিরক্ষায় নির্ভীক সেনানীদের পেছনে আর এক সীমান্তে গড়ে তুলছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে মালিকদের পাওয়া দুষ্কর। শ্রমিকশ্রেণী এগিয়ে এসে মালিকদেরও হাত ধরে ব্যাপকতর ঐক্যগঠনে যখন সংপ্রয়াসী সে সময় কিন্তু দেশরক্ষার প্রগলভ উপদেশ ভুলে স্ব-স্বার্থরক্ষায় চম্পট দিয়েছে একই মালিকগণ। কেবল মুষ্টিমেয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লাখপতি শ্রমিকশ্রেণীর পাশে দাঁড়াবার শক্তি অর্জনে সমর্থ হয়েছেন।

ছেহার্টা থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য কসুর খণ্ডের মূল ক্ষেমকরণ রণক্ষেত্রে যাবার সুযোগ ঘটেছিল। সে ভ্রমণের কাহিনীও রীতিমত উৎসাহব্যঞ্জক। দু' পাশের আদিগন্ত ক্ষেত চিরে সোজা রাস্তা চলে গেছে সীমান্ত পর্যন্ত। গম, আখ, ভুট্টা আর জোয়ারের ক্ষেত। তাতে চাষ করছেন শ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত শিখ কৃষক। শঙ্কা বা বিপন্নতার চিহ্নমাত্র নেই। হয়ত দিনের শেষে কোনো রাখাল তার গরু-ভেড়ার পাল নিয়ে নির্বিকারে ভয়াবহ 'মাইনে'র পাশ দিয়ে গৃহাভিমুখে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছেন (এক একটি 'মাইন' এমনভাবে তৈরি যে ৯৫ পাউণ্ডের অধিক যে কোনো বস্তুর আঘাতে সেগুলি বিস্ফোরিত হবে।) এ থেকে গ্রামের মানুষের সঙ্গে সমরবাহিনীর শ্রেণীবিহীন জোয়ানদের নিবিড় আত্মীয়তাই ফুটে ওঠে।

ক্ষেমকরণ শহরটি সীমান্তের নিকটবর্তী ১০,০০০ জনসংখ্যা সমন্বিত ছোট একটি শহর। বর্তমানে ক্ষেমকরণ সম্পূর্ণই পাক বাহিনীর দখলে। আমাদের ঘাঁটি ক্ষেমকরণ শহরের দেড় মাইল পূর্বে ক্ষেতের মাঝখানে এক নিরাপদ স্থানে। এখানে বসেই কম্যাণ্ডিং অফিসারের সঙ্গে কথোপকথন হলো। উদ্দেশ্য ছিল: কলকাতার এক শুভেষণা প্রেরকের ১০০৲ টাকা থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তু যথা চিরুনি, সিগারেট ও সাবান ক্রয় করে সংগ্রামী সৈন্যদের হাতে পৌছে দেওয়া। এই উপহার সেনাবাহিনীর কাছে এল মধুর বিস্ময় হিসাবে। ওঁরা আমাদের চা খাওয়ালেন। সূর্যের দেহটা তখন পশ্চিমে অস্তাচলমুখীন। হঠাৎ চোখে পড়ল যে গাছের নীচে বসে কথা বলছি তারই একটা ডালে কালো পুড়ে যাওয়া ক্ষতচিহ্ন। অফিসার বুঝিয়ে দিলেন: গোলার পরিণাম। অফিসারের বাঙ্কার ছিল পাশেই। সাগ্রহে সেটি দেখার অনুমতি দিলেন তিনি। উপরে আর চারপাশে বালির বস্তা। মাটি খুঁড়ে সামান্য পরিসর রাখা হয়েছে—তার মধ্যভাগে একটি খাট, ওপাশে দু' চারটি পত্রিকা আর টেলিফোন। মাথার উপর একটি ছোট্ট লণ্ঠন। অফিসারটির কথায় জানলাম এই রণক্ষেত্রে প্রচণ্ড আকারে লড়াই চলেছে। ওঁরা নাকি সেপ্টেম্বরের ৭ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত স্নানাহার ভুলেছিলেন। এই অঞ্চলে সীমান্তের ও ধারে ছিল তিন ডিভিসন পাক ফৌজ, আমাদের মাত্র এক ডিভিসন। তাই ৭ই সেপ্টেম্বরে আক্রমণ করার পাক দুরভিসন্ধি জানতে পেরে আমরা ৬ই তারিখে লাহোর খণ্ডে নতুন রণাঙ্গন সৃষ্টি করতে বাধ্য হই। সামরিক বাহিনীর প্রত্যেকের ঐক্যবদ্ধ অভিমত: তা না হলে পাক ফৌজ দিল্লী পর্যন্ত চলে আসত। অন্তত কসুর খণ্ডে সীমান্ত সংরক্ষণকারী এক ডিভিসন ভারতীয় সেনা পরাভূত হলে সমগ্র পাঞ্জাবে সামরিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা বস্তুতই ভেঙে পড়ত। সেদিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকার উপস্থিত বুদ্ধিতে যথাশীঘ্র দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে।

যেখানে বসে কথা বলছিলাম তার চারপাশে ছিল শাপলার বন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো অফিসারটির বক্তব্য শুনছি। তিনি বলছিলেন ভারতীয় বাহিনীর কৌশলগত পশ্চাদপসরণের কথা, বলছিলেন চিমাগ্রাম (ক্ষেমকরণের থেকে অমৃতসরের পথে প্রথম গ্রাম) থেকে নবোদ্যমে সেনানীদের আক্রমণ পরিচালনায় বীরত্বের কাহিনী, বলছিলেন আবদুল হামিদ কর্তৃক প্যাটন ট্যাংক ধ্বংসের বিচিত্র কাহিনী, বলছিলেন যুদ্ধবিরতি যদি ২৪ ঘণ্টা পরে আসত ভারতীয়

বাহিনী নিঃসন্দেহে ক্ষেমকরণ মুক্ত করত "কারণ আমরা সে সময় ছিলাম ক্রম-অগ্রসরমান।" হঠাৎ উদাস দৃষ্টিতে বলে উঠলেন: এখানে যখন প্রথম আসি চারপাশে শাপলার বনে লতায় পাতায় লেগেছিল রক্ত, শবের পাহাড়। তবু বলব আমরা বেশ আছি।

আবদুল হামিদ এই স্থানের নিকটেই তিনটি প্যাটন ধ্বংসের জন্য পরম বীরচক্র লাভ করেছিলেন। বস্তুত যাত্রাপথের দু' পাশে জমেছিল প্যাটন ট্যাংকের মুমূর্ষু শবদেহ। গাড়ি থামিয়ে আমরা প্যাটন পর্যবেক্ষণ করলাম। সহসা রাউথ নামক এক ওড়িয়া সৈনিক এসে পরিচয় করলেন। 'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করতেই উনি একগাল হেসে বললেন: আপনারা পূর্ববঙ্গের মানুষ, আপনাদের ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তো গতকাল আই. এফ. এ. শীল্ড পেয়েছে—খবর তো আপনাদেরই। সাধারণ সৈন্যরা এতটা অন্তরঙ্গ সে ধারণা আগে পাই নি। নিজেকে বাস্তবিক সমৃদ্ধতর মনে হলো। তারপরেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল অত্যুগ্র বামপন্থার ধারক-বাহকদের জোয়ান-সম্পর্কিত নির্লজ্জ কুৎসার অন্ধ বিদ্বেষ, যার ভিত্তি সম্পূর্ণ অবাস্তব স্বকপোলকল্পিত চিন্তার কীট।

ফিরে আসার সময় বার বার মনে পড়ছিল অফিসারটির কথা: আমরা জনতাকে নিশ্চয়ই সমর-সচেতন করে তুলব, কিন্তু কখনই যুদ্ধোন্মাদনায় উন্মত্ত করে তুলব না। আর তারপাশেই দেখছিলাম কৃষকরা সীমান্তের বিপন্ন গ্রামগুলিতে এখনো কি বিশাল আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ঘরে ফসল তুলছে। সংশয় আর সন্দেহগ্রস্ত মন বুঝল জাতীয় সচেতনতার প্রদীপশিখা সামগ্রিক বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করে একইভাবে প্রোজ্জ্বল।

নিষ্প্রদীপ ছেহার্টায় (প্রসঙ্গত ছেহার্টা 'শেলিং রেঞ্জে'র মধ্যে বলে এখনও নিষ্প্রদীপ) যখন ফিরলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। সে-রাত্রেই ফিরতে হবে। পুরু ফ্রেমে আঁটা কালো রাত্রির বুকে দাঁড়িয়ে অনুভব করলাম এখানকার মানুষ কি গভীর প্রত্যাশায় আজও ক্ষতস্থানগুলো লুকিয়ে রেখেছেন! জোয়ান আর জনসাধারণের এই রাখীবন্ধন দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে বিদায় আলিঙ্গনের পূর্বমুহূর্তে হঠাৎ বলে উঠলাম।

"আবার জ্বালাবো বাতি
হাজার সেলাম তাই নাও আজ
শেষ যুদ্ধের সাথী।"

রবিন পাল

সূর্য-সংবাদ

মোড়ের চা ঘর থেকে সত্যেন দেখতে পেল মিনু আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে বাড়ি ফিরছে। মিনুর ডান চিবুকের উপর দুটি উড়ন্ত চুল, মিনুর মাথায় স্বল্প ঘোমটা, মিনুর শাড়িটা নিপুণভাবে সারা শরীরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়ানো, মিনু আজ রাত্তিরে আলুর পাঁপর ভাজবে।

দূর থেকে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় মিনুর মলিন মুখ দেখে সত্যেনের মনটা একটু কেমন-কেমন করে। শাড়ির অসংখ্য পাকে পাকে ক্লান্তি, মিনু বড়ো ক্লান্ত। অনেকদিন হয়ে গেল আমি চাকরি পাই নি···সত্যেনের মনে হোল। সময় যেন স্থবির সুড়ঙ্গের মতো, শীতল প্রতীক্ষা যেন হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে তার ভিতর। মিনু ··মিনু···মিনু···সত্যেন ঠাণ্ডা চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে মনে মনে উচ্চারণ করছিল। চা গলায় ঢালতে গিয়ে 'মিনু' এই শব্দটা দু-টুকরো হয়ে চলন্ত নিওন আলোর মতো ওর মুখের উপর যাওয়া-আসা করতে লাগল। আর, সত্যেন ভাবলো মিনুকে অনেক কাল ভালো করে আদর করা হয় নি।

তাড়াতাড়ি তলানি চা-টুকু শেষ করে সত্যেন ক্যাশের সামনে গিয়ে ছুটো মৌরী আলতোভাবে জিভের উপর দিয়ে 'দাদা, পরে···কেমন?' বলে ছেঁড়া চটি ঘসটাতে ঘসটাতে রাস্তায় নেমে পড়ল।

রাস্তায় নামলে কেমন যেন কর্তব্য-কর্তব্য ভাব আসে একটা। পথঘাট, গাড়িঘোড়া, লোকজন, অনেক অসম্পৃক্ত চিন্তা, অনেক ব্যস্ততা। এইজন্যই সত্যেনের রাস্তায় বেরুতে খারাপ লাগে অথচ না বেরুলেই নয়। যদি একটা গাড়ি থাকতো···নাঃ তাহলেও ঝামেলা, অ্যাকসিডেন্ট, পেট্রোল··· যাঃ কি সব ভাবছি আমি। ও নিজের মনে হাসল একটু। বিয়ের পরদিন মিনুর সঙ্গে সিনেমা থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল সত্যেন। আজ হঠাৎ মনে পড়ে যায়। আর, মিনু, সত্যি বেচারা···বড়ো কষ্ট হয়··· ওকে যদি একটু বিশ্রাম করার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হত, ওকে যদি

একটু ভালো খাবার, একটু দুধ···শালা কুত্তা আমি···আর কয়েক মাস পরে বাপ হব···চারমিনারের কাঁচা তামাক থু-থু করার মতো হয়ে উঠল সত্যেনের মুখ।

একটা অল্পবয়সী ছেলে ডালার প্যাঁচ আলগা ছিল জানত না বলে রাস্তায় সরষের তেল ছড়িয়ে আছে খানিকটা, ছেলেটা কাঁদছে। ওর কান্নাভরা মুখের দিকে তাকিয়ে ওর শিশিটা···প্যাঁচটা···খুলে-যাওয়া··· সত্যেন একে-একে দেখে, অনুভব করে···শিশিটার প্যাঁচগুলো, বেয়াড়া, মোটা, ছিপিটা কালো হয়ে গেছে···যেন কবিতার পংক্তিরচনার মগ্নতা ওকে আশ্রয় করেছিল। ধীরে ধীরে রাস্তা ফাঁকা হয়, ছেলেটাও, একরাশ ধুলো কাদায় থকথকে তেল···কর্কটা খুলে গেছে, শিশিটা আধভাঙা · কর্কটা খুলে গেছে···সত্যেন ফিরে চলল বাড়ির দিকে। আজ মিনু সোনার সঙ্গে অনেকক্ষণ খাটে পা ঝুলিয়ে গল্প করব···আজ মিনুকে আমি অনেক গল্প বলব···সেই পুরনো দিনের মতো···আজ ওকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব···মিনু···আঃ···এক-একদিন সত্যেনের বড়ো ইচ্ছে করে ভিক্টোরিয় প্রেমিকের মতো আচরণ করতে। আমি শালা কুত্তার বাচ্চা···সিভ্যালরাস মান্‌কি···জানোয়ারকা অধম···হাঃ···হাঃ···হাঃ···নিজেকে গাল দিতে বেশ লাগে কিন্তু। কর্কটা খুলে গেছে···শিশিটা·· আচ্ছা এই'টা'-কে আশ্রয় করে প্রবহমান তানের স্পর্শ নিলে কেমন হয়···শিশিটা···সারে-এ-এ-এ···আমি আজ মিনুকে অনেক-অনেক গান শোনাব। বিষ্টিতে ভেজা পাতাবাহার গাছের মতো মনে হলো নিজেকে সত্যেনের।

বড়ো রাস্তা পেরোলে গলির মোড়ে ফলের দোকান। নধর শশা, পুরুষ্টু আপেল, নারকোল পাতার শিকলি দিয়ে আটকানো পাকা ফুটি। ভুঁড়িওলা দোকানদার থলথলে চোখ নিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাতপাখায় হাওয়া খায়। এই দোকানটা দেখলে সত্যেনের মনে অনেক পুরনো সুখী, তৃপ্তিময় একটা স্মৃতি ভেসে আসে। একটা লাইব্রেরি···ঝকঝকে পালিশ-করা টেবিল···টেবিলে পড়ুয়া মেয়ের উড়ুক্কু চুলসুদ্ধ ছবি, বিনুনি। পেছন থেকে উঁকি মেরে টেবিলের দর্পণে মেয়েমানুষ দেখা। একটা ফিনফিনে হাওয়ার মতো আনন্দ। সত্যেন আজ এই তেত্রিশ বছর বয়সে বুড়ো হয়ে যাবার আগে ফিরে ফিরে এইসব কথা ভাবতে বড়ো তৃপ্তি পায়। কিছু তৃপ্তি তো অযোনিসম্ভূত, অদ্ভুত···তাই নাকি? তরমুজের মতো টাটকা লাল

প্রেমের গান শুনলে কি মনে হয় না আমার প্রেমিকা আছে, হয়তো কাছেই নেই, হয়তো অনেক অনেক দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। এই ভালো-লাগা নিয়ে আমি জীবনের অনেক অনেকগুলো বছর কাটিয়ে দিয়েছি, আর আজ আমি বাপ বনে যাচ্ছি···সত্যেনের হাসি পেল। মিনু নামক একটি ছাব্বিশ বছরের মহিলার সঙ্গে সে এক খাটে শোয়। তার অসুখে রাত জেগে জলপটি লাগায়, ভালো হলে চুমু খায় চুক্‌চুক্ করে যেন শব্দটুকু অভিজ্ঞান না রাখলে চলে যাবে সব। সবই তো চলে যায়···সবই হারিয়ে যাচ্ছে···আমি আর দু-দশ বছর পরে বুড়ো হয়ে পড়ব, যৌবন হরে কৃষ্ণ হরে রাম গাইতে গাইতে ফিরে যাবে পিছন পথে। চোখের দৃষ্টি ফিকে হয়ে আসছে। সেও যাবে। আমার খাতাপত্তর··সেও ধুলো পড়ে পড়ে বদলে যাচ্ছে···বদলে যাচ্ছে পৃথিবী।

সত্যেন বেশি ভাবতে চায় না। ভেবে হবে কি ছা···ভেবে···দুর শালা··· সত্যেন বড়ো কষ্ট পায় এক দুর্বোধ্য অস্বস্তিতে ··চোখের সামনে ক্যালিডস্কপিক রঙীন ছবিগুলি এসে আবার দূরে···কতদূরে ফিরে যায়···মন ফুটন্ত দুধের মতো বল্ বল্ করে ফেঁপে ফুলে ওঠে···ফুঁ দে, ফুঁ দে···বাপ্‌স্!

সন্ধ্যে। ঘর। ধোঁয়াটে অন্ধকার। দেওয়াল। সত্যেন। মিনু স্নান করছে। বাথরুমে হুড়হুড় জলের শব্দ। রাস্তা। চৌকাঠ। জলের কুঁজো। টিকটিকি। বালিশের ওয়াড়ে প্রজাপতি আঁকা।

বউ-বউ খেলা, খেলি সারাবেলা, ওগো আমার বউ, কোথায় তুমি বউ···নতুন বর্ষ মাস শেষ হলে আর কোনো নতুনের পায়ের ধ্বনি ফিরে আসে না···নতুন জন্মের শেষে দরিদ্র স্মৃতির ভাঙা খিলান আঁকড়ে আঁকড়ে টিঁকে থাকা···কালো কালো চাপ চাপ পোড়া কাগজের বাণ্ডিলের মতো জীবন নালা দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, চোখে চিকণ পিতলের অদৃশ্যজাল···চোখ খুললে বড়ো ব্যথা লাগে···তার মেয়ে ওগো প্রাণাধিক আমি তোমার ওষ্ঠাধর বাঞ্ছা করিয়া বাঁচিয়া আছি। পত্র দিয়া অধমের প্রাণ সুশীতল করিবা··· ভালো। সব শালা বেইমান, বদমাস, খচ্চর আমি বউয়ের কোলে সারারাত শুয়ে থাকব···দেখি কোন শালার বেটা শালা কি বলে···হ্যাঁ আমি বউ-আঁকড়া পুরুষ·· তাতে হয়েছে কি? হ্যাঁ, হ্যাঁ ভালোবাসি আমি মিনুকে··· ভালোবাসি···। সত্যেন ছায়ার সঙ্গে ক্রমান্বয়ে ক্রীড়া ও সংগ্রামে ক্লান্ত

হয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে ঝিমোয় আর ওর অজ্ঞাতসারে ঘরের আলোটুকুকে ধাক্কা মেরে বাইরে ফেলে দিয়ে গভীর অন্ধকার ঘরের মেঝেতে আসন পাতে।

দূর থেকে শাঁখের আওয়াজ এ-গলি ও-গলিতে ধাক্কা খেতে খেতে ঘরের চৌকাঠে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে স্ট্রাইকারদের পরিষ্কার চাঁচাছোলা কণ্ঠস্বর, কখনো-সখনো ব্যাগপাইপ বাজিয়ে বরযাত্রার আওয়াজ ভেসে আসে। আসে আর যায়। অসংখ্য স্বরের সমুদ্রে ওদের ঘর টলমল করে ওঠে আর তখন ওরা পরস্পরের দিকে কোনো কথা না বলে তাকিয়ে থাকে।

আলগা শায়ার খুঁট দাঁতে চেপে মিনু ঘরে ঢুকল। সত্যেনকে এই অসময়ে ঘরে দেখে একবার চোখ পাকাল। এই তাকানোর মধ্যে যেন প্রশ্রয় ছিল। সত্যেন উঠে দাঁড়িয়ে মিনুকে দু-হাত দিয়ে টেনে আনল বুকের মধ্যে। অ্যাই···হচ্ছেটা কি···অ্যাঁ···এই···উঃ ছাড়ো···কে দেখে ফেলবে ··সতু···প্লিজ সতু···। সত্যেন কোনো উত্তর দিল না। মিনুকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মিনুর বুকের মাংসে সবুজ উত্তাপ বিন্দু বিন্দু করে জমা হচ্ছিল গোপনে। যেন বিরাট হলঘরের অসংখ্য আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে একে-একে। ক্রমশ সত্যেনের চোখের সামনে একটা জলসাঘরের ছায়া ভাসল। আলোর রোশনাই, রক্তিম মদের বোতল, নজরানার থালা, আর মিনু নাচছে···মিনু বাঈজী···মিনু সোনা···'সত্যেন, সত্যেন'···মিনু ভয় পেয়ে কেঁপে উঠল···'আমাকে ছেড়ে দাও সত্যেন, আমার ভীষণ ভয় করছে তোমাকে।' আচ্ছন্নের মতো সত্যেন মিনুকে ছেড়ে দিল। ও ছিটকে সরে গেল, এককোণে, জানালার দিকে। একটা লম্পটের মতো সত্যেন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

: এই, তেল এনে রাখো নি কেন? পাঁপর ভাজব কি দিয়ে?

: তেল? ওঃ মানে ঠিক······ইস্‌

: সারাদিন বাবুর কি করা হয়েছে শুনি? খালি ওই মোড়ের মাথার দোকানে বসে বুঝি চা গেলা? আর নয়তো···

: কি?

: হুঁ, নইলে কোনো বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সিনেমা, রেস্টুরেন্ট অথবা ফাঁকা ময়দানে পদ্য শোনা—আর কি?

: এই খবর্দার পদ্য বলবে না বলে দিচ্ছি।

: বেশ বলব। তেল এনে রেখেছ মশাই? তেল এনে রাখলে পদ্য না বলে কবিতা বলতাম।

মিনু ব্যস্ত হাতটা আঁচলে মুছে সত্যেনের অর্ধশায়িত দেহের পাশে এল, ওর উস্কো-খুস্কো চুলগুলো একটু নেড়ে দিল। হাল্কা বাদামী ছাট দেওয়া মরুপ্রান্তরের মতো বিশাল চোখ দুটোর দিকে পলকে তাকাল। সত্যেনের হাতটা ধীরে ধীরে কোমর জড়িয়ে ধরতে উদ্যত হতেই মিনু বলল, যাই, নীলিদির ঘর থেকে একটু তেল চেয়ে আনি। যাবার সময় চৌকাঠের সামনে এসে মুখ ফিরিয়ে একটু মুচকি হেসে মিনু ক্রমশ অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সত্যেনের চোখ কিছুদূর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এল। উঠানের অজস্র অন্ধকার পেঁজা বরফের মতো উড়ছে, ওর মধ্যে দৃষ্টিশক্তি আহত হয়।

মিনু চলে গেলে এই ঘর সত্যেনের কাছে দায়স্বরূপ হয়ে ওঠে। এই সব বাসনকোসন, খাট, কিছু বই, দেওয়ালে ছোলানো পট সব কিছু যেন আনকোরা দায়িত্ব প্রতিমুহূর্তে রচনা করতে উদ্যত হয়। আর বহুকাল বেকার থাকতে থাকতে সত্যেন দায়িত্বের কাছে এসে কখনই স্বস্তি পায় না। হোক তা যত ছোট কিংবা যত মহৎ। সমাজের মৃন্ময় সত্তার কাছে এক-একদিন সে মাথা খোঁড়ে, তার অর্বুদ নিযুত বন্ধনের বিস্তৃতিতে ওর চোখ-মুখের রঙ পাঁশুটে হয়ে যায় আর ঠিক তখনুই মনে পড়ে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র ও লাল শালুর জঙ্গল কিংবা নির্জন পুকুরে গঙ্গাফড়িঙের ছটফটানি অথবা রাঙচিতার বেড়ার ঘন সবুজ: রোজই মনে হয় সময়ের খুঁট ধরে অজস্র ঘটনা বয়ে চলেছে, তার সংখ্যাবৃদ্ধি ক্রমশই মানুষকে হিসেবী করে তুলছে। বাবা ব্যাঙ্কের লেজার রাখছেন, টাকা গুণতে গুণতে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মারা গেলে চোখে তুলসীপাতা বসাতে গিয়ে সত্যেন আবিষ্কার করেছিল বাবার চোখ কী ভয়ানকভাবে ভেতরে ঢুকে গেছে। আর, মিনুকে-ও তো কত খবর রাখতে হয়। কত টুকটাক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রশ্ন, পাবলিক রিলেশন্স অফিসার, অনেক কিছু না জানলে চলবে কি করে? বোবা মহিষের আকৃতি নিয়ে সত্যেন মাঝে মাঝে ছটফট করে, কষ্ট পায়। ও আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেছে এক-একটি ঘটনার আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত ভাষ্যদানে বন্ধুরা কিংবা ক্বচিৎ মিনুও কি আশ্চর্যভাবে দক্ষ। এ বুঝি এক

অলৌকিকতা। আমি পারি না এ-সব, এ আমার অক্ষমতা, তার জন্য ভয় জমা হয় করোটিতে, সব ঘটনা পরম্পরা চিন্তার বিস্তারে তুলে ধরতে গেলেই ওরা যে পোড়া ছাইয়ের মতো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে ঝরে ঝরে আমার দু-চোখ ভরিয়ে ফেলে, আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলি, আমি বোবা হয়ে যাই···এই সব এবং আরো অনেক কথা ভাবতে ভাবতে সত্যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

কয়েকঘণ্টা পর। ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। মিনু নিপুণ হাতে ছিটকিনি লাগাল। এই আওয়াজ শুনলেই সত্যেনের মনে হয়, আমি মিনুকে কী ভীষণ ভালোবাসি। আর কিছুক্ষণ পর আমি, মিনু, কী ভীষণ, ভালোবাসি ইত্যাদি শব্দগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সারা ঘরের মধ্যে প্রেতনৃত্য শুরু করে দেয়।

মিনু কিছু সংক্ষিপ্ত কাজ সেরে লাইট নিভিয়ে বিছানায় এল। বালিশে মাথা রাখার পর মিনু ক্লান্তিতে একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর সত্যেনের গলা জড়িয়ে ধরে বলল: 'জানো, মিঃ ব্যানার্জি বলেছেন, খুব শীগগিরই আমার প্রমোশন হবে।' সত্যেন মিনুর বুকের ঢাকনা খুলে মাথা রাখল। ভাবল, মিনু কত ভালো. আর ভাবল যে খুব শীগগিরই মিনু মা হতে চলেছে। "সত্যেন, তোমার জন্য আমার বড়ো কষ্ট হয়, সত্যেন তুমি কতকাল কলম··" কথা শেষ হবার আগেই দুরন্ত পশুর মতো ও মিনুর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল।

রাত একটার ঘণ্টা বাজে দূরবর্তী ঘড়িতে। ঘণ্টার ধ্বনি ঘরের মধ্যে সত্যেনের জাগ্রত চক্ষুর কাছে নেমে আসে। সত্যেন এই শব্দের মাধুর্য কিংবা প্রয়োজনীয়তা কিছুই বুঝতে পারে না, পরিবর্তে রাত্রিকালে ঘণ্টাপতনের শব্দ আয়ু ছিনিয়ে নিচ্ছে চুপিসাড়ে মন এই অহেতুক ভাবনায় ভাবিত হয়। রাত একটার শব্দ ··বুঝি অনেক কর্তব্যের ডাক···অনেক আনন্দ ও আশার উজ্জ্বল প্রভাত ফেরী শুরু করে দিল···হয়তো এমনই এক রাত্রিতে মিনুর বাচ্চা হবে···মিনুর শীর্ণমুখে নবজাতকের আর্তনাদ ছড়িয়ে দেবে আলো।

সত্যেনের বুকে মিনুর একটা হাত ছড়ানো। আলুথালু মিনু ঘুমোচ্ছে পাগলের মতো। গভীর শ্বাসপতনের তালে তালে শরীর কেঁপে কেঁপে

উঠছে। ঘুমন্ত মিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সত্যেন কিছুক্ষণ। সমগ্র ঘর নিস্তব্ধ রাত্রির দ্বারা গ্রস্ত হয়েছে। রাত্রি ভেঙে পড়েছে এ-ঘরে। সত্যেন চুপ করে শুয়ে রইল অনেকক্ষণ। আর এই অনেকটা সময় হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনল প্রাণভরে। যেন শব্দের যাবতীয় লুক্কায়িত রহস্য সত্যেন একান্ত তৃষ্ণায় আঁকড়ে ধরতে চাইল। আঁকড়ে ধরতে গেলে, সত্যেন জানে, এই রহস্যের কপালে বেশিক্ষণ হাত রাখলে ক্রমে বুক হাজারদুয়ারী হয়ে যাবে। অসংখ্য মানুষ, অসংখ্য বিপ্লব, অনেক রক্ত-ঝরানো ব্যর্থতা আর নিরুত্তর ক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। যেন বিরাট পার্লিয়ামেণ্ট কক্ষের মধ্যে চকিত এক জাগ্রত স্বপ্নের হাতে তখন ধরা দিতে হবে, যে-স্বপ্নের মৃত্যু নেই, যে-স্বপ্ন জরাগ্রস্ত হয় না আর সেইজন্যই যে-স্বপ্ন শুধু পাঁজরে কালো কালো গর্ত করে দিয়ে যায়। সুতরাং স্বপ্নের হাতে ধরা দিতে সত্যেন ভয় পায় কিন্তু তবু ওর মনে হয় যেন মৌল আকর্ষণ ওকে অন্ধের মতো তুলে নিয়ে যায়, ওকে স্বপ্নিল করে তোলে বারে বারে।

সত্যেন বিছানা ছেড়ে উঠল। লাইট জ্বালিয়ে কুঁজো থেকে জল খেল। গলার ভেতরটা কেমন যেন শুকনো শুকনো লাগছে। অনেকটা সময় নিয়ে গ্লাসের জলটা শেষ করে সে জানলার কাছে সরে এল। আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পর ও মাথা নিচু করল। জানলার গরাদ আশ্চর্যভাবে নিষ্প্রাণ ও ঠাণ্ডা। এই অবস্থায় অনেক কিছুর থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা হল। মন একবার বলে উঠল:· কাল সকালের দিকে নিজেকে এগিয়ে দাও। এ রাত অত্যন্ত সুন্দর এবং সাধারণ। আজ এই বিংশ শতকের প্রান্তে দাঁড়িয়ে, জানলার গরাদে মাথা রেখে·· ছিঃ ছিঃ লোকে পাগল ভাববে। সত্যেনের মনে হল আর কিছুক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে ওর ঘাড় ফুঁড়ে বুঝি অজস্র ডালপালা ঠেলে বেরিয়ে আসবে। তারা গরাদের ফাঁক দিয়ে ডাবের মালার মতো চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু মূলত্রাণ সিমেণ্টের মেঝে ভেদ করতে শেখে নি। সে ভাতের হাঁড়ি, মিনুর ছাড়া কাপড়, উনুনের ছাইয়ের আড়ালে লজ্জায় আত্মগোপন করবে। মিনুর নাম মনে ভেসে উঠতেই ও চমকে উঠল, মিনুর বাচ্চা হবে। মিনু মা হবে।

সত্যেন বিদ্যুৎ-আহতের মতো বিছানায় ছিটকে এল। মিনু ঘুমোচ্ছে।

উড়ুক্কু চুলের ফাঁকে মিনুর তৃপ্তি ঝরানো মুখ বিন্দু বিন্দু ঘামে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সত্যেন আস্তে আস্তে মিনুর ফোলা পেটের উপর হাত রাখল। গরম। কান রাখতে সাহস হয় না। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারল একটা কিছুর অস্তিত্ব। গরম গোলাপী মাংস খামচে ধরল সত্যেন পাগলের ম'তা।...আচমকা মিনুর শাঁখাসুদ্ধ হাত সত্যেনের হাতের উপর আসে। আর সত্যেন থরথর করে কেঁপে ওঠে, সত্যেনের মাথা ঘুরে যায়।

চোখ বুজে এল, মনে হল দু-চোখের পাতা আরো ঘন হয়ে জমে যাবে, ক্রমে প্রস্তরীভূত হবে, তারপর এক অন্তহীন সুড়ঙ্গ, মাইলের পর মাইল, বুঝি তার শেষ নেই, বুঝি সেই পথে পরিত্রাণহীন নষ্ট পথিকের মতো অনেক বর্ষ মাস কাটিয়ে দিতে হবে......।

এই সব ভাবতে ভাবতে যে অশ্রুজল সহসা বাঁধ ভেঙে নামছিল তা' ক্রমশ শুষ্ক হল এবং নিদ্রার এক প্রচ্ছন্ন মাদকতা চতুঃস্পার্শ্বস্থ নিস্তব্ধতার সঙ্গে সত্যেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভালো করে অনুভব করার আগেই সত্যেন তার মধ্যে তলিয়ে গেল।

প্রদ্যোৎ গুহ

খোলা চোখে চীন

গল্প আছে, একদল আমেরিকান সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ঘুরে এলে তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আচ্ছা বলশেভিকরা নাকি মানুষ খায়? জবাবে সেই আমেরিকানরা বলেছিল,—খেতে দেখি নি, তবে এক জায়গায় দেখেছি অনেক হাড়গোড় পড়ে আছে।

প্রশ্ন এবং জবাব দুই-ই হাস্যকর মনে হতে পারে—কিন্তু চীন সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই জ্ঞানের বহর প্রায় এই ধরনের। যখন চীন আমাদের বন্ধু ছিল তখন তার সম্পর্কে যে-কোনো অতিকথা মেনে নিতে আমরা দ্বিধা করি নি, এমন কি চীন দেশে ধান গাছে মই নিয়ে চড়তে হয় এ কথা লিখলেও আমরা লেখকের পকেটে ছোট কলকের সন্ধান করি নি আবার এখন যখন চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শত্রুতার তখন তো তার সম্পর্কে সম্ভব-অসম্ভব যে-কোনো রটনা আমরা অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করতে প্রস্তুত।

কিন্তু শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক, চীন আমাদের অনন্তকালের প্রতিবেশী এই ভৌগোলিক সত্য তো কোনো রকমেই মিথ্যে হয়ে যাবে না। আর প্রতিবেশী রাষ্ট্র সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানের অভাব দেশের স্বার্থের পক্ষেই বিপজ্জনক। বিশেষ করে চীনের সঙ্গে এখন যখন আমাদের সম্পর্ক শত্রুতার তখন তো সে দেশ সম্পর্কে অবিমুগ্ধ, অতিরঞ্জনমুক্ত বাস্তব জ্ঞানের প্রয়োজন আরও বেশি। শত্রুর শক্তির উৎস এবং দুর্বলতা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকলে তার মোকাবিলা করা অসম্ভব।

শ্রীমতী জোন রবিনসন যদিও ভূমিকাতে এই ধরনের চাহিদা পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু তাঁর ৩৮ পাতার চটি বইটি* আমাদের সে প্রত্যাশা করে না।

চীনা পীপলস রিপাবলিক নামে কোনো রাষ্ট্রের উদ্ভব হবার ঢের আগে

---

* Notes from China : Joan Robinson, Monthly Review Press, New York. 75c.

থেকেই অবশ্য বামপন্থী কেইনসীয়ান শ্রীমতী রবিনসন সোভিয়েত ব্যবস্থার তথা মার্কসবাদের তীব্র সমালোচক ছিলেন এবং সেই কারণে কমিউনিস্ট মহলে নিন্দিতও হতেন প্রতিক্রিয়াশীল বলে। মার্কসবাদের প্রতিষেধক হিসাবে যে কেইনসীয় তত্ত্বের উদ্ভব, সেই তত্ত্বের অন্যতম প্রধান পুরোহিতের এই ভূমিকা অবশ্য বোধগম্য, যা বোধগম্য নয় তা হল তাঁর অন্ধ চীনা সমর্থকের ভূমিকা—যারা কিনা স্বঘোষিত শতকরা শতভাগ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী!

বছর তিনেক আগে বোম্বাইয়ের 'ইকনমিক উইকলি' পত্রের বার্ষিক সংখ্যায় এক প্রবন্ধে শ্রীমতী রবিনসন লিখেছিলেন অন্য দেশে চীন যে রাজনৈতিক লাইনের প্রবর্তন করতে চায় তা 'ডগম্যাটিক' (মতান্ধ) হলেও স্বদেশে তারা যে লাইন অনুসরণ করে তা 'প্রাগম্যাটিক' (অভিজ্ঞতানুসারী)। জানি না, শ্রীমতী রবিনসন (এবং বিশেষ করে এদেশে যাঁরা এই প্রবন্ধটি সাইক্লোস্টাইল করে বিলি করেছিলেন তাঁরা) এবংবিধ উক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেন কিনা। এর সোজা অর্থ, চীন সুবিধাবাদী। প্রশ্ন জাগে তবে কি এই কারণেই শ্রীমতী রবিনসন চীনের সমর্থক ?

'ইকনমিক উইকলির' পূর্বোক্ত প্রবন্ধের এই সিদ্ধান্ত যে কোনো অসতর্ক উক্তি ছিল না, আলোচ্য পুস্তিকার প্রথম প্রবন্ধ 'দ্য চাইনীজ পয়েন্ট অব ভিউ' থেকেও তা প্রমাণ করা যায়। এই প্রবন্ধে তিনি লেখেন—"আমার মনে হয় তাঁরা যে প্রকাশ্য উক্তিতে ভাবাদর্শগত শৈলী ব্যবহার করেন তার কারণ তাঁরা মনে করেন এইরূপ করাই বিধেয়।" (They use the ideological style in public pronouncements, I suppose, because they think it is the right thing to do) সাদা বাংলায় এর মানে দাঁড়ায় চীনা নেতাদের 'আদর্শগত শৈলী' (ideological style) একটা ভান মাত্র! শ্রীমতী রবিনসন অবশ্য পরের অনুচ্ছেদেই চীনা নেতাদের মার্কসবাদ ভক্তির সার্টিফিকেট দেন, কিন্তু তা দিতে গিয়েও আবার লেখেন, 'এই ব্যাপারে এই মতের যুক্তিসংগত আধেয় নয়, এর সুস্পষ্ট শক্তিই বিশ্বাস কাড়ে'। (In these matters, it is not the logical content of the creed, but its manifest power that commands belief.)

কিন্তু মার্কসবাদ এবং তাতে চীনা নেতাদের আস্থা সম্পর্কে শ্রীমতী রবিনসনের মতামত যাই হোক না কেন, তাদের রাজনৈতিক লাইন তিনি এই প্রবন্ধে বিশদভাবে আগাগোড়া সমর্থন করে যান, যদিও

তা করতে গিয়ে তিনি কখনও কখনও হাস্যকর ও পরস্পরবিরোধী উক্তি করেন।

এই প্রবন্ধে শ্রীমতী রবিনসন অবশ্য নতুন কথা বিশেষ কিছু বলেন নি, ১৯৬২ সনের ১৪ই জুন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠিতে সোভিয়েত পার্টির নীতিকে আক্রমণ করে যে-বক্তব্য হাজির করা হয়েছিল, তিনি মোটের উপর বিশ্বস্তভাবে তারই পুনরাবৃত্তি করেন এবং তাদেরই মতো যুক্তির অভাব পূরণ করেন উষ্মা দিয়ে।

বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। গুটিকয় মাত্র উদাহরণ দেব :

(১) শ্রীমতী রবিনসন লেখেন, "সে (চীন) ভালো করেই জানে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী তো দূরের কথা, এমন-কি কোনো প্রগতিশীল শক্তিও নেই যা তাদের গভর্ণমেণ্টকে কোনো প্রকারের ধ্বংসলীলা থেকে সংযত করতে পারবে বলে ভরসা রাখা যায়।"

ভিয়েৎনাম নীতি নিয়ে আমেরিকায় যে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে, যার কিছু কিছু আভাস এদেশের খবরের কাগজেও আজকাল পাওয়া যায়—জানি না তারপর, শ্রীমতী রবিনসন তাঁর মত বদলেছেন কিনা, কিন্তু এটা যে পরাজয়বাদী যুক্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

(২) প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের বিরোধ কী নিয়ে তা বলতে গিয়ে শ্রীমতী রবিনসন লেখেন: "রুশ বক্তব্য আকাড়াভাবে বললে দাঁড়ায় এই: আমেরিকানরা বিপজ্জনক। ছোটো কোনো দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ছোটোখাটো কোনো আক্রমণের বদলা নিতে গিয়ে তারা পৃথিবীকেই উড়িয়ে দিতে পারে। সুতরাং বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে ধীরে চলাই শ্রেয়। শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রী শিবিরের শক্তি বেড়ে যাবে এবং সকলের জন্য জাতীয় মুক্তি আপনা থেকেই আসবে।" (The Russian case may he crudely stated thus : The Americans are dangerous. They are quite capable of blowing up the world in retaliation for some minor attack on Imperialism in some small country. Much better to go slow and avoid danger. In the long run the strength of the socialist camp will grow and national liberation for all will come of itself.)

এক্ষেত্রেও শ্রীমতী রবিনসন বিশ্বস্তভাবে চীনা নীতি অনুসরণ করেছেন

—অর্থাৎ সোভিয়েত বক্তব্য যা তা যথাযথভাবে উপস্থিত না করে যা হলে তার সোভিয়েতবিরোধী প্রচারের সুবিধা হয় তাকেই সোভিয়েত বক্তব্য বলে হাজির করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ক্রুশ্চেভের আমলেই ১৯৬২ সালে চীনের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে খোলাচিঠিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও সহাবস্থান তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁদের নীতি দ্ব্যর্থহীনভাবে পুনর্ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা লিখেছিলেন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তত্ত্ব শুধু সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মানে এই নয় যে শ্রমিকশ্রেণী ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম বন্ধ করে দেবেন, পরাধীন দেশের মানুষ জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম করবেন না, বা বুর্জোয়া মতাদর্শের সঙ্গে আপস করা হবে। (…"when we speak of peaceful co-existence we mean the inter-state relations of the socialist countries with the countries of capitalism. The principle of peaceful co-existence, naturally, can in no way be extended to the relations between the antagonistic classes in the capitalist states ; it is impermissible to extend it to the struggle of the working class against bourgeoise for its class interests, to the struggle of the oppressed peoples against the colonialists. The C P S U resolutely comes out against peaceful co-existence in ideology.")

কিন্তু কথায়ই আছে পিঠের প্রমাণ স্বাদে। মুখে গরম গরম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বুলি কপচান এক জিনিস আর কাজে সে নীতি অনুসরণ করা আর-এক জিনিস। যদি এমনটা দেখা যেত, চীনই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে কার্যকর সাহায্য দিচ্ছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন দিচ্ছে না, চীন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতে বাধা দিচ্ছে তা হলে সোভিয়েত নেতাদের অন্যতর দাবি সত্ত্বেও আমরা শ্রীমতী রবিনসনের সঙ্গে একমত হতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাস্তব চিত্র অন্যরূপ। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাহায্য না পেলে চীনা বিপ্লব সফল হতো কিনা সে প্রশ্ন না হয় নাইবা তুললাম—সোভিয়েত সাহায্য না পেলে যে আলজিরিয়ার বিপ্লব সফল হতো না এবং বিপ্লবী

কিউবা একদিনও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারত না নিতান্ত ভক্তিবাদী চক্ষুহীন ছাড়া আর কে তা অস্বীকার করবে? কে অস্বীকার করবে যে সোভিয়েতের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া সুয়েজ থেকে হাত সরাতে অ্যান্টনি ইডেনকে বাধ্য করা যেত না? কিন্তু অতো পিছনে যাবার কী দরকার—চীনের ঘরের পাশে ভিয়েৎনামে মার্কিন বর্বরতার যে উলঙ্গ তাণ্ডব চলছে দিনের পর দিন—তার প্রতিরোধে ভিয়েৎনামের বীর যোদ্ধাদের কার্যকর সাহায্য দিচ্ছে কে? চীন অবশ্য শ কয়েক কঠোর প্রতিবাদলিপি আমেরিকার উদ্দেশে বর্ষণ করেছে—কিন্তু দুঃখের বিষয় শক্ত কথায় হাড় ভাঙে না। ভিয়েৎনামকে কার্যকর সাহায্য যা কিছু তা সোভিয়েত ইউনিয়নই দিচ্ছে চীন তাতে বরং প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয় আমেরিকান সেভেন্‌থ ফ্লিট পানীয় জল নেয় হংকং থেকে আর সে জল হংকং-এ আসে চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। অর্থাৎ, একদিকে চীন যখন ভিয়েৎনামে প্রত্যক্ষভাবে সোভিয়েত অস্ত্রসরবরাহে বাধা দিচ্ছে তখনই আবার পরোক্ষভাবে ভিয়েৎনামের জল্লাদদের পানীয় জল সরবরাহ করছে। জানতে ইচ্ছে করে, চীনের এই কার্যের কী ব্যাখ্যা আছে শ্রীমতী রবিনসনের আস্তিনের তলায়?

(৩) পারমাণবিক বোমা সম্পর্কে শ্রীমতী রবিনসন এক জায়গায় লেখেন, আমেরিকানরা মোটেই অতো বোকা নয়। তারা নিশ্চয়ই বোঝে উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামে পারমাণবিক বোমা নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে যাওয়া অবাস্তব এবং আন্তর্জাতিক পারমাণবিক যুদ্ধে পুঁজিবাদের ধ্বংস অনিবার্য। (The Americans, after all, are not as mad as all that. They must recognise that to intervene in an anti-colonial war with atom bombs is absurbed and that an international atomic war would mean the end of capitalism.) শ্রীমতী রবিনসন আরও বলেন চীনারা মনে করে পারমাণবিক বোমা থাকলেও আমেরিকানরা তা ব্যবহার করবে না বা করতে পারবে না কেন না তা হলে তাদের আর মুখ থাকবে না এবং তাদের বিশ্বজয়ের বাসনার সমাধি ঘটবে। (...they [China] have been maintaining all along that U. S. administration do not use atomic weapons because to do so would finally discredit them and bring their hopes of world

dominance to an end.) পরের লাইনেই তিনি বলেন, পারমাণবিক শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে তাদের অর্থনীতির সর্বনাশ করলে তাতে চীনের নিরাপত্তা বৃদ্ধি হবে না। (However, it would not increase their security to ruin their economy by setting up as an atomic power.) এই প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে, চীন তখনও পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে নি। কিন্তু ঐ বছরেরই অক্টোবর মাসে চীন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী রবিনসনের মতটাও যায় বদলে। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে কলকাতার 'নাউ' (Now) পত্রিকায় চীনের বোমা বানানো সমর্থন করে এক প্রবন্ধে তিনি লেখেন—একমাত্র চিন্তায় যাঁরা ইচ্ছাপূরণ করেন তাঁরাই বলতে পারেন আমেরিকাকে ভয় পাবার কিছু নেই। (I have always been strongly opposed to the so-called independent deterrent for Britain but it seems to me that situation of China is very different....wishful thinkers can say that it is non-sense to be afraid of America...). এবং এই প্রবন্ধেই তিনি আবার ভারতীয় পাঠকদের উদ্দেশ করে বলেন—আপনারা যাকে বিপদ বলে মনে করেন তার সম্পর্কে আপনাদের প্রতিক্রিয়া যখন এতো প্রবল হয় তখন চীনাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেন আপনারা সহানুভূতির সঙ্গে দেখতে পারেন না? (...my dear Indian readers, since you react so strongly to what you regard as a threat, can you not sympathise with the Chinese point of view?—Now, March 12, 1965).

শ্রীমতী রবিনসনের এই প্রশ্নটা তাঁকেই আমরা ঘুরিয়ে করতে পারি—চীন নিজেকে বিপন্ন মনে করলেই, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পারমাণবিক অস্ত্রবল যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, যদি তার পক্ষে পারমাণবিক বোমা বানানো যুক্তিযুক্ত হয় তবে অন্যের পক্ষেও—ব্রিটেন বা ভারতের পক্ষে তা যুক্তিযুক্ত হবে না কেন? শ্রীমতী রবিনসন অবশ্য অভয়বাণী দিয়েছেন চীনের বোমায় ভারতের ভয় পাবার কিছু নেই। কিন্তু যাদের ঘর একবার পুড়েছে—তারা কি অতসহজে আশ্বস্ত হয়! বিশেষ করে এই সেদিনও যখন পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ চলছিল, চীন যেরূপ চরমপত্রের খেলা দেখাল তারপর?

আমরা ভারতবাসীরা অবশ্য বোমা তৈরির বিরুদ্ধে—কিন্তু সে এই কারণে

নয় যে চীনের বর্তমান নেতাদের মতিগতিতে ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা বোমা তৈরির বিরুদ্ধে নীতিগত কারণে—পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার আমরা চাই না। আমরা বোমা তৈরির বিরুদ্ধে কারণ তাতে আমাদের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবে। আমরা বোমা তৈরীর বিরুদ্ধে—কারণ পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা প্রতিযোগিতার একমাত্র পরিণতি পারমাণবিক যুদ্ধ—যার অর্থে মানবজাতির ধ্বংস। ভারতবর্ষ আয়তনে এবং লোকসংখ্যায় চীনের থেকে খুব ছোটো নয়—তা সত্ত্বেও আমরা এ কথা বলা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ মনে করি যে, অর্ধেক পৃথিবী ধ্বংস হলেও অপর অর্ধেক পৃথিবী অবশিষ্ট থাকবে যেখানে সমাজতন্ত্র গড়া যাবে!

(৪) ভারত-চীন সীমান্ত-বিরোধ সম্পর্কেও শ্রীমতী রবিনসন একবাক্যে রায় দেন যে, সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে ভারতীয় ভাষ্য অপেক্ষা চীনের বক্তব্য অনুসরণ করা অনেক সহজ। (The Chinese story of the border question is easier to follow than the Indian version.) সেই চীন ভাষ্যটা কি? না, চীন সর্বদাই আলোচনার মধ্য দিয়ে মীমাংসা চেয়েছে, ভারতবর্ষ তা করে নি। তারা শুধু আঞ্চলিক দাবি জানিয়ে গেছে, চীনা ঘাঁটির পিছনে গিয়ে ঘাঁটি গড়ে প্রতিশোধ ডেকে এনেছে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালের অক্টোবরে চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেছে এবং চীন বাধ্য হয়েছে তার জবাব দিতে।

জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, ভারতের বক্তব্যও তো প্রায় একই তবে তা বুঝতে শ্রীমতী রবিনসনের অসুবিধা হয় কেন? সে কি এই কারণে যে তিনি সে বক্তব্য মানতে চান না?

কেসলার এক সময়ে লিখেছিলেন, আমরা প্রথমে বিশ্বাস করি তারপর সেই বিশ্বাসের সপক্ষে যুক্তি খুঁজি! অন্তত শ্রীমতী রবিনসনের ক্ষেত্রে কথাটা হয়তো সত্যি আর তিনি কি বিশ্বাস করবেন আর কি বিশ্বাস করবেন না, তা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাতে অন্যের কিছু বলার নেই। কিন্তু তিনি যা বিশ্বাস করবেন তাকেই সত্য বলে দাবি করলে সে দাবি মেনে নেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে বই কি! বিশেষ করে আমরা যখন জানি ১৯৫৯ সালটা ১৯৬২ সালের আগে এবং ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসেই পণ্ডিত নেহরু চু এন-লাইয়ের কাছে এক পত্রে সীমান্ত সমস্যার পাকাপাকি সমাধানের প্রস্তাব তুলেছিলেন। ছ'মাসের মধ্যে সে পত্রের কোনো জবাব পাওয়া

যায় নি। সেপ্টেম্বর মাসে সে চিঠির জবাব যখন এলো তাতে মীমাংসার কোনো কথা তো থাকলই না, বরং নেফার ভারতীয় অঞ্চলের উপর দাবি জানান হলো, যদিও মাত্র ন মাস আগেই (১৯৫৯ সালের ২৩শে জানুয়ারি) নেহরুর কাছে এক পত্রে চু এন-লাই আশ্বাস দিয়েছিলেন যদিও সরকারীভাবে ম্যাকমেহন লাইন চীনা সরকার স্বীকার করেন না তবু, "ম্যাকমেহন লাইন সম্পর্কে মোটের উপর বাস্তব দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা" তারা অনুভব করেন। লাদাখ অঞ্চলে যে ন জন পুলিস গুলিতে নিহত হলো তারা ছিল ভারতীয় এবং সেগুলি ছুঁড়েছিল চীনা সৈন্যেরাই এবং চীন-ভারত সীমান্তবিরোধে সেই প্রথম রক্তপাত। কিন্তু এ-সব সাম্প্রতিক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই—ভারতবাসীর তা জানা আর পাল্টা তথ্য দিলেই শ্রীমতী রবিনসনের বিশ্বাস টলবে এ-আশা দুরাশা। শ্রীমতী রবিনসন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের সেই অ্যালিসের মতো সব জিনিসকেই উল্টো দেখেন! তাই 'নাউ' পত্রিকার প্রবন্ধে যদিও তিনি লেখেন, "...they have established the position that they *want*...(ইটালিকস সমালোচকের) এবং যদিও স্বীকার করেন 'their (chinese) attitude about the whole affair is self-righteous' তবু তিনি সেই পুরনো গালগল্পের পুনরাবৃত্তি করতে ছাড়েন না— 'the Chinese Frontier Guards were obliged to counter-attack...' ইত্যাদি। জানি না, অর্থনীতি শাস্ত্রে পণ্ডিত হলে যুক্তিশাস্ত্রের বিধান হয়তো তার উপর প্রযোজ্য নয়।

(৫) তিব্বত সম্পর্কে শ্রীমতী রবিনসন বলেন ওয়েলস্ যেমন যুক্তরাজ্যের অংশ তিব্বত তেমনি চীনের অংশ। তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌমত্ব অবশ্য ভারত মেনে নিয়েছে এবং দেশে-বিদেশে প্রতিক্রিয়াশীলদের চাপ-সত্ত্বে এখনও ভারত সরকার সে নীতিতে অটল আছে। তবু তিব্বত সম্পর্কে চীনের নীতি আর-একটি সমাজতন্ত্রী দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়—সে দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত নীতির সঙ্গে চীনের নীতির কত না তফাৎ!

তিব্বতিরা, শ্রীমতী রবিনসন যাই বলুন না কেন, চীনা নয়, হানতো নয়ই। তিব্বত রাজনৈতিক ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবেও চীনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা নয়। সে রাজ্য দীর্ঘকাল ছিল ইংরেজের অধীন এবং ইংরেজ চলে যাবার পর ভারতের প্রভাবাধীনে। তিব্বতের উপর চীনাদের দাবির

একমাত্র আইনগত ভিত্তি হলো এই যে সুদূর অতীতে মাঞ্চুরাজারা এই রাজ্য অধিকার করেছিল। মাও সে-তুঙের দল ক্ষমতায় আসবার পর এই ভিত্তিতেই তিব্বতের উপর দাবি জানায়। এটা ভারতবর্ষের পক্ষে উদারতার পরিচয় যে এই দাবি সে মেনে নেয়। এর সঙ্গে তুলনা করুন সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত। এক সময় প্রায় সমগ্র পূর্ব ইওরোপ ছিল জার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। বলশেভিকরা ক্ষমতায় আসার পর প্রথম যে-কাজ তারা করে তা হলো সমগ্র পূর্ব ইওরোপকে মুক্তি দান এবং যেখানে যার সঙ্গে যতো অন্যায় চুক্তি ছিল তা বাতিল ঘোষণা। সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার অর্ধশতাব্দী অতীত হতে চলল—সীমান্ত নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কখনো কারো সঙ্গে রক্তক্ষয়ী কলহ হয়েছে বলে জানা নেই। আর চীনা পীপলস রিপাবলিকের ১৬।১৭ বছরের অস্তিত্বের মধ্যে প্রায় সকল প্রতিবেশীর সঙ্গেই সীমান্ত নিয়ে তার কোনো-না-কোনো সময়ে কলহ হয়েছে—সোভিয়েত ইউনিয়নও বাদ যায় নি।

তাছাড়া তিব্বত থেকে যে দলে দলে শরণার্থী ভারতে আসছে তারই বা কী ব্যাখ্যা দেবেন শ্রীমতী রবিনসন। বাংলা দেশের অধিবাসী আমরা জানি একান্ত বাধ্য না হলে কোনো মানুষ তার বাপ-পিতাম'র ভিটে ছেড়ে সহজে নড়ে না।

(৬) চীনের অর্থনীতির বিকাশ সম্পর্কে শ্রীমতী রবিনসনের বক্তব্য বরং অনেক পরিমাণে বাস্তবানুগ। আলোচ্য পুস্তিকার দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'দ্য পীপলস কমিউন' এবং 'নাউ' পত্রিকার পূর্বোক্ত প্রবন্ধে শ্রীমতী রবিনসন স্বীকার করেন: ১৯৫৮ সালে 'মস্ত লাফ' নীতি গৃহীত হবার পরেই ১৯৫৯-৬১ সালে চীনে প্রবল অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে যায়। এবং তিনি এও স্বীকার করেন, এর জন্য দায়ী কল্পনাবিলাসী পরিকল্পনা। ('It is certainly true that in the exalted mood of the Great Leap in 1958 there was much Utopean and some schemes were started which proved impracticable.' 'নাউ' এর প্রবন্ধে তিনি লেখেন: It is true that the fervour and exaltation, and the exaggerated hopes, of the Great Leap in 1958 were followed by the bitter years' 1959-61, a very serious set back to Chinese economic development.') ১৯৫৯-৬১ সালে চীন যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল এ-তথ্যও একদিন উড়িয়ে দেওয়া হতো বুর্জোয়া এবং 'সংশোধনবাদী' প্রচারনা বলে আর এই

বিপর্যয় যে চীনাদেরই উচ্চাভিলাসী কল্পনাবিলাসী পরিকল্পনার ফল এ-পাপ কথা শুনলে তো অনেকে মূর্ছাই যেতেন। পেছনের উঠোনে ইস্পাত তৈরির পরিকল্পনাকেও শ্রীমতী রবিনসন 'fanciful experiment' বলে বর্ণনা করেছেন এবং তা যে ব্যর্থ হয়েছে তাও স্বীকার করেছেন। শ্রীমতী রবিনসন এও বলেছেন যে 'তিক্ত বছরগুলির' অভিজ্ঞতা 'কমিউন' থেকে অনেক বাজে জিনিস ঝেড়ে বাদ দিয়েছে। (The bad years, it is true, wrung a good deal of nonsense out of them—Now, March 12, 1965) শ্রীমতী রবিনসন যা স্বীকার করেন নি তা হলো এই যে এই পরিবর্তন এবং পরিবর্জনের ফলে আগে যাকে কমিউন বলা হতো আর এখন যাকে কমিউন বলা হয় তার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ ঘটে গেছে, এখনকার কমিউন যৌথখামারেরই অন্য একটা নামে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কমিউন যখন প্রথম প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন তাকে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট সমাজের অবয়ব বলে। বলা হয়েছিল এর মধ্যে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি, (এমন কি এমন ইঙ্গিতও করা হয়েছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নেরও আগে) কমিউনিজমের স্তরে পৌছন যাবে—সোশ্যালিজমের স্তরকে এক লাফে ডিঙিয়ে।

শ্রীমতী রবিনসন এ-প্রসঙ্গে আরও যে-কথা উল্লেখ করেন নি তা হলো এই যে, ১৯৫৯-৬১-র বিপর্যয় অনিবার্য ছিল না। চীন যখন অর্থনৈতিক অ্যাডভেঞ্চারিজমের পথ নেয় তখনই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল-এর ফল-পরিণাম বিপর্যয়মূলক হবে। কমিউনিজমে পৌছবার কোনো সোজা রাস্তা নেই, 'ঐতিহাসিক স্তরগুলিকে' এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।

বিপর্যয়োত্তর কালে চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির এক উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন শ্রীমতী রবিনসন। তিনি অবশ্য কোনো তথ্যাদি দেন নি এবং তার বক্তব্য থেকে মনে হয় অগ্রগতি হয়েছে প্রধানত কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রেই তবু চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে খাটো করে দেখা ভুল হবে। নানা সূত্রেই চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির খবর আজকাল পাওয়া যাচ্ছে—আর সে-সব সূত্র সবই চীনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এমনও নয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাণশক্তির এইটেই পরিচয় যে বিকৃতি সত্ত্বেও তা খুঁড়িয়ে যাবার লাঠিকে এগিয়ে যাবার জয়রথে পরিণত করে। সুতরাং ভারতবাসীর উচিত হবে আত্মসন্তুষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে না থেকে—অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সব কিছু বাধা-বিঘ্ন অপসারণ করে অতিদ্রুত আত্মনির্ভরতার দিকে অগ্রসর হওয়া।

পুস্তক-পরিচয়

বার্নার্ড শ: ভাষাচিন্তা

On Language: Bernard Shaw. Edited by Dr. Abraham Tauber. Peter Owen, London. First British Commonwealth edition, 1965. 30 Shillings.

বার্নার্ড শ'-এর রচনাবলীতে বিভিন্ন সমস্যার উপস্থাপনা পাঠকসমাজে পরিচিত; এবং যে-কোনো কারণেই হোক, এ ধারণাটাও প্রায় স্বতঃসিদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যে, শ' উপস্থাপিত সমস্যাবলী অনেকাংশেই তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি। বার্নার্ড শ'-কে কোনো সর্বজনীন সমস্যার অংশীদার হিসেবে স্বীকার করতে সাধারণ পাঠক প্রায়শই দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু সর্বদা না হোক, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বার্নার্ড শ'-ও যে সর্বজনীন সমস্যার সমাধানে অগ্রণী তার প্রমাণ ইংরেজি ভাষার বানান ও লিপিসংস্কার সংক্রান্ত শ'-এর রচনাবলী। প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে বিভিন্ন উপলক্ষে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষা সম্পর্কিত রচনার সংকলন প্রকাশ করেছেন পীটার ওয়েন, ডঃ আব্রাহাম টোবার-এর সম্পাদনায়।

ইংরেজি ভাষার বিশ্ব-বিখ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে এর বানান এবং উচ্চারণের বিভ্রান্তিকর অসহযোগিতাও স্বীকৃত। ছাব্বিশ অক্ষরের ইংরেজি বর্ণমালায় বহু স্বর এবং কোনো কোনো ব্যঞ্জন দৃশ্যত অনুপস্থিত থেকেও কার্যত সক্রিয়। সমকালীন ইংরেজি ভাষায় চুয়াল্লিশটি ধ্বনির বাহন মাত্র ছাব্বিশটি বর্ণ; আবার প্রচলিত বানানবিধিতে প্রযুক্ত অজস্র স্বর এবং ব্যঞ্জন ধ্বনিহীন। ভাষার সুষ্ঠু এবং সাবলীল শিক্ষা ও ব্যবহারে এই অসহযোগিতা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। ধ্বনি-নির্ভর বানানবিধি এ-সমস্যার একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান। আর, ধ্বনি-নির্ভর বানানবিধি প্রচলনের প্রথম অধ্যায় বর্ণমালার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, মার্জনা ও সংযোজন। নতুন বর্ণমালার ব্যবহার সমসাময়িক কালে বার্নার্ড শ'-এর অন্যতম নিরীক্ষা বলে অভিহিত হলেও, বর্তমান 'ধ্বনিলিপি' (Phonetic Script) বহুলাংশে শ'-এর চিন্তাধারারই সমান্তরাল। কথ্য-ইংরেজি শিক্ষার কালে ধ্বনি-নির্ভর বর্ণমালা অতি-আবশ্যিক।

ভাষাশিক্ষার যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে Phonetic Script-ই ইংরেজি Received Pronunciation-এর একমাত্র বাহন।

ধ্বনি-নির্ভর বানান প্রচলনের ক্ষেত্রে প্রচলিত বানানবিধির সঙ্গে আপস রফা অসম্ভব। দুটোই পাশাপাশি উপস্থিত থাকলে বানান এবং উচ্চারণ দু-রকমের লিপিতে আলাদা করে শিখতে হবে—যাতে প্রায় দুটো ভাষা শিখবার সময় ও শ্রম প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে বানান সরলীকরণ সমিতির সঙ্গে বার্নার্ড শ'-এর অসহযোগিতা আপাতত অসহিষ্ণুতা মনে হলেও যুক্তিগ্রাহ্য। নাটকের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাষারীতি ও বাচনভঙ্গি চরিত্রের দেশ, কাল এবং সামাজিক স্তরের দ্যোতক। সংলাপে একমাত্র ধ্বনি-নির্ভর লিপি ব্যবহারেই অভিনেতার পক্ষে বাচন ও উচ্চারণভঙ্গির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ সম্ভব। প্রচলিত বানানবিধিতে লিখিত শব্দবিশেষের উচ্চারণবৈশিষ্ট্য নির্দেশ কষ্টকর। বিশেষ চরিত্র বিশেষ শব্দ কী ভাবে উচ্চারণ করবে সেটা নাট্যকারের জানবার কথা সবচাইতে বেশি এবং তাঁর সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী উচ্চারণ (নাট্যকারের ব্যক্তিগত উপস্থিতি যখন সম্ভব নয়) সম্ভব বার্নার্ড শ' প্রদর্শিত পথে।

প্রচলিত ইংরেজি লিপির বিরুদ্ধে সময় সংক্ষেপের যুক্তিটি হয়তো বার্নার্ড শ'-র ব্যক্তিগত—কিন্তু নাটকের সংলাপে, ভাষাশিক্ষায় ও ব্যবহারে ধ্বনি-নির্ভর বানান ও বর্ণমালার প্রয়োগ-সংক্রান্ত যুক্তি ইদানীং প্রায় সবকটিই স্বীকৃত। বিশ্ব-ভাষা হিসেবে পরিচয়ে ভাষার প্রয়োজনীয় মৌলিক গুণাবলী সম্পর্কে বার্নার্ড শ'-এর সঙ্গে মতদ্বৈতের অবকাশ নেই।

নতুন বর্ণমালার প্রয়োগে ধৈর্যের পক্ষপাতে, ইংরেজি h-এর এবং Cockney উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে বার্নার্ড শ' নিরূপিত তথ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির এবং অনুসন্ধিৎসার প্রমাণ। ভাষাতাত্ত্বিক (?) বার্নার্ড শ' নিতান্তই অল্প পরিচিত। তাঁর উইল এবং এই রচনাবলী ইংরেজি ভাষার প্রতি বার্নার্ড শ'-এর নিষ্ঠা ও অনুরাগের প্রামাণ্য দলিল।

শ' প্রদর্শিত পন্থা হয়তো ত্রুটিহীন নয়; কিন্তু প্রয়োজনের অনুভবে এবং সমস্যার অনুধাবনে যে চিন্তাশীলতার পরিচয় এই সংকলনে উপস্থিত, বর্তমান ধ্বনি-নির্ভর বানানবিধির যুগে সেটা নিঃসন্দেহে পথিকৃতের। সমসাময়িক ভাষাতাত্ত্বিক বা বানান সরলীকরণ সমিতির সঙ্গে মতবিরোধ এবং নিজস্ব মতে অবিচল আস্থা—এ তাঁর চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যবোধের নিদর্শন।

এই সংকলনে সংযোজিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজি ভাষা সংস্কার সম্পর্কিত বার্নার্ড শ'-এর রচনা ও পত্রাবলী; Captain Brassbound's Conversion ও Pygmalion-এর অংশবিশেষ। Linguaphone Institute-কৃত record-এর বিষয়বস্তু, House of Commons-এ উত্থাপিত Spelling reform debate-এর মূল বক্তব্য, বার্নার্ড শ'-এর উইল, শ' কৃত নতুন বর্ণমালা এবং ডঃ আব্রাহাম টোবার ও স্যার জেমস্ পিটম্যান লিখিত পরিচিতি।

সরোজ চৌধুরী

বাংলা কবিতা : আধুনিকতার ইতিহাস

আধুনিক কবিতার ইতিহাস : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। বাক্-সাহিত্য, কলিকাতা-৯। ৭'৫০

বই-এর নামটিকে একটু বিস্তারিত করে বলে দেওয়া হয়েছে যে এটি 'বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সঞ্চার ও বিবর্তনের বৃত্তান্ত।' এই আলোচনার ভূমিকা রচনা করেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর 'সূচনা'য়; রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে এই আগন্তুক সাহিত্যস্পন্দন ও বিদ্রোহ প্রয়াসের ঘাত-প্রতিঘাত দেখিয়েছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে; রবীন্দ্রানুসারী কবিদের দানের মূল্য স্বীকার করেছেন অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে। এর পর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশক—আলোচ্য সময়ের এই তিনটি কালপর্ব বিভাগ করে নিয়ে প্রতি পর্বের উল্লেখযোগ্য আন্দোলন, সমস্যা ও সিদ্ধির আলোচনা করেছেন অশ্রুকুমার শিকদার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ও তারাপদ রায়। এবং এই ধারাবাহিক বৃত্তান্তগ্রন্থনের একটা সামঞ্জস্য সূত্র গেঁথেছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ফলশ্রুতি' প্রবন্ধে। এ ছাড়া তিনটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে শব্দ, ছন্দ ও ছন্দোমুক্তির দিক থেকে আধুনিক পরিবর্তনের আলোচনা করেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ ও দীপঙ্কর দাশগুপ্ত। এর পরে পরিশিষ্ট অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এমন অনেক আলোচনা ও তথ্যসমাহার যার মূল্যও কম নয়। কবিতার নতুন পাঠকগোষ্ঠী, তারপর 'চিত্রকল্প', 'রূপক', 'প্রতীক', 'পুরাণ', মুখচ্ছদ ইত্যাদির অর্থ এবং

নব্য ব্যবহার ইত্যাদি একদিকে। অপর দিকে কবিতাপত্রিকাগুলির তালিকা ও ভূমিকা, বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার কবিতা, কবিমনীষা ও পরিভাষা ও গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদি তথ্যভারসমৃদ্ধ রচনা।

সম্পাদকরা জানাচ্ছেন যে এই সংকলন 'দীক্ষিত'দের জন্য ততটা নয়, যতটা 'বৃহত্তর পাঠকসমাজের উদ্দেশে'। 'সংকলনের ঐকিক তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ না করে যেন নানান দৃষ্টিকোণের বৈষম্য ও সন্নিবেশে মূল প্রসঙ্গ নির্ধারিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।'

সম্পাদকদের প্রথমোক্ত প্রত্যাশাটির মধ্যেই রয়েছে কাব্যচর্চার জগতে একটি যুগপরিবর্তনের ইঙ্গিত। এখন একটা পাঠকগোষ্ঠী তৈরি হয়ে উঠেছে যাঁরা সকলেই সাহিত্যের ছাত্র বা অধ্যাপক নন অথচ কাব্যের রসাস্বাদনে ও তত্ত্ববিচারে যাঁরা আগ্রহী; বাংলায় সংগীত ও চিত্রের উচ্চাঙ্গ বা লোকশিল্প শাখার অনুরাগী ও সমঝদার মানুষের সংখ্যা যেমন বেশ বেড়েই চলেছে, এ-ও তেমনি। কাজেই সমালোচনা যদি শুধু শ্রোতার অসম্পূর্ণ প্রস্তুতির প্রশ্রয় না হয়ে শিল্পের সূক্ষ্ম রীতি ও রহস্যের মর্ম উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করে তাহলেও আজকের পাঠক মুখ ফেরান না। ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে যেটুকু মানস পরিশ্রমের প্রয়োজন তাতে তাঁরা রাজি।

তাছাড়া শুধু যুক্তিতর্কের সূক্ষ্ম বিন্যাস ও ব্যবহার নয়, শুধু বিচিত্র ভাব ও ভাবনার ব্যঞ্জনায় নয়, ভাষায়ও আজকালকার সমালোচনা কত নির্ভীকভাবে সৃষ্টিশীল তা এই বই থেকে বোঝা যাবে। সুধীন্দ্রনাথের 'স্বগত' যখন প্রকাশিত হয় তখন তার ভাষা ও স্টাইল তাদের কাঠিন্যে অনেক আগ্রহকে ব্যাহত করেছিল আবার অনেক মনকে ঐ অসাধারণত্বের দ্বারাই আকর্ষণ করেছিল। বর্তমান গ্রন্থেও ভাষা তৈরির ও ব্যবহারের একটা অবাধ স্বাধীনতার স্ফূর্তি পাঠককেও নিশ্চয় কিছুটা কৌতুক ও কৌতূহলাক্রান্ত করে তুলবে, তার মনে নীরস বাঁধাবুলির দায়মুক্ত কিছুটা স্ফূর্তির সঞ্চার করবে। কিন্তু হয়তো এই স্বাধীনতা কোনো-কোনো লেখক একটু মাত্রাতিরিক্ত ভাবেই ব্যবহার করেছেন। আর এমনও আশঙ্কা করি যে তাঁদের প্রত্যাশা যত উদারই হোক ভাষার নিষ্করুণ কাঠিন্য ও সংহতিচেষ্টার জন্য তাঁদের উক্তির বেশ কিছু অংশ 'সাধারণ' পাঠকের কাছে অস্পষ্টই থেকে যাবে। তবে, আগে যা বলেছি, কাঠিন্যই একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে পাঠক আকর্ষণ করতে পারে এবং তার ফলে লেখকরা প্রচারের দিক থেকে হয়তো তাঁদের প্রত্যাশিত সাফল্য পেতে পারেন।

আর-একটা কথা বলতে হচ্ছে। সংস্কৃত ব্যাকরণকে যদি আমরা তেমন আমল নাই দিই, তবু বাংলা ব্যাকরণ ও ঐতিহ্যও তো একটা আছে? 'রবি' থেকে 'রৈবিক' বিশেষণ কোন যুক্তিতে মেনে নেওয়া যায়? খুব মুক্তিবাদীদের কাছেও কি এটা গ্রহণযোগ্য হবে? এই ধরনের কিছু কিছু নব-উদ্ভাবন আছে (যার তালিকা দেবার প্রয়োজন নেই), যা না থাকলেই মনে হয় ভালো হতো।

ভাষার দিক থেকে যেমন, তেমনি ভাব ও ভাবনা সংগ্রহ, বিন্যাস ও আবিষ্করণের দিকেও একটা মুক্তির হাওয়া মনে এসে লাগে এই বইটি পড়তে পড়তে। একসময়ে, এই কিছুকাল আগেও, আমাদের দেশের সাহিত্যচিন্তার রকম ছিল হয় পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ও সূত্রের বশংবাদিতা এবং পারলে এদেশী সাহিত্যের বিচারে তার প্রয়োগ; এই প্রয়োগের কৃতিত্বও অর্জন করতেন অল্প লোকেই। আর নাহয়, সম্পূর্ণ সরল, বা কখনো কুটিল ও একগুঁয়েভাবে অশিক্ষিতপটুত্বের বিলাস, মৌলিক তর্জন-গর্জন। রবীন্দ্র-সমালোচনার একাধিক সংগ্রহ বেরিয়েছে, তার থেকে এই দু'রকমেরই নমুনা মিলবে। যে সমালোচকের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রীতি-নীতি বোঝবার সত্যই কিছুটা প্রস্তুতি আছে, শুধুই থাপছাড়া অসমঞ্জস স্মৃতিসাৎ করবার ক্ষমতা নয়, তাঁরাও অনেক সময় দেখা যায় হয় সম্পূর্ণ যান্ত্রিকভাবে, নতুন বিষয়ের পশ্চাৎপট পরিপ্রেক্ষ পরিকল্প ইত্যাদি বিবেচনা না করেই, নিয়মশাসন প্রয়োগ করছেন; নাহয় খুব নিপুণভাবে সমস্ত যুক্তিকে বাহিনীপরিচালন করে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর আগু ও নিজের অনুমোদিত সিদ্ধান্তের দিকে। আমাদের কবি ও সাহিত্যিকদের বহুপ্রচারিত রবীন্দ্রবিরোধ বা বিদ্রোহের যুক্তিভূমিকা অনেকটা এই ধরনের মনশ্চালনার উপরই প্রতিষ্ঠিত।

সুখের বিষয় আলোচ্য গ্রন্থের একাধিক লেখক নির্ভীক স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সমালোচনার জন্যে প্রয়োজনীয় অনেকগুলি গুণেরই অধিকারী। তাঁরা বিদেশী আইনকানুনই শুধু চর্চা করেন নি, যে সাহিত্যিক সৃষ্টির উপর সেইগুলির সম্পর্কণ (reference) ও প্রতিষ্ঠা তাও তাঁরা পড়েছেন। মূল বিদেশী সাহিত্যের ব্যাপকচর্চায় আজকের দিনের অনেক বাঙালি সাহিত্যিক অগ্রসর। কিন্তু তার চেয়েও আনন্দের কথা এই যে 'যা কিছু বিদেশী তাই ভালো', বা অ্যারিস্টটল বলেছেন এলিয়ট বলেছেন এমনকি আধুনিকতর অডেন বা লুই ম্যাকনিস বলেছেন অতএব তাই গ্রাহ্য—এমন মনোভঙ্গী তাঁদের নয়।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ব্রজেন শীল কি বলেছেন, সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ কি বলেছেন এ সবও বিবেচনা করতে প্রস্তুত। এই লেখকদের সমবেত দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটি ভারসাম্য বা বলা যাক দিক্‌সাম্য আছে। তার প্রমাণ রবীন্দ্রসৃষ্টি ও রবীন্দ্রসাহিত্য চিন্তার সাক্ষ্যকে এঁরা স্থিরচিত্তে গ্রহণ করে তার যোগ্য মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছেন। যে-নীতি এঁরা প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছেন তার মধ্যেও অবিকল্প মতাসক্তি (dogmatism) নেই, বরং আছে উদার আহ্বান ও আপ্যায়নের চেষ্টা। এঁরা নিজেরা কিছু কিছু যা চিন্তা করেছেন তা যে করেই হোক স্থাপন করবার জন্যে কোনো জেহাদ ঘোষণা করেন নি। ব্যাপকতর গভীরতর চিন্তার পথ উন্মুক্ত রেখেছেন।

এইসব কারণে বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে এঁদের স্বাগত জানিয়ে এইটুকু বলবো যে এঁদের চিত্তস্ফূর্তি ও চিন্তাস্ফুরণ বেশ উৎসাহবর্ধক হলেও ভাব-ভাবনার সুমেলিত পথপ্রসরণের এখনো অপেক্ষা আছে। কোনো-কোনো জায়গায় গভীরতর সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণী দৃষ্টির অবকাশ ছিল। সাময়িক দৃকপাতের জন্যও যে সব আদর্শের উল্লেখ করা হয়েছে তা হয়তো সেই প্রসঙ্গে যথাযথ নয়, যেমন ধরা যাক ব্রজেন শীলের অহংভোগের যান্ত্রিক দলীয়তা ও ব্যক্তিগত নিজস্বতা—এই প্রকারভেদের আলোচনা। ব্রজেন শীল বললেও ঐ egoistic subjectivity প্রসূত neo-romanticism আখ্যায় কি রবীন্দ্র-প্রতিভাকে বাঁধা যায়? সেই বাঁধন কি ওতে আছে? কিন্তু এই বিস্তৃত আলোচনার প্রলোভন এখানে ত্যাগ করলুম। এবং এইরকম আরো-কিছু উদাহরণ দেবার স্থান এখানে নেই।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে কয়েকটি শুধু তালিকা প্রস্তুত বা তথ্য সমাহারে নিযুক্ত। এরও মূল্য আছে। কিন্তু চিন্তাপটরচনায় যাঁরা প্রধান শিল্পী, যথা সম্পাদকদ্বয়, অশ্রুকুমার সিকদার, শঙ্খ ঘোষ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রভৃতির রচনা মূল্যবান এবং আধুনিক বাংলা কবিতাচর্চা যাঁদের সাধনা বা সখ তাঁদের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য। প্রতীক পুরাণ মুখচ্ছদ ইত্যাদি প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য ধারণাগুলি সম্বন্ধে এ দেশের অনেক অস্পষ্ট চিন্তার নিরসন হবে এই বই-এর প্রবন্ধগুলি থেকে। কিন্তু আরো ব্যাপক ও সুসমঞ্জস ধারণাবৃত্ত যার মধ্যে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে মানিয়ে নেওয়া যায়—তৈরি করার কাজ এখনো বাকি।

বই-এর নামের মধ্যে ঐ 'ইতিহাস' কথাটায় একটু নুন মিশিয়ে নিতে হবে। কারণ সম্পাদকদ্বয়ের নিজেদের ব্যাখ্যানই এর বিরোধী। তাঁরা যথাসাধ্য 'নানান দৃষ্টিকোণ'কে যদি সন্নিবেশিত করতে চেয়ে থাকেন তবে তাকে বলা যায় ইতিহাস-রচনা নয়, ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহ। সেই হিসাবে এই বইটির প্রধান মূল্য। এর লেখকরা কবিতা আলোচনাই করেন না, এঁদের অনেকে কবিতা লেখেন, কবিতাপত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত আছেন বা ছিলেন। এঁরা সমকালীন কবিদের কি চোখে দেখছেন, কাকে পছন্দ করছেন ও কেন—এই সাক্ষ্যটা এঁরা না দিলে জানতেই পারতুম না। কারো একাকীর রাজত্ব আজ আর নেই, গোষ্ঠীবন্ধন সুরু হয়েছে, (তবে সেটা অভিজাততন্ত্র না গণতন্ত্রের কাঠামোয় তা পরে দেখা যাবে)। এখন আমাদের আধুনিক কবিগোষ্ঠীর জগতে এই বই-এর মধ্য দিয়ে প্রবেশের পথ পেয়ে কৃতজ্ঞতাবোধ করছি।

সুনীলচন্দ্র সরকার

সিন্ধুপারের পাখি

নীল চন্দ্রমল্লিকা : কারেল চাপেক। অনুবাদ করেছেন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানি, কলকাতা। চার টাকা।

ফ্রান্সে যেমন মোপাসাঁ, রুশ দেশে যেমন চেখভ, তেমনি চেকোশ্লোভাকিয়ায় গল্প-লিখিয়েদের মধ্যে প্রমুখ হলেন কারেল চাপেক। 'আজও চাপেকের জনপ্রিয়তা চেকোশ্লোভাকিয়ায় আগের দিনেরই মতো আছে। হয়তো বেশি। চাপেকের বই-এর যে-কোনো নতুন সংস্করণ বাজারে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রি হয়ে যায়।'

চাপেক জাতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলেই নিখিল বিশ্বের কলাকোবিদদের মধ্যে তাঁর স্থান নিঃসন্দেহে খুব উঁচুতে। এহেন একজন লেখকের বই বাংলায় ইতিপূর্বে অনূদিত হয় নি—এইটেই আশ্চর্য।

সুখের কথা সে অভাব পূরণ করেছেন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যে এঁদের সহধর্মিতা কেবল পারিবারিক সম্বন্ধের প্রতিফলন নয়—পরন্তু চেক-ভারত সম্প্রীতির একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। লেখক

থেকে 'নীল চন্দ্রমল্লিকা'র আবির্ভাব বাংলায় অনুবাদসাহিত্যের দিক থেকে সর্বত অভিনন্দনযোগ্য।

কিন্তু এই আশ্চর্য গল্পের সংকলন সম্বন্ধে এইটেই শেষ কথা নয়। গল্প-সাহিত্যের নমুনা হিসেবে এগুলি সাহিত্যিক স্বীকৃতির দাবি রাখে—প্রধানত দুটো কারণে: বেশ কয়েকটি গল্প প্রথম শ্রেণীর, আর এমন উৎকৃষ্ট অনুবাদ কালেভদ্রে দেখা যায়।

লেখা যদি রচনা হয় অর্থাৎ তার মধ্যে যদি নির্মাণশৈলী বলে একটি পদার্থ থাকে, তবে গল্পলেখাকে আর্ট বলে অভিহিত করতে হয় এবং তেমন লেখার মূল্যমান নিরূপণ করতে হয় স্থাপত্যকৌশলের দিক থেকে। কারেল চাপেকের গল্পে এই রকম কুশলতা লক্ষণীয়। তিনি যেন ব্লু প্রিন্ট ও তাবৎ সরঞ্জাম এক্কা-কাট্টা করে তবে আসরে নেমেছেন। তার মানে এই নয় যে তাঁর গল্পে সংবেদনা অনুপস্থিত। কিন্তু চরিত্র ও ঘটনা বিন্যাসে তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব থেকে বোঝা যায় তিনি গল্পের ছক তৈরি করেছেন আগের থেকে ভেবেচিন্তে, অনুপ্রেরণার অনির্দিষ্ট স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন নি।

তাঁর এই গল্পসংগ্রহ থেকে দেখা যায় এগুলি তাঁর বিদগ্ধ সমাজচেতনা ও জীবন উপলব্ধির দ্যোতক। তাঁর গল্পগুলির নায়ক নায়িকা প্রধানত দুই শ্রেণীর—এক সমাজের চোখে যারা দোষী এবং দুই, সমাজ যাদের বসিয়েছে বিচারকের আসনে। এক ঝাঁক গল্প এসেছে তাঁর প্রথম পকেট থেকে, অন্য ঝাঁক দ্বিতীয় পকেট থেকে। একই কোটের দুই পকেট—যেন একই সত্যের এ-পিঠ ও-পিঠ। এই দুই পকেট থেকে গঙ্গোপাধ্যায়-দম্পতি বেছে নিয়েছেন মোট চোদ্দটি গল্প। নির্বাচিত গল্পগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্র হল এই যে তারা সুরে, আঙ্গিকে ও মেজাজে সমগোত্রীয়। কিছু শ্লেষ কিছুটা দরদ দিয়ে লেখা এই কটি গল্পে চাপেক নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন গল্পের চরিত্রগুলি তিনি সত্যভাবে জেনেছেন—যেমন ভাবে জানলে সবাইকে দোষে-গুণে ভালবাসা যায়। মানবপ্রীতির সেই স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন তাঁর জীবনেও—আমরণ ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরোধিতা করে। 'ডাকঘরের ঘটনাটি' গল্পের শেষ ছত্রে চাপেক যেন তাঁর জীবনদর্শনের সার সত্যটুকু বলে গেছেন: "আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলতে পারি—জানি না, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিসম্পন্ন কোনো ভগবান আছেন কিনা, কিন্তু যদি থাকেন তাহলে তাঁকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এটা বলতে পারি যে এমন একজন খুব বড়

কেউ আছেন যিনি অত্যন্ত বিচারসম্পন্ন। আমরা শুধু শাস্তিই দিতে পারি কিন্তু এমন একজন নিশ্চয় কেউ আছেন যিনি ক্ষমাও করতে পারেন।... সবচেয়ে সত্যিকারের এবং সর্বোচ্চ বিচার হচ্ছে ভালোবাসারই মতো অদ্ভুত ও বিশিষ্ট।" অনুবাদকদ্বয় তথা রূপা সংস্থার প্রকাশক এমন একটি বিদেশী ফুল বাঙালি পাঠককে উপহার দিলেন যা 'নীল চন্দ্রমল্লিকা'র মতোই দুষ্প্রাপ্য অথচ যা আলু শিমের সঙ্গে অনাদরে গুমটিঘরের একফালি বাগান আলো করে ফুটে আছে।

ক্ষিতীশ রায়

অন্যনগরের কথা

শিল্পনগরী। সুজিত রায়। অভিপ্রকাশ। চারটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অভ্রআবীর। নীলরতন মুখোপাধ্যায়। বুকস্ট্যাণ্ড। ছটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

'শিল্পনগরী' বইটায় অনেক চরিত্র রয়েছে, অনেক দুঃখকষ্টের কথা, কলেজে পড়া যুবক সুকান্তর ইস্পাত কারখানায় নিজেকে মানিয়ে নিতে না-পারার দায়, ধর্মঘট, দালালি, প্রেম (এবং একটিছেলে-দুইটিমেয়ের ত্রিভুজাত্মক প্রেম) ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ব্যাপার রয়েছে একশ ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা জুড়ে। ভাষাটি সহজ, কোনো নতুনরীতি-টিতি করা হয় নি, সুতরাং পড়তে কষ্ট হয় না। টানা গল্প, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই 'শিল্পনগরী' শেষ হয়ে যায়। কিন্তু শ্রীযুক্ত রায় কি ঠিক এইটাই চেয়েছিলেন? অর্থাৎ দেড়ঘণ্টায় মোহনপুর নামে শিল্পনগরী দর্শন? তাহলে উদ্দেশ্য তাঁর বহুলাংশে সফল। বহুলাংশে, কেননা কোনো-কোনো জায়গায় হোঁচট খেতে হয়। সুকান্তর সঙ্গে অফিসার বোসসাহেব-দুহিতা অরুণার প্রণয়পর্ব পড়ে মনে হয়েছে জ্যোতির্ময় রায়ের 'উদয়ের পথে'র কাল এখনও শেষ হয় নি। কিন্তু সত্যিই এ-ধরনের ব্যাপার ভীষণ বানানো ঠেকে। আবার এই ঘটনা দিয়েই বইটি শেষ হয়েছে। (কাঁধে মৃদু স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠল সুকান্ত।... ফিরে তাকিয়ে অবাক হোলো—"অরুণা! তুমি? এ সময় এখানে?" "জানি, তুমি কাউকে চাওনা সুকান্ত আশাও কর না।..." প্রভৃতি।) কিন্তু লেখক চমৎকার ফুটিয়েছেন কারখানার পরিবেশ, সুকান্তর বাবা তথা অভাবের সংসারটি এবং কারখানা-ধর্মঘটের নেপথ্যসমাচার। এর মধ্যে

অভিনবত্ব নেই, কিন্তু বাস্তবতার প্রতি নিষ্ঠা রয়েছে। সেইজন্যে 'শিল্পনগরী' সুখপাঠ্য বই। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনো রেশ রেখে গেল না এই বইখানি, দুঃখ এখানেই। শেষতম অনুচ্ছেদটি যেখানে লেখা রয়েছে: "জীবনধারণের শক্তি ও মৃত্যুবরণের সাহস আমি মোহনপুরের কাছ থেকে পেয়েছি, এ কথা কোনোদিন ভুলব না। মনে মনে এ স্বীকৃতি উচ্চারণ করতেই যে কান্না এতক্ষণ প্রাণপণ চেপে রেখেছিল সুকান্ত তা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।"— মর্মস্পর্শী; কিন্তু সমস্ত বইটিতে এই উপলব্ধির জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করা হয় নি, বরং নানান কাহিনী আর চরিত্রের মিছিলে 'শিল্পনগরী' কেমন যেন রিপোর্টাজধর্মী বই হয়ে গেছে।

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের বিষয়বস্তুর কেন্দ্রভূমিও শ্রমিক-এলাকা তথা শিল্পশহর যা গড়ে উঠেছে অভ্রখনিকে নিয়ে। নায়ক ইঞ্জিনিয়ার, এবং আগাগোড়া বইখানিতে তাঁর কোনো নামগত পরিচয় রহস্যজনকভাবে অনুপস্থিত। সর্বক্ষণই ইঞ্জিনিয়ার এটা করলেন, ইঞ্জিনিয়ার ওটা করলেন— পড়তে খারাপ লাগে। তা ছাড়া সুজিতবাবুর বইখানিতে যেমন শ্রমিক-জীবনের নানা সমস্যার অবতারণা থাকায় 'ইস্পাতনগরী' প্রায়ই শ্রমজীবীদের কাহিনী বলে মনে হয়েছে, 'অভ্র-আবীর' তেমনটি আদৌ নয়। অভ্র-আবীরের ক্যানভাস হচ্ছে রাজস্থানের অভ্র-এলাকা; কিন্তু পাত্রপাত্রীদের আচার ব্যবহার যে-কোনো উপন্যাসের—স্থূল অর্থে সামাজিক উপন্যাসের—চরিত্রের মতোই ব্যক্তিগত; কখনো তা প্রেম, কখনো তা বাৎসল্য আর এইরকম নানান সহজে হার্দ্য অনুভূতিকে ঘিরে এইসমস্ত আচরণের জন্ম। আসল কথা, শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ও গল্পই বলতে চেয়েছেন, মোটামুটি জমাট গল্প; এবং সার্থকতার দিক দিয়ে সুজিতবাবুকে কমবেশি ছাড়িয়েও গেছেন। কারণ শেষোক্ত লেখক যেখানে নাটকীয় এবং বানানো বিয়োগসমাপ্তি টেনেছেন, নীলরতনবাবু সেখানে কিন্তু বেশ যুক্তিগ্রাহ্য। কয়েকটি স্ত্রীচরিত্র, যেমন ঝমকু, লছমীরানী—এদের জীবন্ত করতে পেরেছেন তিনি, তুলনায় ইঞ্জিনিয়র কেমন যেন ঝাপসা। অবশ্য অভ্র-আবীর নিছক গল্প ছাড়া অতিরিক্ত কিছু যে আমাদের দেয় না, তা নয়। শিখিয়েছে অনেক রাজস্থানী লোকসংগীতের কথা, উপভাষার সংলাপ, লোকাচার। এদিক থেকে কিন্তু বইখানি সত্যি জ্ঞানগর্ভ। এবং অভ্রখনির শ্রমিকদের জীবনের বাস্তব সমস্যার উল্লেখ না থাকলেও খনির ব্যাপার, যান্ত্রিক রহস্য ইত্যাদি লেখক নায়কচরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যথাসাধ্য দেখিয়েছেন। সুতরাং বইখানি উপভোগ্য সন্দেহ নেই।

শিবশম্ভু পাল

স্থিরতার অন্তঃপুরে

'Though it is impossible to speak of art in terms of narrow formulee, I belive I may say that, to me, art means a beauteous pursuit of repose.'[১]

শিল্পী নীরদ মজুমদার একটি সুবিদিত নাম। তাঁর পরিচয় দেবার যোগ্যতা হয় তো সকলের নেই, কিন্তু তাঁর চিত্র উপভোগ করার অধিকার প্রত্যেকের আছে—এই ভরসাতেই বর্তমান রচনাটির অবতারণা। পারীর রঙ ও রেখার মধ্যে যার ভাবনা পুষ্ট হয়েছে, তাঁর শিল্পের মূল যে দেশজ ঐতিহ্যের গভীরতম স্তরে সঞ্চারিত—এ সত্য অনেকেই অবগত আছেন। ইনিই একমাত্র জীবিত ভারতীয় শিল্পী যিনি ভারত ও প্রতীচ্যের দুরূহ সমন্বয়সাধনে সক্ষম হয়েছেন, পারীর রঙ ও কালীঘাট পটের রেখা তাঁর চিত্রে যেন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গ্রথিত হয়েছে, কালিঘাটের পটচিত্রে পট থেকে চিত্র স্খলিত হয় বলে অসংখ্য রেখার বন্ধনে শিল্পী পট ও চিত্রকে দৃঢ়সম্বদ্ধ করেছেন, আবার, পটের ছবিতে রেখার জালে বিন্যস্ত করে ভূমি রচনার চেষ্টাও লক্ষণীয়। আপাতদৃষ্টিতে গোটা চিত্রটি ক্যানভাসের সমতলের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু রেখার সংস্থান ও অতি সূক্ষ্ম আলোছায়া রচনার দ্বারা এমন একটি চিত্রভূমি রচিত হয়েছে, যা পটচিত্রের থেকে স্বতন্ত্র, যা আপাত-সমতল দ্বিমাত্রিক চিত্রকে space-য়ের গভীরতা দেয়। তা ছাড়া, শিল্পী যাকে বলেছেন 'হৃদয়পুষ্কর', চিত্রের সেই অলক্ষ্য কেন্দ্রবিন্দু মানবদেহে স্নায়ুকেন্দ্রের মতো সমস্ত রৈখিক বিন্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করে।

যে যুগে পেশীচালনা ও অবচেতনের উদ্গীরণই শিল্পচর্চার নামান্তর, সে যুগে নীরদবাবুর ছবি উপলব্ধি করা শক্ত। কেননা, এ শিল্প প্রিমিটিভ কলাবিদ্যার ঠিক বিপরীত মেরুতে প্রতিষ্ঠিত, এবং এখানে infra-rational বা accidental কিছুই নেই। এ শুদ্ধ চৈতন্য ও মননের ছবি।

দান্তের স্মরণে নিবেদিত 'Nine Variations on the Symbolic Nine', অর্থাৎ, 'নব ব্যূহ', 'নব রত্ন', 'নব ঘট,' 'নব পত্রিকা,' 'নব গ্রহ', 'নব নারী-কুঞ্জর', 'নব কুঞ্জর' 'নব মাতৃকা' ও 'নব যন্ত্র' নামিত শ্রীমজুমদারের

১। শ্রীনীরদ মজুমদার

বারখানি তৈলচিত্র ও চারটি স্কেচের একটি প্রদর্শনী সম্প্রতি অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমন স্থির ও গভীর চিত্র, প্রজ্ঞা ও রসের এমন মিশ্রণ রেমব্রাণ্ট ভিন্ন আর কারুর ছবিতে কখনও দেখিনি (বলা বাহুল্য, বর্তমান লেখকের দেখা ছবি খুবই অল্প এবং মূল রেমব্রাণ্ট দেখার সৌভাগ্য কখনও হয় নি)। তা ছাড়া, অলক্ষ্যের উদ্ঘাটনে রুয়ো, নির্মাণ দক্ষতায় (pictorial construction) দেগা ও ব্রাক এবং রোম্যাণ্টিকতায় মাতিসের সঙ্গে এই শিল্পীর তুলনা চলে। কেউ কেউ হয়তো পল ক্লি-র সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ করবেন, কিন্তু তা আপাতসাদৃশ্য মাত্র। ক্লির অবচেতনে নিমজ্জন বা মনোবিকলন এখানে নেই; প্রতীয়মানতাকে ক্লি সৃষ্টির কোনও স্তরেই এড়াতে চান নি (ক্লির চিত্রে কালো ছাড়া রঙীন রেখা এবং শ্রীমজুমদারের চিত্রে রঙীন ছাড়া কালো রেখা কখনও দেখি নি)। অতি আধুনিক Op বা Optical শিল্পে রেখা ও বিন্দুর যে-বিন্যাস আছে, তা নিছক জ্যামিতিক ও যান্ত্রিক, এবং দর্শকের শারীরিক প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। অপরপক্ষে, নীরদবাবুর প্রতিটি রেখাই ভাব, এবং এখানে রেখার জাদুকর দর্শক-দৃষ্টিকে সকল জৈব সাময়িকতা থেকে সরিয়ে ক্রমাগতই এক প্রগাঢ় স্তব্ধতার রাজ্যে পৌঁছে দেন। তবু ইন্দ্রিয়ভোগ্য জৌলুষের অভাব নেই। সবুজ, হলুদ, লাল, অকার, আলট্রামেরিন্ সকলই দ্যুতিময়, কালোকে তিনি আশ্চর্য নিষ্ঠুরতায় সরিয়ে রেখেছেন, সাদা রঙ পাড়াগাঁয়ের শুকনো পলিমাটি ক্ষেতের শুভ্র মৃত্তিকার মতো নির্মল, কিংবা কুটির-দেয়ালে পল্লীবালার অঙ্গুলিকৃত নক্সার মতো ছায়াময়। কিন্তু এখানে সব জৌলুষ ও স্নিগ্ধতা যেন একটি প্রার্থনার একাগ্রতায় ও গভীরতায় তন্ময় হয়ে উঠেছে, যেন এক আকারহীন, স্পর্শহীন অপ্রত্যক্ষের অনুচিন্তনে নিমগ্ন।

অথচ এ শিল্প কতই যেন অনায়াসসাধ্য, এক বিন্দু জলের মতো স্বচ্ছতায় উদ্ভাসিত। শিল্পকে লুকোবার এমন শিল্প এ দেশের গত অর্ধ শতকের শিল্পের ইতিহাসে আর দেখা যায় নি। এ শিল্প প্রকৃতির মতোই নিরাভরণ, অথচ আভরণের শেষ নেই। চেনা যায় না সহজে, অথচ চিনে নিলেই অন্তরে নিমজ্জনের অসীম বিচিত্র পথ।

আশ্চর্য দৃষ্টিমান এক শিল্পীর বহু বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান ও বিনয়ে এ শিল্পের জন্ম। অথচ সকল নম্রতার পেছনে আছে পাশ্চাত্ত্য অভিজ্ঞান ও রুচি, তুলির প্রতিটি ঘন আঘাতের মধ্যে আছে আধুনিক শিল্পীমনের অস্থিরতা, সব শৃঙ্খলার পশ্চাতে আছে শিল্পীর স্বাভাবিক রক্তচিহ্নিত প্রাণকে বাঁধবার দুরূহ আকুতি। আর, নিয়ম ও নিয়মহীনতার ভারসাম্যের মধ্যে যেমন জাগতিক যাবতীয় বস্তুর স্থিতি, তেমনি বিক্ষোভ ও স্থিরতার টান-দেওয়া-ধনুকের-ছিলার মতো একটি সমতার মধ্যেই এই শিল্পের প্রাণকণাটি বিধৃত আছে।

মণি জানা

মঞ্চপ্রভা-র 'জনক-জননী'

পরিচালক শ্রীবিদ্যুৎ গোস্বামীকে বোধহয় দোষ দেওয়া যায় না। এ নাটক নিয়ে কীই বা করবেন তিনি? তিন অঙ্কের নাটকে তিন অঙ্কে তিন দম্পতি —প্রথম দম্পতির পত্নী নির্বীজিতা; দ্বিতীয় দম্পতির স্বামী পুরুষশক্তিহীন, তৃতীয় দম্পতি অনুক্ত কারণে এতো দেরীতে বিবাহ করেছেন যে সন্তানপ্রজননে অক্ষম। নাট্যকার তিন দম্পতিকে যথাক্রমে তিন সামাজিক শ্রেণীতে স্থাপন করেছেন—শ্রমিক, মিলমালিক ধনিক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। প্রথমাঙ্কের মহিলাটি ও দ্বিতীয় অঙ্কের পুরুষটির মধ্যে এক প্রাক্‌বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। তখন তাঁরা দুজনেই সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন; সেই সম্পর্কের দান একটি পুত্রসন্তান নাটকের সূচনায় তৃতীয় দম্পতির আশ্রয়ে লালিত হচ্ছে। নাটকে দেখা গেল, তিন দম্পতিই ঐ একই সন্তানের দাবিদার, শেষে সেই বহুপ্রার্থিত ছেলেটির উপরেই বিচারের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়। সে তিনবার ছ'জনের মুখের দিকে তাকাবে, তারপর চতুর্থবার সে কেবল একজনের অর্থাৎ এক দম্পতির দিকে তাকাবে; সেই হবে তার বেছে নেওয়া। কার্যত অবশ্য চতুর্থবার সে তাকায় সোজা দর্শকদের দিকে। নাট্যকারের বোধহয় শেষে অনির্দেশ্যতা তথা অসমাপ্তির ভাব রচনার কোনো সাধ ছিল। সে সাধ পূর্ণ হয় নি; ছেলেটি শেষে সমগ্র সমাজকেই যেন তার মাতাপিতা বলে গ্রহণ করে বসল; অন্তত দৃশ্যমান থিয়েটার তো সেই তাৎপর্যই দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরল। এ হেন তাৎপর্য বোধহয় নাট্যকার বা প্রযোজকের অভিপ্রেত ছিল না। যদি এই তাৎপর্যই অভিপ্রেত হয়ে থাকে, তবে তার মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ খুঁজে পাওয়া যায় না; কেন সে সমাজের বশ্যতা স্বীকার করবে? কী প্রতিশ্রুতি বা প্রত্যাশা পেল সে সমাজের কাছে? কিন্তু নালিশ শুধু শেষটুকু নিয়ে নয়। সমগ্র নাটকটিই ছকের জালে জড়িয়ে পড়ে চলচ্ছক্তি হারিয়েছে, অ্যাক্‌শনের চেহারাটা অ্যাকিউমুলেশনের—প্রথম দম্পতি দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় দম্পতির বাড়ি এসে চড়াও হয়, তারপর তৃতীয় অঙ্কে প্রথম দুই দম্পতি তৃতীয় দম্পতির বাড়ি এসে উপস্থিত হয়—অর্থাৎ একটা জটলাই ক্রমশ বাড়ছে। এ হেন অ্যাক্‌শন লোককাহিনীতে বা রূপকথায় বেশ খাপ

খেয়ে যায়, কিন্তু ন্যাচারালিস্ট নাটকে আরোপিত বোধ হয়। তদুপরি সংলাপের অক্ষমতায় নাটক ও চরিত্রায়ন উভয়ই ব্যাহত। প্রেমিক দম্পতির তীব্র সংঘাতের কালে "আবার তুমি নোংরা ছুঁড়তে শুরু করেছ" (ইংরেজি ইডিয়মের কষ্টকৃত ভাষান্তর), "জন্তুরও আত্মজ্ঞান থাকে, তোমার নেই" (প্রায় বটতলার ফিলসফাইজিং), "আমি মানি। কারণ যারা না মানে এ পৃথিবীতে তারাও শান্তিতে নেই। আমি বিশ্বাস করি তার হাতে ভাগ্যের থলি আছে।" (আবার সস্তা উপন্যাসের ফাঁপা যত্রতত্রপ্রযোজ্য বুলি!) নাটকীয় সংলাপের শোচনীয় প্যারডি। চরিত্র ও পরিস্থিতির সঙ্গে সংযোগহীন এ হেন সংলাপ নিয়ে এ নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীরা হিমশিম খেয়ে গেছেন। কেতকী দত্ত যখনই কিছুটা দৃঢ়তা দেখাবার সুযোগ পেয়েছেন: তখনই কিছুটা চোখে পড়েছেন। বিদ্যুৎ গোস্বামী 'জন্তুত্ব' দেখাতে গিয়ে মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্লীব আক্রোশটুকু সম্বল করেছেন, অথচ সত্যিই খানিকটা বন্য পাশবিক হতে পারলেই ভালো হতো না কি? দ্বিতীয় অঙ্কে গালিগালাজ দিতে গিয়ে তিনি পরিস্থিতির তীক্ষ্ণতাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন, দর্শককে হাসিয়েছেন। নাট্যকারের পরিমিতিবোধের ও পরিস্থিতিবোধের অভাব শুধরে নেবার সুযোগ পরিচালক গ্রহণ করেন নি। ঈষৎ চেপে কথা বলার ঝোঁকটাকে কাজে লাগিয়ে মমতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভূমিকাটিকে বাঁচিয়ে তুলেছেন; পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা শোনা কিংবা দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে তাঁর আত্মপ্রত্যয়ী অথচ তিক্ত ধিক্কারের বাচনে পুরো নাটকে একমাত্র তিনিই থিয়েটারের মান বাঁচিয়েছেন। শেষের সাস্‌পেন্‌স্ সৃষ্টির ছেলেমানুষী ফোকাসিং-এর টুকরোটুকু বাদ দিলে আলোকসম্পাত অনুল্লেখ্য। মাঝে মাঝে কম্পোজিশনে বুদ্ধির ছাপ আছে, যেমন দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে ও সেই অঙ্কেরই শেষে।

অগ্নিষ্ণু ভট্টাচার্য

জনক জননী। রচনা—প্রবোধবন্ধু অধিকারী। নির্দেশনা—বিদ্যুৎ গোস্বামী। প্রযোজনা—মঞ্চপ্রভা। আলোকসম্পাত—কণিষ্ক সেন। অভিনয়ে—বিদ্যুৎ গোস্বামী, কেতকী দত্ত, মনোজ বিশ্বাস, মমতা চট্টোপাধ্যায়, সতীপ্রসাদ বসু, মীনা ভট্টাচার্য, নীরেন ঘোষ, প্রদীপ শূর। মুক্ত অঙ্গন, ২৫ অক্টোবর, ১৯৬৫।

কলকাতায় হিন্দী নাটক : অনামিকা-র 'কাঞ্চনরঙ্গ'

গত ৮ই আগস্ট তারিখে হিন্দী হাই স্কুল মঞ্চে অনামিকা সম্প্রদায় শ্রীশম্ভু মিত্র ও শ্রীঅমিত মৈত্রের 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকটির হিন্দী রূপান্তর মঞ্চস্থ করেন।

প্রথমেই রূপান্তরকারী শ্রীনেমিচন্দ্র জৈনকে প্রশংসা করার লোভ সামলাতে পারছি না। পুস্তকাকারে প্রকাশিত (ন্যাশনাল পাব্লিশিং হাউস, দিল্লী) রূপান্তরটি আমি আগেই পড়েছিলাম এবং মুগ্ধ হয়েছিলাম। এরকম বিশ্বস্ত রূপান্তর (এমন কি বাংলা নাটকের নামগুলো পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে অথচ কোথাও খটকা লাগে না) এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, মূল ভাব এবং রসকে পুরোপুরি সঞ্জীবিত রেখে রূপান্তরকরণ বড়ো একটা চোখে পড়ে না—বিশেষত নাটকের ক্ষেত্রে। এ কথা অনস্বীকার্য যে—ভারতের জাতীয় নাট্যসংস্কৃতি গড়ে তুলতে গেলে বিভিন্ন প্রদেশের নাট্যকর্মীদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হওয়াটা আবশ্যক। শ্রীজৈন সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয়েছেন, এবং অনামিকা সম্প্রদায় ঐ রূপান্তরটি মঞ্চস্থ করে আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

অনামিকার নাম হিন্দী নাট্যজগতে সুপরিচিত—বিশেষত ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আটদিনব্যাপী নাট্যমহোৎসব সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপনের পর। এই সম্প্রদায়ের 'কাঞ্চনরঙ্গ' দেখতে যাওয়ার মধ্যে তাই যথেষ্ট উৎসাহের কারণ ছিল। প্রথমেই একটু ধাক্কা লাগল। টিকিটে অনুরোধ ছিল অন্তত পাঁচ মিনিট আগে যেন নিজের আসন অধিকার করি। কিন্তু নাটক আরম্ভ হলো নির্ধারিত সময়ের অন্তত সাত মিনিট পরে। স্বভাবতই এরপর যখন সূত্রধার ও নটী বিলম্বে আসবার কথা বলে দর্শকদের লজ্জা দেবার চেষ্টা করলেন, তখন তার কোনো মানে হলো না। তা ছাড়া এই অংশের অভিনয়ও অত্যন্ত দুর্বল। এ কথা হয় তো সত্যি যে নাটক আরম্ভ করতে দেরী হওয়ার পিছনে অনিবার্য কোনো কারণ ছিলো, কিন্তু তাহলে উদ্যোক্তাদের এ কথাটাও মানতে হবে যে দর্শকদের দেরী হওয়ার পিছনেও অনিবার্য কারণ থাকতে পারে। তা হলে?

শ্রীকৃষ্ণকুমারের নির্দেশনায় এমন কিছু অভাবিত তাৎপর্য আরোপিত হয়েছে যা অত্যন্ত উপভোগ্য। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি—কেউ বেল বাজালে দরজা যেন না খোলে—এই মর্মে পাঁচুকে ধমক দিয়ে মালকিন (গিন্নী) ঘরের দিকে ফিরতেই বেল বাজলো। পাঁচু পূর্ব অভ্যাসবশে তৎক্ষণাৎ

ছুটেছিলো দরজা খুলতে কিন্তু সেই মুহূর্তে মালকিন ফিরলেন। দেখে পাঁচু হঠাৎ থেমে গেল, তার সমস্ত শরীর যেন শ্লথ হয়ে গেল, তারপর সে আগের জায়গায় ফিরে এসে ফুলদানী ঝাড়তে থাকল। আর-এক জায়গায় —যদুগোপালবাবু কোনোরকমে রুষ্টা মালকিনকে সামলে অমরকে ঘরে ফেরাবার জন্যে দরজার দিকে ফিরলেন। পিছনের দেওয়ালের গায়ে মা কালীর পট। তার সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন, তারপর চোখে পড়লো বাঁ পাশে দণ্ডায়মান গিন্নীর উপর; রণরঙ্গিনী দেবী এবং ক্রুদ্ধা মালকিনের মধ্যে যেন একটা সামঞ্জস্য লক্ষ করে কর্তা কোমর থেকে ঊর্ধাঙ্গ বেঁকিয়ে তাঁকেও একটি প্রণাম করলেন, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

নির্দেশনার সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি বলে যেটা প্রতীয়মান হলো সেটা পাঁচুর চরিত্র সম্পর্কিত। গোটা নাটকটা দেখার পর মনে হল পাঁচু একটি নির্ভেজাল হাবাগোবা ভালোমানুষ; সাত চড়েও সে রা কাড়ে না, এবং কাড়লেও তৎক্ষণাৎ তার জন্যে অনুতপ্ত হয়। টাকার জন্যে যদুগোপালবাবুর পুরো সংসার যখন তাকে শকুনের মতো ঠোকরাতে লেগেছে, তখন পাঁচু যেন সহসা আত্মবিস্মৃত হয়ে চেঁচামেচি করে ফেলে কিন্তু পরক্ষণেই সে যেন অনুতপ্ত হয় এবং মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। এ রকম চরিত্র যে হতে পারে না তা নয়, কিন্তু 'কাঞ্চনরঙ্গে'র পাঁচু এ রকম হলে নাটকটা দাঁড়ায় না। পাঁচু গ্রাম্য ভালোমানুষ এবং বোকা হলেও তার ভেতরে কোথায় একটা চারিত্রিক বল আছে—সে কখনও কটু কথা বলে না, কোথায় যেন তার ভালোত্বে বাধে। তাই অমর যখন তাকে 'বেটা' 'হারামজাদা' বলে, তখন প্রচণ্ড রেগে গিয়ে কেঁদে ফেলে, সমর জুতো তুলে মারতে এলে সে অপমানিত বোধ করে, টাকার জন্যে তাকে সকলে মিলে টানাটানি করলে তার শ্লীলতার বোধে লাগে। এ সবের থেকে মনে হয় পাঁচুর একটা মেরুদণ্ড আছে এবং দরকার মতো সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে অন্যায়ের মুখোমুখি। এই চারিত্রিক জোরটা আছে বলেই তাকে চরিত্রহীন ভদ্দরলোক যদুগোপাল বাবুদের থেকে আলাদা বলে—ভালো বলে মনে হয়।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে পাঁচু যেন মেরুদণ্ডহীন থেকে গেল। তাই সে যখন (দ্বিতীয় অঙ্কে) তরলাকে বলছে—'দেখ মা, ভগবান কভী মুখে নহী ছোড়েগে। তু পক্কা মান তরলা, উসকে ধরম কা পহিয়া সারী ধরতী পৈ ঘূমতা হৈ। পুন্ন কী জীত অওর পাপ কী হার। যহ্ হোগা হী হোগা। দেখ লেনা

রহ্‌, হোগা হী হোগা।'—তখন কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না, কারণ যে চারিত্রিক জোর থাকলে একটা লোক এ কথাগুলো সত্যি করে বলতে পারে সে জোর পাঁচুর চরিত্রে কোথাও প্রকাশ পায় নি। এবং যেহেতু পাঁচু এই নাটকের নায়ক, সে হেতু এই দুর্বলতা নাটকের সামগ্রিক আবেদনকেও অবদমিত করেছে।

এ ছাড়া আরও দু' একটি ত্রুটি পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। যেমন, নাটকের একেবারে শেষে যখন টেলিগ্রামটা এলো, তখন নাটকীয় টেন্‌শন্‌ প্রচণ্ড। সেই সময়ে বটু টেলিগ্রামটা খুলে পড়ে প্রায় এক থেকে দেড় মিনিট হাসতেই থাকলো। ফলে টেলিগ্রামের সার্‌প্রাইজটা চলে গেলো এবং বটুর পরবর্তী কথাগুলো অর্থহীন হয়ে গেলো। ফলে শুধু ঐ অংশটাই নয় নাটকের শেষটাই যাকে বলে ঝুলে গেলো—নাটকটা শেষ হলো anti-climax-এ।

এবার অভিনয়ের কথায় আসা যাক। তরলার ভূমিকায় সুষমা সহগলের অভিনয় অত্যন্ত ভালো। কোথাও বাড়াবাড়ি না করে তরলার ভালোবাসা কষ্ট এবং মর্যাদাবোধকে তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পাঁচুর সঙ্গে ঝগড়ার পর তিনি যখন "তুম মেরে কোঈ, নঈ কোঈ নঈ"—বলে কেঁদে চলে গেলেন তখন চোখে জল এসেছিলো। পাঁচুর ভূমিকায় নির্দেশক কৃষ্ণকুমারকে গোড়ার দিকে বেশ ভালো লেগেছিলো। তাঁর হাবেভাবে কথায় এমন একটা গ্রাম্য সারল্য প্রকাশ পেয়েছিলো যা সত্যিই উপভোগ্য। কিন্তু তাঁর অভিনয়ে এই ধরনটাই থেকে গেল শেষ পর্যন্ত। চরিত্রটার কোনো উত্তরণ ঘটল না—শেষ পর্যন্ত কোনো বড়ো জায়গায় গেল না। ফলে তাঁর অভিনয় ভীষণ ineffective লাগলো। বিশেষত নাটকটা আমার পড়া ছিল বলে একটা প্রত্যাশাও ছিল। তাই বোধহয় শেষকালে মনে হল খুব ঠকে গেলাম।

এর পরেই মনে আসে যদুগোপালরূপী শ্রীঅমৃতভূষণ গুজরালের অভিনয়। ভদ্রলোককে মানিয়েছিলো ভালো এবং তাঁর অভিনয়ও অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিশেষত তাঁর মালকিনকে তাঁর নমস্কার করার ভঙ্গী ভোলা যায় না। মালকিনের ভূমিকায় দিব্যা অগ্রবালের অভিনয়ও ভালো কিন্তু তাঁকে ঐ চরিত্রে যেন মানায় না। মহিলার মুখে চোখে, চলায় বলায় এমন একটা ঠাণ্ডা ভাব আছে যাতে কিছুতেই তাঁকে দজ্জাল গৃহিনী বলে মনে হয় না। অন্যান্য ভূমিকায় মোটামুটি সু অভিনয় করেছেন শ্যামা অগ্রবাল, রবি দত্তে, জ্যোতীশংকর পঙ্কোলী, এবং রবি যাজ্ঞিক। সময়ের চরিত্রে রবি কাপুর পুরো

দস্তুর ক্যারিকেচার করেছেন। বটুর চরিত্রে শ্যাম কেজরীওয়াল সবচেয়ে হতাশ করেছেন। বটুর চরিত্রে যে-গভীরতা আছে—যার জন্যে তার দাম—সেটা তাঁর অভিনয়ে একেবারেই অনুভূত হয় নি।

এই ধরনের naturalistic নাটকে আবহবাদ্যের ব্যবহার বোধহয় যুক্তিযুক্ত নয়। এর ফলে নাটকের কয়েক জায়গায় রীতিমতো অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছিল।

এইসব ত্রুটিসত্ত্বেও 'অনামিকা-'র এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনের যোগ্য। এবং এর থেকে বাংলা দেশের নবনাট্যকর্মীদের কিছু শিক্ষা নেবার আছে। ভারবর্ষের সব ভাষাতেই ভালো নাটকের সংখ্যা খুবই কম। এই অভাব মেটাবার জন্যেই আমরা বিদেশী নাটকের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ করতে উৎসাহী হয়েছি। ঠিক ঐ কারণেই আমরা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় যেসব নাটক লেখা হচ্ছে তার থেকে বেছে নিয়ে কিছু কিছু নাটক বাংলায় রূপান্তরীত করে অভিনয় করতে পারি। এতে নাটকের অভাবও খানিকটা কমবে এবং তার চেয়েও যেটা বড়ো ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও সেখানকার নাট্যসংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা অবহিত হব। এই ধরনের প্রচেষ্টার ফলে ভারতের জাতীয় নাট্যসংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজও ত্বরান্বিত হবে।

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

কাঞ্চনরঙ্গ। মূল রচনা—শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র। হিন্দী রূপান্তর—নেমিচন্দ্র জৈন। নির্দেশনা—কৃষ্ণ কুমার। মঞ্চ—গোকুলদাস দ্বারকানী। আলো—শ্যামানন্দ জালান ও অনিল সাহা। হিন্দী হাইস্কুল মঞ্চ, ৮ আগস্ট।

ফেলিনির "ই ভিতেল্লোনি"

নিওরিয়ালিজমের পরিচিত গণ্ডীকে অতিক্রম করে স্বকীয়তামণ্ডিত চিত্ররচনায় ইতালীয় চলচ্চিত্রে আধুনিক যুগের প্রবর্তনাপর্বে ফেলিনির এই ছবি একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। প্রখর বাস্তবতা থেকে অনায়াসে বাস্তবাতিক্রান্ত রীতিতে প্রায় glide করে চলে যাওয়ার অপূর্ব ছন্দোবদ্ধ বিন্যাস এই ছবিতে লভ্য। তাই দেখা যায় সাধারণ বিশ্বাসযোগ্যতাকে তোয়াক্কা না করে প্রকাশ্য রাস্তায় গ্রামাফোন-সংগীতের সঙ্গে ফস্তো ম্যাম্বো নাচ শুরু করে; ক্যামেরা অকস্মাৎ অবজেক্টিক দৃষ্টিকোণ ছেড়ে চূড়ান্ত সাবজেক্টিভ দৃষ্টিকোণ থেকে দৃশ্যরূপ সৃষ্টি করে—নৃত্যসভার হুল্লোড়ে, এবং মোরাল্ডোর শহর থেকে চলে যাওয়ার সময় পরিচিত জগতের ছবি ট্রেনের জানলা থেকে মনশ্চক্ষে অপসৃয়মান হবার দৃশ্যে। এক আশ্চর্য ফলপ্রসূ নেপথ্যবিবরণ, যার বক্তা সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয়, তন্ময়তা থেকে মন্ময়তায় অবাধগতিকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। ত্রুফোর "জুল এণ্ড জিম" কিংবা ভিন্ন মেজাজে জার্মির "ডিভোর্স ইটালিয়ান স্টাইল" কিংবা রিচার্ডসনের "টম জোন্স" ছাড়া নেপথ্যবিবরণ আর-কোনো ছবিতে এতটা কার্যকর হয়েছে কিনা চট করে মনে পড়ে না।

এ ছবির জগৎ পুরুষমক্ষিকাদের কর্মবিমুখ অর্থবিহীন "মধুর জীবন" (ভিতেল্লোনি কথাটির অর্থ "Drone") যার মাদকতা থেকে এ ছবির চারটি চরিত্র সর্বদাই "অন্য কোনোখানে" চলে যাওয়ার কথা ভাবে (বিবরণীতে আছে 'They' talked of leaving—আবার কমেডিয়ানের সঙ্গে দেখা করতে যাবার দৃশ্যে শোনা যায় 'all' of "us" felt nervous, এই 'They' থেকে 'We'-এর মধ্যে এ ছবি আশ্চর্য ছন্দে চলাচল করে) অথচ একজন ছাড়া (মোরাল্ডো) আর কারো যাওয়া ঘটে ওঠে না, ঐ মাদকতার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে (অপসৃয়মান দৃশ্যগুলি স্মরণীয়)। মোরাল্ডো ছাড়া আর তিনটি চরিত্রের প্রতি ফেলিনির মনোভাব মিশ্রিত মনে হয়। এদের "অকর্মণ্যতার" প্রতি কোনো তিরস্কার কিংবা যে সামাজিক কারণে এদের এই দশা তার প্রতি কোনো সুস্পষ্ট দোষারোপ এই ছবিতে নেই। এ ছবি বেকার সমস্যার ওপর statement নয়, ফস্তো "বাইসাইকেল থিভস"-

এর নায়কের সহোদর নয়, কেননা এ ছবির চরিত্রদের অকর্মণ্যতা শুধু বেকারত্বজনিত নয়—তার পশ্চাতে দক্ষিণ ইতালীর বিশেষ মানসিক পটভূমিকাটা অনেকটা সক্রিয়। এরা নিওরিয়ালিষ্টিক ছবির চরিত্রদের মতো নিছক কোনো system-এর বলি নয়, এদের এই অবসাদগ্রস্ত অস্তিত্বের জন্য এরা নিজেরা অনেকটা দায়ী। ফেলিনি অনুকম্পায়ী মন নিয়ে এদের অন্তর্লোক উদ্ঘাটন করেন আবার কখনও বা তাদের মৃদু উপহাসের পাত্র করে তোলেন। লিওপোলদোর লেখক হবার বাসনা এবং পাশের বাড়ির পরিচারিকার সঙ্গে ফস্টিনস্টিকে তিনি প্রায় কমেডির স্তরে রাখেন, আবার এক সমকামী অভিনেতার কবলে পড়বার দুঃস্বপ্নসম দৃশ্যরচনা করে তার অবস্থাকে ভয়ংকর ও করুণ করে তোলেন। দায়িত্বজ্ঞানহীন আলবেরতো-কে (এ চরিত্রে সোর্দি অসামান্য অভিনয় করেন) ক্লাউন মনে হয়, আবার বোন তাকে ছেড়ে চলে যাবার দৃশ্যে তার বিকৃত কণ্ঠস্বরের আর্তনাদ তাকে অন্য স্তরে আনে, পরক্ষণে বিরাট মুখোস টেনে নির্জন রাস্তায় তার মাতালমূর্তি তার ক্লাউনের চেহারা ফিরিয়ে আনে। অতিরিক্ত কামুক ফস্তো দায়ে পড়ে মোরাল্ডোর বোনকে বিবাহ করে, বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব পালন তার মতো পুরুষমক্ষিকার পক্ষে সম্ভব নয়, চুরি গণিকাগমন ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ (যাকে "human animal"-এর 'passion'-এর আধিক্য বলে লিওপোল্দো সাহিত্যিকসুলভ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে ব্যস্ত) তার চলতে থাকে, শেষপর্যন্ত বাপের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে "মিলন" হয়—ওরা নির্জন রাস্তায় হেঁটে যায় শিশুপুত্রকে নিয়ে—নেপথ্যবিবরণে শোনা যায়—This is the end of the story *at least for a while.* অর্থাৎ পুরুষমক্ষিকাদের জীবনে কোনো পরিণতি নেই—শুধু আছে আকৃতিবিহীন বিবর্ণ নিরর্থক অস্তিত্ব—Dolce Vita ছবিকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে শেষপর্যন্ত যা মাছের চোখের রূপকল্প পরিগ্রহ করেছে, অপরিসীম হতাশা আর ধিক্কার নিয়ে। 'মধুর জীবনের' পরিণতি সম্পর্কে হতাশা আর ধিক্কারের সেই তীব্রতা আর তিক্ততা অবশ্য এ ছবিতে অনুপস্থিত।

এই মধুচক্রে মোরাল্ডো একমাত্র ব্যতিক্রম, তারই 'অন্য কোনোখানে' চলে যাবার আকাঙ্ক্ষার সফলতার ছবি দিয়ে ফেলিনি এ ছবি শেষ করেন। সুন্দর নির্দিষ্ট কোনো সত্তা এ চরিত্রটির মধ্যে লভ্য নয় বলেই বিচ্ছিন্নভাবে এর নগরপানে অভিযান এ ছবির গভীর মধ্যে আলাদা কোনো গভীর

তাৎপর্যের ব্যঞ্জনা করে বলে মনে হয় না। সকল রকম পাপের সে সাক্ষী কিন্তু মন তার রাজহংসের শরীর—এ জাতীয় নিষ্কলুষতার একটি চেহারা তৈরি করাই এর মধ্যে যেন ফেলিনির অম্বিষ্ট। হয়তো সেই "innocence"-কে আরেকটু পরিস্ফুট করবার জন্য রেলকর্মী বালকটির সঙ্গে তার টুকরো সাক্ষাৎকারের দৃশ্যদুটির অবতারণা এবং ছবির শেষদৃশ্যে ক্যামেরা লাইনের ওপরে ব্যালেন্স রাখতে যত্নপর সেই বালকের উপরই নিবদ্ধ। 'নিষ্কলুষতা' 'পবিত্রতা'র রূপকল্প হিসেবে—শিশু, বালক বালিকা ইত্যাদির ব্যবহার চলচ্চিত্রে পরিচিত—'দল্‌চে ভিতা'তে পাওলা মার্চেল্লোর কাছে ফ্রা এঞ্জেলিকোর আঁকা ছবি। কিন্তু মার্চেল্লো নারকীয় অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ নিমজ্জমান থাকা অবস্থায় শেষদৃশ্যে 'পবিত্রতা'র ডাকে সাড়া দিতে না পারার ব্যাপারটা যে অসামান্য inevitability-র বোধ্ জাগায় যার ফলে রূপকল্পের প্রয়োগ এ ক্ষেত্রে সর্বসার্থক হয়ে ওঠে—এ ছবিতে বালক রেলকর্মীর প্রক্ষিপ্ত উপস্থিতিতে (নিনো রটার সুর সত্ত্বেও) সেটা সম্ভব হয় না। মোরাল্ডোর অন্তর্ধান একজন drifter-এর অন্যত্র ভেসে যাওয়ার কথাই স্পষ্ট করে—'মধুচক্রে'র বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ বা তা থেকে কোনো 'উত্তরণের' ছবি উপস্থিত করে না।

কিন্তু "দল্‌চে ভিতা"র সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখলে মোরোল্ডোর "ইনোসেন্স" এবং নগরযাত্রার একটি তাৎপর্য পাওয়া যায়। ফেলিনি মোরাল্ডোকে যদিও যথেষ্ট স্পষ্ট করে রূপ দেন নি তবুও তার মধ্যে যতটুকু সম্ভব উপস্থিতের গণ্ডীর বাইরে যাওয়ার ইচ্ছাকে সজীব রেখেছেন, এবং ঘটনাচক্রে অবশ্যম্ভাবি তাকে প্রতিষ্ঠিত না করেও আকস্মিকভাবে হলেও ছবির শেষে তার সেই ইচ্ছাকে পূর্ণ করেছেন। সেই অপরিণত বুদ্ধি লাজুক মোরাল্ডোই যেন রোমে এসে মার্চেল্লোর রূপ ধারণ করে তিক্ততর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল—মোরাল্ডো যেন মার্চেল্লোরই adolescence, তার গতি এক "মধুর জীবনের" মাদকতা থেকে বৃহত্তর "মধুর জীবনে"র বীভৎস মাদকতায়।

ধ্রুব গুপ্ত

ই ভিতেলোনি (১৯৫৩) পরিচালক-ফেদেরিকো ফেলিনি। ক্যামেরা :—ওতেলো মার্তেলি, কার্লো কার্লিনি এবং এল. ত্রাসাত্তি। সঙ্গীত :—নিনো রটা। অভিনয়—আলবের্তো সোর্দি, ফ্রাংকো ফত্রিৎজি, লিওপোলদো ত্রিয়েস্ত, এলেনোরা রুফো আরো অনেকে। 'ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিস্ অব ইণ্ডিয়া'র ব্যবস্থাপনায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটিতে প্রদর্শিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-বিনাশী প্রস্তাব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের নামে একটি নতুন প্রস্তাব শীঘ্রই আইনে পরিণত হবার সম্ভাবনা। 'বিশেষ কমিটির' পরীক্ষা পেরিয়ে তা এখন বিধান সভায় উপস্থাপিত হয়েছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থা বহুদিকে এতই নতুন, এবং বহু পরিমাণে এতই বিতর্কমূলক যে, তা একটি সুদীর্ঘ আলোচনার উপযুক্ত। সে আশা ভবিষ্যতে না ত্যাগ করেও আমরা এই মুহূর্তে শুধু এই প্রস্তাবের গুরুত্ব ও তার মূল অর্থটির দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

গোড়াতেই বলে রাখা দরকার বর্তমানকালীন কোনো শিক্ষাসমস্যা সমাধানের জন্য এই আইন প্রণীত নয়। শিক্ষা উন্নয়ন, শিক্ষা বিস্তার, ছাত্রের কল্যাণ, শিক্ষক কল্যাণ, জাতীয় কল্যাণ প্রভৃতি কোনো শিক্ষা বা সংস্কৃতিমূলক বিষয়ের সঙ্গে এই আইনের কোনো সম্পর্ক নেই। ইহার একমাত্র লক্ষ্য—বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ—শিক্ষা পরিচালনা নয়। এই মূল কথা বুঝে নিয়ে দেখতে হয় প্রস্তাবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কী। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ই দেশের জীবন-ধারার ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক বিশেষ উৎস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে এইদিকে সর্বাধিক। ছাত্রসংখ্যাই তার একমাত্র কারণ নয়, অধ্যয়ন অধ্যাপনার গবেষণার এককালীন সাফল্য নিশ্চয়ই তার অন্যতম কারণ। কিন্তু প্রধান কারণ এই—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলার জাতীয় জাগরণের স্রোতকে আশ্রয় করে নিজেও সেই ভারতীয় জাতীয় জাগরণের এক প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠতে পেরেছিল। তাই, যত নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হোক তার ঐতিহ্য ও যশ অম্লান, অবিস্মরণীয়। ইংরেজ সরকার তার নিজের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা আত্মকর্তৃত্ব দান করে, কিন্তু ভারতীয় সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা রাখতে চেয়েছিল সরকারী কর্তৃত্বের একটি আশ্রয়রূপে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের সেই প্রণীত আইনের মধ্যেও আপনাকে প্রথম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে। লর্ড কার্জনের সেই সাম্রাজ্যবাদ স্থষ্ট ও দুষ্ট

পরিধির মধ্যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, বিদ্যানুরাগ ও দেশপ্রীতি এই দুঃসাধ্য কর্ম সুসম্পন্ন করে। তাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনত না হলেও কার্যত বেশ কিছুটা আত্মকর্তৃত্ব লাভ করে—অবশ্য ব্যক্তি প্রাধান্যেও সে সূত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতকটা আত্মকর্তৃত্ব লাভ করে ১৯০৭-১৯৪৭-এর মধ্যে দেশের জনমতের ও জাতীয় চেতনার বাহন হয়,—এই হলো তার গুরুত্ব। তাই স্বাধীনতালাভের পরে ১৯৫২-তে যে বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণীত হয় তাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই আত্মকর্তৃত্ব অনুমোদিত হয় এবং যথাসম্ভব তার পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতির ও পদ্ধতির ও বিস্তারের ব্যবস্থা থাকে। সেইজন্যই তার সিনেট ডাঃ বিধান রায়ের বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি নীতির একবাক্যে প্রতিবাদ করে, ফলে কংগ্রেস শাসক-গোষ্ঠীরও তা বিরূপভাজন হয়ে পড়ে। বর্তমানে প্রস্তাবিত আইন কংগ্রেসের শাসকদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই কষ্টার্জিত আত্মকর্তৃত্ব ও গণতান্ত্রিক প্রভাবনাশেরই উদ্দেশ্যে প্রণীত। অবশ্য শোনা যায়, ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের মার্কিন সাহায্যদাতাদের নির্দেশানুযায়ীও এই প্রস্তাবের বিশেষ বিশেষ ধারা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে এই খসড়ার প্রায় প্রত্যেকটি প্রস্তাবেরই তাই শিক্ষাবিশেষজ্ঞ ভূতপূর্ব উপাচার্যগণ বিরোধিতা করেছেন।

এমন কথা কেউ বলে না যে, ১৯৫২ সনের বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাই নির্দোষ। পৃথিবীর কোনো ব্যবস্থাই নির্দোষ নয়। তবে সে আইনের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করা না যেত, তা নয়। সে দোষ-ত্রুটি প্রধানত কি? আইনপ্রণেতাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সিণ্ডিকেট প্রভৃতি নানা বিভাগ ও তাদের নানা নির্দেশ, নিয়ম-কানুন প্রভৃতির চাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ বিলম্বিত হয়ে ক্ষতি হয়। এ কথা আংশিক সত্য, কারণ, পুরাতন কানুনের জঞ্জাল সাফ করা হয় নি। বাধা তাতে প্রধানত এসেছে সরকার-পুষ্ট সদস্যদের থেকে। দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনাদিতে নানা কেলেঙ্কারী ঘটেছে। কিন্তু এ কেলেঙ্কারীর মূল ও প্রধান উৎস পশ্চিম বাঙলার কংগ্রেস শাসকগোষ্ঠী ও তাদের পালিত অনুচরবৃন্দ। প্রকৃতপক্ষে ভোটশাঠ্যের দ্বারা তাঁরাই সিনেট-সিণ্ডিকেটে গত আট বৎসর যাবৎ কর্তা—এ-কথা সুবিদিত। এমন কি, দেখা যায় অধ্যাপকাদি নিয়োগেও কংগ্রেস দলের লোকই নিযুক্ত বা উন্নীত হন—নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও

কেন এই নতুন ব্যবস্থা কংগ্রেস শাসকরা চান তাদের শাসন যেন ভবিষ্যতেও অক্ষুণ্ণ থাকে। খেলার মাঠ থেকে শিক্ষাক্ষেত্র পর্যন্ত সবই তাঁরা কুক্ষিগত করবেন। এইজন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মকর্তৃত্ব ও গণতন্ত্র খর্বিত করা তাঁদের এখনকার নীতি। বর্ধমান, কল্যাণী, রবীন্দ্রভারতী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আইন সেইরূপে প্রণীত হয়েছে। বাকী আছে শিক্ষা ও গণতন্ত্রের শেষ আশ্রয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এ-খসড়া প্রস্তাবের মূল তাৎপর্য এই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বাংশে শাসক-দলের কুক্ষিগত করা।

'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' ও তার নামাঙ্ক

আমাদের উত্তর পশ্চিমে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে তিন সপ্তাহ কালের যুদ্ধ চলেছিল,—আজও তারপরে শান্তি স্থাপিত হয় নি। দু রাষ্ট্রের মধ্যে গতায়াত বা দু রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে সাধারণ চিঠিপত্র, ব্যবসায়-বাণিজ্য কিছুই পুনঃস্থাপিত হয় নি—কবে স্থাপিত হবে তাও বলা অসম্ভব। বরং দুয়ের মধ্যে বিরোধাগ্নি জ্বলে উঠবে, এমন আশঙ্কাই করা হয়; সে সম্ভাবনা মনে রেখেই রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যথোচিত প্রস্তুতিও সংগত। বিরোধ বাধুক বা না বাধুক, যা তবু সর্বসময়ে সর্বভাবে আমাদের পক্ষে প্রয়োজন তা হচ্ছে দেশে সাম্প্রদায়িকতা-বিলোপ, ও জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও কাশী বিশ্ববিদ্যালয় দুই কেন্দ্র-পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্প্রদায়িক নামাঙ্ক দূর করাও নিশ্চয়ই তাই আমাদের ভারতরাষ্ট্রে সমীচীন। সম্ভবত কর্তৃপক্ষ একটু বেশি সাহসী হয়ে উঠেছিলেন। তাই আলীগড়ের পরে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়কেও সেরূপ নামাঙ্ক থেকে মুক্তি করবার জন্য চেষ্টায় অগ্রসর হন। তাতে করে শুধু সদিচ্ছাজাত বিপাকেই তাঁদের জড়িয়ে পড়তে হয় নি, অনভিপ্রেত সাম্প্রদায়িক মনোভাবকেও বরং তাঁরা কিছুটা খুঁচিয়ে তুলেছেন। সমতারক্ষার দিক থেকে আপাতত ঐ দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সমভাবে সাময়িক ভাবে পূর্ব-মার্কায় চলতে দেওয়াই হয় তো এখন সুকৌশল অর্থাৎ স্থিতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের প্রত্যাবর্তন ছাড়া গত্যন্তর নেই, কারণ, এ কথা পরিষ্কার—উত্তরাপথে সাধারণভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের সঙ্গে কংগ্রেস সরকার শক্তি পরীক্ষায় অক্ষম, কংগ্রেস দলের মধ্যেই এই ধরনের সাম্প্রদায়িক মানুষ যথেষ্ট

প্রবল ও ক্ষমতাবান এবং অনতিদূরের নির্বাচন মনে রেখে দল পরিচালকরাও এই বিশ্ববিদ্যালয়-ঘটিত ব্যাপার নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহী হবেন না। সরকার পক্ষের নির্বুদ্ধিতায় তাই জাতীয় সংহতির ক্ষতিই হয়েছে।

কিন্তু যুদ্ধকালীন জাতীয় সংহতির প্রয়োজন কি এই যুদ্ধাশঙ্কার দিনে এতই অবজ্ঞেয়? বিশেষত কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে? আমরা জানি, তারা বহু-পরিমাণে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হাতের ক্রীড়নকরূপেই বিপথগামী। ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতি পরিহার্য—এমন কথা আমরা মনে করি না। কিন্তু নিশ্চয়ই ছাত্রদের পক্ষে দ্বন্দ্ব-সমাকীর্ণ রাজনীতিতে, দল-উপদলগত (পার্টিজান) পার্টিবাজিতে জড়িয়ে পড়া অবাঞ্ছিত। শুধু তাই নয়, আমরা মনে করি ভারতের বিশেষ অবস্থায়,—বর্তমানে সংকটের কথা ছেড়ে দিলেও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও জাতীয় সংহতির সপক্ষে দাঁড়ানো সুস্থ রাজনীতির প্রথম কথা, এবং তা সুস্থ মানুষের জীবন-নীতি। এই নীতি বর্জন করে যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র কেন, সমস্ত অধ্যাপকও 'হিন্দু' বা 'মুসলমান' মার্কাটাকে বজায় রাখার জন্য জেদ করেন তা হলে তাঁরা নীতিভ্রষ্ট এ কথা বলতে আমাদের দ্বিধা নেই। অবশ্য কি করে ছাত্রদের এ পথ থেকে নিরস্ত করতে হবে, তা কৌশল ও কর্মপদ্ধতির কথা। কিন্তু নিরস্ত তাদের করতেই হবে, নীতির দিক থেকে সংশয়ের তাতে স্থান নেই। ভারতের ছাত্র-সমাজের বৃহত্তর অংশ নিশ্চয়ই অতো ভ্রান্ত নয়। তারা নিজেরাই কেন সেই সুস্থ নীতির সপক্ষে নিজেদের বিভ্রান্ত সতীর্থদের ফিরিয়ে আনবেন না! বহুবিষয়ে ছাত্ররা মুখর; অনেক অধিকারের দাবিতে তারা সক্রিয়, কিন্তু এই মূল মনুষ্যত্বের দাবিতে, সংস্কৃতির দায়িত্বে, জাতীয় সংহতির অলঙ্ঘ্য প্রয়োজন বুঝেও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যদি নিজেদের শিক্ষাক্ষেত্রেই তারা নিজেরা নিষ্ক্রিয় বা নির্বাক থাকেন, তা হলে নিশ্চয়ই তাঁদের প্রতি দেশের স্নেহ, সম্মান ও বিশ্বাস তাঁরা নিজেরাই ভঙ্গ করতে থাকবেন॥

গোপাল হালদার

আমাদের আধুনিকতা

যতদূর মনে পড়ে হুতোম তার বিখ্যাত নকশার এক জায়গায় লিখেছিলেন, একশ বছর ইংরেজের সহবাস করেও আমরা আমেরিকান হতে পারি নি, আমরা যে ভেতো বাঙালি সেই ভেতো বাঙালিই রয়ে গেছি।

স্বাধীনতা অবশ্য আমরা অর্জন করেছি, আগে যেসব চাকরী সাহেবদের একচেটে ছিল তার দু' একটা এখন আমরা পাচ্ছি, চলনে-বলনে সাহেব হয়েছি অনেকেই—কিন্তু সাহেবিয়ানা বা পাশ্চাত্ত্য-প্রভাব বলতে যদি বোঝায় আধুনিকতা, অর্থাৎ বিজ্ঞানমনস্কতা, তা আমরা কতটা আয়ত্ত করেছি ?

অন্যপরে কা কথা। এই তো সেদিন জনৈক কট্টর বামপন্থী নেতা, যিনি নিজেকে বিশুদ্ধ মার্কসবাদী বলে দাবি করে থাকেন, পিতৃবিয়োগের পর জেল থেকে সরকারের কাছে প্যারোলে মুক্তির আবেদন জানিয়ে লিখলেন, প্রথাসিদ্ধ-ভাবে পারলৌকিক কৃত্য না করলে নাকি তাঁর পিতার আত্মার মুক্তি হবে না। যে-কোনো ব্যক্তিকেই বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখা অন্যায় এবং এরকম কোনো পারিবারিক বিপর্যয় ঘটলে সকলকেই প্যারোলে কেন, বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়াই সংগত আর রাজনৈতিক নেতাদের অনেক ক্ষেত্রেই জনসাধারণের এমন কি কুসংস্কারকেও শ্রদ্ধা করে চলতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—আত্মার মুক্তি-টুক্তি এ-সব কথা কি বিশুদ্ধ মার্কসবাদের সঙ্গে খাপ খায় ?

আর-একজন বিখ্যাত বামপন্থী লেখকের কথা জানি, যিনি বেশ কিছুদিন ইওরোপে কাটিয়েছেন, নিজে বিয়ে যেভাবে করেছিলেন তাকে মোটেই সমাজসম্মতভাবে বলা চলে না। কিন্তু নিজের মেয়ের বিয়ের বেলা তিনি কুলগোত্র দেখলেন, মেয়েকে সারাদিন উপোসী রাখলেন, নিজে উপোস করে কন্যা সম্প্রদান করলেন, পুরুত এসে মন্ত্র পড়লেন সাত পাক ঘুরে তবে হৃদয় হৃদয় এক হল। অথচ শুনেছি রেজিষ্টারী করে বিয়েতে ছেলের এবং তাঁর বাড়ির তরফে বিশেষ কোনো আপত্তি ছিল না।

যাঁরা নিজেদের বামপন্থী এমনকি মার্কসবাদী বলে দাবি করেন, তাঁদেরই যখন এই হাল (উদাহরণ দুটি মোটেই বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয়—এ রকম দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেওয়া যেতে পারে), প্যাণ্ট-কোট পরা আর পাঁচজন বাঙালি মধ্যবিত্তের অবস্থা তো সহজেই অনুমান করা যায়।

ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের যে পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সেটা ছিল চিন্তার জগৎ, বাঙালি যুবক যেখানে পেয়েছিলেন এক নতুন জীবন-দর্শনের ইশারা। বস্তুতপক্ষে তাঁর শিক্ষার ফলেই তরুণ বাঙালি সমাজ ভাবতে চিন্তা করতে শিখলেন, বুঝতে শিখলেন যে যা কিছু এতদিন ধরে সমাজে চলে এসেছে, তার সবটাই ঠিক এবং অনেক গলদ অনেক অন্যায় যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়ে আছে যা সরিয়ে ফেলতে হবে।

এ হল একশ বছর আগের কথা। তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেছে, পৃথিবী অনেক বার ঘুরেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু আমরা কতদূর এগিয়েছি ?

দেশ স্বাধীন হবার আগে বাঙলাদেশে কিছু কিছু পরিবার ছিল যেখানে সাহেবিয়ানার প্রচলন খুব বেশিমাত্রায় ছিল। এঁরা অধিকাংশই পয়সাওলা মানুষ ছিলেন, এবং সেই কারণে আসল সাহেবদের সঙ্গে মাখামাখি করে দেশের মানুষদের "নেটিভ" "কালা আদমী" বলে ঘৃণা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না। যথাসময়ে রায়বাহাদুর, রায়সাহেব হয়ে এঁরা যখন মারা যেতেন তখন ইংলিশম্যান এবং পরবর্তীকালে স্টেটসম্যানে বেরুত।

উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পরে কলকাতার সমাজে এক নতুন শ্রেণী গজিয়ে উঠল, যার নাম হল উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজ। এদের কেউ কেউ যুদ্ধের বাজারে টাকা-কামানো লোক হলেও, বেশির ভাগই নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার জোরে এই শ্রেণীভুক্ত হন। ব্যাপারটা হল এই। ইংরেজ সরকার চলে যাবার পরে কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রীট, ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিতে এমন সব চাকরি খালি হয়ে গেল যেগুলি আগে শুধুমাত্র ইংরেজ ও কিছু সংখ্যক ভাগ্যবান বাঙালির জন্য বাঁধা থাকত। এখন এ ধরনের চাকরি পাওয়া অনেকটা ময়ূরপুচ্ছ লাগানোর মতো। যাঁরা এই ধরনের চাকরি পেলেন তাঁরা তৎক্ষণাৎ নিজেকে অন্য পাঁচজনের চেয়ে ভাল ভাবতে শুরু করলেন এবং সবচেয়ে যেটা বিপদের কথা, কথায়-বার্তায় আচার-ব্যবহারে পুরোপুরি সাহেব বনে যাবার চেষ্টা শুরু করে দিলেন। মধ্যবিত্ত ঘরের আনন্দ পাঁচটা সাহেবের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করে এবং মিলেমিশে নিজেকেও সাহেব ভাবতে আরম্ভ করল, এবং ভবানীপুরের রং চটে যাওয়া বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো কী করে নিউ আলিপুর বা ওল্ড বালীগঞ্জে উঠে আসা যায়।

এবং এলোও তাই। ধীরে ধীরে এই অঞ্চলগুলিতে গড়ে উঠলো কলকাতার নতুন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ, যেখানে আনন্দ রাতারাতি হয়ে উঠলো "অ্যাণ্ডি", যেখানে ইংরেজদের ফেলে যাওয়া বয় বেয়ারা বাবুর্চিরা আবার চাকরি পেল, যেখানে সন্ধ্যেগুলি আবার ভরে উঠলো বিলিতি বাজনার সুরে, যেখানে ইংরেজদের অনুকরণে দিশী সাহেবদের অসংখ্য ক্লাব গজিয়ে উঠল সন্ধ্যেটা একটু ব্রীজ অথবা হুইস্কী দিয়ে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য।

কিন্তু এ সবই বাহ্য। একশ বছর আগে? শিক্ষিত বাঙালি সমাজের একটি বৃহৎ অংশ যে সমস্ত কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন বা মুক্ত হবার চেষ্টা করেছিলেন তার সবগুলিই আজ আবার ফিরে এসেছে, জাঁকিয়ে বসেছে আমাদের মনে।

একটি সামান্য উদাহরণ দিচ্ছি। সাউথ অব পার্ক স্ট্রীট সমাজে আজকাল ছেলেমেয়ের মেলামেশা চলে থাকে। একটি ছেলে একটি মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে গেলে বা দু দণ্ড হেসে কথা বললে আজ আর কেউ আঁতকে ওঠেন না, যেমন উঠতেন পনেরো বিশ বছর আগে।

কিন্তু ধরুন এই মেলামেশার ফলে যদি কোনো বিপর্যয় ঘটে। এই তথাকথিত লিবারাল, প্রগ্রেসিভ সমাজের মানুষেরা তখন প্রাণপণ চেষ্টা করবেন কী করে ব্যাপারটা চাপা দেওয়া যায়। যেহেতু চাপা দেওয়ার পথ খুব বেশি নেই, সেই হেতু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জোরজবরদস্তি করে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান করে ব্যাপারটা চাপা দেওয়া হয়। কিন্তু হয়তো দু জনের মধ্যে আসলে কোনো ভালোবাসা নেই, তা হলে? হয় কিছুদিনের মধ্যেই ডিভোর্স—এবং আরেক দফা পারিবারিক অশান্তি—নয়তো সারাজীবন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের ভাব নিয়ে বেঁচে থাকা।

এবং এ সবের জন্যই দায়ী হচ্ছে সেই সমাজ যা বাইরে যত সাহেবই হোক না কেন, ভেতরে ভেতরে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। এঁরা সব সময়েই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার গুণগান করেন কিন্তু এ রকম অবস্থায় ভুলে যান যাঁদের নকল করেও তাঁরা কি করতেন। যে বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করেছি, সেই রকম অবস্থার সম্মুখীন হয়ে এঁরা নিশ্চিত ভুলে যান বা যাবেন যে অবিবাহিত মা'দের ইউরোপীয় সমাজ বহুকাল আগেই মেনে নিয়েছে এবং পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে। ভুলকে ভুল হিসেবে নেওয়ার ক্ষমতা আজও আমাদের হয় নি।

অর্থাৎ সাহেব আমরা শুধু পোশাক-আশাকেই। রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মজীবনীতে এক জায়গায় লিখেছিলেন, সিপাহিবিদ্রোহের সময় তাঁরা প্যান্টলুনের নিচে ধুতিখানা সর্বদা পরে থাকতেন। রাজনারায়ণ বসু অবশ্য কোনো রূপক রচনা করতে চান নি—সাদা কথায় নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তা এই গল্পটিকে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের রূপক হিসাবেই গ্রহণ করা যায়। আমরা যতই ড্রেন পাইপ কি ছুঁচলো জুতো পরি না, সনাতন ধুতিটি তার নিচে সর্বদাই জড়ান থাকে। ইদানীং নিউ আলিপুর বালীগঞ্জ নিবাসী কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলাদের মধ্যে একটা হিড়িক পড়েছে দীক্ষা নেবার। গুরু যেই হোক না কেন, যেমনই হোক না কেন দীক্ষা নেবার জন্য ভীড় লেগেই আছে। এবং স্বামীর চাকরিতে উন্নতি বা ছেলের স্কুলে প্রমোশনের জন্য মেমসাবরা গুরুর নির্দেশে উপোসী থাকছেন কিংবা কিছু মানত করছেন, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। মুখে যতই কিছু বলুক না কেন এঁদের ছেলেমেয়েরা এখনও সরস্বতী পুজোর আগে কুল খেতে ভয় পায়, এবং অঞ্জলি না-দিয়ে খাবার আগে দুবার চিন্তা করে।

এখানে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তোলা ঠিক হবে না। কেউ বিশ্বাসী, কেউ নয় এবং দু দলেরই সপক্ষে বলবার অনেক কিছু থাকতে পারে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে সততার। আজকের সমাজে যা চলছে তা হচ্ছে নিজেকে ঠকানো। এবং এঁরা নিজেরাও স্বীকার করবেন যে এটা অন্যায়। কিন্তু কি আশ্চর্য, পরমুহূর্তেই অম্লানবদনে সেই অন্যায় করে যেতে এঁদের একটুও বাধবে না।

আরও যা খারাপ তা হলো কোট-প্যান্ট পরা আজকের বাঙালিদের প্রশ্ন করার অক্ষমতা। যা শুনছে, যা দেখছে সবই মেনে নিচ্ছে। কোথাও কারও কোনো জানবার ইচ্ছে নেই 'এমনটা কেন হচ্ছে, এটা কি উচিত, এটা কি ভালো'? উনবিংশ শতাব্দীতে যে প্রশ্নের বলে বিধবাবিবাহ চালু হয়েছিল তেমন কোনো প্রশ্ন বা প্রশ্নকর্তার উদয় আজ আর আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

এই হচ্ছে আজকের উচ্চ মধ্যবিত্ত ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ। এ সমাজের লোকেদের অবস্থাটা অনেকটা ত্রিশঙ্কুর মতন। আপ্রাণ চেষ্টা করছেন উড়ে যাওয়ার কিন্তু মাটি ছাড়তে পারছেন না, অথবা মায়া কাটাতে পারছেন না। পূর্বপুরুষদের অন্ধ বিশ্বাসের শিকড়গুলি গেঁথে আছে এঁদের মনে, যা উপড়ে

ফেলার শক্তি এঁদের নেই। অথচ অর্থনৈতিক অবস্থা দেশের আর সব লোকের থেকে এঁদের আলাদা করে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অতএব নতুন কিছু কর ভাই, নতুন কিছু কর। এই নতুন কিছুর করার জন্য এঁরা সাহেব বনে যাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হবে কি করে? রাজনারায়ণ বসুর সেই ধুতি। এমন শক্তভাবে জড়িয়ে গেছে যে প্যান্টলুন না খুলে আর সেটা সরানো যাবে না।

সুমন্ত্র সেন

পা ঠ ক গো ষ্ঠী

ধূর্জটিপ্রসাদ প্রসঙ্গে

শারদীয়া পরিচয়ে আমরা অনেকেই শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র মহাশয় "অন্ধকারে রাত্রি লেপে যাক" লেখাটি পড়েছি।

তারপর আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় শ্রীঅরুণ রায়চৌধুরী মহাশয় এ বিষয়ে কিছু বলেছেন পাঠকদের তরফ থেকে।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে ধূর্জটিবাবুর "মনে এলো" নামে একটি লেখা ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। তাতে তাঁর একটি সসংকোচ উক্তি চোখে পড়েছিল—"ভাবছিলাম আমাকে একবারও সাহিত্য-সাম্মলনে কোনো সভাপতি করল না কেন?" কোনো বন্ধুর কাছে বলেন। তারপরেই আরো অপ্রস্তুত ভাবে ভেবেছেন 'কেন এ কথাটা বললাম'।…যাঁরা ধূর্জটিবাবুর সবুজপত্রে নানারকম লেখা ও বঙ্গবাণীতে "আমরা ও তোমরা", সংগীত বিষয়ে আলোচনা রবীন্দ্রনাথ দিলীপ রায় সহ—উত্তরা পত্রিকায় চিঠিপত্র, অন্যান্য লেখা ও 'পরিচয়ের' লেখাও পড়েছেন, তাঁরা অনেকেই ধূর্জটিবাবুর ঐ সংকোচের কোনো কারণ আছে বলে মনে করবেন না। সবুজপত্র থেকে পরিচয় অবধি যে এক ধরনের শাণিত তীক্ষ্ণ ও সরস মননশীল প্রাবন্ধিক চিন্তার ধারা এখনো চলে আসছে তাতে ধূর্জটিবাবুরও কিছু দান ছিল। এবং যাঁরা সাহিত্য-সম্মিলনের নানা বিভাগে সভাপতি হয়ে থাকেন, মনে হয় ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁদের একজন না-হতে পারায় কোনো হেতু ছিল না। এ আশঙ্কাও তাঁর স্বাভাবিকই ছিল। এবং সংকোচ করাও তাঁর মতো সূক্ষ্ম রুচির মানুষের খুব স্বাভাবিক সংকোচ।

এখনো যদি তাঁর লেখাগুলি সংগ্রহ করেন তাঁর অনুরাগীরা, তাহলে 'সবুজ পত্র' থেকে 'পরিচয়' অবধি যে একটা চিন্তাধারা তখনকার লোকের ও ধূর্জটিবাবুরও চিন্তার ধারা—যা এখনকার সাহিত্যেও রয়েছে তার একটি আলোচনার দিক খুলে যেতে পারে। অনুরাগী বন্ধুদের 'তর্পণ' সংখ্যার সঙ্গেই সেটা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইতি—

জ্যোতির্ময়ী দেবী
কলিকাতা-৯

বর্ষ ৩৫ । সংখ্যা ৬
পৌষ, ১৩৭২

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : দিলওয়ারার মন্দির ভাস্কর্য

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

শাস্ত্রীজীর প্রয়াণে

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে (১১ই জানুয়ারী, ১৯৬৬) আজ সকলেই শোক বিমূঢ়। বিদেশে, প্রিয়জন থেকে দূরে, এমন অপ্রত্যাশিত বিয়োগ মৃত্যুর বেদনাকে দ্বিগুণিত করার কথা। সে বেদনা এক্ষেত্রে শাস্ত্রীজীর মহৎ দানে একটি শান্ত শ্রী ও মহৎ মর্যাদায় মহত্তর হয়েও উঠেছে। সংঘর্ষের সম্মুখে শাস্ত্রীজী জাতিকে যে অবিচলিত নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাই সম্পূর্ণ করেছেন তাশখন্দে সংঘর্ষের অবসান ঘটিয়ে। ভারত ও পাকিস্তান এবং পৃথিবীর সকল দেশের মানুষকে তিনি জীবনের শেষ দিনে শাস্তি ও স্বস্তির অম্লান উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছেন। আমরা কেন তাঁর প্রিয়জনেরাও অনুভব করতে পারেন— শাস্ত্রীজী জীবনের এই চরম অর্ঘ্যে জীবনের শেষ মুহূর্তটি কতখানি পবিত্র করে রেখে দিয়ে গেলেন, আর পৃথিবীর মানুষের কাছে একই কালে কতখানি মহৎ ও কতটা প্রিয়জন হয়ে রইলেন। বিয়োগ বিয়োগই, তার বেদনা কোনো কিছুতেই লঘু হতে পারে না। কিন্তু মৃত্যু যখন অনিবার্য, তখন যে মৃত্যু জীবনের পূর্ণতায় সমৃদ্ধ, নিশ্চয়ই সে মৃত্যুকে মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিণাম রূপে শ্রদ্ধায়, বিনম্র চিত্তে, অবনত মস্তকে গ্রহণ করাও সুনিশ্চিত কর্তব্য। সেই শ্রদ্ধাভরেই আমরা শাস্ত্রীজীর আত্মীয় পরিজনদেরকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাতে চাই; আর সঙ্গে-সঙ্গে এই ভেবেও শান্তিলাভ করতে চাই—ভারতের প্রধান মন্ত্রী তাঁর জাতির মঙ্গলের মতোই সকল জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। স্বজাতির মধ্যে সর্বজাতিকে আর সর্বজাতির মধ্যে স্বজাতিকে সত্যরূপে অনুভব করা, ভারতের এই আদর্শ তাঁরা জীবনেও উদ্‌যাপন করতে চান, মরণেও অঙ্গীকার করে যান। তাঁদের জীবনে ও মরণে আমরা গৌরবান্বিত হই।

সাধারণ মানুষের জয়

লালবাহাদুর শাস্ত্রী অসাধারণ মানুষ ছিলেন, এমন কথা কেউ মনে করতেন না। সাধারণ ঘরের সাধারণ মানুষ,—এই ছিল তাঁর আত্মপরিচয়েরও রীতি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পরে ভারতের রাষ্ট্রভার গ্রহণ করা কারও পক্ষেই সম্ভব হবে কিনা, এ সন্দেহ দেশে-বিদেশে সকলেই প্রকাশ করতেন। নিশ্চয়ই শাস্ত্রীজীও করতেন। তবু আজ উনিশ মাস পরে যখন তিনি তাঁর ভার ত্যাগ করে বিদায় নিলেন, তখন কি কারও মন সন্দেহ আছে—তিনি যোগ্যতার সঙ্গেই তাঁর দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন? এমন কথা কেউ বলবে না— আমাদের সমস্যা আর নেই, সকল সমস্যার তিনি সমাধান করেছেন। বরং বলব, সংকটের মুখেই অনিবার্য নিয়মে আমরা আরও এগিয়ে গিয়েছি। কিন্তু তলিয়ে যে যাই নি তাও সত্য। আর সে কৃতিত্ব বিশেষ করে শাস্ত্রীজীরই প্রাপ্য। বাধ্য হয়েই এই শান্ত মানুষটি সংঘর্ষের পথে পা বাড়িয়েছেন, সে সময় অবিচলিত রয়েছেন। কিন্তু আরও বড় কথা এই—সংঘর্ষ কাটিয়ে তিনি তেমনি সাহসে আমাদের স্বস্তির পথেও উত্তীর্ণ করে দিয়ে গিয়েছেন। এ দুইই অসামান্য কৃতিত্ব। অথচ শাস্ত্রীজী সাধারণ মানুষ ছিলেন। বিশ্বাস করতে হয়— ভারতবর্ষের জনজীবনের মধ্যে এমন শক্তিও নিহিত আছে যাতে তার সাধারণ শক্তির মানুষও জনসমাজের সেই শুভ চেতনায় আপনার সততায় ও কর্মনিষ্ঠায় জাতির যোগ্য কর্ণধার রূপে বিকশিত হতে পারেন; এমন কি, বৃহত্তর মনুষ্য সমাজেরও প্রিয় নায়ক ও আত্মীয় হয়ে ওঠেন। এই উপলব্ধিতেই এই সংকট-সংকুল মুহূর্তে আমরা বিশ্বাস করি ভয় নাই, এ জাতির ভবিষ্যতের জন্য ভয় নাই তার জনসমাজের মধ্যে অমৃতের মন্ত্র আছে।

তাশখন্দের মন্ত্র

মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ—এই পরমবাণীর প্রতি আন্তরিক আস্থা পোষণ না করলে তাশখন্দের অসাধ্য সাধনায় সম্ভবত কেউ হস্তার্পণ করতেও সাহসী হতেন না। ওরূপ বিশ্বাস অন্তরে না থাকলে সোভিয়েত নেতা কেসিগিনিও তাশখন্দের দিকে অগ্রসর হতেও সাহসী হতেন না। কে আশা করতে পারত—ভারত ও পাকিস্তান তাদের অবিশ্বাস ও সংঘর্ষের বিষজ্বালা বিস্মৃত হয়ে এত শীঘ্র এমন শুভ সদ্‌বুদ্ধিতে জাগ্রত হবে? বিরোধের

পথ ত্যাগ করা থাক্ পরস্পরের মুখ দর্শনেও স্বীকৃত হবে? তারপর একবারের মতো সর্বনাশী ও আত্মনাশী সশস্ত্র বিরোধের অবসান ঘটাতে পারবে? সম্মেলনের শেষদিনটি পর্যন্ত মানুষের সংশয় ও অবিশ্বাসই মনে হয়েছিল চিরন্তন জিনিস। কোসিগিনের অক্লান্ত প্রয়াস কোন রাষ্ট্রনীতিক ও কূটনৈতিক মন্ত্রণার সহায়ে সেই দুস্তর বাধা অপসারিত করে ভারত ও পাকিস্তানকেও শেষ পর্যন্ত শুভ চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করল, নিশ্চয়ই বহু কূটনৈতিক ভাষ্যকারের মুখে তার বহু ব্যাখ্যা শোনা যাবে, ভারতে ও পাকিস্তানেও শুনব তাদের নিজ নিজ লাভ ক্ষতির খতিয়ান নিয়ে হিসাবের দ্বন্দ্ব। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস মন্ত্রণাটা যাই হোক তার মন্ত্র এক—মানুষের প্রতি বিশ্বাস। এ বিশ্বাস কোসিগিনকে অসাধ্য সাধনায় পূর্বাপর প্রেরণা দিয়েছে। এবং যদি আমাদের ধারণা ভুল না হয়, তা হলে শেষ পর্যন্ত এ বিশ্বাসই লেনিনেরও মূল প্রেরণা; আর কমিউনিজম্-এর কেন, সমস্ত সাধনারই শেষ আশ্রয়। অবশ্য মন্ত্রণার প্রয়োজন তাতে মিটে যায় না—বিশেষ পরিস্থিতিতে এই মানবতার নীতিকে কী ভাবে সার্থক করতে হবে, তা সেই মন্ত্রণার দিক। নিশ্চয়ই তা অপরিহার্য। কিন্তু মূল নীতিরই প্রয়োজনেই মন্ত্রণা প্রণীত হয় অন্তত আমরা তাকেই বলি লেনিনিস্ট ডিপ্লোম্যাসি। সেই মূল নীতিতে আস্থা না থাকলে 'পাশ্চাত্য' মহাশক্তিদের মতো ভারত বা পাকিস্তানকে অস্ত্র বিক্রয় করে বিরোধের আহুতি জোগাতে সোভিয়েত নেতাও অগ্রসর হতে পারতেন; আর রাষ্ট্রসংঘে বসে দু' পক্ষকে নিরুদ্বেগে অস্ত্রসম্বরণের উপদেশ দিতে পারতেন। কিংবা চীনের ভ্রান্ত ও অভিন্ন কূটনীতিতে প্রতিবেশীর মধ্যে বিরোধ জীইয়ে রাখাই মনে করতে পারতেন এ্যান্টি-কোলোনিয়াল ডিপ্লোম্যাসি। তার পরিবর্তে, তেমন মানবতা-বিরোধী কূটনীতির বিরুদ্ধেই—কোসিগিন অগ্রসর হয়েছেন ভারত ও পাকিস্তানের শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাস নিয়ে, তাদের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটাবার সংকল্প নিয়ে। একবারের মতো তাশখন্দে কূটনীতির ক্ষেত্রেও তাই মানুষের প্রতি বিশ্বাসই জয়ী হয়েছে। বোধহয় ইতিহাসে এই মানবতাবাদীর কূটনীতির এমন সার্থকতা সহজে দেখা যায় না। এইটিই তাশখন্দের মন্ত্র—এই শান্তি ও মানবতার নীতি।

একথা নিশ্চয়ই সত্য এখনো মানবীয় কূটনীতির প্রাধান্য স্থাপিত হতে বহু বিলম্ব আছে। ভারত ও পাকিস্তানের পরস্পর সোহার্দ্যও গড়ে তুলতে

এখনো অনেক ধৈর্য ও সদ্বুদ্ধির প্রয়োজন। একবারের মত বাধা অপসারিত হয়েছে; সেই সুযোগকে সার্থক করতে না পারলে সে দোষ আমাদের—হয় পাকিস্তানের নয় ভারতের, সম্ভবত দুয়েরই। তাই বলে সোভিয়েত কূটনীতির তা পরাজয় নয়, মানবীয় নীতিরও পরাভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে তারও অনেক পরীক্ষা আরও হবে—ভিয়েৎকং, কিম্বা পশ্চিম জার্মানি, কিম্বা আণবিক অস্ত্রত্যাগ, কতখানেই তা এখনো ব্যর্থ হতে পারে। কিন্তু তাই বলে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে তাশখন্দ যে নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে, তা অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই।

রলাঁ শতবার্ষিকী

রম্যাঁ রলাঁর জন্মের শতবর্ষপূর্তি (২৯শে জানুয়ারী, ১৯৬৬) সাংস্কৃতিক জগতের একটি বড় ঘটনা। 'পরিচয়ে'র আগামী কোনো সংখ্যায় বিশেষ করে সে উৎসব প্রতিপালন করতে পারব আশা রাখি। ইতিমধ্যে আগামী মাঘ সংখ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধের অনুবাদ আমরা প্রকাশ করব। প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে বাংলায় অনূদিত হয় নি।

যুগোস্লাভ সাহিত্যিক মেন্দারেভিচ্-এর মৃত্যু সংবাদ তাঁর স্বদেশবাসী ও ভারতবর্ষের বন্ধুদের পক্ষে বিশেষ বেদনাদায়ক। 'পরিচয়ে'র পক্ষে তিনি ছিলেন অকৃত্রিম সুহৃদ। তার একটি কবিতার অনুবাদ 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হয়েছিল। আরও দু একটি লেখা তিনি দিয়েছিলেন তার অনুবাদ আমরা আগামী কোনো সংখ্যায় প্রকাশ করব। 'পরিচয়ে' যে একটি সন্ধ্যা তার সঙ্গে কবিতা অবৃত্তি ও সাহিত্যালাপে আমরা উপভোগ করেছি, তা আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে—আর মেন্দারেভিচ্ও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

আরও একজন আমাদের ছেড়ে গেছেন। তিনি চলচ্চিত্র শিল্পী বিমল রায়। উদয়ের পথে ছবিতে তিনি বাংলা ছবিতে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। আগামী সংখ্যায় আমরা তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা প্রকাশ করতে পারব বলে আশা রাখি।

বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের বিলম্বে ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন থেকে পারমাণবিক মনস্বী ভাবার বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু আর খাদ্য-

সংকটের ঘোরতর অবনতি পর্যন্ত সময়টা নানা ঘটনায় সমাকীর্ণ। আটকবন্দীদের মুক্তি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সংকট পর্যন্ত বহু জিনিসই তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—আমরা যে কঠিন থেকে কঠিনতর সংকটের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছি, তাতে সন্দেহ নেই। 'পরিচয়ের' পক্ষ থেকেও স্বীকার করতে হবে আমরা সেসব সম্বন্ধে আলোচনা করে উঠতে পারছি না। অথচ এসব সমস্যার কথা চিন্তা ও আলোচনা করবার সুযোগ আমাদের চোখের উপর দিয়েই শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ক্রটি স্বীকার করে তবু আশা করছি—যোগ্য ব্যক্তিরা আলোচনায় অগ্রসর হবেন—আমরাও একটু দোষ-ক্ষালনের সুযোগ পাব।

ক্রটি স্বীকার

পরিচয়-এর এই সংখ্যা প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্ব ঘটল, এজন্য আমরা পাঠক গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদের কাছে মার্জনা প্রার্থী। এই সংখ্যায় যাঁদের লেখা প্রকাশিত হল তাঁদের অনেকেই কাগজে কলমে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশে অভ্যস্ত নন। লেখা পেতে তাই কিছু দেরী হয়েছে, ক্রটি ছাপাখানারও কিছু আছে। কিন্তু দেরীতে হলেও সংখ্যাটি পাঠকদের খুশি করবে, আশা করি। নিজগুণে তাঁরা আমাদের ক্রটি মার্জনা করবেন, এ ভরসাও রাখি।

এ সংখ্যা প্রকাশে যাঁদের সহযোগিতা এবং সাহায্য পেয়েছি, এই সুযোগে তাঁদের কাছে জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় 'বহুরূপীর' কথা। খালেদ চৌধুরীর প্রবন্ধে ব্যবহৃত ব্লকগুলির একটি ছাড়া আর সবই পাওয়া গেছে তাঁদের সৌজন্যে; 'কালের যাত্রা'র ছবিটি শ্রীচৌধুরীর সৌজন্যে পাওয়া গেছে। শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত, শ্রীবাদল ধর প্রমুখও আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করছি।

ধূর্জটিপ্রসাদের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথার অনুবাদ-প্রকাশে অনুমতি দেওয়ার জন্য শ্রীমতী ছায়াদেবী ও শ্রীকুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সংগীতস্মৃতি

বয়স যখন কাঁচা ছিল তখন অনেক সমজদারের মধ্যে সাচ্চা ঠেকেছিল দিলীপকুমারকে। তার 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জীতে' দেখা পেয়েছিলাম উত্তর ভারতের বেশ কিছু সেরা সংগীত শিল্পীর। তার মধ্যে কাউকে সে পছন্দ করত, কাউকে হয় তো তেমন করত না কিন্তু ভালবাসত সে সবাইকেই। আচ্ছান বাই, ফৈয়াজ খাঁ, উজীর খাঁ আর তাঁর প্রেমাস্পদা জয়পুরের সেই বৃদ্ধা, জরাজীর্ণা বাঈজী—সকলেই ছিল দিলীপের ভালবাসার পাত্র।

শেষাশেষি দিলীপ হয়ে পড়ল ভক্ত, তার ভালো লাগতে লাগল ধার্মিক মানুষ ও ধর্মসংগীত। তবু আমাদের সকলের মধ্যে তারই ছিল সব থেকে বড় সমজদার হওয়ার সম্ভাবনা। গান আর গাইয়ের প্রতি তার ছিল আশ্চর্য দরদ আর এক সময়ে তাদের গুণগ্রহণও সে করতে পারত যথার্থই। সেদিন সে গান গাইত আর ভালবাসত। এখন তার নিঃসঙ্গ সংগীতের সাধনা।

লখ্‌নৌ পৌঁছে দেখা পেলাম সমজদার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর। মিউজিক কলেজ শুরু হওয়ার আগে তিনি বার দুই লখ্‌নৌয়ে এসেছিলেন। ঠাকোর নবাব আলি খাঁকে এর আগে থেকেই চিনতেন আর মন্ত্রীপ্রবর, রায় রাজেশ্বর বালির সঙ্গে পরিচয় তখনই। এই তিনজনে মিলেই ভিত গাঁথলেন মিউজিক কলেজের। ভাতখণ্ডেজী প্রথমেই শুরু করলেন শিল্পী বাছাই। 'চীনা গেটের' কাছে তাঁর পুরোনো বাড়িতেই চলত তার মহড়া। আমিও সেখানে হাজির থাকতাম অনেক সময়ে। একবারের কথা মনে পড়ে। একজন বুড়ো গাইয়ে এসেছেন। তাঁর জানা বহু সব বিরল রাগের কথা তিনি বলে চলেছেন অবিশ্রাম। ভাতখণ্ডেজীও তারিফ করে যাচ্ছেন কিন্তু আমি তখনও টের পাইনি যে তিনি সব শুনছেন এক কানে। মাঝেমাঝে তিনি উল্টো মাথা নাড়ছেন, কথা বলছেন ও হাসছেন শান্তভাবে। তারপর হঠাৎ বললেন, 'ওস্তাদজী সত্যই অপূর্ব আপনার কাজ। আচ্ছা, ওস্তাদজী,

একটা হাম্বীর ধরুন না কেন'। 'নিশ্চয়ই' বলে ওস্তাদজী ভাঁজতে শুরু করলেন হাম্বীর কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই গুলিয়ে ফেললেন অবরোহীতে পৌঁছে। ভাতখণ্ডেজী কিন্তু মাথা নেড়েই চল্লেন ও একটু পরেই যথারীতি বল্লেন: 'চমৎকার, চমৎকার। ঠিক হয়েছে একদম'। ভাতখণ্ডেজী ঐ সব ওস্তাদদের উপরে হাম্বীর গাওয়ার ঐ সহজ চালটি চালতেন—আরোহী কিছুতেই সেখানে শুদ্ধ মধ্যমে শুরু হবে না—নইলে কেদারার মত হয়ে দাঁড়াবে।

শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকারের তখন তরুণ বয়স। তিনি প্রত্যহ সকালে রেওয়াজ করতেন দু' ঘণ্টা। ভাতখণ্ডেজী শান্তভাবে শুনতেন আর ঈষৎ মাথা নেড়ে সামান্য কিছু মন্তব্য করতেন। বিকেলে আমাদের ক্লাস নিতেন দু' ঘণ্টা ধরে। আমার রোল নম্বর ছিল এক, পাহাড়ী সান্যালের তিন। একবার একনাগাড়ে পুরো দশ দিন—রবিবার শুদ্ধ—তিনি শুধু 'কল্যাণ' রাগ বিষয়ে—তার সারবস্তু ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গে দশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি আমার নোটবুকেই লিখতেন, কিন্তু সে খাতা আজ হারিয়ে ফেলেছি। কলেজ খোলার পর ভাত্‌খণ্ডেজী তার চৌহদ্দীর মধ্যে পুরো ছ'মাস কাটান প্রতিষ্ঠানটিকে ঠিকমত চালু করার জন্যে। এর প্রথম অধ্যক্ষ হলেন যোশী। তিনি ছিলেন এক প্রবীন স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর ও সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ সুপণ্ডিত। দু' তিন বছর পরে অধ্যক্ষ হন শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর। আমাদের তখন গানের সাপ্তাহিক আসর বসত শনিবারে। সেখানে আমরা অনেক কিছুই শিখতাম কিন্তু তার সর্ব প্রধান প্রেরণার উৎস ছিল ভাতখণ্ডেজীর উপস্থিতি।

গল্প বলার ক্ষমতার দিক থেকে আমি যত লোক দেখেছি তার মধ্যে তিনি ছিলেন অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সে দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ, তবু ভাতখণ্ডেজীর গল্প ও ঘটনা বলা খুবই মোক্ষম রকমের হত। তিনি বলে যেতেন কি করে তিনি আসল 'চিজ'টি নিংড়ে বার করতেন ওস্তাদদের কাছ থেকে; তাঁরাও বাগ মানবেন না, তিনি ইস্ক্রুপের প্যাঁচ কষতে থাকবেন। একবার তিনি এক মারাঠি পণ্ডিতের কাছ থেকে দুষ্প্রাপ্য এক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন বরোদার মহারাজাকে দিয়ে তাঁর তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা করিয়ে দিয়ে। সদাশিব রাওয়ের কাছ থেকে এক সঙ্গীতচক্র যোগাড়ের জন্য একবার তিনি এলাহাবাদে তিন দিন অপেক্ষা করেছিলেন আর তারপর দেখলেন সেটি কোনো কাজেরই নয়। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল গ্রন্থাদি পড়ার জন্য তিনি বাংলা শেখেন অনেক বয়সে। দক্ষিণের মস্ত সব আচার্য, উত্তরের বড় বড় ওস্তাদ সকলের সঙ্গেই

ছিল তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয়। পাণ্ডুলিপি ও গুণীর তল্লাসে তিনি দু' বছর ধরে সন্ধান করে ফিরেছেন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। এসবের বৃত্তান্ত তিনি বলে যেতেন অজস্র।

কখনো তিনি আমাদের শোনাতেন গোয়ালিয়রের বুড়ো বুড়ো সব ওস্তাদের কাছে তিনি যে সব গল্প শুনেছেন তার কথা। তাঁরা সবাই নাকি নাম করতেন মাধোজী সিন্ধিয়ার। একবার গান গাইছিলেন হাড্ডু খাঁ। মাধোজী আস্তে আস্তে বললেন, 'ওস্তাদজী, আপনি কি আমার পিলখানা থেকে হাতী বার করে আনতে পারেন? ওস্তাদ জানালেন, 'হাঁ হুজুর'। আর যেমন বলা, তেমন কাজ। হাড্ডু খাঁ কি একটা জানি রাগ ধরলেন— আমার এখন মনে নেই কি সে রাগ—অমনি হাতীরা পিলখানা থেকে পিলপিল করে চলে আসতে লাগল খাসদরবারে। আর তারপর শুরু হল তাদের নৃত্য। আমরা তো গল্প শুনে হাসিতে ফেটে পড়লাম। ভাতখণ্ডেজী বললেন, "এইখানেই কিন্তু গল্পের শেষ নয়। কারণ কি করে এখন হাতীদের ফেরৎ পাঠানো যায়? তখন হাড্ডু খাঁর ভাই হাস্মু খাঁ ধরলেন কেদারা। দাদা তাঁকে বাৎলে দিলেন 'ভায়া, উল্টো তান লাগাও।' ভাই তাই করলেন। হাতীরাও আবার পিলপিল করে ফিরে গেল পিলখানায়।"

ভাতখণ্ডেজী এ গল্প ইংরেজীতে বলেন নি—তিনি বলেছিলেন তাঁর মারাঠিতে। মস্ত সে গল্প, তার প্রতি সুবিচার করাও আমার অসাধ্য। এ কাহিনীর আবার পাঠান্তরও আছে নানা রকম।

তাঁর গল্প বলার ধরনটিকে কি বলা যায়? অবশ্যই তিনি মজলিশি। কিন্তু তাঁর মজলিশ তো জমে বন্ধুদের নিয়ে। অথচ তাঁর সঙ্গে গল্প চালানোর মত বন্ধু লখ্নৌতে তেমন কেউ ছিলেন না—তাঁকে তাই গল্প করতে হত শিষ্যদের সঙ্গে। তা হলে তাঁর সমজদারির মাহাত্ম্য কোনখানে? আমার মতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, দেশের শ্রেষ্ঠ যা কিছু তাকেই আয়ত্ত করার মত বিপুল শক্তি—এরই মধ্যে সে-মাহাত্ম্য নিহিত। তিনি একেবারে যেন মজে গিয়েছিলেন সে রসসমুদ্রে। একদিন সকালে তিনি রাধিকা গোস্বামীকে দিয়ে সকালবেলায় বিলাওলের নানা রকমফের ও সন্ধেবেলা কৌশিকি-কানাড়া গাওয়ালেন। শ্রীকৃষ্ণকে বললেন চুপিচুপি তার স্বরলিপি তুলে নিতে। মনে হল তাঁর সংগৃহীত জ্ঞান একেবারে যেন মিশে গেছে তাঁর চেতনায়। মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি চুপচাপ তাঁর ঘরে বসেছিলেন—মনে

হল যেন ধ্যানস্থ। কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম এখন তিনি দু' কানেই আর একেবারেই শোনেন না। আমি বোকার মত তাঁকে প্রশ্ন করলাম 'আপনি এতে অসুবিধা বোধ করেন না'? তিনি বল্লেন, 'না মুখার্জিবাবু, এতে আমি একেবারেই পীড়িত হই না। কাল মাঝরাতে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল পঞ্চাশ বছর আগে শোনা এক পুরোনো রাগ। আবার সে-রাগ আমার কাছে কাল আবির্ভূত হল তার পূর্ণ মহিমায়। অমনি ঠিক যেমনটি শুনেছিলাম আমি তাই-ই গাইতে শুরু করলাম। ওটি খুবই এক বিরল রাগ—মঙ্গল রাগ। এই বলেই তিনি ফের চুপ করে গেলেন যদিও তাঁর মননপ্রক্রিয়া চলতে থাকল পুরোদমেই।

আসলে ভাতখণ্ডেজী ছিলেন এমন এক ধরনের সমজদার—যাঁর সমজদারির পিছনে ও সামনে ছিল প্রগাঢ় জ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের সমজদারি কিন্তু আর এক ধরনের মনে ধরে রাখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত। বারবার যেন নতুন করে তিনি স্বাদ নিতে চাইতেন, তাই তিনি পুনরাবিষ্কার করতেন ও সৃষ্টি করতেন নতুন করেই। তাঁর ক্ষেত্রে সৃষ্টি প্রক্রিয়া ছিল অতিরিক্ত-রকমের দ্রুতগতি। আমার বোধ হত সেটি আর একটু ধীরগতি হলে হয়তো মননশীল সমজদারিত্বের দাবি পুরোপুরি মিটত। ভাতখণ্ডেজী তাড়াহুড়ো করতেন না। ফৈয়াজ খাঁ ও রাজা ভাইয়াকেও তিনি বলতেন 'চৌথ' শিল্পী বা 'মিকিরথ'; একমাত্র জকরুদ্দীনই তাঁর কাছে ছিলেন পূর্ণ মহারথী।

লখ্নৌ ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেবার কয়েক মাস আগে আমার পরিচয় অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গে। তিনি আমাদের সকলেরই 'অতুলদা'। লক্ষ্ণৌ-এর সেরা ব্যারিস্টার, তাঁর বিপুল সম্পত্তি তিনি দু' হাতে খরচ করতেন গরীব দুঃখীর জন্যে। সারা শহর তাঁর গুণমুগ্ধ, আবার তিনিও মশ্গুল লখ্নৌ-এর প্রেমে। পারিবারিক জীবন তাঁর সুখের ছিল না। এক ধরনের সুগন্ধীগুল্মের মত, পিষ্ট হলেই যেন তিনি আরো বিকীরণ করতেন সৌরভ। খেয়াল, ঠুংরী, কাজরী, চৈতী, সবরকম অপরূপ লোকসংগীতের, সব সংগীতেরই তিনি ছিলেন অসম্ভব রকম অনুরাগী। আমাদের ভাষায় সব থেকে সুন্দর ক'টি গান তাঁরই রচনা। ভারী চমৎকার গলায়; আশ্চর্য সংযতভাবে তিনি সেগুলি গাইতেন। তাঁর গানকে ঘিরে থাকত এক ধরনের আশ্চর্য নৈঃশব্দের মেজাজ।

অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়িটি ছিল গানের কেন্দ্র। লখ্‌নৌ-এর শ্রেষ্ঠ গাইয়েরা জড়ো হতেন সেখানে, শ্রীকৃষ্ণ রতনজন্‌কার ও দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। হেমেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রলাল রায়, অম্বিকা মজুমদার, শচীন দত্ত, প্রশান্ত দাশগুপ্ত সর্বদাই আসতেন তাঁর কাছে। বিখ্যাত সমজদার রাজা নবাব আলি প্রায়ই আসতেন তাঁর হার্মোনিয়াম নিয়ে। অতুলদা কীর্তনও ভালোবাসতেন তাঁর জীবনের কয়েকটি সংগীত-সম্লিষ্ট ঘটনা আমি কখনো ভুলব না—আমার স্মৃতিপটে সেগুলি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কে একজন একবার তাঁকে বললেন যে একজন ভিখারিণী নাকি ভৈরবী গাইছে অপরূপ। অতুলদা তাঁকে বললেন তাকে একটি রাস্তার মোড়ে ডেকে আনতে। দূরে গাড়ি রেখে তিনি মোড়ের দিকে এগোলেন। ভিখারিণী কিন্তু তাঁকে দেখেই পালায়। অতুলদা তাকে চিনলেন; সে ছিল লখ্‌নৌ-এর এক বিখ্যাত বাঈজী—প্রেমে পড়ে তার সর্বস্ব সে বিলিয়ে দিয়েছিল তার প্রেমিককে। প্রতিদানে তার কপালে জুটেছিল প্রবঞ্চনা। জানি না তার কি হল, যন্ত্রণাই পেল হয়ত শেষ অবধি। আর একবার তিনি অম্বিকা মজুমদারের বাড়িতে গিয়েছিলেন। অম্বিকা বললেন, 'অতুলদা, কাছেই এক আশ্চর্য ঠুংরী-গাইয়ে এসেছে। যাবেন নাকি একবার। তার কিন্তু আপনাকে বসতে দেবার মত একখানা চেয়ারও নেই।' অতুলদা তখনই সেখানে গেলেন এবং তার গান শুনলেন দু' ঘণ্টা ধরে। এমন যে কিছু ভালো গাইয়ে তা নয়, তবু অতুলদা ঠাওরালেন যে লোকটার গানের চাল ভালোই।

দুটি নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনেই অতুলদা (পণ্ডিত জগৎনারায়ণ সমেত) উপস্থিত ছিলেন, দিনেরাতে একবারও আদালতমুখো হন নি। এই তিন দিনে তাঁর হাজার দু'তিন টাকা ক্ষতি হল। আমি সত্যিই তাঁকে দেখেছি তাঁর বাড়িতে গান শোনার জন্য, যে কোনো গান শোনার জন্য মক্কেলদের কাছ থেকে দৌড়ে পালাতে। তাঁর চাইতে বেশি গান ভালোবাসতে আমি কাউকে দেখি নি। ভালো গানের তারিফে তিনি যে সব স্বগতোক্তি করতেন তা সত্যিই শোনবার মতো ছিল। গানের সামনে তিনি যেন শিশু ছিলেন।

তাঁর কথায় অনেক দূরে ভেসে এলাম। কিন্তু অতুলদার প্রসঙ্গে 'পরে বলব' বলা কঠিন। তিনি ছিলেন এক প্রকৃত পুরোদস্তুর সংস্কৃতিমান মানুষ

রবীন্দ্রনাথ, নাটোরের মহারাজা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও লোকেন পালিতের বন্ধুত্বভাগ্য তাঁর ছিল। সংগীত ও সাহিত্যের হরগৌরী মিলন সম্ভব হয়েছিল তাঁর মধ্যে। সর্বস্ব বিলিয়েই তাঁর ছিল পরম আনন্দ।

১৯২৪ সনে আমি আবদুল্ করিম খাঁকে শুনেছি তার চরম উৎকর্ষের মুহূর্তে—চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর দিনকয়েক পরে। সত্যিই আশ্চর্য সে সমাবেশ: রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, শরৎচন্দ্র ও অতুলপ্রসাদ সবাই হাজির ছিলেন দিলীপের বাড়িতে। আবদুল করিমের গানের ফাঁকে ফাঁকে গান্ধীজী চাঁদা তুলতে লাগলেন। আবদুল করিমের মেয়ে হীরাবাঈও ছিলেন তাঁর সঙ্গে। উপস্থিত সব মেয়েরাই উজাড় করে দিতে লাগলেন গান্ধীজীর ঝুলিতে। একটি আনন্দভৈরবী সমেত আবদুল করিম আরো কয়েকটি গান গাইলেন; কিন্তু গানের মেজাজ তাঁর নষ্ট হল ঐ সবের ফলে। অথচ শ্রীসত্যানন্দ যোশী আমায় বলেছিলেন যে মোট চারজন—গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও আর-একজন—পুরোপুরি মশ্‌গুল হয়ে যাবেন গানে। আমার ধারণা গান্ধীজী না রাগসংগীত, না অন্য কোনো সংগীতেরই তেমন অনুরাগী ছিলেন, তিনি পছন্দ করতেন শুধ্ ধর্মসংগীত, বিশেষত ভজন। একবার আহমেদাবাদে আম্বালাল সর্রাভাইয়ের বাড়িতে বিখ্যাত বীণকার মুরাদ আলি বাজাচ্ছিলেন তাঁর উপস্থিতিতে। গৃহকর্তা জানতে চাইলেন, 'কেমন লাগছে বাপুজী?' বাপু বললেন, 'আশ্চর্য, কিন্তু আমার চরখার গানের চাইতে মিষ্টি নয়।' ওটা কৌতুক কিন্তু রসগ্রাহিতা কি? রবীন্দ্রনাথের সমজদারি ছিল সাচ্চা; তিনি চোখ বুজে একেবারে 'মস্ত্' হয়ে যেতেন। অতুলপ্রসাদ হতেন উন্মত্ত। আর শরৎচন্দ্র? দিলীপ তাঁকে আবদুল করিমের গান শোনার অনুরোধ জানালে তিনি বলেছিলেন 'নিশ্চয়ই আসবো কিন্তু তিনি থামবেন তো?'

অতুলপ্রসাদ সেনের কথা এতাবৎ যা বলেছি তার চাইতে অনেক বেশি আমি বলতে চাই গানের ব্যাপারে তিনি একেবারে পাগল না হলেও নিশ্চয়ই পাগলাটে ছিলেন। শিল্পীর দশ গজ দূরে থেকে তিনি শুরু করতেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আরম্ভ হত তাঁর 'ওয়া, ওয়া' আরো পাঁচ মিনিটের মধ্যে আরো ঘেঁসে আসতেন শিল্পীর, সঙ্গে টেনে আনতেন গুটোনো সতরঞ্চাটিকে আর তারই সঙ্গে আমাকেও, যদিও বারবার আমাকে সাবধান করতেন তাঁর এই ধরনের পাগলামির বিরুদ্ধে; বলতেন আমি যেন এমন কাণ্ড

কথনো না করি। অনিবার্যভাবেই আমরা দু'জন ভিড়তাম একঘাটেই। আনন্দ উপভোগের তিনি ছিলেন মস্ত সমজদার—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের সে সমজদারি।

গোলগঞ্জের নবাবও ছিলেন ঐ ধরনেরই আর একজন, গান শুনলে তিনি একেবারে গলে পড়তেন। রাজা নবাব আলিও ঐ দলের, তবে তিনি সুর বানাতেন না, শুধু ছটফট করতেন সর্বক্ষণ। তিনিই সেই নবাব যিনি কদর পিয়ার গানে দুরস্ত ছিলেন আর তালিম দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণজীকে। এঁরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো দিক থেকে বিশিষ্ট তবে সবাই ছিলেন সুর পাগল পুরোদস্তুর।

১৯২৩ সন নাগাদ একবার মনে পড়ে আর্কট ও লক্ষ্ণৌয়ের নবাবজাদা হুমায়ুন গভীর রাতে তাঁর জুড়িগাড়িতে আমার ওখানে এসে আমায় টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন সম্পূর্ণ অজানা এক জায়গায়। গাড়ি থেকে নেমে আমরা বেশ খানিকটা হেঁটেছিলাম, মনে পড়ে তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমেছিলাম কিছুটা। অতঃপর হঠাৎ পৌঁছে গিয়েছিলাম আশ্চর্য সুন্দর এক পুরোনো প্রাসাদে। সেখানে জনত্রিশেক লোক—দেখে বোধ হল নবাব আসরে বসেছিলেন, লখ্নৌ-ই কেতায় পিছন দিকে পা মুড়ে। নবাবজাদা আমার সঙ্গে পরিচয় করালেন তাঁদের। জবাবে তাঁদের নেতা আশ্চর্য যে-সব কথা বললেন তার মানে আমি কিছুই বুঝলাম না, তবে নবাবজাদা ইংরেজীতে বললেন যে তার অর্থ নাকি 'অপরিচয়ের মেঘের আড়ালে কতদিন আপনি লুকিয়ে রয়েছেন?' নবাবজাদা অবশ্য ধন্যবাদ জানালেন যথারীতি। তারপরে আমরা আসরে বসলাম, আমাদের আপ্যায়ন করা হল যুঁইয়ের মালা ও সরবৎ দিয়ে। তারপর সঙ্গীত। প্রায় জনা দশেক গাইলেন ওয়াজেদ আলি শার গান উপলক্ষ ওয়াজেদ আলি শা'র লখ্নৌ ছাড়ার দিনটির স্মৃতি উদ্যাপন। যাঁরা গাইলেন তাঁদের ঠিক সংগীতবিশারদ হয়তো বলা চলে না, তবু তাঁরা গাইয়েই। আসল ব্যাপার হল আবহাওয়া, মেজাজ আর সেই মেজাজের থেকেই উদ্ভব তৃতীয় আর এক ধরনের সমজদারির।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গরমের ছুটিতে পরপর দু'বার আমি এলাম কলকাতায়। সেখানে পরিচয় অমিয় সান্যালের সঙ্গে। সে তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। বন্ধুবান্ধব নিয়ে থাকত এক মেসবাড়িতে। তারা গান জানত কিন্তু জানত না যে অমিয় তাদের চাইতে অনেক বেশি জানে। আশ্চর্য লাগে কি

করে অমিয়র পক্ষে সম্ভব হয়েছিল অমন আত্মগোপন। তবে ডাক্তারি জগতের বাইরে সে নিজেকে লুকোয়নি। অদ্ভুত তার এস্রাজের হাত; ঠুংরী গাইত সে অপূর্ব, আবার খেয়ালও গাইত চমৎকার। হাফেজ আলি খাঁ একবার বলেছিলেন 'পাঁচুবাবু (অমিয় ঐ নামেই পরিচিত ছিল), আমি আপনার এস্রাজের হাতটা চুরি করতে চাই।' এক টিপ নস্যি নিয়ে সে শুরু করত হয় তো একটা ঠুংরী। তার 'বাজুবন্ধ' ফৈয়াজ খাঁ-র পরে সবার সেরা ভৈরবী। একবার শচীন সিংহের বাড়িতে বাদল খাঁর এক দারুণ দেশকার, মঈজুদ্দীনের এক আশ্চর্য আড়ানা শুরু করে তারপর সে এস্রাজ বাজাতে লাগল তার তুলনাহীন ভঙ্গীতে। কালি পাঠকও তার সঙ্গে আসতেন মাঝে মাঝে, ও রবি মিত্র তো ছিল তার সর্বক্ষণের সঙ্গী।

অমিয় এখন কৃষ্ণনগরে হোমিওপ্যাথী করে। তার দুই বা তিন মেয়েকে সে ঠুংরী শিখিয়েছে—তারা সত্যই চমৎকার গায়। তিনটি বইও সে লিখেছে —প্রথমটি খুবই ভালো—তৃতীয়টিও ভালো, সেটি ইংরেজীতে। তবে তার দ্বিতীয় বইটি আমার তেমন ভালো লাগেনি।

সে যাই হোক অমিয় সত্যই একজন সাচ্চা সমজদার। সে জানে, গায় ও বাজায়; সে লেখে ও কথাও বলে চমৎকার। কৃষ্ণনগরী ঢং তার আপনার। তার সঙ্গে দেখা করতে আমি এখনও মাইলখানেক হাঁটতে রাজি। আপশোষ এই যে আমাদের দেখা হয় না তেমন ঘন ঘন। মজলিশি মহলেও সে বনেদী। ক'দিন আগে সে আমায় বলেছিল যে সংগীতের আদত কথা হল রস, রস বাদ দিয়ে কোনো কিছুই সে বরদাস্ত করতে রাজি নয়। অথচ নানা ঢংয়ের গান সে ভালোবাসে—উদার তার রুচি।

পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন ঘোষের কিন্তু ঝোঁক ছিল না সঞ্চয়ের দিকে। তখনকার সেরা গাইয়ে বাজিয়েদের তিনি জড়ো করতেন ও তাদের আপ্যায়ন করতেন এলাহিভাবে। সকলের শিল্পের প্রতিই তাঁর সমান আগ্রহ। সমজদার হিসেবে তিনি ছিলেন অতিশয় সজ্জন।

আবার ঠাকোর জয়দেব সিংহের কথাও বিশেষ করেই মনে পড়ে। কানপুরের এক কলেজে তিনি ছিলেন সংস্কৃত ও দর্শনের অধ্যাপক ও সুপণ্ডিত। তারপর তিনি যান খেরি-লখিমপুরে ও সেখানে হলেন অধ্যক্ষ। সংস্কৃত পুঁথি ও দর্শন নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ সত্যই একটা আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু সংগীতেও তিনি হলেন একেবারে পয়লা সারির লোক। আচার্য

নরেন্দ্র দেও যখন উপাচার্য তখন একবার তিনি ঠুংরীর তত্ত্ব ও প্রয়োগ প্রসঙ্গে আশ্চর্য এক ভাষণ দিয়েছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে আমি তাঁর রেডিও বক্তৃতাও শুনেছি। এখন তিনি দিল্লী রেডিও স্টেশনের পরিচালক। সত্যই তিনি এক আশ্চর্য মানুষ, আমার মতে একজন প্রকৃত সমজদার।

বাংলা দেশে আরো কয়েকজন সমজদার দেখেছি: জীতেন রায়চৌধুরী ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—বাস্তবিকই ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা ও গৌরীপুরের সমগ্র পরিবারই। এঁরা হলেন মস্ত সংগ্রাহক। কালি পালও ছিলেন যিনি আমায় সন্ধান দেন রাগ কুসুমের। গুণীদের মধ্যে সব থেকে ভালো গল্প বলতেন করামৎ খাঁ। বাঙলাদেশের নামকরা ঔপন্যাসিক, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তাঁর অনেক গল্প ব্যবহার করেছেন নিজের মত করে। বোম্বাই ও মাদ্রাজেও আমি অনেক সমজদারের সঙ্গে আলাপ করেছি। আমি আগে ভাবতাম সেখানে বুঝি বাঙলা দেশের চাইতে অনেক বেশি সমজদার আছেন। এখন আর আমি অতটা নিশ্চিত নই সে-ব্যাপারে। বাঙলা দেশও এগোচ্ছে নিঃশব্দে। এ কথা ঠিক নয় যে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাঙলা দেশে ঐ সমজদার জাতটাই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আমার বরঞ্চ মনে হয় যে তাঁদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কারণ খেলাধুলোর মত সংগীতেও সক্রিয় যোগদানকারীদের সংখ্যা হয় তো তেমন নয়, কিন্তু দর্শক ও শ্রোতাদের সংখ্যা অনেক বেশি। অবশ্য এও ঠিক যে সক্রিয় যোগদানকারীদেরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। তবু এ দুইয়ের অনুপাত সম্পর্কে আমি এখনো নিশ্চিত নই। এও কি ঠিক যে গুণগত দিক থেকে সমজদারির মাত্রা নিচে নেমে গেছে? ব্যাপার হচ্ছে গুণের ক্ষেত্রে আমরা কিছুতেই নিশ্চিত কথা বলতে পারি না। অবশ্য আলগাভাবে বলতে গেলে মনে হয় যে গুণের পারা বরঞ্চ কিছুটা চড়েই গেছে। সব মিলিয়ে আমার মতে সমজদারি ও কীর্তির দিক থেকেও ভারতীয় সংগীতের এখন উঠতি অবস্থা—আর তার কারণ হচ্ছে অল ইণ্ডিয়া রেডিও। রেডিও অনেক কণ্ঠের সর্বনাশ করেছে, আধুনিক সংগীত সমেত বহু অনাসৃষ্টিও ঘটিয়েছে—তবু আমাদের সবাইকেই ঐ রেডিওই করে তুলেছে সংগীত সচেতন। এ কথা কোনোক্রমেই আমি ভুলতে পারি না যে ১৯১০ থেকে ১৯১৫-র মধ্যে খুব কম ছাত্রই গানবাজনা নিয়ে মাথা ঘামাতেন বা যাঁদের ঐ বিষয়ে অনুরাগ প্রবল ছিল। কিন্তু গত বছর দশেকের মধ্যে

তেমন ছাত্রের সংখ্যা বেড়েছে আশ্চর্য রকম। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যথেষ্টই সমালোচনার বুদ্ধি ধরেন, কারো কারো মনের গড়ন তো রীতিমত গবেষকের মতো। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রাজ্যেশ্বর মিত্র ও 'দেশ' পত্রিকার শার্ঙ্গদেবের মত কয়েকটি নাম তো অনায়াসেই করতে পারি এ-প্রসঙ্গে। আর কম জানান দেন এমন বহু লোকের তো আমি খবরই জানি না। আমি নিশ্চিত জানি যে তাঁরা আমার চাইতে অনেক বেশি জানেন শোনেন এ-সব ব্যাপারে।

বাঙলা দেশের আরো তিনজন সমজদারের আমি উল্লেখ করতে চাই—সুরেশ চক্রবর্তী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও ডি. টি, যোশী। এঁরা সবাই মজে আছেন মার্গসংগীতের রসে, তবে জানি না হয়তো ধ্রুপদে ততটা নয়। এঁরা খেয়াল সত্যই খুব ভালো রপ্ত করেছেন, জ্ঞান ঘোষ তা ছাড়াও জানেন ঠুংরী। তবলা ও হার্মোনিয়ামেও তাঁর দক্ষতা অসামান্য—শেষের যন্ত্রটি তিনি খুবই ভালো বাজান। বেশ কিছু তরুণ, সুদক্ষ তবলিয়া তাঁর শিষ্য। সুরেশবাবু ও জ্ঞানপ্রকাশ দু'জনেই আবার রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও রসগ্রাহী। সুরেশবাবু আজ বাঙলা দেশের সব থেকে সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ হিন্দুস্থানী সংগীতের ক্ষেত্রে। কলকাতা রেডিওতে তিনি পরের পর কয়েকটি বিরল রাগ পরিবেশন করে যাচ্ছেন। রেডিওতে যাকে বলা হয় লঘু সংগীত জ্ঞান ঘোষ হলেন তার প্রযোজক। আগেই বলেছি 'আধুনিক সঙ্গীতে' আমার বিশেষ অরুচি। সেগুলি বিদেশীও নয়, দেশীও নয়। আশ্চর্য এই যে জ্ঞানপ্রকাশ এ-ক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য দোহাই পাড়েন রবীন্দ্রনাথের! আবার তিনিই দীপালি নাগের সঙ্গে চমৎকার দ্বৈত গানের আসর জমান মার্গসংগীতের। আসলে তিনি পড়েছেন এক দোটানায়।

তবে তাঁর সংগীতজ্ঞান সত্যই গভীর। যেভাবে তিনি গাইয়ে বাজিয়েদের উৎসাহিত করেন তাও সত্যই আশ্চর্য। তাঁর সঙ্গীতপ্রতিষ্ঠান, 'ঝঙ্কারে' তিনি কলকাতায় আগত শ্রেষ্ঠ গুণীদের সমাবেশের ব্যবস্থা করেন এমন কি পাকিস্তানি ওস্তাদেরাও বাদ পড়েন না। বড়ে গোলাম আলি, আমির খাঁ আলি আকবর, বিলায়েৎ, রবিশঙ্কর, সলাকৎ ও নাজাকৎ সবাই এসেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠানে। তাঁর টেপ্‌রেকর্ড সংগ্রহও চমৎকার। তাঁর বৈঠকখানায় সাজানো নানান যন্ত্র। ওস্তাদদের তিনি ভারতের নানা জায়গায় সফরে নিয়ে যান। সত্যই তিনি ভালোবাসেন গান ও গাইয়েদের।

আর সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয় হচ্ছেন লাজুক প্রকৃতির। তিনি ভালো বক্তৃতা করতে পারেন না কিন্তু কথা বলেন চমৎকার। জ্ঞানপ্রকাশের বাড়িতে একবার আমরা মুলতানের দুই ভাই, সলাকৎ ও নাজাকতের গান শুনছিলাম। তারা হালের রেওয়াজ অনুসারে বিরল এক রাগ ধরেছিলেন। আমার মনে হল কেদারা ও পুরিয়ার মিশ্রণ। সুরেশবাবু সঙ্গে সঙ্গে জানালেন 'ওটি কেদুরিয়া'। আমাদের সংগীতে এমন কিছু নেই যা তিনি জানেন না। তিনি আকণ্ঠ ডুবে আছেন সংগীতরসে। সংগীত তিনি উপভোগ করেন পুরোমাত্রায় কিন্তু সে রসগ্রহণের কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই। কবে বেরোবে তাঁর বই ?

ধ্রুবতারা যোশী সেতার বাজান খুবই ভালো। তাঁর তালিম এনায়েৎ খাঁর কাছে। কিন্তু তাঁর আলাপ তাঁর নিজস্ব। আবার তাঁর গলাও খুব সুন্দর। আমার ধারণা তিনি ভারতীয় সংগীতের একজন সাচ্চা সমজদার। আমি তাঁর সঙ্গে গেছি লখ্‌নৌ, এলাহাবাদ ও কলকাতায় এবং সর্বত্রই আস্বাদ পেয়েছি তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার।

অনুবাদ : চিন্মোহন সেহানবীশ

* শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংগীত স্মৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত ইংরেজী পাণ্ডুলিপির এক অধ্যায় থেকে তর্জমা।

ঋত্বিককুমার ঘটক

ছবিতে শব্দ

ছবিকে আমরা চিত্রশিল্প অথবা visual art বলে বলে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি, যাতে করে মাঝে মাঝে ভয় হয় শব্দের নিজস্ব জগতের প্রাধান্যের কথাটা আমরা বোধহয় একেবারেই ভুলতে বসেছি। আসলে কিন্তু চলচ্চিত্রে শব্দের প্রাধান্য ততখানি, যতখানি ছবির, চলচ্চিত্রের মূল রস-সঞ্চারে শব্দ একটি বিশাল ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্তত আমার দেখা সব ছবিতে ক'রছে।

তাই এই নিবন্ধের অবতারণা।

আর একটা কথা। চলচ্চিত্র বলতে নিঃশব্দ ও সশব্দ দু ধরনের ছবিকে একই মানেতে আমরা ধরে নিই। এটা মোটেই ঠিক না। নিঃশব্দ ছবি হচ্ছে একটা একেবারে আলাদা শিল্প। তার গতি-প্রকৃতি, তার সূত্রগুলি, তার শব্দরূপ, ধাতুরূপ, অন্য অঙ্কের। "Iron Clad Potemkin" বা "Passion of Joan of Ark,"—"পথের পাচালীর" পূর্বপুরুষ নয়। তার থেকেই বেড়ে উঠেছে শব্দচিত্র,—কিন্তু সে তো স্থিরচিত্র থেকে চলচ্চিত্রও এসেছে। স্থিরচিত্রের সব গুণাবলীর সঙ্গে খালি গতি এসে মিশে কী বিপ্লব ঘটিয়েছে ভাবুন তো! তেমনি নিঃশব্দ চিত্রের সব গুণাবলীর সঙ্গে খালি শব্দ এসে মিশেছে। মূল সিদ্ধান্তটি পাল্টে গেছে।

শব্দের যে-ফিতেটা বিবাহিত হয়ে অহরহ বয়ে চলেছে উৎপ্রেক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে ছবির সঙ্গে সঙ্গে তার উপাদানগুলি কী কী?

পাঁচটি।

কথা বা সংলাপ, সংগীত, incidental noise অর্থাৎ যা ছবিতে দৃশ্যমান ঘটনাগুলোর পরিপূরক শব্দ, effect noise অর্থাৎ দৃশ্যোর্ধ দ্যোতনাময় শব্দ এবং নীরবতা।

সংলাপ নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই, ওটি সব চাইতে প্রকট। ওটি ছবির গল্পকে (অবশ্য যদি থাকে) সোজা এগিয়ে নিয়ে যায় দৃশ্যমান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে। ওটি প্রাথমিক স্তরের।

সংগীত। এটি ছবিতে একটি বিপুল অস্ত্র। সময় সময় ব্রহ্মাস্ত্র।

সংগীতের মধ্যে দিয়ে আমরা অপর একটি স্তরে সমান্তরালভাবে ছবির বক্তব্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করি। নানা রকম আছে। যেমন ধরুন, সমস্ত সংগীতে পুরো ছকটিকে মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে, তবে আমরা প্রথম সুরটিকে বসাই। গোড়াতে পরিচয়-লিপিতেই সমস্ত ছবিটার একটা overture তৈরি করার চেষ্টা করি। তারপর বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন মন্তব্যের জন্যে বিশেষ বিশেষ সুর বা compositions নিয়ে আসে। নিয়ে আসি যখন, শেষ পরিণতিতে সেই বিশিষ্ট সুরটিকেই আমার বক্তব্যের দ্যোতক রূপে কী ভাবে ব্যবহার করব, সেটা ভেবেই নিয়ে আসি।

সংগীত অত্যন্ত সংকেতবহ। সেই সংকেত আমার, কাজেই তা ব্যবহৃত হয় ; তার পেছনে একটা সচেতন নক্সা থাকে।

ধরুন,—গোড়ায় কোনো প্রেমের দৃশ্যে আমি 'রাগ কলাবতী'র একটা বন্দীশ ব্যবহার করলাম। জিনিসটা জায়গাটার জন্যে খুব উপাদেয় বোধ হল শুধু এই ভেবেই করলাম না। মাথার মধ্যে তখন ঘুরছে এই সংগীতের টুকরোটিকেই একেবারে চূড়ান্ত বিপর্যয় এবং দুরন্ত বিচ্ছেদের দৃশ্যে বাজাব। তাতে করে একটি কথা বলা হয়ে যাবে।

আমার "কোমল গান্ধারে"র মূল সুর ছিল দুইবাংলার মিলনের, তাই অনবরত বেজেছে বিভিন্ন প্রাচীন বিবাহের সুর, চরম বিরহের দৃশ্যেও সেই একাত্মীকরণের সুর বেজে চলেছে।

তারপর ধরুন সত্যজিৎবাবুর "অপরাজিত"তে আছে এক অপরূপ ইঙ্গিত। "পথের পাচালী"র অপু-দুর্গা-গ্রামবাংলার দৃশ্যগুলিতে বারে বারে একটি সুর বেজে চলেছে, বলা যায় ওটিই ছবিটির মূল সুর। পথ চলতে আপনি সে সুর শুনলেও চোখের সামনে ভাসবে গ্রামবাংলার আদিগন্ত শ্যামলতা। এবং সেইটিকে নিয়ে সত্যজিৎবাবু একটি কাণ্ড করেছেন। "অপরাজিত"তে যখন সর্বজয়া ও অপু কাশীর রেলের পুল পেরিয়ে চলে এলেন এপারে, হঠাৎ দেখা গেল বাংলাদেশের সবুজ নিসর্গ শোভা। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলো আগের ছবির সেই মূল সুর। সারা ছবিতে ঐ একটিবার মাত্র। তাতেই কাজ হয়ে

গেল। একটি মন্তব্য, একটি পূর্বাপরতা তার সব নিশ্চিন্দিপুর আর দুর্গা আর কাশবনকে নিয়ে এসে আপনার মনে আছড়ে পড়ল।

অনেক সময় অপরের ছবির বিশেষ সুরকে নিয়েও মন্তব্য করা হয়। আমিই করেছি। "La Dolce Vita"-এর শেষে উন্মত্ত তাণ্ডবের দৃশ্যে, যেখানে ফেলিনি গোটা পশ্চিমী সভ্যতার মুমূর্ষুতাকে ধরে চাবকেছেন,—সেখানে যে-বাজনাটি বেজেছিল তার নাম "Patricia"। আমার নিজের দেশের সম্বন্ধে, এই বুদ্ধি-উজ্জল বাংলাদেশ সম্বন্ধে "সুবর্ণরেখা"তে এ ধরনের একটা কথা বলার ইচ্ছা হয়েছিল। তাই শুঁড়িখানার দৃশ্যের পেছনে ওটি আমি লাগিয়েছি, যাতে করে একটি ইঙ্গিত করা যায়। প্রভাবিত হয়েছি? একেবারে না। ওটা একটি কথায় আমাকে অনেক কিছু বলতে সাহায্য করেছে মাত্র।

কোনো বিশেষ চরিত্রেরও মূল সুর থাকতে পারে। সে আসার আগে বা পরে বা উপস্থিতিতে বিশেষ কয়েকটি পর্দা যদি বাজে বারে বারে, তাহলে সে যখন নেই বা আসবে না,—তখন ঐ পর্দা কটি বেজে উঠলে একটা মন্তব্য আসবে বই কি!

অনেক সময় পরিচালক আস্তিনের হাতায় সংগীত লুকিয়ে রেখে দেন মোক্ষম মন্তব্যটি করার জন্য। যেমন ধরুন,—বুনুয়েলের "Nararin," যাঁরা ছবিতে এক ফোঁটা সংগীত নেই। শুধু শেষের দৃশ্যে যেন হাজার হাজার দামামা বেজে উঠলো। তাতে করে অবস্থাটা যা দাঁড়ালো, তাঁরা ছবিটি দেখেছেন, তাঁরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন।

সংগীতের ব্যবহার যে কী ব্যাপক দ্যোতনার জন্মদাতা সেটা ছোট নিবন্ধে বলা সম্ভবপর নয়। কাজেই এইখানেই ক্ষান্ত দিলাম।

দৃশ্যমান ঘটনার সঙ্গী হয়ে যুক্তিযুক্ত শব্দ যেগুলো বয়ে চলে, সেগুলো সম্বন্ধে বেশি কিছু বলার নেই। তবে তারাও মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মানের সৃষ্টি করে। কিন্তু তখন তারা আর শুধুই সঙ্গী শব্দ থাকে না, দ্যোতনাময় শব্দের জাতে উঠে যায়।

দ্যোতনাময় শব্দ। এটি একটি বিশাল জগৎ। শব্দ দিয়ে দ্যোতনা দু'রকম ভাবে করা যায়। এক, যা দেখা যাচ্ছে তার-ই কিছুর মধ্যে দিয়ে; দুই, যা দেখা যাচ্ছে না এমন কিছু শব্দ এনে ফেলে।

ধরুন কোনো দৃশ্যে একটি মেয়ে প্রতি মুহূর্তে ভয় পেয়ে আছে এক অবাঞ্ছিত

ব্যক্তির আগমন সম্পর্কে। খাটে বসে আছে। হঠাৎ খবর এল ব্যক্তিটি আসছেন। মেয়েটি ভয়ে কেঁপে উঠে দাঁড়াল। খাট 'ক্যাঁচ' করে আর্তনাদ করে উঠলো, মেয়েটির বুক ছাৎ করে ওঠার দ্যোতনা হিসেবে এটিকে ব্যবহার করা যায়।

অথবা ধরুন,—দু'জনে কথা বলছে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে,—সবচেয়ে জরুরী কথা বলার সময় জোরে হর্ন দিয়ে একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল। এমন আরো কত কী!

ছবিতে যা নেই, এমন শব্দেরও সৃষ্টিশীল ব্যবহার প্রতিপদে আমরা করে থাকি। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে বন্ধ একটি ঘরে চুপ করে বসে আছে কথা না বলে। দূরে কোথায় যেন পাখি ডাকছে। অথবা একজন হেঁটে চলেছে দূরের স্বপ্ন চোখে নিয়ে, দূরায়ত একটা রেলের ক্লান্ত বাঁশি শোনা গেল। একটা মেয়ে তার চূড়ান্ত দুঃখের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে, কারা যেন দূরে কর্ণার্জুনের শকুনির পার্ট মুখস্থ করছে বেজায় বেসুরে।

একেবারে আলঙ্কারিক শব্দের ব্যবহারও এক-এক সময় ভয়ানক কাজে আসে। এক মেয়ের চূড়ান্ত দুঃখের মুহূর্তে আমি একটা ছবিতে চাবুকের আঘাতের শব্দ ব্যবহার করেছিলাম।

হিসেব কষে শব্দের ব্যবহার আর-এক রকম ভাবেও আছে,—তাকে ইংরেজিতে বলে design by inference। এটি একটি বেশ তাগ্রা ব্যাপার। সংক্ষেপে দুটো একটা উদাহরণ দেবার চেষ্টা করি। একটি বৃদ্ধ বসে আছে একটা বেঞ্চিতে হঠাৎ শোনা গেল খুব কাছে একটা ট্রেন ইঞ্জিন সান্টিং করছে, সঙ্গে সঙ্গে একটি রেলস্টেশনের যাবতীয় শব্দ। আপনার মনে হবে, এটি কোনো রেলওয়ে ওয়েটিং রুম। ক্যামেরা কিন্তু বৃদ্ধের মুখ ছেড়ে কোথাও যায় নি।

বা ধরুন একটি মেয়ের মুখ। কাছে কোথায় যেন কারা হিঁচড়ে একটা লোহার ফাটক সশব্দে বন্ধ করে তালা মারলো। আপনার মনে হবে মেয়েটি বন্দিনী হল, যদিও ছবিতে তার কিছুই দেখানো হয় নি।

Design by inference-র দ্বারা একটা গোটা ছবি একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থেকে বলা যেতে পারে,—এবং বাইরের ঘটনার স্রোত সঠিক ধরা যেতে পারে।

একটি শব্দকে একটি দৃশ্যে এক দ্যোতনায় প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে তাকেও

কাল্পনিকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। আমার একটি ছবিতে এক মা তাঁর বড় মেয়ের প্রেম করাটা চান না। অথচ চোখের সামনে দেখছেন সে তা করছে। সে সময় তিনি রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন,—পেছন থেকে ভেসে আসছিল কড়াইতে তেল পোড়ার গন্ধ। অনেক পরে ঐ একই অবস্থায় তাকে আমরা আবার দেখি। সেবার কিন্তু পেছনে রান্নাঘর নেই। তবু চড়বড় করে পোড়ার শব্দ আমি ব্যবহার করেছিলাম তাঁর মানসিক অবস্থা বোঝাবার জন্যে।

এর দৃষ্টান্ত আর বাড়িয়ে লাভ নেই।

নিঃশব্দতা। আমার মতে এইটেই সবচেয়ে সংকেতবহ উপাদান।

নিঃশব্দতাকে যে আমরা কতরকম ভাবে খেলাতে পারি তার ইয়ত্তা নেই। —যে-কোনো সংকেতপূর্ণ শব্দ নিয়ে আসার আগে নিঃশব্দতাকে সাধারণত ব্যবহার করা যায়। নিঃশব্দতা যে-কোনো আবেগের যেমন সৃষ্টি করতে পারে, তেমন দৃশ্যের লয়-গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, তেমনি আবেগহীনতাও আসতে পারে। শুধু আগে পিছনের শব্দের অবস্থিতির দ্বারা এই ঘটনাটি ঘটে।

যেমন ধরুন,—আপনি একটি প্রচণ্ড শব্দ করে চমক সৃষ্টি করতে চান। তার আগে নীরবতা খানিকক্ষণ লাগবেই। অথবা উচ্ছল গতিতে যেতে যেতে এক জায়গায় স্তম্ভিত ভাব দরকার। নিস্তব্ধতা ছাড়া গতি নেই। একটি দৃশ্যে মধ্যাহ্নবেলার শ্লথমন্থর গতিকে ধরতে হবে। নিস্তব্ধতাই সেটাকে ফোটায় ভাল। কোনো দৃশ্যকে লয় ফেলে দিয়ে ঢিমে করতে হলেও যেমন নিঃশব্দতা, কোনো তীব্রতম মুহূর্তের গতিশীলতা ধরতেও তেমনি নিস্তব্ধতা।

তাই,—ছবির শব্দের ফিতের কথা ভাববার সময় সর্বপ্রথম নিঃশব্দতার হিসেব ছকে নিতে হয়।

এখন আসে, এই সব উপাদানগুলিকে একত্রে মিলিয়ে যে পরিপূর্ণ রসসৃষ্টি, তার কথা।

প্রথমে,—সাজানো। সে সম্পর্কে খানিকটা উপরে বলেছি। সাজানো আরম্ভ হয় প্রথম চিন্তার সূত্রপাত থেকেই। কথার সঙ্গে সংগীতের, তার সঙ্গে বিভিন্ন শব্দের, তার মধ্যে নিঃশব্দতার ফাঁক সব মিলিয়ে ছকটি দাঁড়ায় মাথায়,—

যখন প্রথম ছবিটি কল্পনা করি। ছবি করার পথে নানা কারণে সে ছক নানাভাবে বদলায়, কিন্তু মূল ব্যাপারটি একই থাকে। শেষে যখন সব উপাদান একত্রে জড়ো হল, তখনও পাল্টাতে থাকে ছক, নানা অচিন্ত্যনীয় সংঘটনের দ্বারা।

একমাত্র তখন-ই সংগীত, সংলাপ, বিভিন্ন শব্দ, নিঃশব্দতা তাদের নিজেদের জায়গা খুঁজে পায়।

তখন আসে শব্দ সংমিশ্রণের যুগ। বিভিন্ন শব্দকে বিভিন্ন স্তরে বাজিয়ে তার সঠিক স্থানটিতে পৌঁছে দিতে হয়। কোনোটি বা খুব জোরে, কোনোটিকে বা শুধু অনুভূতির স্তরে রেখে বাজিয়ে তবেই গিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়ায়।

এখানে বিভিন্ন জোরে বাজানোর ঘটনাটা একটু পরিষ্কার করা দরকার।

একই শব্দ,—সে যে-কোনো জাতেরই হোক না কেন, বিভিন্ন জোরে বাজালে ভিন্ন ভিন্ন আবেগের সৃষ্টি করে। অত্যন্ত দ্রুত আনন্দময় সংগীত যদি অতি মৃদু স্বরে বাজানো হয়, তাহলে যে অনুভূতির সৃষ্টি, অতি জোরে বাজালে সম্পূর্ণ অন্য অনুভূতির জন্ম। অতীব করুণ সুর যদি কান ফাটানো জোরে বাজানো হয়, তাহলে সে আর যাই করুক, কারুণ্যের সৃষ্টি করবে না। সমস্ত সংগীতের দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটা গ্রাম খুঁজে বের করাই শব্দ মিশ্রণের সময়কার সবচেয়ে বড় কাজ। কারণ, একটা গ্রামের নিচে শব্দ মানুষ অন্যমনস্কভাবে গ্রহণ করে, এবং একটি গ্রামের উর্ধে মানুষের কান সহ্য করতে পারে না কোথায় ঘরকে ভরে দেবে শব্দে, আর কোথায় অন্যমনস্ক অনুভূতির স্তরে থাকবে,—এ আসে ছবি-করিয়ের নিজস্ব রুচি থেকে। কারণ, এই সময়টা হচ্ছে সবচাইতে মারাত্মক সময়,—এখনই ছবিটা সম্পূর্ণ জন্মগ্রহণ করল। বহুপূর্বে যে-চিত্রনাট্য লেখা গিয়েছিল, এই লগ্নে তার পূর্ণ রূপায়ণ। এখন থেকে ছবি আর ঘরের নয়,—বাইরের, অপরের। এখন থেকে আমার আর জবাবদিহি করার কিছু রইল না।

এই সময় সেই নক্সাটাও পরিষ্কার হয়ে যায়। আপাতদৃষ্ট গল্পের তলে তলে বইছে যে অপর আর-এক স্তরের গল্পবলা—সেটাও এখন প্রকট হয়ে উঠলো। মন্তব্য দিয়ে ফুটনোট কেটে, সংকেত করে করে শব্দের ধারা অন্য এক স্তরে ছবির বক্তব্যকেই বার বার সোচ্চার করে যাচ্ছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, [illegible]। কারণ যে-কোনো সিরিয়াস ছবিই বিভিন্ন স্তরে একই সঙ্গে বলা

হতে থাকে। তার একটি স্তর, এবং সবচাইতে শক্তিশালী একটি স্তর, এই সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল।

তাই বলছিলাম, স্থির চিত্র মুক্তি খুঁজছে গতির মধ্যে,—মূক চলচ্চিত্র প্রগলভ হতে চেয়েছে,—সশব্দচিত্র সে আয়তন বাড়িয়ে দিয়েছে, মগ্ন হয়ে গেছে, অন্য একটা কিছু খোঁজার মধ্যে। চূড়ান্ত শিল্প যে সঙ্গীত তারই নির্ব্যক্ত উদগ্র এককতায় পৌছবার সাধনা বোধহয় ওর।

তবে যে-কোনো শিল্পই শিল্প হয় না, যতক্ষণ না তার একটা বাতাবরণ থাকে। চলচ্চিত্র শব্দেরও একটা ধাঁচা, একটা গোটা নক্সা থাকে।

সেটিকে ধরবার চেষ্টা করা যেমন তৃপ্তিদায়ক, তেমনি ছবিটিকে বুঝতে, তাকে ওজন করতে আমাদের সাহায্য করে।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পে অনবগুণ্ঠিতা

সত্যভাষণকে অনেকে ভয় পান। এবং এই সত্য যখন লজ্জাহীন বিবসনে এসে উপস্থিত হয়, তখন এঁরা বিব্রত হয়ে হয় পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ব্যাখ্যার ধূম্রজালে ঢেকে তার অসংকুচিত সৌন্দর্য থেকে মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন, কিংবা রুষ্ট হয়ে তাকে দমন করতে সমুদ্যত হন।

এই দুই প্রকার ব্যবহার-ই জুটেছে আমাদের দেশের মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যের ভাগ্যে। ভারহুৎ-সাঁচী থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি মন্দিরেই অগণিত নিরাবরণা প্রস্তরমূর্তির স্বচ্ছন্দ বিচরণ ও অকুণ্ঠিত মৈথুন দৃশ্যের প্রাচুর্য, স্থূলরুচিবিচারে নিন্দিত হয়েছে এবং অনেক অর্বাচীন নীতিবাগীশ-ই চুনমাটি দিয়ে এদের শ্বাসরুদ্ধ করে অবলুপ্ত করার কথা ভেবেছেন। আবার মন্দিরের দেবভক্তির পাশে পাশে অনঙ্গদেবতার কেলিকীর্তনের সামঞ্জস্য সাধন করতে গিয়ে কেউ কেউ তান্ত্রিক ধর্মসম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠানের দোহাই পেড়েছেন। কেউ অতীন্দ্রিয়বাদের আড়ালে গিয়ে ভারতীয় ধর্ম ও শিল্পে অনাবৃতা নারীদেহের আধিক্যকে দেখেছেন দেবতার প্রতি প্রেম-আনুকূল্য প্রকাশের মাধ্যমরূপে। এঁদের মতে মনুষ্যদেহ-ই ভগবৎ-মন্দির। বিদ্যাপতির সেই অপূর্ব পংক্তিগুলি স্মরণীয়:

> "পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
> মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
> বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে।
> ঝাড়ু করব হাম চিকুর বিছানে॥
> আলিপন দেওব মোতিম হার।
> মঙ্গল-কলস করব কুচভার॥"

কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই আজ যে এই উভয় জাতীয় মনোভাব-ই একধরনের পলায়নপ্রবণতার পরিচায়ক। অকপট সত্যকে অগ্রাহ্য করার প্রয়াস। প্রথমেই বলে রাখা ভালো, সুনীতি-দুর্নীতির নামে

মন্দির ভাস্কর্যের বিরুদ্ধাচরণ করেন যাঁরা, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে অব্যবহার্য মুদ্রার মতো মনে করি ; এবং যেহেতু অতীতের বহু কুসংস্কারের মতো এর-ও স্বাভাবিক মৃত্যু একদিন ঘটবে বলে বিশ্বাস করি, এই বিশেষ মনোভাবের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু যাঁরা এই ভাস্কর্যের সমর্থনে ধর্মীয় কৈফিয়ৎ তৈরী করেছেন, বুদ্ধিবাদী মহলে তাঁদের প্রভাব কিছুটা ব্যাপক বলে মনোযোগ দানের উপযোগী। যেটা নিন্দিত ও বিব্রতকারক, তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার সহজ উপায় ধর্মের অনুমোদন যোগাড় করা। এর নজির খুব দীর্ঘদিনব্যাপী বলেই বোধহয় বাংলাদেশে ব্যাপারটা বিদ্রূপাত্মক প্রবচনের রূপ পেয়ে গেছে—"দেবতার বেলায় লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।"

এর ফল হয়েছে মারাত্মক। কোণারক-খাজুরাহর শিল্প-সামগ্রী ধর্মে আস্থাহীন আধুনিক মানসিকতার কাছে প্রায় উপেক্ষিত। আর শিল্পরসে অনুপ্রাণিত অনেকে আজকাল মন্দিরগুলি দেখতে যান, কিন্তু ভাস্কর্যের মুনশীয়ানা উপভোগ করতে গিয়ে কিছুক্ষণ পরেই বিষয়বস্তুর কুণ্ঠাশূন্য আদিরসের প্রাবল্য তাঁদের বিব্রত করে তোলে। আসলে একটা নিসর্গচিত্র বা আবক্ষপ্রস্তরমূর্তির মুখাবয়বকে নিছক আঙ্গিকগত সৌন্দর্যানুধাবনের দৃষ্টিতে বিচার করা সম্ভব। কিন্তু এ দেশের মন্দির ভাস্কর্যকে শুধুমাত্র এই মাপকাঠিতে স্বীকার করে সন্তুষ্ট থাকা যায় না যতক্ষণ না দর্শক তার চারুশিল্প সম্বন্ধীয় আবেদনে সাড়া দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার শৃঙ্গাররসাশ্রয়ী চরিত্রটিকেও যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দেন।

ধর্মের কৈফিয়ৎ

শৃঙ্গাররসের আধিক্যের নেপথ্যে ধর্মীয় অভিপ্রায় মূলত কার্যকর ছিল—এ ব্যাখ্যাটা আধুনিক বিচারশক্তির কাছে গ্রহণীয় নয়। কারণ এ যুগের মননশীল মানুষ দেখেছে রাজনৈতিক দর্শন প্রচারের উদ্দেশ্য বা সমাজ-সংস্কারের বাসনা যখন শিল্পে-সাহিত্যে প্রধান হয়ে ওঠে, তখন কি ভাবে তা নান্দনতাত্ত্বিক গুণাবলীকে পঙ্গু করে তোলে। তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন-ই যদি মূল অভিপ্রায় হোত, তাহলে মূর্তিগুলি মধ্যযুগের প্রথম দিকের খ্রীষ্টীয় শিল্পের মতো হতে পারত, যেখানে ধর্মীয় কাহিনীর যথার্থ অনুসরণের জন্ত আদম ও ইভের নগ্নতাকে প্রয়োজনীয় দুর্ভাগ্যরূপেই সহ্য করা হয়েছে, দৈহিক

সৌন্দর্যরূপায়ণের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। রেনেসাঁসের পূর্বে গ্রীক ভাস্কর্যের পুনরাবিষ্কারের আগে, ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয় শিল্পে তাই অনাবৃত মনুষ্যদেহ লজ্জার বিষয়, তার প্রদর্শনে আড়স্ট শীতলতা।

অপরপক্ষে, কোণারক বা খাজুরাহে, শুধুমাত্র বিবসনা নারীদেহ নয়, প্রায় প্রতিটি মৈথুন-দৃশ্যেই যে অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য, দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি যে মমত্ব ফুটে উঠেছে, তাকে নিছক ধর্মীয় সাধনার ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। বরং মনে হয় অতীতে ভারতীয় নন্দনতাত্ত্বিকেরা শিল্পে শৃঙ্গাররসকে স্বাবলম্বী করে আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকার দিয়েছিলেন। বর্তমানের সমালোচকেরা এতে লজ্জিত হতে পারেন, কারণ প্রায় দীর্ঘকাল ধরে নর-নারীর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ দিকগুলিকে গোপন করে রাখতে এবং কখনও কখনও পাপ বলে ভাবতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি।

সুতরাং মন্দিরগাত্রে রতিশাস্ত্রের রূপায়ণের প্রবণতার পিছনে ধর্মীয় অভিপ্রায় প্রধান বলে মনে হয় না, হয়তো ধর্মীয় অনুমোদন ছিল। এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত বোধহয় করতে পারে অতীত ভারতবর্ষের সামাজিক রীতি-নীতি।

অতীতের রীতি-নীতি

যতদূর বোঝা যায়, অতীতে যৌন-বিষয়ক ব্যাপার নিয়ে শিল্পে-সাহিত্যে, আচার-অনুষ্ঠানে বাধানিষেধের যবনিকাটা এতো ঘন ছিল না খুব সম্ভবত। কথায়-বার্তায় নারীদেহের অকুণ্ঠিত বর্ণনায় আধুনিক মনের গোপন লজ্জা ছিল না। মহাভারতে নরনারীর প্রায় যথেচ্ছ পারস্পরিক সম্পর্কের পৌনঃপুনিক বর্ণনায় তদানীন্তন নীতিধর্মে এই সহনশীলতার-ই স্বাক্ষর রয়েছে। এ-জাতীয় নৈতিক মনোভাব সমাজের পক্ষে ভাল কি ক্ষতিকারক—সে তর্কের স্থান, এ প্রবন্ধ নয়। তবে এটা ধর্মনিরপেক্ষ ছিল বলেই মনে হয় এবং স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কটাকে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মাপকাঠিতেই বিচার করা হত, অতিনৈতিকের কঠোর সংযমের মানদণ্ডে নয়। শুধু অতীত ভারতবর্ষে নয়, বোধহয় প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতাতেই জীবন-যাত্রার মান ও সংস্কৃতি চর্চা যখন-ই উৎকর্ষের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেচে, তখন-ই সামাজিক রীতি-নীতিতে মানুষের কাছ থেকে মহামানবিক কর্তব্য দাবি না করে, তার সহজ প্রবৃত্তিজাত ব্যবহারকে কিছুটা উদারতার সঙ্গে দেখার চেষ্টা

হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীস বা রেনেসাঁসের ইটালীর কথা স্মরণীয়।

সেই কারণেই, অতীত ভারতবর্ষে কঠোর সংযমচর্চার দ্বারা জিতেন্দ্রিয়তা অর্জনের নজির ঢালাও আদর্শরূপে সাধারণের জীবনযাত্রায় স্থাপন করা হয় নি। সাংসারিক বা বৈষয়িক মানুষের অধিকার ও বাসনার সামাজিক স্বীকৃতি ছিল বলেই বাৎস্যায়নের কামসূত্র রচিত হয়েছিল। এবং এ-রচনায় খুব স্বাভাবিকভাবেই মানুষের নৈতিক শৈথিল্য, তার মধ্যে সুপ্ত বহুকামাতুর প্রবৃত্তি বা poly-erotic instinct-এর সহানুভূতিপূর্ণ উপলব্ধি ছিল। একথা ঠিক-ই, পুরুষের যৌন অধিকারের অনুপাতে স্ত্রীর অনুরূপ দাবি স্বল্প বিবেচিত হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ। তবুও নারীর জন্য যে চৌষট্টি কলার উল্লেখ আছে, তা একদিক দিয়ে সে যুগের মেয়েদের অনুশীলনী ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ।

ভার্যাগ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য পুত্র-উৎপাদন—এই অনুশাসনের ভিত্তিতে যে মনোভাব গড়ে উঠেছিল এবং যার আলোকে নর-নারীর প্রতিটি সম্পর্ককে দেখা হত, এর সম্পূর্ণ বিরোধী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে বাৎস্যায়নে ও মিথুন-ভাস্কর্যে। হয়তো ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন ও সমাজ-ব্যবস্থায় এই দুই পরস্পর-বিরোধী চিন্তাই কাজ করেছে; কখনও একটি কখনও অপরটি প্রবল হয়ে উঠেছে। তবে নিছক বংশবৃদ্ধির জন্য স্ত্রী-পুরুষের সহবাসকে যদি দেখা হত, তাহলে কামকলার বিভিন্ন স্তর নিয়ে এতো বিস্তারিত আলোচনা কাব্য-রচনা ও শিল্প-সৃষ্টি ভারতবর্ষে সম্ভব হত না। আসলে মনে হয় প্রাচীন ভারতের শিক্ষিত সমাজ রতিক্রিয়াকে শিল্পকলার সমমর্যাদা দিয়েছিল। এবং যে কোনো শিল্পের চর্চার মতো এর অনুশীলনকেও সযত্ন গুরুত্বদান করেছিল। জীবনযাপনের আরও পাঁচটা সত্যের মতো এ বিষয়টিকেও সহজভাবে তারা গ্রহণ করেছিল। তাই মন্দিরগাত্রে নৃত্যরতা বা গৃহস্থালিতে ব্যাপৃতা নায়িকার সঙ্গে সঙ্গে কামকলার দৃশ্যও খোদিত হয়েছে। অবশ্য সামাজিক রীতি-নীতির যথাযথ প্রতিফলন এই শিল্পে রয়েছে বললে মারাত্মক ভুল করা হবে। কারণ কোণারকের মন্দিরগাত্রে কামকলার যে নানারূপ অদ্ভুত ভঙ্গিমা উৎকীর্ণ রয়েছে, তার অধিকাংশ-ই অবাস্তব, যেমন অসম্ভব বাস্তব জগতে দশভুজার সাক্ষাৎ পাওয়া বা গজসিংহের মতো আশ্চর্য জন্তুর দর্শনলাভ। আসলে ভারতীয় শিল্পের অভিব্যক্তিধর্মী ঐতিহ্যের রীতি অনুসারে

কোনো বিশেষ ভাব বা রস প্রকাশের জন্য শিল্পী চিরকাল-ই বাস্তবমূর্তিকে অতিরঞ্জিত করে এসেছে। দেব-দেবীর অসম্ভাব্য শক্তি বোঝাবার জন্য তাই, অনেকগুলি মাথা, হাত বা চোখ দেখানোর রেওয়াজ ভারতীয় ভাস্কর্যে ও পুরাণের বর্ণনায় দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিষ্ঠিত। মিথুন-ভাস্কর্যেও অনুরূপ অতিরঞ্জন ও নায়ক-নায়িকার অঙ্গ-বিন্যাস বা ভঙ্গিমায় যে অবাস্তবতা, তার পিছনে শৃঙ্গাররসের ভাবাভিব্যক্তিই প্রধান; বাস্তব জগতে তার ব্যবহারিক প্রকাশের যথার্থ রূপায়ণের চেষ্টা নেই এখানে। কোণারকের মৈথুনরত মূর্তিগুলিকে তাই বাস্তবধর্মী শিল্পবিচারের মানদণ্ডে রেখে সে যুগের প্রামাণ্য দলিলচিত্র বলে মনে করলে অবিচার করা হবে। বরং এদের অতীত ভারতীয় সমাজে প্রচলিত একটা চিন্তার symbolic বা রূপকধর্মী অভিব্যক্তি বলে গ্রহণ করাটাই যুক্তিসঙ্গত হবে।

কোণারকে মৈথুনরত মূর্তির প্রাধান্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকেই দেখান, এই জাতীয় মূর্তিগুলি মন্দিরের বহিরঙ্গে এবং নিম্নের ধাপে খোদিত। আরও উপরে দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপিত। তাঁরা এর থেকে সিদ্ধান্ত করেন, মানুষের নিম্নগামী পাশবিক মনোবৃত্তি বলে তার কামকেলির দৃশ্য মন্দিরের সর্বনিম্নে স্থান পেয়েছে। আমার কাছে এ ব্যাখ্যাটা গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য মন্দিরগাত্রে মৈথুন-দৃশ্যের উপস্থিতি এ সিদ্ধান্তের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না। মনে আছে, দক্ষিণভারতের নাগার্জুনকোণ্ডায় দেখেছিলাম একটা বিস্তৃত পাথরের প্যানেল, বৌদ্ধজাতকের কাহিনী খোদিত করা। এক একটি কাহিনীর চিত্রের পর যেন যতিচিহ্নের মতো কামকলার স্তরপারম্পর্য উৎকীর্ণ রয়েছে। দেবতার জীবনকাহিনী চিরস্মরণীয় করতে গিয়ে তার পাশাপাশি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি আনন্দদায়ক ঘটনাকেও স্থান দেবার মধ্যে যে মনোভাবটা স্পষ্ট, তাতে আর যা-ই থাকুক, মৈথুনের প্রতি ঘৃণা উদ্রেকের প্রয়াস নেই।

শৃঙ্গারের স্বাধিকার

যাই হোক, প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতের মিথুন-ভাস্কর্যের রসাস্বাদন করতে হলে কি আধুনিক দর্শককে পুরাকালের আচার-অনুষ্ঠানের জ্ঞানের পুরো বোঝা কাঁধে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এক মন্দির থেকে আর এক মন্দিরে ছুটে বেড়াতে হবে? অতীতের প্রতি বারংবার এই দৃষ্টিনিক্ষেপের হয়তো প্রয়োজন হত না, যদি আধুনিক মন বাধা-নিষেধের জাল থেকে মুক্ত হয়ে

যৌন-সম্পর্কের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক সংবেদনশীলতাটাকে মর্যাদা দিতে পারত।

এই সংবেদনশীলতাই অনেকাংশে কাজ করেছে প্রতি দেশেই প্রতি যুগেই বিবসনা নারীমূর্তির রূপায়ণে। ভারতীয় ভাস্কর্যের মতো মৈথুন দৃশ্যের প্রাধান্য না থাকলেও, ইউরোপীয় মূর্তি ও চিত্রশিল্পে অনাবৃতা সুন্দরীর আতিশয্য সুপরিচিত। এর পিছনে আকৃতি বা shape-এর প্রতি শিল্পীর নন্দনতাত্ত্বিক আকর্ষণও রয়েছে, আবার শৃঙ্গাররসাত্মক অনুষঙ্গের আবেদনের প্রতি তাঁর আগ্রহও অস্বীকার করা যায় না। গাছ, লতা-পাতা বা একটা মুখাবয়বের রেখায় যে গঠনযোগ্যতা উপস্থিত, তার থেকে অনেক বেশিমাত্রায় রেখার বহুবিধত্ব ও আলোছায়ার ব্যঞ্জনা পাওয়া যায় নারীদেহের নমনীয়তায়। সুতরাং তার আকৃতির প্রতি আঙ্গিকগত গুরুত্বঅর্পনের কথা অনেক শিল্প-সমালোচক-ই স্বীকার করেন। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে তার যৌন-আকর্ষণ ক্ষমতার প্রতিও শিল্পীর সচেতন হওয়া স্বাভাবিক এবং হয়তো প্রয়োজনও—এ কথাটা বোধহয় অতি-আধুনিক বুদ্ধিবিদ্‌ও সচরাচর মানেন না।

প্রায়শই দেখা যায় অনেকে বিজ্ঞের মতো ব্যাপারটাকে অবদমিত কামনার বিকৃত প্রকাশ বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছেন। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছে করে যে ফরাসী শিল্পী গোগাঁ যখন তাহিতির আদিম বন্ধনশূন্যতায় উদ্দাম প্রণয়াদরে মগ্ন, ঠিক তার পাশাপাশি তিনি তখন যে চিত্ররচনা করেছিলেন তাতে অতিস্পষ্ট উপস্থিত যৌন রূপকল্পে তাঁর উচ্ছ্বসিত আবেগেরই আর একধরনের প্রকাশ পাওয়া যায়। পিকাসোর ব্যক্তিগত জীবনের প্রণয়কাহিনী, এ যুগের সাংবাদিকতার কল্যাণে, বহুল প্রচারিত। অন্তরের স্বাভাবিক বাসনাকে দমন করে বিকৃত মানসিকতায় তিনি ভুগছেন বলে মনে হয় না। অথচ তাঁর চিত্রে আদিরসাত্মক ব্যঞ্জনা বারংবার নানারূপে এসেছে।

আসলে বোঝা উচিত, অন্যান্য মানুষের তুলনায় তাঁদের ধর্মের নিয়মানুসারেই শিল্পীরা অনেক বেশি সংবেদনশীল, তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি আরও অনুভূতিক্ষম। ঠিক এই কারণেই, একটি নারীদেহের কেবলমাত্র আকৃতিগত সৌন্দর্যর প্রতি ঠাণ্ডা দৃষ্টিপাতে সন্তুষ্ট থেকে মহৎ শিল্প সৃষ্টি কখনও সম্ভব হয় নি। তার সঙ্গে জড়িত যৌন অনুষঙ্গের প্রতিও শিল্পীর আবেগ থাকা স্বাভাবিক। একটা নিদর্শন বিচার করে দেখা যেতে পারে। কোণারকের অশ্বমূর্তি বিখ্যাত; গতিময় আকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অপূর্ব উদাহরণ। কিন্তু পার্শ্ববর্তী মন্দিরের

মৃদঙ্গবাদনরতা সুরসুন্দরীর মূর্তির আবেদন একেবারে স্বতন্ত্র। কারণ form-এর খাড়াই-উৎড়াইর প্রতিনিধিস্বরূপা সুডৌল স্তনযুগল, ক্ষীণকটিদেশ, নাতিউচ্চ নাভিমূল এবং তৎপরবর্তী গুরুনিতম্বের ভার গঠন করতে গিয়ে কি করে শিল্পীর স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হবে এই প্রতিটি আকারের সঙ্গে জড়িত যৌন-আনন্দের অনুষঙ্গ ?

নিরাসক্ত হয়ে শারীরসংস্থান অনুধ্যান করে যে কি ধরনের nude study হয় তার পরিচয় পাওয়া যায় সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে আড়ষ্ট মডেলের নিরুত্তাপ চিত্রগুলিতে। Goya-র La Raja Desnuda বা রুবেন্সের Helena Fourment-এর চিত্র অথবা Renoir-এর স্নানরতা সুন্দরীদের রূপায়ণে অঙ্কিত দেহগুলির প্রতি শিল্পীদের যে মমতা প্রকাশিত, তা নিছক দৈহিক মাপজোখের বৈচিত্র্য-অনুসন্ধানী মনোভাব নয়।

শিল্পে নারীদেহের সার্থক রূপায়ণে যে কেবল আকৃতিসম্বন্ধীয় আকর্ষণ নয়, শৃঙ্গাররসাত্মক আকর্ষণও সমভাবে উপস্থিত, তার সপক্ষে বোধহয় একজাতীয় পরোক্ষ প্রমাণ—এ জগতের সবকটি শ্রেষ্ঠ নারীমূর্তির রচয়িতা পুরুষ শিল্পী। ধারণাটা আমার মনে আরও দৃঢ়মূল হল দিল্লীতে আধুনিক শিল্পের জাতীয় প্রদর্শনীগারে রক্ষিত এদেশের বোধহয় একমাত্র বিখ্যাত মহিলা শিল্পী অমৃত শের-গীলের চিত্র-সামগ্রী দেখতে দেখতে। আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকলার আঙ্গিকে দীক্ষিত হয়েও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য পুরোমাত্রায় রক্ষা করে তিনিই খুব সম্ভবত এদেশে সর্বপ্রথম সচেতনভাবে পাশ্চাত্ত্য শিল্পজগতের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছায়ায় চিত্ররচনা করেন। যদিও অল্পকাল বেঁচেছিলেন তাঁর বলিষ্ঠ তুলির টান ও উজ্জ্বল রঙের ছাপ প্রায় প্রতিটি ক্যানভাসকেই জীবন্ত করে রেখেছে। সজ্জিত চিত্রগুলির মধ্যে একটি মেয়ের nude study আছে; তার অঙ্কনভঙ্গীর পাণ্ডুর দুর্বলতা তাকে তার প্রতিবেশীদের মধ্যে নিন্দিত একঘরে করে রেখেছে যেন।

নারীদেহের তুলনায় পুরুষদেহে রেখার গঠনযোগ্যতা কম বলেই বোধহয় শিল্পে সে সমমর্যাদা পায় নি। রেনেসাঁসের গোড়ার দিকে, অনাবৃত মনুষ্যদেহের সৌন্দর্য আবিষ্কারের প্রথম নেশায় মিকেলাঞ্জেলো, রাফায়েল, দা ভিঞ্চির শিল্প সৃষ্টিতে বিবস্ত্র পৌরুষ সৌন্দর্যরচনার উপলক্ষ হয়েছে বারংবার। কিন্তু নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের নানাবিধ আবেদন পুরুষ শিল্পীকে বেশি উৎসাহিত করেছে

বলেই, পরবর্তী যুগে চিত্রকলায় প্রায় মাতৃতান্ত্রিক রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছে। সমমর্যাদা পাবার যোগ্যতা পুরুষদেহের আছে কিনা—এ বিচার সেদিন-ই হবে যেদিন কোনো শক্তিসম্পন্না মহিলা শিল্পীর সংবেদনশীলতায় সে দেহ রূপায়িত হবে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের প্রতি শিল্পীর সংবেদনশীলতা বোধহয় আরও তীব্র আকার নেয় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে। সমস্ত শিল্পীদের মধ্যে, মনে হয়, একমাত্র ভাস্করের পক্ষেই তাঁর শিল্পকলার মূল উপকরণের সঙ্গে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা সম্ভব প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের ভিতর দিয়ে। তাঁর অঙ্গুলিস্পর্শে প্রতি মুহূর্তে অনুভূত হয় মাটির বা পাথরের কোমলত্ব বা কঠিনত্ব; কখনও সে উপকরণ স্ফীত হচ্ছে, কখনও ক্ষীণ হচ্ছে। নীরব নিশ্চলতা এইভাবে কেঁপে ওঠে বাটালির চাপে আর আঙুলের ছোঁয়ায় ঠিক যেমনভাবে আলিঙ্গনের মধ্যে অনুভূত হয় হৃদয়ের উত্তেজনা। ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্গে এত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অন্যান্য শিল্পে বিরল।

ভাস্করের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে এই স্পর্শ-ভিত্তিক form রচনার সঙ্গে যৌন-সচেতনতাটা কি ভাবে মিশে যায়, তার একটি অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায় গতযুগের বিখ্যাত মার্কিন নর্তকী Isadora Duncan-এর আত্মজীবনীতে, যেখানে Rodin-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের এক অসঙ্কুচিত বিবরণী দিয়েছেন:

"Rodin ছিলেন নাতিদীর্ঘ ও শক্তপেশীবহুল। মাথায় ঘন চুল ছোট করে ছাঁটা এবং একমুখ দাড়ি। মহত্ত্বের সারল্য নিয়ে তিনি আমাকে তাঁর শিল্পকর্ম দেখালেন। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর নির্মিত মূর্তিগুলির নাম বিড়বিড় করে বলছিলেন, কিন্তু মনে হচ্ছিল নামগুলি বোধহয় তাঁর কাছে একেবারেই নিরর্থক। ওদের উপর হাত বুলিয়ে আদর করলেন। দেখতে দেখতে আমার মনে হোল যেন ওঁর হাতের তলা দিয়ে মর্মর প্রস্তরখণ্ড গলা সীসে হয়ে বয়ে যাচ্ছে। শেষে একখণ্ড মাটি নিয়ে উনি ওঁর হাতের তালুতে রেখে আস্তে আস্তে চাপ দিতে শুরু করলেন। খুব জোরে নিঃশ্বাস পড়ছিল ওঁর আর সমস্ত শরীর দিয়ে জলন্ত চুল্লির মতো উত্তাপ বার হচ্ছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওঁর আঙুলের মধ্যে একটি নারীস্তন তৈরী হয়ে কাঁপতে লাগল।"

এই সাক্ষাৎকারের পরবর্তী অধ্যায় আরও আলোকপ্রদ এবং লেখিকার অনবদ্য রচনাশৈলীর গুণে তার প্রতিটি বাক্য এতই আত্মসচেতনে গম্ভীর যে অনুবাদের চেষ্টা করে তাকে ক্ষুণ্ণ করা উচিত হবে না। Rodin-কে তাঁর

নৃত্যচর্চার স্টুডিওতে নিয়ে যান Isadora-এর পরে এবং প্রাচীন গ্রীক নর্তকীদের পরিচ্ছদ পরে Theocritus-এর একটি কবিতাকে নেচে দেখান।

"Then I stopped to explain to him my theories for a new dance, but soon I realized that he was not listening. He gazed at me with lowered lids, his eyes blazing, and then, with the same expression that he had before his works, he came toward me. He ran his hands over my neck, breast, stroked my arms and ran his hands over my hips, my bare legs and feet. He began to knead my whole body as if it were clay, while from him emanated heat that scorched and melted me. My whole desire was to yield to him entire being and, indeed, I would have done so if it had not been that my upbringing caused me to become frightened, and I withdrew, threw my dress over my tunic, and sent him away bewildered."

বিমূর্ত শিল্প

আধুনিক শিল্পকলায়, যেখানে বস্তুজগতের পরিচিত সমস্ত আকৃতি-ই বিমূর্তিকরণে পরিবর্তিত হচ্ছে, সেখানে নারীদেহের রূপায়ণে তার অতীতের শৃঙ্গাররসাত্মক চরিত্র লুপ্ত হয়ে যেতে পারত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এ শতাব্দীর শুরুতে পিকাসোর আঁকা Avignon-এর গণিকাদের চিত্র থেকে আরম্ভ করে বর্তমানে Henry Moore-এর ভাস্কর্য পর্যন্ত, নিরাবরণা দেহশ্রী অবলম্বন করে যত শিল্পসৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে নূতন form-এর নন্দনতাত্ত্বিক আবেদনসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, যৌনসচেতনতা আরও ব্যঞ্জনাপূর্ণ হয়ে উপস্থিত হয়েছে।

বিমূর্ত শিল্পে ব্যঞ্জনার সুযোগ অনেক ব্যাপক। একটা বাস্তবধর্মী চিত্রে বিষয়বস্তু পরিচিত আকারের পোশাকে দর্শকের কাছে অত্যন্ত পরিপূর্ণ হয়ে হাজির হয়। কিন্তু Kandinsky-র বিমূর্ত জলরঙে দর্শকের কল্পনা নানা আকার খুঁজে বেড়াতে পারে; কোনো বিশেষ রঙ বা রেখার সমন্বয় তার মনে অনেক অনুষঙ্গ বহন করে আনবে। ঠিক তেমন-ই পিকাসোর ছবিতে কোথাও নারীমূর্তির বিভিন্ন অঙ্গের অতিরঞ্জন বা বিকৃতিতে যে বোধের যৌন

আকর্ষণ ক্ষমতার আভাস পাওয়া যায়। কোনো নগ্নিকার অবয়বের সমস্ত কিছু ভেঙেচুরে শুধু জঘনদেশকে যখন স্ফীতরূপে Matisse আঁকেন, তখন এই একই আভাস দিচ্ছেন। আবার Henry Moore-এর সম্পূর্ণ বিমূর্ত পিণ্ডাকৃতি শয্যাশায়ী পাথরখণ্ডে, হঠাৎ কোনো খাঁজে বা উদ্গতাংশে দর্শক হয়তো নিতম্বতট বা স্তনযুগলের ইঙ্গিত খুঁজে পেতে পারে।

ব্যঞ্জনার আকর্ষণ অতিবিস্তীর্ণ তার মধ্যে বহুবিধ বৈচিত্র্যের সন্ধানপ্রাপ্তির সম্ভাবনার জন্য। আধুনিক শিল্পে যখন নিরাবরণা সুন্দরী, বিমূর্ত হয়ে তার নতুন অর্ধপরিচিত বা অপরিচিত আকৃতি নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন রসাস্বাদনেচ্ছু দর্শকের মন চেনা-অচেনা অনুষঙ্গের আবিষ্কারে দোদুল্যমান হয়ে ওঠে, নানা অস্পষ্ট স্মৃতি জীবন্ত হবার জন্য অন্ধকারে অস্থির হয়। কোণারকের সুরসুন্দরীর আবেদন যেখানে ছিল প্রত্যক্ষ, এ যুগের বিমূর্ত আধুনিকার আকর্ষণ তার দ্যোতনা ফোটাবার ক্ষমতায়। কখনও দেহের সমস্তটা লুকিয়ে কেবল দু-একটি মোহনঅঙ্গের অতিরঞ্জনে কিংবা কখনও শুধু তার অনুমাত্র আভাসে সে যে নিত্যনতুন আকর্ষণের মায়াজাল বিস্তৃত করেছে, তাতে আধুনিক শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রের আদিরসভাণ্ডারও আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে।

অশোক মিত্র

ভারতীয় মন্দিরে আলিঙ্গনভাস্কর্য

জেনরল কানিংহাম ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের জনক। রবীন্দ্রনাথের জন্মবৎসরে এই বিভাগের এবং তৎসম্পর্কীয় আলোচনার জন্ম হয়। কিন্তু জন্মের মাত্র অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা বলিষ্ঠ সাবালকত্ব লাভ করে। তার হয়তো একটা কারণ কানিংহাম কাজ শুরু করেন ভারতীয় স্থাপত্য ভাস্কর্যের অফুরন্ত খনি উড়িষ্যায়। আমাদের জীবদ্দশায় আমরা হল্‌ডেনের মতো দিক্‌পালকে চোখে দেখার, এবং তাঁর কথা শোনার সুযোগ পেয়ে ধন্য। কানিংহামের যুগে প্রায় হল্‌ডেনের মতোই দুজন দিক্‌পাল ভারতের আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো বিরাজ করেন, একজন জেমস ফার্গুসন, অন্যজন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগ সম্বন্ধেই তাঁদের ছিল অপরিসীম উৎসাহ এবং অধিকার। কিন্তু দুজনের বিশেষ অধিকার ছিল ভারতীয় স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে। একদিকে জেনরল কানিংহাম বেগ্‌লার প্রমুখ শিষ্যদের নিয়ে আবিষ্কার ও মাপজোপে নিজেদের নিয়োগ করেন, অন্যদিকে ফার্গুসন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ লেখকগণ আবিষ্কৃত স্থাপত্য, ভাস্কর্যের নির্ণয় অন্বয়ে প্রবৃত্ত হন। ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে ফার্গুসনের প্রামাণ্য ও অক্ষয় রচনাবলী প্রকাশিত হতে শুরু হয় ১৮৬৩ সাল থেকে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অমর কীর্তি, অ্যান্টিকুইটিজ অব উড়িষ্যা দুই বিরাট খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১০৮০ সালে।

ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রথম থেকেই বিশেষভাবে শিল্পশাস্ত্র, মূর্তিলক্ষণ এবং মূর্তিধ্যানের বিতর্ককে আশ্রয় করে। এই আলোচনার জের আজও আমরা কাটাতে পারি নি, এবং কাটাবার বিশেষ ইচ্ছাও আমাদের নেই। তার কারণ আছে। একশ বছর আগে প্রাচীন ও মধ্যযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে যখন আলোচনা শুরু হয়, তখন থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে মৌলিক স্থাপত্যসৃষ্টির বিশেষ কোনো নিদর্শন আমরা

১নং নক্সা

পাই না। সমুখদিকে বা চারিদিকে খালি বা ঢাকা চওড়া বারান্দা-ঘেরা কলোনিয়াল বাড়ি ইংরেজরা প্রবর্তন করেন নি, উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁরা এই ঐতিহ্য পান ডাচ এবং পর্টুগিজদের কুঠিবাড়ি থেকে। ইংরেজের যুগে ভারতীয় স্থাপত্যে ঐক্যসাধন করে শাদা রং-করা দেওয়ানি আদালত, লাল ইঁটের ফৌজদারি আদালত, শাদা রং-করা সার্কিট হাউস এবং হলদে রং-করা ডাকবাংলা। ইংরেজরা বাসগৃহের মতো এগুলিও নেন ডাচদের কুঠিবাড়ি থেকে। প্রবর্তনের মধ্যে তাঁরা শুধু করেন ডোরিক, আইওনিয়ান বা করিন্থিয়ান থামের। ইংরেজযুগে প্রতিষ্ঠিত কোনও একটি বাড়িতে স্থাপত্যনিহিত ভাস্কর্যের বিন্দুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই ধরনের ভাস্কর্য সম্বন্ধে ইংরেজদের কোনও তাগিদ বা বোধ ছিল না। স্থাপত্যনিহিত ভাস্কর্য সম্বন্ধে উৎসাহ এবং উদ্যম বন্ধ হয় মুসলমানযুগে। পূর্ণাঙ্গ, সুডৌল প্রমাণ আকারের ভাস্কর্য সম্বন্ধে নিষেধই ছিল বলা যায়। সুতরাং ১৭।১৮ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত যা-কিছু ভাস্কর্যে কাজ হয় তা শুধু মন্দিরের গায়ে অগভীর স্বল্প উৎকীর্ণ খোদাই, প্রায়শই টালির কাজ, বড়জোর স্টাকোর। একমাত্র ব্যতিক্রম হয় দক্ষিণে। সেখানে সৌভাগ্যবশে কোনওক্রমে মন্দিরস্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ঐতিহ্য বহতা থাকে, যদিও ইংরেজিপ্রভাবে তার নাড়ি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়।

এইহেতু গত শতকের মাঝিমাঝি ভারতীয় মনে স্থাপত্যনিহিত ভাস্কর্য-শিল্প সম্বন্ধে রুচি বা বোধ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বললে বিশেষ অত্যুক্তি হবে না। স্থাপত্য অসম্পৃক্ত ছোট-বড় ভারতীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন ধনী ব্যক্তিরা অথবা রুচির অহংকার যাঁরা করতেন তাঁরা ঘরে আদৌ রাখতেন না। তাঁদের ঘরে বা বাগানে শোভা পেত ইটালিয়ান নিদেনপক্ষে জয়পুরী মার্বেলে তৈরি, ঝুটো ক্ল্যাসিক্যাল ইউরোপীয় কায়দায় খোদাই করা, অপ্সরী-সুন্দরী-পরীর দল, অথবা জীবিত লোকের প্রতিকৃতি। ভারতীয় প্রাচীন বা অতীত ভাস্কর্যের সঙ্গে নাড়ির যোগ তখন সম্পূর্ণ ছিন্ন। কলকাতার যাদুঘরে এসে আস্তে আস্তে জড়ো হওয়া শুরু করলেও সেগুলি হয়ে রইল প্রত্নতাত্ত্বিক ঔৎসুক্যের সামগ্রী। ভারতীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ জীবনের যোগ অবশিষ্ট রইল শুধু পূজা করার প্রতিমায় বা প্রতিষ্ঠিত আরাধ্য দেবতার মূর্তিতে। সেইহেতু বোধহয় পণ্ডিত বা লেখকরা আজও ভারতীয় ভাস্কর্য সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেও অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুরেফিরে শেষ করেন

মূর্তিলক্ষণের নির্ঘণ্টে বা আইকনোগ্রাফিতে। ভাস্কর্যের আইন অনুযায়ী কোনও মূর্তি রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা তার আলোচনা অনেক সময়ে আদৌ হয় না, সমস্ত আলোচনা শেষ হয় কোন্ ধর্মের প্রচার উদ্দেশে এই মূর্তির রচনা সম্ভব হয়েছিল এই নিয়ে, শাস্ত্রোল্লিখিত ধ্যান বা লক্ষণগুলি মূর্তিতে সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয়েছে কিনা সেই চিন্তায়। উনিশ এবং বিশ শতকে ভাস্কর্য বিষয়ে তদানীন্তন রুচিবিকার বা কুরুচির বিরুদ্ধে ইওরোপীয় মনকে যেভাবে নিজের সঙ্গে লড়াই করে রুচি বদলাতে হয়েছিল আমাদের পক্ষে হয়তো তার আদৌ প্রয়োজন হত না যদি আমরা ভারতীয় ভাস্কর্যের পুনরাবিষ্কারের যুগে তার শিল্পোচিত গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রথম থেকে অবহিত হতাম।

সেইজন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিরাট গ্রন্থে স্থাপত্য সম্বন্ধে আমরা যে পরিমাণ বোধ ও জ্ঞানের পরিচয় পাই, ভাস্কর্য সম্বন্ধে পাই না, যদিও তিনি ভাস্কর্য নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। তাঁর ভাস্কর্য বিষয়ক আলোচনা তা মূলত আইকনোগ্রাফিক। যে ভাস্কর্যে আখ্যান বা গল্প আছে সেই ভাস্ক সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ দেখা যায়। আখ্যানহীন ভাস্কর্য অর্থাৎ যে-ভাস্কর্যে বক্তব্য আখ্যান নয় বরং শিল্প বা খোদাইকার্যের কতকগুলি মৌলি সমস্যার নিরাকরণ সে ধরনের প্রস্তাববিতর্কে রাজেন্দ্রলাল মিত্র থেকে অধুনি শিল্প-সমালোচকরা প্রায়ই মৌন এবং উদাসীন। তার একটা কারণ, আমাদে সমাজে এবং দৈনন্দিন জীবনে আমরা যদিবা চিত্রশিল্পী, লেখক বা সুরকারে পরিচিতি হই, তাঁদের চিন্তাভাবনাসমস্যার হদিশ পাই, ভাস্করদের সা আমাদে পরিচয় প্রায় একেবারেই নেই, এব তাঁদের সমস্যা সম্বন্ধে আমাদে চেতনাও স্বল্প।

ফার্গুসন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ সকলেই কোণার্ক, লিঙ্গরাজ রাজারানী প্রভৃতি মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করে কিন্তু এসব মন্দিরের এবং ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র বহুবিস্তৃতভাবে আলিঙ্গন ভাস্কর্য দেখা যায় তার সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ সংকুচিত। প্রায় সকলে মতে এসব ভাস্কর্যের মতো কুরুচি, দুর্নীতিপূর্ণ শিল্পকলা পৃথিবীতে দুর্লভ নীতি ও সৌন্দর্যবোধ কত নীচ, গর্হিত ও দুষ্ট হলে যে এমন ভাস্কর্য সম্ভব সে-বিষয়ে তাঁরা যথেচ্ছ কটূক্তি করেছেন।

অন্যপক্ষে অনেকে নানাবিধ ঐতিহাসিক গবেষণা এবং জল্পনা-কল্পন করেছেন, মধ্যযুগে ভারতবর্ষে প্রায় তিন-চারশ বছর ধরে কি ধরনের মূল্যবো

নৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত মান ও ধর্মস্রোত না-জানি প্রবাহিত হয়েছিল যার ফলে এই সব ভাস্কর্যের সৃষ্টি। সমাজের কি বিকৃতি বা পরিণতি হলে রাজশক্তির সাহায্যে শিল্পীদের সৃজনীশক্তি ও দক্ষতা এই ঘৃণ্য বিষয়ের আলোচনায় ও উৎকর্ষে এইভাবে ব্যয়িত হতে পারে সে-বিষয়েও আমরা একশ বছর ধরে প্রায়ই আলোচনা করে এসেছি।

অবশ্য এসব আলোচনায় এবং নিন্দাবাদে আমাদের ইউরোপীয় এবং ক্রিষ্টিয়ান শিক্ষাও সাহায্য করেছে। ইংরেজি শিক্ষাসম্মত সভ্যতা-ভব্যতার অনেকাংশই 'অরিজিনাল সিনে'র উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইহেতু নরনারীর দৈহিক মিলন বিষয়ক কোনো আলোচনা বা সে-বিষয়ক কোনও বিশদ উল্লেখ বা বিবরণ আমাদের সাহিত্যে ভারতচন্দ্র রায়ের পর আমরা পাই না। আমরা প্রায় ভুলে গেছি যে আধুনিক ইংরেজীয় সাহিত্যের যা মূলত উপজীব্য তার সুস্থ, সাবলীল, সহজ গ্রহণ এবং আলোচনা প্রাচ্য সাহিত্যে, শিল্পকলায় এমনকি সমাজের দৈনন্দিন জীবনে বহু শতাব্দী ধরে অপ্রতিহতভাবে চলে আসছে, যার সঙ্গে আমাদের ভিক্টোরীয় যুগের নতুন শিক্ষার নীতি, ধর্ম ও মানের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

আলিঙ্গন, বিশেষ করে মিথুন ভাস্কর্য বিষয়ে আলোচনা তাই প্রায় সর্বদা ঐতিহাসিক, আইকনোগ্রাফিক বা নীতির আলোচনায় পর্যবসিত হয়। ভাস্করদের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবে ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের ইতিহাস ও তার সমস্যার আলোচনার অভাবে আমরা এই সব ভাস্কর্যের আঙ্গিকগত সমস্যার আলোচনায় আদৌ যাই নাই। নীতি ও ধর্মের প্রশ্ন এত প্রধান হয়ে পড়ে যে আঙ্গিকের তাগিদের প্রশ্ন এবং তার আলোচনা আমাদের দেশে আদৌ এ-পর্যন্ত হয় নি। নীতি ও ধর্মের বা রাজার নির্দেশ ছাড়া শিল্পীও যে শিল্পনীতির ইতিহাসগত ও শিল্পগত সমস্যা নিরকরণের তাগিদে এসব ভাস্কর্য রচনা করে থাকতে পারেন, একথা আমাদের মনে উদয়ই হয় না। আলিঙ্গন বা মিথুন ভাস্কর্য দেখলে দর্শকের মনে কামোদ্রেক হতে পারে, এবং শিল্পীর হয়তো সে উদ্দেশ্যও কিছুটা ছিল। কিন্তু এটা নিশ্চয় ঠিক নয় যে কোণার্কের বা ভুবনেশ্বরের শ্রেষ্ঠ মিথুনমূর্তি দেখলে সাবালক দর্শকের শুধু কামোদ্রেকই হবে, শিল্পবোধ চরিতার্থ হবে না। তা যদি হত তাহলে শিল্পে নগ্নদেহের উপাসনা লোপই পেত, এবং টিশান, জেলাস্কেথ, জর্জোনে বা রেমব্রান্ট কেউই নীতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন না।

-নং নক্সা
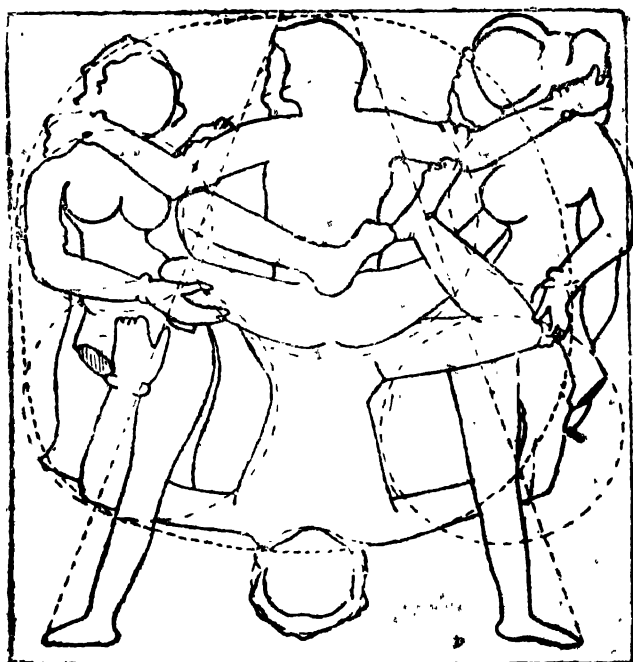
অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানবদেহকে নানাভাবে নতুন উদ্ভাবনায়, আবেগে, রূপে উপস্থাপিত করে ফুটিয়ে তোলাই চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রধানতম সমস্যা। এই সিদ্ধির পিছনে শিল্পী আপ্রাণ চেষ্টিত। মানুষের দেহ, সে নর বা নারীই হোক, এক হিসাবে এত সাধারণ এবং অন্য হিসাবে এত অনন্য, অদ্বিতীয় এবং অসামান্য যে তার অনন্য, অদ্বিতীয় এবং অসামান্য চরিত্র ফোটাতে যখন শিল্পী নিজেকে নিয়োগ করেন, তখন তাঁর নিজের মনে অন্তত কাম বা লালসা থাকা আদৌ সম্ভব নয়, তাঁর সাধনা এতই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যিনি নিছক পর্নোগ্রাফির তাগিদের উপরে উঠে কোনও দিন কিছুক্ষণের জন্যও অন্তত মডেল সমুখে রেখে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য রসোত্তীর্ণ নগ্নদেহ আঁকার বা ফোটোগ্রাফ করার চেষ্টা করেছেন তিনিই একথা স্বীকার করবেন। উপরন্তু এটাও ঠিক যে পর্নোগ্রাফারের পক্ষে রসোত্তীর্ণ গ্রহণযোগ্য ফোটোগ্রাফ বা চিত্ররচনা করা সম্ভব নয়, তার কারণ তাঁর সে শিক্ষা, রুচি এবং সংযম নেই। যিনি পর্নোগ্রাফিপ্রণোদিত হয়ে ছবি রচনা করেন সে-ছবি প্রকাশ্যে দেখানোর সাহস তাঁর থাকে না, কারণ

তিনি জানেন যে তাঁর চিত্ত ও দৃষ্টি শুদ্ধ নয়। তাই তিনি গলিঘুঁজি অন্ধকারে তার প্রচার করেন। শিল্পীর পক্ষে তখন কামোদ্দীপনা চরিতার্থতার প্রশ্নই ওঠে না, শিল্প-সমস্যার নিরাকরণে তখন তিনি এতই গলদঘর্ম ও ব্যতিব্যস্ত। এবং একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে ভারতের মিথুনভাস্কর্য তন্ত্রশাস্ত্রপ্রণোদিত হলেও পর্নোগ্রাফির সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

এ দেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাস্কর্য এত প্রচুর, তার কাজ এত পূর্ণসমাপ্ত, আসমুদ্রহিমাচলে তা এত পরিব্যাপ্ত যে আমরা কয়েকটি মোটা কথা প্রায়ই ভুলে যাই। প্রথমত আমরা মনে রাখি না যে প্রত্যেকটি ভাস্কর্য, হয় পাহাড় বা গুহা বা বড় পাথরের গা খোদাই করে ফোটানো হয়েছে, না হয় তা কোনো বিরাট স্থাপত্যকার্যের গায়ে সংলগ্ন, যেখানে সেই পাথরটি একটি বিশেষ মাপের এবং বিরাট ওজনের, যার সংগ্রহে নিশ্চয় বিশেষ অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় হয়েছে এবং যেটি কোনও কারণে যদি দৈবাৎ নষ্ট হয়ে যেত অথবা যে উদ্দেশ্য বা ডিজাইনের অংশ হিসেবে তা লাগানো হয়েছে, সে-উদ্দেশ্য বা ডিজাইনের ছন্দ যদি কেটে যেত তবে পাথরটি বরবাদ যেত। দ্বিতীয়ত আমাদের ভাস্কর্য-ঐতিহ্য এতই সুদৃঢ়, সমৃদ্ধ ও বহুমুখী যে যাঁরা পাথর, ছেনি, হাতুড়ি, বাটালি নিয়ে কাজ করেছেন তাঁদের পক্ষেই শুধু উপলব্ধি করা সম্ভব এই ধরনের ভাস্কর্যের মধ্যে সামান্যটুকুরও সমকক্ষতা তো দূরের কথা, ধারে-কাছে যাওয়া কতদূর শক্ত। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক পুরীর আধুনিক ভাস্করের তৈরি শ্রেষ্ঠ শালভঞ্জিকা মূর্তি এবং তেরো শতকের যে কোনো নগণ্য অবহেলিত শালভঞ্জিকা মূর্তি। দুটি পাশাপাশি ধরলেই তাদের আকাশ-পাতাল পার্থক্য ও প্রাচীন শিল্পীর উৎকর্ষ চোখে পড়বে। এই সূত্রে যদি এইটুকু স্মরণ রাখি যে এসব মূর্তি কোনও ফ্যাক্টরিতে বা কলে হাজারে হাজারে তৈরি হত না, মাপজোপ, প্যাটার্ন করে লেদমেশিনে ফেলে দিলেই আপনা-আপনি তৈরি মূর্তি কনভয়ের বেল্টে বেরিয়ে আসত না, অপরপক্ষে প্রত্যেকটি মূর্তিই এক-একজন শিল্পীকে বহুদিন পরিশ্রম করে শেষ করতে হয়েছে, প্রতিটি মূর্তি এক-একটি অদ্বিতীয় সৃষ্টি, তাহলেই শুধু আমরা ভারতীয় ভাস্কর্যের বিচিত্র বিস্ময়কর কাজের কিছু হদিশ পাই। তৃতীয়ত যেহেতু ভারতীয় ভাস্কর অনামী এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগে শিল্পীসম্প্রদায়ের সংগঠন ও কর্মপ্রণালী কিরকম ছিল তা আমাদের অজানা, সেহেতু আমরা সেইসব অনামী শিল্পীদের

আধুনিকযুগের স্বনামখ্যাত শিল্পীদের প্রাপ্য মর্যাদার আসন দিতে বিমুখ, আমরা তাঁদের কারিগর ভেবেই তুষ্ট হই, একবারও মনে রাখি না যে তাঁরা নিশ্চয়ই নিতান্ত ছুতোর বা পাথরমিস্ত্রী ছিলেন না, নিশ্চয় উচ্চশিক্ষিত, শিল্পশাস্ত্রজ্ঞ, নানাদেশ ও রীতি পরিভ্রমণকারী অভিজ্ঞ বিদগ্ধসমাজের লোক ছিলেন।

এই যুক্তিগুলি যদি আমরা বার বার স্মরণ রাখি তবেই আমাদের পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব যে ভারতীয় শিল্পী যুগে যুগে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেকে বিশেষভাবে শিক্ষিত ও সজাগ ছিলেন এবং তাঁদের শিল্পগত সমস্যার নিরাকরণ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। ঐতিহাসিক বিবরণীর অভাবে আমাদের এ বিষয়ে সাধারণ ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। আমরা সাধারণত কল্পনা করি যে শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতি কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থ কোনও বিশেষ পণ্ডিত বা মনীষী ব্যক্তি একাই সৃষ্টি করেছেন যার ফলে তাঁর পরবর্তীকালে সকলেই শুধু সে-সূত্রগুলি কলের মতো প্রয়োগ করেছেন মাত্র। এমনকি আমরা মনেও রাখি না যে ভারতীয় শিল্পবিষয়ক কোনও গ্রন্থ, দর্শনগ্রন্থের মতোই, কোনও একজনের লেখা নয়, বরং বহুলোকের বহু বছরের পুনঃ পুনঃ লিখন-পুনর্লিখনের ফল।

এই প্রবন্ধে আমাদের প্রশ্ন ভারতীয় স্থাপত্যনিহিত ভাস্কর্যের ইতিহাসে ভাস্কর্যের ঐতিহাসিক ধারায় আঙ্গিকগত কী সমস্যা-সমাধানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় ভাস্করেরা মিথুন ভাস্কর্যে মনোনিবেশ করেন এবং নানা বিচিত্র বন্ধ-রূপায়ণের মাধ্যমে নিজেদের শিল্পের সিদ্ধি খোঁজেন।

ভারতীয় ভাস্কর্যের আঙ্গিকগত ইতিহাস খুব সংক্ষেপে আলোচনা করে এই প্রশ্নটির একটি সম্ভাব্য উত্তরের প্রয়াস করা যাবে।

মহেঞ্জোদারো এবং তার অনেক শতক পরে পাটলীপুত্রের খনন থেকে যে-সব সীল এবং অল্প খোদাই-করা (লো-রিলিফে) ভাস্কর্য পাওয়া যায়, তার থেকে এটুকু বোঝা যায় যে ঈজিপ্ট থেকে শুরু করে এসিরিয়া ও সুমেরু, ঈরানের পথে ভারতের প্রান্ত পর্যন্ত ভাস্কর্যশৈলীর যে ধারা ইতিহাসপূর্ব যুগে প্রবাহিত হয় তার জাতিবর্ণ এক। এই বিরাট ভূখণ্ডের সেই যুগের ভাস্কর্যশৈলীর সাধারণ নাম দেয়া হয় প্রিমিটিভ ভিশন, বাংলায় আদিম দৃষ্টিভঙ্গি, যদিও এ নামকরণ ঠিক যথাযথ নয়, কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি তখনকার দিনেই বিশেষ একটি দর্শন বা শাস্ত্রের উপর আশ্রয় করে। সে-শাস্ত্র হচ্ছে যে-প্রতিমা বা মূর্তিটি ফুটিয়ে তোলা হবে, সে-প্রতিমা অত্যন্ত সত্য,

জীবন্তেরই সামিল। আমাদের যুগে এর রেশ এখনও আছে প্রতিমার বোধনে, প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ও বিসর্জনে। প্রতিমার অস্তিত্বে ও সত্যতায় বিশ্বাসই এই ভাস্কর্যের মূল উদ্দীপক মন্ত্র। এই মন্ত্রের ভিত্তিতে ভাস্কর্য-রীতির সমগ্র একটি আইন তৈরি হয় বলা যায়, যে আইন ঈজিপ্ট থেকে পূর্বসীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মেসোপটেমিয়ার দেশগুলিতে এই আইনের যে-টুকুবা ব্যবহারিক স্বাধীনতা (এম্পিরিক) ছিল ঈজিপ্ট এবং পরে সাঁচি ও ভারুতে তা বিশেষ বিধিবদ্ধ, দর্শননির্ভর এবং পূতচরিত্রময় হয়। আমাদের দেশের প্রতিমার ধ্যানই এর উৎস। প্রতিমার মধ্যে পূর্ণশক্তি নিহিত করাই সমাজের এবং ভাস্করের উদ্দেশ্য হওয়ায়, ভাস্করের কর্তব্য হল কত সম্পূর্ণভাবে আসল মডেলটিকে পাথরে রূপান্তরিত করা যায়, যাতে আমাদের সাধারণ দৃষ্টির (একটি বিশেষ বিন্দু বা স্থান থেকে মাত্র একটিভাবে দেখার) অসম্পূর্ণতা না থাকে। আমরা যে-কোনো বিশেষ স্থান থেকে কোনো জিনিস প্রায় একটা প্লেনেই দেখি, বস্তুর পিছন দিকটা দেখতে পাই না, এমনকি বস্তু বড় হলে পাশও নয়। কিন্তু প্রাচীন ঈজিপশান ভাস্কর্যে, এমনকি সুমের বা এসিরিয়ায়ও, দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্লেনের দিকটি, যেটি পরিপ্রেক্ষিতের (পারস্পেকটিভ) ফলে সামনের-দিকে-খাটো (ফোর শর্টনিং) হয়ে যাওয়ার দরুণ আমাদের চোখে সাধারণত পড়ে না সেটিকেও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করাই হল ভাস্করের কর্তব্য, যেন ফিগরের সমস্ত কিছু একসঙ্গে যথাযথভাবে চোখের সমুখে ধরাই তার কাজ। এর ফলে প্রায় ৩০০০ বছর ধরে মানবদেহ খোদাই বিষয়ে ঈজিপশান ধর্মাশ্রিত ভাস্কর্যে আমরা এমন একটি অদ্ভুত সুগঠিত শিল্প-সূত্র পাই যার ফলে মাথাটা পাশ করে (প্রোফিলে) খোদাই করে দেখান হত, অথচ একটি চোখ দেখানো হত যেন পুরোপুরি সমুখ থেকে দেখা। সেই মাথার নিচে দেহকাণ্ডটির উপরভাগ খোদাই হত পুরোপুরি সমুখ থেকে দেখার মতো করে, কিন্তু কোমর থেকে তলার পায়ের পাতা পর্যন্ত আবার পাশ করে (প্রোফিলে) দেখিয়ে খোদাই হত। এইভাবে একই মানবদেহের ভিন্ন ভিন্ন ভাগ যে-দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে সম্পূর্ণ করে দেখা যায় মনে হত সেই দৃষ্টিকোণেই খোদাই করা হত। যথা, একসারি সৈন্য একপাশ থেকে দেখানো প্রয়োজন হলে পর পর একজনের সমুখে বা তার উপরে আরেকজনকে খোদাই করা হত। যাতে একজন আরেকজনের পিছনে ঢাকা না পড়ে। গরুর দুধ

দোয়ার দৃশ্য দেখাতে হলে গরুর পাশে গোয়ালাকে খুদে দেখানো হতো, গরুর গায়ের উপর নয় পাছে গরুর গা ঢাকা পড়ে। এসিরিয় শিল্পে, যেমন খোর্শাবাদের বিখ্যাত ষাঁড়ের ভাস্কর্যে, ষাঁড়ের পাঁচটি পা খোদাই হল, যাতে ষাঁড়টি পুরোপুরিভাবে উপস্থাপিত করা যায়। ঠিক একই আইন অনুসারে প্রাচীন ঈজিপশান চিত্রে বা ভাস্কর্যে স্পেসের মধ্যে বস্তুবিন্যাসের কোনো সংজ্ঞা ছিল না। স্পেসের গভীরত্ব এবং পারস্পেকটিভ বোধ অস্বীকৃত হত। কিছু কিছু বস্তু চ্যাপ্টা, সমতল বা ফ্ল্যাট করে খোদা হত, আবার রচনার তাগিদে অন্যান্য বস্তুর প্রোফিল ছোট আকারে দেখানো হত। বড়-ছোট আকার নির্ভর করত বস্তুর আসল বা আপেক্ষিক আকারের উপর নয়, নির্ভর করত দর্শক ও ভাস্করের আপন দৃষ্টি ও নীতির মানের উপর। যেমন গাছের চেয়ে বাড়ির চেয়ে মানুষকে সর্বদাই বড করে দেখানো হত। আরাধ্য দৃশ্যের ছবি ফুটিয়ে তোলা হত দৃশ্যমান জগতের আইনে নয়, মনের, দর্শনের নৈতিক আইনে। দূর থেকে যেমন প্রকাশ বা মূল্য সেইভাবে। চোখের দেখা জগৎ আঁকা হত না, মনের জানা এবং আরাধ্য জগৎই আঁকা হত। মূর্তিকে ধ্যানের সামিল করা হত, ধ্যানকে মূর্তির নয়।

এর ফলে চোখের পথ বেয়ে ভাস্করের হাত বস্তুর সবকটি তল বা প্লেন ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করত। ভাস্কর সজ্ঞানে দৃশ্যমান জগতের দূরে কাছে অস্বীকার করে খোদাইয়ে প্রবৃত্ত হতেন, ফলে মানবদেহ সাধারণত যথাসাধ্য সমুখ থেকে দেখানো হত, বিশেষত মূর্তি বা প্রতিমা, তার থেকে যথাসাধ্য সেইসব রেখা বা ফর্ম বাদ দেওয়া হত যা নাকি স্পেস বা নিকট-দূরের আভাস দিতে পারে। ক্রমে এই রীতি প্রায় অজড় অনড় সূত্রের আকার ধারণ করে ভাস্কর্যকে দাসত্বপাশে আবদ্ধ করল। এর নাম হব ফ্রন্টালিজমের আইন, যার ফলে মূর্তি হল একেবারে স্থাণু, গতিহীন, স্থাপত্যের অনড় স্থিতিস্থাপক অঙ্গ হয়ে।

স্থাপত্যশিল্পে দেয়ালের গায়ে এইভাবে দেখা দিল নানা ধরনের খোদাই, কোনোটা শুধু আঁচড়কাটা, তার পরে আস্তে আস্তে খুব অল্প বের করে খোদা (লো-রিলিফ) তার পরে আসল গভীরত্বের অর্ধেকেরও কম গভীর করে (বা-রিলিফ বা বেসরিলিফ), তার পরে অর্ধেকেরও বেশি এমনকি পুরো গভীরত্ব দেখিয়ে (ফুল-রিলিফ)। কিন্তু যখনই খোদাই দেয়ালে হত তখনই তা হত পাশ থেকে খোদাই, দেয়ালের উপর ছায়ার আকারে। মন্দিরের

খুঁটিনাটি দেখানো হত বাটালির ঘায়ে নক্সা করে, খোদাই করে ততটা নয়। ফলে ফিগরের আকৃতিরেখাটি হত অত্যন্ত বলিষ্ঠ, প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের মতো।

মানবদেহ খোদাইয়ের সময়ে মুখের ভঙ্গী হত একেবারে আড়ষ্ট, ঋজু, স্পন্দনহীন, নৈর্ব্যক্তিক, চারিদিকের গতির সঙ্গে একেবারে বিচ্ছিন্ন, ভঙ্গী হত ভাস্কর্যের সাধারণ ছন্দের অনুবর্তী, ফলে দেহের ভঙ্গিতে আসত উপাসনার গাম্ভীর্য। জীবজন্তু খোদাইয়ের সময়ে অবশ্য শিল্পী আরও স্বাধীনতা নিতেন, চোখের দেখার উপরে করতেন বেশি নির্ভর, খোদাইয়ে আসত গতি, অনেক বেশি পরিমাণে মডলিং, পরিপ্রেক্ষিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে নারীদেহ পুরুষদেহের চেয়ে সর্বদাই বেশি জীবন্ত, পূর্ণ ও প্রাণবন্ত হত, বোধহয় নারীকে প্রকৃতি হিসাবে দেখার ফলে। এমনকি অনেক ঈজিপশান চিত্রে ও ভাস্কর্যেও নারীদেহে লাস্য, কমণীয়, টলটলে ভাব ফুটিয়ে তোলা হত। এর অজস্র উদাহরণ অবশ্য আমরা পাই মৌর্য, সুঙ্গ ও গুপ্ত শিল্পকলায়। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে প্রধান ভাস্কর একবার মাপজোপ করে কাজ ভাগ করে দেবার পরে কারিগরের ব্যক্তিগত দক্ষতার ইতরবিশেষের ফলে নানাবিধ ত্রুটি শেষপর্যন্ত থেকে যেত।

ল অব ফ্রন্টালিজমের ফলে ভাস্কর্যে যে সমস্ত সমস্যার উদয় হয় তার প্রভূত অভিনব নিরাকরণ ও সমাধান ভারতীয় ভাস্কর্যে যেভাবে সম্ভব হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও তত বিচিত্রভাবে হয় নি। আমার মনে হয় মিথুন বা বন্ধ ভাস্কর্যেই ফ্রন্টালিজমের আড়ষ্টতা এবং ঋজুতা সম্পূর্ণভাবে দূর করে ভারতীয় ভাস্কর ভাস্কর্যকে পুরাপুরি প্রাণস্পন্দিত, জীবন্ত, গতিময়, এমনকি স্পর্শগ্রাহ্য শিল্পে রূপান্তরিত করেছেন। এবং এই হিসাবেই ভাস্কর্যের ইতিহাসে ভারতীয় বন্ধ ভাস্কর্যের সার্থকতা।

ভারতীয় ভাস্কর্য যে কাষ্ঠশিল্পী বা সূত্রধর এবং হস্তিদন্তশিল্পীর কাছে ঋণী তা পুরাতন ভাস্কর্যমাত্রেই প্রমাণিত হয়, সাঁচিতে তো স্পষ্ট উল্লেখই আছে। মৌর্যযুগের অখণ্ড স্তম্ভে ও যক্ষমূর্তিতে প্রথম দেখা যায় ভারতীয় শিল্পী কি ভাবে ফ্রন্টালিজ্‌ম্ অনুধাবন করেও তার প্রাণবন্ত, গতিশীল ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেন। প্রথমেই মাথা এবং মুখ প্রোফিলে না এঁকে তিনি সোজা সমুখ থেকে দেখে মাথা এবং মুখ খোদাই করে তার থেকে আস্তে আস্তে অজড়, অনড় স্পন্দনহীন কাঠিন্য সরিয়ে আনলেন মানুষী কমনীয়তা, এমন

কি ঈষৎ হাসি বা ভ্রুকুটি। কিন্তু তা সত্বেও ঋজুতা, নৈর্ব্যক্তিক মূর্তির ভাব যথেষ্ট ছিল। ফ্রন্টালিজম্ সম্বন্ধে উপরে যা বলা হয়েছে খৃষ্টপূর্ব ২০০—১০০ সনে ভারুত ও সাঁচির ভাস্কর্যে প্রায় তার সবকটি লক্ষণই আমরা দেখতে পাই। আড়ষ্টতা, উপাসনার গাম্ভীর্য, ফ্রন্টা-লিজ্‌মের ঋজুতা, পারস্পেক-টিভের উপেক্ষা, সবই খুব সুস্পষ্ট। সাঁচির ভাস্কর্য আমাদের দেশের সবচেয়ে 'পবিত্র' ভাস্কর্য, সেই হেতু ফ্রন্টালিজ্‌মের সবকটি লক্ষণই এতে প্রকট। স্পেস বা পারস্পেকটিভ সাঁচিতে প্রায় নেই বলা যায়, দূরে কাছে দেখানো হয়েছে একের নীচে আরেকটি সমান্তরাল পটি, সারি সারি করে সাজিয়ে। সব ফিগরই প্রায় সমান আকারের, কেবল মানুষের ফিগর সর্বত্রই বড়। মানবদেহ খোদাই বিষয়েও সাঁচিতে দেখা যায় একান্ত ঋজুতা, গাম্ভীর্য, গতিহীনতা, অথচ জীবজন্তু লতাপাতার বিষয়ে প্রাণস্পন্দন, গতি, হিল্লোল, আবর্ত। এমন কি এই গতি ও আবর্ত আনার জন্য ভারতবর্ষে মেডালিয়ন আকৃতির সৃষ্টি হয় বলা যায়।
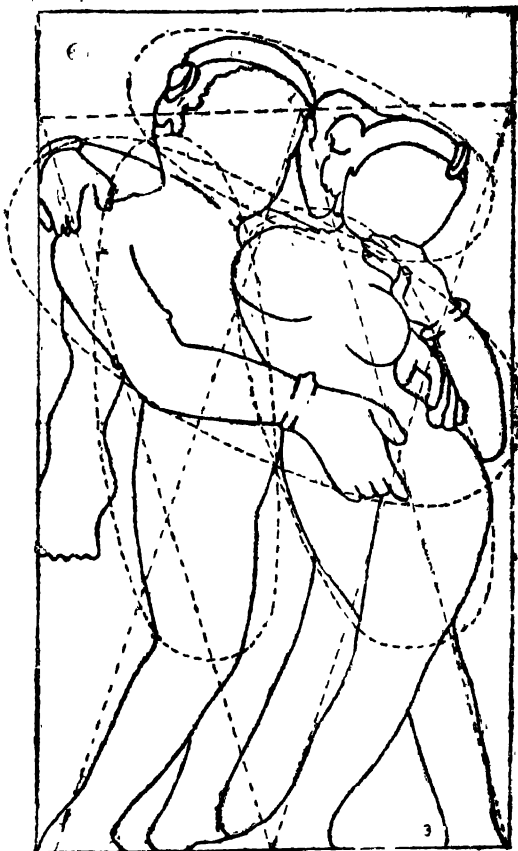
৩নং নক্সা

ঐতিহাসিক যুগে ফ্রন্টালিজ্‌মের দ্রুত রূপান্তরে দুটি কর্মধারা বিশেষ করে সাহায্য করে। একটি ভারতবর্ষের নিজস্ব টেরাকটা পুতুল, সীল ও মূর্তি ইত্যাদি, এবং অন্য ধারা গান্ধার ভাস্কর্য। সুঙ্গ ও কুশাণযুগের ফ্রন্টালিজ্‌মের ঋজুতা যে যথেষ্ট ছিল তার ভুরিভুরি প্রমাণ মথুরা যাদুঘরে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই সময়ে মথুরায়, অহিচ্ছত্রে পাটলীপুত্র এবং অন্যত্র টেরাকটায় যে রকম অদ্ভুত প্ল্যাস্টিক উৎকর্ষ দেখা যায় তার ঢেউ নিঃসন্দেহে পাথরের ভাস্কর্যে লাগে। গ্রীক প্রভাবও ইতিমধ্যে গান্ধার শিল্পে এসে ফ্রন্টালিজ্‌ম্‌কে আঘাত করে।

টেরাকটা এবং গ্রীক প্রভাবের ফলে প্রাচীনযুগের দেয়ালে আঁচড়কাটা ভাস্কর্য ক্রমে ক্রমে লো-রিলিফে, পরে বা-রিলিফে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ফ্রন্টালিজ্‌ম্‌ আইন অনুযায়ী ফ্রিজ কখনও ভারতীয় ভাস্কর্য থেকে লুপ্ত হয়নি। দেয়ালে নিহিত ফ্রিজের লো-রিলিফ বা বা-রিলিফ পূর্ণভাবে ফুটিয়ে, ভাস্কর্যকে ফ্রেমে আঁটা অর্ধচিত্রের আকার থেকে মুক্তি দিয়ে, বদ্ধ ভাস্কর্য আরেক হিসাবে ভারতীয় ভাস্কর্যের কৈবল্যসাধন করে, তাকে পূর্ণ রিলিফ, সুডৌল ভাস্কর্য বা স্কাল্‌পচার ইন দি রাউণ্ডের মুক্তি ও সিদ্ধি দিয়ে, সেইসঙ্গে জীবন্ত, স্পন্দিত, প্রাণচ্ছন্দ দিয়ে।

খৃষ্টজন্মের ১৩০ সাল থেকে ভারতীয় ভাস্কর পূর্ণ বুদ্ধমূর্তির সৃষ্টি আরম্ভ করেন। এইখানে বৌদ্ধধর্মের বিধানে ফ্রন্টালিজ্‌মপ্রসূত মুখের ঋজুতা এবং নৈর্ব্যক্তিক আড়ষ্টতা ভেঙ্গে আসে ক্ষমাসুন্দর ঈষৎ হাসি, মুখের পেশীতে ঈষৎ মানুষীভাব, যদিও দেহের ছন্দে উপাসনা, ধ্যানের স্টাইলাইজ্‌ড্‌ গাম্ভীর্য পূর্ণভাবে বিরাজিত। ফ্রন্টালিজ্‌মের প্রধান গ্রন্থি, মুখের আড়ষ্ট কাঠিন্য, যেই বৌদ্ধধর্মের বিধানে দূর হলো তখনই সম্ভব হলো নানাবিধ প্ল্যাস্টিক সমস্যার নূতন সমাধানের চিন্তা। এই সমাধানে, আগেই বলেছি, টেরাকটা শিল্প বিশেষভাবে সাহায্য করে।

গুপ্তযুগে বৌদ্ধভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প কয়েক ক্ষেত্রে আশ্চর্য সিদ্ধিলাভ করে। চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর মানবদেহের আদর্শ মাপ বা স্কেল আবিষ্কার করেন। এই স্কেল অবশ্য একহিসাবে ফ্রন্টালিজ্‌ম আইনেরই অবদান। কিন্তু ফ্রন্টালিজ্‌মে এই সব মাপ বা স্কেল শুধুমাত্র সমুখ থেকে খাড়া দাঁড় করানো ফিগরেই প্রয়োগ করা হতো, কিন্তু গুপ্তযুগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এইসব আদর্শ মাপ শরীরের যে-কোনো ভঙ্গীতেই প্রযোজ্য হলো। ত্রিভঙ্গ আকার ফ্রন্টালিজ্‌মের আড়ষ্টতা ভাঙ্গতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। ফলে চিত্রশিল্পে এল আশ্চর্য মুক্তি ও গতি। ভাস্কর্যে তার সুফল হল এই যে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আদর্শ মাপ ও হিসাব সর্বত্র একভাবে গ্রহণ করায় ভাস্করের কোনো ত্রুটিবিচ্যুতির আশংকা গেল দূর হয়ে, ফলে তিনি এইসব হিসাব নিয়ে ইচ্ছামত সৃষ্টিপরীক্ষার অবকাশ পেলেন। এ-যেন আধুনিক যুগে ছেলের হাতে নানামাপের বিল্ডিং

ব্লক্‌স্ দিয়ে তার উদ্ভাবনীশক্তিকে মুক্তি দেয়ার মত। শরীরের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পরের সুস্পষ্ট হিসাব ও হারাহার যতক্ষণ ভাস্কর মেনে চলছেন ততক্ষণ তিনি মানবফিগরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যথেচ্ছ সোজা, লম্বা, মুড়ে, বেঁকে, দুমড়িয়ে, ঘুরিয়ে উপুড় করিয়ে দেখাতে পারার স্বাধীনতা পেলেন এবং নূতন নূতন ফর্ম সৃষ্টি করার অধিকার পেলেন।

ফ্রণ্টালিজ্‌মের হাত থেকে মুক্তির আস্বাদ ও উল্লাস প্রথম অজস্রভাবে প্রকাশ পায় গুপ্তযুগে, অজন্তায়, বাদামীতে, পরে ইলোরায়, এলিফাণ্টায়। এক ফিগরের উপরে আরেকফিগর বসিয়ে, পাশাপাশি রেখে নয়, স্পেস ও পারস্পেকটিভের প্রবর্তন হলো। যদিও মরাল হায়ারার্কি অনুযায়ী মানুষের ফিগর গাছের মাপের চেয়ে, এমন কি বাড়ির মাপের চেয়ে, তখনও বড় রইলো তবুও অজন্তায় পারস্পেকটিভহীনতা দূর হয়ে রোটেশন পারস্পেকটিভ এমনকি রিভার্সড্ পারস্পেকটিভ প্রতিষ্ঠিত হলো। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, নৈর্ব্যক্তিকতা, ঋজুতা, আড়ষ্টতা দূর হয়ে মুখে, শরীরে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, বিশেষ একটি অদ্বিতীয় মুহূর্তের ক্ষণস্থায়ী ভাব, যা পরমুহূর্তে বদলে যাবে, পুনরায় ধরা যাবে না। আদর্শমাপে গাঁথা শরীরের ভঙ্গীতে, চাহনিতে, এই আবেগময় অদ্বিতীয় মুহূর্তে, প্রাণস্পন্দন, নাটক ও কাব্য আনা যে কতখানি নৈপুণ্যসাপেক্ষ ও অসাধ্যসাধন কাজ, তা বোঝানো শক্ত। এ প্রায় বাইজানটিন মোজাইক রীতিতে জর্জোনের টেম্পেস্টা বা টিশানের সেক্রেড এ্যাণ্ড প্রোফেন লাভ আঁকার চেষ্টা করার মতই দুরূহ।

অজন্তায় ভারতীয় ভাস্কর আস্তে আস্তে একফিগরের উপর আরেক ফিগর সম্পূর্ণভাবে বসিয়ে দুটি বা ততোধিক ফিগরের মধ্যে স্বাভাবিক, চোখের দেখা জগতের সম্বন্ধ স্থাপন করেন, কিন্তু তবুও ফিগরের সর্বত্র সাবলীল, স্বাচ্ছন্দ গতি তখনও এলোনা। গুপ্তযুগে প্রায় সর্বত্রই ফ্রণ্টালিজ্‌মের বিধি অনুযায়ী কাজ হয়েছে। মুখের অবয়ব হয়ত সাবলীল হয়েছে, শরীরের দেহকাণ্ড হয়ত হয়েছে গতিমুখর, কিন্তু কোমর থেকে পা-পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গ তখনও অনেকক্ষেত্রেই ঋজু, আড়ষ্ট, কঠিন। এ বিষয়ে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও যুগসন্ধিসুলভ উদাহরণ এলিফাণ্টার ত্রিমূর্তি। ত্রিমূর্তির দেহ ঋজু, ধ্যানমগ্ন, অথচ মুখের সকল অবয়ব, পেশী নিশ্চলতার মধ্যেও অত্যন্ত সাবলীল, সম্পূর্ণভাবে দেখানোর জন্যে তিনটি মুখ আঁকা হয়েছে, তিনটি মুখ মিলিয়ে তবে একটি মুখ, ফ্রণ্টালিজ্‌ম্ আইনের বিচিত্র প্রকাশ।

মুখের আড়ষ্ট, নিশ্চলতা ঘুচিয়ে দেবার পর শরীরে ঋজুতা অপসারিত করা খুব শক্ত হলোনা। শিল্পশাস্ত্র অনুসারে, শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপের হারাহারি হিসাব পেয়ে ভারতীয় ভাস্কর তাঁর কাজে সেগুলি বিল্ডিং ব্লকের মতো নিয়োগ করলেন। এই সন্ধিক্ষণে বন্ধ-ভাস্কর্যের সমস্যা শিল্পীকে আশ্চর্যভাবে সাহায্য করলো এবং তাঁকে নতুন নতুন আঙ্গিক সমস্যা নিরাকরণের পথে এগিয়ে নিয়ে গেলো।

মানুষের দেহ যে চিত্রশিল্পী বা ভাস্করের পরম আরাধ্য বস্তু, এই দেহরচনা ও তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারেই তাঁর যত ব্যর্থতা এবং সিদ্ধি, এবিষয়ে আশাকরি দ্বিতীয় মতের স্থান নেই। মানুষের দেহে কি করে অসংখ্য আলোকবিন্দু ও প্লেনের সাহায্যে চরিত্র, বিচিত্রভাব, প্রাণ স্পন্দন, হিল্লোল, স্পর্শগ্রাহ্যতা, এক্স্ট্যাসি, গতি, ও অদ্বিতীয় মুহূর্ত সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়, প্রকৃতির সঙ্গে সার্থক সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় তাই হয় শিল্পীর একান্ত অভিষ্ট আরাধ্য। এবং এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্ত নরনারীর প্রেমের ও মিলনের মুহূর্ত ও ভঙ্গীটি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা, যার মধ্যে সম্পূর্ণ সততা থাকবে। সততার বিন্দুমাত্র অভাব থাকলে সে মিলনের প্রকাশ ব্যর্থ হতে বাধ্য। নরনারীর মিলনের মুহূর্তে তাদের দেহে যে এক্স্ট্যাসি, প্রেম, বিনয়, নম্রতা, উৎসর্গ, স্বার্থত্যাগ প্রকাশ পায় তা যদি শিল্পী যথার্থ সত্যতায় তাঁর সৃষ্টিতে ধরে রাখতে পারেন তবেই তাঁর পরম সার্থকতা হয়। এবং এই সত্যতা তখনই সম্ভব যখন শিল্পী তাঁর শিল্পগত আঙ্গিকগত যাবতীয় সমস্যার প্রকৃত নিরাকরণে সমর্থ হন।

বলা বাহুল্য এ-পথ বড় ক্ষুরধার পথ, কারণ নরনারীর মিলনের মুহূর্তে স্বর্গ ও নরকের পার্থক্য এক চুলেরও কম। কখন নরক উত্তীর্ণ হয়ে শিল্পী স্বর্গে পৌছবেন তা যতক্ষণ না তিনি নরক উত্তীর্ণ হচ্ছেন ততক্ষণ বলা যায় না। ইওরোপীয় শিল্পী কখনও এই পরীক্ষা সম্মুখসমরে গ্রহণ করেন নি। নগ্নদেহ এঁকে তিনি আনসাটে, পরোক্ষে ইঙ্গিতেই শেষ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় করেজ্জো থেকে রেমব্রান্ট পর্যন্ত 'ডানায়ে' চিত্ররাজির। এই চিত্রগুচ্ছে দুই দেহের মিলন উহ্য, শুধু একটি দেহের রূপায়ণেই সেই মিলন কল্পনা করে নিতে হবে। জুইশব্রাইডেও রেমব্রান্ট সামাজিক মূল্যেই মিলনের মুহূর্তকে ন্যস্ত করেন। ডেলাক্রোয়া আনেন নিষ্ঠুর ভয়ংকরতা। কিন্তু একান্ত এক্স্ট্যাসি আনেন একমাত্র ভারতীয়

ভাস্কর, চিত্রশিল্পীও নয়। বলা বাহুল্য এই একান্ত দুরূহ পথে ভারতীয় শিল্পী সর্বত্র সিদ্ধিলাভ করেন নি, কিন্তু এত সংখ্যক ক্ষেত্রে তিনি স্বর্গের সন্ধান দিতে পেরেছেন যা সত্যই বিস্ময়কর। এই দুরূপ বিপদসঙ্কুল পথে যদি তিনি শতকরা পাঁচটি ক্ষেত্রেও সিদ্ধিলাভ করে থাকতে পারেন তবে তা আশাতীত সাফল্য বলা যায়। হয়তো তিনি আর বাকী ৯৫টি ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা সম্পূর্ণ সফল হন নি। তবুও তাঁর চেষ্টা যে মূলত সার্থক তা কোণার্ক মন্দির দেখলেই বোঝা যায়। এবং কোণার্ক মন্দিরেই বোঝা যায় ভারতীয় শিল্পী ফ্রন্টালিজমের নিগড় থেকে ভারতীয় ভাস্কর্যকে কী আশ্চর্যভাবে মুক্তি দিয়েছেন।

কোণার্ক মন্দিরের ভাস্কর্য কিভাবে ফ্রন্টালিজমের নিশ্চলতা থেকে মুক্তি পেয়ে সাবলীল গতিতে অনন্ত চঞ্চল হয়েছে, ভাস্কর কিভাবে তাঁর আঙ্গিকগত সমস্যার মৌলিক সমাধান করেছেন, নানা বিচিত্র বন্ধ-ভাস্কর্যের সাহায্যে তাঁর নৈপুণ্য প্রমাণ করেছেন তার দু-একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্য কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে।

১৯৬০ সালে প্রকাশিত 'কামকলা' বইয়ে আমাদের আলোচনার পক্ষে উপযুক্ত কয়েকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ আছে। প্রথম উদাহরণস্বরূপ (১নং নক্সা) ধরা যাক ২২ পৃষ্ঠার সংলগ্ন ছোট মিথুন ছবিটি। এখানে পুরুষটির দেহ প্রায় ঈজিপশান রীতিতে খোদাই, মুখটি ঈষৎ একপাশ করা, উপরের দেহকাণ্ড সমুখ থেকে অল্প পাশ করে দেখানো, কিন্তু দুই পা পাশ করে খোদাই, যাতে পায়ের পাতার পুরো প্রোফিল পাওয়া যায়। নারীর মুখটি পুরো প্রোফিল, উপরের দেহকাণ্ড তিনভাগ সমুখ করে দেখানো, অথচ নাভি, কোমর ও উরুদেশ আবার সমুখ থেকে দেখা, এবং পা দুটি আবার প্রোফিল করে পাশ করে দেখানো। কম্পোজিশন হয়েছে পুরুষ ও স্ত্রীর মাথা দুটি নিয়ে দুটো মুখোমুখি ডিম্বাকৃতি ম্যাস। পুরুষের ডান বাহু ভাঁজ করে যে ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে সমতা রেখেছে নারীটির ভাঁজ-করা বাঁ হাত। নারীর প্রসারিত হাত পুরুষাঙ্গ ধরে থাকায় দুজনের মাথা এবং দেহকাণ্ড বেষ্টিত করে একটি বড় গোলাকৃতি ম্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। পুরুষাঙ্গ প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত দিকে বাঁকানো, যাতে বাঁকের রেখাটি তার নিজের ও নারীর উরুর রেখার সঙ্গে ছন্দ রাখে।

খাজুরাহে নানাবিধ বন্ধ-ভাস্কর্যের বহু জটিল কম্পোজিশন আছে যাতে

একেবারে সমুখ থেকে দেখা মূর্তির মধ্যে অদ্ভুত স্পন্দন, দ্যোতনা, আবেগ, টেন্‌শন ও সুষমা প্রকাশ পেয়েছে, যদিও বঙ্কভঙ্গী প্রায় বীভৎসই বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক খাজুরাহের বিশ্বনাথ মন্দিরের তন্ত্রবন্ধের বিচিত্র ভাস্কর্যের (২নং নক্সা)। এখানে মধ্যের পুরুষটিকে শীর্ষাসন করিয়ে মাথা নিচু করিয়ে একেবারে ফ্রণ্টাল অবস্থায় খোদাই হয়েছে, উপরদিকে সঙ্গমের বন্ধে এক নারী দর্শকের দিকে একেবারে পিছন করে, যদিও তার মুখ অল্প প্রোফিল করে ফেরানো। তার প্রসারিত দুই হাত দুই দিকে বেষ্টন করে আছে দুটি নারীর গলা। পুরুষের পাদুটি মধ্যের নারীকে বিচিত্র ভঙ্গিতে বেষ্টন করেছে। বাঁ পাশের নারীর ডান হাত মধ্যের বাঁ উরু ধরে আছে এবং ডান-পাশের নারীর বাঁ-হাত পুরুষের ডান-হাঁটু ধরে আছে। পুরুষের দুটি বাহু দুদিকে ছোট সমকোণ সৃষ্টি করে উপরদিকে উঠে গিয়ে গুপ্ত হয়েছে দু-পাশের দুই নারীর যোনিদেশে। দু-পাশের দুই নারীর প্রত্যেকের একটি করে পা মোড়া, এবং বাকি একটি করে পা সম্পূর্ণ প্রোফিল করে দেখানো। ফ্রণ্টালিজমকে ভেঙে নতুন করে গড়ার চূড়ান্ত। কম্পোজিশনটি যে কত জটিল তা লাইন দিয়ে নক্সা দেখালে স্পষ্ট হয়। আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে ভাস্কর্যটি প্রায় পূর্ণ রিলিফে, সুতরাং প্রতিটি সুডৌল ম্যাস অন্যান্য সমস্ত ম্যাসের প্রতিটির সঙ্গে আলাদা আলাদা এবং সমষ্টিগত সমতা ও সাম্যভাবে রেখেছে। ভঙ্গিগুলি যদিও রুচিবিরুদ্ধ তবু ভাস্কর্যটি সব মিলিয়ে ভাস্করের পক্ষে আঙ্গিকগত সমস্যার মৌলিক নিরাকরণের পক্ষে অপূর্ব। ৩ ও ৪ নং নক্সায় ভাঙা-ভাঙা রেখা দিয়ে কম্পোজিশনের মূল ভাগ ও আকারগুলি দেখানো হয়েছে। প্রতিটি নক্সায় দেখা যায় ত্রিভঙ্গভঙ্গী কিভাবে ফ্রণ্টালিজমের আড়ষ্টতা নষ্ট করে গতি আনে।

খাজুরাহে শিল্পী যেসব আঙ্গিকগত পরীক্ষা ও সমস্যার সমাধান করেছেন তার প্রতিটিকে অপূর্ব সুষমা ও শ্রী, স্পন্দন, উচ্ছল প্রাণবন্ততা, প্ল্যাষ্টিসিটি, বেগ ও গতি দিয়েছেন কোণার্কের ভাস্কর। কোণার্কের ভাস্কর্যের মানবিক একস্ট্যাসির তুলনা নেই। ফ্রণ্টালিজমকে ভাস্কর্যে রূপান্তরিত করে কোথায় যে নিয়ে গেছেন, তার প্রমাণ কোণার্কের স্থপতি নিজেই রেখে গেছেন। সারা মন্দিরের প্রতিটি পাথর গতিচঞ্চল, প্রাণস্পন্দনে উদ্দীপিত, অথচ তার মধ্যে একমাত্র নিশ্চল নিবাতনিষ্কম্প স্থাণুনৈর্ব্যক্তিক মূর্তি হচ্ছে সূর্যের, সবুজ মুগনি পাথরে খোদাই। ঐটুকু প্রমাণ এককোণে স্থপতি
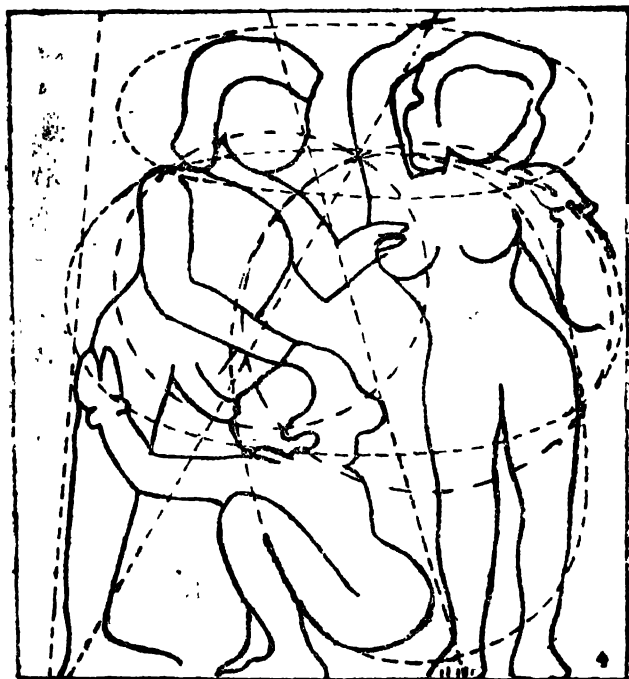
৪নং নক্সা

নিজেই রেখে নিজের অন্যান্য কীর্তি প্রমাণ করেছেন, যেখানে প্রতিটি কীটপতঙ্গ, লতাপাতা থেকে নরনারী প্রত্যেকে প্রাণের আবেগে, গতিতে হিল্লোলিত। এবং তা সম্ভব হয়েছে প্রতিটি ভাস্কর্যের কম্পোজিশনজনিত সার্থকতায়। অনেকে আপত্তি করেন এই বলে যে বন্ধমূর্তি না হয় দেখানো হল, কিন্তু পুরুষাঙ্গ বা যোনির স্ফুরিত খাঁজ দেখানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো বীভৎস বিকৃত রুচির ফল বলে মনে হয়, যতক্ষণ না চোখে পড়ে যে পুরুষাঙ্গের বক্রতা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বাঁকা, এবং তা করা হয়েছে কম্পোজিশন সম্পূর্ণ করার জন্যেই মুখ্যত এবং প্রায় প্রতি-ক্ষেত্রেই যোনিরেখা সমতা রেখেছে উপরের দিকে পুরুষের বাহুমূলের বা চিবুকের রেখার সঙ্গে (১, ৩ ও ৪ নং নক্সা)।

বন্ধ-শাস্ত্রের সুবিধাই হল বন্ধের কল্যাণে মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গের নানারকম সম্ভব-অসম্ভব সংস্থানের কল্পনা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নানা বিচিত্র কম্পোজিশন প্রবর্তিত করা সম্ভব হয়। তাদের মাধ্যমে শিল্পী,

বিশেষ করে ভাস্কর, ম্যাস, ভল্যুম এবং পারস্পরিক সম্বন্ধের নানা সমস্যা নিরাকরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত করতে পারেন। উপরন্তু তাঁর কর্তব্য হয় প্রতিটি রোমে রোমে হর্ষ, আনন্দ, তন্ময়তা, উল্লাস, একস্‌ট্যাসি ফুটিয়ে তোলা, তা না হলে বন্ধ ভাস্কর্য রসোত্তীর্ণ না হয়ে পর্নোগ্রাফিতে পর্যবসিত হতে বাধ্য। ফ্রন্টালিজমের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ভারতীয় ভাস্করের পক্ষে বন্ধ ভাস্কর্যকে উপেক্ষা করা নিশ্চয় বিশেষ শক্ত হয়, বিশেষত তিনি যখন ইতিমধ্যেই সৃষ্টির যাবতীয় প্রাণীর আনন্দময়, গতিশীল প্রতিচ্ছবি অজস্রভাবে সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। ১৯৬৫ সালে ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন কোম্পানির ছাপা ক্যালেণ্ডারটিতে সুনীল জানার তোলা বারটি চিত্র দেখলেই বোঝা যায়, কোণার্ক শিল্পী শাস্ত্রানুযায়ী দেহের হারাহার মাপ প্রয়োগ করেও কত অদ্ভুত অদ্বিতীয় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, পূর্ণদেহের মধ্যেও ফুটিয়েছেন নিতান্ত বালিকার কচিমুখ, অল্পবয়সী, পূর্ণযৌবনা, মধ্যবয়সী, পরিণত যৌবনার আত্মস্থ চিন্তামগ্ন মুখ সবই আশ্চর্যভাবে সম্ভব হয়েছে, যা পৃথিবীর অন্যত্র হয় নি। ভারতীয় ভাস্করের সমুখে দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তাঁর শিল্পগত কী সমস্যা ছিল তার আলোচনা করলে ভারতীয় ভাস্করের কাছে বদ্ধ-ভাস্কর্যের তাগিদ কিজন্য এসেছিল বোধহয় বোঝা যায়।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

ভারতীয় সংগীতের ভিত্তি কি আধ্যাত্মিক?

আমাদের দেশে একটি বৃহৎ গোষ্ঠী আছেন যাঁরা ভারতীয় সংগীতের মধ্যে অধ্যাত্মপ্রেরণা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পান না। দেশ-বিদেশে এ কথা খুব বড় করে প্রচার করা হয়েছে এবং হচ্ছে যে ভারতীয় সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য গানের সুরে ভগবানের আরাধনা। তাঁরা সহজেই সামবেদের কথা তোলেন, নাদব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন—সংগীতে আমাদের লক্ষ্য যে খুবই উঁচু সেকথা এইভাবে বোঝানো ছাড়া অন্য কোনও উপায় আছে বলে তাঁরা মনে করেন না।

আসলে নাদব্রহ্মের সঙ্গে সংগীতের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। সুতরাং এ তত্ত্ব সংগীতপ্রসঙ্গের বাইরেই রাখা যেতে পারে। সামগান সম্বন্ধে এ কথা বিশেষভাবে বলা যায় যে কেবলমাত্র গানের দিক থেকে উৎকৃষ্ট শ্লোকসমূহই গাতারা বেছে নিয়েছিলেন। আমরা যে-সামবেদ পাঠ করি তা গান নয়। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—এই সব চিহ্ন পাঠের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে—গানের জন্য নয়। এগুলি কেবলমাত্র যোনীমন্ত্র। এই মন্ত্রগুলিকে অবলম্বন করে সপ্তস্বরে, তালে লয়ে ব্যাপকভাবে গান প্রস্তুত হত এবং সেগুলি গাওয়া হত। সামবেদের মন্ত্রের মধ্যে আমরা কি কেবল আধ্যাত্মিক বস্তুই পাই? তা তো মনে হয় না। সামবেদের মন্ত্রগুলি আসলে প্রকৃতির বন্দনা। প্রকৃতি থেকে আমরা যে বিপুল শক্তি লাভ করেছি তাকে উদ্দেশ করে যেসব স্তোত্র রচিত হয়েছে সেগুলিই সামবেদে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। একমাত্র আধ্যাত্মিকতাই যদি উদ্দেশ্য হত তাহলে সোমরসের এত উচ্ছ্বাসপূর্ণ বন্দনা সামবেদের অন্তর্ভুক্ত হত না। উদাহরণস্বরূপ একটি সূক্তের একাংশ উদ্ধৃত করছি:

"হে আনন্দপ্রদানকারী সোম, তুমি দিব্য ইন্দ্রিয়ের ভোগের জন্য সর্বশক্তি নিয়ে ধারায় প্রবাহিত হও। হে অমৃতবিধানকারী সোম, তুমি আমার হৃদয়প্রকোষ্ঠে বিরাজিত হও। তোমার রসসঞ্চারী ক্রতুপ্রবাহমান

আনন্দরস প্রজ্ঞাশক্তিকে বলপ্রদান করে। দিব্য ইন্দ্রিয় দিব্যত্বপ্রাপ্তির জন্য সুখপ্রদায়ী আনন্দরসস্বরূপ তোমাকে পান করে। পবিত্রভাবে নিসৃত আনন্দদায়ক সোম তার প্রবাহে চারদিক থেকে ঐশ্বর্য বহন করছে। সেই আনন্দজনক রস জ্ঞান প্রদান করছে, কর্মশক্তি সঞ্চারিত করছে এবং পরিশেষে পরম সুখের প্রেরণাও প্রদান করছে।"

এই বন্দনাকে আদৌ আধ্যাত্মিক বলা যাবে না। সোমরসপানে পরমপ্রীত কবির মুখ থেকে এই সূক্ত উচ্চারিত হয়েছে এবং কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে একে সংগীতে পরিবর্তিত করা হয়েছে। অতএব এই অনুমানই সমীচীন যে, যে-মন্ত্রগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট lyric-এর পরিচয় গায়নশিল্পী বা সংগীতশিল্পীরা পেয়েছিলেন সেইগুলিকেই তাঁরা সংগীতে রূপান্তরিত করেছেন। তৎকালে বেদই ছিল উৎকৃষ্ট সাহিত্য এবং সেই থেকেই তাঁরা সংগীতের বস্তুকে আহরণ করেছিলেন। বৈদিক যুগেও সৌন্দর্যসৃষ্টিই ছিল সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমরা ঐতিহাসিক যুগে আসছি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মাধ্যমে। ভরত তাঁর পূর্বযুগে অর্থাৎ বৈদিকোত্তর খৃষ্টপূর্বযুগের দশরকম গীতের উল্লেখ করেছেন, এর মধ্যে তিন প্রকার গীত সামগীতিকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল। এই গীতগুলি হচ্ছে ঋক্, গাথা এবং পাণিকা। এতদ্ব্যতীত শার্ঙ্গদেব বিরচিত সংগীতরত্নাকর থেকে আমরা জানতে পারি অপর একশ্রেণীর গীত ছিল যার আখ্যাই ছিল সামগীতি। ঋক পর্যায়ের গীতে আমরা দেখতে পাই একটি ঋককে অবলম্বন করে অথবা তার ভাব নিয়ে তৎকাল প্রচলিত ছন্দে গান রচনা করা হয়েছে। অষ্টাক্ষর থেকে দ্বাদশাক্ষর ছন্দে এই সব গীত রচিত হত। এই সব গানে ওঙ্কার, হ-কার প্রভৃতি স্তোভাক্ষর উচ্চারণ করা হত। ভরত তাঁর পূর্বযুগ থেকে প্রচলিত সাতপ্রকার গীতের উল্লেখ করেছেন। এই গীতগুলি হচ্ছে—মদ্রক, অপরান্তক, উল্লোপ্যক, প্রকরী, ওবেণক, রোবিন্দক এবং উত্তর। এছাড়া আরো দুটি বৃহৎ গীতগোষ্ঠী ছিল, বর্ধমানক এবং আসারিত। উক্ত ঋক, গাথা, পাণিকা এবং সাম গীতিগুলিতে এই সপ্তগীতের বহু অংশ যোজনা করে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছিল। ভরতের যুগের পরেও সামগীতি শোনা যেত, তাতে সামের সপ্ত অঙ্গ যথা—প্রস্তার, উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব, নিধন, হিঙ্কার এবং ওঙ্কার—এইগুলিকে প্রবন্ধ সংগীতের কলির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই কলিগুলি হচ্ছে—উদ্গ্রাহ, অনুদ্গ্রাহ সম্বন্ধ, ধ্রুবক এবং আভোগ, হিঙ্কার এবং ওঙ্কার কেবল

কলাপূরক হিসাবেই গণ্য হত। এতে প্রমাণিত হচ্ছে বৈদিক মন্ত্রগুলি শেষপর্যন্ত লৌকিক গীতের পর্যায়ে এসে পড়েছিল। আধ্যাত্মিকতাই যদি সংগীতে মূলমন্ত্র হত তাহলে বেদমন্ত্রকে কাব্যসংগীতে পরিবর্তিত করবার চেষ্টা হত না।

আমরা যে রাগসংগীত শুনে থাকি তার উৎপত্তি হল নাটক থেকে। নাটক পৌরাণিক বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে বটে কিন্তু নাটক যে একটি আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা এটা নিশ্চয়ই কেউ দাবী করেন না। নাটক চিত্ত-বিনোদনের জন্যই রচিত হয়েছে। প্রথমদিকে নাটকের সঙ্গে সংগীত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। নাটকের বিভিন্ন ভাব, রস, পরিস্থিতি নির্দেশ করবার জন্য সংলাপই যথেষ্ট ছিল না, সংগীতেরও প্রয়োজন ছিল। নানা ছন্দে ছোট ছোট গীত অবকাশ অনুযায়ী নাটকে সংযোজিত হত। এই গীতকে বলা হত ধ্রুবা। পূর্বে যেসব গানের উল্লেখ করেছি এই সব গানের অংশবিশেষ খুব সংক্ষেপে ধ্রুবা হিসাবে গাওয়া হত। ধ্রুবা নইলে নাটক সম্ভব হত না। পরে অবশ্য ধ্রুবার ব্যবহার লুপ্ত হয়েছিল কিন্তু নাটকের যথেষ্ট উন্নতি হবার পরেই ধ্রুবার প্রচলন রহিত হয়েছিল। আসলে এই ধ্রুবা প্রভৃতি গীতগুলিই ছিল মার্গসংগীত। মার্গসংগীত নিয়েও আমাদের দেশে কষ্টকল্পনার বিরাম নেই এবং অনেকের কাছে জিজ্ঞাসা করলে এর সদুত্তরও পাওয়া যায় না কিন্তু সংগীতশাস্ত্রগুলিতে একবাক্যে বলা হয়েছে যে ভরতমুনি ব্রহ্মার সামনে যে সংগীত প্রয়োগ করে দেখিয়েছিলেন তাই হচ্ছে মার্গসংগীত। ব্রহ্মার সামনে ভরতমুনি নাটক প্রদর্শন করেছিলেন এবং এই নাটকে প্রযুক্ত সংগীতই হচ্ছে মার্গসংগীত। ভরত স্বয়ং তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাট্যসংগীত এবং যে-সংগীত থেকে নাট্যসংগীত রচিত হচ্ছে সেই সংগীতের আলোচনা করেছেন। নাট্যশাস্ত্র বোধকরি আমাদের দেশে সংগীতমহলে ভালোভাবে অধীত হয় নি। যদি নাট্যশাস্ত্র আমাদের সংগীতজ্ঞগণ ভালো-ভাবে আয়ত্ত করতেন তাহলে নানারকম ভাসা-ভাসা মত প্রকাশ করে পাঠকদের তাঁরা বিভ্রান্ত করতেন না।

রাগশব্দের অর্থ বোঝাতে গিয়ে শাস্ত্রকারগণ বলেছেন: "রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ"। যা রঞ্জন করে তাই রাগ। আসলে এই রঞ্জন ছিল নাট্যসংগীতের মাধ্যমে দর্শকদের মনোরঞ্জন। প্রাচীন গ্রামরাগগুলি নাটকের কোথায় প্রযুক্ত হত শাস্ত্রে তারও উল্লেখ আছে। রাগসংগীত নাটকে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরই আসরে ব্যবহৃত হবার যোগ্যতা লাভ করে। আসরে প্রযুক্ত রাগসংগীতের

বিবর্তন পরবর্তীকালে স্বাভাবিকভাবে হয়ে এসেছে। এ-ক্ষেত্রেও প্রমাণিত হচ্ছে রাগসংগীত আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে রচিত হয় নি।

রাগরাগিণীর যেসব চিত্র মোগলযুগে আঁকা হয়েছিল সেগুলিকে নিয়েও অনুমান এবং ইচ্ছাপ্রণোদিত মতবাদের স্বল্পতা নেই। এ কথা জোর দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে যে এই চিত্রপরিকল্পিত মূর্তিগুলিই হচ্ছে রাগের ধ্যানমূর্তি। পৌত্তলিকতায় একান্ত বিশ্বাসী এই দেশে এই মতবাদ স্বীকৃত হতে একটুও দেরী হয় নি। অনেক ওস্তাদ আছেন যাঁরা একান্তভাবে বিশ্বাস করেন এইগুলিই হচ্ছে রাগরাগিণীর যথার্থ প্রতিমূর্তি এবং যাঁরা রাগসিদ্ধ তাঁরা এইসব মূর্তির সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করেন। কিন্তু এই সামান্য কথাটা তাঁরা চিন্তা করে দেখেন না যে রাগসংগীত একই আদর্শে একটি চিত্রকে স্মরণ রেখেই আচরণ করা যায় না, নানা ভাবে নানা বৈচিত্র্যে রাগসংগীত রূপায়িত হয়। এক ভৈরবীই কতজনে কতভাবে গেয়ে থাকেন। যেদিন একই রূপের দিকে লক্ষ রেখে একটি রাগের একইরকম রূপায়ণ ঘটবে সেদিন হবে আমাদের রাগসংগীতের একান্ত দুর্দিন। এ হয় না, হতে পারে না এবং হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। রাগমালা একান্তভাবেই চিত্রকরের পরিকল্পনা—চিত্রকরের দৃষ্টি দিয়েই তাকে দেখা উচিত ছিল। সংগীতের ক্ষেত্রে এই চিত্ররূপকে আবশ্যিকভাবে খাড়া করলে চিন্তাশক্তির দৈন্য ছাড়া আর কিছুই প্রকট হয় না।

ধ্রুপদের ক্ষেত্রেও এটা সাধারণ বিশ্বাস যে ধ্রুপদ মূলত ধর্মসংগীত এবং আধ্যাত্মিক আবেদনের জন্যই এই সংগীত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। অথচ, মধ্যযুগের তাবৎ গ্রন্থেই পাওয়া যায় যে ধ্রুপদে প্রেমসংগীত রচিত হত। অনেকে ধ্রুপদের আলাপকে প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ রূপ বলে নির্দেশ করেন। কিন্তু, আলাপ কেবলমাত্র রাগের ধ্বনিময় রূপকে পরিকল্পনা করবার জন্যই আচরিত হয়ে এসেছে।

সংগীত সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে যেরকম ইচ্ছা সেরকম ধারণা পোষণ করবার অধিকার সকলেরই আছে কিন্তু সেটা পরকে বিশ্বাস করাবার প্রচেষ্টা সংগত নয়। নিরপেক্ষভাবে আমাদের সংগীতের ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে দেখা যাবে সৌন্দর্যসাধনই হচ্ছে ভারতীয় সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অপরাপর আর্ট যেমনভাবে বিকশিত হয়েছে সংগীতও স্বক্ষেত্রে সেইভাবে বিকশিত হয়েছে। সংগীতের বিবর্তন সামাজিক নিয়মেই সংঘটিত হয়েছে। আধ্যাত্মিকতাবাপন্ন

ব্যক্তিগণ এদেশে যেমন সংগীত রচনা করেছেন অপর দেশেও তেমনি করেছেন। অথচ কোনো পাশ্চাত্ত্য সংগীতজ্ঞ এ কথা বলেন না যে পাশ্চাত্ত্য সংগীত মূলতঃ আধ্যাত্মিক। আমাদের দেশের লোকেরা আধ্যাত্মিক বলতে সমধিক গৌরব বোধ করেন যদিচ এই শব্দে তাঁরা যে কী বোঝেন তা বোধকরি জিজ্ঞাসা করলে বোঝাতে পারবেন না। সংগীতের মূল উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। এই রসসৃষ্টির জন্য একটি উপযুক্ত বস্তুর মাধ্যম দরকার। এ অনুভূতিদ্বারা স্পর্শযোগ্য বস্তুর জন্যই বৈদিক সংগীতকে কাব্যরূপ দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। সংগীত যখন প্রগাঢ় রসে পরিপুষ্ট হয়েছে তখন তার থেকে আনন্দ বিচ্ছুরিত হয়েছে। এই আনন্দই হল শেষ কথা। কিন্তু এই আনন্দে পৌঁছবার জন্য যে নিরেট বস্তুটি যুগে যুগে পরিকল্পিত এবং পরিবর্তিত হয়েছে তার প্রতিটি স্তরের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা আছে, বিবর্তনের ইতিহাস আছে, সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব আছে। কেবল আধ্যাত্মিক বলে যাঁরা বক্তব্য শেষ করেন তাঁরা পলায়নপর মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদান করেন, ইতিহাসের সংগঠনের কিছুমাত্র সাহায্য করেন না।

সুচিত্রা মিত্র

ছন্দের অন্তরালে

কথা ও সুর যেখানে একাত্ম হয়ে আমাদের আনন্দ ও বেদনাকে রূপ দিয়েছে, মূর্ত করেছে—সেখানেই রবীন্দ্রনাথের গান। আজ এ কথা স্বতঃসিদ্ধ, কথা ও সুরের এই পরমরমণীয় বিবাহ একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যেই সম্ভব হয়েছে, কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের গানে তালের ব্যবহার কী বিচিত্র ও ভাবানুসারী—তার পর্যালোচনা বাকি রয়ে গেছে। কথা ও সুরের বর্ণাঢ্য সম্মিলনে যে-চিত্র রচিত হয়েছে, তাল সেখানে ভারসাম্য রক্ষা করেছে; এমনকি কখনো কখনো, বিশেষত নাট্যগীতিতে, সুরের চেয়েও তালের ব্যবহার গানের ভাবকে অনেক বেশি মূর্ত করেছে। সংগীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিতে তাল বা লয়কে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর গানকে কোনো কোনো ওস্তাদ কাব্যগীতি বলে থাকেন; তাতে দোষাবহ কিছু দেখি না। রবীন্দ্রনাথের গানের মাঝখানে আসন জুড়ে বসেছে কথা, কিন্তু তার একদিকে সুর আরেকদিকে তাল—একই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও দূরবর্তী—প্রয়োজনমতো ভাবনাকে ছড়িয়ে দেবার জন্য নিজেদের ভূমিকাটুকু পালন করে চলেছে; তারা অতিরিক্ত নয়। অবান্তরও নয়।

অর্থাৎ আমি বলতে চাই, গানের উপর তালের অতিমাত্রায় প্রাধান্য রবীন্দ্রনাথের গানে অত্যন্ত কম। একটি উদাহরণ মনে পড়ছে, 'বহুযুগের ওপার হতে' গানের সঞ্চারী অংশে রয়েছে 'সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবা নদীর তীরে'—এখানে 'রেবা' এই শব্দটি তালের প্রয়োজনে সামান্য খণ্ডিত হয়েছে, তাতে হয়তো ভাবগাম্ভীর্য যথেষ্ট থাকে নি। কিন্তু এর বিপরীত উদাহরণ প্রচুর। যেমন, 'ওযে মানে না মানা, আঁখি ফিরাইলে বলে—না—না—না' এই গানটিতে তিনবার 'না' উচ্চারণকে তাল সুন্দরভাবে জোরদার করেছে। লোকগীতি ঢঙের গানগুলিতে ছন্দ লোকগীতির ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে দ্রুত তাল বা লয় চালিয়ে, যেমন, 'হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়' গানটিতে 'কেন এমন হল গো আমার এই নবযৌবনে' এমন গভীর কথাও

দ্রুত তালের ব্যবহারে দ্রুত লয়ে উচ্চারিত হয়েছে—যেজন্য তার স্পর্শ অথ ত্বরিতগতিতে আমরা পাই না হয়তো, কিন্তু সমস্ত গানটির মধ্যে এমন এব আনসফিস্টিকেটেড, সহজ সরল স্পষ্ট উচ্চারণ রয়েছে যেখানে লোকগীতির তাল ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় মনে হয় না। যেমন লোকগীতির তাল তার বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তেমনি কখনো রাগের বা ঢঙের অনুবর্তী হয়ে তাল এসেছে রবীন্দ্রনাথের গানে। যেমন, 'আমার যেদিন ভেসে গেছে চোখের জলে' গানটির এক অংশে রয়েছে 'আজি পুবের হাওয়ায় হাওয়ায় হায় হায় রে কাঁপন ভেসে চলে'; এখানে 'হাওয়ায় হাওয়ায় হায় হায় রে' শব্দগুলিতে ভোরের করুণ রাগের অনুষঙ্গে তালও তার যথাযথ জায়গা করে নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যগীতিতে তালের ও লয়ের বিচিত্র ব্যবহার নাট্যরসকে গভীরতর করেছে। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় বাল্মীকির যে-দ্বন্দ্ব, সেখানে তাল ও লয়ের পরিচ্ছন্নতা প্রয়োগ তাকে যথার্থভাবে প্রকাশ করেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার সবচেয়ে প্রিয় নাট্যগীতি হল 'চণ্ডালিকা'। এই 'চণ্ডালিকা' গীতিনাট্যে প্রকৃতির প্রথম গান মনে পড়ছে: 'যে আমারে পাঠালো' এই অংশটিতে লয়ের বিচিত্র প্রয়োগ একই সঙ্গে প্রকৃতির জন্মের বিড়ম্বনা আর সেই বিড়ম্বনাকে অস্বীকার করবার বিদ্রোহ, তার বাঁচবার আগ্রহকে আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। সমস্ত গীতিনাট্যটিতেই প্রকৃতির চারিত্রিক দ্বন্দ্ব তালের বিবিধ প্রয়োগে সম্পূর্ণতা পেয়েছে, যেমন, প্রকৃতি তার মায়ের কাছে, মনে করা যাক, যেখানে আনন্দর আবির্ভাব বর্ণনা করেছে, সেখানে সে চকিতে বলে উঠেছে 'এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম, নতুন জন্ম আমার।' তারপর সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিয়েছে প্রকৃতি, তার স্মৃতিচারণ গভীর মর্মস্পর্শী, সে-সঙ্গে গানের তাল পরিবর্তন হল—বৌদ্ধ ভিক্ষু যখন বললেন 'জল দাও'—প্রকৃতির সেই স্মৃতিবাহী মনে আবার নিজেকে উপলব্ধির আশ্চর্য অভিজ্ঞতা গানের তালও বদল করে দিল; তেওড়া ও কাহারবা তালের সুনিপুণ প্রয়োগ এখানে নাট্যমুহূর্তের জন্ম দিয়েছে। এই 'চণ্ডালিকা'তেই যেখানে আনন্দকে মায়াবলে ছায়া-অভিনয়ে ধরা হয়েছে সেখানটা মনে করা যাক। বিস্মিতা মা বলছেন: 'ওরে পাষাণী, কী নিষ্ঠুর মন তোর', উন্মত্তা কন্যাকে মার এই তিরস্কার একমাত্র যেন ঝাঁপতালেই ঠিক ফুটে ওঠে, আর, প্রকৃতির উত্তর 'ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই

ঝরা, তার নাই ভয়, নাই লজ্জা' এক আন্তরিক অথচ নির্মম সত্যকে ব্যক্ত করেছে, তাই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন লয়ে এই সংলাপকে কাহারবা-তে বেঁধে দিলেন। এরকমভাবে দেখানো যায়, প্রকৃতি ও তার মা-র কথোপকথনে যে চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়, যার মধ্য দিয়ে নাটকের গতি অনেক বিক্ষুব্ধ উত্তাল সংঘাতের পর এক শুভ স্থির পরিণতিতে পৌঁছেছে—সেখানে সুরের চেয়েও বাণীকে সহায়তা করেছে তাল।

'চিত্রাঙ্গদা' গীতিনাট্যের প্রথমাংশে তালবৈচিত্র্য নেই; সেখানে 'পুরুষের বিদ্যা'য় দীক্ষিত চিত্রাঙ্গদা, অর্জুন, গ্রামবাসীদের সম্মেলক সংগীত সমস্ত প্রায় একই তালে রচিত। কিন্তু, অর্জুনকে দেখবার পর চিত্রাঙ্গদার নারীসত্তার উন্মোচন ঘটল, তার সঙ্গে সখীদের সম্মিলিত ব্যঙ্গ ও বিস্ময়ের পাশাপাশি প্রকাশে তালেরও হেরফের ঘটেছে; চিত্রাঙ্গদার গান 'রোদনভরা এ বসন্ত' আর সখীদের 'তোমারি বৈশাখে ছিল'—এ-দুটি গানের বিকল্প অবস্থানে আর কাহার্‌বা ও সাত মাত্রার ছন্দের তেওড়া তালের সংমিশ্রণে নাটকের ভাবচূড়া (climax)-র সূচনা হল। কিংবা, 'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি' চিত্রাঙ্গদার এই গানে বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ের সার্থক ব্যবহার ঘটেছে। তবু এখানে এখন তুলনার ইচ্ছে হয়: 'চিত্রাঙ্গদা'য় বাণী ও সুরের সফল সংমিশ্রণ ঘটেছে, কিন্তু, তাল ও লয়ের বিচিত্র ও সার্থক ব্যবহারে 'চণ্ডালিকা' অনেক বেশি নাট্যগুণান্বিত।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার একটি গান 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা' মনে পড়ছে; এখানে প্রতি দুটো পংক্তি অন্তর অতীতচারী ভাবনার আর বর্তমানের মিলনোল্লাস যথাক্রমে লিপিবদ্ধ রয়েছে, রবীন্দ্রনাথ এই ভাবনা ও উল্লাসের প্রকাশ দেখাতে গিয়ে ঢিমে ও দ্রুত লয়ের আশ্রয় নিয়েছেন—সেজন্য গানটি শ্রবণমাত্রই তার চিত্ররূপ আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়। একই গানে দু-রকম তাল ও লয়ের ব্যবহার মেজাজের বা পরিবেশের ভিন্নতা কেমন রচনা করে, তার উজ্জ্বল উদাহরণ: 'আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে'। কাহার্‌বা তালে গঠিত গানটিতে বৃষ্টির ঝরঝর শব্দকে শুধু ধরা হয়েছে তাই নয়, 'উদ্‌ভ্রান্ত মেঘে'র ডাকে এই দ্রুত লয়ের গানের সঙ্গে আমাদের মনও 'বলাকার পথখানি চিনে নিতে' ছুটে যায়; আবার ষষ্ঠী তালে যখন এই গানটি গাওয়া হয়, তখন ঘরে বসে 'উদাসী মেঘ'কে যেন উপভোগ করতেই ভালো লাগে, মন হয়তো সেখানে সত্যিই শুধু 'চায়'—

যাবার তাড়া নেই, হয়তো বৃষ্টি থেমে গেছে, হয়তো ক্ষীণ হয়ে এসেছে ধারাপতনের শব্দ—সমস্ত দিকে মেঘমল্লারের বিষণ্ণতা, তখন একমাত্র এই ষষ্ঠী তালই আমাদের ভাবনাকে রূপ দিতে পারে মনে হয়। প্রেম পর্যায়ের একটি গান ধরা যাক: 'হে নিরুপমা'। এখানে গীতিকার চপলতার জন্য প্রতিটি স্তবকের প্রথমেই ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন, সে-চপলতার বৈচিত্র্য দেখাবার জন্যই বিভিন্ন তালও ব্যবহৃত হয়েছে এক-একটি স্তবকে: কাহারবা, দাদরা, তেওড়া। কিন্তু শেষ স্তবকে প্রার্থনার ঘনীভূত অংশে গভীরতাকে আনবার জন্যই তাল-ছাড়া রূপ দেওয়া হল; তালের বিচিত্র প্রয়োগের পরই ভাবগাম্ভীর্যের অনুরোধে তালকে অতিক্রম করা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। বর্ষারই আরেকটি গান: 'নিশীথরাতের বাদলধারা' দু-রকম তালে গাইবার প্রচলন আছে। কিন্তু, কাহারবা তালে রচিত গানটি, আমার ব্যক্তিগত মতে, রমণীয় লাগে; দাদরা তালের এই গানটিতে নিশীথরাতের বাদলধারাকে, যে 'স্বপ্নলোকে দিশাহারা' এসো হে গোপনে সেরকম আর্তি যেন জানানো যায় না। 'নৃত্যের তালে তালে' গানটিতে প্রতিটি স্তবকের তালফেরতা বা কাহারবা, ষষ্ঠী, ঝাঁপতালের যথাযথ ব্যবহার নটরাজের নৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গীকে চিত্রায়িত করেছে—সে-সঙ্গে প্রতিটি স্তবকের শেষে 'নমো নমো নমো' এই অংশতে দাদরার ঢিমে লয়ের প্রয়োগে নিবেদনের বিনম্র গাম্ভীর্য এসেছে।

গানের লয় তার প্রাণসত্তা, বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের গানে। শান্তিনিকেতনের বাইরে অনেকের দেখি লয় দ্রুত করে গাইবার অভ্যাস রয়েছে। আমার মনে হয়, সেজন্যই রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কী অনেকের কণ্ঠে ধরা দিতে পারে না। 'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি' এই গানে যুক্তাক্ষরের বাহুল্যই ধীর লয়ে গাইতে বলে, তাহলে প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে গানটির যথার্থ গাম্ভীর্য রক্ষা পায় 'শ্যামল ছায়া নাইবা গেলে' গানটি শুনেছি দ্রুত লয়ে গাইতে, আমার মনে হয়েছে এই গানের প্রাণ যে পরম আকুলতায় 'না, না, নাই বা গেলে'—তাকে সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া হল।

শেষে আরেকটি ব্যাপারে আমার অভিমত জানাই। অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তবলা বেমানান। আমি জানি, রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদের, বিশেষত, ব্রহ্মসংগীতের আবহাওয়ায় মানুষ—তাই হয়তো তাঁর কাছে পাখোয়াজ যথেষ্ট আদৃত ছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ গানের অনুষঙ্গ হিসেবে

পাখোয়াজই একমাত্র গ্রাহ্য, নইলে চৌতাল বা সুরফাক্তা, বিশেষত, ধামারের চরিত্র ফুটে উঠবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান আঙ্গিক-প্রকরণেও বিচিত্র ও বিরাট; তাই আমার মনে হয়, খেয়ালধর্মী গানের সঙ্গে তবলার ব্যবহার অনায়াসে চলতে পারে। এমনকি আমার মতে, যেসব গান খেয়ালাঙ্গও নয়, যেমন 'কেন যে মন ভোলে' বা 'তুমি তো সেই যাবেই চলে'—এসব গানের সঙ্গে তবলার অনুষঙ্গই প্রশস্ত। আবার রবীন্দ্রনাথের লোকগীতিধর্মী গান, যেমন কীর্তন বা বাউল, এসব গানের সঙ্গে মৃদঙ্গ বা খোল একমাত্র গ্রহণীয়। সমস্ত গানের সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত একমাত্র পাখোয়াজ বা একমাত্র মৃদঙ্গ বা একমাত্র তবলা চলে না। এখানে রবীন্দ্রনাথের গানের রূপকারের শিক্ষা, অনুশীলন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিণতির অপেক্ষা রাখে।

রঞ্জন রুদ্র

বিষয়বস্তুর সংকট

আমাদের দেশের শিল্পকলার অবস্থা ভয়াবহ।

কেউ চেষ্টা করছেন হিন্দুশাস্ত্র থেকে বিষয়বস্তু বার করতে। তাঁর মতে হিন্দুধর্ম ও দর্শন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। শিল্পে তারই ব্যঞ্জনা থাকবে। কিন্তু আজকের দিনের ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে তাঁর কাজের কোনও যোগাযোগ ঘটল কিনা সন্দেহ। আঁকার ধরন, ব্রাসের টান, রঙ-মাধুর্য, কম্পোজিশন ইত্যাদি হয়তো কিছুসংখ্যক শিল্পরসিক ও সমালোচকদের মনে রসসঞ্চার করতে পেরেছে—কিন্তু হিন্দু দর্শন বা ধর্ম সম্ভূত যে সম্যক উপলব্ধি শিল্পীর তা কতদূর প্রসারলাভ করল বিচার করা প্রয়োজন। শিল্প যদি আত্মিক যোগাযোগের মাধ্যম হয় আর সেই মাধ্যম যদি দর্শকের মনে শিল্পীর বক্তব্যকে পৌঁছে না দিতে পারল, তবে সে সৃষ্টি নিষ্ফল।

কেউ আবার যৌনতাকে তার শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু করে নিলেন। কিন্তু যৌনতা অর্থে শুধু লিঙ্গ এবং যোনি হয় না। অথচ যৌনতার গভীরতা, জটিলতা, তার দৈহিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা তাঁর কাজে দেখা না দিয়ে দেখা দিল শুধু লিঙ্গ-যোনি যোনি-লিঙ্গের এমন কায়দার ডিজাইন যে কি আঁকা হয়েছে বোঝা যাবে না।

শুধু জ্যামিতিক সমস্যা নিয়ে লেগে পড়লেন আর-একজন; কিছু একটা নতুন করতে হবে এইটাই পেয়ে বসল তাঁকে। সুতরাং তিনি পারস্পেক্টিভের উল্টো করে ছবি আঁকতে শুরু করলেন, কিন্তু সেই জ্যামিতিক লড়াই করতে গিয়ে দিশাহারা হলেন।

আবার কেউবা ক্লাউন অথবা ঘোড়া নিয়ে এঁকে চললেন। কলকাতা শহরে বসে আমরা ঘোড়াগাড়ির ঘোড়াই দেখি, সার্কাসের ক্লাউনও ভারতীয় জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে নি যেমন করে হয়েছে ইউরোপে। অথচ জোর করে কতগুলি symbol-কে তাঁর ছবিতে তিনি আনলেন।

এই হারিয়ে যাওয়া কেন? চারদিকের পূতিগন্ধে ভরা গলিতে সমাজ

তার জন্যে দায়ী। তাতে শিল্পীরা যে হারিয়ে যাবে সেটা কিছু আশ্চর্যের নয়। আমাদের সমাজ হাজার হীনমন্যতায় নিমগ্ন হয়ে আশাহীন দিশাহারাভাবে অশুভ পথে গড়িয়ে চলেছে। এই অবক্ষয়ের বলয়ের মধ্যে শিল্পীরা কোনও পথের নির্দেশ পাচ্ছেন না। সামনে তাকাবার সাহস কারও নেই—কারণ সামনে রয়েছে কালো মেঘ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপে আমরা মানুষকে ভালোবাসার বদলে গভীরভাবে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করতে শিখেছি। স্বার্থের লোভে প্রেম বিকিয়ে দিয়েছি অনেকদিন আগে। ফলে শিল্পীও জীবনের সত্যকে ভুলেছে। আমরা সামগ্রিকভাবে নিঃশেষিত হয়ে পড়ছি এবং সেইটাই ট্রাজেডি—শিল্পীর পথ হারানো সেই কারণেই।

এই পথহারা অবস্থায়ও শুধু বড় মনের শিল্পীরা তাঁদের আত্মিক সততা বজায় রাখতে পারেন। কিন্তু শিল্পীগোষ্ঠীর স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। আমাদের সমাজে লোক ঠকিয়ে তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়ার যে-মনোবৃত্তি সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে সেই মনোভাব তাদের গ্রাস করতে বসেছে। ছবির মধ্যে দেখা যায় উপরচালাকি আর অগভীরতা, রঙ লাইন নিয়ে মন ভোলানোর চেষ্টা।

সাধু এবং অসাধু দুই গোত্রের কাজেই আমাদের সমাজের, আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণার ছাপ পড়ছে না। সমাজের সিস্‌মোগ্রাফ হিসেবে শিল্পীর যে-ভূমিকা সে ভূমিকাপালনে তাঁরা অক্ষম। সমাজে মজুর হিসেবে যে-ভূমিকা তাতে আমাদের সমাজের insecurity-র superficiality-গুলোই প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

বর্তমানে কলকাতার বাজারে বেশ তর্কাতর্কি দলাদলি চলছে কে সত্যিকারের পথে চলছে তাই নিয়ে। একদল "ভারতীয় শিল্প" চর্চা করছেন এবং সবাইকে করতে বলছেন। কিন্তু ভারতীয় শিল্প বলতে কি বোঝায় সেই সংজ্ঞাটা তাঁদের মনে মোটেই পরিষ্কার নেই। কথা বলে বুঝলাম প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিটিই একমাত্র ভারতীয় পদ্ধতি এবং তারপর অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল পর্যন্ত আসা চলে। কিন্তু তা বাদে অন্য কোনও রূপ গ্রহণযোগ্য নয়। রাজপুত কাংগড়া প্রভৃতি শিল্পরীতি যে অন্য যুগে অন্য সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছিল সে-সত্যটি এঁদের মনে স্থান পায় নি। এবং তাঁদের কাজ দেখে বোঝা যায় যে সেই "ভারতীয় শিল্প"কেও তাঁরা মোটেই ভালো করে বুঝতে বা হজম করতে পারেন নি। তাঁদের কাজ তাই ভাবালুতায় ভিজে স্যাঁৎস্যাতে,

মিঠে মিঠে, কিন্তু প্রাণপ্রাচুর্যে অদুদ্বেলিত। এবং আজকের যুগের সামাজিক ও মানবিক সত্যের সঙ্গে তার কোনও রকম যোগাযোগ নেই।

আরেক দল বলছেন বাস্তবধর্মিতাই একমাত্র পথ। বাস্তবধর্মিতা কি প্রশ্ন করতে বুঝলাম এঁরা প্রকৃতির হুবহু অনুকরণকেই বাস্তবধর্মিতার চূড়ান্ত প্রকাশ বলে মনে করেন। এঁরা রব তুলেছেন যে আমাদের দেশের আধুনিকপন্থী শিল্পীদের একঘরে করা হোক—কারণ তাঁরা ধাপ্পা দিয়ে জনসাধারণকে ঠকাচ্ছেন। জলপ্রপাতের আওয়াজটাকে কোনও যন্ত্রে ধরে নিয়ে আবার শুনলে যেমন সংগীত শোনা হয় না, তেমনি সামনে যা দেখছি তাকে নির্বিচারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আঁকতে পারাটাই শিল্পসৃষ্টি নয়, এ-কথাটা আমাদের এই গোত্রের শিল্পীরা বোঝেন নি। পিয়ানোর চাবিগুলোর উপর বসে পড়লেই একটা শব্দসৃষ্টি হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু সোনাটা তৈরি হয় না। এঁরাও ধাপ্পা দিয়ে জনসাধারণের পকেট মারবার চেষ্টা করছেন, কারণ হুবহু প্রতিকৃতি দেখে সাধারণ দর্শকের মনকে এতটা ভুলিয়ে দেওয়া যায় যে শিল্পীর কাজ রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা সেটা বিচার করবার ক্ষমতা তার থাকে না। "বাঃ কী সুন্দর মুখ ঐ মেয়েটার" বা "ইস! ফুলটাকে যেন তুলে নেওয়া যায়"—এই ধরনের উক্তি দিয়েই তার সৌন্দর্যবিচার সমাপ্ত হয়। ভালো ফোটোগ্রাফারও সেই একই কাজটা করতে পারত! বাস্তবধর্মী শিল্পচেতনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ রেম্ব্রাণ্ডের কাজের মাহাত্ম্য কোথায় সেটা তাঁরা দেখতে শেখেন নি—তাই প্রকৃতির নকলনবিশি করা, আজে-বাজে কাজ নিয়ে 'realism-এর ধ্বজা তুলে আন্দোলন করবার সাহস এঁরা পাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ খুঁজলেও একটি সত্যিকারের নিপুণ, গভীর এবং মহান শিল্পী জুটবে না। যাঁদের কাজকে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এতকাল ধরে, সত্যিকারে বাস্তবধর্মী মহান শিল্পসৃষ্টি যাঁদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা মুহূর্তেই দেখতে পাবেন যে আমাদের সেই "নমস্য" বাস্তবধর্মী শিল্পীদের কাজ কত খেলো, নৈপুণ্য ও অনুভূতিতে তবু হেমেন মজুমদার কিছু ভালো বাস্তবধর্মী কাজ করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা বাদে সকলেই বাজে।

এই দুই পক্ষই আধুনিকপন্থীদের বিরুদ্ধে।

আর আমাদের আধুনিক শিল্পীদের বড় দুরবস্থা। পশ্চিমে আধুনিক শিল্পের বিবর্তনের একটা ইতিহাস আছে—সেই ইতিহাস গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্ত্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে।

আমাদের দেশে শিল্প চলতে চলতে মরুভূমিতে মিলিয়ে গিয়েছে কিছুকাল আগেই। আজকের যে কাজ চলছে সেটার সঙ্গে প্রাচীন ধারার কোনও একটানা যোগসূত্র নেই।

আমরা আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে বড়াই করি, প্রকৃতপক্ষে সেই ঐতিহ্যকে কাঁচের আলমারিতে তুলে রাখা বই-এর পর্যায়ে এনে রেখে দিয়েছি। কিন্তু সত্যিকারের বোঝা, নিজের করে অনুভব করা এবং নিজের মধ্যে তার প্রতিধ্বনি খুঁজে পাওয়া, খুব কম সমকালীন শিল্পীর কাজের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইংরাজশাসন যখন কলকাতায় মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ে ধুপ করে তিনটি আর্ট ইস্কুল বসিয়ে দিল—সেই ইস্কুলগুলোতে শেখানো হল উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের অনুকরণধর্মী শিল্পকলা। এবং ভারতীয় শিল্পকলা অবহেলিত হল।

আধুনিক শিল্প আজ আমাদের দেশে এসে জুড়ে বসেছে। কিন্তু যে-কোনও শিল্পকেই সে দেশের মাটিতে গাছের মতো বাড়তে হয়—তা না হলে তা রং-করা কাগজের গাছ হয়। অন্য জলবায়ুর দেশ থেকে গাছের একটা ডাল ভেঙে এনে মাটিতে বসিয়ে দিলেই সে-ডাল সব সময়ে বেঁচে উঠে ফুলে পল্লবে ভরে ওঠে না। কিন্তু আমাদের সমস্ত ব্যাপারটাই ভাঙা ডাল বালিতে গুঁজে দেওয়া। প্রথমত আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘন এবং আত্মিক পরিচয় আমাদের বেশির ভাগ আধুনিক শিল্পীদের নেই। দ্বিতীয়ত, ইস্কুলে শিল্প-শিক্ষাকালে তাদের উপরে একটা বিদেশী পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয়ত, বাস্তবধর্মী শিল্পভঙ্গির কোনও ভূমিকা আমাদের দেশে না থাকায় তরুণ শিল্পী অতীতের মহান বাস্তবধর্মী শিল্পনিদর্শনের কোনও দিন প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করতে পারল না। পশ্চিমে দেখেছি ছাত্ররা ক্লাশে বসে যতটা শেখে তার বহুগুণ বেশি শেখে ম্যুজিয়ম ও আর্টগ্যালারিতে ঘুরে ঘুরে। সেখানে তারা পুরোন দিন থেকে শুরু থেকে আজ অবধি যত বড় বড় শিল্পীরা কাজ করে গিয়েছেন, তাঁদের কাজের নিদর্শন দেখতে পায়। অধিকন্তু, তাদের সেই ঐতিহ্য জীবন্ত।

আমাদের না আছে অজন্তা ইলোরা রাজপুত কাংগড়া মোগল শিল্পকলার সঙ্গে কোনও সরাসরি যোগাযোগ, না আছে পশ্চিমের মহান শিল্পীদের মহৎ সৃষ্টির সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ।

আধুনিক শিল্প আমাদের দেশে এসে পৌছুল পত্রপত্রিকার পাতায়

ছাপান ছবি থেকে, বই থেকে, প্রতিলিপি থেকে আর অল্প দু-চারজন ভাগ্যবান শিল্পী যাঁরা পশ্চিমে গিয়ে, যেখানে টগবগ করে আধুনিক শিল্প ফুটছে, তার আঁচ নিতে পেরেছেন তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। সমস্তটাই second hand। আধুনিক শিল্পের এই বর্তমান রূপ উদ্ভূত হয়েছে পাশ্চাত্য সমাজে সেখানকার সমাজের মূল্যবোধের আভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাতে। যেমন action painting। সেটা আমেরিকায় যখন উদ্ভূত হয়েছে—অনুসন্ধানে দেখা যাবে যে তাদের আধুনিক সামাজিক চাপের মধ্যে তার বীজ লুকোনো ছিল। কিন্তু আচমকা জয়পুরে যদি একটি ১৮ বছরের ছেলে action painting করতে শুরু করে দেয়—তখন যথেষ্ট চিন্তার কারণ থাকে।

আমরা হঠাৎ আধুনিক শিল্পী হয়েছি। অথচ আধুনিক শিল্প আমাদের দেশে স্বাভাবিক পথে বেড়ে ওঠে নি। ওপার থেকে ছিটকে যা এসে পড়েছে তাকেই কুড়িয়ে নিয়ে হৈ-চৈ করে আমরা আধুনিক শিল্পচর্চা করছি।

আমাদের অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের ঘরগুলিতে আধুনিক ব্রিটিশ ভাস্কর্যের এক্সিবিশনের প্রথম দিনে ঘর থেকে ঘরে ঘুরতে এক পরিচিত ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভদ্রমহিলার শিল্পপ্রদর্শনী দেখার অভ্যাস আছে কিন্তু আজ তাঁকে দেখলাম বড় বিহ্বল। পাশাপাশি আসতে ফিস ফিস করে বললেন: "I am afraid I find some of them revolting." আমিও ফিস ফিস করে উত্তর দিলাম: "Yes, as a matter of fact, they are frightening." ফিস ফিস করার কারণ সকলে গম্ভীরমুখে এমন ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন যে, কোনও কাজ খারাপ লাগছে বলবার সাহস কারও ছিল না। একজিবিশন দেখতে গিয়ে সত্যিই দেখলাম এক ভীষণ অবস্থা—দেখলাম মানুষের মূর্তি করা হয়েছে—হাত-পাগুলো যেন কুষ্ঠ হয়ে গলে গেছে—অথবা মানুষকে যেন আগুনে জ্যান্ত ঝলসানো হয়েছে—গা-হাত-পা পুড়ে গলে বিকৃত হয়ে একজায়গার সার অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। দেখলাম পশ্চিমের শিল্পীদের আত্মায় ক্ষুধা ও নিঃস্বতা, দেখলাম মানসিক যন্ত্রণার অসহ্য প্রতিমূর্তি। দেখলাম যে পশ্চিমী সমাজের ব্যক্তিস্বাধীনতা তাদের জীবনে এখনও পরিপূর্ণতা দিতে সক্ষম হয় নি। তারা অসুস্থ চোখে গলিত আত্মাকেই দেখতে পেল।

শিল্পীকে যদি সিস্‌মোগ্রাফের সঙ্গে তুলনা করতে হয়, তবে এই শিল্পীদের কাজ দেখে মনে হল যে পশ্চিমের মানুষের আত্মার যন্ত্রণা—প্রাচুর্যের মাঝে

থেকেও জীবনে স্থৈর্যের অভাব, জীবনের সত্যকে হারিয়ে ফেলে নিঃসঙ্গ। সেই নিঃসঙ্গতা এবং খণ্ড অস্তিত্বের হাহাকার থেকে উদ্ভব এই যন্ত্রণামুখর শিল্পের। তাই তাদের কাজ হয়ে গেছে বীভৎস এবং নিষ্ঠুর। There is a sense of futility and of the grotesque. দেখলাম, আধুনিক শিল্প পাশ্চাত্ত্য মানুষের যন্ত্রণার প্রতীক। যে-কজনের কাজ এখানে দেখানো হল তারা সকলেই নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান এবং কর্মিষ্ঠ শিল্পী। কিন্তু প্রশ্ন রইল, জীবনকে কি তাঁরা ভালোবাসতে পারলেন ?

এই সূত্রে মনে পড়ছে কিছুদিন আগের কথা,—লণ্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে মস্ত প্রদর্শনী চলছে—সোভিয়েত শিল্পীদের কাজের। সোভিয়েত শিল্পীদের কাজ দেখবার সুযোগ আমি তার আগে এবং পরে অনেকবারই পেয়েছি। কিন্তু এই বিশেষ প্রদর্শনীটির কথা আলাদা করে মনে থাকবার কারণ আছে।

পশ্চিমে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আধুনিক শিল্পক্ষেত্রে যত শিল্পী কাজ করে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক বড় বড় শিল্পী এসেছেন-গিয়েছেন। তাঁদের কাজ দেখবার মতো, জানবার মতো, ভাববার মতো। তার পাশে সোভিয়েত সোশালিস্ট রিয়ালিস্ট কাজ অত্যন্ত বিরক্তিকর ভিজে প্যাচ-প্যাচে লাগে। কিন্তু তবুও সেদিন সেই প্রদর্শনীতে একটি মাঝারি সাইজের ছবির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সোশালিস্ট রিয়ালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি শিল্পীর—সোশালিস্ট রিয়ালিস্ট ধরনের ছবিতে একটি মেয়ে জানালায় বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে—হাতে ঝাড়ু, ঘর পরিষ্কার করাই তার কাজ। ছবিটির মধ্যে কি ছিল ? ড্রয়িং ? পারদর্শিতা, তার বেশি কিছু নয়। তবু কি ছিল সেই ছবিটিতে। রঙ ছিল হাল্কা এবং উজ্জ্বল আর সমস্ত ছবিটার মধ্যে ছিল একটা ভালোবাসার তুলি বোলানো। আঁকার ধরন সম্বন্ধে যাই বলি না কেন, অন্তর্নিহিত একটা জীবন-বিশ্বাস, জীবনকে সহজে ভালোবাসা লুকোনো ছিল তাতে। একটা স্বাস্থ্যের, সুখের, সম্ভাবনার। একটা ভালো লাগার, একটা ভালোবাসার কথা ছড়িয়ে ছিল ছবিটাতে।

আমার কোনও ছাত্র যদি বাস্তবধর্মী কাজের চূড়ান্ত নিদর্শন দেখতে চাইত, আমি হয়তো তাকে এই ছবিটি দেখতে পাঠাতাম না। আমি তাকে পাঠাতাম মিউজিয়মগুলোতে যেখানে রয়েছে পুরোনো দিনের শিল্পগুরুদের

কাজ। কিন্তু এই ছবিটা দেখতে দেখতে একটা সত্য উপলব্ধি করলাম। এই যেন সঠিক রাস্তা। এ যেন এক আশার আলো জ্বেলেছে। শিল্পী তথাকথিত সোশালিস্ট রিয়ালিজমের নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী হয়েও তার পদ্ধতিকে ছাপিয়ে জীবনের আনন্দ, প্রেম ও ভালোবাসাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই ছবিতে। এই ভালোবাসা, এই জীবন-বিশ্বাস, এই আশাবাদ সোভিয়েত শিল্পীদের কাজে দেখা যায় প্রায়ই, যদিও অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের উপর থেকে চাপানো দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো তাঁদের কাজকে মহান শিল্পসৃষ্টির পথে নিয়ে যাচ্ছে না। সোভিয়েত শিল্পীরা যেন সোশালিজমের নিয়মতান্ত্রিকতার নিগড় থেকে মুক্ত হতে পারেন সেইজন্য মনে মনে প্রার্থনা করলাম। তাহলে আজকের যুগের উপযোগী মহান শিল্পের সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁদের মাঝেই।

আধুনিক ধরন ও সোশালিস্ট রিয়ালিস্ট ধরনের সমান্তরাল অবস্থিতি নজর করলাম পোল্যাণ্ডে গিয়ে। এবং সেইখানে পাশাপাশি বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে শিল্পের অসুখ আসলে শিল্পীর মনের অসুখের বহিপ্রকাশ। অসুস্থ, অসুখী, নির্যাতিত বা হারিয়ে-যাওয়া শিল্পী দিশাহারা শিল্পই সৃষ্টি করেন, তিনি আধুনিক বা বাস্তবধর্মী যে পথেরই হোন না কেন।

আবার আমাদের নিজেদের কথা বলে শেষ করি। আমরা এখানে এক-একজন বাঁশবনে শেয়ালরাজা হয়ে বসে আছি—কেউ "আধুনিকপন্থী", কেউ "ভারতীয়", কেউ "বাস্তবধর্মী"। আমাদের সামনে কোনোটারই বড় কাজের নিদর্শন নেই—তার ফলে কোনও ঘষামাজা নেই—কোনো বিচার নেই। কোনও permanent galleries নেই, আর্ট মিউজিয়ম নেই, কী দেশী কী বিদেশী কী পুরনো কী নতুন কোনও কাজই দেখার সুযোগ নেই। আমাদের শিল্পীজীবনের এক মস্তবড় ট্র্যাজেডি এটা। আমরা কেবল আপন আপন গর্তে বসে খ্যাক-খ্যাক করছি—পরচর্চা, পরনিন্দা আর পরশ্রীকাতরতা।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

বিষুব পুষ্প : ওজু

"Farewell, O Spring ! We are on to Eternity."
—Okakura

প্রস্থিত শীত ঋতুর জন্য জাপানের 'তোকুগোয়া পুষ্পবিন্যাস রীতি' নির্দেশিত এক আঙ্গিক : জীর্ণ চেরী স্তবকে সঙ্গে না-ফোটা এক ক্যামেলিয়া-কুঁড়ির সমন্বয়। যার দার্শনিকতায় বিদায়ী শীতের প্রতিধ্বনির মধ্যে বসন্ত আগমনের মন্ত্র শুনতে পাওয়া যায়। এই রীতির পালাবদল ঘটে ঋতুবদলের সঙ্গে। কিন্তু সার্বিক দর্শনের গভীরতা কমে না। অথচ জাপানী flower master তার জন্য দুই বা তিনের অধিক পুষ্পচয়নে সম্পূর্ণ অসম্মত। ইয়াসুজিরো ওজুর 'হিগানবানা' সম্পর্কে (বা আলাদাভাবে তার অন্তর্ভুক্ত 'শট্'গুলি সম্বন্ধে) এ কথা মৌল মনে হয়। জাপানের ট্র্যাডিশন্যাল শিল্প-সংযম এখানে চলচ্চিত্রের এক বিস্ময়কর নিজস্বতায় রসান্বিত। 'হিগানবানা'র চলচ্চিত্র-ভাষা ওজুর বিশিষ্ট প্রয়োগরীতি ও দর্শনের অন্তরঙ্গ-বন্ধনের স্বাক্ষর। চূড়ান্ত সম্পাদনার পর ওজু-চিত্র থেকে যেমন কোনো একক 'ফ্রেম' বাদ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব, তেমনই তার দর্শন ও রীতির স্বতন্ত্রীকরণ শিল্পোপভোগের ক্ষেত্রে খণ্ডিত রসাভাসের সৃষ্টি করে। খণ্ড খণ্ড চিত্রকল্প থেকে সৌন্দর্যের এক নিটোল বৃত্ত রচনায় ওজুর স্বচ্ছন্দ উত্তরণ। অবশ্য সে-প্রসঙ্গ পরে আলোচ্য।

ওজু সম্পর্কে এক জনশ্রুতি আছে। শৈলাবাসের এক নিভৃত কক্ষে 'ফায়ার প্লেসে'র মুখোমুখি বসে নিকটতম বন্ধু কোগো নোদার সহযোগিতায় চিত্রনাট্য রচনা তার প্রিয় অভ্যাস ছিল। রচনাকালের ঐ পারিবারিক পরিবেশের উষ্ণতা ওজু-চিত্রে সহজলভ্য। 'হিগানবানা'য় তার ব্যতিক্রম নেই ; জাপানী ভাষায় যাকে বলা যায় 'শুমিন-গেকি'। রীতির মতো বিষয় নির্বাচনেও ওজু তাই নিত্যপরিবর্তবাদিতায় আস্থাশীল নন। আধুনিক

জীবনে বিবাহযোগ্যা (বিবাহের বয়স উত্তীর্ণপ্রায়) কন্যার সঙ্গে পিতামাতার বিভিন্ন মানসিক দ্বন্দ্ব বা সংঘাত (কোনো সোচ্চার অর্থে নয়), বা সম্পর্ক তার অতিপরিচিত বিষয়বস্তু। 'হিগানবানা'র বিষয়ের সঙ্গে ওজুর 'লেট স্প্রিং' বা 'অ্যান অটাম আফ্‌টারনুন'-এর গভীর মিল পাওয়া যায় ('হিগানবানা'র মতো 'অটাম আফ্‌টারনুন'-এর কেন্দ্রচরিত্রের নামও হিরায়ামা)। এভাবে একই আখ্যান ফিরে ফিরে বলার মধ্যে স্রষ্টার পারফেকশনের স্তরে উন্নীত হবার প্রয়াস থাকে। ওজুর কাহিনী-কথনের অন্তঃস্তরেও এমন এক ফিরে আসার প্রবণতা কিছু দুর্লক্ষ্য নয়, একটা বিশেষ বা নির্দিষ্ট বিন্দুতে ফিরে আসা। 'হিগানবানা'র প্রথম 'ফ্রেম' তোকিও স্টেশন, দ্বিতীয়, সমান্তরাল দুইটি কোনো রেললাইন। ছবির শেষ 'ফ্রেম' দৃষ্টিকোণের লম্বভাবে রেললাইনকে নিয়ে। এর পরে আর কোনো ফ্রেম নেই। কিন্তু আর-একটি 'ফ্রেম' থাকা কিছু অসম্ভব ছিল না—হিরোশিমা স্টেশন। সেখান থেকে হিরায়ামার প্রত্যাবর্তন ঘটবে তোকিও স্টেশনে। এই রেখানুসারে বৃত্ত সম্পূর্ণ হত। কিন্তু, তার পূর্বেই ওজু আমাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে এনে রেললাইনের পাশে তাঁর ক্যামেরা বসিয়ে দেন। এবং জাপানি চা-গৃহ সজ্জার, উকিয়োএ বা ওয়াশ অঙ্কনের প্রখ্যাত unsymmetrical রীতির মতো এখানেও আলোচ্য বৃত্তের সম্পূর্ণতা সম্পর্কে আমাদের মনে কোনো সংশয় থাকে না। কিন্তু, আরও এক সূক্ষ্ম ধরনের প্রত্যাবর্তনের কথা 'হিগানবানা'য় আছে, যা জাপানের Zen বৌদ্ধ দর্শনের আপন কথা। ওজু-দর্শনে 'ক্ষণ' বা তার 'great transition'-এর প্রসঙ্গটি মুখ্য। (মিৎসোগুচি-চিত্রের মতো) ওজু-চিত্রে "It is the spirit of Cosmic Change,—the eternal growth which returns upon itself to produce new forms....for it deals with the present—ourselves. It is in us that God meets with Nature, and yesterday parts from to-morrow. The Present is the moving Infinity, the legimate sphere of the Relative" *(The Book of Tea)*. 'হিগানবানা'র পাত্রপাত্রীদেরও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়। কিন্তু, সেখানে অতীত অনুপস্থিত নয়। যদিও বর্তমানের সঙ্গে তার অসংগতি আছে। বৈষম্যও। তার কারণে কেমন এক বিষাদাভাবে অতীত সেখানে অতীত হয়। বর্তমানের আনন্দভৈরবীও একদিন বিগতের

পূরবীতে অবসিত হবে। তবু, বর্তমানই সেখানে সত্যসুন্দর। 'হিগানবানা'র আবহসংগীতে তাই 'সকুরা' (চেরীফুলের গান) বারে বারে বেজে ওঠে। এবং প্রবীণদের 'রি-য়ুনিয়ন' সভায় মিকামি গীতে বিদায়সংগীতের এক জায়গায় আমরা শুনি যে তরবারির ফলকে জলকণাগুলি জমে আছে—সে কি শিশিরবিন্দু না আমাদের অশ্রুধারা। এই তরবারিকে যেন জাপানী প্রাজ্ঞ আচার্যরা বলেছেন :

O sword of eternity !
Through Buddha
And through Dharuma alike
Thou hast cleft thy way."

আর তার উপরে জলকণাগুলি স্থায়িত্বে ক্ষণিক হলেও অসীম সৌন্দর্যময়। এই সৌন্দর্যরচনা 'হিগানবানা'র বর্তমানকে পরম রমণীয় করেছে। যা চিরকালীন নয়। তবুও সর্বকালীন।

এক সুপ্রাচীন অভিজাত সৌন্দর্যবোধ থেকে উদ্ভূত বলে 'হিগানবানা'র অতীত ও বর্তমানের দ্বন্দ্ব আমাদের সামনে কোনো সামাজিক কুশ্রী ক্ষত-দৃশ্যের সূচনা করে না। এমনকি মিৎসোগুচি-চিত্রের অন্বিষ্ট 'প্যাশন' বা কুরুসোয়া-চিত্রের প্রবল 'ভায়োলেন্স'ও এখানে উপস্থিত নয়। অত্যন্ত মন্থর, স্থির ও সংযত সৌন্দর্যলোকের মণিদীপ জ্বেলে যেন কয়েকটি মানবচরিত্রের বিশেষ 'মুড্' বা প্রতিক্রিয়াকে এখানে ক্যামেরাবদ্ধ করা হয়েছে। কতকগুলি বিষাদসুন্দর বা আনন্দসুন্দর মুহূর্ত। তাই ওজু চিত্রাবলীতে সম্ভবত কোনো 'ভিলেন' চরিত্রের উপস্থিতি নেই। 'হিগানবানা'য় হিরায়ামার আপন মতের প্রতি দৃঢ়তা বা আপন কন্যার দাম্পত্যজীবনের প্রতি মিকামির প্রাথমিক অনীহা তাদের কিছু শয়তান চরিত্রে পরিণত করে না; শুধু সুন্দর এক একাকিত্ব দান করে। সুখ-বেদনার বুনুনির ফাঁকে এই যে বিশিষ্ট চরিত্রের isolation (যে-কথা কিয়োকো, সেৎসুকো বা এমনকি য়ুকিকো সম্পর্কেও বলা যায়), ওজু-বৈশিষ্ট্যের এক সুরম্য স্বাক্ষর।

অনুরূপভাবেই ইমেজের isolation এবং তাদের সমষ্টিগত সৌন্দর্যে সামগ্রিক আবেদনে আসা ওজুর চলচ্চিত্রভাষার নিজস্ব উপকরণ। এখানে প্রাচীন হাইকু কবিদের মতোই তার ইমেজ রচনা চিত্রধর্মীতার একক বলিষ্ঠতা বহন করে। হাইকু বর্ণিত চিত্রকল্পগুলি যেমন একান্তভাবেই

স্বতন্ত্রসুন্দর। তাদের সেতুবন্ধনের প্রয়াসের মধ্যে রসিকমনের কল্পনা নিজস্ব পথে পদচারণের অবকাশ পায়। যেমন ধরা যেতে পারে Kyoroku-র এই রচনা :

"It is early dawn.
The castle is surrounded
By the cries of wild ducks."

এখানে ইমেজগুলি নিয়ে শেষ থেকে শুরু করা যায়। বুনো হাঁসের কাকলী ও প্রাসাদ (নিঃসঙ্গরূপে যার অঙ্কন) এই দুই ইমেজ ছুঁয়ে তৃতীয় ইমেজ প্রত্যুষ। অর্থাৎ চূড়ান্ত ইমেজকে এস্টাব্লিশ করার এই ভঙ্গিতে স্বতন্ত্র ইমেজগুলিতে এক আশ্চর্যজনক স্বয়ংসম্পূর্ণতা লক্ষ করা যায়। চলচ্চিত্রে (আপাতক্ষেত্রে 'হিগানবানা'য়) ওজু তার 'ফ্রেম'গুলি যেন অনুরূপ আদর্শে প্রস্তুত করেন। এই কারণে তার চলচ্চিত্র-বর্ণমালায় 'কাট্'ই কেবলমাত্র যতিদানের প্রকরণ। মনে হয় 'ফেড্' বা 'ডিসল্ভ্' তার 'ফ্রেম'কে পূর্বাপর অপর 'ফ্রেম' থেকে অংশগ্রহণে নারাজ। এখানে শিল্পগত এক নীরব সহিষ্ণুতা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। একটি 'ফ্রেমে'র শৈল্পিক পরিপূর্ণতা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত (সময়কে কখনও বিলম্বিত করাও হতে পারে) 'কাট্' করে অপর 'ফ্রেমে' যেন অবশ্য খাওয়া চলে না। 'হিগানবানা'য় রি-য়ুনিয়ন রাত্রি শেষে সেতুর উপরে হিরায়ামা ও মিকামির 'মিড্'-শটের কথা ধরা যেতে পারে। এখানে ঐ দুই চরিত্রের কথোপকথনের পর (যার আলোচ্য বিষয় ছিল আধুনিক কালের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পিতামাতার মতবৈষম্য) তাদের পিছন থেকে ক্যামেরা অনেকক্ষণ তাদের নিঃসঙ্গতার শরিক হয়। এই বিলম্বিত সময় 'ফ্রেমে' একটি পূর্ণতা আসার জন্যে অপেক্ষা করে। এবং তা প্রাপ্তির পরমুহূর্তেই যথাক্রমে এক নিস্তব্ধতা পাগোদা ও অরণ্যের দুটি শটে চলে যায়। শেষ এই placing শট্-দুটি পূর্বদৃশ্যের পরিপূরক বলে আমাদের দেখানো হয় না (বা সাবজেকটিভ প্রয়োগ তো নয়ই), তাদের এই কারণে আমরা দেখি যে সেতুর উপর দাঁড়ানো ঐ দুই চরিত্রের (ক্যামেরা যাদের ব্যাক-গ্রাউণ্ডে) দৃষ্টিপথ আমরা অনুসরণ করতে চাই। এবং ওদের চোখে দৃশ্যমান বস্তু থেকে আমরা অবজেকটিভ্লি ওদের দুঃখ-বেদনার কাছাকাছি আসতে পারি।

'হিগানবানা'র বিভিন্ন সিকোয়েন্সের establishing শট্গুলি মূলতই

অবজেকটিভ্। এই শট্গুলির (যা কখনও তিনের অধিক হয় না) এক বিশেষ চারিত্রিক সম্পদ আছে। সাধারণত চিত্রকলার পরিভাষায় এদের বলা যেতে পারে 'স্টিল-লাইফ' (ল্যাণ্ডস্কেপের প্রয়োগও দুর্লভ নয়)। কিন্তু ব্রাকের আঁকা 'দুটো ন্যাসপাতি' বা পিকাসোর 'মাছের' সঙ্গে এর অসীম তফাৎ। ওজু-চিত্রে এগুলি অবশ্যই শিল্পীর চিত্ত-ভাবনার (বা মতান্তরে চিত্তবৈকল্য) ব্যক্তিক স্বাক্ষর নয়। প্রথমত, এর একটা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের পরিবেশকে পরিচিত করে। দ্বিতীয়ত, Tea Ceremony-র চা-পানগৃহের ('সুকিয়া') নিরাভরণ বা বেরঙা পটভূমি রচনার মতো (যাকে Tea Masters বলেছেন 'Abode of Vacancy') এই 'ফ্রেম'গুলি 'aesthetic need of the moment'-কে পূর্ণতার সুযোগ দেয়। আবার আলাদাভাবে বিচার করলে আলোচ্য ফ্রেমগুলির বা ইমেজের আভ্যন্তরীণ 'কম্পোজিশন'-কেও "devoid of ornamentation" বলা যায়। শুধু সেই শূন্যতার পটে ওজু কখনও হলুদ, সাদা বা গেরুয়া লালের চীনে মাটির পাত্র বসিয়ে দেন। কখনও ফুলদানীতে কেবল এক বেগুনী চন্দ্রমল্লিকা। কখনও অন্ধকার পিছনে রেখে নীল বা কমলা কাগজের লণ্ঠন। কখনও বা দীর্ঘ সেতুর প্রান্তদেশে একটি একাকী পাথরের লণ্ঠন। কিংবা, তোকোনোমার উপরে মেটে লালের উপরে সাদা চেরির পট বা দেওয়ালে লম্বিত লিপিচিত্র। এগুলি জাপানি মানসের কালজয়ী সৌন্দর্যসৃষ্টি। সুন্দর বলেই চিরন্তন। তাই দেখা যায়, ওজুর এই এসটাব্লিশিং শট্-এ প্রথমে মানুষের উপস্থিতি থাকে না। এবং 'সিকোয়েন্সে'র following শট্-এও নয়। কালের এই চিরন্তনীতে বাশোর প্রখ্যাত হাইকুর মতো জীবনের আবর্তগুলি ঢেউ তুলে আবার বিলীন হয়।

'হিগানবানা'র সর্বপ্রথম বিবাহপর্বের মুহূর্তগুলির কথা আলোচনা করা যায়। স্টেশনে লাউডস্পীকারে আসন্ন ঝড়ের বার্তা ঘোষিত হবার পরের 'ফ্রেমে' দেখানো হয় জানালার মধ্য দিয়ে শহরের বাড়িঘরের কিছু অংশ (নেপথ্যে বিবাহসভার সংগীত তখন শোনা যায়)। এর পরেরটি 'করিডর শট্'। অনেকটা দূরে করিডরের অপর প্রান্তের দেওয়ালে একটি ফুজিয়ামা-চিত্র। তার কোল দিয়ে বরবধূ নিয়ে শোভাযাত্রা চলেছে (এ শটের 'visual beauty' অনবদ্য)। সবাই ধীর পদক্ষেপে ঐ অলিন্দ পার হয়ে যাবার পরে আলোচ্য ফ্রেমের শূন্যতা এক অনির্বচনীয় লাবণ্যে মণ্ডিত হয়।

পরে বিবাহসভা অন্তে পুনরায় ঐ শট্-এ প্রত্যাবর্তন, যখন আরও কয়েকটি লোককে ফিরে যেতে দেখা যায় পূর্বের অনুরূপ রীতিতে। অনন্তের গর্ভে ঐ চলমান মানুষের প্রবাহ যেন কোথায় হারিয়ে যায়। 'হিগানবানা'য় ওজুর এই বিভিন্ন 'করিডর শট' কেমন এক নির্লিপ্ত দূরত্ব রচনা করে তার পাত্রপাত্রীদের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত জাপানে চা-পান-গৃহে প্রবেশের পূর্বে এক উদ্যান-পথ পার হতে হয়। যাকে বলা হয় 'রোজি'। জাপানি দর্শনে এই বীথিকা যেন 'first stage of meditation'। এর একাকিত্ব স্মরণে মনীষী Rikiu লেখেন :

"I looked beyond ;
Flowers are not,
Nor tinted leaves.
On the sea beach
A solitary cottage stands
In the waning light
Of an autumn eve."

তুলনামূলকভাবে ওজুর 'করিডর শট্'গুলির সঙ্গে Rikiu-র কাব্যদর্শনের স্বাজাত্য অনুভব করা যায়। শুধু চিত্রকল্পের বৈভবে নয়, চিত্তদর্শনের রীতিতেও। প্রকৃত অর্থে ওজুর চলচ্চিত্র তার পাত্রপাত্রীদের portraya নয়, observation। যার পরিমিতিবোধ তার চিত্রভাষাকে এক অভিনবত্ব এনে দিয়েছে। অন্য পরিচালকের মতো ওজুর ক্যামেরার চোখ যত্রতত্র আসা-যাওয়া করতে পারে না। সেই কারণে তার দর্শকের অনুভূতি বা মানসিক অবস্থিতিও। ওজু স্বচ্ছন্দে 'মিড্-ক্লোজ্'-এ মুখোমুখি তার কুশীলবের বক্তব্য শোনেন এবং এক চরিত্রের সংলাপের মধ্যে হঠাৎ ক্যামেরাকে সরিয়ে নিয়ে অপর চরিত্রের reaction দেখেন না। ওজুর সঙ্গে আমরাও অপেক্ষা করি। 'হিগানবানা'য় যে অবজেকটিভ্ শট্গুলি নয়নাভিরাম মনে হয়, তা কাহিনীর কোনো বিশেষ 'মুড্'-এর প্রতিচ্ছায়া নয় (প্রতীক তো অতীব হাস্যকর)। ঐ সৌন্দর্যপ্রবাহ আমাদের জন্য নয়, 'হিগানবানা'র পাত্রপাত্রীদের জন্য। তাদের চোখে ওরা সুন্দর বলে আমাদের চোখেও সুন্দর। ওদের কাছে ওরা বিষণ্ণ হলে আমরা আনন্দিত নই। দর্শক নয়, ওজু তার পাত্রপাত্রীদের প্রতিই বিশেষ মনোযোগী। যেমন

হিরায়ামার অফিসে মিকামির আগমনের প্রথম প্রসঙ্গটি। এখানে হিরায়ামা মিকামিকে পূর্বঅনুষ্ঠিত উৎসবে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আবহশব্দে ইঞ্জিনের বাষ্পত্যাগের আওয়াজ ধীরে ধীরে শুরু হয়ে যায়। ঠিক পরবর্তীকালে কথিত মিকামির কন্যার গৃহত্যাগের প্রসঙ্গে এই দীর্ঘশ্বাসের মতো ইঞ্জিনের আওয়াজ কিছু সাবজেকটিভ প্রয়োগ নয়। আসলে ওটা হিরায়ামা ও মিকামির কাছে শ্রুত বলে আমরা শুনতে পাই। ঐ আলোচনার মধ্যে হিরায়ামা ঘর ত্যাগ করেন এবং তার প্রত্যাবর্তন অন্তে শূন্যঘরে তাকে অন্যমনা দেখায়। নেপথ্যে আবার ইঞ্জিনের শব্দ হতে থাকে এবং তখন তা আমাদের কাছে হতাশ্বাসধ্বনি বলে মনে হয়। তার কারণ হিরায়ামার কাছেও তা অনুরূপ প্রতিভাত। কাহিনীর শেষভাগে হিরায়ামা যখন য়ুকিকোকে সঙ্গীমনোনয়নের অনুরোধ জানান তখন দর্শকের emotion চরিতার্থে ওজু তথাকথিত কোনো filmic কার্যকারণের আশ্রয় নেন না। য়ুকিকোর মুখে খুব ছোট এক লাজুক হাসি শুধু আমরা দেখতে পাই। সেটা হিরায়ামারও দৃষ্টিগ্রাহ্য।

আন্তোনিওনির মতো ওজুও তার চলচ্চিত্রে, কখনও চরিত্র কখনও বা দর্শকের 'পার্‌স্‌পেক্‌টিভ'-এ সময় নিয়ন্ত্রণ করেন। 'লাভেণ্ডরা'য় নির্জন কারখানার স্তব্ধতা থেকে সান্দ্রো ও ক্লদিয়া পালিয়ে গেলেও জনহীন গীর্জার পাশে আন্তোনিওনির সঙ্গে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। পরবর্তী আকস্মিক মিলনদৃশ্যের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সেই ভয়াবহ নৈঃশব্দ্য তিল তিল করে আমাদের গ্রাস করতে থাকে। 'হিগানবানা'য় ওজু আমাদের অনুরূপ মাত্রাবোধের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন। পিতার কাছে তিরস্কৃত হয়ে যে রাতে সেৎসুকো তানিগুচির কাছে এসে তাদের ভালোবাসার নতুন প্রত্যয় উপলব্ধি করে ওজু তখন আমাদেরও সেই ঘরে আনেন। কিন্তু ওরা যখন ঘরের বাইরে চলে যায়, ওজুর ক্যামেরা তখন রুদ্ধদ্বার কক্ষের মধ্যে অপেক্ষা করে কিছুক্ষণ। সেই মুহূর্তে তাদের অনুসরণ করতে ওজু আমাদের নিষেধ করেন। আবার বিপরীতমুখে এক সিকোয়েন্সের কিছু আগেই চরিত্রের 'টাইম-পার্‌স্‌পেকটিভ'-এ কিয়োকোর সঙ্গে আমরা নাতিদীর্ঘ কাল রেডিও শ্রবণের (ছবির এক প্রাণবন্ত মুহূর্ত) অংশীদার হই। জাপানি aestheticism-এ একেই বলা হয় 'moral geometry'। ওজুর ক্যামেরা অতামির উপর উপবিষ্ট এক প্রাজ্ঞ জাপানী দার্শনিকের চোখ। ট্র্যাকিং, প্যানিং বা জুমিং প্রভৃতি গতিশীলতার প্রতি যার বিরাগঔদাসীন্য। পরিমিত, স্থির ও সংহত দৃষ্টিপাতে যার জীবনের প্রগাঢ় সত্যোপলব্ধি। যার সৌন্দর্যদীক্ষা সকল মহৎ শিল্পের স্বপ্নধেয়ান।

'হিগানবানা' (ইকুইনক্স্ ফ্লাওয়ার, ১৯৫৮)

পরিচালনা : ইয়াসুজিরো ওজু, চিত্রনাট্য : কোগো নোদা ও ইয়াসুজিরো ওজু, আলোকচিত্রে : য়ুশুন আৎসুতা, সংগীত : তাকানোরি সাইতো ; অভিনয় : শিন শাবুরি, কিনুয়ো তানাকা, ইনেকো অরিমা, মিয়ুকি কুবানো ইত্যাদি।

তিনটি সাক্ষাৎকার

শিশিরকুমার প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র

[একদিন সকালে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে শ্রীশম্ভু মিত্রের সঙ্গে আলোচনা হয়। কথা বলতে বলতে নোট্‌স্ নিয়েছিলাম। তারই ভিত্তিতে লেখাটি দাঁড় করাই। অন্যত্র প্রকাশিত শ্রীমিত্রের প্রবন্ধগুলি 'বহুরূপী'র গ্রন্থাগারের ও শ্রীদেবতোষ ঘোষের সৌজন্যে দেখবার সুযোগ হয়। লেখাটি শ্রীমিত্রকে দেখালে তিনি সযত্নে সেটি সংশোধন করে দেন, দুটি নতুন অনুচ্ছেদ তাঁর নিজের বক্তব্যরূপে উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে যোগ করেন।]

"যে-মানুষটিকে চিনতাম তিনি তো কেবল একটা অভিধা নন যে বাছা বাছা গোটাকতক বিশেষণ দিয়ে তাঁর সম্পর্কে আমাদের দায় চুকিয়ে দিতে পারি। তিনি তো নিকৃষ্ট হাতের আঁকা একটা নীরক্ত দ্বিমাত্রিক ছবি ছিলেন না। একটা বিরাট শিল্পী অজস্র জটিলতা দিয়ে একটা রক্তমাংসের পরিপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করেছিল, যার নাম শিশিরকুমার ভাদুড়ী। 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে নাদিরশাহের ভূমিকায় তিনি একটা কথা বলতেন—যেটার অর্থ হচ্ছে—'তোমার কল্পনার চেয়ে আমি বৃহৎ, তোমার আদর্শের চেয়ে আমি মহৎ, তোমার কল্পনার সাধ্য কী যে তার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আমাকে বেঁধে রাখে।'

"কতবার যে শিশিরকুমারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার এই কথাগুলোই মনে পড়েছে—মনে হয়েছে, মানুষটি একটি ব্যক্তি নয়, অনেকগুলো ব্যক্তিত্বের একটা জটিল সংমিশ্রণে এই অনন্য মানুষটির সৃষ্টি হয়েছে। তাই হয়তো কখনো রাগ করেছি, ঝগড়া করেছি, কিন্তু তবু আত্মীয় বলে মনে করেছি। চারদিকের এই নিষ্ঠাহীন পেশাদার লোলুপতার মধ্যে তিনিই ছিলেন একটা অনমনীয় লোক যাঁর পা দিয়ে পয়সা ছুঁড়ে ফেলতে কোনও

দ্বিধা হোত না। অদ্ভুত লোক। অনেকে বলেছে দাম্ভিক। আমি জানি না। যে-লোক এই কিছুদিন আগেই বলেছেন—'কষ্ট আর ক'দিন? যে ক'দিন বাঁচবো; এই তো? কিন্তু তারপরে? এই তোমাদের শোকসভা করতে হবে, দল বেঁধে চাঁদা তুলে মূর্তি গড়িয়ে তার গলায় সভা করে মালা দিতে হবে।'

"একে কি দাম্ভিকতা বলে? যে-মানুষ বুকের রক্ত দিয়ে কিছু সৃষ্টি করেছে, এবং সেই সৃষ্টির ফল যার জীবদ্দশাতেই জাতীয় উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে সেই সার্থকশ্রম মানুষের আত্মবিশ্বাসের কথা হোল এইটা, এবং এইরকম জীবন্ত মানুষগুলোর কথা বুঝতে পারে না বলেই তুচ্ছ মানুষে তার হীন অর্থ করে।"

কথাগুলো বলেছিলেন শ্রীশম্ভু মিত্র, শিশিরকুমারেব মৃত্যুর পর ১৯৫৯-এর ৩০শে জুনের এক বেতার-কথিকায়। আজও শিশিরকুমারের কথা বলতে গেলেই শ্রীমিত্র অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা, এক-একটা আশ্চর্য অভিনয়ের স্মৃতি একই সঙ্গে মিশিয়ে বলে যান, কখনও কখনও শিশিরকুমারের মডিউলেশনে এক-একটা নাটকের সংলাপ আবৃত্তি করে শোনান।

শ্রীমিত্র যখন প্রথম শিশিরকুমারের অভিনয় দেখেন, তখন নাট্যাচার্য সদ্য মার্কিন শফর সেরে ফিরে এসেছেন। শ্রীমিত্রের দেখা সেই প্রথম নাটক যোগেশ চৌধুরীর 'বিষ্ণুপ্রিয়া'। "তখনই লোকে বলতে শুরু করেছে, এ তো শিশিরবাবুর কঙ্কাল; তখনই ভাঙা হাট, পুরনো সে-সব লোকজন নেই।" অথচ তখন মাত্র একত্রিশ কি বত্রিশ সাল। শ্রীমিত্র 'সীতা' দেখেছেন পরবর্তী কালে, কিন্তু তার প্রথম চমকের আভাস পেয়েছেন অন্য লোকের কাছে। টিকিটে 'ক পংক্তি অমুক সংখ্যা' পড়েই দর্শকের গৌরববোধ হত, বিকেলে নাটক দেখতে এসেই শুনতে পেতেন শানাই বাজছে। তারপর প্রেক্ষাগৃহের সব আলো নিভে যেত। টিকিটে বাংলা হরফ, শানাই, প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভে যাওয়া—এই সবই বাংলা রঙ্গমঞ্চে সেই প্রথম। আলো নিভতেই কোনো দর্শকের হঠাৎ মনে হয়ে গিয়েছিল, আলো 'ফিউজ' হল নাকি? প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভতেই একটা নীল ফোকাস এসে পড়ে—তারই মধ্যে একটি মেয়ে (একটা বেদীর উপর) দাঁড়িয়ে অত্যন্ত টানা সুরে গাইছে, "কথা কও, কথা কও, অনাদি অতীত।" গান শেষ হলে আবার আলো

নিভে যায়। তারপর পুরো মঞ্চ খুলে যায়—(মঞ্চে দাঁড়ালে) ডানদিকে চত্বর, খিলান, সামনে বারান্দার মতো, তার থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে, সেখান থেকে বাইরে যাবার পথ বাঁ দিকে—এর সবটাই সাঁচির তোরণের অনুসরণে পরিকল্পিত। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, চিত্রপরিচালক হিসেবে পরবর্তীকালে খ্যাতিমান শ্রীচারু রায় এই নাটকের মঞ্চশিল্পী)। নাটকের শুরুতে কোনো কথা নেই (এটাও সেদিনকার পক্ষে একেবারেই অভিনব), বারান্দায় সীতা শুয়ে, রামচন্দ্র নীরবে পাখার বাতাস করছেন। মঞ্চের ওপাশ থেকে একটি মেয়ে এসে রামচন্দ্রকে কী যেন বলল, শোনা গেল না। রামচন্দ্ররূপী শিশিরবাবু দুবার হাততালি দিলেন : পরিচারিকারা স'রে গেল, দুর্মুখ এল। স্বভাবতই দর্শকের সেদিন মনে হয়েছিল, এরকম তো কখনও দেখিনি। ঐ পর্বের নাটকের প্রত্যেকটিতেই প্রয়োগকর্তা শিশিরকুমারের দৃষ্টি থাকত প্রযোজনার প্রত্যেক দিকেই। "এগুলো দর্শকমনকে চমক দেবার জন্যে কেবল stunt হিসেবে করা হয় নি। Stunt বাংলা মঞ্চে অনেক হয়েছে, কিন্তু গৌরব করতে হলে আমরা শিশিরবাবুর এই সমস্ত নাট্যপ্রযোজনার কথাই স্মরণ করি। তিনিই বোধহয় আমাদের নাটমঞ্চের প্রথম সার্থক নির্দেশক। যিনি total theatre-এর কথা চিন্তা করেছিলেন তিনি না থাকলে আমাদের কাজের সুরুই হোতো না। আমরা যে থিয়েটারকে আরো গভীরতর উপলব্ধির ক্ষেত্রে অনুভব করার প্রয়াস পাচ্ছি সেটা বাংলাদেশে শিশিরবাবু total theatre সৃষ্টি করে গিয়েছেন বলেই সম্ভব হচ্ছে। নইলে হোতো না।"

শ্রীমিত্র নিজে দেখেন নি, কিন্তু মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কাছে শুনেছেন, গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকের পুনরাভিনয়ে প্রয়োগ-পরিকল্পনার আরেকটি স্মরণীয় নিদর্শনের কথা। মায়াকাননের দৃশ্যে মঞ্চের একেবারে মাঝখানে স্থাপিত হলুদ, লাল ও কালো রঙে একটা অদ্ভুত বনের 'কাট্-আউট্', পাতাগুলো অস্বাভাবিক মোটা ও লম্বা—একটা 'প্রাইমীভাল' বনের কল্পনা। নায়িকা প্রবীরকে আকর্ষণ করছে রিপুর আকর্ষণে, যৌনচেতনার আকর্ষণে। (বাঙালির মনের সঙ্গে এই তিনটি রঙের সাব্‌কন্‌সাশ্‌ যোগ ও তার অনুষঙ্গ অনুভবের সম্পর্ককে শিশিরবাবু কি কাজে লাগিয়েছিলেন ?) ফলে ঐ কাট্-আউট্‌কে ঘিরে প্রবীর ও নায়িকার চলায় গভীরতর তাৎপর্য এসে গিয়েছিল। কিংবা 'নরনারায়ণে' ওপ্‌ন্ স্টেজ্, পেছনে পর্দা, তাতে কালো-সবুজে একটা মরা রঙ—মঞ্চে একটা পুরনো কাঠের গুঁড়ি; তার গায়ে একটা

রথের চাকা, তার গায়ে হেলান দিয়ে বসে শিশিরকুমার। কিংবা 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের শুরু। মঞ্চের একেবারে গভীরে যেন এক তাঁবুর প্রবেশদ্বার। প্রবেশদ্বারেরও ওধারে নীল আলো, যেন এক খোলা প্রান্তর। যবনিকা উঠতে দেখা যায়, মঞ্চের সেই একেবারে পিছনে এক সান্ত্রী টহল দিচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ টহল দেবার পর হঠাৎ বিউগ্‌ল্‌, নাকাড়া বেজে উঠল; সান্ত্রী দাঁড়িয়ে গেল। ওখান থেকেই শিশিরবাবু ঢুকলেন—যেমন যেমন আসছেন, তেমনি তেমনি দুপাশে আলো জ্বলে উঠছে। সঙ্গে সাদৎ আলি খাঁ। এতক্ষণ অন্ধকারে বোঝা যায় নি, এবার আলো জ্বলে উঠতে দেখা যাচ্ছে, দুধারে ফ্ল্যাট্‌স্‌-এ কানাতের রঙ, তার গায়ে দাঁড়িয়ে আমীর ওম্‌রাহ-রা কুর্নীশ করছে। মঞ্চের সামনে আসতে আসতে শিশিরবাবু প্রশ্ন করতেন: "দিল্লী এখান থেকে একদিনের পথ ?" এই দৃশ্যের পরেই অভিনেতা শরৎ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করেছিলেন: "এর পরে বাংলাদেশে আর অন্য থিয়েটার চলবে ?"

শুধু এই প্রবেশ-পরিকল্পনাই নয়, সমগ্র অভিনয়েই শিশিরকুমারের তীক্ষ্ণ চিন্তার ছাপ পড়ত। এই 'দিগ্বিজয়ী' নাটকেই তাঁর অভিনয়ের কথা বলতে গিয়ে শ্রীমিত্র পত্রান্তরে লেখেন: "চলনভঙ্গী তিনি এমন করেছিলেন যেন দিনের বেশির ভাগ সময় তিনি ঘোড়ার ওপরেই থাকতে অভ্যস্ত। জীবনে আমরা দেখি যে 'জকি'র হাঁটা এবং ধরুন একজন বিচক্ষণ ডিপ্লোম্যাটের হাঁটা এক নয়। কিন্তু নাদির শাহ্‌ অভিজাত-বংশীয় অমায়িক ডিপ্লোম্যাট ছিলেন না, তিনি ছিলেন মেষপালক, যোদ্ধা ও সহজাত বুদ্ধির অধিকারী। তাই তাঁর চলাফেরায় ও ভাবভঙ্গীতে শার্দুলের মতো বন্যতা ও ক্ষিপ্রতা এনেছিলেন শিশিরকুমার। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই চরিত্রের ট্র্যাজেডি ফোটাতে চেয়েছিলেন।" (দ্র. চর্চা ও শিল্পসম্ভোগ, 'সুন্দরম্‌', ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৬৫)।

প্রযোজনার অভিনবত্ব পরবর্তীকালে ততটা সৃজনধর্মী না হলেও শিশিরকুমারের অভিনয়ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল বলেই শ্রীমিত্র মনে করেন—"অনেক পরেও মহর্ষি কখনও কখনও ভাদুড়িমশায়ের অভিনয় দেখে এসে বলেছেন, 'এইবার অ্যাক্‌টিং-টা দেখো'—ভাদুড়িমশাই শেষ পর্যন্ত গলা ভালো রেখেছিলেন।" শিশিরকুমারের অভিনয়শৈলীর কথা বলতে গিয়ে শ্রীমিত্র বলেন, "শিশিরবাবু ন্যাচারালিষ্টিক্‌ অভিনয় করতেন না; তাঁর ধরনটা হেরোইক্‌ অ্যাকটিং-এর।" ঐ প্রসঙ্গে শ্রীমিত্র অপরেশচন্দ্রের 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'-এ

গিরিশচন্দ্রের যোগেশের ভূমিকায় অভিনয় সম্পর্কে আলোচনার উল্লেখ করেন। অপরেশচন্দ্র লিখেছিলেন, সেই অভিনয়ের বর্ণনায়: "শুষ্ক অন্তর্ভেদী স্বর, মমতার সমুদ্র শুকাইয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে উত্তপ্ত বালুকারাশি, তাহাকে নিংড়াইলেও আর এক ফোঁটা জল পাওয়া যায় না!...গিরিশচন্দ্রের এ অভিনয়ে একটা বিরাট অনুভূতির বিকাশ আছে।" অভিনয়ের এই ধারার মধ্যেই শিশিরকুমারের বিকাশ।

শিশিরকুমারের অভিনয়প্রসঙ্গে আলোচনাকালে শ্রীমিত্র অন্যত্র প্রকাশিত তাঁর আরেকটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীমিত্র লিখেছেন: "হেরোইক্ অভিনয়ের কাঠামোর মধ্যে কী করে চরিত্রটাকে জীবন্ত করে তুলতে হয় তা তিনি জানতেন। তাই রামের ভূমিকায় ছন্দের সংলাপের মধ্যে তিনি যেসব দৈনন্দিন কথোপকথনের সুর আনতেন সেটা তদানীন্তন অনেক লোকের ভীষণ খারাপ লাগতো।...কারণ তখন ছন্দের সংলাপে সুরেরই প্রাধান্য ছিল, মানের নয়। গলা দুলিয়ে দুলিয়ে আবৃত্তি করা হোতো।

"শিশিরকুমারের আলমগীর আর নাদির শাহ্, রাম ও রঘুবীর—হেরোইক্ অভিনয়ের যে ব্যাপ্তি তাঁর ছিল তা আর দেখি নি। অনেক অভিনেতা শিশিরবাবুর গোটাকতক মোটাদাগের ভঙ্গি নকল করেছেন, কিন্তু তাঁর অভিনয়ে বাচনের সূক্ষ্মতা লক্ষই করেন নি। আমারও হয়ত লক্ষ হোতো না যদি না পথ দেখাবার মতো গুরুজন থাকতেন। আমি কৈশোরে একজনের কাছে অভিনয় সম্পর্কে প্রচুর শিক্ষা পেয়েছি। বলতে গেলে তিনিই আমার প্রথম গুরু। তিনি বলতেন—ভাদুড়িমশায়ের মুড দ্যাখো যেন সুইচ্‌বোর্ডে বাঁধা আছে। যখনি যে মনোভাব দরকার, তখনই সেগুলো যেন পরপর পটাপট চলে আসছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই গলার মডিউলেশন যেন আপনা থেকে হয়ে যাচ্ছে। এর জন্যে কতখানি প্র্যাক্‌টিস্ আর কতখানি ডিসিপ্লিন দরকার বুঝতে পারো? অ্যাক্‌টিং অমনি হয় না।

"পরলোকগত গায়ক ও অভিনেতা ধীরেন দাস মশায় আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি একদিন বলেছিলেন—বড়দার একটা জিনিস লক্ষ করবেন। একটা পংক্তির মধ্যে যদি পাশাপাশি একটা কোমল অর্থের শব্দ ও একটা কঠোর অর্থের শব্দ থাকে তা হলে তিনি দ্রুত ছন্দে সমস্তটা বলবার মধ্যেই কিন্তু সুস্পষ্টভাবে ঐ দুটো শব্দের ভিন্ন ওজন প্রকাশ করে দেন।

লক্ষ করে শুনবেন।" (দ্র. কিছু স্মরণীয় অভিনয়, 'যুগান্তর', শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭২)।

শ্রীশম্ভু মিত্র বলেন, "ভাদুড়িমশায়ের অভিনয় কিছু স্মরণীয় মুহূর্তমাত্রের অভিনয় নয়। তাঁকে দেখেই আমার প্রথম মনে হয়েছিল, এঁর প্রতিটি কথায় ভঙ্গিতে মানে আছে ; এ মানে বুঝে অভিনয়।"

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' নাটকে পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের উল্লেখ করে শ্রীমিত্র অন্যত্র লেখেন : "এই দৃশ্যের অভিনয়ে অনেক অতুলনীয় গুণের সঙ্গে একটি জিনিস শিশিরকুমার অসামান্য ক্ষমতায় প্রকাশ করেছেন। সে হলো, প্রায় হাস্যকর ভঙ্গি দিয়ে একটি প্রচণ্ড কবিতা রচনা করার পদ্ধতি। একজন পঞ্চাশ বৎসরের লোককে পায়ে মল পরে কথার তালে তালে মঞ্চের ওপর প্রায় নাচতে দেখলাম, 'সংহার সংহার' বলে দুই পা তুলে লাফাতে দেখলাম। এসব স্বাভাবিক নয়, শহুরে নয়, 'সফিস্টিকেটেড্' নয়। কিন্তু এর প্রবল ভীষণতায় আমার মনে হয়েছিল যে আমি মরে গেছি। আমার জীবনে বিরাট শিল্প আমাকে যে কবার মুহ্যমান করে দিয়েছে এটি তার মধ্যে একবার।

"কিন্তু এই দৃশ্য অকস্মাৎ একটি রগ্‌রগে বাটি-চচ্চড়ির মতো পরিবেশন করা হয় নি। এই সংকটকে শিশিরকুমার নাটকের প্রথম থেকে গড়ে তোলেন রঘুবীরের শান্তি দিয়ে, কষ্ট মেনে নেওয়া শান্তি দিয়ে, বিচলিত সহজ শান্তি দিয়ে, বিক্ষুব্ধ অশান্ত মনকে চেপে জোর করে শান্তির কথা বলবার চেষ্টা দিয়ে, নিজের কথায় নিজের সন্দেহ দিয়ে। তবেই হঠাৎ ঝোড়ো সমুদ্রের মতো যখন রঘুবীর উত্তাল এবং উদ্দাম হয়ে ওঠে আমরা আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যাই, আমার নিজের কথা ভেবে, মানবনীতি কি—সেই প্রশ্নের কথা ভেবে।" (দ্র. সুন্দরম্, পূর্বোক্ত সংখ্যা)

পরিশেষে শ্রীশম্ভু মিত্র বলেন :

"কিন্তু এই সমস্ত প্রচণ্ড সুন্দর নাট্যপ্রয়োগ তাঁর জীবনের প্রথম দিকের। প্রায় বলা যায়, প্রথম দশ বারো বৎসরের মধ্যে। তারপরে এই অলৌকিক প্রয়োগ প্রতিভা আর তেমন করে বোধহয় প্রকাশ পায় নি। এটা অবশ্য একেবারেই আমার ব্যক্তিগত কথা। আমার মনে হয়, এসব ক্ষমতা তো প্রকৃতি চিরকালের জন্যে কাউকে দেয় না, তাই শিশিরবাবুর সেই সমস্ত নাট্যসৃষ্টি দেখে আমরা যারা লাভবান হয়েছি তাদের কাছে থিয়েটারের reference-ই বোধহয় আলাদা এরই জন্যে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।"

সত্যজিৎ রায়

[শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক'-এর কাজ এখনও চলছে। তারই মধ্যে একদিন সকালে এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। এক ঘণ্টা আলোচনা হয়। আলোচনার মধ্যেই কিছুটা নোট নিই, বাকিটা স্মৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। প্রশ্নোত্তরের কাঠামোয় এই বিবরণটি লেখার পর শ্রীরায়কে দেখাই। তাঁরই সংশোধিত ভাষ্য এখানে প্রকাশ করা হল।]

প্রশ্ন : আপনি বিভিন্ন উপলক্ষে এক-একটা দেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সেখানকার জাতীয় চরিত্র কিংবা ঐতিহ্যগত কোনো ধারা বা সংস্কার কীভাবে সে দেশের চলচ্চিত্র-সৃষ্টির ধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে, সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ব্রিটিশ ছবি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন, "আমার মনে হয়, ইংরেজরা স্বভাবগত কারণেই মুভি ক্যামেরার সার্থকতম প্রয়োগে অপারগ। ক্যামেরা মানুষকে বাধ্য করে সত্যের মুখোমুখী এসে দাঁড়াতে, মানুষ ও তাবৎ বস্তুকে খুঁটিয়ে দেখতে, তাদের স্পষ্ট করে তুলে ধরতে, তাদের আরো কাছে আসতে। অথচ ইংরেজদের চরিত্রই তার বিপরীতধর্মী, তারা সব-কিছু থেকেই নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করে, রূঢ় সত্যকেও 'সভ্য-জনসুলভ' শ্লেষোক্তি দিয়ে ঢাকে। নিজের মধ্যে এহেন বাধা থাকলে মহৎ ছবি করা যায় না।" [দ্র. Thoughts on the British Cinema, *Hindusthan Standard,* ১৪ জুন, ১৯৬৩]। একই ভাবে 'ওয়েস্টার্ন' চিত্রে আপনি আমেরিকার "নিজস্ব প্রতিভা"র প্রকাশ লক্ষ করেছেন (ইণ্ডো-অ্যামেরিকান সোসাইটিতে আমেরিকার চলচ্চিত্র সম্পর্কে ভাষণে)। জাপানি ছবির অভিনয়ে ও সমগ্র পরিচালনায় নিদারুণ পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলাবোধে এবং "শিল্পীর তুলির মতো আলোর প্রয়োগে", "স্বাভাবিক আলো"র উপর তার নির্ভরতায় আপনি এক বিশিষ্ট জাপানি ধারার প্রমাণ পেয়েছেন [দ্র. Calm Without : Fire Within, *Indian Film Culture*, ৪র্থ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪]। বাংলা ছবির ক্ষেত্রে অমনি কোনো ঐতিহ্য-স্বরূপ ধারা লক্ষ করেন কি ?

উত্তর : যাত্রা ও থিয়েটারের সঙ্গে বাঙালি দর্শকের মনের যোগ এত গভীর যে, বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের আদিপর্বে চলচ্চিত্রের কাছেও দর্শক এই যাত্রা বা থিয়েটারের চিত্ররূপই প্রত্যাশা করেছেন। মফস্বলের যে দর্শকসমাজ কলকাতার থিয়েটার দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাঁদের কাছে চলচ্চিত্র থিয়েটারেরই প্রতিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুরোপুরি থিয়েটার-ঘেঁষা সিনেমা এই দাবি মেটাবারই চেষ্টা করে যায়। রেনোয়া বলতেন, চলচ্চিত্রের প্রকৃতি নির্ণয় করার ব্যাপারে দর্শক একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। যে ধরনের গল্প বা গল্প বলার ঢঙ বাঙালিরা পছন্দ করে (যেমন ধর, শরৎচন্দ্র), তাই পরিবেশন করে যেতে পারলে টিঁকে থাকা যায়, এই ভরসায় চিত্রনির্মাতারাও নিশ্চিন্ত ছিলেন।

থিয়েটার-সিনেমার মৌল প্রভেদ স্বীকারের এই সমস্যা বিদেশেও এসেছিল। একটা নতুন ফর্ম চোখের সামনে গড়ে উঠছে, তার মৌল প্রকৃতিকে ধরতে পারা সহজে সম্ভব হয় নি। তাই গোড়ার দিকে বিদেশেও বহু ছবি একেবারে থিয়েটারেরই চিত্রসংস্করণ হিসেবে রচিত হত। গ্রিফিথ্ ও আইজেন্‌স্টাইন্ সম্পূর্ণ 'ইন্‌স্টিঙ্কটিভলি' এই মৌল চরিত্র উপলব্ধি করেছিলেন : বলতে পারি, একা গ্রিফিথ্-ই, কারণ আইজেন্‌স্টাইন্‌ও গ্রিফিথের কাছে ঋণস্বীকার করেছিলেন।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র অনেক আগেই এসেছিল। অথচ এই ফর্মের স্বাতন্ত্র্য অনুধাবন করার চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। নিউ থিয়েটার্সের আমলেও যা ঘটেছিল, তা আসলে 'সুপারফিশিয়ালি' কিছু মার্কিন টেক্‌নিকের আমদানি ; 'ক্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান্‌শিপ্'-এর ব্যাপার ; ক্যামেরার ব্যবহারে, কাটিঙ্ ও মুভ্‌মেণ্টে কিছু অভিনবত্ব। সংলাপে বা অভিনয়ের রীতিতে তখনও থিয়েটারের প্রভাব বজায় ছিল।

বাংলা চলচ্চিত্রের এই গতানুগতিকতা বোধহয় বিমল রায়ই প্রথম অনুভব করলেন। বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে 'উদয়ের পথে'-ই প্রথম নব পদক্ষেপ। রাধামোহন ভট্টাচার্য ও বিনতা রায় থিয়েটার থেকে আসেন নি—তাঁদের অভিনয়ে চলচ্চিত্রের স্বভাবজ 'আণ্ডার-অ্যাক্টিঙ' দেখা গেল। ছবিতে সমাজচেতনার ছাপ পড়ল। বাংলা ছবি

কোন্ দিকে যেতে পারে, তার কোনো দিক্‌চিহ্ন 'উদয়ের পথে'-র আগে আর কোনো ছবিতে ধরা পড়ে নি।

প্রশ্ন : আপনি বহুবার উত্তর দেওয়া সত্ত্বেও আপনার ছবি সম্পর্কে একটা প্রশ্ন বারে বারেই উঠছে : মূল রচনার প্রতি আপনার চিত্রকর্মের আনুগত্যের প্রশ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক চিত্রনাট্য অবলম্বনে চিত্রনির্মাণের কথা ভাবছেন কি ? অগ্রণী চিত্রপরিচালকেরা (যেমন বার্গম্যান বা আন্তনিওনি) তো অনেকেই মৌলিক চিত্রনাট্য নিয়েই কাজ করে যাচ্ছেন !

উত্তর : আমি এখন থেকে আরো বেশি নিজের গল্পের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করব। মৌলিক চিত্রনাট্য লেখার প্রয়োজন খুব বেশি করেই অনুভব করছি। সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের মৌলিক প্রভেদ উপলব্ধির অক্ষমতার সঙ্গে দর্শকদের রেস্‌পন্‌স্‌-এর প্রশ্নও জড়িয়ে থাকে। দর্শকরা মূল গল্প পড়ে তার চিত্ররূপের যে প্রত্যাশা নিয়ে আসেন, আমার ছবি দেখে সে প্রত্যাশা মেটার সম্ভাবনা কমই।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় কোনো গল্পই অল্পবিস্তর পরিবর্তন না করে চিত্রায়িত করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা এত ভালো লাগে, অথচ ছবি করতে গেলে দু' এক জায়গায় খট্‌কা লাগে। যেমন ধর, "দেবী চৌধুরানী" উপন্যাসে সাগর ও ব্রজেশ্বরের ঝগড়ার সময়ে হঠাৎ জানলার ওপাশে প্রফুল্লের আবির্ভাব : "সাগরের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে পিছনের জানালা হইতে কে বলিল, 'আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মতো টিপিয়া দিবে।' সাগরের মুখে সেই রকম কি কথা আসিতেছিল। সাগর না ভাবিয়া চিন্তিয়া, পিছন ফিরিয়া না দেখিয়া, রাগের মাথায় সেই কথাই বলিল—'আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মতো টিপিয়া দিবে'।" এখানে প্রশ্ন থেকে যায় : প্রফুল্ল হঠাৎ এখানে কোথা থেকে এল ? কেনই বা এল ? ছবিতে এই আবির্ভাব কিছুতেই 'কন্‌ভিন্‌সিং' হতে পারে না, এমন কি দর্শকের কাছেও না। অথচ একে কনভিনসিং করতে গেলে নতুন দৃশ্যের অবতারণা করতে হয়—আর তখনই দর্শক-সমালোচক বলে ওঠেন : 'কই, এ দৃশ্য ত বঙ্কিমে ছিল না!' বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্লট্-লাইন' এত স্পষ্ট যে, যে-কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্জন দর্শকদের ধাক্কা দেবেই।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীমহল নালিশ তোলেন, এক্ষেত্রে সাধারণ দর্শকেরাও নালিশ তুলবেন।

অবশ্য মৌলিক চিত্রনাট্যের কথা ভাবতে গিয়েও একটা সমস্যায় সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের 'রেঞ্জ'-এর অভাব একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভালো পার্ট লেখার কোনো মানে হয় না যদি না সে পার্টে অভিনয় করার মতো লোক থাকে। ছবি বিশ্বাসের মৃত্যুর পর ওই স্তরের মধ্যবয়সী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অভিনেতার অভাব দেখা যাচ্ছে; ঐ বয়ঃসীমায় ভালো অভিনেত্রীরও অভাব। বিদেশে পরিচালকেরা প্রায়ই বিশেষ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কথা মনে রেখেই চিত্রনাট্য রচনা করেন। ভিক্টর সিওস্ট্রম্-এর মতো অভিনেতা হাতের কাছে না থাকলে হয়ত বার্গম্যানের 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ' তৈরিই হত না। বার্গম্যান তাঁর নিজের অভিনেতৃগোষ্ঠীর কথা মনে রেখেই তাঁর ছবির পরিকল্পনা করেন।

কিন্তু সেদিক থেকে আমার চিন্তার সুযোগ অনেক সীমিত। শৌখীন থিয়েটারে একটা বিশেষ বয়ঃসীমায় বেশ কিছু ভালো অভিনেতা দেখা দিয়েছেন। কিন্তু অন্য বয়সের অভিনেতা কোথায়? তাছাড়া এই থিয়েটারের শিল্পীরাও যে সব সময়ে ক্যামেরার সামনে উত্রোবেন এমন কোনো কথা নেই।

প্রশ্ন : সিনেমার উপর ব্যবসায়িক চাপ যেভাবে বাড়ছে, তাতে তার শৈল্পিক সম্ভাবনা ব্যাহত হচ্ছে না কি? আপনি কীভাবে এই বাধার সঙ্গে লড়ছেন?

উত্তর : নিজের টাকায় ছবি করতে পারলে অন্য কথা। কিন্তু অন্যের টাকা নিলেই একটা বিশেষ দায়িত্ববোধ এসে পড়ে; কত দর্শককে টানতে পারব, সেই ভাবনা এসে পড়ে। ছবি করার অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চাহিদা সম্বন্ধেও একটা ধারণা ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। এখন অবশ্য এমন অনেক প্রযোজক আছেন, যাঁরা অন্য ছবিতে অনেক টাকা তুলেছেন, এখন কিছুটা 'প্রেস্টিজ' চান। আমি এঁদের অনেক সময় 'এক্স্‌প্লয়েট' করি। আমি এঁদের বলি, "আমার ছবি বক্স্-অফিসে উত্রোবে কিনা গ্যারান্টি দিতে পারি না,

তবে পুরস্কার পেলেও পেতে পারে।" অনেক সময় একটু off-beat ধাঁচের গল্প বাছলে নাম-করা কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী নিয়ে সামলে নিতে হয়—এমনি একটা হিসেব সব সময়ই করে যেতে হয়। অবশ্যি আমার ছবি বিদেশ থেকেও কিছুটা টাকা আনে। দেশ-বিদেশের বাজার মিলিয়ে আমার প্রায় সব ছবির খরচা উঠে গেছে। বিদেশের বাজার না থাকলে আমার এ-লাইনে বেশিদিন টেঁকা সম্ভব হত কিনা জানি না। বিদেশ সম্বন্ধেও চিন্তার কারণ আছে। ওদেশের সমালোচনা থেকে মাঝে মাঝে মনে হয় যে বাঙালির জীবনের ছোট ছোট সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো ওরা ধরতে পারে না। তাই 'চারুলতা' সম্পর্কে কেনেথ্ টাইনানের মতো সমালোচকও অতিরিক্ত সংযমের নালিশ তুলেছেন; আমাকে হয়ত গোঁড়া রক্ষণশীল ভেবে বসেছেন। অথচ আমি অমল ও চারুর সম্পর্কের যেটুকু দেখিয়েছি, সেটুকুই বাংলাদেশের মানুষের কাছে কতখানি, তা টাইনান বুঝবেন কী করে? আমাদের জীবনের মৌলিক সামাজিক চেহারা ও জীবনধারার ধরন না জানা থাকায় ওরা ছবির অনেক সূক্ষ্ম দিকই ধরতে পারছে না।

প্রশ্ন : ১৯৬২-তে ফ্র্যাঙ্ক পেরি ও এলীনর পেরি যেভাবে নিজেরা টাকা তুলে মাত্র পঁচিশ দিনের শুটিঙে অত্যন্ত সস্তায় 'ডেভিড ও লিজা'র মতো ছবি তোলেন, এ ধরনের ছবির কি সত্যিই কোনো সম্ভাবনা আছে?

উত্তর : ঐ জাতীয় ছবি একান্তই 'একসেপশনল্'। আব্বাসও তো প্রায় ঐভাবেই 'শেহর ঔর স্বপ্ন' তুলেছিলেন। কিন্তু আগেই রাষ্ট্রপতির পুরস্কার না পেলে সেই ছবি কি আদৌ মুক্তি পেত? হল-মালিকদের অনেক রকম খেয়াল আছে। আমার ছবির ব্যাপারই দেখ না। দিল্লীতে রবিবার সকালের শো ছাড়া আমার ছবির কোনো নিয়মিত ব্যবসায়িক শো হয় না। বোম্বাইয়ের একটি হলের মালিক তাঁর হলটিকে 'আর্ট থিয়েটার' বলে দাবি করেন। একমাত্র তিনিই বোধ হয় 'অভিযান' থেকে শুরু করে আমার সব ছবিরই নিয়মিত ব্যবসায়িক শো করেছেন, তা-ও এক সপ্তাহ কি দু' সপ্তাহের 'ফিকস্‌ড্ বুকিঙ'-এ। এই ব্যবসায়িক কাঠামোর মধ্যে ও ধরনের নতুন ছবির মুক্তি পাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

প্রশ্ন : এ দেশে ফিল্‌ম্‌ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠায় চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে বলে মনে করেন কি ?

উত্তর : আসলে অন্য যে-কোনো আর্ট-ফর্মের মতোই গূঢ়, অর্থাৎ শিল্পের দিকটা চলচ্চিত্র নির্মাণের ইস্কুলে শেখানো যায় না। অর্থাৎ ফিল্মের ডিপ্লোমা পেলেই বড় ফিল্ম পরিচালক হওয়া যায় না। বড় জোর কিছু 'ফাণ্ডামেণ্টালস্‌' অনেকটা কম সময়ে শিখিয়ে দেওয়া যায়—তার বেশি একটা ফিল্‌ম্‌ স্কুল আর কী দিতে পারে ? পোলাণ্ড ছাড়া আর কোনো দেশেই ফিল্‌ম্‌ স্কুলের ছাত্রেরা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ছাপ রাখতে পারে নি। চলচ্চিত্র নির্মাণ যদি শিখতেই হয়, তবে তার সঙ্গে আরো অনেক কিছুই শিখতে হয়—দেশের ইতিহাস অর্থনীতি থেকে শুরু করে অন্য যাবতীয় আর্ট ফর্ম পর্যন্ত, কারণ চলচ্চিত্র নির্মাণে এ সবেরই স্থান আছে। আইজেনস্টাইন যে পবিকল্পনা করেছিলেন, তাতে হয়ত কিছুটা হতে পারত। কিন্তু তাতেই বা কী হল ? আইজেন্‌স্টাইনের স্কুলের শিক্ষায় ক'জন বড় পরিচালককে পেলাম ?

প্রশ্ন : এবার শুনলাম, বুন্যুয়েলের সঙ্গে আপনার আলাপ হল ?

উত্তর : হ্যাঁ, বেশ কয়েকদিন কথা হল। ওঁর ছবি নিয়ে বিশেষ আলোচনা করা গেল না। কারণ, ওঁর সেরা ছবিগুলোর অধিকাংশই আমি দেখবার সুযোগ পাই নি। 'আর্চিবাল্ডো' আমার তেমন ভালো লাগে নি। বছর পনের আগে গ্লোব-এ 'রবিন্‌শন্‌ ক্রুসো' দেখেছিলাম—দারুণ লেগেছিল—ক্রুসো ও ফ্রাইডে যেন বই থেকে জীবন্ত উঠে এসেছে। দেখলাম, ফরাসী নবতরঙ্গ সম্পর্কে বুন্যুয়েলের তীব্র বিরাগ ; উনি ফেল্লিনি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান। বুন্যুয়েল বললেন, উনি পরিচালক সম্পর্কে 'ইণ্টেরেস্টেড্‌' নন, ছবি সম্পর্কে আগ্রহী। তাই আমাকে বললেন, "তোমার 'পথের পাঁচালি' 'অপরাজিত' ভালো লেগেছে, 'চারুলতা' না-ও ভালো লাগতে পারে ; তাতে অবাক হয়ো না।"

প্রশ্ন : টোয়েপ্‌লিট্‌জ-এর লেখায় পোলিশ চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে একটা দিক-পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে [দ্র. Film at the Crossroads

Polish Perspectives, মার্চ, ১৯৬৫]। আপনি সম্প্রতি কিছু পোলিশ ছবি দেখেছেন কি ?

উত্তর : পোলানস্কির ব্রিটেনে তোলা 'রিপাল্‌শন্‌' দেখেছি। দেশ ছেড়ে বাইরে এসে এই ধরনের ছবি তোলার ব্যাপারটা পোলান্‌স্কির উপরই একটা 'রিফ্লেকশন'। আমার মনে আছে, বছর কয়েক আগে বিশ্ব যুব-উৎসবে মুঙ্ক আমাকে গর্ব করে বলেছিলেন, চলচ্চিত্র নির্মাণে এতটা স্বাধীনতা পোলাণ্ডের বাইরে পৃথিবীতে আর কোনো দেশে নেই। এবার আমাদের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ওয়াইদার সঙ্গে আলাপ হয়। দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলছেন, এই আশঙ্কায় তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত দেখেছিলাম, আমাকে 'ইনোসেণ্ট্‌ সোর্সারার্স্‌' দেখতে বারণ করেছিলেন : "ইট্‌স্‌ এ ব্যাড্‌ ফিল্‌ম্‌, ডোণ্ট্‌ সী ইট্‌।"

প্রশ্ন : এবার বাইরে বিদেশী ছবি কী দেখলেন ?

উত্তর : বন্দারচুকের 'ওয়র অ্যাণ্ড্‌ পীস্‌' দেখলাম। যেখানেই অভিনয়ের জায়গা, ছবি জমে ওঠে। নাটাশা অপূর্ব। কিন্তু সমগ্র 'অর্গানিজেশন'টা গোলমেলে। ফরাসী নিউ ওয়েভের নানা 'ডিভাইস্‌', বিশেষত হ্যাণ্ড ক্যামেরার ব্যবহার, এই কাহিনীর ক্ষেত্রে একেবারেই মানায় না। কুরোসাওয়ার নতুন ছবি 'রেড্‌ বীয়ার্ড'-এর প্রথমার্ধ দারুণ ভালো লেগেছে।

লক্ষ করলাম, বিদেশের যেসব দেশ একরকম 'স্টেবিলিটি'তে পৌঁছে গেছে, তাদের ছবি করতে গিয়ে সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্তরের সমস্যা নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে—যেমন বার্গম্যানের 'সাইলেন্‌স্‌'। কণ্ট্রাস্ট্‌ ছাড়া, নাটক ছাড়া ছবি হয় না—এটা সব বড় আর্ট-ফর্মেরই বিধি। 'ডিক্লাস্‌ড্‌' শ্রমিকের সমস্যা হাতে পেয়ে ব্রিটেনের সুবিধে হয়েছিল, তবে এবার তা-ও ফুরিয়ে এসেছে। সেদিক থেকে আমাদের দেশে সমস্যার অভাব নেই। কিন্তু সব কিছু নিয়ে ছবি করবার স্বাধীনতা কোথায় ? 'পরশপাথর' দেখে তদানীন্তন সেন্সর বোর্ড আমাকে বলেছিলেন ফিল্মের উপর তুলি বুলিয়ে তুলসীবাবুর গান্ধীক্যাপ কালো করে দিতে।

অমলাশঙ্কর

শ্রীমতী অমলাশঙ্করের সঙ্গে দেখা করি রবিবার সকালে রবীন্দ্রসরোবর প্রেক্ষাগৃহের দোতলায় উদয়শঙ্কর কাল্‌চারাল সেণ্টারের শিক্ষাগৃহে। শ্রীমতী শঙ্কর তখন নিজেই শেখাচ্ছেন। শেখাবার ধরন আশ্চর্য অভিনব—সবচেয়ে ছোটরাও সাধ ও কল্পনার উপর নির্ভর করে হস্তকর্ম ও পাদচারণভঙ্গি রচনা করে। পরে বড়রাও গোল হয়ে ঘিরে হাঁটতে হাঁটতেই নিজেরা ছন্দ সৃষ্টি করে। সেই ছন্দ মৃদঙ্গ তুলে নেয়; তারপর বাহুভঙ্গি আসে, তারপর মুদ্রা, গ্রীবাভঙ্গি; খণ্ড খণ্ড উপাদান ছন্দবোধ ও স্বাভাবিক অনুভবের টানে একটি নৃত্ত রচনা করে। শিল্পীরা একই সঙ্গে দর্শকদের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন অথচ অবিচল থাকতে শেখেন, মনের চলন ও দেহের চলনের দৃশ্যমান ঐক্য রচনার সাধনায় নামেন। এই শিক্ষণপদ্ধতি ইম্‌প্রোভাইজেশনের স্বতঃস্ফূর্তির সুযোগ রচনা করে, নৃত্য ও নৃত্ত উভয়েরই মধ্যে সৃষ্টির চেতনা এনে দেয়, ব্যাকরণের নিয়মরক্ষার চেয়ে সর্বাত্মক ইন্‌ভল্‌ভ্‌মেণ্ট্‌-কে বড় বলে মানে। এই শিক্ষণপদ্ধতির ক্রিয়েটিভ্‌ সম্ভাবনা ভারতীয় নৃত্যকলাকে ভবিষ্যতে নতুন রূপ দিতে পারে বলে ভরসা হয়। পরে যখন এই শিক্ষণপদ্ধতি নিয়ে কথা ওঠে, শ্রীমতী শঙ্কর বলেন, আলমোড়ায় উদয়শঙ্করের কাছেই এই শিক্ষণপদ্ধতির সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তিনি বলেন, "শিল্পীর সর্বদেহে প্রাণ বইবে, একেবারে তার আঙুলের ডগা পর্যন্ত প্রাণ স্পন্দিত হবে; লতা যখন দোলে, তখন তাকে কি বলে দিতে হয়, সে কীভাবে দুলবে? হাওয়া যেমন লতাকে দোলায়. তেমনি মনের ভাব, অনুভূতি দোলায় দেহকে। দেখলেন না, আমি শুধু একটা হাত তুলে একটা বাহুভঙ্গি দিলাম, আর কিছুই বলে দিলাম না, তবু ওরা সকলেই একই দিকে 'বেণ্ড্‌' করল? আমি যে জানি, দেহ তার সাধকে আপনা থেকেই অনুসরণ করবে, তার ফর্ম-এর সাধকে তৃপ্ত করবে।"

প্রায় তিরিশ বছর ধরে নৃত্যকলার সঙ্গে শ্রীমতী অমলাশঙ্করের ঘনিষ্ঠ যোগ। প্রশ্ন করলাম, "এতদিন ধরে তো দেখলেন, এই এক কলারূপে ডুবে থাকলেন, এই এতদিনের মধ্যে দর্শকদের কতটা বদলাতে দেখলেন?" শ্রীমতী শঙ্কর বললেন, "নৃত্যকলা আজ ছড়িয়ে পড়েছে, আরো বেশি লোক দেখতে আসছে। কিন্তু আগে যে কয়েকজন সমঝদার সমালোচক পাওয়া যেত, আজ আর তাঁরা কোথায়ও নেই। সম্পূর্ণ ইম্‌পার্শিয়ালি শিল্পের অনুভব নিয়ে, আঙ্গিকের জ্ঞান নিয়ে, ফর্ম-এর বোধ নিয়ে কড়া সমালোচনা করবেন, এমন লোক

কোথায়? এমন সমালোচক দর্শকদের মধ্যে না থাকলে শিল্পীই বা কেমন করে তাঁর সর্বশক্তি ঢেলে দেবার তাগিদ অনুভব করবেন? তাই বলি, শার্প্‌ ক্রিটিসিজম্‌ চাই। ব্যালে ডান্সার ও ক্যাবারে ডান্সার, দু'জনেই তো নাচিয়ে—কিন্তু ওদেশে তো কখনও দু'জনকে নিয়ে একসঙ্গে লেখে না! অথচ এদেশে তো কার্যত তা-ই হয়।" ঐ প্রসঙ্গেই য়োরোপে ও আমেরিকায় ভারতীয় নৃত্যকলার সমালোচনার কথা উঠল। শ্রীমতী শঙ্কর বললেন, অতীতে জন মার্টিনের মতো সমালোচকও ভারতীয় নৃত্যকলায় অনির্বচনীয় আনন্দের কথা বলেছেন তার চেয়ে গভীরে যেতে পারেন নি। তখন এক উদয়শঙ্করের কাছেই তাঁরা ভারতীয় নৃত্যের পরিচয় পেয়েছেন। তারপর আরো অনেকে গেছেন; এখন ওখানকার সমালোচকেরাও ভারতীয় নৃত্যের আঙ্গিক ইত্যাদি সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে উঠেছেন, আরো খুঁটিয়ে আলোচনা করছেন।

শ্রীমতী শঙ্করের অনুযোগ, বৃহত্তর সুযোগ ও প্রতিশ্রুতির মধ্যেও শিক্ষাদানের ত্রুটি ভারতীয় নৃত্যকলার প্রসার ও বিকাশের সম্ভাবনার পথে প্রতিবন্ধক—"দেখবেন, একটা মেয়ে তিন বছর ধরে প্রচণ্ড খেটে নাচ শিখছে। তার মা-বাবাও 'সিন্‌সীয়ারলি' চেয়েছেন, মেয়ে ভালো করে নাচ শিখবে, অথচ, মাস্টার ফাঁকি লাগায়—কে ধরবে সে ফাঁকি?—সব নষ্ট হয়ে গেল।" নৃত্যের অনেকটাই শিক্ষার ভিতর দিয়ে ধরিয়ে দেওয়া যায়—"তারপরে যা, সে তো ভগবানের দান—বালসরস্বতীর সঙ্গে কি আর কারো তুলনা চলে?" আবার নৃত্যশিক্ষার কথায় ফিরে গিয়ে শ্রীমতী শঙ্করকে স্মরণ করিয়ে দিই, ১৯৩৫ সালে ভাল্লাথলের উদ্যোগে যখন কেরল কলামণ্ডলম্‌ কথাকলির পুনঃপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করছে, তখনই শ্রীউদয়শঙ্কর লিখেছিলেন, "ত্রিবাঙ্কুরে এবং অন্যত্র আমি অনেকবার একটা প্রশ্ন শুনেছি: যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কথাকলি অনুষ্ঠানে কিছু পরিবর্তন ও কিছু নতুনত্ব প্রবর্তনের ঔচিত্য সম্পর্কে। আমি বলি, যে-কোনো পরিবর্তনই হবে এই নৃত্যকলার মৃত্যুশেল" (দ্র. The Four Arts Annual, Calcutta, 1935)। শ্রীমতী শঙ্করও এই মতে বিশ্বাসী: অথচ গুরুগৃহে একনিষ্ঠ শিক্ষার রীতি লুপ্ত; ফলে এইটুকু আপস করতে হয়েছে, ধ্রুপদী নৃত্যকলার যে তিনটি ধারাকে শ্রীমতী শঙ্কর তাঁর পাঠক্রমে স্থান দিয়েছেন, তার কোনোটিই সমগ্রভাবে শেখানো সম্ভব না হলেও যেটুকু শেখানো হবে, তার শুদ্ধতা নিঃসংশয়িত। শ্রীমতী শঙ্কর নৃত্যগুরু রূপে সহযোগী পেয়েছেন কথাকলি নৃত্যে শ্রীউদয়শঙ্করের দীর্ঘদিনের সহযোগী

শ্রীরাঘবন, ভরতনাট্যম্‌-এ শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ও মণিপুরী নৃত্যে গুরু আমুবীর শিষ্য তরুণ সিং। প্রায় আশি বছরের বৃদ্ধ স্বয়ং গুরু আমুবীকেই শ্রীমতী শঙ্কর আহ্বান করেছিলেন। গুরু আমুবী দুঃখ করে জানালেন, বয়স বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই শিষ্যকে পাঠাচ্ছেন। প্রায় কোনো অর্থসংস্থান ছাড়াই যে শিক্ষাকেন্দ্রের সূত্রপাত হয়েছিল, বছরখানেকের মধ্যেই তা দাঁড়িয়ে গেছে। প্রথম কয়েকমাস তো নৃত্যশিক্ষকেরা কোনো পারিশ্রমিক নেন নি, অথচ তাঁদের কাজে কখনও ফাঁক পড়ে নি। শিল্পের প্রতি তন্নিষ্ঠ অনুরাগের এই টানেই শিক্ষক ও ছাত্রীদের মধ্যেও গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক ; শিক্ষাদানকালে শিক্ষার্থিনী ছাত্রীরাই যেমন পরস্পরের ভুল ধরিয়ে দিতে অভ্যস্ত, তেমনি প্রয়োজনবোধে গুরুর ভুল ধরতেও ভয় পান না। শ্রীমতী শঙ্কর একদিনের কথা বললেন : "আমার ঘাড় 'ষ্টিফ্‌' ছিল, আমি বুঝতে পারি নি, ওরা ধরিয়ে দিল।"

ভারতীয় নৃত্যকলার ভবিষ্যতের কথা বলতে গিয়ে শ্রীমতী শঙ্কর বললেন, "জমি তৈরী, বীজ তৈরী, ফুল ফোটাবার লোক নেই।" সেই ফুল ফোটাবার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীমতী শঙ্কর। ফলে, "নিজে অনুষ্ঠানে নাচবার কথা আর ভাবতেই পারি না। মনটা একদম বদলে গেছে, এখন এদেরই নিয়ে আমার সব ভাবনা।" এই শিক্ষাকেন্দ্রের ক্ষুদ্রতায় শ্রীমতী শঙ্কর সম্পূর্ণ তৃপ্তি পান না, শ্রীউদয়শঙ্কর তো আরো অতৃপ্ত থাকেন। আলমোড়ার স্মৃতি থেকেই শ্রীমতী শঙ্কর ভাবেন, "যদি নদীর ধারে চল্লিশ বিঘা জমি থাকত, খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘর, চাষবাস চলত, সেখানে নাচ প্রাণ থেকে উঠে আসত!" সেই আর্তি সত্ত্বেও নতুন শিক্ষাপদ্ধতির পরীক্ষায় তিনি দায়িত্ববোধে অটল থাকতে পারেন : "চলতে হবে, এইটুকু জানি। যদি কিছু দেবার থাকে, গাছতলায় বসেও দিতে পারি, তাতে কোনো লজ্জা নেই। আমি হতাশ হইনি, 'ইম্‌পেশেণ্ট্‌' নই।"

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃণাল সেন

চলচ্চিত্রে সমকালীনতা

চলচ্চিত্রে সমকালীনতা বা Contemporaneity নির্ধারিত হবে কি ভাবে? টাটকা কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা নিয়ে ছবি তুললেই কি তাকে সমকালীন বলা হবে? না, ব্যবহার্য উপাদানের প্রতি চিত্র-নির্মাতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সমকালীনতা নির্ণীত হবে?

চলচ্চিত্রানুরাগীদের অনেকেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করে ফেলেন অতি সহজেই: ট্রাম বাস হাল মডেলের মোটর গাড়ি ও মাথার উপর বিদ্যুৎ-চালিত পাখা থাকলেই তা একালের, আর পাইক বরকন্দাজ লাঠিয়াল ও মাথার উপর ঝাড়লণ্ঠন ঝুললেই তা সেকেলে। মোটামুটি এই সাদাসিধে ধারণা নিয়েই অনেকে একাল আর সেকালের তফাৎটা বুঝে নেন। কিন্তু বিষয়টা অত সহজ না।

একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হবে না এমন একটা ঘটনা এখানে তুলে ধরা যাক:

অ্যাণ্ড্রোক্লিস ও সিংহের গল্প আজকের নয়, অজানাও নয়। গল্পটি প্রাচীন ও অতি পরিচিত। সেই গল্প নিয়ে বর্ণার্ড শ' একটা নাটক লিখলেন, নাম Androcles and the Lion. নাটকটি যখন জার্মানীর কোথায়ও মঞ্চস্থ হয়—খুব সম্ভবত বার্লিনেই—তখন এক ডাকসাইটে রাজপুরুষ অভিনয় দেখতে দেখতে এতই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে নাটক শেষ হওয়ার আগেই একসময়ে তিনি হল থেকে বেড়িয়ে যান। শ' শুনে আশ্বস্ত হয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'যাক্, ভদ্রলোক তা হলে আমাকে বুঝতে পেরেছেন!' সঙ্গে-সঙ্গে এ কথাও তিনি জানিয়ে দিতে ভোলেন নি যে, যে-দেশটিকে সামনে রেখে তিনি ঐ নাটকটি লিখেছিলেন সেই দেশ ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে অবস্থিত নয়, এ পারেই।

ঘটনাটি মজার এবং আমার এই আলোচনায় অবশ্যই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সিংহের পা থেকে কাঁটা তুলে দেওয়ার সেই প্রাচীন গল্প। এবং সিংহটি

অকৃতজ্ঞ নয় বলেই পরে এক নাটকীয় মুহূর্তে যখনই সে অ্যাণ্ড্রোক্লিসকে চিনতে পারলো তখন আর তার উপর হামলে পড়লো না, কাছে এলো, কৃতজ্ঞতা জানালো, লেজ নাড়লো, গা চেটে দিল। কিন্তু তাই দেখে এ-যুগের এক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন রাজপুরুষ ক্ষেপে উঠবেন কেন? এবং ক্ষেপে গিয়ে সমস্ত শালীনতা বিসর্জন দিয়ে বেরিয়েই বা আসবেন কেন?

নিশ্চয়ই ভদ্রলোক ক্ষেপেছিলেন inquisition-এর দৃশ্যে যেখানে দেখানো হয়েছে কি ভাবে বিচারের প্রহসনের মধ্য দিয়ে শাসক তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে যে-কোনো বিরুদ্ধনীতি, বিরুদ্ধ মত অথবা যে-কোনো নতুন বিশ্বাসকে নস্যাৎ করে দিতে বদ্ধপরিকর। এই হল নাটকের কেন্দ্রবিন্দু, শাসকের নোংরা অস্বাস্থ্যকর এই চেহারাটা তুলে ধরাই হল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। এবং এখানে এসেই গোটা কাহিনীটি একটা তাৎপর্য পেল। সঙ্গে-সঙ্গে নাট্যকার যা চেয়েছিলেন তাই হল—নাটকের মধ্যে এ-যুগের এক শাসক-প্রতিনিধি নিজেকে দেখতে পেলেন, শাসনযন্ত্রের কদর্য রূপটি তাঁর চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে উঠলো, রঙ্গমঞ্চে এতগুলো লোকের সামনে তা তাঁকে বিদ্রূপ করতে লাগলো এবং শেষপর্যন্ত ভয়ে রাগে ও লজ্জায় ভদ্রলোক পালিয়ে বাঁচলেন ও এ-যুগের নাট্যকার শ' আশ্বস্ত হলেন। যাঁরা রাজপুরুষটির সঙ্গে বেরিয়ে এলেন না, শেষপর্যন্ত নাটকটি উপভোগ করলেন, তাঁরা নিজেদের এবং চারপাশের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেই প্রাচীন গল্প আর আজকের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিতরে কোথাও একটা যোগসূত্র খুঁজে পেলেন।

এই যোগসূত্রকেই ঔপন্যাসিক হাওয়ার্ড ফাস্ট-ও তাঁর শিল্পকর্মে বারবার তুলে ধরেছেন। এবং এই সত্যটিকেই তিনি বলেছেন ancient consistency of mankind. যীশু খ্রীষ্টের জন্মের চারশ বছর আগেকার বিদ্রোহী ক্রীতদাস স্পার্টাকাস-কে নিয়ে ফাস্ট উপন্যাস লিখলেন, পুরনো ঘটনাকে নতুন করে বললেন, ইতিহাসের এতটুকু বিকৃতি না ঘটিয়ে এ-কালের শ্রেণীসংগ্রামী মানসিকতা দিয়ে প্রাচীনকালের সেই সংগ্রামকে ও সংগ্রামী চরিত্রকে বিশ্লেষণ করলেন এবং শিল্পসম্মত ঢং-এ রূপ দিলেন।

এবং একই ভাবে খ্রীষ্টের জন্মের দেড় শ' বছর আগে তদানীন্তন গ্রীক-সিরীয় শাসনের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় ইহুদি কৃষিজীবীর লড়াই ও মুক্তির অলিখিত ইতিহাসকে ফাস্ট একালীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করলেন My Glorious Brothers উপন্যাসে।

শ' তাঁর নাটকে ধর্মীয় বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন গল্পকে বিচার করলেন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। থিয়োলজি নিয়ে মাথা ঘামান নি তিনি, সিংহের কৃতজ্ঞতাবোধ নিয়ে পাতাও ভরান নি। তিনি প্রাচীন ও অতি প্রচলিত একটি গল্পকে অবিকৃত রেখেই সেই উপাদানের মধ্য দিয়ে আধুনিক শাসনব্যবস্থার কুৎসিত রূপটিকে তুলে ধরলেন। ফলে, নাটকে আজকের কথা বিধৃত হল এবং এ-কালের দর্শক নাটকের মধ্যে এ-কালের পৃথিবীকে আবিষ্কার করলেন।

ফাস্টের উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হল। প্রাচীন ইতিহাস অক্ষতই রইলো, কিন্তু যে-উপাদান দিয়ে সেই ইতিহাস তৈরি হয়েছিল উপন্যাসে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করা হলো শিল্পীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, শিল্পী ancient consistency of mankind আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন এবং পাঠক দেখলেন এ যেন আজকেরই সংগ্রামের কাহিনী—ব্যক্তির ও সমষ্টির।

কিন্তু চলচ্চিত্রে যে Spartacus-টিকে দেখতে পাওয়া যায় শিল্পীর সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে নেহাৎই জাঁকজমকে ভরা সে যুগের একটি অতি সীমাবদ্ধ গল্প—শুধুই গল্প যার অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই, ইতিহাসের অনিবার্যতার কোনো লক্ষণ নেই, যার সবটাই স্থূল শারীরিকতায় উপস্থাপিত। যাতে আত্মার আমেজ নেই এতটুকু এবং অধুনা এ-দেশীয় সাহিত্যে তথাকথিত ইতিহাস-আশ্রয়ী গল্পে উপন্যাসে নাটকে যার দৃষ্টান্ত অজস্র। অথচ চিত্র-নির্মাতার যদি ইতিহাসের সেই বোধ থাকত, যদি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থাকত তাহলে আজকের দর্শক হয়তো নিজেকে ভিড়িয়ে দিতে পারতেন ছবির মধ্যে, ওরই মধ্যে হয়তো প্রত্যক্ষ করতেন নিজের অভিজ্ঞতাকে এবং চারপাশের চেনা জগৎটাকে।

তাই বলব, পুরনো বা টাটকা ঘটনা বলে নয়—যে-কোনো ঘটনা, যে-কোনো গল্প, যা কিছু আজকের মানুষকে আজকের কথা মনে করিয়ে দিতে পারবে, আজকের কথা ভাবিয়ে তুলবে, আজকের বস্তুজগতের সঙ্গে একটা যোগসূত্র খুঁজে বার করতে সাহায্য করবে তাই সমকালীন বলে নির্ণীত হবে। শুধুমাত্র আজকের ব্যবহারিক জীবনের উপাদান দিয়ে তৈরি কাহিনীই নয়, যে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা, পৌরাণিক ধর্মীয় বা অ-ধর্মীয় আখ্যান অথবা উপকথা রূপকথা সব কিছুই তাদের প্রাচীনত্ব ঘুচিয়ে সমকালীন শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পারে যদি অবশ্য বর্তমানের সমস্যা সংকট সংঘাতের সঙ্গে সেই যুগের

আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এবং যদি, সর্বোপরি, সেই কাহিনী একালের মনস্তত্ত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কৃত্তিবাস অনূদিত রামায়ণ নিশ্চয়ই বড় রকমের একটি শিল্পকর্ম, কিন্তু রাম-রাবণের চরিত্রকে মাইকেল মধুসূদন যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন, যে-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করলেন সেই ভাব বা দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক চিন্তার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তাই শিল্পের বিচারে মেঘনাদবধ কাব্যের সমকালীনতার দাবি অনস্বীকার্য।

পক্ষান্তরে চলচ্চিত্রে এমন প্রায়ই দেখা যায় (এবং অধুনা জনপ্রিয় সাহিত্যেও এর নজীর অপ্রচুর নয়) যেখানে আধুনিক জীবনযাত্রার সমস্ত উপকরণই বর্তমান—ট্রাম-বাস, চা-খানা, বড়োলোকের বাড়ির লাউঞ্জ, নিম্নবিত্তের অপ্রশস্ত ঘর, গরীবের বস্তি, সবই—অথচ সমস্ত থেকেও গোটা ব্যাপারটা যেখানে কেমন যেন সেকেলেই থেকে যায়। দৃশ্যবস্তুতে যেখানে আধুনিকতার এক ব্যর্থ ও স্থূল অনুকরণ ছড়িয়ে থাকে সর্বত্র—সমস্তটাই ভাসা ভাসা, উপর উপর—অথচ ভিতরে ঘটনায় ও চরিত্রের আচরণে ব্যবহারে, চরিত্র ও ঘটনার মূল্যায়নে এ-কালের চেহারা অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে, যেহেতু কাহিনীর চরিত্রগুলো আধুনিক সাজসজ্জায় ঘুরছে ফিরছে, ট্রামেবাসে বা গাড়িতে চাপছে এবং ডানলোপিলোর গদিতে অথবা শস্তা হ্যাণ্ডলুমের চাদর পেতে ঘুমুচ্ছে, এমন কি রেশনের দোকানে লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছেওবা অথবা রাস্তায় মিছিলের সামিল হয়ে শ্লোগান তুলছে, আর তাই কাহিনীটি সমকালীন হয়ে উঠবে এ কথা ভাবার অথবা এ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়ার কোনোই কারণ নেই। কাহিনীতে এবং কাহিনীর চরিত্রগুলোর মধ্যে একালের হাওয়া বইয়ে দিতে হবে, একালের মনস্তত্ত্বে ব্যাখ্যা করতে হবে সবকিছু, বিশ্লেষণ করতে হবে এ-কালের ঢং-এ—তবেই তা একালের কাহিনী হয়ে উঠবে। অর্থাৎ সমকালীনতা নির্ণীত হবে ব্যবহার্য উপাদান থেকে নয়—কী ভাবে সেই উপাদানকে ব্যবহার করা হচ্ছে, কী ঢং-এ তার বিশ্লেষণ হচ্ছে তার উপর। কোনো কাহিনীতে আড়াই হাজার বছর আগেকার ঈশপ-বর্ণিত ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাকের ছায়া রয়েছে অতএব কাহিনীর প্রাচীনত্ব ঘুচলো না এ কথা মনে করার যেমন কোনো যুক্তি নেই, ঠিক তেমনি ভুল করে বসবেন যদি কেউ আধুনিক জীবনযাত্রার উপকরণে ঠাসা কাহিনীমাত্রকেই সমকালীন জ্ঞান করেন।

মূল্য নিরূপণে এ-ধরনের ভুল চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে একটু বেশিরকমই হয়ে

থাকে। তার কারণ, চলমান ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্রের মারফত যতখানি স্পষ্ট ও ঘনিষ্ঠভাবে চলচ্চিত্রে বাস্তবের শারীরিক উপস্থাপন সম্ভব এমন আর কোনো শিল্পমাধ্যমেই সম্ভব নয়। এবং বাস্তবের শারীরিক উপস্থিতি চলচ্চিত্রে সহজলভ্য বলেই দর্শকের মন পেতে চিত্রনির্মাতার বিশেষ বেগ পেতে হয় না। নির্জন দুপুরে দূরে গলির মোড় থেকে যখন আইসক্রীমওয়ালার হাঁক শোনা যাবে—ম্যাগনোলিয়া !!—প্রেক্ষাগৃহে বসে দর্শক তখন বিনা দ্বিধায় নিজেকে ভিড়িয়ে দিতে চাইবেন সেই সৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে। অথবা, ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই করপোরেশনের লোকেরা যখন রাস্তা ধুইয়ে দেবে ও সেই ভেজা রাস্তায় সাইকেলে চেপে কাগজওয়ালা কাগজগুলোকে পাকিয়ে পাকিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারবে এ-বাড়ির দোতলায়, ও-বাড়ির দেড়তলায়, গ্যারেজ ঘরের উপরে আর ঝি বা চাকর কাগজ কুড়িয়ে এনে দেবে বাড়ির কর্তাকে, এবং সঙ্গে ধোঁয়া উঠছে এমনি গরম চা, দর্শক অবশ্যই তখন অসম্ভব মজা পাবেন, এবং দর্শকের মধ্যে যাঁরা কম বেশি অসতর্ক তাঁরা হয় তো আগ বাড়িয়েই গল্প সম্পর্কে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটু বাড়তি রকমের পক্ষপাতিত্ব করে বসবেন। উল্টোটাও ঘটছে হামেশাই। ঘটছে বলেই আজ থেকে ন' বছর আগে অপরাজিত-র মতো এক অসামান্য আধুনিক ছবি তৈরি করা সত্ত্বেও কোনো কোনো দায়িত্বশীল মহল থেকে বলা হয়ে থাকে সত্যজিৎ রায় নাকি সমকালীন জীবনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন নি। অপরাজিত-তে যে-গ্রাম আমরা দেখেছি তাতে দূরে আকাশের গায়ে ডি-ভি-সি-র হাই টেনশন তার অনুপস্থিত সন্দেহ নেই, অপরাজিত-র কলকাতায় নিয়ন সাইনের একটা বিজ্ঞাপনও দেখা যায় নি, রাস্তায় ট্র্যাফিকের অটোমেটিক লাল হলুদ সবুজ আলো তাও দেখি নি। দেখি নি কেননা কাহিনীর কাল গত মহাযুদ্ধেরও বেশ কয়েকবছর আগে। কিন্তু দেখেছি সন্ত কৈশোর পেরোনো একটি ছেলেকে যে তার ছোট্টো সংসারের সীমানা ডিঙিয়ে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়িয়েছে বৃহত্তর এক জগতের মুখোমুখি—অচেনা ও বিশাল—প্রতি পদক্ষেপেই যেখানে ভয়, বিস্ময়, ভালোলাগা—প্রতিটি সম্পর্ক গড়ে উঠতেই যেখানে জটিলতা। দেখেছি মা ও ছেলের সম্পর্কের সূক্ষ্ম, স্পষ্ট ও বিচিত্র বিশ্লেষণ যেখানে তীব্র হয়ে ফুটে উঠেছে একমাত্র ছেলের উচ্চশিক্ষার অদম্য আগ্রহের প্রতি মার মনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। এবং সমস্ত মিলিয়ে বর্তমান যুগের মননশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে যখন অপরাজিত-কে দেখি তখন উঁচু গলায় স্বীকার

করি—এদেশে এ যাবৎ যত ছবি তৈরি হয়েছে এইটিই তাদের মধ্যে আধুনিকতম।

চলচ্চিত্রে সমকালীনতার বিচারে এহেন টালমাটাল দশার মূলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রয়েছে সরলীকরণের প্রতি এক অতি অস্বস্তিকর ঝোঁক। যথার্থ মূল্য নির্ধারনের জন্যে যা প্রয়োজন তা হোলো বাস্তবের স্থূল শারীরিকতায় আকৃষ্ট না হয়ে আরো গভীরে প্রবেশ করা, আধুনিকতা সম্পর্কে আরো সচেতন হওয়া, আরো সতর্ক হয়ে ছবি দেখা।

আরো একটি কথা :

সমকালীন চলচ্চিত্রের আসরে পৃথিবী জুড়ে নব্যরীতির চলচ্চিত্রকারেরা আজ যে-বস্তুটি নিয়ে মেতেছেন তা হোলো ব্যক্তিজীবনে একালের অস্থিরতা, আধুনিক মানসের অব্যবস্থচিত্ততা ও তার আত্মিক সংকট—যার চলচ্চিত্রায়ণ ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্রের নতুন নতুন যান্ত্রিক উদ্ভাবন এবং সেগুলোর সুষ্ঠু ও শিল্পসম্মত প্রয়োগের ফলে নিদারুণ সত্য, স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে উঠছে। চলচ্চিত্রায়ণের সাবেকি নিয়মগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে নব্য চিত্রকারেরা নতুন ঢং-এ নতুন সাজে পরিবেশন করছেন তাঁদের বক্তব্যকে—অবশ্যই নতুন ফ্যাশান আমদানি করতে নয়, বক্তব্য প্রকাশেরই ঐকান্তিক তাগিদে।

মানুষের সমস্যা বাড়ছে, মনোজগতের সংকট বাড়ছে। মনস্তত্ত্ব জটিলতর হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের উদ্ভাবনী ক্ষমতাও বাড়ছে দিন দিন।

সমকালীন চলচ্চিত্রের দরবারে চলচ্চিত্রের এই আঙ্গিকগত উদ্ভাবনের ওজনটাও বড় কম নয়।

খালেদ চৌধুরী

মঞ্চসজ্জা : প্রাথমিক দায়িত্ব

আমরা দৈনন্দিন জীবনে একটা কথা প্রায় প্রবাদবাক্যের মতোই ব্যবহার করে থাকি, সেটি হচ্ছে 'স্থান-কাল-পাত্র'। অর্থাৎ, একটা ঘটনার বিবরণ বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে এই তিনের সংগতিতেই। কোথায়ও হয়ত কোনো দুর্ঘটনা হলো: আমরা প্রথমেই প্রশ্ন করি, কোথায় ঘটল ব্যাপারটা, কখন ঘটল, কারাই বা হতাহত হলো। থিয়েটারের মঞ্চে পাত্র অভিনেতা বা অভিনেয় চরিত্র। এই পাত্রও বিশ্বাস্য হয়ে উঠতে পারে পরিবেশের পটভূমিকায়। মঞ্চসজ্জার পরিবেশে স্থাপনমাত্রেই ঐ চরিত্রের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে পরিবেশের অভিন্ন অঙ্গরূপেই চরিত্রের কালও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। স্থান-কাল-পাত্রের এই সংস্থাপন থিয়েটারের মঞ্চে অপরিহার্য।

বাংলা থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে রোলারে গুটিয়ে নিয়ে আঁকা দৃশ্যপট পরিবর্তনের রেওয়াজ থেকে বক্স্ সেটের বিবর্তনই একটা বড় পদক্ষেপ। এর ফলে মঞ্চে ডাইমেন্‌শন এলো। কিন্তু তখনও এই মঞ্চসজ্জাকে আরো শিল্পসম্মত এবং আরো স্বল্প উপকরণে আরো গভীর তাৎপর্যবহ করে তোলার দায় রয়ে গেল। আসলে সমগ্র থিয়েটারের বিকাশের সঙ্গেই মঞ্চসজ্জার বিকাশের প্রশ্নও জড়িত। অথচ নাটক, অভিনয়, আলোকসম্পাত, সংগীত ইত্যাদি প্রত্যেকটি আঙ্গিকেরই যে এক-একটা স্বতন্ত্র সমস্যা আছে এই ধারণাগুলোই তখনও আসে নি। থিয়েটারের প্রত্যেকটি আঙ্গিক অন্যান্য আঙ্গিকের সহযোগী। একই কেন্দ্রবিন্দুর দিকে চালিত হওয়ার দরুণই বিভিন্ন আঙ্গিকের স্বতন্ত্র অথচ সামগ্রিক বিকাশের প্রচেষ্টা সম্ভব হয়। অথচ তখনকার থিয়েটারে আপনা থেকে যা এসে যায়, তা-ই থেকে যায়, কোথায়ও কোনো পরিকল্পনা নেই, পদ্ধতি নেই। নাটকের এক-একটি বিশেষ অঙ্গে 'স্পেশালাইজেশন'-এর ফলে যে গভীর চিন্তা ও অভিনিবেশের সম্ভাবনা, তাও তখনও সম্ভব হয় নি। ফলে মঞ্চসজ্জা তখনও নাটকের অনুগামীমাত্র থেকে

১নং চিত্র

গেছে, সহযোগী বা সহযাত্রী হয়ে উঠতে পারে নি। কোনো ক্ষেত্রে পরিচালক হয়-তো মঞ্চশিল্পীকে নির্দেশ দিলেন, "দাও, একটা মধ্যবিত্তের বাড়ি করে দাও।" মধ্যবিত্তের বাড়ি হলো, কিন্তু এই একই মধ্যবিত্ত সমাজে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, পরিবারে পরিবারে এত বিভিন্নতা, এত স্বাতন্ত্র্য, তার কোনো চিহ্ন থাকল না এই মঞ্চসজ্জায়। এইভাবেই দীর্ঘকাল মধ্যবিত্তের ফর্মুলা, বড়লোকের ফর্মুলা অনুসারে মঞ্চসজ্জা রচিত হয়েছে।

গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' থেকে বাংলা নাটকের, বাংলা থিয়েটারের নতুন সম্ভাবনা দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ-পরিকল্পনায়ও নতুন চিন্তা এলো, নতুন প্রচেষ্টা দেখা গেল। কিন্তু 'নবান্ন'-র প্রভাবও যে সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হলো, তাও বলা যায় না। 'নবান্ন'-র দৃশ্যপরিকল্পনায় চটের ব্যবহার হয়েছিল নাটকের একান্ত নিজস্ব প্রয়োজনেই। পরে দেখা গেল, ঐ চটের ব্যবহারই একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল; দৈন্যটাই ফ্যাশন হয়ে গেল। আরেকটা নতুন ফর্মুলা এসে গেল—মানুষের দুর্দশার ছবি দেখিয়ে করুণাভিক্ষার ফর্মুলা: ঐ ফর্মুলার ছাঁচে ঢালা সাজানো চাষী আর সাজানো কথা এসে গেল। কিন্তু 'নবান্ন'-র চাষী সেভাবে আসে নি;

২নং চিত্র

সে বাংলাদেশের দুর্দিনের এক পর্বের প্রতিনিধি।

৩নং চিত্র

পরীক্ষা-নিরীক্ষার কালে আঙ্গিকের কিছুটা বাড়াবাড়ি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সকলেই তো মনে মনে জানে যে, থিয়েটারে অভিনয়ই প্রধান আঙ্গিক। অভিনেয় চরিত্র যেন ফুল, থিয়েটারের আর সব অঙ্গই জল, হাওয়া, আলো, সার ; ফুল যাতে ভালোভাবে ফুটে উঠতে পারে, সেদিকেই তাদের সবার নজর। মঞ্চসজ্জার মনোহারিতা প্রযোজনের উপরই নির্ভরশীল। মঞ্চসজ্জা নয়নাভিরাম হলেই চলবে না, তার নাটকীয় তাৎপর্যেরই যা-কিছু দাম। দৈনন্দিন জীবনে একজন লোক প্রাতে শয্যাত্যাগ থেকে শুরু করে রাতে শয্যাগ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে অসংখ্য প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় কাজ করে থাকে, কথাবার্তা বলে থাকে। কিন্তু ঐ লোক যখন নাটকের চরিত্র হয়, তখন তাকে বিশেষ মুহূর্তে একটি বিশেষ কাজ করতে হয়, অথবা একটি বিশেষ কথাই শুধু বলতে হয়—যে-কাজ অথবা যে-কথা নাটকে একান্ত প্রয়োজনীয়। মঞ্চে দেয়াল থাকলেই দেয়ালে ছবি টাঙাতে হবে, অথবা টেবিল থাকলেই বই অথবা ফুলদানী দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করে পরিবেশের সারবস্তুটুকু বেছে নেওয়াই কর্তব্য—'ফোকাল্ সেণ্টর্' (focal centre)

৪নং চিত্র

৫নং চিত্র

স্বরূপ প্রতিটি উপকরণকে বেছে নিতে হবে, যাতে মঞ্চসজ্জা এক লহমায় সমগ্র পরিবেশের আভাস দিতে পারে।

জীবনে ও চিন্তায় ক্রমবর্ধমান জটিলতার সঙ্গে তাল রাখবার জন্যই আমাদের বর্তমান প্রোসেনিয়ম বা ছবির ফ্রেমের ধাঁচের এই মঞ্চের উদ্ভব। জটিলতার মধ্যে হারিয়ে যাবার ভয় থেকেই নাটককে ফ্রেমে বাঁধার প্রয়োজন অনুভূত হয়, যাতে দর্শকের দৃষ্টি ও মন ঐ চতুর্ভুজের সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট হতে পারে। এই অভিনিবেশের ফলে দর্শকের দৃষ্টি আরো প্রখর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই এই ফ্রেমে সীমায়িত স্থানটুকুর প্রতিটি কণা জায়গা মঞ্চশিল্পীর কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ছবির ফ্রেমকে গ্রহণ করার ফলে ছবির বিশেষ গুণাবলীকে গ্রহণ করার দাবিও এসে পড়ে; ছবির কম্পোজিশন ও রঙের বিন্যাসের নীতিকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চসজ্জার 'ফাংশনল্' বা নৈমিত্তিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। নাটক আমায় যা দেবে, আমি কেবল তাকেই সাজিয়ে নেব। মঞ্চসজ্জার প্রতিটি উপকরণ এইভাবেই নিতান্তই অলংকরণের দ্বিমাত্রিকতা থেকে নাটকীয় তাৎপর্যের যোগে ত্রিমাত্রিক চরিত্র লাভ করে।

৬নং চিত্র

মঞ্চসজ্জা কখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ এক শিল্প-মাধ্যম হতে পারে না। একটা অ্যাশট্রে

থেকে ধোঁয়া উঠছে, কিংবা র‍্যাকে বইগুলো উল্টো করে সাজানো এটাও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠা চাই। মঞ্চসজ্জার যাবতীয় উপাদানই স্থিতীয়; অথচ নাটকের আর সবই গতীয়। ফলে চেষ্টা

৭নং চিত্র

করতে হয়, যাতে উপকরণগুলিকে এমন আকার-অবয়ব দেওয়া যায় যে তারা অভিনেতাদের চলাফেরার ধরনের সঙ্গে মিলে গতীয়তার আভাস রচনা করতে পারে। অভিনেতাদের সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চসজ্জাকেও এইভাবে গতিশীল করে তোলা যায়। পরিচালক, মঞ্চনির্দেশক ও আলোকশিল্পী, এই তিনের একত্র চেষ্টায় মঞ্চসজ্জাকে অঙ্গাঙ্গিসম্পর্কে নাটকের সঙ্গে জড়ানো যায়।

বহুরূপী-র 'পুতুলখেলা' নাটকে সচেতনভাবে এই চেষ্টাই ছিল। 'পুতুলখেলা'-য় কোনো দেয়াল নেই, কারণ এই নাটকে দেয়ালের প্রয়োজন নেই। দরজা আছে, জানালা আছে, এক্ষেত্রে তারা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলেই। স্থাপত্যের আইন লঙ্ঘন করেই দুটো দরজার একটার মাথায় 'আর্চ' আছে, অন্যটার মাথায় নেই। প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়, ঘরের দরজায়, জানালায়, বসবার জায়গায়, বিছানা ইত্যাদিতে বাড়াবাড়ি রকমের হলুদ রঙে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, জানালা দিয়ে বাইরে শরতের ধবধবে স্বচ্ছ আকাশ, পেছনে কালো পশ্চাদ্‌পটের ব্যবহারে এই রঙের প্রচণ্ড

৮নং চিত্র

তীব্রতাই আরো প্রকট হয়ে ধরা পড়ে, যাতে বুলুর নিজেরই হাতে সাজানো বাড়াবাড়ি রকমের পরিবেশে তার নিজেরই আউট্‌লাইন হারিয়ে যায়। তারপরেই তপন ঢোকে, পাশের প্রায় অন্ধকার ঘর থেকে, ধবধবে শাদা পোষাক, হাতে টুক্‌টুকে লাল ডায়েরি, বাঁদিক থেকে প্রথমে একটি ছোট্ট র‍্যাকের মাথায় ল্যাম্পশেড, তারপর ক্রমশ উঁচুতে উঠতে থাকে ইজিচেয়ারের মাথা, চেয়ারের মাথা, আলনা, ফুলদানী, আলমারীর মাথায় পোঁটলা ও কুলো, দরজার মাথায় আর্চ (আর্চের তাকে গণেশমূর্তি), তারপর ক্রমশ নিচে নামতে থাকে হ্যাট্‌র‍্যাক, বুক্‌র‍্যাকের মাথায় গোল ল্যাম্পশেড, বিছানার উপর বালিশ ; ধনুকের মতো বক্ররেখার এই সমাহার বিছানার শেষ প্রান্তের গোল মোড়ায় এসে তার সাইক্‌ল্‌ সম্পূর্ণ করে। সবটা মিলিয়ে গভীর দুঃখে একটা মানুষের লুটিয়ে পড়া, ও তারপরেই বাইরের দরজার দিকে আকুল হয়ে তাকানোর একটা প্যাটার্ন রচনা করে। এই বক্ররেখাগুলোই 'পুতুলখেলা'র মঞ্চপরিকল্পনায় কম্পোজিশনের প্রধান ছন্দরেখা (১—৪নং চিত্র)। অথচ তারা এমনভাবে সাজানো যে, আলোর সুচিন্তিত প্রয়োগে কোনোসময়ে আমাদের চোখে কেবল সোজা রেখাগুলোই পড়ে, আবার কোনোও সময়ে কেবল ধনুকের মতো বাঁকানো রেখাগুলোই চোখে আসে। দ্বিতীয় অঙ্কে সমস্ত ঘরে হলুদ রঙ সরে গিয়ে তার স্থান নিয়েছে গাঢ় নীল আর ছাই রঙের উপর লাল রঙের কারুকার্য। ফলে সমস্ত আবহাওয়াটা থম্‌থমে, কোনো ভীষণ একটা ঘটনার প্রতীক্ষায়। তৃতীয় অঙ্কের শেষের দিকে ঐ সমস্ত রেখাগুলোই যেন বাইরের দরজার দিকে আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। কিংবা সবশেষে পরাজিত তপনের চেয়ারের হাতল ধরে ঝুঁকে পড়ার ভঙ্গিটা ঐ বাঁকানো রেখাগুলোর সঙ্গে মিলে যায়। এইভাবেই মঞ্চ-পরিকল্পনার ঐ ছন্দরেখার একটা অর্থ ধরা পড়ে।

বহুরূপী-র 'রক্তকরবী'-র মঞ্চসজ্জার স্তরবৈচিত্র্যও নাটকের প্রয়োজনেই এসেছে। যক্ষপুরীর সমাজ বহুস্তরে বিভক্ত, এখানে ছোটরা নিচে থাকে, বড়রা উপরে। এবং সমস্ত মিলিয়ে সমাজটার এমন একটা জগদ্দল পাথরের মতো চেহারা আছে যেটা ভারী আর কঠিন। 'রক্তকরবী'-র মঞ্চসজ্জায় সেই নিষ্প্রাণ পাথরের কঠোর কাঠিন্য ঋজুরেখার পরিকল্পনায় ধরবার চেষ্টা হয়েছিল (৫—৮নং চিত্র)।

রূপকারের 'কালের যাত্রা' নাটকের মঞ্চসজ্জা 'রেপ্রেজেন্টেশনল্‌' ধাঁচের
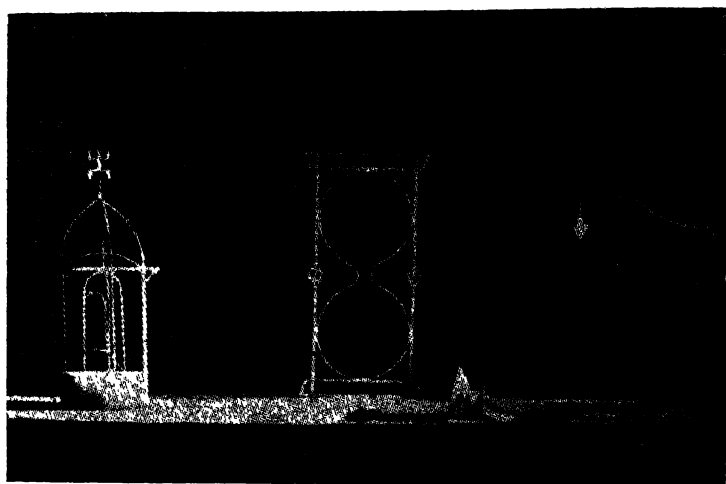
'কালের যাত্রা'র মঞ্চপরিকল্পনা

দিকে না গিয়ে 'স্ট্রাক্‌চরল' ধাঁচের দিকে ঝুঁকেছে। জায়গায় জায়গায় প্রতীকেরও ব্যবহার আছে কারণ নাটকটিও যেন একটি নাট্যরূপায়িত প্রবন্ধ। এর বিভিন্ন 'আইডিয়া'গুলি যেন তাদের কাঠামোমাত্র; কোনোটাই সম্পূর্ণ শরীরী নয়, অথচ সম্পূর্ণের ব্যঞ্জনাবহ। এক্ষেত্রে ঘড়ি ও মন্দিরের (মাথায় ব্রহ্মার চিহ্ন) 'স্কেলিটান' বা কঙ্কালপ্রতিম মূর্তি রচনা করতে হয়েছিল। এর সঙ্গে অভিনয়ে কেবল ব্যালে-র স্টাইলাইজেশনই খাপ খেতে পারে। কারণ সমগ্র নাটকের পরিকল্পনাই বস্তুলোকের স্পষ্ট বস্তুরূপের স্তর থেকে অন্যতর স্তরে স্থাপিত, যে-স্তরে মূল ফর্মটুকুই কেবল বিরাজ করে।

নাটক দৃশ্যকাব্য। এর তাৎপর্যকে দৃশ্যগ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টায় পরিচালক ও মঞ্চশিল্পী, উভয়েরই চিন্তা ও কল্পনার দাম আছে। পরিচালক হয়ত বললেন, চেয়ার চাই। মঞ্চশিল্পী প্রশ্ন করবেন: কে বসবে? সে কেমন লোক? হয়ত দেখা গেল, কোনো-এক কিম্ভূত চরিত্র। মঞ্চশিল্পী তাকে চেয়ার না দিয়ে হয়ত অন্যভাবে বসানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। এখানেই মঞ্চশিল্পীর নিজের সত্তার স্বকীয় ভূমিকা।

নাটকের নিজস্ব দাবি মিটিয়েও মঞ্চসজ্জার আরেকটা দায় থেকে যায়। চোখ রাখতে হয় যাতে মঞ্চপরিকল্পনা কখনই দর্শক ও মঞ্চের নাটকের মধ্যে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে

নির্যাতনদৃশ্যটি 'হোরাইজণ্টাল সাইট্‌লাইন' বা দর্শকের দৃষ্টিরেখার থেকে উঁচুতে অতক্ষণ ধরে চলতে থাকায় দর্শকের কায়িক ও স্নায়বিক ক্লেশ নাটকীয় পরিস্থিতির তীব্রতায় অভিনিবেশের অন্তরায় হয়। ঐ সূত্রেই মঞ্চসজ্জায় পরিচ্ছন্নতার প্রশ্নও এসে পড়ে। কাগজ-লাগানো সেটের কাগজটা যদি প্রকট হয়ে ওঠে, সিঁড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি সিঁড়িটা নড়ে ওঠে, আলমারীতে হাত দিতেই সেটা যদি কেঁপে ওঠে, তাতে দর্শকের বাস্তবভ্রম আহত হয়, রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটে। নাটকের তাৎপর্য থেকে দর্শকের মন তখন অন্যদিকে সরে যায়।

মঞ্চ-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে-কোনো আন্দোলনই নাটককে দৃশ্যমান করে তোলার চেষ্টার উপর নির্ভরশীল। নাটক ও মঞ্চসজ্জার সাযুজ্যই এক্ষেত্রে একমাত্র মানদণ্ড। ফর্মুলা বা ইজ্‌ম্‌ দিয়ে মঞ্চসজ্জা হয় না। নাটক যদি কিউবিস্ট্‌ না হয়, মঞ্চসজ্জায় কিউবের আমদানী প্রক্ষিপ্ত অতএব বাহুল্য। নাটকের উপরেই মঞ্চসজ্জা নির্ভর করবে, বাইরের কোনো 'আন্দোলনের' তর্কাতর্কির উপরে নয়। কোনো বিশেষ নাটকের দাবি মেটাতে গিয়ে যদি মঞ্চসজ্জা কোনো বিশেষ 'ইজ্‌ম্‌'-অনুসারী হয়, তাতে আমার আপত্তি নেই। একটা চরিত্রের কোনো বিশেষ সংকট প্রকাশ করতে গিয়ে চরিত্রটিকে যেমন সচেতনভাবেই 'ডিস্টর্ট' করতে হয়, তেমনি মঞ্চসজ্জাকেও তার সঙ্গে তাল রাখবার জন্য সচেতন 'ডিস্টর্শনের' প্রয়োজন হতে পারে। প্রয়োজন হলে বর্ণবিন্যাসের নীতি লঙ্ঘন করে দুটো পরস্পরবিবাদী রঙকেও পাশাপাশি ব্যবহার করতে পারি, যদি তার সেই দ্বন্দ্ব বা সংঘাত নাটকের সংঘাতের সঙ্গে মেলে। বিনা মঞ্চোপকরণে খালি মঞ্চে অভিনয় করার একটা ধুয়া ইদানীং উঠেছে। এই ধুয়া যাঁরা তোলেন, তাঁরা হয় ক্ষেত্রবিশেষে মঞ্চসজ্জার বাহুল্য দেখে বিরক্ত হয়েছেন, নয় নিজেদেরই কল্পনা ও চিন্তার দৈন্য ঢাকবার চেষ্টা করছেন, আর নয়তো যাত্রা-থিয়েটারের মৌলিক প্রভেদ ভুলে থিয়েটারের প্রোসেনিয়ম মঞ্চে যাত্রাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছেন। ক্ষেত্রবিশেষে পরিমিতিবোধের অভাব ঘটলেই আঙ্গিকটিকেই বিসর্জন দেওয়ার চিন্তা আমার কাছে মানসিক অজীর্ণতারই লক্ষণ বলে মনে হয়। ফ্রেম করলে ফ্রেমের মধ্যে ছবি থাকবেই, ছবিতে নানা বস্তু থাকবেই। ফ্রেমে সীমায়িত ঐ স্থান আমার কাছে অত্যন্ত দামী। আমি তার প্রতিটি ইঞ্চিকে অর্থবহ করে তুলব। অবশ্য কোনো নাটক যদি শূন্যতার মধ্যে পরিকল্পিত হয়, সেক্ষেত্রে ঐ শূন্যতাই
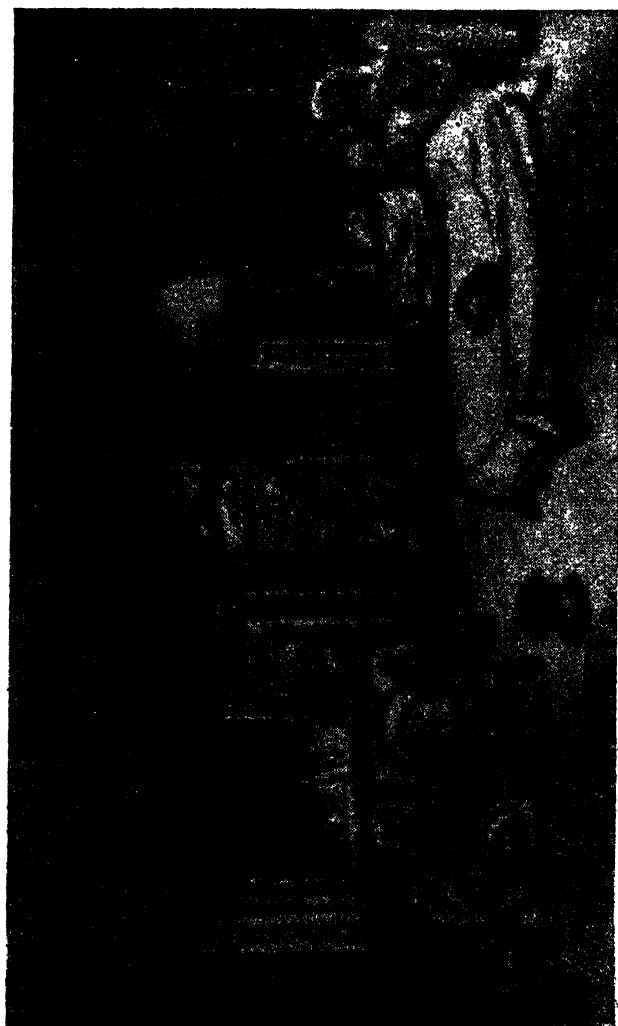
'পুতুলখেলা' : মঞ্চপরিকল্পনার ছক । খালেদ চৌধুরীর স্কেচ্‌

'রক্তকরবী' : মঞ্চপরিকল্পনার ছক। খালেদ চৌধুরীর স্কেচ

মঞ্চসজ্জার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত মঞ্চের খালি জায়গার অব্যবহারের যুক্তি দিতে হবে।

এখনও দেখা যায়, মঞ্চসজ্জার ব্যাপারে অভিনেতাদের কোনো আগ্রহ নেই। অর্থাৎ, যাঁদের নিয়ে মঞ্চশিল্পী 'প্যাটার্ন' রচনার চেষ্টা করছেন, তাঁরাই মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে উদাসীন থেকে যাচ্ছেন, ফলে মঞ্চসজ্জাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে পারেন না। মঞ্চসজ্জার নৈমিত্তিক ভূমিকা সম্পর্কে অভিনেতা ও পরিচালক সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠলেই মঞ্চসজ্জা নাটকের অন্তরঙ্গ অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে, অন্যথায় নয়।

পরিতোষ সেন

আধুনিক চিত্রশিল্প

'The main purpose of art is not to render the visible, but rather to make visible.'—Paul Klee

আকাশের চাঁদের প্রতিবিম্ব জলে পড়ে, কিন্তু সেই প্রতিবিম্বিত চাঁদকে আমরা কখনও চাঁদ বলে গ্রহণ করি নে, কেননা সেই চাঁদ হলো আকাশের চাঁদের নকল। ভারতীয় শিল্পের সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কোনোখানে দেখা যায় না যে তা বাস্তব (nature)-কে নকল করেছে—তা সে উপজাতীয় বা লোকশিল্পই হোক কিংবা ধ্রুপদী শিল্পই হোক। পাশ্চাত্ত্যের গ্রীক, রোমান ও রেনেশাঁসের শিল্পকে বাদ দিলে এই নকল করার ব্যাপারটা পৃথিবীর আর কোনোও শিল্পেই দেখা যায় না। আধুনিক শিল্প হলো শিল্পের যেটা মৌল ধারা তারই উৎসের সন্ধানে অভিযান এবং সেই উৎসের আবিষ্কারেই আধুনিক শিল্প মহিমান্বিত। আধুনিক শিল্পের কথাতে যাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন তাঁরা একটু তলিয়ে দেখলেই মানবেন যে এর মূল পিছনে আট-দশ হাজার বছর পর্যন্ত বিস্তৃত।

কালের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরও পরিবর্তন ঘটে। যদি ভাবি যে নেহাত নতুনত্বের খাতিরে সে পরিবর্তন ঘটে তবে ভুল হবে: বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধেও পরিবর্তন আনে এবং সেসব পরিবর্তনের অনুপাতে শিল্পের জন্যে নতুন চাহিদাবোধ জাগে এবং সেই অনুসারে শিল্পের রূপ ও স্বরূপ পরিবর্তিত হয়। যেমন পাশ্চাত্ত্যের শিল্পের ইতিহাসে দেখি যে এতদিন যাঁরা শিল্পের পরিপোষক ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি তাঁদের স্থান নিচ্ছেন সদ্যোত্থিত পুঁজিবাদী-শ্রেণী এবং তাঁদের রুচির চাহিদা মেটাতে গিয়ে শিল্পের মান অনেক নিচে নেমে যায় উনবিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু ফটোগ্রাফের কোশল আবিষ্কৃত হওয়ার পরে এই শ্রেণী এক দিকে সহজে ও সস্তায় বাস্তবের প্রতিচিত্রণের দিকে ঝুঁকে পড়লেন, অন্যদিকে সত্যিকার শিল্পী

তাম্রযুগের শিলারূপ—মাণ্টা

মুক্তি পেলেন—ইতিহাসে সর্বপ্রথম মুক্তি পেলেন—সমাজের চাপে বস্তুর অবিকল প্রতিচিত্রণ আঁকার দায় থেকে এবং একই সঙ্গে সেই মুক্তি তাঁকে করে তুলল সমাজ-ছাড়া ও নিঃসঙ্গ। এই মুক্ত শিল্পী এক হিসেবে বিদ্রোহী শিল্পী। সমাজের চাহিদাতে এতদিন তিনি চোখে যা দেখে গেছেন তা-ই এঁকেছেন—কিন্তু এবারে এই ধারার বিরুদ্ধে, এই সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ।

বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গিতে সশস্ত্র হয়ে আধুনিক শিল্পী নিজের চোখের উপরে খুব বেশি আস্থা রাখতে পারলেন না। চোখে যা দেখলেন তাকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে চাইলেন, বারবার চক্ষুগ্রাহ্য দৃশ্যকে ভেঙেচুরে উল্টেপাল্টে যাচাই করার পরে তাঁর এই উপলব্ধি হলো যে বস্তুর বাইরের রূপের (appearence) তলায় তলায় আর-এক রূপ আছে, সেটাই সত্যরূপ (inner reality), সেটা হলো তার স্বাশ্রয়ী (intrinsic) ও ফর্ম্যাল গঠনবিন্যাস।

এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু যে বস্তুজগতের অন্তর্রূপকে ব্যক্ত করল তাই নয়, তা বর্ণকেও মুক্ত করল। গাছ হয়ে গেল সিঁদুরে লাল, আকাশ হলো গন্ধকে হলুদ, প্রাশিয়ান নীলে আঁকা হলো ঘোড়া। এক কথাতে, এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সমস্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য জগৎ (objective world) পরিণত হলো রূপের ও বর্ণের নিবিড় স্পন্দনে। শিল্পীর মুখ্য অম্বিষ্ট হলো এমন কতকগুলি সূত্র যার মাধ্যমে

বহির্দৃশ্যের সঙ্গে তাঁর অন্তরোপলব্ধির একটা সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। একবার সেই সূত্রটাকে আয়ত্ত করার পরে শিল্পী পেলেন লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার স্ফূর্তি।

আধুনিক শিল্পে উক্ত সূত্রের সন্ধান প্রথমে শুরু হয় বুদ্ধির সাহায্যে। পিকাসো, ব্রাক প্রভৃতি শিল্পিগণ ঠিকই বুঝেছিলেন যে পাশ্চাত্ত্য শিল্প বস্তুজগতের প্রতিচিত্রণ আঁকতে আঁকতে কোনখানে দেউলে হয়ে গেছে এবং কোন পথে তাকে আবার মুক্তি দেওয়া সম্ভব। যে-জিনিসটাকে চোখে দেখতে পাচ্ছেন তার বাহুল্য ও ফালতু রূপ ও বর্ণকে তাঁরা সচেতনভাবে খুঁজে বের

মহেঞ্জোদারো—৩০০০ খ্রীষ্টপূর্ব

করে, সেগুলো বাদ দিয়ে, শুধু আবশ্যিক রূপ ও বর্ণকে ধরার চেষ্টা করলেন এবং সে-রূপ নিতান্তই ফর্ম্যাল রূপ।

এই সচেতন প্রয়াসের সমান্তরালে পাশ্চাত্ত্য শিল্পের আর-একটি ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে, সেখানে শিল্প স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয় শিল্পীর অচেতন সত্তার গভীরতা থেকে। অর্থাৎ প্রথম গোষ্ঠীর শিল্পিগণ ছবি আঁকার বিষয়কে আহরণ করেন দৃষ্টিগ্রাহ্য জগৎ থেকে এবং তারপর সেটাকে নিজের বিচার অনুসারে আঁকেন; আর শেষোক্ত গোষ্ঠী নিজেদেরই সত্তার ভিতরে
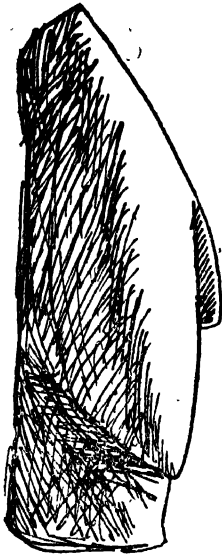
মানুষের মাথা—সাইক্লিডিস শিল্প
২০০০ খ্রীষ্টপূর্ব
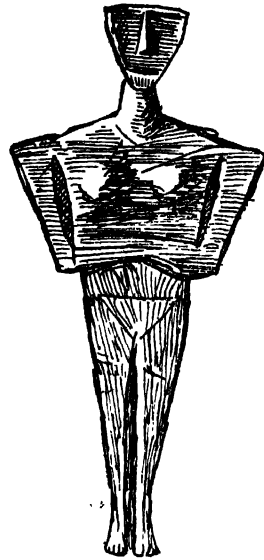
নারীমূর্তি—সাইক্লিডিস শিল্প
২০০০ খ্রীষ্টপূর্ব

ছবির বিষয়কে খোঁজেন। এক হিসেবে বস্তুর গূঢ়তর রূপকে বুদ্ধি দিয়ে অন্বেষণের যে-ধারা তারই প্রত্যুত্তরে মস্তিষ্ককে একেবারে অস্বীকার করে আপন সত্তার মধ্যে শিল্পী অবতরণ করলেন: পিকাসোর ছবিতে যেমন will হলো প্রধান কথা তেমনই পল ক্লী-র ছবিতে অন্তর্দৃষ্টি বা complete abnegation of will, তা অজানার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়া। একটা অভিজ্ঞতা আশুচেতন বা sensitive মনে কতকগুলি প্রক্ষোভ (emotion) জাগায় এবং সেই প্রক্ষোভগুলি আস্তে আস্তে সত্তার অতলে থিতিয়ে পড়ে। কোনও অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে নয়, সেই থিতিয়ে-পড়া তলানি অভিজ্ঞতাটুকুকেই সত্তার ভিতর থেকে অন্তর্মুখী শিল্পী উদ্ধার করেন, তাকেই দেন রূপ, রেখা, বর্ণ। নিজের দেখা কোনও বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে না পাওয়া সত্ত্বেও সেই রূপ, রেখা ও বর্ণের সমাহার একজন দর্শকের অপ্রস্তুত ও অচেতন মনে প্রবল প্রতিক্রিয়া জাগাতে পারে, যেমন একটা ক্যাকটাসের বিচিত্র রূপ বা ঝর্ণার তলায় পাথরের গায়ে জলের আলপনা অথবা আকাশে মেঘের নানা অদ্ভুত আকার আমাদের সত্তাকে চকিতে জাগিয়ে দেয়।

এভাবে যেসব চিত্রল প্রতীক (pictorial symbols) শিল্পীর অচেতন মন থেকে উঠে আসে তার স্বাভাবিক আবেদন থাকে দর্শকের অচেতন মনের কাছেই: কোনও আক্ষরিক অর্থ কিংবা দর্শকের দৃশ্যগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার সাযুজ্য না থাকলেও কিছু এসে যায় না। আমরা যখন অশ্রুতপূর্ব কোনও পাখির গান শুনে মুগ্ধ হই তখন কি তার অর্থ খোঁজার চেষ্টা করি? একদিক থেকে দেখতে গেলে এসব ছবির সঙ্গে ধ্রুপদী শিল্পাদর্শের কোনও বিরোধ নেই। কেননা সেখানেও রেখা, বর্ণ, ও রূপের সুসমঞ্জস তথা সুখদায়ক বিন্যাসই প্রথম কথা। সুপরিণত ও সুশিক্ষিত শিল্পীর অচেতন মন থেকে উত্থিত ছবিতে রেখা-বর্ণ-রূপ ইত্যাদির সমন্বয় চমৎকার না হওয়ার কোনও কারণ নেই এবং সেসবের মূল্যও অনস্বীকার্য, কেননা মনে রাখা দরকার সেসব অতি উচ্চাঙ্গের ও উৎকৃষ্ট চিত্তের লীলা।

অচেতন মনের সৃষ্টি হওয়ার দরুণ এসব ছবির মধ্যে একটা রহস্য থাকে এবং ছবিগুলোকে তাদের রহস্যের অখণ্ডতার মধ্যে থাকতে দেওয়াই ভালো। কিন্তু সে সঙ্গে এ কথা ভুললেও চলবে না যে এ ছবিগুলোর ভাষা বিশেষভাবে সর্বজনীন এবং দেশে ও কালে তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা অসম্ভব। এ ধরনের ছবি যাঁরা এঁকেছেন তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে free fancy, গভীর আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি দেখতে পাই।

এটা সত্যি যে অন্তর্মুখী শিল্পীরও চোখ দিয়ে দেখবার বা অভিজ্ঞতা অর্জন করার প্রয়োজন আছে। সেই অভিজ্ঞতা শিল্পীর মনে জাগায় নানারূপ অভিজ্ঞতা এবং সে প্রক্ষোভগুলিও এক সময় তাঁর অচেতন মনের মধ্যে থিতিয়ে পড়ে। কিন্তু এরপরে শিল্পীর মন যে ঠিক কীভাবে কাজ করে সে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অচেতন মনের এই প্রক্রিয়াটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তৃত-ভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন। কেননা সেই তলানি প্রক্ষোভ দিনে দিনে শিল্পীর মনে চোলাই হতে হতে ঠিক কোন রূপ নিয়ে কোন্‌দিন আত্মপ্রকাশ করবে তা শিল্পী নিজেও নিশ্চিত করে বলতে পারেন না। শুধু এটুকু বলা যায় যে তাঁর আদি অভিজ্ঞতা এবং তার পরিণত ফল বা চূড়ান্ত প্রকাশের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্পর্ক বা দৃষ্টিগ্রাহ্য সাদৃশ্য না-ও থাকতে পারে।

এ-প্রসঙ্গে বিখ্যাত সুইস শিল্পী পল ক্লী-র উক্তি উদ্ধারের লোভ সংবরণ করা অসাধ্য: "From the root the sap rises up into the artist, flows through him, flows to his eyes. He is the trunk of the tree.
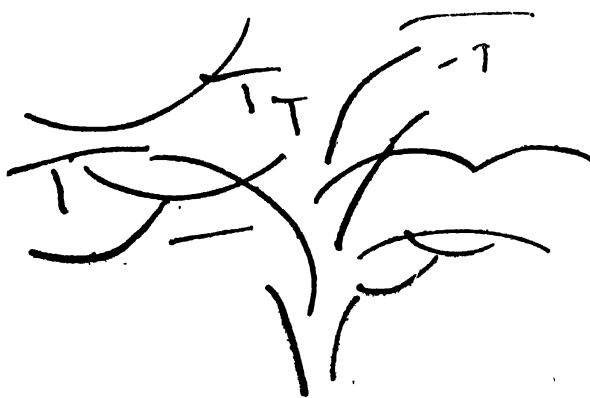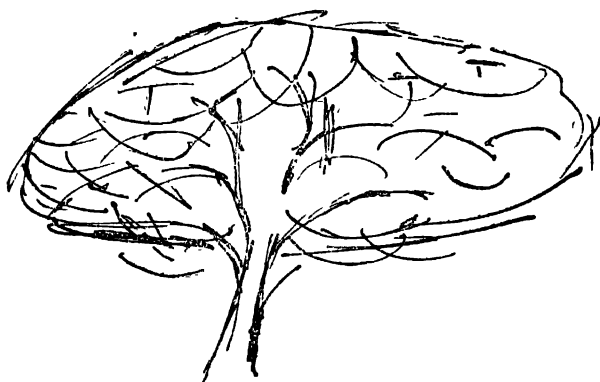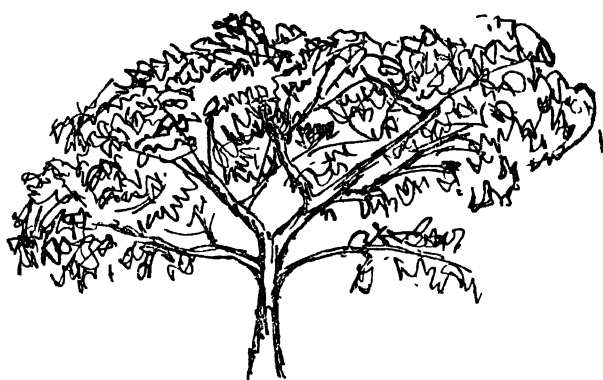
একটি গাছের ছবি : বিমূর্ত শিল্পের ধারাবাহিক ক্রম

Over-whelmed and activated by the force of the current, he conveys his vision into his work. Nobody would expect a tree to form its crown in exactly the same way as its root. Between above and below there cannot be exact mirror images of each other. It is obvious that different functions operating in different elements must produce vital divergences. But it is just the artist who at times is denied those departures from nature which his art demands. He has even been accused of incompetence and deliberate distortion. And yet standing at his appointed place, as the trunk of the tree, he does nothing other than gather and pass on what rises from the depth. He neither serves nor commands, he transmits. His position is humble. And the beauty of the crown is not his own ; it has merely passed through him."

এভাবে একজন শিল্পী যেসব বস্তুর ছবি আঁকেন সে সব বস্তু—যেমন একটা ফুল, মাছ, মানুষ ইত্যাদি—দেখে আমরা একটা বস্তু বলেই চিনতে পারি ; কিন্তু যথাযথ ওই অঙ্কিত রূপের বস্তু অথবা ফুল-মাছ-মানুষ আমরা কোনোদিন চোখে দেখি নি : সে-ফুল, সে-মাছ, সে-মানুষ আমাদের পরিচিত ফুল বা মাছ বা মানুষ নয়, যেন অন্য কোনও গ্রহের জিনিস। আবার একই ধারাতে আরও এগিয়ে একজন শিল্পী বলবেন যে বস্তুর ওই সুদূর সদৃশতাও শুধু যে অবান্তর তা-ই নয়, তা একটা শৃঙ্খল, এই শৃঙ্খল ভেঙে বের হতে হবে বিশুদ্ধ রূপের জগতে, সেখানে বৃত্ত, চতুর্ভুজ, ত্রিকোণ ইত্যাদির রূপও বিশুদ্ধ বর্ণের মিশ্রণে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থাৎ এ সবের মধ্যেই আছে শিল্পীর বিভিন্ন প্রক্ষোভকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করার স্বাশ্রয়ী (intrinsic) ক্ষমতা। কিন্তু এসব রূপ ও বর্ণকে এমনভাবে সাজানো দরকার যাতে তা শিল্পী ও দর্শকের মধ্যে একটা যোগাযোগের সেতু বানাতে পারে। সেগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য হবে যেমন দর্শকের মনে বস্তুগত স্তরে একটা প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া (emotional response) জাগানো, তেমনই সংগীতের মতো চেতনার স্তরে প্রবেশ করা। সেজন্যে বলা যায়, এসব ছবির বেলাতে দর্শকের মনে ঈসথেটিক প্রতিক্রিয়া জাগাবার জন্যে শিল্পী সর্বদা সচেতন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবেই সচেষ্ট।
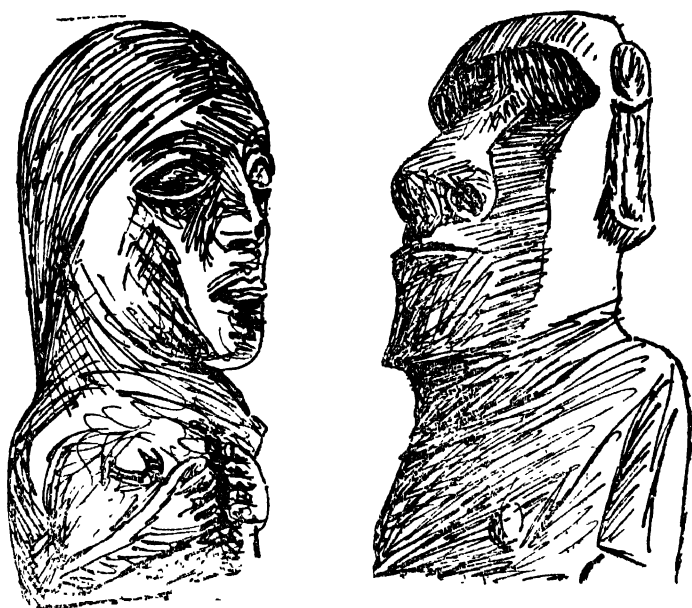
ইনকা বা পেরুর প্রাচীন রাজবংশীয় শিল্প—১৫শ শতাব্দী

আর-এক পা এগোলেই আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের জগতে পৌঁছে যাই। শিল্প শুধু একটা অনুভবের (feeling) জিনিস নয়, তা একটা চিন্তা- (thought)-ও বটে। এমন চিন্তা কি থাকতে পারে না যার সঙ্গে দৃশ্যগত বা ভাষাগত বিগ্রহের (image) কোনও সম্পর্ক নেই? এটা মনস্তাত্ত্বিক সত্য যে মানুষের চিন্তাক্রিয়াতে (thinking) মূল ব্যাপার হলো চিন্তা আর বিগ্রহ আসে তার সূত্র ধরে, ঘটনাক্রমে। ধরা যাক, ফুলদানীতে কিছু ফুল সাজানো আছে। সাধারণ লোক সেটা দেখে কী করবেন? তাঁর মনে ফুলদানীতে ফুলের যে-বিগ্রহ আছে তার সঙ্গে তখনই চোখে-দেখা দৃশ্যটাকে সনাক্ত করতে চাইবেন। কিন্তু শিল্পী কি করবেন? মনের পুরনো বিগ্রহটাকে বাতিল করে ফুলদানীতে ফুলের উপস্থিত দৃশ্যটাকেই শুধু অর্থাৎ সে-দৃশ্যের আকার, রেখা, বর্ণ ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ককে তিনি অনুধাবন করবেন।

আগেই বলা হয়েছে, শিল্পী কখনও প্রকৃতিকে নকল করেন না। তার অর্থটা ভালো করে বোঝা দরকার। শিল্পী যখন একটা গাছ দেখেন তখন তার বিশেষ বিগ্রহ শিল্পীর মনে একটা অভিঘাত সৃষ্টি করে এবং সে অভিঘাত

ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বিভিন্ন হতে বাধ্য, কেননা দীর্ঘ সাধনাতে অর্জিত শিল্পীর ব্যক্তিত্বের স্তরক্রম অনুসারে সে-অভিঘাত চোলাই হতে হতে স্বরূপ পালটায়। স্বরূপ অর্থাৎ বাইরের রূপের (outer reality) ভিতরে যে-রূপ (inner reality), চোখে যে-গাছটা দেখা যাচ্ছে তারই অন্তঃসার এবং স্বভাবতই গাছের বাহ্যরূপ ও স্বরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটো জিনিস। সেই অন্তঃসারকে শিল্পী যখন আঁকেন তখন তা হলো গাছের বাহ্যরূপের যে-অভিজ্ঞতা শিল্পীর ব্যক্তিত্বে ধরা পড়ে তার জটিলভাবে পরিশ্রুত ও পরিশোধিত অভিব্যক্তি, তা হয়তো গাছের বদলে কয়েকটি রেখা কিংবা কতকগুলি রঙের ছোপ।

আবার একই সঙ্গে শিল্পীর কাছে দৃষ্টিগ্রাহ্য জগতের সীমানাও বেড়ে চলেছে: সমুদ্রের তলায় যে আশ্চর্য জগৎ আছে তা একদা ডুবুরীদেরই অধিগম্য ছিল, কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগে শিল্পীর পক্ষে তা নিজের অথবা ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার চোখে দেখা সম্ভব হয়েছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দৌলতে বিভিন্ন জীবাণু ও বীজাণুর আকার, বর্ণ, গতি ইত্যাদি আজ শিল্পী দেখতে পারেন। আবার একইভাবে মহাবিশ্বেও শিল্পীর অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়ছে। তাছাড়া কালে কালে ও লোকে লোকে সৌন্দর্য-সম্পর্কিত, আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, চিত্রগত মূল্যবোধও পরিবর্তিত হয়। এবং হচ্ছে। এক শ বছর আগে গাছের শিকড়ের আঁকাবাঁকা চেহারা, তার টেনসন ও টেক্‌স্‌চার মানুষ উপেক্ষা করেছে, কিন্তু সেই শিকড়ের বিন্যাস, রূপ ও কারুকার্য আমাদের রুচিকে মুগ্ধ করছে আজ। এককালে যেসব জিনিস না থাকলে, যেসব নিয়ম না মানলে আমরা একটা ছবিকে বাতিল করে দিতাম সেসব জিনিস ও নিয়ম আজ জরুরি মনে হচ্ছে না এবং আজ যেসব জিনিস ও নিয়মকে আমরা জরুরি মনে করছি সেগুলো সেই অতীতকালের দর্শকের কাছে অনর্থক বা স্বেচ্ছাচার মনে হতে পারে। কিন্তু আজকের ছবিকে আজকের মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে।

অর্থাৎ বস্তুর কোন্ রূপ তাৎপর্যহীন ও কোন্ রূপ তাৎপর্যময়, কোন্ রূপটাকে বর্জন করা ও কোন্‌টাকে গ্রহণ করা হবে সেটাই শিল্পীর সমস্যা। কিন্তু তাৎপর্যটা কার জন্যে? তা কি শুধু শিল্পীর কাছে ধরা পড়ে? নাকি দর্শকের কাছেও তা ধরা পড়া চাই? এখানে এসে পড়ে শিল্পীর সঙ্গে দর্শকের সম্পর্কের বা Communication-এর প্রশ্ন এবং শিল্পীর কাছে দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সমস্যাই সবচাইতে চরম। প্রকৃতপক্ষে এ-সমস্যাকে
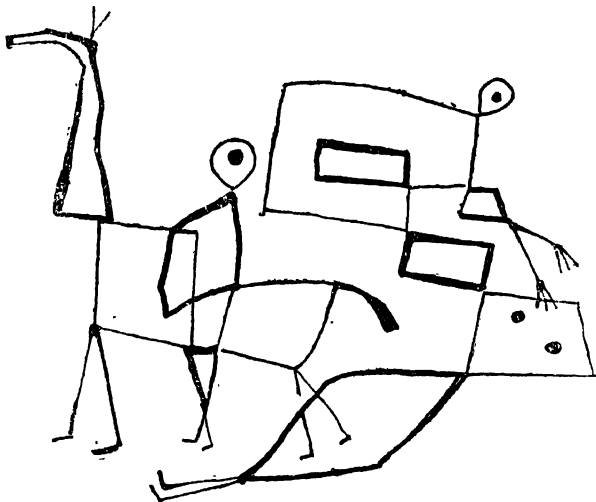
'সফল'—পল ক্লী। ১৯৩১

দ্বিতীয় কোনোও ব্যক্তি সমাধান করতে পারেন না, তা একান্তই শিল্পীর নিজস্ব সমস্যা এবং প্রত্যেক শিল্পীকে তা সমাধান করতে হয় নিজের নিজের পথে। যখন শিল্পী এটাকে সমাধান করতে পারলেন তখনই তাঁর শিল্প সার্থক।

কিন্তু গাছের শিকড়ই হোক, বা কোনোও ফসিলই হোক বা কোনোও মেরিন ফর্মই হোক, কিংবা বায়োলজিকল অথবা কসমিক ওয়ার্ল্ডেরই কিছু হোক—সবখানেই শিল্পী ফর্মকে কোনো-না-কোনো ভাবে মেনে নিয়েছেন, অবশ্য মেনে নিয়েছেন আমাদের অভ্যস্ত মামুলি জগতের বাইরে গিয়ে। এই মেনে নেওয়াটাও এক ধরনের পরাধীনতা, এক ধরনের শৃঙ্খল, কেননা তিনি এখনও ফর্ম্যাল ওয়ার্ল্ডেই আবদ্ধ। শিল্পী চাইলেন এর থেকেও মুক্তি, পাখির মতো আকাশে ডানা মেলতে—কোথাও কোনোও বাধা থাকবে না, সীমা থাকবে না। পাখি যে সবসময় খাবার খুঁজতে ডানা মেলে তা তো নয়, অনেক সময় নিছক ডানা মেলে দেওয়ার আনন্দেই সে ডানা মেলে। বিদ্যা, শিক্ষা, সামাজিক আচার, লৌকিক প্রথা ইত্যাদি আমাদের মনে কতকগুলি নিষেধ ও সংস্কারের জন্ম দেয়। শিল্পী চাইলেন এসব বাধাকে ডিঙিয়ে ছবি আঁকতে। সমস্ত পার্থিব মূল্যবোধকে অস্বীকার করে অনন্তের

সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মতোই নিছক ছবি আঁকার কাজটাতেই (action painting) তিনি আনন্দ খুঁজলেন। এক হিসেবে এই আনন্দ একটা অলৌকিক উন্মীলন, একটা মিষ্টিক আনন্দ।

সে-অবস্থাতে শিল্পী কি করেন? তিনি তাঁর সেই অপূর্ব অনুভূতিকে রূপ ও বর্ণ দেন; যেহেতু তখন তাঁর কাছে ফর্মের জগৎ একেবারে মিথ্যে তাই সেই রূপ ও বর্ণের সঙ্গে ফর্মের কোনোও সম্পর্ক নেই। কিংবা বলা যায় যে তখন শিল্পীর কাছে ফর্মহীন রেখা-বর্ণ-স্পেসের বিন্যাসটাই একটা ফর্ম, কিন্তু সে-ফর্ম একান্তই ব্যক্তিগত, সেজন্যে তাকে আমরা ফর্মহীনতাই বলব। অর্থাৎ শিল্পী তাঁর অনুভূতিকে কোনোও চিত্রকল্প বা রূপের আধারে পুরে দেন না, তাকে দেন নিরাধার অভিব্যক্তি। বিশেষ বিশেষ অনুভূতিতে তাঁর মন বিশেষ বিশেষ বর্ণ, বিশেষ বিশেষ রেখা, স্পেসের বিশেষ বিশেষ কতকগুলি বিন্যাস পছন্দ করে—আর তাঁর হাত যেন আপনা থেকেই সেই বর্ণ-রেখা-স্পেসের বিন্যাসকে ফুটিয়ে তোলে। ওই বর্ণ, রেখা, স্পেস, সে সবের বিন্যাস, শিল্পীর আঙুল, চোখ, ক্যানভাস, আলো—সব কিছু নিয়েই তাঁর অখণ্ড স্বাধীন শিল্পীসত্তা, কোনোটার থেকে কোনোটাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, আর সেই সত্তা কাজ করে যায় বোধ (sense) ও বোধির (intellect) ছোঁয়াচ এড়িয়ে। তখন শিল্পী ও শিল্প একই জিনিস।

এ ধরনের ছবি আঁকতে গিয়ে শিল্পী দেখলেন তাঁর পুরনো হাতিয়ার, পুরনো উপকরণ যথেষ্ট নয়। তখন তিনি তাঁর প্রক্ষোভ ও অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্যে নূতন জিনিসের সন্ধান করলেন। আমরা বিদেশী পত্রপত্রিকাতে পড়েছি যে পশ্চিমের কোনো-কোনো শিল্পী পিস্তলে রং ভরে গুলি ছুঁড়ছেন, গায়ে রং মেখে গড়াগড়ি খাচ্ছেন, বালতি বালতি রং ঢেলে হেঁটে বেড়াচ্ছেন ছুটে যাচ্ছেন সাইকেল চালাচ্ছেন ক্যানভাসের উপরে। সিমেন্ট, অ্যাসফল্ট, কোলটার, বালি প্রভৃতি হরেকরকম কারিগরি-শিল্পের ও ঘরকন্নার উপকরণও তাঁরা উদারভাবে ব্যবহার করছেন। এভাবে তাঁরা এমন সব ছবি আঁকতে শুরু করলেন যেগুলোকে কোনোও ফ্রেমে বাঁধা যায় না, যেগুলো সমুদ্রের মতো অনন্তের ইঙ্গিত নিয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত। কিন্তু এর মানে এই নয় যে এঁরা অন্তরের অস্থিরতা ও প্রচণ্ড সংরাগকে (passion) প্রকাশ করতে গিয়ে যা-খুশী তা-ই করছেন। যেসব শিল্পী এ ধরনের সার্থক ছবি এঁকেছেন,—যেমন জ্যাকসন পোলোক, মার্ক টোবে প্রভৃতি—তাঁরা প্রথম

ও মধ্য জীবনে এমন সব ছবি এঁকেছেন যা যে-কোনোও মানদণ্ডেই অসাধারণ, সেসব ছবিতে তাঁদের প্রতিভা ও দক্ষতা রক্ষণশীল দর্শকদেরও অভিভূত করে। পরিণত বয়সে এসে তাঁরা যে-নতুনত্ব দেখিয়েছেন তা মোটেই স্বেচ্ছাচার নয়, শুধু লক্ষ্য ও সাধনার পূর্ণতাপ্রাপ্তি। অর্থাৎ এখানেও রয়েছে অভিব্যক্তির প্রক্রিয়ার উপরে শিল্পীর স্বনির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ। এ যেন শিল্পীর সঙ্গে তাঁর হাতিয়ার ও উপকরণের একটা নাটকীয় সংলাপ, যেন একটা দুঃসাহসিক অভিযান ও অনবদ্য আবিষ্কার: ছবি আঁকাটা এক অজানা দেশে পর্যটন আর সেই পরিক্রমার পথে শিল্পী কত কী দেখতে পান, কত কী জানতে পান, কত কী কুড়িয়ে পান আর সেই পাওয়াটাই তাঁর সমস্ত পরিশ্রমের পুরস্কার, সমস্ত সাধনার সার্থকতা।

একটি মেয়ের মাথা
পিকাসো। ১৯৪১

প্রত্যেক নতুন জিনিসেরই একটা বৃদ্ধি আছে, একটা চরম শিখর আছে এবং তারপরে নতুনত্ব ঘোচে, তা পুরনো হয়ে যায়, তখন শুরু হয় অবরোহণ। এবং তখন ফর্মহীনতার প্রতিক্রিয়াতে শিল্পী আবার ফিরে এলেন ফর্মের মধ্যে, মূর্তি আঁকার দিকে। কিন্তু সেই ফিরে আসাটা যে-ঘাট ছেড়ে শিল্পী যাত্রা করেছিলেন সেই একই ঘাটে ফিরে আসা নয়, তাঁর সেই ফেরাটা সম্পূর্ণ নতুন এক ঘাটে। আগেকার কালে যেসব বিষয়বস্তু নিয়ে ফর্ম ও ফিগর আঁকা হয়েছে শিল্পী সেসব বিষয়বস্তুকে বাতিল করে এসেছেন, তাই তাঁর বিষয়বস্তুও হল নতুন। এই নতুনের চরিত্রটাকেও বোঝা চাই।

এবারে শিল্পীরা একেবারে আনকোরা নতুন চোখে সেসব জিনিসকে দেখতে লাগলেন যা আমাদের একালের দৈনন্দিনকার মামুলি জীবনের সঙ্গে জড়িত এবং সেসব জিনিস দিয়ে তাঁরা চাইলেন এক-একটা গল্প বলতে (বিষয়বস্তুতে প্রত্যাবর্তনের অর্থই হল গল্পবলার পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন)। যেমন একদা পুরাণ থেকে, যুদ্ধবিগ্রহের রাজারাজড়ার কাহিনী থেকে, পরে
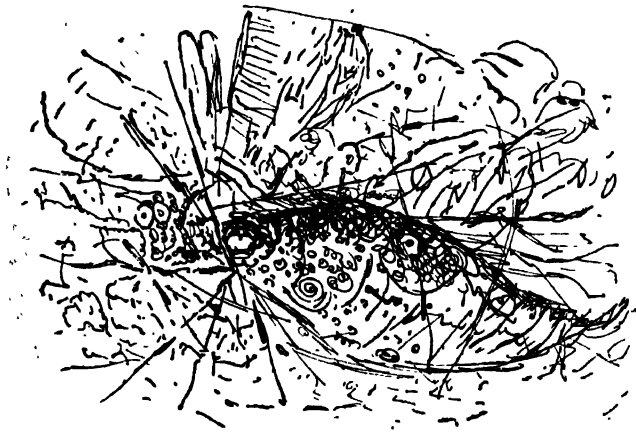
ড্রয়িং—য়ওল্স্। ১৯৪৭

নিসর্গ থেকে, নারীর দেহসৌষ্ঠব থেকে ছবির বিষয়বস্তু আহরণ করা হয়েছিল তেমনই এখন শিল্পী বিষয়বস্তু আহরণ করলেন জনতার জীবন, জনতার সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে, টেলিভিশন, সিনেমা, পোস্টার, খবরের কাগজ, টিনের কৌটোর লেবেল ইত্যাদি জনতার পক্ষে রুচিকর জিনিসের মূল্য বেড়ে গেল শিল্পীর কাছে। জনসংযোগের বিভিন্ন উপাদান থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করে এঁরা শিল্পকে টেনে তুলতে চাইলেন ফাইন আর্টের উচ্চস্তরে। এমনকি ছবির পেছনে টেপ-রেকর্ড রেখে কথা বলানোও হল, ছবির মধ্যে লাগানো হল রেডিয়ো বা টেলিভিশন সেট। মোটমাট এই পপ্‌আর্টের সমস্তটাই হল জনসাধারণের কাছে বেশ আমোদের ও আলোচ্য বিষয়।

এরপরে চিত্রকলার ধারা কোন্‌দিকে বাঁক নেবে, কোন্‌ পথে পরিণতি খুঁজবে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। আসলে এটা একটা জীবন্ত ধারা, তাই তা নিত্যনতুন পরীক্ষা ও সাফল্যের মধ্যে দিয়ে নিত্যনতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে করতে চলেছে ও চলবে। শিল্পীদের চলার যেমন শেষ নেই তেমনই শিল্পের রীতিনীতির পরিবর্তনেও শেষ নেই।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধের লেখক নিজেও একজন শিল্পী। শিল্পের কথা সাধারণভাবে বলতে গেলেও তাঁর নিজের দেশের শিল্পীদের কথা, নিজের দেশের শিল্পের ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিক চিত্রকলার ধারার কথা মনে হয়। কিন্তু মনে হলেই তাঁর হৃদয় ভরে যায় বিষণ্নতাতে। কেননা সাধারণভাবে বলা যায়

যে ভারতীয় শিল্পে এখন যা চলছে তা হয় প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা নতুবা নব্য পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলার অত্যন্ত পল্লবগ্রাহী ও নিকৃষ্ট অনুকরণ। সবচাইতে শোচনীয় এই যে দুটি ধারারই প্রশংসাতে মুখর দু-দল সমালোচক আছেন, যার কারণ আমাদের সমালোচনার মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের। ঐতিহ্য কোনো বিশেষ দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ জিনিস নয়, তা একটা সচল সর্বব্যাপ্ত শক্তি এবং বিশেষ করে আজ তা দেশের ভৌগোলিক গণ্ডিকে অতিক্রম করে চলেছে, ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে জাতীয় সীমানা বলে কিছুকে নির্দিষ্ট করতে যাওয়ার চেষ্টা নিতান্ত হাস্যকর। এটা জাপানী শিল্প, এটা ভারতীয়, এটা মিশরীয়, এটা ইউরোপীয় শিল্প বলে আজ কোনোও শিল্পকে সরিয়ে রাখার বা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা শিল্পীর পক্ষে ক্ষতিকর।

যে-আলোতে চোখ মেলে তাকাচ্ছে, যে-মাটিতে পা রয়েছে, যে-বাতাস বুকে নিচ্ছে, যে-জল জীবন দিচ্ছে তার ছাপ একজন সত্যিকার শিল্পীর কাজে নিশ্চয়ই থাকবে। আজ এমন এক জায়গায় শিল্পী এসে উপনীত হয়েছেন যেখানে শিল্পী জানেন যে, সুন্দর সুন্দরই, তার জাতপাত নেই,

ড্রয়িং—য়ুয়ান মিরো। ১৯৪৯
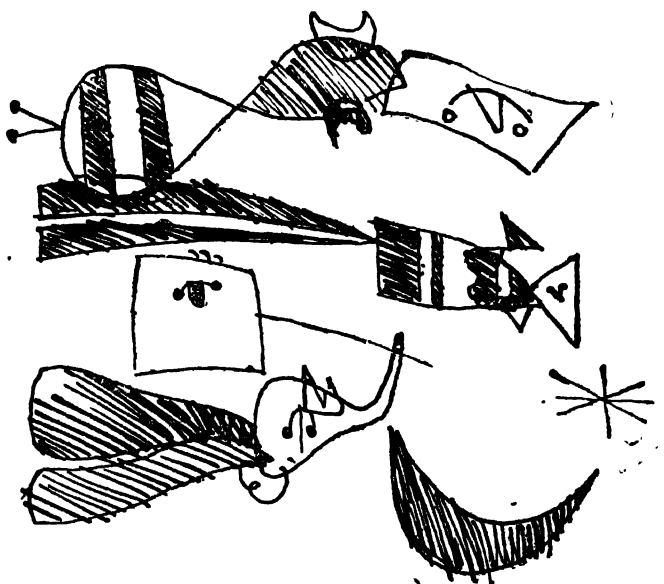
তাকে সুন্দর বলেই মানতে হবে, তার বেলাতে দেশ ধর্ম বা ঐতিহ্য তাৎপর্যহীন। অর্থাৎ একজন প্রকৃত শিল্পী একই সঙ্গে স্বদেশের ও সর্বদেশের, স্বকালের ও সর্বকালের। আন্তরিক চরিত্রে শিল্প সর্বদাই এক, যেমন অতীতে তেমনই বর্তমানে ও ভবিষ্যতে। তবে শিল্পের জাতীয় চরিত্র বলে একটা বাইরের বৈশিষ্ট্য একদা ছিল বটে, কিন্তু আজ তা মুছে গেছে এবং এ-সত্যকে দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তেই মেনে নিতে হবে; এই টেকনোলজি ও ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজশনের যুগে যখন সর্বত্র জীবনধারাতে একটা বিপুল পরিবর্তন চলেছে সার্বিক সমন্বয়ের দিকে তখন শিল্পের পক্ষে জাতীয় চরিত্র খোয়ানো একটা অনিবার্য ব্যাপার। কিন্তু সে সঙ্গে মনে রাখা দরকার, জাতীয় চরিত্র বিশ্বের চিত্রশিল্পে যে-বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমরা পাচ্ছি আর এক ধরনের বৈচিত্র্য: আজ শিল্পীর ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে দেখা যাচ্ছে অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য এবং সেই বিচিত্র ব্যক্তিত্বরাজির প্রকাশে শিল্প সামগ্রিকভাবে এমন এক বৈচিত্র্য লাভ করছে যার ব্যাপ্তি অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে আগাগোড়া অনন্য।

ইউরোপ থেকে আগত আধুনিক শিল্পের শিক্ষা যে দারুণ ধাক্কা দিয়েছে তার থেকে ভারতীয় শিল্পী সবে টাল সামলে উঠতে শুরু করেছেন—এখনও ততখানি সামলে উঠতে পারেন নি যখন প্রেরণার শুদ্ধতাকে অমোঘ মৌলিকতাতে প্রকাশ করা সম্ভব। আমার মনে হয়, এটা একটা পর্যায়মাত্র, অচিরেই কেটে যাবে। স্বদেশে ও বিদেশে কর্মরত মাত্র গুটি কয়েকজন ভারতীয় শিল্পী সেই শক্তি অর্জন করেছেন যা আধুনিক শিল্পীর অবশ্যই থাকা চাই এবং তাঁদের আঁকা ছবিতে নতুন সমৃদ্ধির প্রথম সংকেত দেখা যাচ্ছে। এই সমৃদ্ধির সত্যিকার অধিকারী তখনই হব আমরা যখন চোখে যা দেখা যাচ্ছে সেটাকেই দেখাবার চেষ্টা না করে যা দেখা যাচ্ছে না সেটাকে দেখাতে সমর্থ হব।

দিলীপ বসু

পণ্ডিত বিষ্ণুনারাণ ভাতখণ্ডে

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ (classical)* সংগীতের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের আবির্ভাব। জন্ম তাঁর আজ থেকে কিঞ্চিদধিক একশো বছর পূর্বে—আইন পাশ করে ওকালতী শুরু করলেও ক্রমশই সংগীত তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথমে সেতার, পরে ধ্রুপদ এবং অবশেষে রামপুরের ওয়াজির খাঁর নিকট বেশ কয়েক বছর শিক্ষালাভ করলেও পণ্ডিতজী কখনও জনসমক্ষে গান করেন নি। দু-একবার ঘরোয়া পরিবেশে যাঁদের তাঁর কাছে গান শেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁদের মতে (যেমন শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতি) পণ্ডিতজীর গানের গলা ছিল অপূর্ব : জলসাতে গান করা নিয়ে লোকে যাতে টানাটানি না করে, সেজন্যই পণ্ডিতজী একেবারেই আসরে গাইতেন না। আর তিনি যে কতবড় সমঝদার ছিলেন, তার প্রমাণ অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদের 'স্মৃতিকথা'-তে কিছু আছে (যেটা 'পরিচয়ে'র এই সংখ্যাতেই অন্যত্র ছাপা হচ্ছে)। মনে রাখা দরকার যে, আমাদের উচ্চাঙ্গ সংগীতে বড় সমঝদারের স্থান গায়ক বা বাজিয়ে থেকে কোনো অংশে কম নয়। গঙ্গার উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনীতে দেখি, মহাদেবের গান শোনবার যোগ্যতা অবধি নারদের ছিল না, তার জন্য ডাকতে হলো বিষ্ণুকে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশক অবধি উচ্চাঙ্গ সংগীতের জগতে যে খানিকটা অরাজকতা দেখা দিয়েছিল, তাতে গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পণ্ডিতজী আসরে গান করে নাম বা অর্থ উপার্জন করা অপেক্ষা সাংগীতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তন, লুপ্ত রত্ন উদ্ধার এবং জনসমক্ষে

---

* আজকাল ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতকে অনেক সময় মার্গ-সংগীত নামে অভিহিত করা হচ্ছে। এটি ভুল। অতীতের মার্গ ও দেশী সংগীতের শ্রেণীবিভাগ আজকে বোধহয় একেবারেই প্রযোজ্য নয়। সংগীত ছাড়া অন্যত্র ক্ল্যাসিক্যাল অর্থে ধ্রুপদী কথাটি ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটি বলা বাহুল্য সংগীতে করলে মানে সম্পূর্ণ বদলে যাবে, কারণ আজকের দিনে খেয়াল, এমন কি ঠুংরীকেও ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

উচ্চ সংগীতের বহুল প্রচারের পথ সুগম করাকেই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ত্রিশ বছরের ব্যবধানেও এ কথা আমরা বলতে বাধ্য যে, ঠিক ঐ কাজটি তখন না করা হলে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতে ঐতিহ্যমণ্ডিত পুরনো চেহারা কতখানি আজ বজায় থাকত, তা বলা শক্ত।

ইংরেজি শাসকবর্গ ভারতীয় সংস্কৃতির অন্য আর পাঁচটা জিনিসের মতোই ভারতীয় উচ্চ সংগীতের কোনো নিজস্ব সত্তা স্বীকার করতে চায় নি। অবশ্য উইলিয়াম্ জোনস্ ও ফক্স স্ট্র্যাংগয়ের মতো উজ্জ্বল ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আজো আশ্চর্য হই যখন দেখি যে, অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত সংগীত সম্পর্কে সুবৃহৎ গ্রন্থে ইউরোপের অখ্যাত সুরকারের নামোল্লেখ ও আলোচনা থাকলেও, মিঞা তানসেন থেকে শুরু করে কোনো ক্ল্যাশিক্যাল সুরকার অথবা আমাদের সংগীত-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (যেমন সপ্তকে ২২টি শ্রুতির অবস্থিতি) সম্পর্কে কোনো আলোচনা বা হদিশই পাওয়া যাবে না। পেলিক্যান সংস্করণে 'সংগীতের ইতিহাস' পুস্তকেও এই একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

ভাত্‌খণ্ডের অবদান শ্রদ্ধাবনতচিত্তে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বসূরী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ভূপেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রভৃতির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সংগীতশিক্ষার্থে স্কুলের চলন প্রথম করেন, তাছাড়া ইয়োরোপীয় নানারকমের বাদ্যযন্ত্র, যেমন ম্যান্‌ডোলিন, গীটার ইত্যাদির সঙ্গে ভারতীয় সেতার স্বরোদকে মিলিয়ে নানারকমের নতুন যন্ত্র তৈরির চেষ্টাও করেছিলেন। ১৯৬১ সালে পার্ক সার্কাস ময়দানে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে এই যন্ত্রগুলি বেঙ্গল মিউজিক্ কন্‌ফারেন্‌সের আয়োজিত সংগীত-প্রদর্শনীতে দেখার সুযোগ অনেকেরই হয়েছিল।

স্বরলিপি

ভাতখণ্ডে দেখলেন যে, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতে ঘরানা নিয়ে গোঁড়ামী, ঝগড়া-ঝাঁটি, অনেক সময় অর্থহীন তর্কাতর্কি রয়েছে, অথচ জনসাধারণের জন্য সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা প্রায় নেই। কারণ আমাদের উচ্চাঙ্গ সংগীতের

শিক্ষাপদ্ধতি ছিল গুরুকুলের ব্যবস্থাপনাতে গুরু-শিষ্যের একান্ত ঘনিষ্ঠ প্রাত্যহিক যোগাযোগের মাধ্যমে—শিষ্য গুরুকে আন্তরিক সেবার দ্বারা তুষ্ট করবে, গুরুও যোগ্য শিষ্যকে ছেলের মতো তাঁর নিজস্ব বহু আয়াসলভ্য জ্ঞানের অধিকার দান করবেন। তাহলেও শিষ্য নিশ্চয়ই গুরুর কারবনকপি হয়ে উঠলে বড় শিল্পী হতে পারে না। বিশেষ করে আমাদের সংগীতশিল্প যেখানে শ্রুতিনির্ভর, সেখানে যোগ্য শিষ্যপরম্পরার হাতে শিল্পের চেহারা খানিকটা বদলাতে বাধ্য।

অবশ্য রাগ-রাগিণীর কাঠামো এমনভাবেই বাঁধা যাতে তার স্বর (melody) ও রস মূলত বদলানো সাধারণভাবে সম্ভব নয়। তার উপর প্রামাণিক (index reference-এর মতো) ধ্রুপদাঙ্গের গানের দ্বারা রাগ-রাগিণীর কাঠামোকে সুস্পষ্ট সাজ পরিয়ে বেঁধে রাখা হয়। তথাপি কোনো বড় গুরুর আরো বড় শিষ্যের গায়ন বা বাজনা শুনলেই বোঝা যায় যে, যদিও একই ঘরানা শুনছি তথাপি পরিবেশনে আলাদা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটুকুর ছাপ স্পষ্টভাবে রয়েছে। প্রসঙ্গত, আলি আকবর খাঁ সাহেবের বাজনার সঙ্গে তাঁর পিতা ও গুরু আচার্য আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের মিল ও প্রভেদ লক্ষ করা যেতে পারে। একই বেহাগ রাগে কখনও করুণ, কখনও শৃঙ্গার রস প্রবলতর হতে দেখেছি, মালবকৌশিকে গম্ভীর অথবা ভক্তি। কারণ নিশ্চয়ই, আমাদের উচ্চাঙ্গ সংগীতে রাগ-রাগিণীর স্বরের সাজটুকুকে (melodic pattern) যেমন বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে গায়ক বা বাজিয়েকে দেওয়া হচ্ছে সেই সাজের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অবাধ বিচরণের ক্ষমতা।

বৈপরীত্যে এমন মিলনের সমন্বয় ইউরোপীয় সংগীতে স্বভাবতই কম (কে ভালো, কে মন্দ সেটা আমাদের বক্তব্য বা বিচার্য নয়) বলে সেখানে নিখুঁত স্বরলিপি করা সম্ভব।

আমাদের উচ্চাঙ্গ সংগীতে এইভাবেই এক-এক ঘরানার মধ্যে একাধিক বড় সংগীতশিল্পী তৈরি হলেও নিশ্চয়ই সাধারণ্যে ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের প্রচার এভাবে সম্ভব নয়। অথচ ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের রসোপলব্ধির ক্ষমতা জনসাধারণের না থাকলে ক্রমশই সেটা লুপ্ত হতে বাধ্য। বিশেষ করে আজকের দিনে, যখন রাজামহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা থাকা সম্ভব নয় এবং সেটা ভালোই, কারণ উচ্চাঙ্গ সংগীতকে নিশ্চয়ই rare plants (বা সৌখীন

স্পর্শকাতর লতা)-এর মতো নিভৃত বিশিষ্ট সৌখীন আবহাওয়ার মধ্যে জিইয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া আধুনিক যুগে মাইক্রোফোনের উৎপাত অনেক সময়েই বেশ পীড়াদায়ক হলেও এ কথা বলতে বাধ্য যে, ঐ যন্ত্রটি বিনা জনসাধারণে এই সংগীত প্রচারের আর কোনো সহজলভ্য উপায় ছিল না। অবশ্যই আজকের সংগীতের আসরে মাইক্রোফন যন্ত্রের দায়িত্ব এমন কারুর নেওয়া উচিত যাঁর সংগীত ও শব্দবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুটা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান আছে। বড় বড় সংগীত সম্মেলনে এটার অনেক সময়ে বিশেষ অভাব লক্ষ করেছি বলেই সামান্য অবান্তর হলেও কথাটা জোর দিয়েই বলতে হলো।

জনসাধারণের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সংগীতের বহুল প্রচারের ও বিশেষ করে সংগীত-সমালোচক না হোক, অনন্ত সংগীত-প্রেমিক তৈরি করার জন্য চাই এই সংগীত সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান। এটা বুঝেই, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর থেকে পণ্ডিত ভাত্‌খণ্ডে স্বরলিপি পর্যন্ত অনেকেই প্রচলনের চেষ্টা করেছেন। অবশ্যই সভয়ে গোড়াতেই স্বীকার করে নিতে চাই যে, আমাদের উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রধানত শ্রুতিনির্ভর, তার উপর রয়েছে মীড়, গমক, আশের প্রাচুর্য, অর্থাৎ গুরুর নিকট প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষালাভ ছাড়া যথার্থ শিক্ষা হতেই পারে না। এমনকি বন্দেজী তান বা স্বরবিস্তারও নিশ্চয়ই পুরোপুরি মুখস্ত করে হতে পারে না। তথাপি স্বরলিপির প্রচলন থাকলে গানের ও রাগের কাঠামো, বিশেষ করে গায়কী ও বাদ্যকৌশল, বিশেষ ধরনের স্বরপ্রয়োগ, ইত্যাদি ধরে রাখা সম্ভব।

সেটা বুঝেই পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, পরে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে আকার-মাত্রিক স্বরলিপি চালু করেন। বহু সংগীত-প্রতিষ্ঠানেই আজ স্বরলিপির ব্যবহার চালু হয়েছে। আলি আকবর খাঁ সাহেবকে দেখেছি, বিশেষ যত্ন নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বরলিপি লিখতে শেখাতে। তাঁর কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষাতে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার খাতার মতো ক্লাসের শিক্ষার স্বরলিপি-লেখা খাতা দাখিল করতে হয়। অবশ্যই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে স্বরলিপি লেখার অনুসরণ না করে নিজস্ব ভারতীয় পন্থাতে স্বরলিপির উন্নতি করবার প্রচুর অবকাশ আছে ও এর জন্য মিলিত প্রচেষ্টা হওয়া উচিত।

পণ্ডিত ভাত্‌খণ্ডে প্রণীত ছয় খণ্ডে সমাপ্ত "হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতি"-তে শতাধিক রাগ-রাগিণীতে বাঁধা প্রায় চারশ গানের মূল কাঠামো, বহু প্রকারের

তালের প্রকার ও মাত্রাভেদ, রাগলক্ষণ সম্পর্কে প্রামাণ্য শ্লোক ও উদ্‌ধৃতি প্রভৃতি দেওয়া আছে। অবশ্যই এই পুস্তকে কিছু মতামত আছে (যেমন মিয়া কি তোড়ীর আরোহণ-অবরোহণ), যা নিয়ে তর্ক উঠবে।

ঠাট

বহু রাগ-রাগিণীর ও গানের উদ্ধার, স্বরলিপি প্রচলন, ঘরানার গোঁড়ামী ভেঙে রাগ-রাগিণীর কাঠামোতে খানিকটা নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তন করা ছাড়াও পণ্ডিতজীর সর্বাপেক্ষা বড় অবদান উত্তর ভারতীয় সংগীতে দশ ঠাটের প্রচলন।

বারটি শুদ্ধ ও কোমল বা বিকৃত স্বরের যতরকমের জোট (combination) বাঁধা যেতে পারে, তাই নিয়ে কর্ণাটকী সংগীতে বাহাত্তর ঠাট গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানসম্মত হলেও বোধহয় বাহাত্তর ঠাটের অনেক ঠাটই খানিকটা কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট ; প্রমাণস্বরূপ কর্ণাটকী বহু ঠাট বাজালে বা গাইলে জনক রাগের আভাসও পাওয়া যাবে না। এই বাহাত্তর ঠাটকে ভেঙে সরলীকৃত করে সংগীতপিপাসু জনসাধারণের সহজবোধ্য করার জন্য ভাত্‌খণ্ডে দশ ঠাটের প্রচলন করলেন। দশ ঠাটের প্রত্যেকটিই জনক রাগের সঙ্গে বিশেষ মিল রেখে করা হয়েছে বলে কার্যক্ষেত্রের প্রয়োজনে সবাই একেই গ্রহণ করেছেন। বলাই বাহুল্য, সরলীকরণের জন্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও যা ঘটে থাকে, কিছু কিছু অস্পষ্টতা থেকে যেতে বাধ্য। ধরা যাক, জয়জয়ন্তী—কোন্ ঠাটে তাকে ধরব তা নিয়ে হয়তো তর্ক উঠবে।

তাহলেও, আসল কথা স্বীকার করতেই হবে—**দশ ঠাটের প্রবর্তনে সংগীতশিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক জ্ঞানের অভূতপূর্ব সুবিধা হয়েছে।**

সংগীতশাস্ত্রে গবেষণা

ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী, পরে পুত্র রাগ বা কন্যা রাগিণী ইত্যাদির ধারণাতে বেশ খানিকটা কৃত্রিমতার ছাপ এসে গিয়েছিল। যাঁরা একেবারে সংগীতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সংগীতশাস্ত্রজ্ঞ হতে চান, তাঁদের নিশ্চয়ই রাগ-রাগিণীর শ্রেণীবিভাগকে ভালো করেই বুঝতে হবে। তাছাড়া ষড়জ ও মধ্যম গ্রামের (গান্ধার গ্রামকে বোধহয় বাদ দেওয়া যেতে পারে) শ্রুতিবিন্যাসের সম্যক্‌

কারণও অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন আছে। চল বীণা ও ধ্রুব বীণার সাহায্যে শ্রুতির পরিমাপ করা অতীতে সম্ভব হলেও আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যে টিউনিং ফর্ক, সোনোমিটার ইত্যাদির মারফৎ শ্রুতির পরিমাপ হওয়া দরকার।

এটা ঠিকই যে, সপ্তকে ৬৬ শ্রুতি ভাগ অবাস্তব—আসলে একটি শব্দের কম্পনসংখ্যার কত সামান্য বৃদ্ধি হলে শব্দটি বদলে যাবে, অর্থাৎ অন্যরকমের শোনাবে, সেটাই নিশ্চয় শ্রুতির পরিমাপ। মধ্য সপ্তকের ষড়জ থেকে তার সপ্তকের ষড়জের কম্পনসংখ্যার যে দ্বিগুণ বৃদ্ধি, তাকে লগারিথম্ টেব্‌লে ফেলে এক হাজার দিয়ে গুণ করলে সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৩০।—একে ২২ শ্রুতিতে ভাগ করলে কি দাঁড়ায় (ফরাসী গণিতজ্ঞ স্যাভার্তের হিসাব) সেটাও দেখা দরকার।

অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমাদের শ্রুতিবিন্যাস কেন বদলে অতীতের নিখাদের মূর্ছনা আজকের বিলাবল ঠাট হয়ে দাঁড়াল, সেটাও সবিশেষ অনুসন্ধান করা দরকার।

ভারতীয় সংগীতের এই রকমের কিছু কিছু জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধান করতে হবে পণ্ডিত ভাত্‌খণ্ডের উত্তরসূরীদের। মার্গসংগীতের বহুল প্রচার ও শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার চেষ্টা আজ বেশ কিছু হচ্ছে। প্রতি বছরে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের দু-বছরের জন্য স্কলারশিপ দেওয়া ভারত সরকার চালু করেছেন, তা' ছাড়া কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে এবং বাংলাদেশের বেশ কিছু জিলা সদর টাউনেও সংগীতশিক্ষালয় গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রভারতী, শান্তিনিকেতন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও সংগীতশিক্ষার পাঠক্রম বেশ ভালো ভাবেই চালু আছে।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, সে তুলনায় সংগীতশাস্ত্র (musicology) সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণের গবেষণা দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকী সংগীতের তুলনায় উত্তর ভারতে হচ্ছে না। শুধু সংগীতশাস্ত্রের কিছু কিছু সমস্যা (সামান্য দু-একটি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি) নিয়েই গবেষণা করলে চলবে না, আমাদের যন্ত্রগুলিকে আরো উন্নত করার প্রচুর অবকাশও আছে।

পণ্ডিত ভাত্‌খণ্ডে শেষজীবনে বীটোভেনের মতো প্রায় বধির হয়ে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ একজায়গায় লিখেছেন, ভাত্‌খণ্ডে তাঁকে একদিন বললেন যে, গতকাল মল্লার রাগ যেন মূর্তি ধারণ করে তাঁর কাছে

উপস্থিত হয়েছিল। নবম সিম্ফনি রচনার সময়ে বীটোভেন সম্পূর্ণরূপে বধির। সিম্ফনির প্রথম পরিবেশনে (১৮১৮ সালে তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে) বীটোভেন অর্কেষ্ট্রা-বাদক ও গায়কদের সঙ্গে বসে থাকায় দর্শকদের দিকে ছিলেন পেছন ফেরানো—সিম্ফনি অন্তে প্রচণ্ড হর্ষ ও হাততালির কোনো শব্দই তাঁর কানে আসে নি বলে তিনি মুখও ঘোরান নি।

সুরের বাণীহীন রূপ (non-verbal image) বহু সংগীতজ্ঞের কাছেই নিশ্চয় প্রত্যক্ষ অনুভূতিস্বরূপ।

"Heard melodies are sweet, but those unheard
Are sweeter ; therefore, ye soft pipes, play on ;
Not to the sensual ear, but, more endear'd,
Pipe to the spirit ditties of no tone."

কুমার রায়

সৎনাট্যের অভিধা

বাংলাদেশে নাট্য-আন্দোলনের সামনে 'বৃহৎ-সমস্যা' দেখা দিয়েছে ঘোষণা করে সমস্বার্থবিশিষ্ট কিছু নাট্যকর্মী বা বলা ভাল রাজনৈতিক কর্মী এক ফতোয়া জারী করেছেন। এবং সে ফতোয়ায় 'সৎ-নাট্যের' প্রয়াসকেও অন্যতম বৃহৎ সমস্যা হিসাবে দেখান হয়েছে। নচেৎ সে ঘোষণায় মন না দিলেও চলত। কারণ শিল্পকে নানান উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার নজীর অনেক। এবং সে গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদের সমাজে স্বীকৃত। প্রচার-সাহিত্য, বিজ্ঞাপন-সাহিত্য বা চলচ্চিত্রকে বাহন করে বিজ্ঞাপন-চিত্র, তথ্য-চিত্র, প্রচার-চিত্রের নজির তো হাতের কাছেই আছে। আর আমাদের আলোচ্য নাট্যশিল্পকেও পার্টি রাজনীতি বা সরকারী নীতির প্রচার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে আমরা দেখেছি। নাটক বাদে উল্লিখিত অপর দুটি ক্ষেত্রে বিচারের সংশয় নেই। উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা এই দুই ক্ষেত্রে এমন ভাবেই সুচিহ্নিত যে বিভ্রান্তির অবকাশও নেই। এদের আপন মেরু সুনির্দিষ্ট না হলে অপরিমেয় বিড়ম্বনা ভোগ করতে হত। কিন্তু কুড়ি বছরের পর নাটকের ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যাপারটা ঘুলিয়ে যাওয়ার ফলে এই বিচারের, পরিচয়ের বিড়ম্বনা উপস্থিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে সমস্বার্থবিশিষ্ট এই জোটের ফতোয়া বাঞ্ছিত পোলারাইজেশনের কাজকে সহজ করে দিয়েছে। এবং এটা সম্পূর্ণভাবে জানা থাকলে ভুল হবে না বিচারে এবং পরস্পরের মধ্যে আর প্রয়োজন হবে না ঈর্ষা দ্বেষ প্রকাশের। আর সমালোচক, দর্শকও যার যা উদ্দেশ্য সেটা জেনে নিয়েই সেটা মেনে নেবেন, বুঝে নেবেন।

এঁরা সততা, ভদ্রতা, সূক্ষ্ম রুচি, গভীরতা ইত্যাদিকে পরিত্যাজ্য বিবেচনা করবেন। এঁদের কারো কারো কাছে শিল্প বিরাটত্ব লাভ করে তখনই যখন তা কেবল সর্বহারা শ্রেণীর কাজে লাগে। এঁদের কারো কারো ঘোষণা রাজনীতি ছাড়া নাটক হয় না। দর্শকের মান যেখানে যেমন সেখানে তেমন

করেই তাঁরা অভিনয়ের অনুষ্ঠান করবেন—উৎকর্ষের কথা আপাতত তালাচাবি মারা থাকবে। পরিচালক জ্ঞানী হলে তার প্রকাশ ঘটালে চলবে না। তাঁরা শোষণের বিরুদ্ধে তাঁদের দর্শকদের সংগ্রামই নাটকের একমাত্র বিষয়বস্তু বলে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে 'কেন্দ্রীয় মূলনীতি' তাঁদের অধীনস্থ দলগুলি মানতে বাধ্য। এঁদের ফতোয়া মেনে পৃথিবীর তাবৎ নাট্যশিল্পের আদর্শ সুপরিনির্দিষ্ট হলে অবস্থা কী হত সে কল্পনা করা সময়ের অপব্যবহার—কারণ পৃথিবী তো কেবল ছোট-মাপের মানুষেই ভর্তি নয়। আর তাছাড়া ময়দানের রাজনৈতিক বক্তৃতা, দেওয়ালে রাজনৈতিক পোস্টারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য—তারই পরিপূরক হিসাবে নাট্যশিল্পকেও কাজে লাগান হবে তো হোক দলের খাতিরে, রাজনৈতিক আদর্শের খাতিরে। কিন্তু ওই পর্যন্তই তার সীমানা। ওইখানেই তাঁদের মেরু নির্দিষ্ট হোক।

নাটকের ক্ষেত্রে যে-বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে এই সীমানির্দেশ না করায়, তারই জন্য 'সৎ-নাট্যের' আকাঙ্খা। বাঁচাবার জন্যেই কখনো কখনো মানুষকে যেমন একলা হতে হয় ভিড়ের থেকে। শিল্প প্রতিনিয়ত অসাধ্যের মধ্যে ডাক দেয়।

এ কথা যদি মানি তা হলে এও মানতে হবে যে সেই অসাধ্য সাধনেই বিপ্লব ঘটে; ব্যাপকার্থে বিপ্লব। নাট্যশিল্পের প্রগতির পথে, প্রতি পর্বে, এক একটা চ্যালেঞ্জের সামনে এসে দাঁড়াতে হয়েছে এবং আরও হবে। সে চ্যালেঞ্জ কখনো এসেছে কমার্শিয়ালিজম্-এর কাছ থেকে কখনো বা 'পেটি রিয়ালিজম্'-এর কাছ থেকে কিংবা কোনো ইনষ্টিটিউশনের ফতোয়া জারীর মধ্যে থেকে। কিন্তু যে শিল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষ—সেখানে সেই মানুষের গভীরতম তাৎপর্য প্রকাশের জন্যেই এই সব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। যাঁরা সেই কাজ করেন তাঁরা বিপ্লবী। বিপ্লব মানে তো পরিবর্তন—এবং এ পরিবর্তন—নিজেকে অতিক্রম করার। আর যে-অবস্থায় আছি তাকে অতিক্রম করে যাওয়াই তো প্রগতিধর্মিতা। আজকের বাংলা থিয়েটারে সেই আহ্বান এসেছে 'সৎনাট্যের' দাবি থেকে।

একটা 'অনেস্ট ইন্টেলেকচুয়াল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার দাবি কি খুব অস্বাভাবিক? অস্বাভাবিক না হলেও অনেকগুলো জট বোধকরি খুলতে হবে। এবং সে জটের বেশির ভাগটা নিজেদের মধ্যেই। একটা কথা প্রথমেই স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে স্রোতস্বিনী নদীর জল সবসময়েই পানযোগ্য।

কিন্তু তা যদি কোনোও একটা বিশেষ খালে আটকে গিয়ে বদ্ধজলার সৃষ্টি করে তা হলে তার পানযোগ্যতায় সন্দেহ থাকে—কখনো কখনো তা বিষাক্তও হয়ে ওঠে। আমাদের নাট্যের স্রোতকে মানলে—'গণ'—থেকে 'নব' এবং 'নব' থেকে 'সৎ' এই উত্তরণের পথকে মানতে হবে। এতে যদি কেউ আপত্তি তোলেন এবং বলেন যে এটা একটা বুদ্ধিজীবীর 'বস্তুবাদী-থিসিস' খাড়া করা হয়েছে এবং 'সৎ' এবং 'নাটক' এ-দুটি কথা আপাতবিরোধী কারণ তাঁদের কাছে সব নাটকই নাকি সৎ এবং প্রত্যেকে সৎভাবেই নাটককে সার্থক করে তুলতে চান—তাহলে তদুত্তরে বলা ভাল যে প্রথমত কথাটা 'সৎনাট্যের', সৎ নাটকের নয়। আর তাছাড়া আজকে যত নাটক হচ্ছে তা সবই যদি সৎ হয় তা হলে বোধকরি আমরা একটা আইডিয়াল অবস্থায় বাস করছি—তা হলে আর এত দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধের প্রকাশ কেন? 'অবশ্য হ্যাঁ, তারা তাঁদের স্ব-স্ব উদ্দেশ্যের কাছে—অর্থাৎ নাট্যব্যবসায়ী তাঁর ব্যবসার কাছে, পার্টি'র পার্টি'জান তাঁর পার্টি'র ফতোয়ার কাছে, প্রমোদ প্রমত্ত তাঁর প্রবৃত্তির কাছে হয়ত সৎ (?) থাকছেন এবং তদ্দ্বারা সকল নাটক এবং নাট্যানুষ্ঠানই সৎ এমন একটা পাল্টা থিসিস্ খাড়াও করা যেতে পারে।

নাট্যশিল্প মানুষের সৃষ্টি, মানুষের প্রেরণা, মানুষের সাধনা দিয়েই গড়ে উঠেছে। মানুষের আবেগ ও ভাবরাজ্য, মানুষের চিন্তাধারাকে অবলম্বন করেই তার স্থিতি। অত্যন্ত পুরনো কথা তবুও উল্লেখ করতে হচ্ছে নাট্যশিল্পের জন্ম সামাজিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে। তাই জন্মলগ্নেই এই শিল্প সামাজিক। থিয়েটারের সমগ্র ইতিহাস—অন্যান্য সমস্ত ইতিহাসের ধারার মতোই—তার উত্থান এবং পতনের পর্ব সুচিহ্নিত। দেখা গেছে যখনই থিয়েটার সামাজিক মানুষের আশ্রয়চ্যুত হয়েছে—যখনই তাকে কোনোও বিশেষ ধর্ম, সংকীর্ণ আদর্শ, বা সাময়িক উত্তেজনাকে আশ্রয় করতে হয়েছে—তখনই তার প্রাণস্বরূপ বিনষ্ট হয়েছে—এ শিল্প আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সার্থকতার বাণী সে বহন করতে পারে নি। তাকে মুক্তি খুঁজতে হয়েছে ভিন্নতর পথে। সেই পথ সৎ শিল্পভাবনাপ্রসূত।

সমসাময়িক অবস্থায় মর্মান্তিক বিপদ বোধ থেকেই এ আকাঙ্খা জাগে। এই বাংলাদেশে, এই 'সৎ নাট্যের' বর্তমান আকাঙ্খাকে নিয়ে—বোধকরি চারবার বেদনা বোধ থেকে পরিবর্তনের কথা উঠেছে। প্রথমবার বিদ্রোহী

মাইকেল অলীক কুনাট্যরঙ্গে পীড়িত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দফায় রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছিলেন—"বাংলাদেশে একটি অতিরিক্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা চলে না ?…এখন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদেরও অভিনয় দেখার সাধ হয় এবং মনের মধ্যে নাটক লেখবার ইচ্ছা জাগে।" তৃতীয় অধ্যায় গননাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠাকালে। যদিচ সে সংঘের উদ্যোক্তাদের মনে নাটকের তৎকালীন দুরবস্থা প্ররোচিত করেছিল না অন্য কোনোও ভিন্নতর উদ্দেশ্য সাধন সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে তবুও সংঘে জোটবদ্ধ হয়েছিলেন অনেক শিল্পী, বুদ্ধিজীবী যাঁরা সমসাময়িক নাট্যশিল্পের আবদ্ধ আবহাওয়ায় অতৃপ্ত ছিলেন। অবশ্য গণনাট্যের জন্মলগ্নের প্রস্তাবে—"…revitalising the stage and traditional art…" এ কথাটা লিপিবদ্ধ ছিল। সাম্রাজ্যবাদীশোষণ, ফ্যাসিবাদের রাক্ষস-তত্ত্ব, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা ভারতবাসীকে বাস্তব সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। শিল্পীকেও। তাই গণনাট্য আন্দোলন—'People's theatre stars the people"—পণ্ডিত নেহরুর এই স্লোগানকে গ্রহণ করে প্রসার লাভ করল। গণনাট্যের দান নবনাট্যের ভাবনায় এবং পরবর্তী, অর্থাৎ বর্তমানকালের সৎ নাট্যের ভাবনায় অনস্বীকার্য। তার কারণ গণনাট্যের সূচনাকাল ইতিহাসের অন্তর্গত।

গণনাট্যের প্রথম পর্বে যে-নেতৃত্ব থিয়েটারের ক্ষেত্রে এল তা বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকেই এল। তাঁদের মধ্যে তখনও প্রত্যক্ষ ছিল 'মনন-চিন্তা-অনুরাগ-আবেগের এক অভিব্যক্তি।' এই উচ্ছ্বসিত মানসিকতায় নিঃসন্দেহে নতুন রাজনৈতিক চেতনা, বাস্তববোধ এবং নতুন সমাজের আশা ছিল। সে সময়ের অপর বৈশিষ্ট্য হল দুরন্ত দুঃসাহস, স্পর্ধিত আত্মত্যাগ, দুরবগাহী কল্পনার আর আদর্শের অকুতোভয় আহ্বান। তারই ফলে শিল্পসমৃদ্ধ, কাব্যময় অথচ জীবন-সন্ধানী এবং উদ্বুদ্ধ করার মতো কয়েকটি সৃষ্টি সম্ভব হল। নবান্ন, জীয়নকন্যা, জবানবন্দী, আর মধুবংশীর গলি, নবজীবনের গান—উল্লেখযোগ্য। উৎকর্ষ দিয়েই এগুলির স্বাতন্ত্র্য। ইতিমধ্যে পপুলারাইজেশন এবং এলিভেশনের প্রশ্ন এসে গেছে। এসে গেছে দলের পার্টিজান এবং নন্-পার্টিজানের স্বাধীন সত্তার সংঘাত। সে সংঘাতে (আজকের হিসাবে) কে জয়ী হয়েছে—তা বোধকরি সচেতন মানুষের কাছে অস্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যে নাট্যভাবনায় দুটো ভাবনা দেখা দিল। মনন-চিন্তা-আবেগ, দুরবগাহী কল্পনার এবং নাট্যের আদর্শের আহ্বান এক ভাবনায়—আর-এক ভাবনায় বুদ্ধির খণ্ডিত

অংশ—ক্রোধ, দ্বেষ, ঘৃণা আর অপ্রেম যা দলের সংকীর্ণ স্বার্থের পরিপোষক। প্রকাশের মধ্যে স্বভাবতই ভিন্নতা দেখা দিল। প্রথম ভাবনা পুষ্ট হতে থাকল আর দ্বিতীয় ভাবনা ক্রমশ খণ্ড খণ্ড হতে থাকল এবং প্রায় অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেল। সে যাই হোক—গণনাট্যের সবচেয়ে বড় ফল এই হল যে অনেকের মনের নাট্যের আকাঙ্খা বেড়ে গেল এবং বোধকরি প্রথম অনুভূত হল যে ব্যবসায়িক মঞ্চের বাইরে নতুন ভাবনার নাটক করা যায়—শুধু যায় না, তা লোকের ভালোও লাগে। পেশাদারি মঞ্চের একছত্র প্রতিপত্তি এবং প্রভাবের বাইরে ভাল নাটক ভালভাবে পরিবেশিত হতে পারে এ ভরসা এল—নইলে এ আত্মপ্রত্যয় কবে আসত কে জানে!

'নবান্ন'র অভিজ্ঞতা দিয়েই নব-নাট্যের কাজ শুরু। হল 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'ছেঁড়াতার' আর 'নতুন ইহুদী'। বাস্তব জীবনকেই প্রকাশ করা হল—রাজনৈতিক এবং সামাজিক সচেতনতাও প্রকাশ পেল। তখন রিয়ালিজম্‌কে প্রকাশ করার চেষ্টাটাই বড়। নানান পরীক্ষা-নিরিক্ষার মধ্য দিয়ে একটা পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা থিয়েটারের সত্যকে খুঁজে পাওয়া—এবং সমগ্র থিয়েটারকে ধরা এই প্রচেষ্টার অন্তর্গত। সেই সমগ্র থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেই মঞ্চসজ্জা রিপ্রেজেণ্টেশন্যাল হল, আলো নাট্যের মুড্ প্রকাশক হল; অভিনয়ে flamboyant অভিনয়রীতি অনুসরণ না করে স্বাভাবিক এবং রিয়েল করবার অনুশীলন স্পষ্ট হল। এই সমগ্র থিয়েটারের অনুশীলনটা যথার্থ প্রগতির পথে চললে নবনাট্যই সৎনাট্য হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি বলেই সৎনাট্যকে আলাদা করে চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আমাদের স্বভাবদোষেই হোক বা অন্য কোনোও কারণেই হোক নাটকের আকাঙ্খাটা নাটুকে হুজুগে রূপান্তরিত হয়ে গেল। দর্শক ইতিমধ্যে কতকগুলি প্রচলিত ধূয়োকে ধরে ন্যায়বিচারে অপারগ হল। সবাই নবনাট্য করছেন -এবং সবাই টোটাল্ থিয়েটারের কথা বলছেন। বিশদ আলোচনায় না গিয়েও বলা ভাল যে পুরনো পেশাদারি পাপগুলো অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকল। হতভাগ্য অফিস ক্লাবগুলিই শুধু নবনাট্যের বাইরে থেকে গেল—নইলে নবনাট্যের সংখ্যার ভিড়ের সঙ্গে অফিস ক্লাবের অভিনয় আসরের বড় বেশি তফাৎ থাকল না। কাজে কাজেই সৎনাট্য আর এদের মাঝখানে একটা নির্দিষ্ট লাইন টানতে হবেই।

বস্তুত সৎনাট্যের আকাঙ্খা 'রক্তকরবী' নাটক থেকেই উঠেছে। শিল্পের

উৎকর্ষবোধ, নবতর ভঙ্গি আনয়নের আগ্রহ কাব্যসুষমা, সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে মানুষের অবস্থান সম্বন্ধে সচেতনতা ইত্যাদিই সৎনাট্যের প্রেরণা। রক্তকরবীর পর মনে হল এই নাটক যথার্থ ভারতীয়; মানুষের এবং তার সংকটের, সংঘর্ষের কোনোও স্তরই বাইরের পরিধির নয়, গভীরের—কেন্দ্রবিন্দুর সন্নিকটের। রিয়ালিটির গভীরে অন্বেষা, সমাজের স্তরবিন্যাস, আবেগের সত্য এ নাটকে উপলব্ধ হল। এখানে শ্রেণীর কথা আছে, সংকটের কথা আছে এবং সংঘর্ষের কথাও স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু সেটাই এ নাটকের শেষ কথা নয়। আরও বড় জায়গায় মানুষের জীবনের, যৌবনের জয়গানে এ নাটকের সমাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের সংলাপ প্রতিদিনের ব্যবহারের ভাষা নয় এবং এ নাটক অনেক গভীর। এর সূক্ষ্মতা, জটিলতা প্রকাশ করা আয়াসসাধ্য। এই নাটকে একটা গভীর ছন্দে উপনীত হতে হয়। সমাজগত মানুষ আর ব্যক্তিগত মানুষের সম্পর্কের কথা আছে এতে। শুধু সমাজের বাইরের স্তর নয়, শুধু ন্যাচারালিজম্ নয়, রিয়ালিটিও নয়, রিয়ালিটির গভীরের অন্বেষা এ-নাট্যে। তাই এর অভিনয়, প্রযোজনা, আলো, মঞ্চ অনেক সূক্ষ্মতা, গভীরতা দাবি করে। সেই দাবি সৎ নাট্যের—টোটাল্ থিয়েটারের।

স্বাভাবিকভাবে এই আকাঙ্খাকে স্বাগত জানানরই কথা। কিন্তু সম্প্রতি কারো কারো কাছে, সৎ নাট্য প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে। তাঁরা তাই একে 'ভাববাদী তমসা', পলায়নী মনোভাব, বৃহন্নলা বৃত্তি ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করে নিজেদের উদ্দেশ্যকে মহত্তর বলে দাবি করছেন। তা করুন, তাতে সৎ নাট্যের ক্ষতি নেই। এমন এককালে আমরা বাস করছি যে-কালে সৎ, সততা, সত্য এবং সংকল্প ইত্যাদি কথাগুলি উপহসিত, মূল্যহীন। বোধহয় প্রমাণ হয়ে গেল যে মিথ্যের মতো শক্তি সত্যের নেই। কাজে কাজেই তাদের দোষ দেওয়া যায় না। আবার কাজে কাজেই জোরের সঙ্গে বলবার থাকে সৎ, সত্য, মূল্য, সংকল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা। নইলে কোন মহত্তম ভবিষ্যতের কথা আমরা ভাবব? সেই ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আমরা ছোট সংকল্পে আমাদের নাট্যপ্রয়াসকে বাঁধতে চাই না। পৃথিবীতে প্রমাণ হয়ে গেছে যে তদ্দ্বারা শিল্পের, সমাজের বা মানুষের কারো ভাল করা যায় না। বুদ্ধি, সূক্ষ্মতা, জটিলতা, গভীরতাকে সাধারণের বোধের মানের কথা ভেবে খর্ব করলে ফল ভালো হয় না। "স্থূল দেহবিশিষ্ট" প্রেক্ষাগৃহের বিপুল সংখ্যাধিক্যের উত্তেজনা সৃষ্টি করাটাই চরম লক্ষ্য নয়।

দর্শকের মানকে দিকদর্শক করাতেই যাদের সার্থকতা বা পপুলারাইজেশন যাদের লক্ষ্য তারা মাওৎ-সে-তুং-এর ইয়েনান্ বক্তৃতা উদ্ধৃত করুন ক্ষতি নেই (হায় বিস্মৃত প্রায় ঝ্দানভ্ এবং তাঁর শিল্প সম্পর্কিত ফতোয়া!)। সৎ নাট্যের কথা যাঁরা ভাবছেন তাঁদের সামনে শিল্প সম্পর্কে (রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই 'কলাকৈবল্যবাদী' নন) রবীন্দ্রনাথের মতো জীবনশিল্পীর, মানুষের সপক্ষের শিল্পীর নির্দেশ আছে। দর্শকদের বোধের মানকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে ফল কী হতে পারে তা শোনা আছেঃ বহুদিন আগে—গান্ধীজীর তখন অসাধারণ খ্যাতি, এলাহাবাদের এক গ্রাম্য সর্দার বলছে—গান্ধীজীর কারাবাসের কথা শুনে,—সে নাকি শুনেছে যে গান্ধীজীর অলৌকিক ক্ষমতা আছে—সেই কারণে জেলখানায় তাঁকে আটকে রাখা ইংরেজ সরকারের অসাধ্য। অলৌকিক ক্ষমতা বলে গান্ধীজী নাকি এক প্রাকৃতিক কর্ম করে জেলখানা ভাসিয়ে দিতে পারেন। আশা করা যাচ্ছে যে কোনোও অল্পবুদ্ধি প্রচারক জনতার বোধকে স্বীকার করে নিয়েই গান্ধীজীর আত্মিক শক্তিকে ওই ভাবে দেখিয়েছিলেন সরলপ্রাণ গ্রাম্য ব্যক্তিটিকে। কিংবা টল্স্টয়ের সেই গল্পও উল্লেখ করা যেতে পারে পপুলারাইজেশনের নজীর হিসাবে। কোনোও এক সমাবেশে তিনি একজন বলশেভিক বিপ্লবীর ফেরারী অবস্থায় এক বারবনিতার গৃহে আশ্রয় নেওয়ার গল্প বলেছিলেন। তাঁর বর্ণিত ঘটনার বিবরণে ছিল যে সেই বিপ্লবী আশ্রয় নিলেন তার ঘরে এক রাত্রে। সে জিজ্ঞেস করল কেন তার এ অবস্থা—তখন সেই বিপ্লবী তাকে সবিস্তারে জারের শাসন থেকে দেশের মুক্তিআন্দোলনের ইতিহাস শোনায়। সারারাত সে মেয়ে নির্বাক হয়ে শুনল সে ইতিবৃত্ত। রাত্রিশেষে সেই বিপ্লবীর যখন আস্তানা ত্যাগের সময় এসেছে তখন সেই মেয়ে তার সারাজীবনের পাপ ব্যবসায়ে সঞ্চিত সম্পদ বিপ্লবীর হাতে তুলে দিল—তাকে কাজে লাগানর অনুরোধ জানাল শুধু। এই গল্প শোনার কিছুদিন পর আর-এক সমাবেশে একজন টলস্টয়কে বললেন যে সেদিনকার শোনা ঘটনা অবলম্বন করে তিনি এক গল্প লিখে ফেলেছেন। সে গল্পে তিনি দেখিয়েছেন যে কী করে গল্প শুনতে শুনতে সেই বারবনিতা, ফেরারী ছেলেটির প্রেমাসক্ত হল,—সে প্রেম কী ভাবে প্রকাশিত হল তার সবিস্তার বর্ণনা আছে এবং রাত্রিশেষে সে প্রেমবশেই দয়িতকে সবকিছু তুলে দিল। অর্থাৎ গল্প পপুলার হল। যা অনুচ্চার ছিল তাকে বেশ ঝালমশলা দিয়ে রগরগে করা হল। শোনা যায়

সে গল্প শুনে টলস্টয় লেখকের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করেছিলেন। সৎ নাট্যের আসরে এ জাতীয় পপুলারাইজেশনের কোনোও স্থান নাই। তেমনি কোমর বেঁধে কোনোও নীতি-উপদেশ দিয়ে পৃথিবীকে পালটে দেব এমন সংকল্পও সৎ নাট্যের প্রতিশ্রুতিতে নেই। যদি কোনোও উন্নতি হয়ও সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়েই তা ঘটে। 'মানুষের পুরুষার্থ আরোপ করে। সেখানে প্রযুক্ত হবে চিন্তা, কথা, প্রতীক' এবং উপজীব্য হবে সমগ্র মানুষের জীবন। এখানকার কাজ হল প্রাণসঞ্চার করা, জীবন্ত করে তোলা আর কিছু নয় এবং এই কাজে সৎনাট্যের অস্তিত্ব সীমায়িত হচ্ছে দুটি নিয়মে: জ্ঞান ও রূপ; দুই-ই একত্রে এবং একসঙ্গে। অন্য কোনোও নিয়ম বা নীতি নয়। এই দুটি সৎনাট্যের আসরে প্রাণময় অবিচ্ছিন্ন বস্তু। এঁরা পরস্পরকে নির্ধারিত করে, আবশ্যিক করে তোলে, উৎপন্ন করে। এই একতাই সৎনাট্যের আসরে গভীরতা আনবে, তাকে সুন্দর করে তুলবে, তার স্বাধীনতাকে স্বীকার করবে। কিন্তু যে নাট্যআসরে এই একতা বা সংহতি নেই সেখানেই মূঢ়তা, নেহাৎ গড়পড়তা প্রত্যহের মানবিক মূঢ়তা। এইখানেই সৎনাট্যের বুদ্ধিগত এবং নীতিগত শ্রেষ্ঠতার ভিত্তি। এই শ্রেষ্ঠতার ভিত্তি টলে যেতে বাধ্য যদি নাট্য অপর কোনোও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

অথচ সৎ শিল্পের প্রকাশগভীরতায়, অন্তর্দর্শীতায় সামাজিক হতে বাধে না; পার্টির পার্টিজান না হয়েও রাজনৈতিক তাৎপর্যে উপনীত হতে বাধা থাকে না। চার অধ্যায়, দশচক্র, রক্তকরবী, পুতুলখেলা তাই সামাজিক তাৎপর্য বহন করে এবং রাজনৈতিক জ্ঞান পরিপুষ্ট করে। কিন্তু সবার আগে এ নাট্য মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ। এর প্রযোজনা যদি গভীরে না ছুঁয়ে যেত তবে এটা সম্ভব হত না।

কোনও রাজনৈতিক আদর্শ বা অন্য কোনও আদর্শ যদি মানুষের মানবতা আচ্ছন্ন অভিভূত করে ফেলবার অবাধ ক্ষমতা পায় মানুষেরই ভাবালুতার আতিশয্যে তাহলে এক সময়ের বাঞ্ছিত আদর্শ কেমন করে মানুষের মানবতাকে নষ্ট করতে পারে এ জ্ঞান চার অধ্যায় অভিনয় দেখে কী হয় না? দশচক্র নাটকের অভিনয় শেষে কি এই সামাজিক শিক্ষা পাই না যে চক্রান্তের কোনো এক অমোঘ নিয়মে অনায়াসেই সমাজে প্রগতিবাদী বলে খ্যাত মানুষরা সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন। এ রাজনৈতিক শিক্ষা কি এতে নেই—যে-কোনো কৌশলে মানুষের মনে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করে

তাদের দিয়ে অন্যায় করান সহজ এবং তাঁরা সাধারণ মানুষকে বোঝান তাঁরাই তাদের স্বার্থের একমাত্র রক্ষক আর তলায় তলায় নিজ স্বার্থসিদ্ধিই কাম্য। একক মানুষ বা স্বল্পসংখ্যক মানুষ যদি কখনো সত্যকে ছুঁতে পারে তার নাট্যের আবেগ কি কম অভিভূত করে—নাকি অভিভূত হওয়া, সত্যের কথা বলা প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ? তা হোক তবু সৎ-নাট্যে তা থাকবে। এটা সামাজিক সত্য যে যৌথ-জনগণ মিথ্যার মায়াজাল সহজে ছিঁড়তে পারে না। তারা বড় সহজেই মোহাচ্ছন্ন হয়। এ কেবলমাত্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জন্য নয় পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে ব্যক্তি-মানুষের এ ট্রাজেডি যেন বারবার অভিনীত হয়। মানুষের সমস্যা তো কেবল চামড়ার নীচের স্তরের নয়—আরো ব্যাপক, আরও অন্তর্নিহিত। সৎনাট্য এই অন্তরদর্শিতায় পারঙ্গম হোক। যাঁরা ফতোয়া জারী করে নাট্যকে বেঁধে দেবেন তাদের কাছে মানুষের সংকটের একটি মাত্র চেহারা। তাঁদের কথামতো পৃথিবীর অনেক মহৎ নাট্যকে হারাতে হয়—তার কারণ তাঁদের দেখবার ধরনটাই বিধিবদ্ধ, বিচারের পদ্ধতিটা ভিন্ন। তাই আজও দেখি পিরানদেল্লো ফাসিস্ত ছিলেন বলেই তাঁর গভীর কোনও নাটক তাঁদের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয়। দৈনন্দিনতায় তা পূর্ণ নয় বলে তা অবক্ষয়। কিন্তু মানুষের জীবনের কোনও গভীর কথা, গভীর সমস্যার কথা তাতে থাকলে উপেক্ষা করার কী আছে। বিধিবদ্ধ বিচারপদ্ধতির ফলেই বোধহয় টমাস মান্‌ একদা ঠাট্টা করে বলেছিলেন "কমিউনিস্ট নিন্দিত বহু দোষে আমার রচনা পূর্ণ, যথা রূপ প্রাধান্য, মনস্তাত্ত্বিক ঝোঁক, অনিশ্চিতবাদ, অবক্ষয়ের লক্ষণ, তাছাড়া একটা কৌতুকরস এবং সত্যের বিষয়ে দুর্বলতা।"

যে ইজম্‌ সে ক্যাপিটালিজম্‌, ইমিপরিয়ালিজম্‌ বা ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম হোক না কেন সুন্দরকে সংহার করে মানুষের সহজাত স্বভাবের বিকৃতি ঘটায়, মানুষের মূলোচ্ছেদ করতে পারে, সে সমাজে রক্তকরবীর ফাগুলালদের মতো সাধারণ মানুষেরা চিরকাল ইতর প্রাণীদের মতো বাঁচবার জন্য সংগ্রাম করতে পারে। দুর্বলরা পর্যুদস্ত, অবনত থাকতে পারে—সেখানে কিন্তু মানুষের মুক্তির জন্য বিশুই "আয়রে ভাই লড়াই-এ চল" আহ্বান তুলতে পারে। যে-বিশু সুন্দরকে সূক্ষ্মকে চিনতে পারে। দর্শকের নিম্নমানকে স্বীকার করলে অপার দুর্গতি। বস্তুত এ ভাবনাটা বোধ করি একটু সরলীকরণ। ভারতবর্ষের লোকশিল্প, তার প্রকাশে সরলতা থাকলেও কম জটিল নয় সেখানে প্রতীক, প্রতিমার ব্যবহার অপ্রতুল নয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকের জটিলতা সূক্ষ্মতা এই

ভারতীয় মূল থেকেই আহৃত। কেবল তা আধুনিক এবং স্বভাবতই পরিশুদ্ধ (এই শুদ্ধ কথাটাও কি অবক্ষয়ের লক্ষণ?)। থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার অতি চিৎকৃত রূপ নয়—পুরনো যাত্রার অনুভবের যে-শক্তি তার সঙ্গে তাই মুক্তধারা, রাজার এত মিল। নিজেদের জানবার এবং নিজেদের প্রকাশ করবার দায় এবং দায়িত্ব অনুভব করলে আমরা অনেক ছোট কথার তাড়না থেকে থিয়েটারকে রেহাই দিতে পারি। পুতুলখেলার অভিনয় যদি অন্তরদর্শী না হত তা হলে একটা পারিবারিক বা ডিটেকটিভ কাহিনীই হত। এ নাটকে জনগণকে সংঘর্ষে লিপ্ত করবার উপকরণ নেই—কিন্তু সূক্ষ্মতা আছে। অভিনয়ে, মঞ্চসজ্জায়, আলোর কম্পোজিশনে সেই সূক্ষ্ম কারুকার্য প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে বলে দর্শককে ভাবায়, উত্তেজিত করে না—কিন্তু আঘাত দিয়ে চেতনাকে জাগ্রত করে—তাই এ-নাটকে সমাজ তো বটেই এমন কি নৈতিক একটা তাৎপর্যও খুঁজে পাওয়া যায়, অবশ্যই পুতুলখেলার বুলু তখন কেবলমাত্র নারী নয়, পুতুল ভেঙে মানুষটা বেরিয়ে পড়ে। সমাজের একটা শ্রেণীকে দেখতে পাওয়া যায় যে কেবল একজনের অধিকারের পুতুল হয়ে থাকতে চায় না। সমাজের কৃত্রিম পরিবেশের চাপে আমরা সবাই প্রায় এক শ্রেণীর পুতুল হয়ে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করি। মানুষের মর্যাদা দিই না। শ্রেণী-পুতুলের দ্বন্দ্বেই এর শেষ নয়—মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা আদর্শ সম্পর্কের ইঙ্গিতে এ-নাটকের শেষ।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে ধরুন নাটক লেখা হবে। যুদ্ধের রোমহর্ষক বিভীষিকা ফুটিয়ে তুলেও তা করা যায়—এবং দর্শককে উত্তেজিত করা যায়—কিন্তু কেউ যদি যুদ্ধকে একবারও নিন্দা না করে যুদ্ধের মূল কারণে যান! অর্থাৎ জাতিবৈরিতা, অন্ধ জাতীয়তাকে তুলে ধরেন—তাহলে অবশ্যই তাঁকে গভীর কথা বলতে হবে—অনেক তুচ্ছতাকে পরিহার করতে হবে। এইটাই কাম্য।

বহুবিতর্কিত রাজা অয়দিপাউসকে অনেকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেছেন; বলেছেন সিনিক্যাল, আবার প্রশ্ন তুলেছেন মানুষ কি এখনও ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক, নিয়তির দাস? সত্যের প্রতি দুর্বলতা কি প্রতিক্রিয়াশীলতা, অনিশ্চিত অন্ধকার কি আমাদের জীবনে সত্য নয়? প্রাচীন গ্রীক মানসে নিয়তির প্রাধান্যের কথা ক্লাসিক সাহিত্যের আলোচনায় পেয়েছি—সেই কেতাবি বিদ্যা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া বাক্যে বিচার করা চলত যদি এ-নাটক উপস্থিত করা হত রিচুয়ালের মত করে—এর প্রযোজনায় যদি কোনও

আধুনিক চিন্তা আবর্তমান থাকত। আমাদের আজকের বাঁচার চারপাশে যে অন্ধকার তাকে অস্বীকার করতে চাইলে বাস্তবকেই অস্বীকার করা হবে। কিন্তু প্রত্যয়ী মানুষের কাছে এই অন্ধকার বাস্তব এবং তাকে ছিন্ন করে জ্ঞানে পৌছতে চাওয়ার আকাঙ্খাটা সত্য। রাজা অয়দিপাউসের যবনিকা উঠলে প্রথমে দেখি মারী ও মড়কের হাত থেকে দেশের সাধারণ মানুষকে বাঁচাবার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন দেশের সাধারণ নায়ক। সে সংকল্প আজকের দিনের অনেক সুচতুর কৌশলী নায়কের ময়দান বক্তৃতার মতো মিথ্যাচার নয়। তাই নাটকের শেষে, নেতা এবং নায়কের অহরহ কথায় এবং কাজে ফাঁক দেখতে পাওয়া হতাশ দর্শক সংকল্পের জোরকে উপলব্ধি করে।—যে নায়ক তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে, অন্যায়ের মুলোৎপাটন করতে নিজের বিপদ ডেকে আনে সেই পুরুষ তো পুরুষকারের জয় ঘোষণা করেছেন দুরন্ত দুঃসাহস আর স্পর্ধিত আত্মত্যাগের দ্বারা। হোক না সে ব্যক্তি-মানুষ! আজকের দিনে সেই নেতার তো বড়ই অভাব যে সমষ্টির কল্যাণের জন্য সঞ্চিত পাপের মুল অনুসন্ধান করতে গিয়ে হঠাৎ নিজেকে সেই পাপের সঙ্গে জড়িত দেখেও তা স্পর্ধার সঙ্গে স্বীকার করেন, শাস্তি গ্রহণ করেন!

এসব হল সৎ নাট্যের জ্ঞানের দিক। বলবার কথা এই যে সমাজচেতন দর্শক, নাট্য যদি সৎ হয় গভীরে পৌছায়, তবে তাব মধ্যে থেকে তাৎপর্য খুঁজে পাবেনই—খোঁচা মেরে উদ্দেশ্য জাহির না করা সত্ত্বেও। মুলত শিল্প কিন্তু শাসক নয় ঘাতকও নয়, এমন কি বোধহয় শক্তিও নয়—শিল্প মানুষের জীবনের স্বস্তি।

সৎ নাট্যের রূপ কী হবে? ইতিপূর্বে নির্দিষ্ট হয়েছে যে নাট্য বস্তুটি আমরা দর্শক হিসাবে মঞ্চের যবনিকা উঠলে যা দেখি পুরো ব্যাপারটা—যার কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষের অভিনয় এবং নাট্যকারের দেওয়া ভালো outline-এর কিছু সর্টহ্যাণ্ড নোট। অভিনয় এবং নাটক এই 'যুগ্মতারার দ্বৈত নৃত্য'। পুরোটা মিলিয়েই একটা সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি। সেই সৃষ্টির আভরণ হল মঞ্চ, দৃশ্যপট, আলো, আবহ সংগীত। কেন্দ্র চরিত্রের সস্তা সেন্টিমেণ্ট প্রকাশের অবকাশ নেই—আছে সৎ আবেগ প্রকাশের থিয়েট্রিক্যাল রিয়েল হয়ে ওঠার। এখানে স্বাভাবিক অভিনয়ের নামে গভীর উপলব্ধির কথাকে চটুলতা প্রকাশক বা তথাকথিত ফ্রী অভিনয়ে সম্ভব হয় না। সৎ নাট্যে স্বাভাবিকত্ব উপরের নয় ভিতরের ব্যাপার। চরিত্রকে আত্মগত ও বস্তুগত উভয়ভাবে আবিষ্কার

করতে হয়। আভরণকে কখনোই প্রাধান্য দেওয়া হবে না সৎনাট্যে। সৎনাট্যে আভরণের স্বীকৃতি থাকবে নিশ্চয়ই কিন্তু আত্মপ্রচারের অবকাশ নেই—যাঁরা টোট্যাল থিয়েটারের কথা মুখে বলে এই আত্মপ্রচার নাট্যে চাইবেন তাঁদের কাজ সৎ নাট্যের তো বটেই, এমন কি তাঁদের বলা টোটাল থিয়েটারেরও তা পরিপন্থী। যা কিছু বাহুল্য, যা কিছু অপ্রয়োজনীয় তা আভরণে থাকবে না। তাই দৃশ্যপটে সাধারণত দেওয়ালের কোনও ভূমিকা নেই, তাই দেওয়াল একেবারেই বর্জনীয়। তথাকথিত ন্যাচারিলিজম্ নাট্যের গভীরতাকে ব্যাহত করে। আলো তো খেলা দেখাবার জন্য নয় তাই সৎনাট্যে তা মানুষের মুড্ প্রকাশের সহায়তার জন্যই রচিত। চার অধ্যায়ের জটিলতা, রক্তকরবীর ব্যঞ্জনা, গাম্ভীর্য, ছেঁড়াতারের রূপকথার কাব্য, এর প্রকাশের সহায়তায় আলোর কম্পজিশন্। একবার ছেঁড়া তারে মঞ্চচিত্রী দেওয়াল এবং গাছের কতকগুলি cut-out করলেন। তিনি এর আগে মঞ্চসজ্জায় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। এবং total theatre-এর পরিপন্থী কিছু করেন নি। কিন্তু ছেঁড়াতারে পরিবর্তন করার পর তিনিও বুঝতে পারলেন ফল ভাল হল না। রূপকথা এবং কাব্যটা ব্যাহত হল। অথচ মানুষকে, চরিত্রকে প্রকাশের সহায়কও হল তা। তাই পরবর্তী অভিনয়ে তা বর্জিত হল। সৎনাট্যের বিজ্ঞাপনে আভরণের ঢক্কানিনাদ থাকবে না—নববধূর আগমনের আমন্ত্রণ-লিপিতে অমুক দোকানের বেনারসী শাড়ি পরে তিনি আসবেন বা চলবেন এ বিজ্ঞপ্তি সৎ-নাট্যে অচল। মূল নাট্যবস্তু অভিনয় সম্পর্কে বর্তমানের সৎ-প্রচেষ্টা কোন দিকে সে সম্পর্কে শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্রের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করছি: "এ প্রশ্নের উত্তর বোধহয় ভাবা দরকার। কারণ বহু ক্ষেত্রেই আমার মনে হয়েছে সাধারণ ভাবে যেসব নাটক আমরা অভিনয় হতে দেখি তার মধ্যে গভীর উপলব্ধির কথাকে কেবলি এড়িয়ে যাওয়া হয়, ফিল্মের গল্পের মতন। এবং তার স্থলে আমদানি করা হয় হৈ হট্টগোল, সেনসেশন্যালিজম্ আর যান্ত্রিক স্টান্ট্। গভীর ভাবে গভীর কথা বলবার ক্ষেত্র যেন আরো একটু সংকীর্ণ হয়ে গেছে এবং সেই জন্যেই অভিনয়ে নিখাদ সেন্টিমেন্টের অতীতাশ্রয়ী অভিনয় ভঙ্গির এত প্রাদুর্ভাব। যখনি আবেগের কথা বলতে হয় তখনি মনে হয় অভিনেতা যেন আগের যুগ থেকে কথা বলছেন। আজকের দিনের মানুষ হিসাবে তাকে চরিত্র বিশ্লেষণ করতে দেখি না।—এই নেগেটিভ্ দিক উদ্ঘাটনের ফলে আশা করছি পজিটিভ্ দিক নির্দেশে বিভ্রান্তি থাকছে না।"

প্রবন্ধের সূচনায় 'বৃহৎ সমস্যা' হিসেবে যাঁরা সৎ নাটককেও ধরেছিলেন—তাঁদের উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধ নয়, সৎ নাট্যের সমস্যায় যারা উৎকণ্ঠিত তাদের কাছে কিছু বিনীত প্রশ্ন তোলাই কাজ। আলোচনার সূত্রপাত হোক—দর্শকের দিশে হারাবার সব ভয় দূর হোক।

তাপস সেন

থিয়েটারে নতুন আলো

একালের আলোর পটভূমিকা

আমাদের থিয়েটারের বিকাশ ঘটেছে পশ্চিমী থিয়েটারের বিকাশের পথ ধরে; তাকে অনুসরণ করেই। বিশ্ব থিয়েটারের বিকাশের সঙ্গেই বাংলা থিয়েটারের বিকাশ সরাসরিভাবে যুক্ত। আমরা হয়তো কখনও কিছুটা পিছিয়ে থেকেছি, এই বিকাশ হয়তো কখনও কিছুটা মন্থর গতিতে ঘটেছে।

আকাশের আলো: চকমকির আগুন: বিদ্যুতের আলো

সভ্যতার আদিপর্বে মাইম্, ম্যাজিক ও লোকাচারের সমষ্টিগত ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার সঙ্গেই জন্ম, মৃত্যু, হত্যা, প্রতিশোধ, শিকার, সবই আঁটসাঁটভাবে জড়িয়ে ছিল। এই জীবনের অনেকটাই মুক্ত আকাশের নিচে অতিবাহিত হত ফলে প্রকৃতির আলো-অন্ধকারের একের থেকে অন্যের রদবদলের ছক মানুষের দেহে, চোখে, মনে, হৃদয়ে ছাপ রেখে যেত। আলোর সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন ঘটল সেইদিন, যেদিন মানুষ চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালাতে শিখল। আগুনের উপর মানুষের এই অধিকারেই পরিবেশের উপর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কে এতদিন মানুষের যে অসহায় বশ্যতার দশা ছিল, এবার তার অবসান হল।

মানুষের স্বকীয় সত্তার যে-বিকাশ সেদিন শুরু হয়েছিল, তার পরিণতি ঘটল আলাদাভাবে নৃত্য-গীত-নাট্যচর্চার পর্বে। সৃজনশীল 'পারফর্মিং' শিল্পের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রীক থিয়েটার। গ্রীক থিয়েটারের স্থাননির্বাচনের মধ্যেও মানুষের জাগ্রত মনের পরিচয় মেলে। গিরিবক্ষে প্রেক্ষাগার সংস্থাপনায় শব্দের ঝঙ্কার ও প্রতিধ্বনির বিপুল সম্ভাবনা সম্পর্কে মানুষ সেদিন সচেতন ছিল। ঐ সংস্থাপনার গুণেই একটা ড্রামের শব্দ যখন

দশটা ড্রামের শব্দের বিপুলতায় পৌছে যেত, তখন শব্দের যে শুধু মাত্রার পরিবর্তন ঘটত তা-ই নয়, তার একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে যেত; রক্তকণিকায়, মনে একটা স্বতন্ত্র উত্তেজনার সঞ্চার হত। শুধু শব্দ নয়, স্বাভাবিক আলোর স্বাভাবিক পরিবর্তনেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল ঐ থিয়েটারে। সকালে, বিকেলে, সন্ধ্যেয় আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে "দৃশ্যপট" অন্যরকম লাগত। নাটকের পরিণতি যখন ক্লাইম্যাক্স্-এ ঘনীভূত হয়ে আসে, তখনই আকাশ থেকে পাওয়া আলোর তীব্রতা কমে আসে, দীর্ঘ ছায়া পড়ে, মেঘের নানারঙের মেশামেশিতে অজান্তেই এমন এক স্বাভাবিক পশ্চাদ্‌পট রচিত হত যা নাটকের 'ক্লাইম্যাক্সিং'-এর সহায়ক হত।

কৃত্রিম আলোর যুগ এসেছে অনেক পরে। একদিকে আলোকবিজ্ঞানে মানুষ অধিকার বিস্তার করেছে, আলোর রূপান্তর ঘটিয়েছে। অন্যদিকে থিয়েটারে পশ্চাদ্‌পট, প্রোসেনিয়ম্, উইংস্, দর্শক-অভিনেতার মধ্যে যবনিকার ব্যবহার এসেছে। অনাবশ্যক দৃশ্যবর্জন ও সময়ের 'ব্রিজিং'-এর প্রয়াস চলেছে। সঙ্গে সঙ্গেই আলোরও পরিপূরক বিকাশ ঘটেছে।

মানুষের আয়ত্তাধীন প্রথম আলো আগুনের আলো। সেই আগুনকে নির্দিষ্ট তীব্রতা ও কালানুক্রমের সীমায় নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যই প্রথমে জান্তব চর্বি, পরে অন্য উপাদান ও রাসায়নিক দ্রব্য, শেষে প্রাকৃতিক, আকরিক, খনিজ ও কারখানায় বীজফল থেকে নিষ্পেষিত তেলের ব্যবহার আসে। ফলে আলো নেভানো ও জ্বালানোর সময়ানুবর্তন সহজ হয়।

সাহিত্যে ও শিল্পে এই আলো বা আগুনের শিখার একটি তাৎপর্য রয়ে গেছে। জীবনের প্রতীক হিসেবে এই আলো আমাদের চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। অন্ধকারের মধ্যেই যার ক্ষীণ অনিশ্চিত আরম্ভ, ক্রমে বিকাশ, পরে পরিপূর্ণ আলোকবিকীরণ, তার কম্পমান শিখা, তার দপ্ করে নিভে যাওয়া জীবনের নানা পর্বের রূপকল্পস্বরূপ। একটা আলোর শিখার নিভে যাওয়া দৃশ্যমান ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের কারণেই মানুষের মৃত্যুর আভাস এনে দেয়। আগুনের শিখা যে নিজে নিভে যাবার সময়ে অন্য আরেক শিখা জ্বালিয়ে যেতে পারে, এতেও মানুষের জীবনের ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত বর্তমান।

সেই আগুন বা সেই আলোকে আরো সুনিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হল গ্যাসের প্রয়োগে। আলোকে ইচ্ছেমতো বাড়ানো-কমানো এবং প্রক্ষেপণ এবার সম্ভব হল। কিন্তু তার আবার অসুবিধেও ছিল—তার বিপদ ছিল, তার কড়া দুর্গন্ধ

ছিল। এর পরের পদক্ষেপেই বিদ্যুতের বাতি, প্রথমে আর্ক ল্যাম্প, তারপর বাল্‌ব্‌। এর পরের ধাপ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ফ্লোরেসেণ্ট ল্যাম্প।

আলোর এই বিবর্তন ব্যবহারিক বিজ্ঞান থেকে সৃজনশীল শিল্পে বিবর্তনের ইতিহাস। এই সমগ্র ইতিহাসই, অর্থাৎ তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের বিবর্তন, এদেশে গত পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যেই শিল্পক্ষেত্রে এবং থিয়েটারে দ্রুত ঘটে গেছে। আসলে এই ইতিহাস ইয়োরোপেরই ইতিহাস, আমরা imported stuff হিসেবে পেয়েছি মাত্র। এতে আমাদের কোনো অবদান নেই, কোনো স্বকীয় ভূমিকাও নেই।

আগে বলতে ভুলে গেছি, এই ইতিহাসে আরো একরকম আলো এসেছিল। এই আলোটির আজ আর কোনো অস্তিত্ব নেই, অথচ তার নাম আজও রয়ে গেছে। চূণের ঢেলা থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগে উৎপন্ন এই আলোর নাম লাইম্‌লাইট। সাহিত্যে ও চ্যাপ্‌লিনের বিখ্যাত চলচ্চিত্রের উল্লেখে ধন্য এই আলোটির আবির্ভাব হয়েছিল গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলোর মধ্যবর্তী পর্বে। Local zone-এর বিশেষ গুণে এই আলো একটা ঘনিষ্ঠ নস্ট্যাল্‌জিক্‌ অনুভব রচনা করতে পারত বলে মনে হয়।

ভারতীয় চিত্রকলার প্রভাব : এদেশের নাটমঞ্চ : আলোর অনুল্লেখ

এদেশে প্রাচীন সংস্কৃত নথিপত্রে গ্রন্থে যেসব নাট্যোপকরণের বর্ণনা আছে, তার মধ্যে আলোকপ্রক্ষেপণের বা আলোর সুবিধা-অসুবিধার প্রায় কোনো স্পষ্ট উল্লেখই নেই। রঙ্গভূমির প্রবেশ-প্রস্থান ও মঞ্চ-সাহিত্যে স্তরভেদের বিশদ বিবরণ আছে। হর্ষবিষাদের সঙ্গে আলো-অন্ধকারের যে-যোগ, সে-প্রসঙ্গে কোনো ভাবনার পরিচয় পাই না। আলোর সৃজনক্ষম প্রয়োগ সম্পর্কে বোধহয় কোনো চিন্তাই হয় নি। প্রদীপ ও মশালের উল্লেখ আছে, কিন্তু নাটকে তার বিশেষ প্রয়োগের কোনো ইঙ্গিত নেই। মনে হয়, ভারতীয় চিত্রকলার রীতি মঞ্চচিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। এই চিত্রকলার প্রকৃতি প্রধানত দ্বিমাত্রিক, রেখার মধ্য দিয়েই দ্বিমাত্রিক স্তরে ফর্মকে প্রকাশ করতেই ভারতীয় চিত্রকলা অভ্যস্ত। স্পেস্‌-এর গভীরতায় বস্তুর সংস্থাপনের ভাবনা ভারতীয় শিল্পীকে যেমন ভাবায় নি, ঠিক তেমনিই ভারতীয় নাট্যকলা, অভিনেতার চলাফেরা, পশ্চাদ্‌পট থেকে তার এগিয়ে আসার তাৎপর্য সম্পর্কে অনবহিত থেকে গেছে। প্রবেশ্‌ ও প্রস্থান, থাকা ও না-থাকা,

রেখাঙ্কন শিল্পের তৎকালীন চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে কেবল এই দুয়েরই মূল্য ছিল। মঞ্চের চলাফেরার গতীয়তার (ডাইন্যামিজম্) কোনো বোধ তখনও আসে নি। অন্যদিকে য়ুরোপীয় থিয়েটারের ক্ষেত্রে ছবির ফ্রেমের ধাঁচের মঞ্চের সীমাবদ্ধতাকে ত্রিমাত্রিক আঙ্গিকে ভাঙবার প্রয়াসে আলোর সচেতন প্রয়োগ ঘটেছিল। যন্ত্রবিজ্ঞানের অগ্রগতিও আলোকসম্পাতের আঙ্গিকের বিকাশে সাহায্য করে।

রেখাঙ্কন বা দ্বিমাত্রিক শিল্পপদ্ধতির মধ্যেও মনস্তত্ত্বের সচেতন প্রয়োগে কখনও কখনও সামাজিক-মানসিক প্রতীক হিসেবে রঙের ব্যবহার ঘটেছে। অথচ রঙ ও আলো যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ, সে বোধ সম্ভবত আসে নি। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' বা প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের নানা তর্কের জটিলতার মধ্যেও বিভিন্ন রঙের রূপক অর্থ আরোপ করা হয়েছে। পোশাকে, রূপসজ্জায়, আসবাবপত্রে, যবনিকায়, পশ্চাদ্‌পটে এবং সংগীতের ক্ষেত্রে রাগ-রাগিণীর নানান শ্রেণীবিভাগে রঙের নানা প্রতীক-নির্দেশ লক্ষণীয়—কিন্তু এই সব নির্দেশে আরোপিত অর্থের যুক্তি আমাদের স্পষ্ট নয়। বস্তুত, কোনো রঙেরই আলাদা মানে হতে পারে না। রঙের অর্থ অনুষঙ্গ থেকেই গড়ে ওঠে। লাল রঙ যেমন রক্তের, আগুনের, উত্তপ্ত হওয়ার বা ভয়াবহতার দ্যোতক হতে পারে, তেমনি বিশেষ কোনো রঙের সাহচর্যে প্রীতিকর কোনো ভাবের দ্যোতক হতে পারে। মানুষের মুখে নীল রঙ বিষের অনুষঙ্গ আনে, অথচ সেই নীল রঙই আকাশে বা দূরত্বে রোম্যান্টিক হয়ে ওঠে। দেশভেদেও রঙের অর্থভেদ ঘটতে পারে। হলুদ এদেশে পবিত্র, অন্যদেশে পাপের অনুভূতিবহ। সবুজ এদেশে প্রায়ই যৌবনের দ্যোতক, অন্যদেশে ডাইনীবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। রঙের অর্থের অদলবদল প্রাচীন ভারতীয় মঞ্চে বা ভারতীয় চিত্রকলায় হয়েছে—কাপড়ের বা বস্তুর বয়নের বা রঞ্জক উপাদানের তারতম্যে; আলোর প্রয়োগে রঙের রদলবদলের ব্যাপারটা তখনও বিবেচনার মধ্যে তেমনভাবে আসে নি।

ধারকরা আলো।

আলোকপ্রয়োগের ক্ষেত্রেও আমাদের সাধারণ পশ্চাদ্‌পরতার ছাপ স্পষ্ট। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অগ্রগতি বা শিল্পপ্রগতি আমরা বিদেশী শাসকদের স্বার্থের খাতিরে কিংবা দাক্ষিণ্যের দানে ধার পেয়েছিলাম, তার যাবতীয় উপকায়

ভোগ করেছি বিনা আয়াসে। ফলে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই, সোজাসুজি শক্ত হয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়ানোই দুরূহ হয়ে পড়ে। নিজেদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কখনই কোনো প্রয়োজন না পড়ায় সৃষ্টির পরিশ্রমের দামটাও আমরা দিতে পারি না। মঞ্চের ব্যাপারেও প্রাথমিক চিন্তার ক্ষেত্রে একই পরনির্ভরতা দীর্ঘকাল চলেছে। ইয়োরোপের দু' হাজার বছরের বিকাশের ধারা এখানে প্রায় পঞ্চাশ বছরেই সম্পূর্ণ পথপরিক্রমা করে নিয়েছে। পার্শি থিয়েটার ও গিরিশ-যুগের মধ্যেই তেল বা গ্যাসের আলো থেকে রঙে ডোবানো বাল্‌ব্‌-এর বিবর্তন ঘটে গেছে।

পার্শী থিয়েটারে আলোর প্রয়োগে সমগ্র দৃশ্যের সম্পূর্ণ রঙ বদলে যেত, দৃশ্যপরিবর্তনে বাস্তবতার নিষ্ফল অনুকরণের চেষ্টা প্রকট হয়ে উঠত। মঞ্চে ঘোড়ার প্রবেশ, পাইরোটেক্‌নিক্‌স্‌-এর সাহায্যে বিস্ফোরণ, ফ্ল্যাশ পাউডারের দাহ্য ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, কিংবা সার্কাসের কায়দাকানুন, সবই একজাতীয় এণ্টারটেণ্টমেণ্টের অঙ্গরূপে থিয়েটারে এসে পড়েছিল। দুই রঙের মেশামিশিতে তৃতীয় রঙ রচনার দৃষ্টান্ত দেখা গেলেও তখনও রঙের অর্থদ্যোতক ব্যবহার খুবই সীমিত ছিল। লাল থেকে হঠাৎ সমগ্র দৃশ্যের নীলে রূপান্তর বা রোলার-এর দৃশ্য পরিবিবর্তন, সমসাময়িক মনে এগুলোর দামই বড় ছিল। সেদিনকার চলচ্চিত্রের যে 'ইম্‌পারফেক্‌শন্‌স্‌' আজ অত্যন্ত পীড়াদায়ক, কল্পনা করতে পারি, সেদিনকার থিয়েটার আজ হুবহু ফিরিয়ে আনা গেলে তাও সমানই পীড়াদায়ক ও হাস্যকর হত।

ইলেক্‌ট্রিশিয়ান থেকে আলোকশিল্পী : সতু সেনের ভূমিকা

প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভিয়ে দেওয়া থেকেই মঞ্চে আলোর কাজ শুরু হয়ে যায়। আশপাশের বাকি আলো নিভিয়ে দেওয়ার অর্থ সমস্ত আলোকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় সন্নিবিষ্ট করা, দর্শকের দৃশ্যমান অবাঞ্ছিত পরিবেশকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে তাঁর মনকে ঐ একই চতুর্ভুজের মধ্যে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট করা। আলোর অতি প্রাথমিক কাজ দেখানো, দ্বিতীয় কাজ আরো ভালো করে দেখানো, তৃতীয় কাজ শিল্পীর মনের মতো করে দেখানো, চতুর্থ কাজ কোনো কিছুকে না দেখানো বা গোপন করা, বা কম করে দেখানো। আলোর রঙবদলে যেমন সময়নির্দেশ ঘটে, তেমনি নাট্যকারের কোনো বিশেষ চিন্তারও প্রতিফলন ঘটতে পারে। আজকের থিয়েটারে

দৃশ্যবিশেষে ভয়াবহতা বা রোম্যান্টিক মাধুর্যের অনুভবরচনায় অভিনেতার সংলাপ, কাহিনীর উপস্থাপনা, দৃশ্যপট, আসবাবপত্র, আলো, পরিবেশসৃষ্টির জন্য শব্দপ্রয়োগ বা সংগীতের যোজনা, এই সমস্ত কিছুই একত্র হয়। শিশিরকুমারের আবির্ভাবের অব্যবহিত আগেই থিয়েটারের এই সামগ্রিক রূপ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। আর্কল্যাম্পের সাহায্যে ইচ্ছামত আলোকে সীমিত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করে আলোর নির্বাচনী ক্ষমতার প্রয়োগ শুরু হল। সংলাপের মধ্যে কোনো অংশ যখন বিশেষ উচ্চগ্রামে উচ্চারিত হত, কিংবা কোনো মেলোড্রামার অংশে আর্কল্যাম্পের স্পটলাইটের ক্রমান্বয় অনুসরণ বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করত। আজকের চোখে এই পদ্ধতি বেমানান লাগতে পারে। কিন্তু আলোর একটি বিশেষগুণের যে স্বীকৃতি এই রীতির মধ্যে বিধৃত, তার মূল্য কম নয়। মঞ্চের সর্বত্র নির্লিপ্ত উদাসীনতায় সমভাবে আলো প্রক্ষিপ্ত হবে না, আলাদা করে কোনো বিশেষ চরিত্র বা বিশেষ অংশকে আলো বিশেষভাবে দেখাবে—এই চেতনা সেদিন এসে গিয়েছিল। অপেক্ষাকৃত স্তিমিত এবং জোরালো আলোর প্রয়োগে দেখানো ও না-দেখানোর বৈচিত্র্য রচনা সম্ভব হয়।

মোটামুটিভাবে আমাদের থিয়েটারে শ্রীসতু সেনই বোধহয় প্রথম আলোক-সম্পাতের স্বকীয় চিন্তাসমৃদ্ধ ও শিল্পসম্মত ব্যবহার করেন। তাঁরই হাতে স্পট্‌লাইটের অর্থপূর্ণ ব্যবহার, 'ডিমার'-এর সাহায্যে আলোর তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ এবং মঞ্চের অভিনয়ের গতিশীলতার দাবিতে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সূত্রপাত ঘটে। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকে শ্রীসেন স্পট্‌লাইট, মূড্ লাইট্ এবং রঙীন আলোর সচেতন, শিল্পসম্মত মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োগ, এবং 'ঝড়ের রাতে' নাটকে আধুনিক পরিবেশে একটিমাত্র দৃশ্যসজ্জায় বিভিন্ন স্তরের ব্যবহার এবং আলোর বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ করেছিলেন। শিশিরকুমার ও শ্রীসতু সেনের সহযোগিতার এই কালটি বিশেষ স্মরণীয়। পরবর্তীকালে এই নতুন আলোর বিরাট সম্ভাবনা সেদিনকার থিয়েটারে আভাসিত হয়েছিল। কিন্তু সতুবাবুরই আরেক কীর্তি ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ রঙ্গালয়ে এই সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ হল। সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ হল বটে, কিন্তু ততদিনে মঞ্চে আলোর প্রয়োগের আধুনিক রূপটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বোঝা গেছে, আলো ও মঞ্চসজ্জার সুপরিকল্পিত ব্যবহারে আধুনিক মানুষের মনস্তত্ত্বের স্তরে আলো দ্বিমাত্রিক স্তরকে ভেদ করে 'স্পেস্'-এর মধ্যে, চরিত্রের বা বস্তুর উপস্থিতি, অবস্থান ও অস্তিত্বকে

প্রতিষ্ঠা করতে পারে, দ্বিমাত্রিক চতুর্থ দেয়াল ভেদ করে আলো মনোজগতের নতুনতর গভীরতর অনুভূতির জটিল অন্ধকার কোণগুলিকে আলোকিত করে তুলতে পারে, আলো আজকের শিল্পীমানসের সমাজচেতনাকে জটিল বিচিত্র এক কাঠামোর বৈচিত্র্যে উদ্‌ঘাটন করতে পারে, কখনও তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী, বিবর্ধক, কখনও বিকৃত করে দেওয়া, মিলিয়ে দেওয়া, বা ভুল বোঝানোর নাটকীয় ভূমিকাও গ্রহণ করতে পারে। আলো আর শুধু দেখানোর আলো রইল না, অনুবীক্ষণের মতো, দূরবীণের মতো, ছোটকে বড় করে, দূরকে কাছে এনে, এক্‌স্‌-রে-র মতো তীক্ষ্ণ তীব্রতায় আপাত অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করে তুলে, প্রিজ্‌ম্ কিংবা আয়নার মতো দৃষ্টির ক্ষমতাকে, এবং ক্রমে চিন্তার সম্ভাবনাকেও বহুপ্রসারিত করার এক শক্তিশালী উপকরণ বলে অনুভূত হল।

রিভলভিং স্টেজ ও সবাক ছবির বিস্ময় : থিয়েটারের সম্ভাবনায় অন্তরায়

সাধারণ রঙ্গালয়ের জীবনে অবক্ষয় ও অধঃপতনের কাল এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখোমুখী এসে। একদিকে আর্থিক সংকট ও অস্থিরতা, অন্যদিকে নাটক-বিষয়-নির্বাচনের মর্মান্তিক দৈন্য হেতু শিশিরকুমারকে কেন্দ্র করে নব্যবাংলার জনমানসের নবচেতনা সঞ্চারে ছেদ পড়ল। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের তাৎক্ষণিক মজা, চোখের লহমায় দৃশ্যপরিবর্তনের আকর্ষণ থিয়েটারকে পেয়ে বসল। এই উন্মাদনার সঙ্গে সঙ্গেই থিয়েটারের পক্ষে আপাত অশুভ প্রভাব নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের আবির্ভাব ঘটল। সিনেমা দ্রুত জনচিত্ত জয় করে চলল। চলচ্চিত্রের অক্ষম অনুকরণে ঘূর্ণায়মান মঞ্চকে মুহুর্মুহু দৃশ্যপরিবর্তনের যান্ত্রিক চমক দেওয়ার কাজে লাগানো হল। আজ ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সেই প্রথম অনভ্যস্ত চমক কেটে গেলেও তার সৃষ্টিশীল ব্যবহার অদ্যাবধি সামান্যই হয়েছে।

ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রতিষ্ঠায় মঞ্চের গভীরতা রচনায় আলোর সক্রিয় সম্ভাবনা নির্বাপিত হল। ছোট ডিস্ক-এ বৃত্তকে চার বা তিন ভাগে ভাগ করায় ছ'সাত ফীটের মধ্যে গভীরতা সীমিত রাখতে হয়। ফলে আলোয় কিংবা অভিনয়েও দৃশ্যের গভীরতা সৃষ্টি সম্ভব হয় না। থিয়েটার আবার প্রবেশ ও প্রস্থান, থাকা ও না থাকার দ্বিমাত্রিক ঐতিহ্যে ফিরে যায়। আলোছায়ার সাহায্যে 'স্পেস'-এর সম্ভাবনা বাধা পেল। জলছবির মতো বাস্তবতার বিকৃত প্রতিফলন

আবার শুরু হল ; আলোছায়ার ক্রিয়াপ্রক্রিয়াও দেয়ালে আঁকা ; পটে আঁকা ; পটে আঁকা খাট ও রোগীসহ হাসপাতাল, শ্মশানে চিরকালের জন্য জ্বলছে দৃশ্যপটে আঁকা অনড় অগ্নিশিখা ও একই পটে আঁকা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খুলি, ধাবনোদ্যত শেয়ালের ছবি ফ্রেমে আঁকা অটল, অচল। শোনা যায়, এই বাস্তবতার তথাকথিত অনুসরণেই অন্তত একবার রোহিতাশ্বের মৃতদেহের পাশে পুত্রশোকাতুরা শৈব্যার সঙ্গে এক জীবন্ত দেশী কুকুর মঞ্চস্থলে "প্রবেশ" করে নাট্যদৃশ্যে অবাঞ্ছিত অশালীন বিপত্তি ঘটায়।

থিয়েটারের এই পর্বে সতুবাবুর উদ্‌ভাবিত মনস্তাত্ত্বিক আলোকবিন্যাস সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। স্থানের তাড়নায় আলোকসম্পাত কভার-ডিস্‌কভার-এর আঙ্গিকেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। স্থানের অভাবে আলোর প্রক্ষেপণ অস্বাভাবিক আড়ষ্টতায় পঙ্গু হয়ে যায়, আর্ক ল্যাম্পের উগ্র আলোর দৃষ্টিকটু দৌড়োদৌড়ি চলতে থাকে : যেন মঞ্চে আলোর সাহায্যে নাট্যচমক জাগানোর চেষ্টায় চূড়ান্ত প্রক্রিয়া কার্বন আর্ক ল্যাম্পের 'ফোকাস্'।

ব্ল্যাক আউট, ব্ল্যাকমার্কেট—নতুন নাটক 'নবান্ন', নতুন ভাবনার আলো

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে দেখা গেল, অস্বাভাবিক ব্ল্যাক্ আউট্ ও কালো-বাজারের পটভূমিকায় রঙ্গমঞ্চের আলো অনেকটা স্তিমিত হয়ে এল। শিশিরকুমারের নিজের থিয়েটারে প্রযোজক ও অভিনেতার ভূমিকাও শেষ অঙ্কে উপনীত। থিয়েটার-জীবন অস্বাভাবিকরকম অগোছালো, এলোমেলো। দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের অতিরূঢ় বাস্তব বিপর্যয়ের মধ্যে রঙীন আলোয় পৌরাণিক ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নামধারী নাটকের জনপ্রিয়তা তখন অনেকখানি ম্লান। এই সময়েই এমন নাটক এল, এমন চিন্তা এল যে পুরো পরিস্থিতিটাই হঠাৎ এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। সেই নাটক 'নবান্ন'—এ নাটকে রাজা নেই, রানী নেই, নৃত্যগীত সংবলিত কোরাস নেই, মেলোড্রামার প্রয়োজনে সেই আর্ক ল্যাম্পের ফোকাস-এরও বিশেষ আকর্ষণ নেই। অন্ধকার ও আলোর পটভূমিকায় বিরাট মঞ্চের 'স্পেস'-এ বিচরমান দরিদ্র অসহায় মানুষের জীবননাট্য 'নবান্ন'। 'নবান্ন'-এর চিন্তার গভীরতার মধ্য দিয়ে মঞ্চ ও আলোর নতুন স্বকীয় সম্ভাবনার সূত্রপাত হল। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের ঘাঙ্গি টানতে টানতে ক্লান্ত মঞ্চে ডিরেক্শনল্ লাইট্ ও আলোর নির্বাচনী ক্ষমতা, তার মুছে দেওয়ার ক্ষমতা, ইঙ্গিতে বেশি বলার ক্ষমতা আবার স্পষ্ট হল।

'নবান্ন'-র নতুন অভিজ্ঞতাকে বিদগ্ধমহল স্বাগত জানান। পেশাদারি থিয়েটার ভয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করে। শিশিরকুমার পেশাদারি মঞ্চে তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' মঞ্চায়িত করে প্রকারান্তরে 'নবান্ন'-র গুরুত্বকেই স্বীকার করে নেন। কিন্তু 'নবান্ন'-র প্রথম সাড়ার পর একটা সাময়িক বিচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয়তার কাল এসে পড়ে। ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশবিভাগ ও তারই মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা, বামপন্থী রাজনৈতিক কার্যক্রমেরও থম্‌কে দাঁড়ান বিভ্রান্তি, এই সব কিছুর প্রচণ্ড টালমাটাল কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে আসতেই 'নবান্ন'-রই কিছু পুরনো শিল্পীর অস্থায়ী সমাবেশে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ হয় এবং শ্রীশম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে 'বহুরূপী' সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। 'নবান্ন'-র পর আলোর পরিমিত ও সুপরিকল্পিত প্রয়োগ এবং মঞ্চসজ্জার সুচিন্তিত, স্বল্প উপকরণে রচিত, অর্থব্যঞ্জক ব্যবহার প্রথম দেখা গেল 'নাট্যচক্র' প্রযোজিত এই 'নীলদর্পণ' নাটকে। তারপরই 'বহুরূপী'-র নতুন নাট্যপ্রয়াসের পর্ব।

'ছেঁড়া তার' থেকে 'কল্লোল'

চার অধ্যায়, রক্তকরবী, পুতুলখেলা

'নবান্ন'-র ঐতিহাসিক প্রযোজনার পরবর্তীকালে পেশাদারী থিয়েটারের বাইরে যাঁরাই মঞ্চে প্রবেশ বা অনুপ্রবেশ করছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই কাছে 'নবান্ন'-এর মঞ্চস্থাপত্যে স্তরভেদের ব্যবহার, পরিবেশসৃষ্টিতে সংগীত, শব্দ ও আলোর নতুন সুচিন্তিত সমন্বয় নাট্যভাবনার প্রথম সূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আলোর সক্রিয় ভূমিকার চেতনা থেকেই বিভিন্ন মঞ্চে বিভিন্ন নাট্যসংস্থার নাট্যপ্রচেষ্টায় এই সময়েই নতুন আলোকসম্পাতের চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। সেদিনকার পরিস্থিতিতে অপ্রচুর যন্ত্রপাতি, আর্থিক অসংগতি, নিজস্ব মঞ্চ না থাকায় মহলার অসুবিধে ইত্যাদি সমূহ সমস্যা বোধহয় একদিক থেকে আলোর ক্রমবিকাশের সৃষ্টি ও পরীক্ষার প্রয়োজনীয় চ্যালেঞ্জ যুগিয়েছিল। এইসব অসুবিধের বাধা অতিক্রম করতে গিয়ে আমাদের সবাইকেই আলোকে জানতে ও বুঝতে হয়েছিল।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তখনও আর্ক ল্যাম্পের 'ফলো-ফোকাসিং' এবং মেলোড্রামাটিক্ দৃশ্যে তীব্রতাবৃদ্ধির মধ্যেই আলোর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ ছিল।

কোনো সামগ্রিক মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োগ-পরিকল্পনা ছিল না বললেই চলে, ৮/১০ ফীটের গভীরতায় তা সম্ভবও ছিল না; সেটের জানলার ঠিক বাইরেই এক কিংবা দেড় ফুটের মধ্যেই আকাশকে রাখতে হয়; খোলা মাঠ বা প্রাসাদ বা কক্ষ তিন ভাঁজে রিভল্‌ভিং ডিস্ক্‌-এর একটা সেক্টরে সীমাবদ্ধ; লাইন ভেঙে কোণ এনে বৈচিত্র্যসৃষ্টির চেষ্টা হত। স্তরভেদের ব্যবহারও প্রায় অসম্ভব ছিল। শুনেছি, একমাত্র 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকেই ঘূর্ণায়মান মঞ্চের নিজস্ব ব্যবহার দেখা যায়, অন্যত্র এই মঞ্চকে অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবেই নাটকের গতিবেগ রচনায় কাজে লাগানো হত। বহুরূপীর 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'ছেঁড়া তার' নাটকেই প্রথম স্পষ্টত আলোর তারতম্য প্রধানত শাদা আলোর মাত্রাভেদে বিভিন্ন কোণ থেকে প্রয়োগের চেষ্টা হল। আমার অভিজ্ঞতায় প্রথম 'পথিক' নাটকেই চটের টেক্‌স্‌চার ও গভীরতার পরিপ্রেক্ষিতে এক সেটের পটভূমিকায় প্রায় শাদা আলোর নানা বৈচিত্র্য ও অন্ধকারের কালো প্রচণ্ড নাড়া দেয়। পরে লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপের 'সাংবাদিক' নাটকে শাদা আলোর বিন্যাসে 'স্পেস'-এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। দৃশ্য ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে আলোর প্রয়োগ তখন যে সবসময়েই অত্যন্ত সচেতনভাবে করা হয়েছে, তা-ও নয়। আলোর বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের সুযোগ তখনও সীমিত ছিল। অথচ তখনই 'ছেঁড়া তার' নাটকে স্পট্‌লাইটের নির্বাচনী ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়—রহিমুদ্দিন ও ফুলজানের বলিষ্ঠ অভিনয়কে আরো তীব্র করে তোলার কাজে 'স্পট্‌' ও 'ডিমার'-এর সুপ্রযুক্ত ব্যবহার দেখা যায়।

পরবর্তীকালে বহুরূপী-র 'চার অধ্যায়' নাটকে আলোর এই ডাইন্যামিক সম্ভাবনাকে আরো সচেতনভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা হয়েছে। নির্দেশক শ্রীশম্ভু মিত্র নাটকের প্রতিটি অধ্যায়েই অভিনয়ের 'কম্পোজিশন' ও নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবাবেগের অনুসরণে আলোকসম্পাতের বৈচিত্র্য এক-একটি বিশেষ ধরনে রচনা করতে চেয়েছিলেন। সেই সময়কার আলোর যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা, নিজস্ব মঞ্চ না থাকার দরুণ যথেষ্ট সময় নিয়ে মহড়া দেওয়ার অসুবিধা সত্ত্বেও চার অধ্যায়ের নাট্যবস্তুর গভীরতা সূক্ষ্ম অনুভবনশীল অভিনয় এবং তারই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ রচনায় শব্দ ও সংগীতের সুচিন্তিত ও সচেতন প্রয়োগে গভীরভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল। যেমন প্রতি দৃশ্যের শেষে গুলির শব্দ ও কোরাসে 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনির rousing tempo, দূরাগত ট্রেনের হুইস্‌ল্‌-এর শব্দ, শেষ দৃশ্যে 'মরণের কালো যবনিকা'র পটভূমিকায় রাত বারোটা

রাজার অমঙ্গলসূচক সংকেত, এই সব কিছুর সঙ্গেই শাদা আলোর বিভিন্ন তারতম্যে ব্যবহার এবং একমাত্র এলার ঘরে দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে কালীমূর্তির ফোটোর কাছে লাল আলোর আভাস, তৃতীয় অঙ্কের শেষে পোড়ো বাড়িতে অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র মাস্টারমশায়ের হাতের টর্চের আলো, বা শেষ দৃশ্যে অন্ধকার ছাদে পাঁচিলের ওপারে বহুদূরে বাড়ির গায়ে জানলার দুটি ছোট্ট আলোর চতুষ্কোণ যখন প্রেতের চোখের মতো মনে হয়—আলোর, পরিবেশের ও শব্দের এই প্রয়োগ বিষয়বস্তু ও অভিনয়ের সঙ্গে একেবারেই একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে আলাদা করে বিচ্ছিন্নভাবে এই 'ইফেক্ট'গুলো নিশ্চয়ই মনে বা চোখে এসে লাগে নি।

যদিও আমার কাছে আজও সব মিলিয়ে 'চার অধ্যায়'-এর আলোক-পরিকল্পনা বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং আলোচনার যোগ্য, তবু পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের আধুনিক থিয়েটারের ক্ষেত্রে 'রক্তকরবী' যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, তারই মধ্যে 'রক্তকরবী'-র মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতও সাধারণভাবে সর্বস্তরের মানুষের মনেই সাড়া জাগিয়েছিল। 'রক্তকরবী' নাটকের প্রায় অসম্ভব মঞ্চপ্রয়াসকে শ্রীশম্ভু মিত্র সম্ভব করতে পেরেছিলেন, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতসহ প্রতিটি অঙ্গের সার্থক সমন্বয়ে।

পৌষের পাকা ধানের আমেজ, উজ্জ্বল সকাল, বিশু-নন্দিনীর নিভৃত অন্তরঙ্গ আলাপ এবং ফাগুলাল চন্দ্রা ও বিশুর আড্ডার দৃশ্য স্থান-পরিবেশে নিশ্চয়ই এক নয়, এই বিভিন্ন অংশগুলির অন্তর্নিহিত অনুভব এক নয়। নন্দিনী ও রাজার আলাপচারীর তাৎপর্য আরো গভীর। এঁটোদের দৃশ্যের উগ্র ভয়াবহতার সঙ্গে মঞ্চের গভীরে দূরত্বে এদের দেখানোর মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল—এই দৃশ্যের spiritual locale-কে spatial locale-এ স্থাপন করা হয়েছিল। খালেদ চৌধুরী মঞ্চসজ্জায় লাল রঙ, মার্বেল পাথর ও মকর দাঁতের ব্যবহার, এবং আলোর নিত্যপরিবর্তনশীল প্রয়োগকলায় বিভিন্ন রঙের আলো নানা কোণ থেকে প্রক্ষেপণ, 'ডিমার'-এর সাহায্যে আলোর এক প্যাটার্ন থেকে অন্য প্যাটার্নে যথাসম্ভব সুকৌশলে ও ধীরে দর্শকের চোখের অলক্ষ্যে মিশে যাওয়া, কখনও 'গ্লাইড্' করে, কখনও আচমকা নাটকের দৃশ্যান্তরে যাওয়া, নেপথ্যে রাজার অস্তিত্বের প্রতীক হিসেবে জালের দরজার উপরে দুটি লাল আলো জ্বলে ওঠা ইত্যাদি সবই শব্দের প্রয়োগের সঙ্গে সমন্বয়ে শ্রীমিত্রের সামগ্রিক প্রয়োগ-পরিকল্পনার সহযোগী অঙ্গরূপে নাটকের নাটকীয় প্রয়োজনেই

প্রয়োগ করা হয়েছিল। মানুষের চোখে এর সহজ আবেদন তো আছেই। সব মানুষের মনেই একটা কৌতূহলী ছেলেমানুষী মনও হয়ত আছে, সেই সহজ কৌতূহলী ছেলেমানুষী ভালো লাগার মাত্রাভেদও নিশ্চয়ই আছে। 'রক্তকরবী'র ক্ষেত্রে তাই দর্শকদের মনে visually সবচেয়ে ভালো লেগেছিল সিঁদুরে মেঘের পটভূমিকায় 'সিলুয়েটেড্' নন্দিনীকে। যদিও তুলনাগতভাবে হয়ত আলোর মনস্তাত্ত্বিক ব্যবহার (যদিও সম্পূর্ণ ভিন্নরকম) বা কল্পনা এ নাটকেই অন্যত্র অনেক বেশি কার্যকর হয়েছে, তবু নাট্যপ্রয়োজনেই 'রক্তকরবী'-র আলোক-পরিকল্পনায় দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার visual interest এবং সর্বোপরি সিঁদুরে মেঘের প্রোজেক্‌শনের (বিলেত থেকে আনা imported stuff ক্লাউড্ প্রোজেক্টরের সাহায্যে) ছবি দর্শকদের সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করেছিল। যদিও অতি পরিমিত সময়ের জন্য রঙীন মেঘ 'রক্তকরবী'র আকাশে দেখা দেয় (এবং সেই মেঘের যন্ত্রেরই তাকে চলমান করার ক্ষমতাও ছিল) তবু প্রথম দর্শনে অনভ্যস্ত দর্শকের চোখে মনে সবকিছু ছাড়িয়ে অনেকক্ষেত্রে অন্তত আলোর ব্যাপারে ঐ মেঘের ছবিই উজ্জ্বল হয়ে থাকত। এর জন্য দর্শকের রুচিকে সমালোচনা করে অপবাদ দেওয়া ঠিক হবে না। অনুরূপ কথাই বলা চলে 'পুতুলখেলা'-র একটি দৃশ্যের শেষে যখন সমস্ত মঞ্চ অন্ধকার হয়ে একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্রীভূত আলোকরশ্মি একটি কলের পুতুলের আকস্মিক সচল হাত-পা নাড়াকে প্রায় ক্লোজ-আপ-এর মতো দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরে। অথচ অন্য দৃশ্যে বিকেল থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে ডাঃ রায় ও বুলুর নিভৃত সংলাপে ক্রমে যখন এক ধরনের স্পেস্‌লাইটিং-এর ব্যবহারে দৃশ্যের মঞ্চসজ্জায় বেতের চেয়ার, ল্যাম্পের শেড, আলমারীর মাথায় ফুলো, দরজার আর্চ-এর কম্পোজিশনের বিশেষ রেখাভঙ্গিমা মূর্ত ও জীবন্ত হয়ে ওঠে তারই পটভূমিকায় বুলুর তীক্ষ্ণ প্রোফাইল ও মুখে একেবারে স্পষ্ট পাশ থেকে আসা আলো-অন্ধকারের অসম প্রয়োগ দৃশ্যের অস্থিরতা, চাপা উত্তেজনা এবং সাস্‌পেন্‌স্-কে ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। কিন্তু বেশির ভাগ লোকের চোখেই, এমন কি সমালোচকদের চোখেও কলের পুতুলের ছবিটাই মনে থাকে, এবং তা-ই নিয়ে আলোচনা হয়।

ট্রেন ও জলপ্লাবন : সেতু ও অঙ্গার

বিশ্বরূপা-য় 'ক্ষুধা' নাটকের আলোকপরিকল্পনা সম্পর্কে অভিযোগ ছিল, পেশাদারী মঞ্চের সমস্ত সুযোগসম্ভাবনা পেয়েও আমি এখানে আলোকে

'রক্তকরবী'র চেয়ে অনেক কম কাজে লাগিয়েছিলাম। এ অভিযোগের জবাবে আমি বলব, 'চিরকুমার সভা' বা 'শেষরক্ষা' হলে আলোর কাজ হয়ত আরো কম থাকত। অথচ 'ক্ষুধা' নাটকে তিনটি বেকার যুবকের ঘরের কোণের জানলায় ভাঙা শার্শির জায়গায় খবরের কাগজে ঢাকা তিন ফোকরের মধ্য দিয়ে গলির গ্যাসের স্তিমিত ম্লান আলোর আভাসে প্রকটিত অন্ধকারে ক্ষীণ কম্পমান প্রদীপশিখার আভাস ঘূর্ণায়মান মঞ্চের দুষ্টচক্রের চাপের মধ্যেও ব্যবহার করা হয়েছিল। হয়ত বাংলা রঙ্গালয়ে এই প্রথমই সামনে থেকে প্রেক্ষাগারের মাঝখান থেকে আলোকসম্পাতের বিশেষ প্রক্রিয়াটি, যা আধুনিক আলোকসম্পাতে অপরিহার্য, তারও উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ঘটেছিল। কিন্তু এই নাটকে একটি দৃশ্যে নায়কের অভ্রখনির অফিসের বাইরের জানলা দিয়ে রঙীন আকাশের পটভূমিকায় দূরে পর্স্‌পেক্‌টিভ-এ ছোট করেই প্রায় মডেলের মতোই কলকারখানা ও চিম্‌নির ধোঁয়াই কিছু দর্শক মনে রেখেছিলেন। এই নাটকের চরিত্রদের জীবনে আলো নেই, শুধু বিষণ্ণ দারিদ্র্যের 'অ্যানিমিক্‌' চেহারা। নায়িকা দারিদ্র্যের তাড়নায় ব্লাডব্যাংকে রক্ত বিক্রয় করে ; সেই দৃশ্যে কিছুটা লাল আলোর অর্থদ্যোতক ব্যবহার হয়েছিল। রঙীন আলোর ব্যবহার এই দু'বারই। বিষয়বস্তুতে রঙের অভাব আলোক-পরিকল্পনায় প্রকাশ করার সাধ্যমত চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এই আলোক-পরিকল্পনাও হয়ত সার্থক নয়। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রাথমিক অসুবিধা ও নাটকের দুর্বলতা অন্তরায় ছিল।

এই মঞ্চের পরের নাটক 'সেতু'। 'সেতু'র সপক্ষে একটা বড় কথা ঘূর্ণায়মান মঞ্চের নতুন বা সৃজনধর্মী ব্যবহার। যে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের দৌরাত্ম্যে মঞ্চশিল্পের ক্ষতিই হয়েছে, সেই ঘূর্ণায়মান মঞ্চের বিশেষ ব্যবহারেই আলো এবং অন্ধকারের 'ইম্‌প্যাক্ট্‌' কাহিনী বা নাটকের একটি বিশেষ মুহূর্তে ট্রেনের হুইস্‌ল্‌ ও শব্দের সংযোজনায় নাটকের অভিনয়ের একেবারে মাঝখানেই অত্যল্প স্থায়িত্বেও দর্শকমনকে যে চাঞ্চল্য ও বিস্ময়ে চমকিত করে যায় সেই অনুভূতি নাটকের অভিনয়ের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা এবং কতখানি ক্ষতিকর ভাববার বিষয়। আঙ্গিকের এই ট্রেন নাকি বাংলার নাটমঞ্চের বুকের উপর দিয়ে সত্যিকারের ভালো অভিনয়ের সম্ভাবনাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে এক হাজার চুরাশি বার চলে গেছে। ভাববার কথা অনেকগুলোই এসে যায়। মঞ্চের গতিশীলতার সঙ্গে সরাসরি মঞ্চ থেকে দর্শকের দিকে আলোকরশ্মি নিক্ষেপ, প্রেক্ষাগৃহের থামে-দেয়ালে এবং আক্ষরিক অর্থে দর্শকের দেহে-মুখে সেই

আলোর প্রত্যক্ষ স্পর্শ ও সঞ্চরণ, এবং শব্দ ও আলোর মাত্রা ও দিক পরিবর্তন নায়িকার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের 'হিষ্টিরিক্ ক্লাইম্যাক্স্'-এর মুখে যেভাবে যে effect সৃষ্টি করেছে দর্শকের মনে, এই রেলগাড়ির দৃশ্য নাট্যঘটনাচক্রের মাঝখানে না ঘটে যদি একেবারে শুরুতে কিংবা শেষ দৃশ্যের চূড়ান্ত আবেগের উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তির সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থিত করা হত, অথবা তর্কের খাতিরে টিকিট কেটে লোক জড় করে শুধুই নিছক মঞ্চে রেলগাড়ি দেখাবার আয়োজন করা হত, উপরোক্ত দৃশ্যে শব্দের যে মানসিক প্রক্রিয়া, তারও নিশ্চয়ই রকমফের ঘটত। শেষোক্ত দৃষ্টান্তে ঐ দৃশ্য হয়ে দাঁড়াত আঙ্গিকের ম্যাজিক হিসেবে উপলক্ষবিচ্ছিন্ন 'শুধুই আলোর ভেল্কি'। এই নাটক যাঁরা দেখেন নি, তাঁদের সুবিধার্থে এই দৃশ্যটির পারম্পর্য একটু সবিস্তারে বর্ণনা করা যাক। এ নাটকে আমার মতে ঐ রেলগাড়ির দৃশ্য পর্যন্ত দৃশ্যসজ্জার মধ্যে মোটামুটি শাদামাটা একটা ভাব আছে, আলোয়-শব্দে কোনো উগ্র চমক নেই। আচমকা অপমানিতা ক্ষুব্ধা এবং অস্বাভাবিক উত্তেজিতা নায়িকার ভাবাবেগের সঙ্গে আত্মহত্যার চিন্তা আমাদের এই দৃশ্যে নিয়ে যায়। হঠাৎ অন্ধকারে ধাবমান মোটরগাড়ির শব্দ, নিস্তব্ধ কয়েক মুহূর্তের সাস্‌পেন্‌স্, মঞ্চের অন্ধকার 'স্পেস্' অতিক্রম করে অতিদূরে ক্ষীণ সিগ্‌নাল্-এর আলোকবিন্দু দৃশ্যমান হয়। ঐ নীল আলোকবিন্দুটি যে সিগ্‌নালের আলো তা হয়ত স্পষ্টভাবে সকলের চিন্তায় আসে না। অন্ধকার আকাশে বিষণ্ণ একাকিত্বের প্রতীক কোনো তারা বা অন্য কিছু বলেও বোধ হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই ভাবনা সচেতন রূপ নেবার আগেই ট্রেনের বাঁশি শোনা যায়—দূরাগত ট্রেনের একটানা ক্রমবর্ধমান শব্দের সঙ্গে দিগন্তরেখার কাছে একটি ক্ষীণ অথচ তীব্র আলোকরশ্মির আবির্ভাব এবং ক্রমাগ্রসরমানতার সঙ্গে গতিপথ পরিবর্তন করে দর্শকদের দিকে আলোকরেখার প্রক্ষেপণের সঙ্গেই ক্রমে আলো-শব্দের সমন্বয়ে একটা 'ক্রেসেণ্ডো'তে তোলা হয়। তারই সঙ্গে অপ্রত্যাশিত অনভ্যস্ত দৃশ্যের ব্যাপ্তি, সমস্ত ল্যাণ্ড্স্কেপ, 'সিলুয়েটেড্' গাছপালা, টেলিগ্রাফ পোলসহ দর্শকের চোখের সামনে নতুন চেহারায় গতিশীলতা লাভ করে। সেই চেহারাও দর্শকের কল্পনার হিসেবের বাইরের চেহারা। পুরো ঘূর্ণায়মান মঞ্চ দর্শকের চোখের সামনে ঘুরতে শুরু করে। এই দৃশ্যের আগে সাধারণ শাদা আলোয় flat scenes চাপা অনুভূতির একেবারে contrast হিসেবে, চূড়ান্ত contrast হিসেবেই পুরো মঞ্চের সবটাই দর্শকের

চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করা হয়। অন্ধকারের অস্পষ্টতায় একটা অপরিচিত অজানা উন্মুক্ত প্রান্তরের অনুভূতি চোখকে মনকে এক লহমায় একটা নতুন অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতায় নিয়ে যায়।

পূর্ববর্তী দৃশ্যের সমস্ত মানসিক অস্বাভাবিকতা নিয়ে সেই জনমানবহীন দৃশ্যে আলো ও শব্দের বিচিত্র পরিবেশে নায়িকা প্রবেশ করে। ক্রমে রেলওয়ে এম্‌ব্যাঙ্ক্‌মেণ্টের suggestion হিসেবে রেললাইনের মাঝখানে দৃশ্যের একমাত্র মানবচরিত্র অবস্থান করেন। যে রেলওয়ে এম্‌ব্যাঙ্ক্‌মেণ্ট্‌ মঞ্চের 'লেভেল' থেকে সাড়ে ছয় ফীট সাত ফীট উঁচু, সেই এম্‌ব্যাঙ্ক্‌মেণ্ট্‌ কার্টেন-লাইন ঘেঁষে পাদপ্রদীপের সামনে দিয়ে ঠিক দর্শকের একেবারে চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে যায়। আলো-শব্দ-দৃশ্যের প্রয়োগে এর পরে আরো কিছু effects সৃষ্টি করা হয়। শেষ মুহূর্তে আত্মহত্যা থেকে নায়িকাকে নিবৃত্ত করে স্বামী—তখন ধাবমান ট্রেনের গতিশীলতায় ট্রেনের জানলার suggestion হিসেবে চারকোণা আলোর moving square দ্রুত ছুটে যায়। এই পুরো দৃশ্য সংস্থাপনায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুক্তির দিক থেকে বিচার করলে অনেকগুলো গোলমাল যে-কোনো সাধারণ দর্শক হয়ত আবিষ্কার করতে পারেন। যেমন: (১) যেখান থেকে সিগ্‌নালের আলো দেখা যায়, সেখান থেকে ট্রেনের আলো দেখা সম্ভব নয়। (২) কাল্‌ভার্টের উপরে ট্র্যাকের স্লীপার এবং লাইনের মাপ ঠিক তার উপরেই দাঁড়ানো 'হিউমান ফিগার'-এর মাপের তুলনায় অবিশ্বাস্যরকম ছোট। (৩) টেলিগ্রাফ পোল পর্স্‌পেক্‌টিভ্‌-এর খাতিরে অস্বাভাবিকরকম ছোট করা হয়েছে। (৪) জানলার কাটা কাটা আলোয় দৃশ্য শেষ, তার আগে সার্চলাইটের আলো—মাঝখানে 'ব্রিজিং' হিসেবে অন্য কিছু কম্পমান আলোর প্রয়োগ আছে। (৫) কাটা কাটা আলোর visual ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্যই কাছের ট্রেনের শব্দের quality-র বদলে হঠাৎ সেই শব্দ কেটে ব্রিজের উপর দিয়ে ধাবমান ট্রেনের শব্দের' ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দূরের নীল আলোর বিন্দুটি তখনই লাল আলোয় পরিণত হয়।

এক কি দেড় মিনিটের মধ্যেই সমগ্র ঘটনাটি ঘটে যায়। অথচ তারই visual, dramatic, spectacular impact-ই নাকি এই একটি নাটকের একাদিক্রমে পাঁচ বছর ধরে একটানা অভিনয়ের রেকর্ড সৃষ্টির অন্যতম কারণ। নাটকের বিষয়বর্হিভূত না হয়েও এই দৃশ্যটি মানুষকে মুগ্ধ করেছে,

বিস্মিত করেছে—এ পর্যন্ত তো নিশ্চয়ই সবিনয়ে সসংকোচে বলতে পারি।

'অঙ্গার'-এ আঙ্গিকের অপব্যবহারের অভিযোগ আরো এক ধাপ উঠেছিল। 'অঙ্গার' কয়লাখনির কাহিনীতে কালো কয়লা, যান্ত্রিক পরিবেশ, খাদের অন্ধকার রহস্য, বিস্ফোরণ ও দুর্ঘটনার উত্তেজনা, এক্স্কাভেটর, ক্রেন, লিফ্‌ট্-এর ওঠানামা, কালো কয়লার grim কালোময়তার পটভূমিকায় মানুষের ট্র্যাজেডি। সনাতন, বিনু, রমজান, গফুরের মতোই লিফ্‌ট্‌হেড্, ক্রেন, বেলচা, গাঁইতি, টর্চ এবং গ্যাস ধোঁয়া অন্যতম জীবন্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে 'অঙ্গার'-এর পুরো স্ট্রাক্চারের বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। কয়লাখনি shotfirer-এর কোয়ার্টারের প্রথম দৃশ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য নেই। পরে আলো কমে আসে, অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসে, এবং শেষ দৃশ্যের আগে রেস্কিউ দৃশ্যে কম্পোজিশন, আলোকবিন্যাসে নানান চিন্তা এসেছে। যেমন দৃশ্যের অসহ্য অস্থিরতাকে একটি লাল আলোর মালার ক্রমান্বয়ে জ্বলা-নেভা (flickering) ব্যবহৃত হয়েছে। সেই মুহূর্তগুলি মুনাফালোভী খনিকর্তৃপক্ষের আরেকটি বিস্ফোরণের সাহায্যে মাটির নিচের খাদগুলিকে জলপ্লাবিত করে দেওয়ার ঘোষণা ও সেই ঘোষিত বিস্ফোরণের actual ঘটনার মধ্যেকার সাস্পেন্স্-এর মুহূর্তগুলি। কোনো একটি মুহূর্তে পুরো রেস্কিউ ফীল্ডে একমাত্র আলোর source হিসেবে এই জ্বলা-নেভা বা flickering-কেই রাখা হয়েছে। রেস্কিউ অপারেশনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ও হতাশার চূড়ান্ত বেদনাকে রূপ দেওয়া হয় দৃশ্যের শেষে মাত্র কয়েকটি অস্পষ্ট লাল আলোকরেখার সাহায্যে, পিট্‌হেড্-এর ফ্রেম ও চাকার একটি অংশকে অমঙ্গলসূচক ও ভয়ংকর এক dominating solitary presence দিয়ে, চাকা ও ফ্রেমের গায়ে লাল আলোর আঁচড়ের অশুভ ইঙ্গিতে। কিন্তু 'অঙ্গার'-এর আলোকসম্পাত সম্পর্কেও উচ্ছ্বাস শেষ দৃশ্যের জলোচ্ছ্বাস নিয়ে।

তার আগে পাতালপুরীর অন্ধকারের অস্তিত্বকে আলোকিত করে, অথচ শ্বাসরোধকারী গুমোট অন্ধকারের অনুভূতি বজায় রাখার দুরূহ চেষ্টা হয়েছিল। অন্ধকারকে দেখাতে হবে, অথচ আলো দিয়েই দেখাতে হবে। অন্ধকারের এই রূপ নিয়ে ভাবতে গিয়ে এমন আলোর উপকরণের প্রয়োজন হল যা কোনো-একটি দলের পক্ষে সেই সময়ে পাওয়া অসম্ভব। বিশেষত লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ তখন অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছিল। এই

উপকরণ আমদানী করতে গেলে যে-টাকা লাগত, তা লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের ছিল না, তাছাড়া আমদানী করতে সময়ও লাগত আরো অন্তত ছ' মাস। মঞ্চে নিয়মিত অভিনয়ের ব্যাপারে যন্ত্রপাতি ধার করে বা ভাড়া করেও কাজ চালানো যেত না। একটা নিষ্ফল আক্রোশে হতাশায় যখন এই দৃশ্যের মঞ্চরূপায়ণ আলো ও সেট্‌-এ অসম্ভব বলে ধরে নিতে প্রায় বাধ্য হয়েছি, তখন শেষ চেষ্টা হিসেবে মানসিক যুদ্ধক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ জানালাম আমার দেবতাকে, আমার শত্রুকে, আমার অনুপ্রেরণাকে। চ্যালেঞ্জ জানালাম আলোকেই। প্রতিপক্ষকে বুঝতে চেষ্টা করলাম। প্রশ্ন করলাম: আলো কি? কী তার বৈশিষ্ট্য? imported stuff দিয়ে কী হয়? এবং সেই উপকরণ হাতে না থাকলে কি শেষ পর্যন্ত দেশের থিয়েটারের সাংগঠনিক দুর্বলতা, সরকারী ঔদাসীন্য, অর্থনৈতিক অসহায়তা, ও শিল্পীর অক্ষমতাকে দায়ী করে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার আয়োজনই করতে হবে? শেষ পর্যন্ত তা হয় নি। যা হয়েছে, আপনারা দেখেছেন। এবং পাঁচ-ছ' হাজার টাকার জায়গায় খরচ হয়েছিল উনত্রিশ টাকা আট আনা। Imported stuff আমদানীর সর্বনূ্যন ছ' মাসের জায়গায় আমাদের লেগেছিল তিন ঘণ্টা। জীবনে না-থাকা না-পাওয়ার প্রতিবন্ধকতার প্রতিকূলতায় যেমন মানুষকে ভাবায়, শেখায়, থিয়েটারও তেমনি ভাবায়, শেখায়, নিত্য নতুনতর পথ দেখায়—'অঙ্গার'-এর উদ্বোধনের তিন দিন আগে যেমন দেখিয়েছিল আমাদের। কতকগুলো লজেন্‌সের বিস্কুটের ভাঙা পুরনো টিন এবং সাবেক মিনার্ভা থিয়েটারের মরচে-ধরা Exit নির্দেশক টিনের খোলের সাহায্যে অসংখ্য mirror-spot, float-spot এবং optical projector-এর কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কীরকম কাজ চলেছিল, তার প্রমাণ শেষ দৃশ্যের জলোচ্ছ্বাসে টিনের কৌটোয় পেরেকের ফুটো দিয়ে প্রতিফলিত আলো আল্‌কাথীনের চাদরে জলোচ্ছ্বাসে বাংলা তথা ভারতীয় "সৎ" থিয়েটার-শিল্পের সম্ভাবনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ থেকেই বোঝা যায়।

'অঙ্গার'-এর শেষে জলপ্লাবনে দর্শকমনে সহসা যে উচ্ছ্বাসের সঞ্চার হয়, তাও বাস্তবিক বিচ্ছিন্ন নয়। এতক্ষণ ধরে অন্ধকারের দম আটকানো পরিবেশে হাঁপিয়ে ওঠা মন জলের সাড়া পেয়েই একটা অদ্ভুত প্রাণোচ্ছল মুক্তির বোধ লাভ করে। শৈল্পিক ফর্ম হিসেবে আঙ্গিকের সুপরিকল্পিত প্রয়োগে অনুভূতির এই transition রচনা নিশ্চয়ই নিছক হাততালি কুড়োবার

ব্যবসায়িক চেষ্টা নয়। দর্শকের মনের গভীর আশঙ্কা এসে অবসাদ ও বিষাদকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে এক নাটকীয় সমাপ্তি রচনার সাফল্যেই আঙ্গিকের এই প্রয়োগের বিশেষ তাৎপর্য।

উপসংহারে 'কল্লোল'

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, থিয়েটার অনেকগুলি শিল্পকর্মের সমন্বয়। এর প্রতিটি অঙ্গের স্বকীয় সম্ভাবনা, নাটকেরই দাবিতে, প্রসারিত হয়। নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীর মতনই এক-একটি অঙ্গ দৃশ্যবিশেষে বা নাটকবিশেষে প্রাধান্য লাভ করতে পারে, অর্কেস্ট্রায় যেমন অংশবিশেষে কোনো বিশেষ যন্ত্র প্রাধান্য লাভ করে। এই প্রক্রিয়ারই সর্বাধুনিক উদাহরণ উপসংহারে আলোচ্য। বহু আলোচিত ও বহুবিতর্কিত উৎপল দত্তের 'কল্লোল' নাটকে দৃশ্যপট রচনা, আলোক, সংগীত, শব্দের আকর্ষণের গুরুত্ব বা আবেদন হয়ত থাকতই না, যদি নাট্যবস্তুর মধ্যে এক অন্তর্নিহিত দৃঢ়তা, রাজনৈতিক বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা বা শ্লেষ, এবং হয়তো নানা কারণে আজকের দিনের ঝিমিয়ে পড়া হতাশ বিভ্রান্তিকর বিষণ্ণতার মধ্যে বহুকাল পরে বা হয়তো এই প্রথমই অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ও ভাবে একটি পৌরুষদীপ্ত বিদ্রোহের অনুপ্রেরণা না থাকত। কর্তৃপক্ষীয় অস্বস্তি, বৃহৎ সংবাদপত্রগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অসহযোগিতা ও বিরোধিতা কাটিয়েও 'কল্লোল' যে সাড়া জনমনে নাট্যজগতে আজকের এই রাজনৈতিক বিভ্রান্তির অসহায়তার মধ্যেও এনেছে, তারই উত্তেজনায় 'কল্লোল'-এর জাহাজ, বয়লার রুমের দৃশ্যবৈচিত্র্য 'কল্লোল'-এর আলোকবিন্যাসে এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে শেষ কথা বলা যায়, একটা বিশ্বজনীন ভাষায় থিয়েটারের বিভিন্ন অঙ্গকে সার্থকতায় আনার অন্যতম বলিষ্ঠ প্রচেষ্টায় নাট্যকার-পরিচালক উৎপল দত্তের 'কল্লোল' এক নির্ভীক চ্যালেঞ্জ। এই সময়ে এই নাটকের প্রয়োজন ছিল।

'ছেঁড়া তার' থেকে 'কল্লোল'-এর এই ইতিহাসে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক imperfections-এর মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হয়ত অনেক দুর্বলতা থেকে গেছে। কিন্তু এইটুকু জানি, পেশাদারী বা অপেশাদারী মঞ্চে যেটুকু কাজ করা গেছে, থিয়েটারের নতুন আলোর ভাবনা ও সম্ভাবনাকে যতটুকু সঞ্চার করে দেওয়া গেছে, আদর্শ, চিন্তা বা কর্মের দিক থেকে আরো সম্পূর্ণ বা সার্থক নাটক বা প্রযোজনার জন্ত অনিশ্চিত অপেক্ষায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে সেইটুকুও তো সম্ভব হত না। এবং এইটেকেই আমি বলি 'পজিটিভ্ অ্যাক্শন'।

পুস্তক-পরিচয়

বাঁকুড়ার ও উড়িষ্যার মন্দির

বাঁকুড়ার মন্দির। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ। পৃ. ১—২০২; দাম—১৫৲।

উড়িষ্যার দেব-দেউল। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। কন্‌টেম্পোরারি পাবলিশার্স। পৃ. ১—৬৪। দাম—৫৷৹।

অনেক দেশেই প্রাচীন কালের জীবনে ধর্মের স্থান ছিল বহু-ব্যাপক। ভারতবর্ষে তো কথাই নেই—ঈশা বাস্যমিদং সর্বং। এবং সেই সূত্রে উঠতে-বসতে সব জিনিসেই দেখা যায় সেই ধর্মানুভূতির একভাবে-না-একভাবে বিচিত্র প্রভাব। সাহিত্য ও শিল্পও অনেকাংশে এখানে দেবতার নামেই নিবেদিত। ফলটা সব সময়ে প্রীতিকর হয় নি। অনেক নিরর্থক ও অবান্তর আয়োজনেও শিল্প বিড়ম্বিত হয়েছে। কিন্তু যথার্থ শিল্পপ্রতিভা এই ধর্মভাবনায় একটা মহিমারও উদ্দেশ পেয়েছে। ভূমার ভাবৈশ্বর্যে সৌন্দর্যবোধ তখন হয়েছে পরিপুষ্ট, সুগম্ভীর; শিল্প হয়েছে অকৃত্রিম, নিবিড় অনুভূতিতে সুগভীর, মানবাত্মার মহৎপ্রকাশ। ভারতবর্ষের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এ-সত্যেরও প্রমাণ আছে, তা স্বীকার্য।

ভারতীয় স্থাপত্যে প্রাধান্য পেয়েছে মন্দির বা তারই অনুরূপ ধর্মমূলক প্রয়াস—স্মৃতিবস্তু (যেমন, বৌদ্ধস্তূপ, চৈত্য), দেবতার সঙ্গে দেবতার উপাসকদের বিহার, গুহা-গহ্বরের বাসস্থান, নদীর ঘাট ইত্যাদি। মোহেন-জো-দড়োর পৌরসভ্যতায় অবশ্য আমরা সেই সঙ্গে মানুষের সাধারণ বাসগৃহ ও ঐহিক জীবনযাত্রার রূপও দেখতে পাই। পাটনার উপকণ্ঠে কুমরাহারে অশোকের রাজসভার সামান্য চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে তা ছাড়া, অশোক স্তম্ভ, শিলালিপি, মৌর্যযুগের নানা মূর্তি—এ সব অসামান্য সম্পদ। কারণ, কালের কোপ ও নানা বিজয়ীর আঘাত অতিক্রম করে এদেশে কোনো প্রাচীন যুগের কীর্তির টিঁকে থাকা সহজ কথা নয়। বিশেষ করে, ধর্মমূলক স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের টেঁকা তো প্রায় অসম্ভব ছিল। টিঁকেছে যা তা প্রায়ই অপেক্ষাকৃত স্থায়ী উপকরণের জিনিস, পাথর ও ধাতুর বস্তু। উত্তর ভারতে তাও সহজে নিষ্কৃতি পায় নি। কিন্তু বাঙলায় তেমন প্রাচীন মন্দিরও

দুর্লভ। দক্ষিণে আছে, উড়িষ্যায় আছে, মধ্যভারতে আছে, উত্তর-ভারতেও ভগ্ন বা লুপ্তচিহ্ন দেখা যায়। বাঙলায় মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুরে ধ্বংসক্ষেত্র ছাড়া তেমন প্রত্নচিহ্ন বেশি নেই। পুরাতাত্ত্বিকেরা মৌর্য-সুঙ্গ ও গুপ্তযুগের কিছু-কিছু কীর্তির সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু প্রধানত পাল ও সেন বংশের ভাস্কর্যই বাংলার প্রাচীন শিল্পকীর্তির প্রমাণ—আর ভারতীয় ইতিহাসের খাতায় সে দুই রাজত্বকাল 'প্রাচীন' নয়—'মধ্যযুগ' বা যুগসন্ধি। স্থাপত্যে বাংলার প্রাচীন রীতির আভাস খুঁজতে তাই পাহাড়পুরের দিকেই তাকাতে হয়। স্থাপত্য-নিদর্শন বেশি নেই, 'পাথুরে প্রমাণের' অভাব। প্রধান কারণ অবশ্য বাঙলাদেশ পাথুরে দেশ নয়—পলিমাটির দেশ। পাথর তাকে আনতে হত বিহার-উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চল থেকে, বিশেষ করে রাজমহল অঞ্চল থেকে। প্রবল রাজা বা সুসম্পন্ন ধনী ছাড়া কারও পক্ষে তা সহজসাধ্য হত না। সহজসাধ্য ছিল মাটি-কাঠ-ইট দিয়েই বাস্তুনির্মাণ। প্রধানত, তা দিয়েই বাংলায় মধ্যযুগের মন্দিরও নির্মিত, মস্‌জিদও নির্মিত। বাঙলার বাস্তুশিল্পে পাথর যা ব্যবহৃত হয়েছে তা সামান্য, তারও খানিকটা আবার পুরাতন মন্দিরের পাথর নিয়ে গড়া। ধাতুমূর্তি ও শিলামূর্তি অবশ্য যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইট-কাঠের শিল্পবস্তু স্বভাবতই পাথরের মতো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। উপকরণের সেই আপেক্ষিক দৈন্য কাটিয়ে উঠে বাঙালি শিল্পী নিজস্ব একটা ধারার শিল্পরীতি তবু আবিষ্কার করেছিল। মন্দিরের বেলা তা মূলতঃ প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-ধারারই একটা আঞ্চলিক রূপায়ণ; মস্‌জিদের বেলা আরবীয় ধর্ম, পারসীক সংস্কৃতি ও তুর্ক ক্ষাত্রশক্তির সহযোগে সেই ভারতীয় ধারারই আঞ্চলিক রূপান্তর। মন্দির-মসজিদ দুই বাঙলার বিশিষ্টতায় বিশিষ্ট—কিন্তু শত হলেও পাথরের মাহাত্ম্য বেশি। ভারতীয় স্থাপত্যে তাই বাঙলার বিশিষ্ট ধারা অপেক্ষাকৃত গৌণ বলেই গণ্য। অবশ্য আঞ্চলিক শিল্প হলেও তা পুরাতাত্ত্বিকদের চোখ এড়িয়ে যায় নি। আর পুরাতাত্ত্বিকেরাও অনেকে শিল্পানুরাগী—শিল্পানুরাগীরাও অনেকেই যেমন পুরাতত্ত্বেরও জিজ্ঞাসু। ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক ফার্গুসন, বেগ্‌লার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র কিম্বা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী বা পূর্বপাকিস্তানের অহমদ্‌ হসন্‌ (তাঁর **Muslim Architecture in Bengal, Asiatic Society of Pakistan: 1961,** বাংলার মুস্লিম বাস্তুশিল্প বিষয়ে বহুচিত্রসম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থ) প্রভৃতি পুরাতাত্ত্বিকদের

সঙ্গে স্মরণীয় শিল্পরসিক পার্সি ব্রাউন, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মুকুল দে বা সেই সঙ্গে নির্মলকুমার বসু, বিনয় ঘোষ প্রভৃতির মতো সাংস্কৃতি গবেষকদের নাম। নানা দিক থেকে এঁরা বাংলার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিদান করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সঙ্গে সম্প্রতি যোগ দিলেন আরেকজন শিল্প-অনুরাগী ও কৃতী গবেষক—শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি এখন পঃ বঙ্গের জিলা গ্যাজেটিয়ার সম্পাদনার ভার লাভ করেছেন। বাঁকুড়ার মন্দির সম্বন্ধে সাময়িক পত্রে তাঁর ধারাবাহিক আলোচনা ইতিপূর্বেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখন তা সমগ্রভাবে প্রকাশিত হল গ্রন্থাকারে—অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি নাতিবৃহৎ তথ্যপূর্ণ ভূমিকাও তাতে যোজিত হয়েছে। বাঙলার শিল্প-পরিচয়ের সাধারণ পর্ব শেষ হয়ে, মনে হয়, এবার আসছে বাঙলার এক-একটি অঞ্চলের ও বিশেষ শিল্প-আয়োজনের বিশদ ও বিস্তৃত জিজ্ঞাসার পর্ব—বাঙালির আত্মপরিচয় তাহলে পূর্ণতর হয়ে উঠতে পারবে। 'বাঁকুড়ার মন্দির' তারই সূচনা, আর বাঙালির আত্মপরিচয়ের তাই তা এক অত্যাবশ্যক উপকরণ।

মন্দিরের কথাই অবশ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু, লেখকের তা সাক্ষাৎ পরিচয়ের ও ক্ষেত্রানুসন্ধানের (ফিল্‌ড ওয়ার্কের) ফল। এরূপ কাজের মূল্য কোনো কালেই নষ্ট হয় না। মন্দিরগুলির বিবরণ ও আলোচনা তাই গ্রন্থের প্রধান বিষয়। কিন্তু মন্দির তো শুধু স্থপতির খেয়াল-খুশির সৃষ্টি নয়। এমনকি, শুধু শিল্পশাস্ত্রের বা বিশিষ্ট শিল্পধারারও একটা নিদর্শনমাত্র নয়। তা কেবল আরাধ্য দেবতার উপাসনা-গৃহ হলেও চলে না—সামাজিক মানুষের সাধ-স্বপ্ন দিয়েও তা গঠিত ও পরিবৃত। অনেক সময়েই একটা গোটা সমাজের জীবন ও ভাবধারারও তা প্রকাশ। যে-সমাজ রাজপ্রাসাদ বা অন্য বিরাট কিছু না নির্মাণ করে যুগে যুগে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে স্থায়ী রূপ দিতে মন্দিরে, তার সম্বন্ধে একথা আরও সত্য। মন্দির সমাজের বাস্তব জীবনধারার একটা সাক্ষ্য, আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার একটা স্বাক্ষর।

বাঁকুড়ার মন্দিরের কথা উত্থাপন করতে গিয়ে লেখক তাই সঙ্গত কারণেই বাঁকুড়ার ভৌগোলিক বিবরণ ও তার ইতিহাসেরও সন্ধান দিয়েছেন। বিশেষ করে দিয়েছেন বাঁকুড়ার জনসমাজের ইতিহাসের পরিচয়। কারণ, 'জনমানসের যাবতীয় স্পন্দন সেগুলিতে (মন্দিরগুলিতে) বিধৃত', এ-কথাটি মূলত সত্য,—যদি-বা সর্বক্ষেত্রে তা সত্য না হতে পারে।

এখনকার বাঁকুড়া জেলা অবশ্য মধ্যরাঢ়। পশ্চিমে মানভূম, সিংভূম, ঝাড়খণ্ড দিয়ে প্রায় তার বুকে এসে পড়েছে ছোটনাগপুরের তরঙ্গায়িত মালভূমের স্পর্শ। অরণ্যাবৃত পাহাড় ও শালবনে খানিকটা বাইরের থেকে এ ভূমিতে আড়ালও রচনা করেছে। সেদিকটায় আদিবাসী সমাজ এখনো জীবন্ত। কিন্তু অন্যদিকে বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুরের শস্যশ্যামল সমতল ক্ষেত্র বাঁকুড়ার প্রায় বিষ্ণুপুর মহকুমা পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে বাঁকুড়া আবার ভাগীরথ-ভূমিরও একটা প্রান্ত। সহজেই বোঝা যায়, ভাগীরথী অঞ্চল থেকে শিষ্ট হিন্দুসংস্কৃতি তার শাস্ত্র, আচার-নিয়ম দেবদেবী নিয়ে এসে এখানে অধ্যুষিত হয়েছে; ওড়িষ্যার রাজাদের প্রভাবেও পড়েছে আবার সেই হিন্দুসংস্কৃতির আরও কিছু ছাপ। তথাপি দামোদর, দ্বারকেশ্বর, কাঁসাইর সঙ্গে পশ্চিমের আদিবাসী কৃষ্টিধারাও এখানে রয়েছে পূর্বাপর অব্যাহত। বাঁকুড়ার সেই আদিবাসী কৃষ্টি হিন্দু-আর্য সমাজের ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলনে-মিশ্রণে তাই হারিয়ে যায় নি। বরং হিন্দু সংস্কৃতিকেও তা দিয়েছে কিছু বৈচিত্র্য; হিন্দু সংস্কৃতির স্থানীয় বৈশিষ্ট্য। বাঁকুড়া এ-অর্থে, লেখকের ভাষায়, 'সভ্যতার মিলনভূমি'। অবশ্য আমরা জানি, সমস্ত বাংলাদেশও তাই; ভারতবর্ষই কি অন্যরূপ? তবে কথাটা এই—এখানে আদিবাসী সমাজ ও ধর্মজীবন হিন্দুর সঙ্গে মিলনেও মিলিয়ে যায় নি। সাঁওতাল, বাউরী, বাগদী, মাল, ভূমিজ, ডোম প্রভৃতি জাতিগুলি এখনও এখানে সংখ্যায় সামান্য নয়। তাদের নিজস্ব দেবদেবী প্রথানিয়মও জীবন্ত। মনসা, ধর্মঠাকুর, চাণ্ডী প্রভৃতি দেবতারা 'হিন্দুও' হয়ে উঠেছেন। বাণফোঁড়া, আগুন-হাঁটা প্রভৃতি এখনো শিবের গাজনের অঙ্গ হয়ে রয়েছে।

এই মিলনভূমিটি সবশুদ্ধ মল্লভূমি নামে অনেকাংশে বিশিষ্ট থাকতে পেরেছিল অনেককাল। ইতিহাসের হিসাবে প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঁকুড়ার সেই সুযোগ ঘটে। তার আদিবাসী মল্লরাজারা ভারতের অন্য অনেক রাজবংশের মতোই, হিন্দু-সংস্কৃতির বিস্তারে 'ক্ষত্রিয়' হয়ে উঠেছিলেন। তার অর্থ হিন্দু ঐতিহ্য ও শিষ্টধারাকেও তাঁরা নিজেদের ইচ্ছায় অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন। এই পাহাড়-পর্বতের আড়ালে কতকাংশে মুসলমান-পূর্বযুগ থেকে মুঘলযুগের শেষ পর্যন্ত তাঁরা নিজেরাও স্বাধীন ছিলেন; মল্লভূমির সমাজ-জীবনকে ও সংস্কৃতিকেও নির্বিবাদে অনেকটা নিজস্ব ধারায় গড়ে উঠবার অবকাশ করে দিয়েছিলেন। দেখতে পাই—সেই আদিম-সমাজের মধ্যে এক সময়ে খ্রীষ্টপূর্ব দু' শতক থেকে প্রায় সাত-আট শত বৎসর পর্যন্ত মানভূম-

গণ্ডোয়ানা এলেকা থেকে প্রথম এসেছিল জৈনধর্মের একটা ধারা। রাঢ়ে-বারেন্দ্রও এক সময় জৈন ধর্ম প্রবল ছিল। মল্লভূমিতেও জৈনধর্মের কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল ; মন্দির না থাক, জৈন বিগ্রহমূর্তি এখনো সেখানে পাওয়া যায়। বিহারীনাথে, ধরাপাটে, বহুলাড়ার মন্দিরে তার সাক্ষ্য স্পষ্ট প্রাচ্যভারতের অন্যখানে যেমন এখানেও তেমনি হিন্দুসমাজ সেই পুরনো জৈন সংস্কৃতির সব মূর্তি আত্মসাৎ করে নিয়েছে। মূর্তিগুলোও বাঁকুড়ার হিন্দুমন্দিরে 'নেংটা ঠাকুর', 'নেংটা শ্যামচাঁদ' প্রভৃতি হিন্দুনাম নিয়ে টিঁকে আছে। এর পরে দেখি মল্লরাজারা শিব ও পার্বতীর উপাসক। উচ্চ গোষ্ঠীর সমাজেও বোধহয় তখন এ-ধরনের শৈব ও শাক্ত হিন্দু ধর্মেরই ছিল প্রতিপত্তি ; তলাকার সমাজে ছিল লৌকিক দেবতা প্রথা-নিয়ম ; দুই স্তরের সংমিশ্রণ, তখন সহজ স্বচ্ছন্দ। এ হল মল্লভূমির প্রধান রূপ। এ-পর্বটা সুদীর্ঘ, আর এ-ধারাটা বাঁকুড়ার জীবনের তৃতীয় ধারা, তা এখনো জীবন্ত। চতুর্থ পর্বে, রাজা। বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসের কাছে দীক্ষা নিয়ে চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির ধর্মকে গ্রহণ করলেন, (আঃ ১৬০০ খ্রীঃ'র দিকে), আর বৈষ্ণবধর্ম তখন থেকে প্রাধান্য পেল মল্লরাজাদের জীবনে, ধর্মে, বিষ্ণুপুরের সংস্কৃতিতে। বিষ্ণুপুর বৈষ্ণব সংস্কৃতির এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠল—অবশ্য মল্লভূমির ক্ষাত্রতেজও কৃষ্ণলীলার মধুর মাহাত্ম্যে ডুবে গেল। তবে আদিবাসী, জৈন, শৈব, শাক্ত ধর্ম ও ধ্যানধারণাও এই বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গেই মিলে-মিশে এখনো জীবন্ত ; বাঁকুড়ার মন্দিরে, দেব-দেউলেও তার প্রমাণ অফুরন্ত। অর্থাৎ ভারতবর্ষের ও বাংলার সংস্কৃতির যা মূল চরিত্র বাঁকুড়ায়ও তা অব্যাহত—সে-চরিত্রকে বলতে পারি হিন্দুত্বের আওতায় সকলের সহাবস্থান। নিশ্চয়ই বাঁকুড়ার স্থানীয় বৈশিষ্ট্যে এই সহাবস্থান একটু বিশিষ্ট,—নিজস্ব রীতির। সেদিক থেকে বাঁকুড়ার জীবনের এই প্রেক্ষাপটের মোট রূপটা অপ্রত্যাশিত বা অপরিচিত কিছু নয়। তবু তার বিশদ বিবরণ দিয়ে লেখক বাঁকুড়ার মন্দিরের কথাটিকে সযত্নে যে পূর্ণতা দিয়েছেন তা প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকর্ষক। তাঁর নিজের বৈজ্ঞানিক ভাব ও উদার দৃষ্টিরও তা প্রমাণ।

মন্দিরের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবরণের পরে তিনটি অধ্যায়ে—'বাঁকুড়ার মন্দির-স্থাপত্য', 'বাঁকুড়ার মন্দির-ভাস্কর্য' এবং 'মন্দির-পরিচয়ে' একে-একে। দক্ষিণের 'দ্রাবিড়', উত্তরের 'নাগর' আর দু'য়ের মধ্যবর্তী

'বেসর' ভারতবর্ষের মন্দিরের প্রধান স্থাপত্যশৈলী এই তিনটি। বাঁকুড়ার ও রাঢ়ের মন্দির এই 'নাগর' শৈলীর দৃষ্টান্ত। বাঙলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যেমন আছে, তেমনি আছে একটি নিজস্ব উদ্ভাবনাও—'বাংলা মন্দির' নামেই সে-কথাটা পরিষ্কার। ওটি বাঙালিরই স্বকীয় সৃষ্টি, আর স্থাপত্য শিল্পে 'বাঙলা মন্দির' বাঙালির দান। এ-দান প্রসারিত হয়েছে উত্তর ভারতে—জয়পুর, বুন্দি, কোটা পর্যন্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে।

'বাংলা মন্দির' বাঙালি চালাঘরেরই বিকাশ। আসলে, এ মন্দির বাঙালির বিশেষ ধর্মভাবনারও রূপায়ণ। দেবতাকে আমরা সুদূর ভাবি না, আমাদের ঘরের মানুষ করে তুলি। শুধু পূজা করি না, ভালোবাসি, স্নেহমমতার রসে অন্তরঙ্গ করি। ঐশ্বর্য-মহিমার আরাধনার চেয়ে দেবতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতাতেই আমাদের আগ্রহ। তাই দেবতাকে বিরাট মন্দিরে মহিমাময় করে না রেখে চালাঘরে নিজের পার্শ্বেই আপনার করে রাখতে আমাদের বাধে না। অবস্থা ভালো হলে সে চালাঘরকেই করেছি ইঁটের মন্দির,—একচালা, দোচালা, চারচালা, আটচালা, এমনি করে। আর সেই বাংলা-মন্দিরের গায়ে ক্ষোদিত করেছি নানা কাহিনী, পুরাণের কাহিনী, লতাপাতা, পশুপক্ষী, সমসাময়িক সাধারণ চিত্রও। অবস্থা আরও ভালো হলে সেই বাংলোয় চড়িয়েছি চূড়ো, এক চূড়ো ছেড়ে পাঁচ চূড়ো, ন' চূড়ো, একুশ চুড়ো ইত্যাদি। এমনি করে বাংলা মন্দিরেরও অন্তত তিনটি বিশেষ রীতিতে বিকাশ ঘটেছে—যথা, বাংলা-মন্দির, চালা-মন্দির, 'রত্ন' বা বহুশিখর-মন্দির। এ-সব মন্দিরের প্রাচীরে 'লহড়া' বা 'করবেলিহ' করে মন্দিরের মাথা মিলিয়ে দেওয়া হয় এক বিন্দুতে। ওড়িষ্যার মন্দিরধারাও অবশ্য বাঁকুড়ার দেবালয় নির্মাণে প্রভাব বিস্তার করেছিল। হয়তো তারও আগে 'নাগর' শৈলীর ("ত্রিরথ ত্রিঅঙ্গ বাঢ়") অন্য একটা ধারা এ-অঞ্চলের জৈন মন্দিরে অনুসৃত হয়েছিল। তবে ওড়িষ্যার (অমলকশীর্ষ, পঞ্চরথ, পঞ্চাঙ্গ বাঢ়) প্রভাব, 'পীড়া-দেউল' ও 'রেখা-দেউল' দু' রীতিতেই বাঁকুড়ায় এখনো স্পষ্ট। বৈসাদৃশ্যও কম স্পষ্ট নয়।—এ সবই চমৎকার চিত্র দিয়ে লেখক ব্যাখ্যা করেছেন।

মনে রাখবার মতো অন্য কথা অবশ্য এই যে, প্রধানত বাংলাদেশের মন্দির ইঁটের তৈরি—ইঁটের সন্ধান পাহাড়পুরে, নালন্দায়ও পাই। অবশ্য বাঁকুড়ায়ও মাকড়া বা ল্যাটেরাইট পাথরের মন্দিরও কিছু আছে। তা

ইঁটের তুলনায় বাঁকুড়ার বৈশিষ্ট্য নয়। দ্বিতীয় কথা, বাঁকুড়ার মন্দির ভাস্কর্যের যা প্রধান বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে তার পোড়ামাটির বা 'টেরাকোটা'র ভাস্কর্য—আর তা যে কী আশ্চর্য কলা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক, তা বোঝানো অসম্ভব। অমিয়বাবুর কৃতিত্ব—তিনি তা যথাসম্ভব বোঝাতে পেরেছেন তাঁর উৎকৃষ্ট চিত্রাবলীর দ্বারা, আর সেই সঙ্গে আলোচনার দ্বারা। মাটির মতো সামান্য উপকরণ বাঙালি শিল্পীর হাতে এ পদ্ধতিতে অসামান্য হয়ে উঠেছে—সামান্যকে অসামান্যতা-দান বাঙালি শিল্পকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য। এই বিশেষ কলা আজ মৃত, পোড়ামাটির সেই কারুবিদ্যার কৌশল অন্তত একশত বৎসর হল বাঙলাদেশে বিস্মৃত। অর্থাৎ যখন বাংলাদেশে পাশ্চাত্য প্রভাব বেড়েছে তার আগে থেকে সেই শিল্পিগোষ্ঠীর কারুকৃতিও সম্ভবত অবজ্ঞাত হয়, পৃষ্ঠপোষকদের অভাবে ক্রমে তা তখন অবলুপ্ত হয়ে যায়। আজ আছে শুধু পোড়ামাটির পুতুল, আর নতুন করে 'আর্ট' হয়েছে (পাঁচমুড়ার) বাঁকুড়ার ঘোড়া। বাঁকুড়ার মন্দিরের সেই পোড়ামাটির অলঙ্করণের বিষয়ে এমন বিশদভাবে ইতিপূর্বে বোধহয় আর আলোচনা হয় নি। শেষ অধ্যায়ে এক-একটি করে লেখক পরিচয় দিয়েছেন বাঁকুড়ার প্রধান প্রধান মন্দিরগুলির। 'দেউল' পর্যায়ের বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির (১১শ শতাব্দীর ?) তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ধরাপাটের রেখ-দেউল, ঘুটগোড়িয়ার প্রস্তরনির্মিত রেখ-দেউল, বিষ্ণুপুরের দুটি দেউল, এ-সবের বিবরণ দিয়ে পরে 'বাংলা-মন্দির'সমূহের বিশদ বিবরণ তিনি উপস্থিত করেছেন। নানা কারণেই তার মধ্যে বিশেষ আলোচ্য হয়েছে বিষ্ণুপুরের 'জোড়া-বাংলা', 'শ্যামরায়ের মন্দির'; সোনামুখীর 'শ্রীধর মন্দির'। তা ছাড়া নিছক নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে উল্লেখযোগ্য হয়েছে এক্তেশ্বরের শিবমন্দির, বিষ্ণুপুরের চারচালার পীরামিড আকৃতি 'রাসমঞ্চ'।

শুধু এই শেষ দুটি অধ্যায়ের জন্যও গ্রন্থকার সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হতেন। যেমন তাতে আছে তাঁর পরিশ্রম, শিল্পনিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার প্রমাণ, তেমনি তাঁর স্বগৃহীত আলোকচিত্রে তাঁর বক্তব্য হয়েছে পরিস্ফুট আর আনন্দদায়ক। শুধু এই উৎকৃষ্ট আলোকচিত্রগুলির জন্যও এ-বই আদরণীয়। বলাই বাহুল্য, শিল্প-আলোচনা সুনির্বাচিত সুপরিচ্ছন্ন চিত্রেই সার্থক হতে পারে, আর 'বাঁকুড়ার মন্দির' তাই হয়েছে। শেষে দু' একটি কথা বলা যেতে পারে—সাময়িকপত্রে সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশের জন্য লেখায় কিছু-কিছু পুনরুক্তি থেকে গিয়েছে। লেখকের আবেগ-উক্তি ও খেদও একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে, আর

চিত্রসন্নিবেশেও বাঁধাইকালে সামান্য ত্রুটি ঘটেছে। এগুলি অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিস; তবু মূল্যবান জিনিসটিতে তাই-বা কেন থাকবে?

বাঁকুড়ার মন্দিরের আলোচনায় উড়িষ্যার মন্দিরের কথা অপরিহার্য। কারণ, অবশ্য বাংলার মন্দিরের যত বৈশিষ্ট্য থাক, উড়িষ্যার সঙ্গে তার তুলনা হয় না। কিন্তু বাঁকুড়ার মন্দির-শিল্পে উড়িষ্যার মন্দিরশৈলীর প্রভাব আছে, অবশ্য পার্থক্যও কম নয়, তাও জানা কথা। পুরীর বা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মতো বিরাট মন্দির নির্মাণ বাঙালি রাজাদের সাধ থাকলেও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। বিশেজ্ঞরা মনে করেন, 'ময়ূরভঞ্জের খিচিং'-এ দেখা যায় উড়িষ্যার মন্দির পরের দিকে সে-অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত সরল ও ক্ষুদ্রায়তন হয়ে এসেছে। খিচিং-এর সেই সরলীকৃত পদ্ধতির অনুবর্তনই বাঁকুড়ার মন্দির-প্রতিষ্ঠাতাদের বাঁকুড়ায় সাধ্যায়ত্ত হয়েছিল। খিচিং দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র।

উড়িষ্যার প্রধান মন্দিরগুলিতে পাই দেবতার মহিমাময় রূপেরই প্রকাশ। বিরাটের আরাধনা। সেই সু-উচ্চ শিখর, বৃহদায়তন জগমোহন, প্রশস্ত অঙ্গন, একাধিক উপমন্দির—এ-সবের ঔদার্য অসামান্য—তা কাউকে অভিভূত না করে পারে না। চিরদিনই তা দেশী-বিদেশী সকল দর্শকের বিস্ময়। বাংলা সংস্কৃতির ছাত্ররা জানেন—আমাদের একালের জাগরণে উড়িষ্যার মন্দির কী গভীর প্রেরণা ও জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগিয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সময় থেকেই আমাদের মনকে আকৃষ্ট করেছে একদিকে উড়িষ্যার মন্দির অন্যদিকে বৌদ্ধ শিল্পের চিহ্ন-সমূহ, বিশেষত বুদ্ধগয়ার মন্দির। হয়তো সেজন্যই এমন বিদেশীয় পণ্ডিতেরও অভাব হয় নি যাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন—এসব মন্দির মৌলিকভাবে দেখলে ভারতের সৃষ্টি নয়—অন্তত ভারতের হিন্দুদের নয়। গ্রীক না হোক পারসীক, বা নিদেন ভারতীয় পাঠান বা মুঘল স্থাপত্যকলারই এসব একটা অপভ্রংশ; যেন ভারতীয় মুসলমান শিল্পকলা ভারতীয় নয়—একেবারেই বহিরাগত! এরূপ হাস্যকর কথা বা ইঙ্গিতে আজ কর্ণপাত করাও আমাদের নিষ্প্রয়োজন। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এরই উত্তরে আমরা 'ওলট-পুরাণের' রচনাতেও এখন উৎসাহী; তাও সমান নিষ্প্রয়োজন। একদিন তবু ভারতীয় শিল্পের স্বপক্ষে প্রমাণপঞ্জি আলোচনা করতে হত, তার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য-ব্যাখ্যাও অত্যাবশ্যক কর্তব্য ছিল। যাঁরা এরূপ আলোচনায় বিদ্যা, ধৈর্য ও শ্রদ্ধা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের

(খ্রীঃ ১৯২৫) নাম স্মরণীয়। পূর্তবিদ্যা বা ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল তাঁর বিষয়কর্ম। কিন্তু বিবেকানন্দ-অরবিন্দের ভাবনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হন। স্বদেশী যুগের প্রেরণায় তিনি অনুপ্রাণিত ছিলেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের, বিশেষ করে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের তিনি ছিলেন অনুরাগী গবেষক। সে-বিষয়ে তিনি একাধিক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লেখেন। 'উড়িষ্যার দেব-দেউল' তাঁর সুবিখ্যাত 'Orissa and Her Remains, Ancient and Mediaeval' (১৯১২) নামক গ্রন্থের স্বকৃত সার-সংকলনস্বরূপ। বাঙলা বইখানার সম্পূর্ণ রূপ তিনি স্থির করে যেতে পারেন নি। তবু বলা যায়—তিনি উড়িষ্যার মন্দির সম্বন্ধে একখানা সুপাঠ্য বিবরণী বাঙালি সাধারণের জন্য রেখে গিয়েছেন। পুরী, ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি-খণ্ডগিরি ও কোণারকের মন্দিরসমূহের সংক্ষিপ্ত (মোট ৬৪ পৃষ্ঠার) ও চিত্তাকর্ষক এই গ্রন্থখানি শিক্ষাপ্রদ একাধিক কারণে। তার মধ্যে প্রধান কারণ—বাস্তুবিদ্যার বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে এই মন্দিরশৈলীর বিশদ ব্যাখ্যা, আর ভাবুকের চোখ দিয়ে সে-শিল্পের রস-পরিবেশন। প্রকাশকেরা এ-গ্রন্থ প্রকাশ করে বাঙালি পাঠকের ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন। এজন্য কৈফিয়ৎ নিষ্প্রয়োজন। ২২ খানার মতো চিত্রে ও নক্সায় বইখানি সুসজ্জিত, তাও আনন্দের কথা। কিন্তু তাঁরা প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বেকার এ-লেখাটির সম্পাদনার আর প্রয়োজন নেই মনে করলেন কেন? 'হুঁসিয়ার পাঠকের উপর' তাঁরা সংশোধনের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন। কিন্তু একজন যোগ্য লোক দিয়ে একটি পরিশিষ্ট বা কিছু টীকা সংযোজন করে তা সম্পূর্ণ করা দুঃসাধ্য হত না। প্রকাশকদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার সঙ্গে তাই একটু খেদও আমাদের থেকে গেল।

গোপাল হালদার

সম্প্রতিকালের ব্রিটিশ ভাস্কর্য

সাম্প্রতিক ব্রিটিশ ভাস্কর্য-প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। খুব কাছাকাছি সময়ে আমরা একাধিক পশ্চিমী ভাস্কর্যের প্রদর্শনী দেখলাম, যার মধ্যে মেক্সিকোর প্রদর্শনী স্মরণীয়। তবু ব্রিটিশ ভাস্কর্যের এই সমাবেশ থেকে অতি সম্প্রতিকালের ইয়োরোপীয় ভাস্কর্যশিল্পের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা আমরা পেতে পারি।

গ্রীক ভাস্কর্যই সম্ভবত ইউরোপীয় আদিশিল্পের উজ্জ্বলতম নিদর্শন। মিকেলাঞ্জেলো ভাস্কর্যকে সেই মূল্য দিতে পেরেছিলেন, তার সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তাকে স্বীকার করেছিলেন। মধ্যযুগে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য অঙ্গাঙ্গী হয়ে গেল। এবং চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য হল মোটামুটি literary idea-র বাহক।

আধুনিক যুগের প্রারম্ভে ইউরোপীয় শিল্পচেতনার দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটলো। রিয়ালিজমের বাইরেও যে সার্থক শিল্পসৃষ্টি হতে পারে আফ্রিকা ও প্রাচ্য শিল্পের, বিশেষত লোকশিল্পের সঙ্গে পরিচয়ে ইউরোপীয় শিল্পীরা সেই জ্ঞানলাভ করলেন ও তাঁদের শিল্পমানস রিয়ালিজমের অনুকৃতির কম্‌পালশন্‌ থেকে মুক্তি লাভ করল।

পৃথিবী ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছে, এদেশ-ওদেশ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়েছে। পায়ে-চলা থেকে রেল বা ঘোড়া থেকে এরোপ্লেনের প্রচলন জীবনযাত্রাকে দ্রুত করেছে। এই চরম পরিবর্তনের জগতে বিজ্ঞানের সৌজন্যে শিল্পের বিষয় (matter) বা রূপ (form) সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি নতুন অনাবিষ্কৃত দিকেও পড়ল, চিরদিনের জানা রূপকে নানারকমভাবে আবার নতুন করে জানতে হল। সৃষ্টিশীল শিল্পীর রূপ বা পট (perspective) বহুবিচিত্র হল; মানবীয় রূপের সীমানাকে সে ছাড়িয়ে গেল। সমুদ্রের তীরের ঝিনুক অথবা পাহাড়ের খাঁজে কুড়িয়ে পাওয়া নুড়ি-পাথর থেকে এই যুগের শিল্পী নতুন রূপরীতিকে আবিষ্কার করল। তারপর আরম্ভ হল নতুন নতুন উপাদানের ব্যবহার।

তাই, আজকের যুগের ভাস্কর্য শুধু মানুষের দেহনির্ভর নয়, তার যথাযথ রূপ বা গতিকেই শুধু শিল্পিত করে না; তারই প্রকাশ দেখি এসব ভাস্কর্যে।

ভাস্কর্যের যে চিরকালীন ঐতিহ্য—তার ধারণা থেকে মুক্তি পেয়ে ভাস্কর নানা রূপের পরীক্ষা আরম্ভ করল। এদিক দিয়ে ব্রিটিশ ভাস্কর্যের এই প্রদর্শনী বর্তমানকালের শিল্পস্বরূপকে ধরবার চেষ্টা করেছে। এখানকার ভাস্কর্যগুলিতে ঐতিহ্যের বন্ধন ভাঙবার, চিরন্তন রূপ থেকে বেরিয়ে আসবার একটা উদ্দামতা রয়েছে। এখনও, অন্তত ভাস্কর্যশিল্পে, নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় নি; ঠিক এই পরিবর্তনের মোহানায় শিল্পের এই ক্ষেত্রে কিছুটা অরাজকতাও চোখে পড়ে। আধুনিক ভাস্কর্যের বিচারের সময়, মনে হয়, এখনও আসে নি—তার কারণ আগেই বলেছি, কোনো নতুন মূল্যবোধ তৈরি হয় নি। তবে এই প্রদর্শনীতে যথেষ্ট অভিনবত্ব চোখে পড়ল, যার মধ্যে রয়েছে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটা বিশুদ্ধ উত্তেজনা। প্রতিটি কাজের মধ্যেই মূল্যবোধের পরিণত প্রকাশের বদলে নতুন উপকরণ ব্যবহারের উদ্দীপনা কিংবা প্রকাশের নতুন, অস্থির মেজাজ দেখা যায়। এই উত্তেজনায় শিল্পী, শিল্পের যা প্রথমতম শর্ত—দর্শকের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপন, শিল্পের এই প্রয়োজনীয় ব্যাপারটি ভুলে যান। অথচ এটাই শিল্পের বুনিয়াদ, শিল্পের ভিত্তি। এই ভাস্কর্য প্রদর্শনীর শিল্পকর্মের মধ্যে যে-সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়েছে—সেগুলির বেশির ভাগই শিল্পীর সম্পূর্ণ একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা, এর মধ্যে সর্বজনীনতার আবেদন নেই।

ব্রিটিশ ভাস্কর্য প্রদর্শনীর কাজগুলির মধ্যে বারবারা হেপওয়ার্থের কাজ সবচেয়ে ভাল লাগলো; মনে হয়, তাঁর যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্পকর্মগুলি এসেছে। নানারকম ঝিনুক, নুড়ি-পাথর প্রভৃতি প্রাকৃতিক বহু আকৃতি ও surface texture-এর উপর ভিত্তি করে তিনি রমণীয় ভাস্কর্যের সৃষ্টি করেছেন। হেনরী মূরের কাজ যথেষ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক নয়; আরও ভাল কাজের আশা করেছিলাম। যুদ্ধপূর্ব যুগের ব্রিটেনের সমাজের প্রতীক ছিল হেনরী মূরের শিল্প, অত্যন্ত যান্ত্রিক আর আত্মকেন্দ্রিক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু মানুষের রূপ (form) হলেও মানুষের আত্মার প্রকাশ তাঁর শিল্পে দেখা যায় নি। মানুষের আকৃতিকে একটা যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে তাকে ভেঙেচুড়ে যে রূপ দিয়েছেন সে হয়তো ইউরোপের তৎকালীন যান্ত্রিক সমাজে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনার রূপ। অপূর্ব দক্ষতা ও বলদৃপ্ততার পরিচায়ক তাঁর এই সব কাজ। যুদ্ধকালীন সময়ে শিল্পী মানুষের অসংস্কৃত আবেগের, মানবীয় উপলব্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন; যুদ্ধপরবর্তী সময়ে তাই তাঁর শিল্পে প্রকৃত পরিবর্তন ঘটল—একক, নিঃসঙ্গ, অমানবিক, নৈর্ব্যক্তিক ভাস্কর্যের

বদলে হেনরী মুর তৈরি করলেন আবেগবিদ্ধ মানবীয় মূর্তি। তবে এই প্রদর্শনীতে দেখা গেল আবার তিনি হারিয়ে ফেলেছেন মানুষের আত্মিক সংযোগ। লিন চ্যাডউইক, রেগ বাটলার, কেনেথ আর্মিটাজ এঁরা নানারকম নতুন উপকরণ নিয়ে উদ্দামভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। এঁরা যেন এক নতুন পথের খোঁজে বেরিয়েছেন। মিডোজের কাজ বেশ চিত্তাকর্ষক। রবার্ট অ্যাডামস বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে বিমূর্ত শিল্পের চর্চা করেছেন—কিন্তু এগুলো কি সত্যিই ভাস্কর্য ?

এই প্রদর্শনীর অনেকগুলি কাজ দেখে মনে প্রশ্ন ওঠে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কি আধুনিক শিল্পমান অনুসারে একাত্ম হয়ে উঠছে ? আমার ব্যক্তিগত মতে শিল্পের এই দুই প্রকাশের মধ্যে একটা অনিবার্য সীমারেখা থাকা উচিত।

প্রভাস সেন

একচেটিয়া ব্যবসার ক্ষুধায়

ভারতে আয়বন্টন অনুসন্ধানের জন্য ১৯৬৩ সালে ফলিত আর্থনীতিক গবেষণার জাতীয় পরিষদ যে কাজ চালিয়েছিলেন, তাতে দেখা গেল ভারতে আয় এমন অসমভাবে বণ্টিত যা এমনকি বৃটেনে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ঘটে ওঠে নি। ভারত স্বাধীন হবার পনেরো বছর পরে (১৯৬২-১৯৬৩) দেখা গেল সবচেয়ে উঁচু পরিবার, যা সব পরিবার-পরিসংখ্যানের মাত্র এক-শতাংশ, সমস্ত জাতীয় আয়ের দশ শতাংশের অধিকারী। নিচু পঞ্চাশ শতাংশ পরিবারের আয় বাইশ শতাংশের বেশি নয়। সবচেয়ে নিচু পনেরো শতাংশ পরিবার জাতীয় আয়ের চার শতাংশ মাত্র পেয়ে থাকে, অন্যদিকে লক্ষণীয় সবচেয়ে উঁচু আয়ের পরিবার, যা সব পরিবার-পরিসংখ্যানের মাত্র ২৫ শতাংশ, জাতীয় আয়ের আঠারো শতাংশের অধিকারী।

জাতীয় আয় কাদের হাতে কিভাবে বণ্টিত হচ্ছে, ১৯৬৩ সালের ঐ অনুসন্ধান কমিটি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছিলেন। শহরাঞ্চলে আয়ের কেন্দ্রাভিমুখীনতা গ্রামের চেয়ে ঢের বেশি দেখা গেছে। ১৯৬০ সালে শহরাঞ্চলের মাথাপিছু আয় ছিল ৪·৫৫ টাকা। আয় এতদ্ঞ্চলে ৭·৫ শতাংশ হারে প্রতি বছরে বেড়ে ১৯৬২ সালে মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছিল ৪·৮৯ টাকা। শহরাঞ্চলের মোট আয় ছিল ৪,১৫৮ কোটি টাকা। গ্রামাঞ্চলের ছত্রিশ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ জনের মাথাপিছু আয় ছিল তখন মাত্র ২·৪৭ টাকা, মোট গ্রামাঞ্চলের আয় ছিল ৯,০২৩ কোটি টাকা। সুতরাং গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলি সমস্ত আয়ের শতকরা আটষট্টি ভাগের অধিকারী ছিল। বাকি বত্রিশ শতাংশ শহরের পরিবারগুলি পেত। গ্রামাঞ্চলের আয় বণ্টনের বৈষম্য লক্ষ করার মতো, সবচেয়ে নিচু আয়ের পরিবার, অর্থাৎ মোট গ্রাম্য পরিবারের পাঁচ শতাংশ ঐ আয়ের এক শতাংশেরও কম পেয়েছে। লক্ষণীয় যে, গ্রামাঞ্চলের উঁচু আয়ের পরিবারগুলি, অর্থাৎ সকল গ্রাম্য পরিবারের উচ্চকোটি পাঁচ শতাংশ শতকরা বাইশ ভাগ গ্রাম্য আয়ের অধিকারী ছিল।

উপরের তথ্য অনুযায়ী একথা আমাদের নিকটে স্পষ্ট ছিল যে ভারতে আয়ের কেন্দ্রীভবন এমনভাবে ঘটে চলেছে, যার দ্রুত নিয়াকরণ ব্যতীত

ভারতের জনকল্যাণ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অসম্ভব হয়ে উঠছে। কিন্তু নগরাঞ্চলে তথা গ্রামাঞ্চলে, অর্থাৎ দেশের সমগ্র আর্থনীতিক জীবনে একচেটিয়া কেন্দ্রীভবন ব্যতীত এই ধরনের আয়বৈষম্য প্রকট হতে পারে না। ভারতে একচেটিয়া ব্যবসা কি নিদারুণ ভয়াবহ কেন্দ্রীভবনের রূপ নিয়েছে, একচেটিয়া ব্যবসা অনুসন্ধান কমিশনের সাম্প্রতিক রিপোর্টে তা পরিষ্কার বোঝা গেল। একথা ঠিক এই কমিশনের রিপোর্টে সংবাদপত্রজগতে ও ব্যাঙ্কিঙের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ একচেটিয়া কেন্দ্রীভবন ঘটেছে বোঝা যাবে না। এই কমিশন ১৯৬৪ সালের মে মাসে কাজ শুরু করে ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিনের মধ্যে দ্রুত অনুসন্ধানকর্ম ভালোভাবেই শেষ করেছেন। কমিশন উৎপাদন ক্ষেত্রে একচেটিয়া অবস্থা এবং আর্থনীতিক কেন্দ্রীভবনের মধ্যে তফাত করেছেন। কমিশনের মতে কোনো বিশেষ দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা মূলধনের মালিকানার ফলে কিংবা একটিমাত্র সংগঠনের জন্যে অথবা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলি একটি পরিবার বা কতিপয় পরিবার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের তাৎপর্যে—উল্লিখিত অবস্থাগুলিকে উৎপাদনগত একচেটিয়া ব্যবস্থা ধরা হবে। আর্থনীতিক কেন্দ্রীভবন বলতে কমিশন মনে করেছেন এমন অবস্থা, যে-ব্যবস্থায় একাধিক দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে বহুবিধ সংস্থা একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার অথবা কিছু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানমূলক গোষ্ঠী অর্থ ও অন্যবিধ ব্যবসাস্বার্থের সূত্রে নিবিড়ভাবে জড়িত। কমিশন প্রথম ও দ্বিতীয় কেন্দ্রীভবনকে যথাক্রমে 'দ্রব্য-অনুসারী কেন্দ্রীভবন' ও 'দেশানুসারী কেন্দ্রীভবন' বলেছেন।

উভয় কেন্দ্রীভবন আলোচনাপ্রসঙ্গে কমিশন ভারতে বিপুল অস্বস্তিকর একচেটিয়া ব্যবস্থা লক্ষ করেছেন। কমিশন যে একশটি দ্রব্য বিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন তার পঁয়ষট্টিটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিপুল কেন্দ্রীভবন লক্ষ করেছেন এবং দ্রব্যগুলির উৎপাদনের শতকরা পঁচাত্তর ভাগই তিন এমনকি তিনের চেয়ে কম উৎপাদনকারীর হাতে ন্যস্ত রয়েছে। পাঁচ কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তির অধিকারী ২,২৫৯টি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী মাত্র তিরাশিটি গোষ্ঠী। টাটাগোষ্ঠীই ৪১৫ কোটি টাকার সম্পত্তির তিপ্পান্নটি কোম্পানির পরিচালক। বিড়লাগোষ্ঠী ২৯২ কোটি টাকার সম্পত্তির একশো একান্নটি কোম্পানির মালিক। একচেটিয়া ব্যবসাদাররা কেবল যে উৎপাদনেই এমন সর্বগ্রাসী অবস্থা সৃষ্টি করেছে তাই নয়, এমনকি দ্রব্য ও সেবা বণ্টন ও বিপণনেও

বিপুল নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করেছে। সমধর্মী দ্রব্যমূল্যে নির্ধারণ, পুনর্বিপণন মূল্য রক্ষা, বাজার বণ্টন, ক্রেতাদের মধ্যে তফাৎ করা, বয়কট, একচেটিয়া ঠিকেদারি দেওয়া এবং ব্যবসায় ব্যবসায় গ্রন্থিকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতীয় একচেটিয়া ব্যবসা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, গুদামজাত করা ও কৃত্রিম অভাবসৃষ্টি রাখা ঐ ব্যবসায়ীদের নিত্যধর্ম। কমিশন যদিও বলেছেন "একচেটিয়া ও নিয়ন্ত্রণকারী কার্যকলাপসৃষ্টির বিপদ আর কল্পিত নয় এবং বর্তমানে অথবা সম্ভাব্যরূপে বিপুল পরিমাণে তার অস্তিত্ব রয়েছে।" একথা বলা সত্ত্বেও কমিশনের মন্তব্যাদি একচেটিয়া ব্যবসার বিপদ যে পরিপূর্ণ ধারণাসঞ্জাত তা মনে হয় না। বরং তাঁদের মতে ভারতে এই কেন্দ্রীভবনকে আপাত অবস্থায় আঘাত করা কাজের কথা নয়, বরং 'উৎকৃষ্ট উৎপাদন (গুণে ও পরিমাণে) কিংবা সুচারু বণ্টনে'র ক্ষেত্রে যদি তা বিপদ হয়ে ওঠে তবেই একচেটিয়া ব্যবসায় আঘাত হানা যুক্তিযুক্ত। অথচ তাঁরাই এ-বিপদকে কল্পিত বিপদ না-বলে, যথার্থ বিপদ বলে অনুসন্ধান করে মত দিলেন। এমন উক্তির বৈপরীত্য নজর এড়িয়ে যাবার নয়। এমনকি কমিশনের মতে "আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে", এবং এমন আগ্রহও প্রকাশ করেছেন যে 'আগামী চরম বছরগুলির শিল্পোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের তাৎপর্যে' ভারতের একচেটিয়া ব্যবসার প্রতি 'আস্থা রাখা যায়'। একচেটিয়া ব্যবসার উদ্বর্তনের অন্যতম কারণ হিসাবে, বর্তমান অবস্থায় কিছু 'সফল উদ্যোক্তার উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে' প্রতিভা নিয়োগকে নির্দেশ করে, কমিশন এই একচেটিয়া ব্যবসাকে 'দেশের আর্থনীতিক স্বার্থের জন্য প্রয়োজনীয় দোষ' বলে মনে করার পরামর্শ দিয়েছেন। কমিশন মনে করেন, মনোপলির বিভিন্ন উৎপাদনের ক্ষেত্রে হাত-বাড়ানো রোধ করা আদৌ ঠিক হবে না।

আর্থনীতিক কেন্দ্রীভবন সম্পর্কীয় মূল রিপোর্ট বিষয়ে কমিশনের সকল সদস্যই একমত ছিলেন না। শ্রীযুক্ত আর. সি. দত্ত ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। শ্রীযুক্ত দত্ত ভারতে ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থাকে 'কেন্দ্রীভবন গড়ে তোলার একটি ব্যবস্থারূপে' দেখেছেন, সুতরাং 'কেন্দ্রীভবনের একটি যন্ত্ররূপে' তা মনে করেছেন, অথচ মূল রিপোর্টে বলা হয়েছে: 'এ-ব্যবস্থা যদি রহিতও হয়, তবে অন্য কোনো ব্যবস্থা এর রূপ নেবে।' শ্রীযুক্ত দত্ত তাই কমিশনকে 'হতাশার উপদেষ্টামণ্ডলী' আখ্যা দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত দত্ত সঠিকভাবেই মনে করেছেন 'অযথা কেন্দ্রীভবনসঞ্জাত আর্থনীতিক বৈপরীত্য দীর্ঘসময়ে অর্থনীতির

অগ্রগমন ব্যাহত করে এবং সংকুচিত করে, কেননা এরূপ অগ্রগমন যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে স্বনির্ভর নয়।' সুতরাং তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবস্থা বিস্তারের অবিলম্বে সংকোচ দাবি করেছেন। কমিশন ও শ্রীদত্ত একচেটিয়া ব্যবস্থা ও অন্যায় ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মেনে নিয়েছেন। শ্রীদত্ত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংগঠনগুলিকে এই প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তাধীন করার বিরোধী, তাঁর মতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাই একচেটিয়া মালিকানার মূল বিরোধীশক্তি।

কমিশন রাজনীতি, সরকারীকর্ম ও সমাজের মধ্যে একচেটিয়া অবস্থার ভয়ঙ্কর অসুস্থ প্রভাব লক্ষ করেছেন। রাজনৈতিক দলগুলিকে অর্থসহায়তা দিয়ে, সরকারী কর্মচারিদের ঘুষ দিয়ে—এমন অবস্থা সৃষ্টি করায় একচেটিয়া ব্যবসা-পারদর্শী যে তার প্রভাব আর সম্ভাব্য নয়, এখনই সমাজদেহে লক্ষ করা যাচ্ছে। কর ফাঁকি দেওয়া টাকায় এবং অন্যবিধ প্রদর্শনমূলক ব্যয়ের ফলে সামাজিক, নৈতিক ও শিক্ষাগত মূল্যবোধের ক্রমাবনয়ন এরাই ঘটাচ্ছে, বিশেষভাবে তরুণ মনের উপর অসুস্থপ্রভাব রাখছে। কমিশন বলেছেন: 'বৃহৎ ব্যবসার প্রভাব থেকে রাজনীতিকগণ যদি নিজেদের একবার মুক্ত করে নিতে পারেন, তবেই তাদের পক্ষে সরকারী কর্মচারিদের অসদাচরণের বিপক্ষে দৃষ্টি নেওয়া সহজসাধ্য হবে।'

কমিশনের আলোচনা থেকে ব্যাঙ্কব্যবসা বাদ পড়েছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক-পুঁজির সঙ্গে একচেটিয়া শিল্পপতিদের যোগসাজসের কথা তো আজ আর কারো অজানা নেই। ব্যাঙ্কবিষয়ক কিছু আলোচনা হলে বোঝা যেত শিল্পক্ষেত্রে তো বটেই কৃষির উৎপাদন, বণ্টন ও বিপণনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যাঙ্কমূলধনের ভূমিকা কতখানি। সংবাদপত্রের মালিকানামূলক একচেটিয়া অবস্থাও আলোচনা হয় নি। স্বাধীন ভারতবাসীর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অপহরণ করে একচেটিয়া সংবাদপত্র-মালিকেরা যে গণতন্ত্রের অপহ্নব সৃষ্টি করে চলেছে আজ সে-কথা আর কার অজানা রয়েছে?

শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ও বিপণন, ব্যাঙ্কিং, পুঁজির সরবরাহ তো বটেই, রাজনীতি, সরকারী কাজকর্ম, নীতিবোধ, শিল্প, ব্যক্তিস্বাধীনতা—সকল দিকেই একচেটিয়া ব্যবসার আজ সর্বগ্রাসী হাত। আংশিক হলেও একচেটিয়া ব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিশন ঢের আলোকপাত করেছেন।

তরুণ সান্যাল

শিক্ষার লক্ষ্য

ইদানীং বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে জোনস্‌দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ঝোঁক এক নতুন চেহারা নিয়েছে আর সে ঝোঁক নিজেদের যারা কমিউনিস্ট, এমনকি অতি-বিপ্লবী "বামপন্থী" কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দেন তাঁদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। এই ঝোঁক হল ছেলেমেয়েদের 'পাবলিক স্কুল' জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়ান। পাবলিক স্কুলের জন্মভূমি, সকলেই জানে, বিলেত এবং তা সেখানকার সামাজিক অসাম্যকে স্থায়ী করবার একটি যন্ত্রবিশেষ। অধ্যাপক টনি লিখেছিলেন: "the public school is for the well-to-do", পাবলিক স্কুল বড়লোকদের জন্যে।

টনি মস্তবড় কোনো "বিপ্লবী" ছিলেন না, তিনি ছিলেন সংস্কারপন্থী ব্রিটিশ লেবর পার্টির সদস্য; তবু সারাজীবন তিনি এই পাবলিক স্কুলের অসাম্য তৈরির কারখানার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। আর আমরা যারা কিনা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারা কি করছি? স্বাধীনতা-প্রাপ্তির উনিশ বছর পর আমরা একের পর এক পাবলিক স্কুল গড়ছি। আমরা মুখে বলছি সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত মাতৃভাষা কিন্তু নিজেদের ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে পড়াতে না পারলে অস্বস্তি বোধ করি।

অসাম্যকে স্থায়ী করাই হয়তো সমাজের উপরতলার দশজনের স্বার্থ এবং তারই পরবশ হয়ে তাঁরা এইসব প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁরা চান সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কোনো ছাপ যেন তাদের বংশধরদের উপর না পড়ে। কিন্তু আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের কেন এইসব ইস্কুলে পাঠাই? তা কি এইজন্যে যে টাটা-বিড়লার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গা-ঘষাঘষি করে আমাদের ছেলেমেয়েরাও জাতে উঠবে—যার অভিজ্ঞান কিনা চোঙা প্যাণ্ট, টাই-পরা আর ফিরিঙ্গি উচ্চারণে ইংরেজি বলতে শেখা।

এক বন্ধু বললেন: এইসব ইস্কুলের শরণ না নিয়ে গতি কি বলুন, সাধারণ ইস্কুলে লেখাপড়া ভালো হয় না আর ইংরেজি বলতে-কইতে না শিখলে চাকরি-বাকরি হবে কোথাও?

পাবলিক স্কুলে লেখাপড়া সাধারণত ভালো হয়, এ কথা অবশ্য না মেনে উপায় নেই। কিন্তু তার চেয়েও বেশি জোর ওসব ইস্কুলে সহবৎ শেখানোর উপর। কারণ মনিব-শ্রেণীর যা প্রয়োজন তা একদল কেতাদুরস্ত ম্যানেজার।

কিন্তু ম্যানেজার-শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার লাভ—এইটেই কি শিক্ষার চরম লক্ষ্য ? বন্ধুবরের কথায় অন্তত তাই মনে হয় না কি ? তবে আর সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ, কমিউনিজম—এসব কথা তোলা কেন ?

কিন্তু এসব তো পরের কথা। এইসব স্কুলে বড়লোকের ছেলেদের বড়মানুষির সংস্পর্শে এসে ছা-পোষা মধ্যবিত্ত ছেলের মানসিক ভারসাম্য যে নষ্ট হয় তা কি আমরা ভেবে দেখি ? বড়লোকের ছেলে বড় গাড়িতে চেপে ইস্কুলে আসে, ভালো ভালো জামা-কাপড় পরে, ভালো ভালো খাবার খায়। আমি-আপনি নিজেরা না খেয়ে যদি বা ছেলে কি মেয়েকে এসব স্কুলে ভর্তি করতেও পারি—তার এইসব চাহিদা কি মেটাতে পারব ? যদি তা না পারি, ছেলেবেলা থেকেই তার এই অপ্রাপ্তিবোধ কি তার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল ?

আজকালকার বাপ-মায়েরা সন্তানদের শিক্ষাসম্পর্কে আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন—এটা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ। কিন্তু এক কাড়ি টাকা খরচই কী শিক্ষার উৎকর্ষের একমাত্র মাপকাঠি ? শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে—এ-অভিযোগ হয়তো মিথ্যে নয়। কিন্তু তার প্রতিকার কি সাধারণ ইস্কুল ছেড়ে পাবলিক স্কুলের শরণ নেওয়া না কম খরচে ভালো শিক্ষার জন্য আন্দোলন করা ?

প্রদ্যোৎ গুহ

পা ঠ ক গো ষ্ঠী

সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে

এক

একটি অসংলগ্ন কাহিনীকে দুর্বল চিত্রনাট্যে বেঁধেও যে ক্ষণে ক্ষণে মন-ঝলসানো image তৈরি করা যায় তার পরিচয় ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা'। পুরো ছবিটার কোনো সামগ্রিক আবেদন মনকে নাড়া দেয় না। কিন্তু মনের মধ্যে অনেকদিন ধরে একোণ ওকোণ উঁকি মারতে থাকে মাঝে মাঝেই, তার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া কঠিন। যেমন ছবি দেখার প্রায় ছমাস পরে আমার মনে হল সীতা যেন ছিল নির্মল আকাশে সঞ্চরমান এক নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ, তার শেষ হল লৌহপিঞ্জরে, গ্লানির নিরন্ধ্র অন্ধকূপে। এ-ছবিটা যেই মনের মধ্যে জাগল, অমনি আশপাশের দাঁত বার-করা ইঁটগুলো হারিয়ে গেল। তখন নাটকীয় coincidenceগুলো (হরপ্রসাদের আবির্ভাব, দর্শকের ভ্রম হয়, ও দৃশ্যটা ঈশ্বরের আত্মনিধনের সঙ্কল্পতপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা কিনা), বা বাগ্দী-বৌয়ের মৃত্যুতে সরব ঘোষণা 'একটি বাগ্দী-বৌ মরছে', বা অভিরামের অবলীলাক্রমে মাকে চিনতে পারা, বা জহর রায়ের অনাবশ্যক ভাঁড়ামো, কিছুই মনকে পীড়িত করতে পারে না।

কয়েকটা mood, তারা খুব সংলগ্ন নয়, কিন্তু পৃথকভাবে জোরালো। জানলার বাইরে আবছা চাঁদের আলোয়, ঘরের মধ্যে প্রায় অন্ধকারে 'সীতা ঘুমায় রে, সীতা ঘুমায় রে', ঘুমপাড়ানি সুরের তালে তালে ঈশ্বরের দোলা এক অবর্ণনীয় অনুভূতির সৃষ্টি করে। আলো, ছায়া, শব্দ, দৃশ্য—(প্রাকৃতিক দৃশ্যকে অতি সাফল্যের সঙ্গে mood-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়েছেন ঋত্বিক ঘটক) সিনেমা-ব্যাকরণের প্রত্যেকটি তদ্ধিত প্রত্যয়ের সম্পর্কে ঋত্বিকবাবুর আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় আছে সুবর্ণরেখায়। তবু একটা বিরাট 'তবু' থেকে যায়। সুবর্ণরেখার প্রচণ্ড সম্ভাবনা ছবি এগোবার সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হয়ে আসে।

ক্যামেরা ও এডিটিং-এর দিক থেকে অসামান্য 'নবজীবন কলোনি'র অংশটার সাথে আসল গল্পের অঙ্গাঙ্গী যোগ নেই। ঈশ্বর-সীতা-অভিরামের জীবনগাথা দেশবিভাগের backdrop ছাড়াও যখন খুশি ঘটতে পারত।

গোড়ার দিকে যে-ছবি ছবির ভাষায় অনেক কথা বলে গেছে, তার গতি হঠাৎ মন্থর ও গতানুগতিক হয়ে যায় বিবাহবাসর থেকে সীতার অভিরামের সাথে পলায়নের পর থেকে। Bar-এর দৃশ্যে গল্প আবার উজান বেয়ে চলে। কিন্তু সেটা যেন এক স্বতন্ত্র দৃশ্যোদ্‌ঘাটন এবং সেই হিসেবেই উপভোগ্য। সব মিলিয়ে ছবির শেষে একটিমাত্র বিশেষ সুর বা বেসুর বাজে না। আসন থেকে উঠতে হয় প্রায় একটা অস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে। তবে কি কিছুই পেলাম না? শুধু ভালো অভিনয়, ভালো আবহসংগীত, ভালো প্রাকৃতিক দৃশ্য? কী যে পেলাম সেটা বুঝলাম অনেক পরে, যখন মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল টুকরো টুকরো, বিচ্ছিন্ন কিন্তু অনবদ্য একের পর এক ছবি, আর একের পর এক অনুভূতি।

সুবর্ণরেখা সম্পর্কে ঋত্বিক ঘটক নানা পত্রপত্রিকায় বলেছেন এ ছবি নৈরাশ্যবাদের। আশার কথা তিনি বলতে চান্ নি, বরং আশার অপমৃত্যুই ঘোষণা করেছেন। ‘জয় হোক নবজাতকের’—তার সামনে কি আছে কে জানে, হয়ত পুরনো ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। কারণ ভগ্নমন ঈশ্বরকে নিয়ে সীতার ছেলে যে নতুন বাড়ির খোঁজে এগিয়ে চলে, সুবর্ণরেখার দুইপারে তার এতটুকু নিশানা নেই।

ঋত্বিক ঘটক এই নিরাশার ছবি আঁকতে গিয়ে কিন্তু নিজের উদ্দেশ্যকে পরাস্ত করেছেন। হতোদ্যম, অর্ধোন্মাদ ঈশ্বরের পথপ্রদর্শক ক্ষুদ্র, অসহায়, মানবসন্তান, তবু ঈশ্বরকে চলতে হয়, এগোতে হয়, অজানার উদ্দেশে, নতুনের সন্ধানে। হয়তো হার নিশ্চিত, কিন্তু সুবর্ণরেখার জল যেমন নিশ্চল হয় না, জীবনপ্রবাহের টানে ঈশ্বরকেও হতে হয় গতিশীল। সামনে কি আছে সেটা নিশ্চিত জেনে মানুষ আশার মোহে ভোলে না, ভোলে সে কিছু জানে না বলেই।

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই

সাম্প্রতিককালের দেশী-বিদেশী চলচ্চিত্র দেখে মনে সংশয় জাগে চলচ্চিত্রের সমাজসচেতন হওয়ার কোনো দায় আদৌ আছে কিনা। আর যদি না-ই থাকে তবে form-এর এই উৎকর্ষ আমাদের কোন্ পরমলাভের দ্বারে পৌঁছে দেবে?

আশার কথা বাংলা চলচ্চিত্র-সমাজের সমস্যাগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন

হয়ে বসে নেই। মৃণাল সেন 'প্রতিনিধি'তে একটি প্রশ্নের সার্থক উপস্থাপনা করেছেন—যদিও পাঞ্জা লড়তে পারেন নি। 'আকাশ কুসুমে' তিনি স্বচ্ছ ও দ্বিধাহীন। যুদ্ধোত্তর মধ্যবিত্তের নিরালম্ব অবস্থান আর big business-এর দেওয়ালে দড়াম করে ধাক্কা খেয়ে খুঁড়িয়ে যাওয়ায় আমরা জীবনের প্রতিচ্ছবিকেই দেখি। 'অযান্ত্রিক' 'মেঘেঢাকা তারা' 'কোমল গান্ধারে' যে-কথাটি উঁকি দিচ্ছিল 'সুবর্ণরেখা'য় তা ব্যক্ত হল—ঋত্বিক ঘটক সমাজ-সচেতন শিল্পী, বর্তমান বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা তিনি নির্ভুলভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা-দেশবিভাগে নিরালম্ব বাঙালির ঠিকুজী তৈরি করেছেন শ্রীঘটক সুবর্ণরেখায়। ছবির টাইটেল সেই মতই ঘোষণা করে। কুগ্রহ-শান্তির বিধানদান ঠিকুজীর এক্তিয়ার নয়। একটা সফল সংগ্রাম বা লড়াই করে মৃত্যু দেখতে পেলে হয়ত আত্মতৃপ্তি লাভ করা যেত—ঠিকুজী হতো না। সুতরাং পরিচালক নৈরাশ্যবাদী, হতাশ বা বিষাদগ্রস্ত কিনা সে প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক।

পরিচালক একাধিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যে-উক্তিটি উদ্ধৃত করেন "শিল্পকে শিল্প হতে হলে সর্বাগ্রে সত্যনিষ্ঠ হতে হয়, তারপরে সৌন্দর্যনিষ্ঠ" সেই প্রশ্নই করা যাক—সুবর্ণরেখা কি সত্যনিষ্ঠ? এ ছবি গ্রহণে যা-কিছু দ্বিধা, যা-কিছু কুণ্ঠা তা সেই হেতুই। প্রতিবাদকারী আর পলাতক—হরপ্রসাদ আর ঈশ্বর সবাই গড্ডালিকা প্রবাহের যাঁতাকলে গুঁড়িয়ে গেছে। কায়েমী স্বার্থের কাছে আর সবাই হেরে গেছি। উচ্ছেদ, দণ্ডকারণ্য, দু আনা অংশের হাতছানি, জাতিভেদের চোখরাঙানি, কায়িক মানসিক মৃত্যু, কিছুই বরবাদ করা যায় নি।

'রাতে কোনো যুবক ঘুমাবেন না' 'অন্ধকারই শেষ হতে পারে না আলোর সন্ধানে যাচ্ছি?' ইত্যাদি ধ্বনি প্রলাপে পর্যবসিত হয়েছে। পলাতকের অন্নে সন্ততি প্রতিপালন না করার প্রতিজ্ঞা 'বীভৎস মজা' উপভোগের জন্য যাত্রায় পরিণত হয়েছে। যে একটু গুছিয়ে নিয়ে তাই আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছিল, মূলেই আঘাত হেনে সে বিধ্বস্ত হল। আমরা যে কী আমরা তাই-ই জানি না অথবা জানতে সাহস পাই না। তাই বীভৎস মজার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে বায়ুতে ভাসছি। যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা-দেশ-বিভাগ যে বাঙালির মূল উপড়ে দিয়েছে—মিথ্যাচার, স্বার্থান্বেষণ, ন্যায়-নীতি-

হীনতা, সংকীর্ণতা যে মজ্জায় ঘুণ ধরিয়েছে চোখ বুজে থেকে সে চিত্র অস্বীকার করার প্রচেষ্টায় লাভ নেই, সেই রূঢ় সত্যই চিত্রায়িত সুবর্ণরেখায়।

সৌন্দর্যনিষ্ঠার বিচারে শ্রীঘটক পত্রান্তরে বলেছেন "প্রাথমিক স্তরে একটা টানা গল্প হয়তো থাকে, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ দিয়ে বিচিত্র জীবনের নক্সা আঁকা থাকে। একটু গভীর স্তরে···রাজনৈতিক, সামাজিক দ্যোতনাগুলি খেলা করছে। আরও গভীরে···দর্শনগত ও শিল্পীর আত্মচেতনা অনুসারে দিগ্‌নির্দেশগত সংকেতগুলি। আরও গভীরে যে মুহূর্তগত অনুভূতির আস্বাদন ···তাকে কথা দিয়ে ধরা যায় না···যার যে স্তরে বিচরণ তিনি সেই স্তরেই আনন্দ পাবেন। কিন্তু সত্যিকারের মহৎ শিল্প এর সবকটি স্তরকেই ছুঁয়ে যায়···।"

চলচ্চিত্রে একটা পূর্ণ কাহিনী অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু জীবনের নক্সা আঁকায় ছোটখাটো অসংগতি বা আরোপিত ঘটনার অবতারণা সুবর্ণরেখার প্রাথমিক স্তরের চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে বলা যায় না। উদ্বাস্তু কলোনি বা তার উচ্ছেদের চিত্র তেমন বাস্তবনিষ্ঠ হয় নি। ড্রাইভারির পয়লা রাত্রেই অভির মৃত্যু খুব যুক্তিসংগতভাবে আসে নি। অত্যন্ত জোর করেই অভির মার মৃত্যু এবং তার জাতিপ্রকাশের দৃশ্য আরোপিত হয়েছে। ফলে কাহিনীর রসেই যাঁর বিচরণ তিনি তৃপ্ত হন নি।

কিন্তু জীবনের নক্সাকে শুধুই কতকগুলি ইঙ্গিত হিসাবে গ্রহণ করতে পারলে সুবর্ণরেখায় সেই চূড়ান্ত অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করা যায়। জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে উদ্বাস্তু কলোনির স্কুল প্রতিষ্ঠা, জমিদারের অত্যাচার, রাত্রির প্রহরা, গান্ধীজীর মৃত্যু-সংবাদ, সংবাদপত্রের চরিত্রবিশ্লেষক চিত্র-কল্পগুলির উপস্থাপনায় অচিরেই রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্যোতনাগুলির ভিৎ তৈরি হয়ে যায়। 'রাতে কোনো যুবক ঘুমাবেন না' বা ঈশ্বরের চাকরি গ্রহণে হরপ্রসাদের একটি 'ছিঃ' গোড়ার দিকের প্রতিবাদ আকাঙ্খাকে মূর্ত করে তোলে। ভাঙা এরোপ্লেন, ক্লাবঘর, বিমানঘাঁটি অনিবার্যভাবে যুদ্ধোত্তর বাঙলার পটভূমি তৈরি করে দেয়। হরবিলাসে একটি নিখুঁত পুঁজিবাদীর চরিত্র অঙ্কিত—একটি সৎচরিত্র, ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভরযোগ্য কর্মচারী লাভের আশায়। বন্ধুপ্রীতি—মুনাফার পাহাড়ে স্ফীতি—সুরক্ষিত করতে—দু আনা অংশ দান, জাতিভেদের প্রশ্নে গোঁড়া, অবস্থান্তরে বিরূপতা পুঁজিবাদের নিখুঁত চরিত্র। ছোট্ট এই চরিত্রটির মাধ্যমে মধ্যবিত্তের জীবনকে

নিরালম্বীকরণে কায়েমী স্বার্থের অমোঘ ভূমিকা কী গভীর রেখায় অঙ্কিত! যুদ্ধোত্তর বাঙলার অসততা, মূল্যবোধহীনতা, উত্তাল-উদ্দাম স্রোতের মধ্যে আকণ্ঠ ভোগের চিত্রকল্প মূর্ত হয়ে উঠেছে, ঘোড়দৌড়, নিওন সাইন, ক্যাবারে, নাচ গান মদ্যপান, রাতের কলকাতার আলো আর দালালের fresh girl, sir ···'এর টুকরো টুকরো শট্-এ। তারপর সেই চূড়ান্ত টানা ইলাসটিক্ ছিঁড়ে সপাং করে মুখে এসে পড়ে ঈশ্বর-সীতার সাক্ষাৎ মুহূর্তে। এর চেয়ে কার্যকর দিক নির্দেশ আর কী হতে পারত!

কৃষি বাঙলায় জাত সীতা রামরাজত্বে আপস করতে না পেরে পাতালে প্রবেশ করে। সীতার মধ্যে পৌরাণিক মৌলপ্রতীকের ইমেজ যে symbolized হয়েছে তা অস্পষ্ট না-রাখার জন্য বৃদ্ধ ম্যানেজার বর্ণিত সীতার কাহিনী অতি স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। ছোট্ট সীতা প্রাণের খুশিতে গান গাইতে গাইতে কালীমূর্তির সামনে এসে পড়ে। পরিচালকের অনুভূতি অনুসারে গোটা মানব সভ্যতা ত্রাসদাত্রী কালীমূর্তি বা terrible mother-এর archetypul image-এর সামনে পড়ে গেছে। সরলীকৃত করলে সহজ, সরল, সুন্দর কাঁচা ভয়ংকরের সামনে পড়ে গেছে।

এ ছবির এক বিশেষ সম্পদ এর সংগীত ও ধ্বনি সৃষ্টি। সত্যজিৎ রায় ব্যতীত আর কারও ছবিতে এমন উঁচুদরের সংগীতের ব্যবহার পাওয়া যায় না। শ্রীরায়, চিত্র-পরিচালক হিসাবে কোন্ ধ্বনিটি চান এবং সংগীত-পরিচালক হিসাবে কী ভাবে তা পেতে হবে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সংগীত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে পরিচালনা করেন বলেই তাঁর সৃষ্টি অতুলনীয়। আমার ধারণায় শ্রীরায় মহৎ চিত্রপরিচালক কিন্তু মহত্তর সংগীত-পরিচালক। কিন্তু সংগীতের সম্যক জ্ঞান না থাকলে এ দায়িত্ব না নেয়াই ভাল। 'অতিথি'তে শ্রীতপন সিংহ ব্যর্থ হয়েছেন। থিম মিউজিকের সঙ্গে অতিথির ভাব-গতি-ছন্দের কোনো মিল নেই। বধূদের জল-আনতে যাওয়ার অনুষঙ্গ ধ্বনি সুশ্রাব্য ছিল—পৌনঃপুনিকতাদোষে তার রসহানি হল। সুবর্ণরেখার সংগীত পরিচালনায় সংগীত সুরু থেকেই মনকে পুরোপুরি আকর্ষণ করে রাখে—আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গীত সব কথানি গানের সুর শ্রোতার সত্তায় অনুরণিত হতে থাকে। এক ট্রেন থেকে কত বিভিন্ন শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে কত বিভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্য। ক্রমে দ্রুতগতি ইঞ্জিন, ক্রমে মন্থরগতি ইঞ্জিন, বিভিন্ন পর্দায় হুইস্‌ল, ভস্ ভস্ করে ধোঁয়া ছাড়া প্রভৃতি

আতঙ্ক, বীভৎসতা, কারুণ্য কত না রসের দ্যোতকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ঘোড়-দৌড়ের আবহ সংগীতরূপে ভৈরবীতে উচ্চগ্রামে কণ্ঠপ্রয়োগ যেন ভোগবিলাস সম্বন্ধে চাবুক মেরে সচেতন করে দেয়। অনেক কাঁচের বাসনে ঠোকাঠুকি হয়ে ভেঙে পড়ার শব্দ ক্রমে মিলিয়ে দিয়ে আত্মহত্যার 'সব শেষ' অনুভূতিটি তীব্রতর করা হয়েছে। শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি, তানপুরার খাদের দুটি তারের আওয়াজ সবকিছুই চিত্রের দর্শনগত অনুভূতিকে ঘনীভূত করেছে। চিত্র-পরিচালক ও সংগীত-পরিচালকের ভিন্ন সত্তা একাত্ম হয়ে সুবর্ণরেখাকে অনির্বচনীয় করে তুলেছে।

অভি-সীতার দীর্ঘায়িত প্রেমালাপ একটু অস্বস্তিকর লাগে কিন্তু বাজারের থলিতে বাস্তবমুখীনতার সংকেতটি বেশ। বাগ্দী বৌ-এর মৃত্যুর অনুষঙ্গ শব্দ ঘটনার কারুণ্যের বদলে নিষ্ঠুরতার ভাবই জাগায়। এবং তাতে এই আরোপিত ঘটনাটিকেও গ্রহণযোগ্য করেছে।

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের এটাই মনে হয় শ্রেষ্ঠ চরিত্রচিত্রণ। দক্ষ অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্যের কণ্ঠস্বর খেলানো এবং হাতের ভঙ্গিগুলি অপূর্ব। অভি ভট্টাচার্য (ঈশ্বর) চরিত্রটিকে যথাযথ রূপায়িত করেছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়েছে একটু কৃত্রিম। অল্প অবকাশে হরবিলাস ও তার স্ত্রীর ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় হয়েছে। মুখুজ্জেতে (জহর রায়) একটি ঘৃণ্য ইতর প্রাণীর আভাস পাওয়া যায় যা পরিস্ফুট হয় নি। ভাঁড়ামি করান হল কেন বুঝলাম না।

পরিশেষে, ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে শ্রীমতী মারী সীটনের আশঙ্কা—"একমাত্র ভয়ের কথা অতিরিক্ত মননশীলতা তাঁর নিজের কিংবা তাঁর চলচ্চিত্রের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে", এবং পত্রান্তরে শ্রীঘটকের নিজের উক্তি 'আমি তো মুছে গেছি' সত্যে পরিণত হলে শ্রীঘটক জনসাধারণের কাছে অপরাধী হবেন।

মিন্টু রায়

তিন

ঋত্বিক ঘটকের এই ছবিটি নিয়ে খবরের কাগজের নিন্দা ও উৎসাহী দর্শকের সাধুবাদ যথাক্রমে একই রকমের তীব্র ও মুখর হয়ে উঠেছিল। আমার মনে হয় দুপক্ষই অপরিমিত।

ছবিটিতে স্বাধীনতা-উত্তর উদ্বাস্তু বাঙালির ব্যক্তিজীবনের ও গোষ্ঠীজীবনের বহু অপূর্ব আশা, ভয়, ভাবনা ছড়ানো আছে।

দর্শক এই ছবির সমস্যাগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারেন। এবং সমাজের ক্ষয়, কুসংস্কার, ব্যক্তিজীবনের নানা দুর্বলতার প্রতি ঋত্বিকবাবুর অ্যাটিটিউড্-এর দৃপ্ত প্রকাশ তাঁকে দর্শকের প্রিয় করে তোলে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের শুভদিনে নবজীবন কলোনির পত্তন হয়! শিক্ষক হরপ্রসাদ ও তার বন্ধু ঈশ্বর কলোনির শিশুদের শিক্ষার জন্য আকাশের নিচে একটি স্কুল স্থাপন করে। দেশভাগের কঠিন সত্যকে উদ্বাস্তুদের স্বীকার করে নিতে হয়েছে। কিন্তু শুভবুদ্ধি তখনও তাদের অটুট। অল্প পরেই সেই শুভবুদ্ধি ধাক্কা খায়—নতুন প্রতিবেশীর লোভের কাছে। তাদের আশ্রয় বিপন্ন হয়। যুবকদের রাত্রে সতর্ক থাকতে হয় নতুন আশ্রয়রক্ষার জন্য। এই আঘাতেই আবার প্রকাশ হয়ে পড়ে উদ্বাস্তুদের স্ব-বিরোধ, তাদের বিভেদ, এবং সংহতির অভাব।

তারপর হরপ্রসাদ ও ঈশ্বর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দেশভাগে আশ্রয়চ্যুত ও মাতৃহারা ছোট বোনটির নতুন বাড়ির আকাঙ্খা চরিতার্থ করাই ঈশ্বরের প্রথম কর্তব্য বলে মনে হয়। তাই সে কলকাতা থেকে দূরে ছাতিমতলায় একটি ফাউন্ড্রীতে চাকরি নিয়ে চলে যায়। তার সঙ্গে যায় বোন সীতা ও মাতৃক্রোড়চ্যুত নিম্নশ্রেণীর উদ্বাস্তু বালক অভিরাম। শিক্ষা—যা মানুষকে ভেদ-বুদ্ধি থেকে মুক্ত করে উন্নত করবে—সেই শিক্ষাদানের কর্তব্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার দরুণ ঈশ্বরকে পলাতক অভিহিত করে শিক্ষক হরপ্রসাদ নিজেকে তার আরব্ধ কাজে নিযুক্ত করে।

ঈশ্বর চাকরিতে নিজেকে সমর্পণ করে। তার ধারণা সীতার সুখী জীবন তার সমস্ত গ্লানি দূর করবে। ঈশ্বর ব্যক্তিগত শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে অভিরামের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে। মাঝে মাঝে অনশন-পীড়িত হরপ্রসাদের স্ত্রীর আত্মহত্যা, হরপ্রসাদ ও তার সমধর্মীদের করুণ পরাজয়ের কাহিনী ঈশ্বরের কাছে দূরাগত সংবাদের মতো এসে নাড়া দেয়। চাকরিতে উচ্চতম সাফল্য যখন ঈশ্বরের প্রায় করায়ত্ত তখন তাকে এই সাফল্য আর সীতা ও অভিরামের অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন, এই দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তখন দেখা যায় অত্যন্ত সাধারণ জীব হয়ে গিয়েছে ঈশ্বর। সাফল্য ও চরিতার্থতা সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত ধারণা অস্ক

:কানো প্রয়োজনকে স্বীকার করতে নারাজ। তাই সে ব্যক্তিগত সুখ আহরণের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছে। সীতা ও অভিরাম যৌবনের প্রেরণায় কয়েকটি গণ্ডী অতিক্রম করে এসেও অবশেষে প্রচলিত ব্যবস্থার বৈষম্যের হাতে নিহত হয়। রেখে যায় তাদের শিশু-সন্তান বিনুকে।

প্রচলিত ব্যবস্থার বৈষম্যে পীড়িত দর্শক সুবর্ণরেখায় তার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখে। তার বিশ্বাস ফিরে আসে যখন বৃদ্ধ ঈশ্বর ক্লান্ত পায়ে বিনুকে নিয়ে নতুন বাড়ির অন্বেষণে আবার ছাতিমতলায় ফিরে আসে। পরিচালক যখন বিশ্বাসহীন, পরাজিত হরপ্রসাদ ও রিক্ত ঈশ্বরের ক্লেদাক্ত সম্ভোগের দৃশ্যে নিজের অ্যাটিটিউড প্রবলভাবে প্রক্ষেপ করেন তখন দর্শক আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে। তাই সুবর্ণরেখাকে নগণ্য ছবি বলে উড়িয়ে দেওয়া অনুচিত। সেটাই প্রমাণিত হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত ঋত্বিকবাবুর সংবর্ধনায়। সুবর্ণরেখার যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও ঋত্বিকবাবুর এই জনসংবর্ধনা নিশ্চয়ই চলচ্চিত্রের গুণাগুণ বিচারে দর্শকের আত্মনির্ভর হওয়ার প্রমাণ।

তবে চলচ্চিত্রবিচারের প্রধান ভিত্তি হল চলচ্চিত্রবোধ। এই চলচ্চিত্রবোধ আসে অন্য শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রকরণগত তারতম্য অনুশীলনে। দৃষ্টি ও শ্রুতি বাহিত এই শিল্পমাধ্যম যা দৃশ্যবস্তু, শব্দ ও সংগীতের মধ্য দিয়ে নতুন রসানুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম, তার ব্যাকরণ অন্যান্য শিল্পমাধ্যম থেকে স্বতন্ত্র। এবং যেহেতু এই মাধ্যমের স্রষ্টা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁর সমস্ত বক্তব্য দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে বাধ্য তাই তাঁকে গল্পের উপাদান বাছাই করতে দিয়ে কঠিন বিচার করতে হয়। অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ঋত্বিক ঘটকের এই ছবির প্রধান দুর্বলতা তাঁর গ্রহণ-বর্জনের পারদর্শিতার অভাব। ছাতিমতলার দৃশ্য যে-অঞ্চলে গৃহীত হয়েছে সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক উচ্চাবচতা তাঁর চিত্রগ্রহণ-কারীকে এত মুগ্ধ করেছিল যে পরিচালক চিত্রগ্রহণকারীকে সংযত করতে পারেন নি। তাই সীতা যেখানে "অয়ি, ভোর ভয়ি" গাইছে সেখানে ক্যামেরা অতক্ষণ ধরে অনাবশ্যক দৃশ্যকোণ পরিবর্তন করতে থাকে; অথবা সীতা ও অভিরামের প্রণয়ের দৃশ্যটি দেখতে সুন্দর বলেই যেন অযথা দীর্ঘায়িত।

এমন কয়েকটি দৃশ্য আছে যার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

যেমন, যে-দৃশ্যে ঈশ্বর সীতাকে বলছে: "তুই তো আমার মা।" এই দৃশ্যে ঈশ্বরের উৎকেন্দ্রিকতা ও আবেগপ্রবণতা ছাড়া দর্শকের মনে আর কিছুই প্রতিবাহিত হয় না। তেমনি পীড়িত করে ঋত্বিকবাবুর চিত্রনাট্যের দুর্বলতা। অভিরাম সীতার প্রতি তার প্রণয়ের পূর্বাভাস প্রকাশ করতে গিয়ে সীতার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর সীতার চুল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে: "তুই কত বড় হয়ে গিয়েছিস।" পূর্বরাগ প্রকাশের নিশ্চয়ই এর চাইতে ভালো পদ্ধতি আছে। সীতার বহুরূপী দেখে ভয় পাওয়ার দৃশ্যটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে নির্মিত। হঠাৎ ভয় পাওয়ার অনুভূতি দর্শকের শরীরেও সঞ্চারিত হয়। কিন্তু এর তাৎপর্য কি? আমি অবশ্য পরিচালক-কথিত একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু আমার সেটা মোটেই লাগসই মনে হয় নি। তেমনি সংগতিহীন ঈশ্বরের পূর্ববর্তী আধ-পাগল ম্যানেজার। এ যেন দুঃখের বোঝা অসহনীয় ভারি করে তোলার জন্যই ইচ্ছে করে তার উপর শাকের আঁটি চাপানো হয়েছে। এইরকম অসংগতি ছড়িয়ে আছে ঈশ্বরের ছাতিমতলা-বাসের সমস্ত অধ্যায় জুড়ে। তার উপর আছে কলকাতায় ফরমায়েসীভাবে ঈশ্বরের অবাঙালি বন্ধুর আবির্ভাব ও ছাতিমতলায় দণ্ডকারণ্যগামী অভিরামের মা বাগদী-বৌয়ের মৃত্যু।

কিন্তু কলকাতায় নবজীবন কলোনি প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ঈশ্বরের কলকাতা-ত্যাগের অংশটুকুর বেশির ভাগই চলচ্চিত্রসম্মতভাবে অর্থবাহী হয়ে তৈরি হয়ে উঠেছে। আবার সেই পারদর্শিতার প্রমাণ মেলে সীতা ও অভিরামের কলকাতায় বাসের পর্যায় থেকে। সীতার অভিরামের মৃত্যুসংবাদ শোনা, হরপ্রসাদ ও ঈশ্বরের সম্ভোগ-অন্বেষণ ও সীতার প্রতিবেশী একটি মহিলার সীতার ঘরে প্রথম লোক আনার দৃশ্যগুলি নিপুণভাবে তৈরি। সীতার মৃত্যুর পর ঈশ্বরের বিনুকে নিয়ে কলকাতা-ত্যাগের অংশটুকু পরিচালক সমাজ, তার মুখপত্র সংবাদপত্র ও সংবাদপত্রজীবীদের প্রতি তাঁর তির্যক উক্তিকে বক্তৃতার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। ছবির শেষটুকুতে নতুনের উৎসাহকে বৃদ্ধের ক্লান্তপায়ে অনুসরণ sentimental overtone-এ পর্যবসিত হয়েছে। পরিচালক শেষ চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে সমাপ্তিকে পরিণত করে তুলতে। তাতে যদি কোনো সাফল্য এসে থাকে তবে তার অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য।

সুবর্ণরেখা সম্বন্ধে উৎসাহী দর্শকদের নানাবিধ দাবি আছে। কারো

মতে রামায়ণের সীতা নায়িকা সীতার archetype। অতএব সুবর্ণরেখা এপিকের লক্ষণাক্রান্ত। কারো মতে যেহেতু পরিচালক এই ছবিতে কতকগুলি মৌল সমস্যার পর্যালোচনা করে তার সমাধানের ইঙ্গিত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে গিয়েছেন, বলেছেন তার সমাধান রয়েছে 'চরৈবেতি, চরৈবেতি' এই মন্ত্রের মধ্যে তাই এই ছবি গাথা। এইসব উক্তির সার্থকতা-অসার্থকতা অন্য আলোচনার বিষয়। তার আগে যদি নিশ্চিত না হওয়া যায় যে চলচ্চিত্র হিসাবে সুবর্ণরেখা কতটা সার্থক হল, তাহলে একটা বিপদ আছে। সেটা হচ্ছে যে বাংলা সাহিত্যে সুবর্ণরেখার থেকে ভালো কাহিনী আছে ও সুবর্ণরেখার কাহিনীকারের থেকে অনেক ভালো কাহিনীকার আছেন। দীর্ঘকাল ধরে খ্যাতনামা লেখকদের কাহিনী নিয়ে বহু চলচ্চিত্রও তৈরি হচ্ছে। কিন্তু দর্শক ও পরিচালকদের মধ্যে চলচ্চিত্রচিন্তা ও চলচ্চিত্রবোধের অভাবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যে গুণগত সমৃদ্ধি তা অধুনা কয়েকজন পরিচালকের দান। দর্শক যদি সাহিত্য ও চলচ্চিত্র এই দুটো মাধ্যমের মৌল পার্থক্য না ধরতে পারেন, তাহলে তার প্রথম বলি হবে উন্নত চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক সাফল্য। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ঋত্বিকবাবুর সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি অযান্ত্রিক।

দর্শক যদি চলচ্চিত্র-বিচারে সাহিত্যিক ত্রুটি পরিহার করতে পারেন তবেই মৌলিক চলচ্চিত্রকারের পক্ষে সৃষ্টির পথ সুগম ও প্রশস্ত হবে। তাই ঋত্বিক ঘটকের সংবর্ধনায় দর্শকদের চলচ্চিত্র-বিচারে আত্মনির্ভর হওয়ার প্রমাণে আনন্দিত হয়েও বলতে হয় চলচ্চিত্র-বিচারে তার গঠনরীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার চেষ্টা আবশ্যিক। নতুবা চলচ্চিত্রের সাহিত্যভিত্তিক বিচার আমাদের চলচ্চিত্রবোধের অনুশীলনে বাধা সৃষ্টি করবে।

অমলেন্দু বসু

চার

'পরিচয়'-এর আশ্বিন-কার্তিক, সংখ্যায় শ্রীবিভাস চক্রবর্তী ও শ্রীমৃগাঙ্কশেখর রায় দুটি সাম্প্রতিক বাংলা চলচ্চিত্রের (যথাক্রমে 'সুবর্ণরেখা' ও 'অতিথি') যে-আলোচনা করেছেন তার জন্য বাংলা চলচ্চিত্রের অনুরাগী একজন দর্শক ও 'পরিচয়'-এর পাঠক হিসেবে আপনাদের ও উক্ত সমালোচকদ্বয়কে আমার গাঢ় কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র ও নাট্য সমালোচনার মান যে নিষ্করুণভাবে নীচু

এ প্রসঙ্গে বিশেষ বিতর্কের অবকাশ দেখি না। বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক-এর ভাড়া করা সমালোচকরা এ প্রসঙ্গে যে মূর্খতা ও অসততা দেখিয়ে থাকেন তা আমাদের মতো সাধারণ নাট্য ও চলচ্চিত্র দর্শকের কাছে নির্বিশেষ ক্লান্তি ও বিরক্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধুই মাত্র চলচ্চিত্র ও নাট্য-বিষয়ক পত্রিকার সংখ্যাও এতই কম এবং তাদের প্রচার এতই সীমিত যে সেগুলির পাতায় প্রকাশিত দু'একটি সৎ, সক্ষম ও সাহসী আলোচনা প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। এই অবস্থায় গত কিছুকাল ধরে আপনাদের ঐতিহ্য-মণ্ডিত পত্রিকায় এই সময়ের বাংলাদেশের নাট্যাভিনয় ও চলচ্চিত্র-সৃষ্টির তাৎপর্যময়, যদিচ কিছুটা অনিয়মিত ও বিক্ষিপ্ত, আলোচনা প্রকাশে যে-উৎসাহ আপনারা দেখাচ্ছেন তা গভীর আশার দ্যোতনা জাগায় সংশ্লিষ্ট অনুরাগী-মহলে। এই প্রসঙ্গে শ্রীধ্রুব গুপ্ত, শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅজিষ্ণু ভট্টাচার্য ('অনেকের মৃত্যু' নাটক-প্রসঙ্গে উল্লিখিত সংখ্যাটিতে যাঁর একটি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও সারবান আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে)—এঁদের নাম স্বতঃই স্মরণে আসছে। এই সংখ্যায় শ্রীবিভাস চক্রবর্তী এবং শ্রীমৃগাঙ্কশেখর রায়ও তাঁদের আলোচনায় স্বাধীন দৃষ্টিকোণ এবং চলচ্চিত্র-প্রসঙ্গে অভিজ্ঞ রসবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন।

সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে শ্রীচক্রবর্তীর দু-একটি মন্তব্য সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তাঁর লেখার শুরুতে 'নাউ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ থেকে একটি উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি মন্তব্য করেছেন—'ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনই এ যুগের দাবি মেটাতে পারেন'। এই উক্তি নানা রকম প্রশ্নকে প্ররোচিত করে—এ যুগের চরিত্র কি? তার দাবি কি? চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে সাম্প্রতিকতার মর্মানুসন্ধান আমাদের দেশে কারা কি ভাবে করছেন? এবং শুধু ঋত্বিক ঘটক বা মৃণাল সেন কোন্ কোন্ কারণে এ যুগের কথা চলচ্চিত্রে তুলে ধরার গৌরব ও দায়িত্বের অংশীদার? ইত্যাদি। একটি বিরাট প্রবন্ধে সযত্ন বিশ্লেষণের পটভূমিতে শ্রীদাশগুপ্ত যে-মন্তব্য করেছেন তার তাৎপর্যও তিনিই নির্দেশ করেছেন তাঁর লেখায়। শ্রীচক্রবর্তী হঠাৎ একটি উক্তি উদ্ধৃত করে ও সঙ্গে একটি বিতর্কমূলক ও অপ্রতিষ্ঠিত মন্তব্য করে কিছুটা প্রগল্‌ভ অনবধানতার পরিচয় দিয়েছেন বোধহয়। একটি সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত আলোচনায় তাঁর এই উক্তিকে যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব তাঁর উপর পড়েছে, এমন আমার মনে হয়।

সুবর্ণরেখাকে এই দশকের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র বলে স্বীকার করে নিতে আমারও কোনো দ্বিধা নেই। তবে এও ঠিক, সমগ্র ছবিটির চারিত্র্যে কেমন এক ধরনের স্থৈর্যহীনতা ও বিশৃঙ্খলার ছাপ অভ্রান্তভাবে থেকে গেছে। পনের বছরের সময়বৃত্তে এত বড় একটি 'ক্রনিক্‌ল্' কে ধরানোর ব্যাপারে গণ্ডগোল, বহির্দৃশ্য ও অন্তর্দৃশ্যের কাছে মুন্সীয়ানার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য (বিশেষ করে সীতা ও অভিরামের কলকাতার বস্তি-বাড়ির কয়েকটি কাঁচা সেট্ ও দুর্বল 'বৃষ্টি') এবং ছবির শুরুতেই উদ্বাস্তু কলোনি ভাঙা ও সেই ভাঙন রেখার দৃশ্যরচনায় প্রচণ্ড অসম্পূর্ণতা—এত ভালো একটি ছবিতে থাকতে দেওয়া এই ছবির স্রস্টার পক্ষে প্রায় অনপনেয় শৈথিল্য।

অবশ্য সুবর্ণরেখার মহত্ত্ব, শুদ্ধতা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণে শ্রীচক্রবর্তী গভীর বোধের পরিচয় দিয়েছেন। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও ছবিটির সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া দর্শকমনে দীর্ঘস্থায়ী আলোড়ন তোলে। সমাজ ও ব্যক্তি মানসে যে প্রচণ্ড অবক্ষয় একক পলাতকের নিঃসঙ্গ প্রয়াস ও দলবদ্ধ মানুষের যৌথ সংগ্রামকে একই ব্যর্থতার শ্মশানে নিয়ে এসে দাঁড় করায় তার সম্পর্কে এই প্রথম এদেশীয় কোনো শিল্পকর্মে (শুধু চলচ্চিত্র নয়) এমন তীব্র ও যন্ত্রণার্ত সচেতনতা দেখা গেছে। অথচ এই প্রবল ভাঙনের কাছে আত্মসমর্পণই আমাদের অনপনেয় নিয়তি—এমন কোনো নেতিমূলক হতাশাতেও ছবিটি আমাদের ঠেলে দেয় না। বরঞ্চ সীতার চরিত্র-পরিকল্পনায় ও গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে এই অমলিন মেয়েটিকে উপস্থাপনায় চলচ্চিত্রসম্মত ভাষায় বার বার জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসাই নিরন্তর প্রতিফলিত হয় এবং আত্মহত্যার পরেও সীতার যে-মুখের উপর ক্যামেরা স্থির হয় সে-মুখ সব যন্ত্রণা ও ব্যর্থতাকে পার হওয়া একটি দীপ্ত সতেজ ও জীবন্ত মুখ।

দেশভাগ ও দাঙ্গায় ছিন্নমূল কিছু মানুষের পুনর্বাসন খোঁজার পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুত এই সময়ের এই দেশের সব মানুষের নানান আশা ও যন্ত্রণা, ব্যর্থতা ও প্রয়াস, সংশয় ও ভালোবাসার একটি ব্যাপক চলচ্চিত্ররূপ দেওয়ার চেষ্টাই বোধহয় শ্রীঘটক তাঁর গত তিনটি ছবিতে করেছেন। মনে হয় আধার ও আধেয়কে মেলানোর সাধনায় চূড়ান্ত সিদ্ধি তাঁর এখনও অনায়ত্ত, এই বোধ তাঁকে তৃপ্তি দেবে না, এবং সেই অতৃপ্তি, আশা হয়, নানা অসুবিধা কাটিয়ে তাঁকে পরবর্তী আরও ভালো চলচ্চিত্র-সৃষ্টির ব্যাপারে উৎসাহিত করবে।

অশোক মুখোপাধ্যায়

কয়েক বছর আগে সত্যজিৎবাবু মহানগর তুলেছিলেন, সেটা সমস্যার একটা দিক। মৃণাল সেনের 'প্রতিনিধি'ও একালের সমস্যা। 'আকাশকুসুম'-এর নায়কের তার থেকে অনেক inferior মেয়েকে পাবার আকাঙ্খা যেটা আজকের যুগের এই অত্যন্ত রিডিক্যুলাস সমাজব্যবস্থার জন্যে আকাশকুসুমে দাঁড়িয়েছে। আকাশকুসুমের সেই প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা (সত্যিই কি নায়কের আকাঙ্খা আকাশকুসুমের মতো স্পর্ধিত কল্পনাবিলাস ?) সেটাও আজকের যুগের একটা দিক, একটা বড় ট্রাজেডি। কিন্তু সুবর্ণরেখার মতো পূর্ণাঙ্গ কোনোটা হয় নি।

কিন্তু এই সমস্ত ছেড়ে দিলেও শুধুমাত্র শিল্পগুণের জন্যে, অভিরাম উপস্থাপনার জন্যে, প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সুবর্ণরেখা এই দশকের একটা শ্রেষ্ঠ ছবি। আর এই শিল্পবোধের জন্যে, যা সুবর্ণরেখার পটভূমিকে বহির্দৃশ্য-হিসেবে নেওয়া থেকে, অন্ধকারের মধ্যে অভি ভট্টাচার্যের অপসৃয়মান মূর্তি, সেই অদ্ভুত যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি ; সিঁড়ির মুখে বিনুকে রেখে হরপ্রসাদের পালিয়ে যাওয়া ; সুবর্ণরেখার চিকন বালির পাড় ধরে বিনুর নতুন বাড়ির দিকে যাওয়া, পিছনে বোঝার ভারে নত, deformed হয়ে যাওয়া অভি ভট্টাচার্যের পথচলা ইত্যাদি অজস্র দৃশ্যে ছড়িয়ে আছে, এই প্রায় অবিশ্বাস্য ক্ষমতাবান শিল্পবোধের জন্যেই একটি অনেকাংশে আপাতিক ঘটনাবলীর coincidence-এ ভর করা কাহিনী শাশ্বত শিল্পের পর্যায়ে উঠেছে।

বস্তুত এই ছবিটির আগাগোড়া প্রায় প্রতিটি শট অদ্ভুত সৌন্দর্যে ভরা এবং ইমেজ ও চিত্রকল্পের সচ্ছন্দ ব্যবহার এক অবিশ্বাস্য উৎকর্ষতায় উন্নীত। স্মরণ করুন সেই ভাঙা এরোপ্লেনগুলির মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা, রানওয়ের দৃশ্যে অত্যন্ত দ্রুত ক্যামেরার সঞ্চালন। আমাদের জীবনের সেই দারুণ নিষ্ঠুর সত্যগুলি হরপ্রসাদ স্বাভাবিকভাবে বলে গ্যাছে। সেই অন্ধকারভরা ঘরে জানালা দিয়ে অতি-অস্পষ্ট সুবর্ণরেখা দেখা যাচ্ছে, সেখানে পলাতক আর যোদ্ধা উপলব্ধি করে কেউই পার পায় না, ব্যর্থতাই একমাত্র প্রতিলিপি। সেই বিদেশী নাচের হৈ-হুল্লোড়ে ভরা বার-এর দৃশ্যে হরপ্রসাদের চশমার উপর দিয়ে জঘন্য বেশধারী যুবতীর হেঁটে গিয়ে কাঁচটা গুঁড়িয়ে দেওয়া, সেই অদ্ভুত সত্যবোধ যে অমৃতের আকাঙ্খা এ-যুগে উন্মত্ততা এ সমস্তই অত্যন্ত অর্থবহ সংলাপ ও চিত্রকল্পের উদাহরণ। বস্তুত এই গভীর সত্যগুলি এর চেয়ে স্বাভাবিকভাবে বলা আর সম্ভব নয়।

ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত